প্রকাশক
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩ অক্টোবর ১৯৫৮

নবম মুদ্রণ : আগস্ট ১৯৯৩

দশম মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৯৫

মোট মুদ্রণ সংখ্যা : ৫৭,০০০

প্রচ্ছদ
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও ফটো মুদ্রক
প্রসেস অ্যাণ্ড অ্যালায়েড গ্রাফিক্স
১২ প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক
মানসী প্রেস
৭৩, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

সম্পাদকের নিবেদন

অবশেষে বহু প্রত্যাশিত 'শতরূপে সারদা' বের হল। এই দেরির জন্য আমাদের দুঃখের চেয়ে আনন্দই বেশী, কারণ এই দেরির ফলে এই বই-এ এমন কতকগুলি উপাদান যোগ করা সম্ভব হল যা বইখানিকে অসামান্য মূল্য দিয়েছে। একটি উপাদানের উল্লেখ করি—সারা ওলি বুলকে নিবেদিতার ইংরেজী বয়ানে শ্রীশ্রীমায়ের 'মা' স্বাক্ষরিত লেখা চিঠি। এই চিঠি একটা অবিশ্বাস্য দলিল। এই পত্রের ইতিবৃত্ত এই বইতেই আছে।

'শতরূপে সারদা' সারদাদেবীর জীবনী নয়, তাঁর জীবনের ভাষ্য। এই ভাষ্যের প্রয়োজন এই কারণে যে, সারদাদেবী চরিত্রটি আমাদের কাছে রহস্যাবৃত। আপাত-দৃষ্টিতে পল্লীর এক সাধারণ নারী। সর্বদা কর্মব্যস্ত, পতিপ্রাণা, আশ্রিতবৎসল। সকলের প্রতি করুণা, বিশেষ করে যারা দুর্বল ও অক্ষম। সবাই আপনার, তথাকথিত নীচ জাতি, বিধর্মী ও বিদেশীরাও। যেমন মানুষের প্রতি ভালবাসা, তেমন ইতর-প্রাণীর প্রতিও। সর্বদা অদোষদর্শিতা। সর্বদা সন্তোষ—তাঁর ভাষায় যার চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই। সংসারের মধ্যেও অসংসারী। ঈশ্বরমুখী জীবন। দুঃখ-দৈন্য, শোক-ব্যাধি, লোকগঞ্জনা, আবার সুখ-সম্পদ, স্তুতি—সবকিছুকে সমান উপেক্ষা। সর্বদা নির্বিকার, আত্মস্থ। মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। প্রজ্ঞা। পার্থিব বা অপার্থিব সকল সমস্যার সহজ সমাধান। শান্ত, কোমল, স্বল্পবাক্, কিন্তু প্রয়োজনবোধে দৃঢ়, অনমনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সম্ভ্রম করেন, লোকহিতব্রতে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে করেন। ত্যাগ ও তপস্যা তাঁর ভূষণ, তেমনই ভূষণ সকল জাতি, সকল মানুষের প্রতি প্রেম। আদর্শে অবিচল, যে-আদর্শ মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। তাঁর সমগ্র জীবন কঠোর কঠিন সাধনা, এই আদর্শের সাধনা।

সব মিলিয়ে সারদাদেবী এক বিস্ময়কর চরিত্র। কারও স্তুতিতে তিনি বড় নন, তাঁর মহিমা স্বোপার্জিত। 'শতরূপে সারদা' সেই মহিমার কয়েকটি দিক। তাঁর অনন্ত রূপের কয়েকটি মাত্র রূপ। এই বই কতটুকুই বা তাঁর উপর আলোকপাত করবে! তবুও এই ব্যর্থতার মধ্যেই আমাদের সার্থকতা।

'শতরূপে সারদা'র প্রকাশ-মুহূর্তে সম্প্রতি লোকান্তরিত দশম সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। বইটি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সে-বিষয়ে তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল। পরিশিষ্টে 'স্মৃতি-সংকলন' অংশটি সংযোজিত হয়েছে তাঁরই পরামর্শে। শ্রীমায়ের স্মৃতিচারণমূলক তাঁর সুন্দর

ভাষণটির বঙ্গানুবাদ (বঙ্গানুবাদটি তিনি নিজে দেখে দিয়েছিলেন) অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এজন্যে মিশনের নয়াদিল্লী কেন্দ্রের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। নয়াদিল্লী কেন্দ্রের সৌজন্যে আমরা স্বামী অভয়ানন্দজীর (ভরত মহারাজের) স্মৃতি-কথাও পেয়েছি।

এই বই-এর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির সঙ্গে অনেকে জড়িত। তার মধ্যে একজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ তিনি অনেক পেয়েছেন। সেই আশীর্বাদের ফসল আজ আমাদের সকলের সম্পদ। সেই আশীর্বাদ তাঁর উপর আরও বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা।

বইটির পেছনে অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী অব্জজানন্দেরও অনেক অবদান। তেমনি অবদান স্বামী প্রভানন্দের। তাঁরা পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে আমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। নির্দেশিকা তৈরী করেছেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায়, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ গ্রন্থাগার, অদ্বৈত আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের গ্রন্থাগারের সাহায্যও উল্লেখ-যোগ্য।

এই ইনস্টিটিউটের প্রকাশন বিভাগের কর্মিবৃন্দ বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের পরিশ্রম দেখে মনে হয়েছে যেন তাঁরা তপস্যা করছেন।

ত্রিবেণী টিসু এই বই-এর সমস্ত কাগজ বিনামূল্যে দিয়েছেন। তাঁদের এই দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি।

সবশেষে সভক্তি প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সঙ্ঘগুরু পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজকে। তিনি এই বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

সূচীপত্র

সারদা ঃ দর্শনে ও স্মরণে

সারদা ঃ রূপে রূপান্তরে

সারদা : মননে ও বিশ্লেষণে

সারদা ঃ তত্ত্বে ও স্বরূপে

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

সারদাদেবী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি সাধারণত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে—তিনি দেবী, তিনি মাতা, তিনি জ্ঞানময়ী জ্ঞানদাত্রী। শ্রীমা যে দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। শ্রীমা নিজমুখেও বহুবার বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি অভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতিও একবাক্যে বলে গেছেন যে, শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণেরই শক্তি, তাঁর কার্য পরিপূরণের জন্য, তাঁর বার্তা প্রচারের জন্য এসেছিলেন।

তেলোভেলোর মাঠে এক দস্যুদম্পতি সারদাদেবীকে কালীরূপে দেখেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম শ্রীমায়ের স্বমুখেই শুনেছিলেন যে, শ্রীশ্রীমা স্বয়ং মা-কালী। জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে একটি বিড়াল ছিল। ব্রহ্মচারী জ্ঞান তখন মায়ের সেবক; তিনি বিড়ালটিকে আদর-যত্ন তো করতেনই না, বরং মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রহারাদিই করতেন। মা তা জানতেন। ইতিমধ্যে জ্ঞান মহারাজের অযত্ন সত্ত্বেও রাধু ও শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহে বিড়ালের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল। একবার কলকাতা আসার সময় ব্রহ্মচারী জ্ঞানকে ডেকে মা বললেনঃ 'জ্ঞান, বেরালগুলোর জন্যে চাল দেবে; যেন কারও বাড়ি না যায়—গাল দেবে, বাবা।' তারপর ভাবলেন, শুধু এইটুকু বলায় বিড়ালের ভাগ্য ফিরবে না; তাই আবার বললেনঃ 'দেখ, জ্ঞান, বেরালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।'—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা', তিনিই যে আমাদের শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন, নিজের এই পরিচয় নিজেই দিয়ে গেলেনঃ আমি মাতৃরূপে সর্বভূতে, এমনকি এই বিড়ালগুলোর ভেতরও রয়েছি।

নিজ মাতৃভাবকে অবলম্বন করে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মা স্বমুখে বলেছেনঃ 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।' শরৎ—স্বামী সারদানন্দ হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার, সম্পাদক, আর আমজাদ একজন ডাকাত; মায়ের দৃষ্টিতে দুজনই সমান। মা বলেছেনঃ 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।'

একবার এক যুবক-ভক্তের নামে খুব দুর্নাম রটেছে। মায়ের কাছে তার নামে অভিযোগ এল এবং কিছু ভক্ত মাকে অনুরোধ করল, মা যেন যুবকটিকে আর আসতে নিষেধ করেন। কিন্তু মা বললেনঃ 'মা হয়ে তাকে আসতে নিষেধ করব কি করে? অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।' তিনি বলতেনঃ 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।' এ তাঁর কথার কথা নয়, জীবনে, আচরণে সর্বদা তিনি এটা দেখিয়ে গেছেন।

স্বদেশী যুগে যখন আন্দোলন শুরু হয়েছিল—বিদেশী সব কিছু বর্জন করতে হবে, বিলিতি কাপড় বা অন্য কিছু কেনা হবে না, দেশে যা হয় তা-ই ব্যবহার করে

সন্তুষ্ট থাকতে হবে—সেসময় মা একজন ব্রহ্মচারীকে বাজার করতে পাঠালেন। দুর্গা-পুজার আগে মেয়েদের জন্য কাপড় কিনতে হবে। মা তখন জয়রামবাটীতে। ব্রহ্মচারীটি ছিলেন স্বদেশীভাবাপন্ন। তিনি মোটা স্বদেশী কাপড় কিনে ফিরলেন। কিন্তু মেয়েদের তা পছন্দ হল না। তাঁরা ঐ কাপড় ফেরত দিয়ে মিহি কাপড় আনতে বললেন। স্বভাবতই সেই ব্রহ্মচারী বিরক্ত হলেন। তিনি বললেনঃ 'ওসব তো বিলিতি হবে—ও আবার কি আনব?' মা পাশে বসে সব শুনছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেনঃ 'বাবা, তারাও (বিলাতের লোক) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়; আমার কি একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন যেমন বলছে, তা-ই এনে দাও।'

এতে যেন কেউ মনে না করেন, মা বিলিতি-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেমন আমরা হয়ে থাকি। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সব বড় জাতি মিলে যখন ঠিক করলেন, যুদ্ধ আর হতে দেওয়া হবে না, সংঘর্ষের কারণ কিছু ঘটলে তা সবাই মিলে আপসে মিটিয়ে নেওয়া হবে, তখন একজন ভক্ত মায়ের কাছে সেই সুসংবাদ জানালে মা বলেছিলেনঃ 'এ তো খুব ভাল কথা, কিন্তু ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ।' ভক্তটি কথাটা বুঝতে পারেননি দেখে মা আবার বললেনঃ 'যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।' অর্থাৎ কথাগুলি পৃথিবীর দেশনেতাদের প্রাণের কথা নয়, শুধু মুখের কথা মাত্র। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, সেই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে সবকিছু করতেন তিনি। ব্রহ্মচারীকে তিনি যেমন বললেন বিলিতি কাপড় কিনে আনতে, তেমনি আবার ইংরেজের নির্মম পুলিস কর্মচারী একজন নির্দোষ অন্তঃসত্ত্বা নারীর উপর উৎপীড়ন করেছে—তাঁকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে শুনে মা গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। স্বভাবশান্ত শ্রীমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে সেদিন বলেছিলেনঃ 'বল কি?...এটা কি কোম্পানির আদেশ না পুলিস সাহেবের কেরামতি?...এ যদি কোম্পানির আদেশ হয়, তো আর বেশী দিন নয়। এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারে?' কাজেই মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরকম—মানুষের দৃষ্টি দিয়ে আমরা যদি তা বুঝতে যাই, তাহলে সর্বক্ষেত্রে ভুল করব। একদিকে সর্বপ্লাবী মাতৃভাব, অপরদিকে তাঁর স্বাভাবিক দেবীত্ব—এই দুয়ের সমন্বিত রূপই আমরা মায়ের মধ্যে দেখি।

শুধু তা-ই নয়, আগেই বলেছি আমাদের মা জ্ঞানময়ী এবং জ্ঞানদাত্রী। শ্রীরাম-কৃষ্ণ বলেছেনঃ 'ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।' মা একজনকে বলেছিলেনঃ 'দেখ, বাবা, তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] যে সমন্বয়-ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন তা কিন্তু আমার মনে হয়নি।...এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব।' মায়ের এই কথাটাই বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে কত সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারিণী তিনি ছিলেন। স্বামীজী বার বার বলে গেছেনঃ সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। হঠাৎ মা কেন বলতে গেলেন, 'তিনি যে সমন্বয়-ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করে-ছিলেন তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। ...এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব'? শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলে গেছেনঃ আমি নিজে থেকে কিছু করিনি। মা আমাকে যেমন করিয়েছেন, বলিয়েছেন, তেমনি করেছি, বলেছি। —সমন্বয় যদি তাঁর জীবনের ভেতর দিয়ে প্রচারিত হয়ে থাকে, সে সমন্বয় তিনি করেননি, সে সমন্বয় করিয়েছেন স্বয়ং জগদম্বা। মতলব করে তিনি কিছু করেননি। মতলব করে, বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা দর্শন লিখতে পারি, বই

লিখতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব ভাব প্রচার করেছেন তা বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্ট হয়নি, সেসব এসেছে, উৎসারিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে, জগন্মাতারই শক্তিতে। জগতের মা-ই তাঁকে সেসব ভাব জুগিয়ে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা এই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মতলব করে কিছু করেননি। এ অন্তর্দৃষ্টি। প্রজ্ঞাদৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে জ্ঞানদায়িনী সারদাই শ্রীরামকৃষ্ণের মূল ভাবকে যথাযথভাবে তুলে ধরেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা মা-ই প্রথম করেছিলেন, যেমন শ্রীচৈতন্যের পূজা প্রথম করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। পূজার ভিতর দিয়ে তিনি ভগবানের ভগবত্তা জগতে প্রচার করে গেছেন। শুধু কি তা-ই? স্বামীজী যখন জানালেন, আমি বিদেশে যেতে চাই, মা। —মা তখন তাঁকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করেছিলেন ; কেননা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা তিনি, তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে, স্বামীজীর ভিতর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব জগতে প্রচারিত হবে। আরও গোড়ার দিকে যাই। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কে কোথায় থাকবেন, কি হবে, সঙ্ঘ বলে কোন জিনিস দাঁড়াবে কিনা, ঠাকুরের কোন নতুন ভাব আছে কিনা, সেটা প্রচার করা আবশ্যক কিনা—এ সমস্ত কথা নিয়ে তখনও খুব বেশী আলোড়ন হয়নি। সেই সময় মায়ের ভিতর চিন্তা এলঃ 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল ? তা হলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।' মা বলেছেনঃ 'এর [মঠের] জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় আজ মঠ-টঠ যা কিছু।... তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।' অর্থাৎ মা জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন জগতে একটা নতুন ভাব নিয়ে, আদর্শ নিয়ে। সেই ভাব, সেই আদর্শ জগতে প্রচারের প্রয়োজন। কারণ তাতে জগতের অশেষ কল্যাণ হবে। সেই ভাব ও আদর্শকে যথাযথভাবে রক্ষা ও প্রচারের জন্য প্রয়োজন একটি সঙ্ঘের—মা তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তার জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। আর তার ফলেই রামকৃষ্ণসঙ্ঘের জন্ম। স্বামীজী তাঁর সম্পর্কে বলতেনঃ 'সঙ্ঘজননী'।

আজ জগৎ জুড়ে রামকৃষ্ণ পরিবার। সারা বিশ্বে আজ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের বিস্তৃতি। এই সঙ্ঘের মূলে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব গ্রহণ করে, তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে, সব দিকে চোখ খুলে রেখে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁর সন্তানদের কাছে, দুর্দিনে আশা জাগিয়েছেন তাঁদের ভেতর। তারই ফলে আজ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন গড়ে উঠেছে। যত দিন যাবে, মায়ের মহিমা আরও প্রকাশিত হবে—আজও আমরা যা

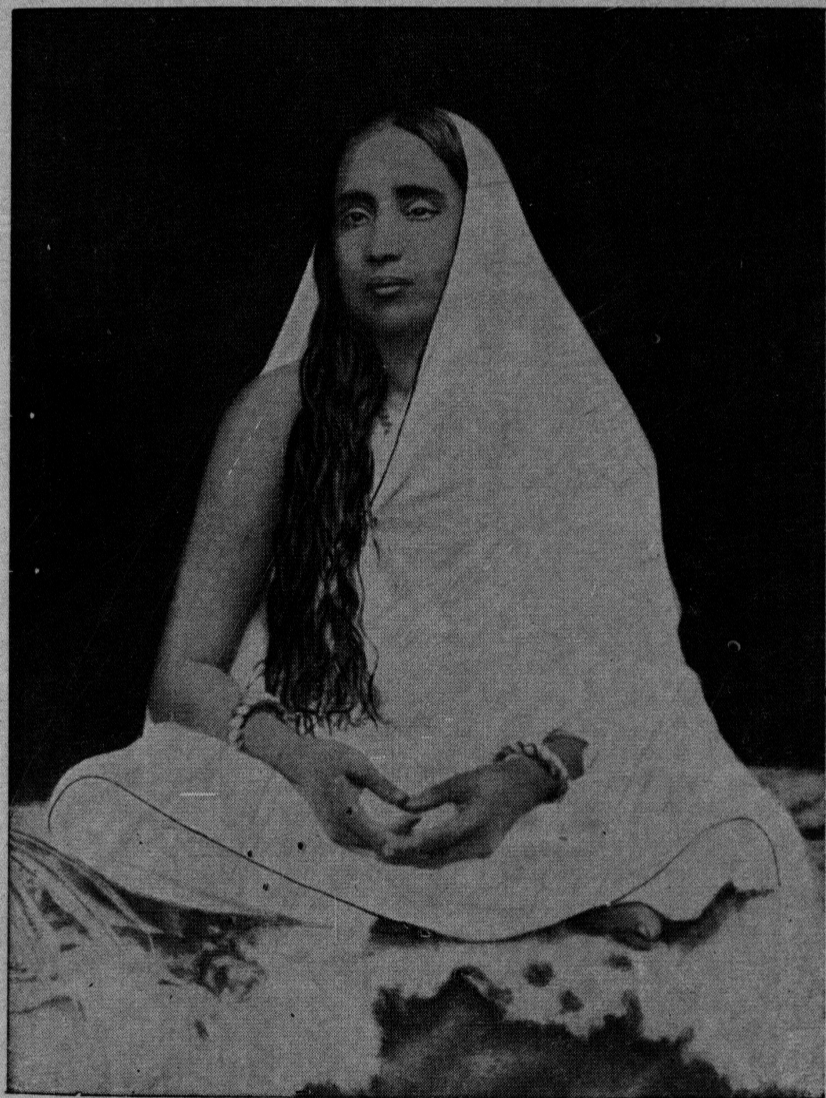
জানতে পারছি না, ভবিষ্যতে অনেকের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা হয়তো তখন থাকব না; কিন্তু শ্রীমা তো দু-চার দিনের বা দু-দশ বছরের জন্য আসেননি, তাঁর সাধনার ফল, তাঁর ভাবধারা হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হবে—মানুষের মনে জাগাবে অনুপ্রেরণা, জগতে আসবে নতুন শান্তি, সমৃদ্ধি, সাফল্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ-প্রতিমা শ্রীমা জগতের মানুষের সামনে একটি মহৎ জীবন-দর্শনকে তুলে ধরেছিলেন। আপাতসাধারণ তাঁর জীবনদর্শন, আপাতসাধারণ তাঁর জীবন। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই চমকে উঠতে হয় তার গভীরতা দেখে। আজ অনেক চিন্তাশীল মানুষ অনুভব করছেন, আধুনিক ভারতবর্ষে এবং আধুনিক পৃথিবীতে সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যে-সঙ্কট দেখা যাচ্ছে তাতে শ্রীমায়ের জীবনের অনুধ্যান এবং তাঁর আদর্শের অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। যে-সঙ্ঘের সঙ্ঘজননীরূপে তিনি আরাধিতা হন, শুধু সেই সঙ্ঘভুক্ত সন্তান-সন্ততির ব্যক্তিজীবনের ধ্যান-ধারণা এবং অনুধ্যানে নয়, সভাসমিতিতে আলোচনায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে এবং গবেষণামূলক গ্রন্থাদিতে আজ শ্রীমায়ের জীবনের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার 'শতরূপে সারদা' শিরোনামে শ্রীমায়ের উপর বৃহৎ আকারে এই আলোচনা-পুস্তক প্রস্তুত করে সেই কাজে অগ্রণী হতে প্রয়াস পেয়েছে। এই গ্রন্থে শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সন্ন্যাসী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, বিচারপতি, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, গবেষক, গৃহবধূ প্রভৃতি সমাজের নানা স্তরের চিন্তাশীল মানুষের প্রায় পঞ্চাশটি রচনা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। তাছাড়া গ্রন্থের পরিশিষ্টে কয়েকজনের স্মৃতিকথাও সংকলিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাভাষায় শ্রীমায়ের উপর এই ধরনের গ্রন্থ ইতি-পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয়নি।

শ্রীমায়ের অনন্ত প্রকাশ। তার ইয়ত্তা করা সম্ভব নয়। তবুও তাঁর জীবনের অনেকগুলি দিককে এখানে জনগোচর করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁদের শ্রীমায়ের জীবন সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা ছিল মাত্র, তাঁরা এই গ্রন্থে শ্রীমায়ের জীবনের বহু-বিচিত্র প্রকাশ দেখে আশ্চর্য হবেন এবং যাঁরা এ-বিষয়ে বিশেষ অবহিত নন তাঁরাও চমৎকৃত হয়ে দেখবেন—অধ্যাত্ম-জগতের সর্বোচ্চ প্রকাশরূপিণী এই নারী বাস্তবজীবন ও তার বিচিত্র সমস্যা সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, পাঠক লক্ষ্য করবেন, সেই জীবনের যন্ত্রণাকে মুছিয়ে দেবার জন্য মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে শ্রীমা কিভাবে এগিয়ে আসতেন।

গম্ভীরানন্দ

সারদা ঃ দর্শনে ও স্মরণে



শ্রীশ্রীমা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে

১৩০৫ সাল : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

ফটো : মিঃ হ্যারিংটন ব্যবস্থাপনায় : মিসেস ওলি বুল

স্থান : বাগবাজার (বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার আবাস)



শ্রীশ্রীমা
১৩১২ সাল : ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ
স্থান : কলিকাতা ফটো : ভ্যানডাইক
ব্যবস্থাপনায় : স্বামী বিরজানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের 'শক্তি'

রামকৃষ্ণদেবের এবার 'ঐশ্বর্যবিহীন লীলা'। তাঁর শক্তিরূপিণী সারদাদেবীও 'অবগুণ্ঠিতা', 'লজ্জাপটাবৃতা'। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ছদ্মবেশে এসেছিলেন, সারদাদেবীও এসেছিলেন সঙ্গোপনে, স্বরূপ ঢেকে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায়, এমন কি পরবর্তী-কালেও তাঁর বিশেষ ভক্তদের মধ্যেও অনেকেই সারদাদেবীর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি পাহাড় পর্বতে তপস্যা করতে যাননি, বক্তৃতা দেননি, গ্রন্থাদি রচনা করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলী, এমন কি ত্যাগী-শিষ্যদের অনেকের সঙ্গেও সামনাসামনি তিনি কখনও কথা বলেননি, অথচ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে একটা মহাজীবনের আদর্শ কিভাবেই না তিনি জগতের কাছে রেখে গিয়েছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ছোটখাট দু-চারটি কথায় কোন কোন সময়ে নিজের স্বরূপের ইঙ্গিত করেছিলেন, তেমনি অল্প দু-একটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর লীলাসঙ্গিনীর স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা সারদাদেবীর জীবনের মহিমার প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। স্থূলদেহে, এমন কি সূক্ষ্মদেহেও তিনি বিভিন্ন জনের কাছে শ্রীমায়ের স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। তা না হলে শ্রীমা হয়তো বড়জোর একজন উচ্চকোটির সাধিকা বা সিদ্ধারূপেই পরিচিতা হতেন ; এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বা ভক্তমণ্ডলীও তাঁকে হয়তো নেহাৎ গুরুপত্নীরূপেই শ্রদ্ধা দেখাতেন।

সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ 'ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।'[১] আবার বলেছিলেনঃ '(ও) জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী *।

ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!'[২] আবার কখনও ইঙ্গিতময়ভাবে বলেছেনঃ 'আমি কি আর লাউশাক-খাকী, পুঁইশাক-খাকীকে বে করেছি?'[৩] এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে জনৈক ভক্তের যে কথাবার্তা হয়েছিল সেটি এখানে উদ্ধার করা যেতে পারেঃ

'জনৈক ভক্ত—মহারাজ, ঠাকুর যে অবতার তা না হয় তাঁর দিব্য ভাব দেখে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী সে কথা মনে আনতে পারি না কেন?

স্বামী সারদানন্দ—ঠাকুরকে যদি ভগবান বলে বিশ্বাস করতেই পেরে থাক তবে এ সন্দেহ তোমার আসে কেন?

ভক্ত—আমার এ সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছে না।

স্বামী সারদানন্দ—তাহলে বল ঠাকুরকে অবতার বলে তোমার ঠিক ধারণা হয় নি।

ভক্ত (বিনীতভাবে)—না মহারাজ, ঠাকুরে সে বিশ্বাস আমার আছে।

স্বামী সারদানন্দ (দৃঢ় কণ্ঠে)—তোমার তা হলে বিশ্বাস ভগবান একটি ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়েকে বে করেছিলেন?'[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবী সম্পর্কে যে বললেনঃ 'ও আমার শক্তি'—এই 'শক্তি' শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাধারণত বিবাহিত পত্নীকে 'শক্তি' বলা হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি 'ব্রহ্ম ও শক্তি'র কথাই ইঙ্গিত করেছেন! শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, সারদাদেবী আদ্যাশক্তি ভগবতী, যুগাবতারের শক্তিরূপিণী, যিনি যুগে যুগে অবতারের লীলাসঙ্গিনী হন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখি যে, তিনি ইঙ্গিত করছেন সারদাদেবীই সীতা এবং রাধা। পঞ্চবটীতে সাধনার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সীতার দর্শন পান তখন তাঁর হাতে 'ডায়মনকাটা' বালা দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের জন্যও ঐরকম বালা তৈরী করিয়ে সকৌতুকে বলেছিলেনঃ 'আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ!'[৫] স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে (তখন সারদাপ্রসন্ন মিত্র) মন্ত্রদীক্ষা[৬] নেবার জন্যে শ্রীমায়ের কাছে পাঠানোর সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্টতই নিজেকে কৃষ্ণ (এবং রাম) এবং সারদাদেবীকে রাধা (এবং সীতা) বলে নির্দেশ করেছেন। আরও লক্ষণীয় যে শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে সারদাদেবীকে তাঁর নিজের চেয়েও উঁচু আসনে স্থাপন করলেন।

ঈশ্বরের মর্তলীলার সনাতন রীতি হল এই যে, যখনই ঈশ্বর আসেন সঙ্গে সঙ্গে আসতে হয় তাঁর শক্তিকেও। এঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা একজন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের। কারণ অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তির মতোই তাঁরা অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য। তাই দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবী পরস্পরের দ্বারা জীবনসঙ্গিরূপে নির্বাচিত। যুবক গদাধরের জন্যে বহু চেষ্টাতেও যখন মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন ভাবাবিষ্ট হয়ে গদাধর একদিন তাঁর অভিভাবকদের বললেনঃ অন্যত্র অনুসন্ধান করা বৃথা। জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা হয়ে রাখা আছে।[৭] আবার অপরদিকে দেখি যে, শ্রীমা-ও এই ঘটনার বহু পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর ভাবী পতি হিসেবে চিনিয়ে রেখেছিলেন। সারদা তখন নিতান্তই শিশু। চমকপ্রদ সেই ঘটনাটি হল এইঃ সেবার শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কীয় ভাগ্নে হৃদয়রামের বাড়ি শিহড়ে কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। ঐ উপলক্ষে গদাধর শিহড়ে আসেন এবং আসরে বসে কীর্তন-যাত্রাগান শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু নরনারীর সঙ্গে শ্যামাসুন্দরীও 'সারু'কে নিয়ে তাঁর পিত্রালয় শিহড়ে হৃদয়ের বাড়িতে এসেছেন কীর্তন শুনতে। কীর্তনের আসর ভেঙে যাবার পরে জনৈকা বয়স্থা প্রতিবেশিনী সারদাকে কোলে নিয়ে রঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'এই যে এত লোক এখানে রয়েছে, এদের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে সাধ যায়?' তৎক্ষণাৎ শিশু সারদা দু-হাত তুলে অদূরে উপবিষ্ট তরুণ গদাধরকে দেখিয়ে দিলেন।[৮] এইভাবে যেদিন সারদামণি স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন সেদিন তাঁর বিবাহ শব্দের তাৎপর্যবোধও ছিল না।[৯]

গদাধর কামারপুকুরে এসেছেন। জয়রামবাটী হতে সারদাকেও আনা হল। তিনি তখন চোদ্দ বছরের কিশোরী। গদাধরকে কেন্দ্র করে কামারপুকুরে আনন্দমেলা বসেছে। অনেক রাত পর্যন্ত পাড়ার মেয়েদের কাছে গদাধর কত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করছেন। সারদাদেবী শুনতে শুনতে হয়তো অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তা দেখে মেয়েরা তাঁকে তুলতে যেত। বলতঃ 'এমন কথাগুলি শুনলে না, ঘুমিয়ে পড়ল!' গদাধর তুলতে বারণ করে বলতেনঃ 'না গো না, ওকে তুলো না। ও কি সাধে ঘুমোচ্ছে? এসব কথা শুনলে ও এখানে থাকবে না—চোঁচা দৌড় মারবে।'[১০] নিজের স্বরূপতত্ত্ব শুনলে সারদাদেবী একেবারে স্বরূপে লীন হয়ে যাবেন। জাগতিক সম্বন্ধে সারদাদেবী তাঁর বিবাহিতা পত্নী; কিন্তু এটাই তো তাঁর আসল পরিচয় নয়! শ্রীরামকৃষ্ণই জানতেন সেই স্বরূপের পরিচয়। পরম ঈশ্বরী জগন্মাতাই স্বয়ং মানবীরূপে সারদাদেবীর শরীর অবলম্বনে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীরূপে এ জগতে। সারদাদেবীর

একজন প্রখ্যাত জীবনীকার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করছেনঃ 'ঠাকুর এই কথাগুলি কি অর্থে বলিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। হয়তো তিনি এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন যে, শ্রীমায়ের মন স্বভাবতই এরূপ ঊর্ধ্বগামী যে, নরলীলার উপযোগী পরিবেশ রচনার পূর্বে ঈদৃশ উচ্চ তত্ত্ব কর্ণগোচর হইলে মায়াবলম্বনে স্বকার্যসাধনের পূর্বেই তিনি এমন গভীর সমাধি-নিমগ্ন হইয়া পড়িতে পারেন যে, লীলাবিগ্রহ-ধারণই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।'[১১]

স্বামী শিবানন্দকে একদিন রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেনঃ 'ঐ যে মন্দিরে মা (অর্থাৎ ভবতারিণী) রয়েছেন, আর এই নহবতের মা (সারদাদেবী)—অভেদ।'[১২] সারদাদেবী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'আমি তোমার কে?' সহজ কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'তুমি আমার মা আনন্দময়ী।'[১৩] অন্য একদিন শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেনঃ 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন,* আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।'[১৪] প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিলেন, 'তাহলে শ্রীশ্রীমাকে [ঠাকুর] কোন্ দৃষ্টিতে দেখছেন? আমার মনে হয় তিন রকম ভাবেঃ শিষ্যারূপে উপদেশ করছেন, পতিব্রতারূপে পদসেবার অধিকার দিয়েছেন এবং সাক্ষাৎ জগদীশ্বরীরূপে পূজা করেছেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁকে পতি, গুরু এবং ইষ্টরূপে সেবাপূজা করেছেন।'[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী যখন দক্ষিণেশ্বরে একত্র বাস করতেন সেই প্রসঙ্গে শ্রীমা বলতেনঃ 'সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম, সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে! ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না; এক দিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে

হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়! তারপর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হত না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হত।'[১৬] শুধু যে শ্রীরামকৃষ্ণের মনই ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করত তাই নয়, সারদাদেবীর মনও অনুরূপভাবে দেহাতীত ভূমিতে অবস্থান করত। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বলেছেন যে, তাঁর মনে হত, তাঁরা যেন 'দুজনেই মার সখী'![১৭] দীর্ঘ আটমাসকাল শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে অতি নিকটে রেখেও তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র দেহবুদ্ধির প্রকাশ দেখতে পাননি। পরবর্তীকালে তিনি এই জাহ্নবীসদৃশা পবিত্রতাস্বরূপিণীর মহিমার পরিচয় দিতে গিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতেনঃ 'ও (শ্রীমা) যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তা হলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে?'[১৮] স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে বলেছেন 'ত্যাগীশ্বর', যাঁর ইন্দ্রিয়জয়ের অলৌকিক ইতিহাস প্রবাদকাহিনীতে পরিণত হয়েছে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্যতমা প্রধান এক স্ত্রীভক্তকে সূক্ষ্মদেহে যেকথা বলেছিলেন তা স্মরণ করা যেতে পারে। স্ত্রীভক্তটি আর কেউ নন—যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস—শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর কাছে যিনি 'যোগীন-মা' নামে সুপরিচিতা। তিনি শ্রীমায়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রীমায়ের ভাব, সমাধি দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। আবার অজস্র স্নেহ-মমতা ও আদরযত্ন পেয়েছিলেন শ্রীমায়ের কাছ থেকে। তবু তাঁর মনে সংশয়ের বীজ শিকড় গেড়েছিল। তিনি ভাবতেন—ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন, আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারী! ভাই ভাইপো ভাইঝিদের জন্য অস্থির। এই রকম মানসিক ভাবনা নিয়ে যোগীন-মা একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে ধ্যান করছেন। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেনঃ 'দেখ, গঙ্গায় কি ভাসছে।' যোগীন-মা দেখেন—নাড়িভুঁড়ি জড়ান একটি সদ্যোজাত শিশু গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণদেব তা দেখিয়ে বললেনঃ 'গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র হয়? না, তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকে (শ্রীমাকে) তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না। ওকে (আর) একে (নিজেকে দেখিয়ে) অভেদ জানবে।'[১৯] এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্ববাসীর জন্য শ্রীমায়ের অলৌকিক মহিমার কথা ধীরে ধীরে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা এইমাত্র দেখলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সম্পর্কে যোগীন-মাকে বলছেন, 'ওকে (আর) একে অভেদ জানবে।' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে চাইছেন যে, তাঁরা একে

অন্যের অন্তরে-বাইরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। বাইরে মাত্র পৃথক সত্তা, অন্তরে তাঁরা এক অভিন্ন একাত্মা। দিব্য দাম্পত্যজীবনলীলায় এ এক বিচিত্র অধ্যায়! এই সূত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তিনি যে অভেদ একথা সারদাদেবীও পরবর্তীকালে একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। আবার কখনও কখনও ইঙ্গিতমাত্র করেছেন, কিন্তু সেই ইঙ্গিত এমনই অর্থবহ যে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যেমন কখনও বলেছেন, 'আমরা কি আলাদা?'[২০] অথবা, 'ঠাকুর ও আমাকে অভেদভাবে দেখবে।'[২১] আবার স্বামী বিরজানন্দ (রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ) একসময় শ্রীমায়ের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেনঃ 'ঠাকুরের দর্শন পেলুম না, কি হবে?' শ্রীমা উত্তরে বলেছিলেনঃ 'ঠাকুরের দর্শন তো পেয়েছো।' কথাটি শুনে স্বামী বিরজানন্দ প্রথমে অবাক হয়েছিলেন, কারণ স্থূলদেহে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। কিন্তু পরে কথাটির তাৎপর্য তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেনঃ 'মা বলিতেছেন—যখন শ্রীশ্রীমাকে (তিনি) দর্শন করিয়াছেন তখন ঠাকুরেরই দর্শন পাওয়া হইয়া গিয়াছে।'[২২]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহধর্মিণীর স্বরূপ জানতেন বলেই শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহারেও খুবই সম্ভ্রম প্রকাশ পেত। তাঁর মনে কোনভাবে বিন্দুমাত্র আঘাতও দিতে চাইতেন না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক ফলমিষ্টি আসত, আর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐসব নহবতে শ্রীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। শ্রীমা সে সবই মুক্তহস্তে বিলিয়ে দিতেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ একটু অনুযোগের সুরে বলে-ছিলেনঃ 'এত খরচ করলে কি ভাবে চলবে?' ঐকথা শুনে শ্রীমাকে নীরবে চলে যেতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ভাইপো রামলালকে ডেকে বললেনঃ 'ওরে, রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখিয়ে) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।'[২৩] শ্রীমায়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্বেচ্ছা-পরাজয় প্রমাণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীমায়ের স্থান কোথায় ছিল। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে নিবেদিতা মন্তব্য করেছেনঃ 'শ্রীমা এমনই প্রিয় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।'[২৪]

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর পরিধির বাইরে হলেও স্বামী হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের প্রতি যে দরদ ও ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তাতে যে মানবিক স্নেহদৃষ্টির স্বাক্ষর আছে তা সহধর্মিণীর প্রতি সাধারণভাবে একজন যথার্থ প্রেমপরায়ণ স্বামীর দরদ ও ভালবাসার চেয়ে কোন ভাবেই কম ছিল না। বাস্তবিক আমরা দেখি, শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমায়ের যতটা টান ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরও শ্রীমায়ের প্রতি তার চেয়ে কিছু কম

টান ছিল না। গৌরী-মা বলেছেনঃ 'এই যে দুজনের মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে থেকেও কখনও কখনও ছ-মাসেও হয়তো একদিন দেখা নাই, তবু দুজনে ভাবই ছিল কত!'[২৫] শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের সম্পর্কে বলতেনঃ 'ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে ভালবাসে।'[২৬] তাই হৃদয়কে একবার বলেছিলেনঃ 'দেখ তো তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভাল করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে!'[২৭] এ সম্পর্কে শ্রীমায়ের মন্তব্যঃ 'তখন তাঁর অসুখ, তবুও আমায় তিনশ টাকা* দিয়ে তাবিজ গড়িয়ে দেওয়ালেন—যিনি নিজে টাকাকড়ি ছুঁতেই পারতেন না।'[২৮] শ্রীমাকে ঠাকুরের 'ডায়মন কাটা' সোনার বালা গড়িয়ে দেওয়ার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

একবার শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ 'দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একদিন আমি রঙ্গনফুল আর জুঁইফুল দিয়ে সাত লহর গড়ে মালা গেঁথেছি! বিকেলবেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি সব ফুটে উঠল। মাকে পরাতে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না খুলে মাকে ফুলের মালা পরানো হয়েছে। এমন সময়ে ঠাকুর মাকে দেখতে গিয়েছেন, দেখে একেবারে ভাবে বিভোর। বার বার বলতে লাগলেন, "আহা, কাল রংয়ে কি সুন্দরই মানিয়েছে!" জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এমন মালা গেঁথেছে?" আমি গেঁথে পাঠিয়েছি একজন বলাতে তিনি বললেন, "আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো, মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক!" বৃন্দে ঝি গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। মন্দিরের কাছে আসতেই দেখি, বলরামবাবু, সুরেনবাবু—এঁরা সব মায়ের মন্দিরের দিকে আসছেন, আমি তখন কোথায় লুকুই। বৃন্দেব আঁচলটি টেনে ঢাকা দিয়ে তার আড়ালে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলুম। ওমা, ঠাকুর তা জানতে পেরে বলছেন, "ওগো, ওদিক দিয়ে উঠোনা, সেদিন এক মেছোনী উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়ে এস না।" তাঁর ঐ কথা শুনে বলরামবাবুরা সরে দাঁড়ালেন। গিয়ে দেখি—মায়ের সামনে ঠাকুর ভাবে প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন!'[২৯]

ঠাকুরের মর্তলীলার অবসানের পরে শ্রীমায়ের ভরণপোষণের কি হবে সেকথাও ঠাকুর গভীরভাবে ভেবেছেন। তিনি অত ত্যাগী হলেও একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তোমার ক-টাকা হলে হাতখরচ চলে?' মা বললেনঃ 'এই পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।' তারপর প্রশ্ন করলেনঃ 'বিকেলে কখানা রুটি খাও?' শ্রীমা খুব লজ্জা পেলেন, খাবার কথা কি করে বলবেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার প্রশ্ন করায় তিনি বললেনঃ 'এই পাঁচ-ছ খানা খাই।' ঠাকুর খরচের পরিমাণ হিসাব করে বললেনঃ 'তা হলে পাঁচ-ছ শ টাকায় তোমার খুব চলে যাবে।' পরে তিনি ঐ পরিমাণ টাকা বলরামবাবুর নিকট

গচ্ছিত রাখেন। বলরামবাবু ঐ টাকা জমিদারিতে খাটিয়ে ছয় মাস অন্তর ৩০ টাকা সুদ শ্রীমাকে পাঠিয়ে দিতেন।[৩০]

শ্রীমায়ের কোনরকম অসুবিধার কথা অবগত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। একবার শ্রীমায়ের মাথা ধরলে শ্রীরামকৃষ্ণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং বার বার রামলাল-দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেনঃ 'ওরে রামলাল, মাথা ধরল কেনরে ?'[৩১]

শ্রীমা বলেছেনঃ 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কখনও আমাকে "তুই" পর্যন্ত বলেননি।'[৩২] দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে তিনি খাবার নিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তা খেয়াল করেননি। যথাস্থানে খাবার রেখে শ্রীমা চলে আসছেন. এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী খাবার দিয়ে গেলেন মনে করে বললেনঃ 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।' শ্রীমা বললেনঃ 'আচ্ছা।' শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের গলার স্বর শুনে চমকে উঠে বললেনঃ 'আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী—কিছু মনে কোরো না।' এমনভাবে বললেন যেন কত অপরাধ করে ফেলেছেন। 'দিয়ে যাস' বলেছিলেন, তার জন্যই এত সঙ্কোচ! পরদিন পর্যন্ত নহবতের সামনে গিয়ে শ্রীমাকে বললেনঃ 'দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি. ভেবে ভেবে– কেন এমন রূঢ় বাক্য বলে ফেললুম।'[৩৩] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তদানীন্তনকালে গ্রামাঞ্চলে বহু ভদ্রবংশীয় পুরুষরাও স্ত্রীকে 'তুই' বলতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং তার মধ্যে অশালীন কিছু আছে বলে মনে করাও হত না। শ্রীমা বলছেনঃ 'আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মতো কিছু বলেননি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি।'[৩৪] স্বয়ং ঈশ্বররূপে পূজিত হলেও এবং অধিকাংশ সময় আত্মভাবে বিভোর থাকলেও শ্রীমায়ের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনে এবং সৌজন্য প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বক্ষণ সচেতন থাকতে দেখা যেত। সারদাদেবী তাই বলতেনঃ 'ঠাকুর, যাঁর পরনের কাপড় ঠিক থাকতো না, তাঁরই আমার জন্যে কত চিন্তা।'[৩৫] শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে কত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন সে সম্পর্কে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিজেই একদিন ভক্তদের কাছে বলেছিলেন যে, শ্রীমা তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দেবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার তাঁকে নমস্কার করতেন।[৩৬] আবার দেখা যায় যে, শ্রীমা তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা ব্রহ্মময়ী মা ব্রহ্মময়ী' বলে সম্ভ্রমভরে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।[৩৭]

শুধু যে শ্রীরামকৃষ্ণই নিজে শ্রীমায়ের প্রতি সম্ভ্রম ও সৌজন্য প্রকাশের ব্যাপারে সদাসতর্ক ছিলেন তাই নয়, অপরেও যাতে তাঁর প্রতি আচরণে কোনভাবে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে সে বিষয়েও সর্বদা সজাগ ছিলেন। এটা যে স্বামী হিসেবে

স্ত্রীর প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধে করতেন তা কিন্তু নয়। শ্রীমায়ের স্বরূপ তাঁর মনে সবসময় জাগরূক ছিল। তিনি জানতেন যদি কেউ স্বয়ং আদ্যাশক্তিকে অশ্রদ্ধা দেখায়, তাহলে সে নিজেরই চরম অকল্যাণ ডেকে নিয়ে আসবে। হৃদয়—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালে ঐকান্তিক সেবাযত্নের দ্বারা তাঁর শরীররক্ষা করে রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রয়েছেন—তিনি সারদাদেবীর সঙ্গে প্রায়ই দুর্ব্যবহার করতেন। হৃদয় অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গেও মাঝে মাঝে খারাপ ব্যবহার করতেন, তিনি সেসব সহ্য করে যেতেন। কিন্তু শ্রীমায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গে একদিন তাঁকে সাবধান করে বলেছিলেনঃ 'ওরে হৃদে, (নিজেকে দেখিয়ে) একে তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনও এমন কথা বলিস নি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।'[৩৮] এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শ্যামপুকুরে—ভক্তেরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য সেখানে নিয়ে গিয়েছেন। শ্রীমা রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। সেসময় একদিন গোলাপ-মা কথায় কথায় যোগেন-মাকে বলেছিলেনঃ 'দেখ যোগেন, ঠাকুর বোধহয় মার উপর রাগ করে কলকাতা চলে গেছেন।' যোগেন-মার কাছে ঐকথা শুনে শ্রীমা কলকাতা গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেঁদে বললেনঃ 'তুমি নাকি আমার উপর রাগ ক'রে চলে এসেছ?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ 'না, কে তোমায় একথা বলেছে?' শ্রীমা বললেনঃ 'গোলাপ বলেছে।' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ রেগে গিয়ে বললেনঃ 'সে এমন কথা ব'লে তোমায় কাঁদিয়েছে? সে জানে না তুমি কে? গোলাপ কোথায়? আসুক না?' শ্রীমা তখন শান্ত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন। পরে গোলাপ-মা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলে তিনি তাঁকে খুব ভর্ৎসনা করে বললেনঃ 'তুমি কি কথা ব'লে ওকে কাঁদিয়েছ? জান না ও কে? এক্ষুণি গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওগে।' গোলাপ-মা তক্ষুণি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন।[৩৯] অন্য এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'নহবতে যে আছে সে যদি কোনও কারণে কারও উপর বিরূপ হয় তো তাকে রক্ষা করা আমারও সাধ্যাতীত।'[৪০]

আদ্যাশক্তিকে অসম্মান করলে যেমন মানুষ নিজের চরম অকল্যাণ ডেকে আনে তেমনি আবার তিনি প্রসন্না হলে মানুষ পরম কল্যাণ ও শ্রেয়োলাভ করে ধন্য হয়। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'[৪১]—তিনি প্রসন্না হলে মানুষকে চরম পুরুষার্থ লাভের অভীষ্ট বর প্রদান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গদের সে বিষয়ে অবহিত করে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরে —অসুস্থ। যোগীন-মার মনে বৃন্দাবনে গিয়ে তপস্যা করার বাসনা হল। তিনি একদিন তা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালেন। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেনঃ 'তুমি বৃন্দাবনে যাবে? বেশ হবে, যাও; সব সেখানে পাবে।' কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীমাকে দেখিয়ে বললেনঃ 'ওকে বলেছ?

ও কি বলে?' শ্রীমা তাড়াতাড়ি বললেনঃ 'যা বলবার তুমিই তো বললে। আমি আবার কি বলব?' শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা শুনেও শুনলেন না, যোগীন-মাকে বললেনঃ 'ওগো বাছা, ওকে রাজী করিয়ে যেও—তোমার সব হবে।'[৪২]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক লাটু (পরবর্তীকালে স্বামী অদ্ভুতানন্দ) একদিন পঞ্চবটীতে ধ্যানে বসেছেন। ধ্যান খুব জমে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর দিকে যেতে গিয়ে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে ডেকে বললেনঃ 'আরে, তুই যাঁর ধ্যান কচ্ছিস, তিনি তো নবতে ময়দা ঠেসছেন।'[৪৩] আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক সন্তান যোগীনকে (পরবর্তীকালে স্বামী যোগানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতে নিয়ে গিয়ে শ্রীমাকে দেখিয়ে বললেনঃ 'ওঁর চরণ ধরে পড়ে থাক, ওখানে তোর সব হবে।'[৪৪] লাটু মহারাজ বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে বলেছিলেনঃ 'দ্যাখ, এখন থেকে যে কোন জিনিস আসবে সব নহবতে এনে দেখাবি, তারপর সবাইকে দিবি।' এর কারণ ব্যাখ্যা করে লাটু মহারাজ বলেছেনঃ 'জিনিসগুলোর দোষ কাটাবার জন্যে তিনি মায়ের কাছে নহবতে পাঠাতে বলতেন।'[৪৫] অবশ্য যোগীন-মার স্মৃতি অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ লাটু মহারাজকে যা বলেছিলেন তা হল এইঃ 'দ্যাখ! যে যা জিনিসপাতি আনে সব ওকে (শ্রীমাকে) দেখাবি, জানাবি। নইলে তাদের উদ্ধার কেমন করে হবে?'[৪৬]

কৌতুকপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় লঘু পরিহাসের মাধ্যমেও ভক্তদের কাছে শ্রীমায়ের দৈবী স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। তার দুটি দৃষ্টান্ত যেমন উপভোগ্য তেমনি আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর ব্যঞ্জনাবহ। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান স্ত্রীভক্ত গৌরী-মা সেসময় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সবে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি সারদাদেবীর সঙ্গেও নহবতে থাকেন। একদিন গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, নহবতে সারদাদেবীর সঙ্গে রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে গিয়ে গৌরী-মাকে কৌতুকভরে বললেনঃ 'বল্ তো, গৌর-দাসী, তুই কাকে বেশী ভালবাসিস?' কৌতুকপ্রিয়তায় গৌরী-মাও কিছু কম ছিলেন না। সোজা কথায় কোন উত্তর না দিয়ে তিনি একটি গান ধরলেনঃ

রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী!
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল, 'রাই কিশোরী'।[৪৭]

গানের মাধ্যমে গৌরী-মার উত্তরের তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়। শ্রীমা লজ্জায়

গৌরী-মার হাত চেপে ধরলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও হার মেনে তাৎপর্যটিকে স্বীকার করে হাসতে হাসতে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

অন্য একদিন এক মহিলা অত্যন্ত কাতরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে জানালেন যে, তাঁর বিপথগামী স্বামীর আচরণে তাঁর জীবনে এবং পরিবারে এক ভয়ানক অশান্তি এসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আকুতি জানালেন যে, যদি শ্রীরামকৃষ্ণ দয়া করে কোন দৈব ঔষধ তাঁকে দেন তাহলে তিনি এই বিপদে রক্ষা পান। মহিলাটি সাধক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের খ্যাতি শুনে এই প্রার্থনা জানাবার জন্যে তাঁর কাছে এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনে মহিলাটিকে বললেনঃ 'সেখানে [নহবতে] এক স্ত্রীলোক আছেন; তাঁকে তুমি সব খুলে বললে তিনি ঠিক ঠিক ওষুধ দেবেন। তাঁর এসব মন্ত্রৌষধি জানা আছে; এবিষয়ে তাঁর শক্তি আমার চেয়ে বেশী।' শ্রীরামকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে মহিলাটি নহবতে গেলেন। শ্রীমা তখন পূজায় বসেছেন। মহিলাটি শ্রীমাকে তাঁর করুণ কাহিনী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পরামর্শের কথা বললেন। সব শুনে শ্রীমা বুঝলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মজা করছেন। তিনি সরল-ভাবে মহিলাটিকে বললেনঃ 'আমি তো কিছু জানি না বাছা, তিনিই ওষুধ জানেন—তুমি তাঁরই কাছে যাও।' মহিলাটি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন কৌতুক জমেছে। তাই তাঁকে আবার নহবতে পাঠালেন। করুণাময়ী জননী সরল বিশ্বাসে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে মহিলাটিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতে বললেন। এইভাবে বারতিনেক যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে মহিলাটি ফিরে এলেন তখন শ্রীমা পূজার একটি বেলপাতা মহিলাটির হাতে দিয়ে স্নেহপূর্ণ-স্বরে বললেনঃ 'বাছা এইটি নিয়ে যাও। এতেই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।' মহিলাটি আশ্বস্ত হয়ে পরিপূর্ণ মন নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। অচিরেই শ্রীমায়ের আশীর্বাদ সফল হয়েছিল। মহিলাটির * বিপথগামী স্বামীর শুধু যে চরিত্র সংশোধিত হয়েছিল তাই নয়, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।[৪৮] লক্ষণীয় এই যে, এই ঘটনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের লোকজননী-সত্তার উন্মোচন করলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে যে মহাব্রত সাধনের জন্যে তিনি দৈবনির্দিষ্ট ছিলেন, কৌশলে তার অঙ্গীকার শ্রীমাকে দিয়ে তিনি করিয়ে নিলেন।[৪৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, যে-যুগপ্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁর আবির্ভাব তাতে তাঁর লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবীর ভূমিকা তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম নয়, হয়ত বেশীই। তিরোধানের আগে তাই তিনি বার বার সেবিষয়ে সারদাদেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্রীমায়ের গুরুশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও কর্মপরিণত করে তাঁর 'জীবোদ্ধার ব্রত'-রূপ অসমাপ্ত কার্যভার সারদাদেবীর উপর অর্পণ করার পটভূমি রচনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে তাঁর শেষ অসুখকে অবলম্বন করে। সেখানে তিনি যখন মহা-

প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেসময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে অনুযোগ করে বললেনঃ 'তুমি কি কিছু করবে না? [নিজেকে দেখিয়ে] এই সব করবে?' নারী-সুলভ দ্বিধা এবং লজ্জাবশত শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?' শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে বলে উঠলেনঃ 'না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।' আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে সারদাদেবীকে বললেনঃ 'দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল বিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' সারদাদেবী বললেনঃ 'আমি মেয়েমানুষ। তা কি করে হবে?' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবস্থায় নিজেকে দেখিয়ে বলে যেতে লাগলেনঃ 'এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।' আবার কখনও কখনও এই বলেও সজাগ করে দিতেনঃ 'শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।'[৫০] পরবর্তীকালে শ্রীমা বলেছেনঃ 'যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখা দিয়ে বললেন, "না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকি আছে।" শেষে দেখলুম, তাই তো অনেক কাজ বাকি।'[৫১]

শ্রীমায়ের জীবনের রহস্যটি শ্রীরামকৃষ্ণ অবগত ছিলেন। শ্রীমাকে তাঁর স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং নিজের অসমাপ্ত কাজের ভার তাঁর উপরে অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তাই বোধহয় শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রথম পর্বেই তাঁর লীলাসম্পূরণকর্ত্রীকে নিজ অন্তরের পূজা নিবেদন করে জগতের কাছে প্রতিষ্ঠিতা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ষোড়শীপূজার মধ্যে সেই প্রয়োজনই চরিতার্থতা লাভ করেছিল। এর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন বিশ্বমাতৃত্বের বেদীতে। শুধু প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনই নয়, স্বামীজীর ভাষায়, 'যাঁর আবির্ভাবে সমগ্র ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে',[৫২] সেই শক্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও আবশ্যক ছিল। তাই ষোড়শীপূজার সময় শ্রীমাকে দেবীর আসনে বসিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেনঃ 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!' এবং পূজাশেষে 'দেবীর কাছে নিজেকে নিবেদন করে নিজের সমস্ত সাধনার ফল, জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব তাঁর চরণে চিরকালের জন্যে সমর্পণ করেছিলেন।[৫৩] কোন্ দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা-দেবীকে দেখতেন ষোড়শীপূজাই সেসম্পর্কে শেষ কথা। জগতের সাধন-ইতিহাসে এটি একক ও অনন্য দৃষ্টান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করে শ্রীমা সম্পর্কে বলতেনঃ 'ছাইচাপা বেরাল।'[৫৪] বেরাল ছাইয়ের গাদার মধ্যে শুয়ে থাকলে যেমন তার গায়ের রং সঠিক কেউ বুঝতে পারে না, তেমনি সংসারে আর পাঁচজনের মধ্যে শ্রীমা এমনভাবে সাধারণ একজন হয়ে থাকতেন



শ্রীরামকৃষ্ণ

চিত্র-সম্পর্কিত তথ্য পরপৃষ্ঠায়

যে, তাঁর স্বরূপ সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। শুধু সাধারণের কাছে কেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছেও। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষোভের সঙ্গে গুরুভাইদের আমেরিকা থেকে লিখেছিলেনঃ 'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।'[৫৫] স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে?... ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল;...কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি!'[৫৬] শ্রীমায়ের সুদীর্ঘকালের 'দ্বারী' এবং 'ভারী' স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটি গান গেয়ে মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেনঃ

> তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ি অবাক্ হয়েছি।
> হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি।
> বিচিত্র ভবের মেলা ভাঙ্গ গড় দুটি বেলা
> ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি।
> এতকাল রইলাম কাছে বেড়াইলাম পাছে পাছে।
> চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি।[৫৭]

বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণ যদি শ্রীমা সম্পর্কে কিছু না বলে যেতেন তাহলে শ্রীমা জগতের কাছে হয়তো চিরকালের জন্যে অবগুণ্ঠিতাই রয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মুখে তারই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বলেছেনঃ 'কি সাধারণভাবে তিনি থাকতেন! আমরা তাঁকে কি বুঝব? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন।'[৫৮] তাই স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের 'মানসপুত্র' বলতেন, স্বামীজী যাঁকে আধ্যাত্মিকতায় নিজের থেকেও বড় বলেছেন, তিনি বলতেনঃ 'মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মতন থাকেন, অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতুম?'[৫৯]

'মাতা ঠাকুরানী' ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিতে

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ—আধ্যাত্মিক জগতের এই দুই বিরাট পুরুষের দিব্য আন্তর-জীবনের গভীরতায় এবং প্রসারিত ধ্যানদৃষ্টির স্বচ্ছতায় শ্রীমা কোন্ অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিতা ছিলেন, তা কি আমাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব? তবু শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর এই দুই প্রিয় সন্তানের সম্পর্ক-সংবাদ, শ্রীমায়ের প্রসঙ্গে তাঁদের নানা উক্তি ও আচরণ আমাদের মাতৃ-অনুধ্যানে পরম সহায়ক। রামকৃষ্ণ-সৌর-মণ্ডলের এই দুই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের বিকীর্ণ কিরণরেখাগুলি কিভাবে রামকৃষ্ণ-সংঘজননীর চরণ স্পর্শ করে ঊর্ধ্ব শিখায় আরতি করেছে, তার কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ ভিন্ন আর কিছু আমরা উপস্থিত করতে সমর্থ নই।

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-দেবের অন্তরঙ্গ গৃহী-পার্ষদ বলরাম বসুকে লিখছেনঃ 'গিরিশবাবুর সহিত মাতা-ঠাকুরাণীকে (কলিকাতায়) আনিবার জন্য আপনার কি মতান্তর হইয়াছে, গিরিশবাবু লিখিয়াছেন—সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। ...মাতাঠাকুরাণীর যে-প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম, তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি?'[১] পত্রটির উপসংহারে স্বামীজী মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখছেনঃ 'বলরামবাবু, মাতাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।' শ্রীমা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের যেসব উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কালগতভাবে এটিই প্রথম। স্বামীজীর অন্তরে শ্রীমায়ের স্থান সম্পর্কে পত্রটি উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ অকুণ্ঠিত চিত্তে বলেছিলেনঃ 'আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য ...তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং।'[২] শ্রীমাকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে এক অখণ্ড সত্তাই দুই দেহাধারে আপনাকে প্রকাশিত করেছেন। গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক

পত্রে স্বামীজী লিখছেনঃ 'মা-ঠাকুরাণীকে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্বাদে আমার সর্বতোমঙ্গল।'[৩] অর্থাৎ তিনি যেমন নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'জন্মজন্মান্তরের দাস' বলে মনে করতেন সেইরকম তিনি নিজেকে সারদাদেবীরও 'জন্মজন্মান্তরের দাস' বলে গণ্য করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' এই সাক্ষ্যই বহন করছে। সে কবিতার প্রথম স্তবকেই তিনি লিখেছেনঃ দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।[৪]

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ 'শাঁকচুন্নী যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে, তাহা পরম সুন্দর। কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাদোষ। দ্বিতীয় edition-এ শুদ্ধ করিতে বলিবে।'[৫]

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদেশানন্দ লিখেছেনঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-লেখককে স্বামীজী ব্যগ্রভাবে নির্দেশ দেন, পুঁথিতে ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের স্তব [অন্তর্ভুক্ত] করিবার জন্যঃ "সশক্তিক ছাড়া ভগবানের উপাসনা হয় না"। তাই পরে সংযুক্ত হইল, "জয় মাতা শ্যামাসুতা জগতজননী।/রামকৃষ্ণ-ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী।" * স্বামীজী স্বয়ংও স্বরচিত ঠাকুরের আরাত্রিকস্তবে মায়ের বীজমন্ত্র "হ্রীং" সংযুক্ত করিয়া দেন।'[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধির জন্য স্বামীজীকে দীর্ঘকাল বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল, কিন্তু শ্রীমায়ের মহিমা উপলব্ধির জন্য

তার কোন কিছুরই প্রয়োজন হয়নি। মায়ের মহিমা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা সংশয় স্বামীজীর কোনদিনও ছিল না। শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের দু-তিনজন ত্যাগী-ভক্ত ছাড়া অন্যান্য সকলের মতো নরেন্দ্রের নিকটও অন্তরালবর্তিনী ছিলেন। পরবর্তীকালেও শ্রীশ্রীমা যখন স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলতেন তখন সোজাসুজি কথা বলতেন না। মায়ের মুখে অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত কথাগুলি গোলাপ-মা বা অন্য কেউ স্পষ্ট করে স্বামীজীকে শুনিয়ে দিতেন। শুধু স্বামীজী নন, অন্যান্য ত্যাগী-সন্তানদের সঙ্গেও (দু-তিনজন ছাড়া) শ্রীমা ঐভাবেই কথা বলতেন।

স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর গিরিশ ঘোষ তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী লিখতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এত মহান ছিলেন, এত বড় ছিলেন যে, আমি তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁর জীবনের এক কণাও আমি জানতে পারিনি। শেষে শিব গড়তে গিয়ে কি বানর গড়ে ফেলব? আমি তা পারব না।'[৭] মায়ের জীবনী লেখার কাজে হাত দিতেও তিনি ভয় পেতেন। একটি চিঠিতে গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজী লিখছেনঃ 'সাণ্ডেল [বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল] আমাকে তিন পাতা লেকচার দিয়েছে যে, মা-ঠাকুরাণীকে ভক্তি করতে হবে এবং তিনি আমায় কত দয়া করেন। সাণ্ডেলের এই মহা আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ! তাঁর [শ্রীমায়ের বিষয়ে] একটা কিছু লিখবো মনে করি; কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে যাই। যাক্, তাঁর ইচ্ছা হয় তো কালে কালে হবে।'[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাকে স্বামীজী যে অভেদজ্ঞান করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর শ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করবার ব্যাকুল সংকল্পে। ঘটনাটি এইঃ স্বামীজীর মনে আমেরিকা যাওয়ার সঙ্কল্প প্রায় স্থির হয়ে গেলেও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হবার জন্য তিনি ভাবলেনঃ 'আচ্ছা, শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরের অংশস্বরূপিণী ; তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয় না? তিনি যেরূপ বলবেন, সেরূপই করব।' স্বামীজী তার পর শ্রীমায়ের নির্দেশ চেয়ে যে পত্র লিখলেন তাতে শ্রীমা স্বামীজীকে আশীর্বাদ করে পাশ্চাত্যদেশে গমনের অনুমতি দিলেন। এটি পেয়ে স্বামীজীর সকল দ্বিধার অবসান হল, তিনি বললেনঃ 'আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হ'ল ; মারও ইচ্ছা আমি যাই।'[৯] শ্রীমায়ের আশীর্বাদকেই স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্যদেশে ঐতিহাসিক সাফল্যের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করতেন। পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পর একদিন তিনি শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ 'মা, আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি।'[১০] আবার স্বামী সারদেশানন্দ বলছেন, তিনি ছোটমামীর (মায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ) মুখে

শুনেছেন যে, বিশ্বজয় করে ফেরবার পর স্বামীজী যেদিন প্রথম[১১] শ্রীশ্রীমায়ের চরণ-বন্দনা করলেন, সেদিন, ছোটমামীর ভাষায়ঃ 'রাজার মতো চেহারা, ঠাকুরঝির পায়ে লম্বা হয়ে প'ড়লো ; জোড়হাতে বলল—"মা, সাহেবের ছেলেকে ঘোড়া করেছি, তোমার কৃপায়"!'[১২]

এই দর্শনের আর একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাই কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতি-কথায়। তিনি লিখেছেনঃ 'মা তাঁর ঘরের দরজায় সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে নীরবে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। স্বামীজী তাঁর সামনে এসেই সোজা মাটিতে শুয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।...কিন্তু সাধারণ রীতি অনুযায়ী তাঁর পাদস্পর্শ করলেন না। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত আমরা যারা স্বামীজীর পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের কোমল কণ্ঠে বললেন, "যাও, মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। কিন্তু কেউ তাঁর চরণ স্পর্শ কোরো না। তাঁর এতই করুণা, এতই কোমল তাঁর প্রকৃতি, এতই তিনি স্নেহময়ী যে যখন কেউ তাঁর পাদস্পর্শ করে তিনি তাঁর সর্বগ্রাসী করুণা, সীমাহীন ভালবাসা এবং সম-বেদনা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তার যাবতীয় দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নেন। তার ফলে তাঁকে নীরবে অপরের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হয়। ধীরে ধীরে একে একে তাঁর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও। মুখে কেউ কিছু না বলে তোমাদের অন্তরের অন্ত-স্তল থেকে নীরবে তাঁর কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর ও তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা কর। তিনি সর্বদাই অতিলৌকিক স্তরে অবস্থান করেন এবং সকলের মনের কথা জানেন—তিনি অন্তর্যামিনী"।

'আমাদের সকলের প্রণাম শেষ হলে গোলাপ-মা নীরবতা ভঙ্গ করে স্বামীজীকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন, "মা জানতে চাইছেন, দার্জিলিঙে তোমার শরীর কেমন ছিল? বিশেষ উপকার হয়েছে কি?"

'স্বামীজী—"হ্যাঁ, সেখানে অনেকটা ভাল ছিলাম।"...

'গোলাপ-মা—"মা বলছেন ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন। আর জগতের কল্যাণের জন্য তোমার আরও অনেক কাজ করতে হবে।"

'স্বামীজী—"আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই, অনুভব করি এবং উপলব্ধি করি যে, আমি ঠাকুরের যন্ত্র মাত্র। যেভাবে যেসব অসাধারণ বিরাট সব ব্যাপার ঘটছে আর যেভাবে ওদেশের মেয়ে-পুরুষ ঠাকুরের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে এবং ঠাকুরের বাণী প্রচার করতে আমাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করার আগ্রহ দেখিয়েছে, তাতে আমি নিজেই কখনও কখনও অবাক হয়ে যাই। আমি মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলাম ; সেখানে আমার বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের মনে যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিলাম এবং তাদের কাছে যে অভাবনীয় সম্মান লাভ করেছিলাম তাতে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝেছিলাম যে, মায়ের আশীর্বাদের শক্তিতেই ঐ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।"' [১৩]

এই কথাই স্বামীজী এক পত্রে স্বামী শিবানন্দকে লিখেছিলেনঃ 'তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ করে পগার পার, এই বুঝ।' [১৪] উল্লেখিত পত্রে কয়েক ছত্র পরেই স্বামীজী 'হুপ' শব্দটি আরও একবার ব্যবহার করেছেন। এই 'হুপ' শব্দটির ব্যবহার, শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর সাগরপারে যাত্রা করার কথা, আবার কয়েক ছত্র পরে 'কো রামঃ?' লেখা এবং অন্য এক সময়ে (পৃঃ ১৬) শ্রীমাকে স্বামীজীর 'মা, আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি' বলা থেকে মনে হয় যেন স্বামীজী এখানে মহাবীর হনুমানের মধ্যে নিজের, শ্রীমায়ের মধ্যে সীতার এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে রামচন্দ্রের প্রতিরূপ দেখেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর তিরোভাবের আগে স্পষ্টই অঙ্গীকার করেছিলেন তিনিই ত্রেতাযুগে রামচন্দ্ররূপে এবং দ্বাপরযুগে কৃষ্ণরূপে এসেছিলেন।' একথা সর্বজনবিদিত। তাছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামীজীর যে বিখ্যাত স্তোত্র আছে ("আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ...') সেখানেও স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন।

স্বামীজী শ্রীমায়ের সম্পর্কে বলতেন, 'জ্যান্ত দুর্গা'। স্বামী শিবানন্দকে লেখা পূর্বে উদ্ধৃত চিঠিতে স্বামীজী লিখছেনঃ 'বাবুরামের [স্বামী প্রেমানন্দের] মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন, দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যে দিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে—। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি ; তোমরা যোগাড় ক'রে এই আমার দুর্গোৎসবটি ক'রে দাও দেখি। গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য।' [১৩]

সাধারণত শ্রীমায়ের কথা মনে হলে, তাঁর ছবি দেখলে বিশাল শান্ত আকাশের কথা মনে পড়ে। অবশ্য এই শান্ত আকাশের আড়ালে যে ভয়ংকর বজ্র লুকানো আছে তার বহিঃপ্রকাশ কদাচিৎ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে সাবধান করে দিয়েছিলেন—ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা সারদাদেবীর যদি কখনও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তাহলে এক মহা অনর্থ সৃষ্টি হবে, যা প্রতিরোধ করা স্বয়ং বিধাতারও সাধ্যাতীত। শ্রীমায়ের সেই স্বরূপ স্মরণ করেই যে স্বামীজী মায়ের সম্পর্কে বলেছেন 'জ্যান্ত দুর্গা' তা অনুমান করতে পারি। জনৈক ভক্তের স্মৃতিকথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ভক্তটি বলেছেনঃ 'স্বামীজী যখন আমেরিকা হইতে দেশে আসিলেন, পড়াশুনা ছাড়িয়া তিন বৎসর তাঁহার পিছনে ঘুরিলাম এবং দীক্ষা, সন্ন্যাস ইত্যাদি যাহা কিছু ধর্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজন, দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম! অবশেষে স্বামীজী সম্মত হইলেন, তিনচারি জনকে দীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মঠের ঠাকুরঘরে যাইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। একে একে অন্য সকলের দীক্ষা হইয়া গেল ; শেষে আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, ঠাকুর বললেন, আমি তোর গুরু নই ; ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন, যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও বড়, তোর হতাশ হবার কারণ নেই, সময়ে সব হবে। একথা শুনিয়া মর্মাহত হইলাম ; ভাবিলাম, স্বামীজী হইতে আবার বড় কে? অনুপযুক্ত বলিয়া অনুগ্রহ না করিয়া ফাঁকি দিয়া বিদায় করিলেন!

'ইহার কিছুকাল পরে রাত্রে স্বপ্ন দেখি,—আমি ঠাকুরের কোলে বসিয়া আছি ; এক উজ্জ্বল দেবীমূর্তি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, একটি মন্ত্র নাও। আমি বলিলাম, এখন ঠাকুরের কোলে বসে আছি, মন্ত্রতন্ত্রের কোনদিনই ধার ধারি না। তথাপি তিনি মন্ত্র নিতে জেদ করায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? "আমি সরস্বতী"—বলিয়াই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, এতে কি হবে? উত্তর দিলেন, কবি হতে পারবি। কবির দলের উপর আমার কোনদিনই ভাল ধারণা ছিল না। সেই কবির দলের সর্দার হইতে হইবে মনে করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলাম, আমি কবি হতে চাই না। দেবীমূর্তি কহিলেন, কবি মানে জানিস? কবি মানে জ্ঞানী। এই কথা বলিয়া, জপ করিবার প্রণালী পর্যন্ত দেখাইয়া দিয়া, অন্ততঃ ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ করিলেন।

'অল্পদিন পরে মঠে স্বামীজীকে দর্শন করিতে যাই। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, —ঠাকুর বলতেন, দেবস্বপ্ন সত্য। একে স্বপ্নসিদ্ধি বলে। এইটি জপ করলেই তোর সব হয়ে যাবে, আর কিছু করতে হবে না। আমি বলিলাম, আমি স্বপ্ন কোনদিনই বিশ্বাস করি না ; সে অমূলক চিন্তামাত্র। যদি কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয়, আপনি দিন। "এসব বুঝি 'বোধোদয়' বইয়ে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' পড়ে তোর ধারণা হয়েছে? তা নয়। ধারণা করে রাখ, বাস্তবিক এটি সত্য। ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক্, পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখিতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।" "আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।" "সময়ে বুঝতে পারবি। যখন দেখতে পাবি, দেখবি উপরে মহা শান্ত-ভাব কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি ; সরস্বতী অতি শান্ত কিনা"।'[১৩] পরবর্তীকালে

ভক্তটি শ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষার সময় তিনি দেখেন, স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্তি ও মায়ের মূর্তি অভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্তানেরা সম্ভবত শ্রীমায়ের ঐশী স্বরূপ সম্পর্কে প্রথমে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। তাই স্বামীজী স্বামী শিবানন্দকে লিখেছিলেনঃ 'মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।'[১৭] পরবর্তী-কালে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ত্যাগী-পার্ষদগণের শ্রীমা সম্পর্কে দৃষ্টির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, তাঁদের সকলেরই কাছে শ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়েছিল; তাঁরা বুঝেছিলেন পরমা প্রকৃতিই শ্রীমায়ের মধ্যে মানবীরূপ গ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের এই দৃষ্টি উন্মোচন করে দিয়েছিলেন স্বামীজী।

স্বামী শিবানন্দকে পূর্বোক্ত পত্রে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও। নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে, কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়।'[১৮] শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি 'ভগবানের বাবা'[১৯] বলে অভিহিত করতেন, যাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেনঃ 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়?'[২০] সেই শ্রীরামকৃষ্ণেরও উপরে তিনি শ্রীমাকে স্থান দিতেন—সেই তথ্যটিই স্বামী শিবানন্দকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত তাঁর উক্তিটিতে সুপরিস্ফুট। শ্রীমায়ের সম্পর্কে তাঁর বিশেষ 'পক্ষপাতিত্ব'কে স্বামীজী গোপন করতে পারতেন না। বরং বলা যেতে পারে, তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারলেই যেন তিনি পরম উল্লসিত হতেন, গভীর তৃপ্তি পেতেন। তাই স্পষ্টতরভাবে স্বামী শিবানন্দকে লিখেছিলেনঃ 'দাদা, রাগ ক'রো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ...ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। ...দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার ক'রে লড়াই ক'রে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে'। ...দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, "কো রামঃ?" দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওই খানটায় আমার গোঁড়ামি।'[২১]

শ্রীমায়ের সম্পর্কে স্বামীজীর এই 'গোঁড়ামি'র কারণ কি? শুধু আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে শ্রীমায়ের আশীর্বাদলাভ এবং আমেরিকায় স্বামীজীর অসাধারণ সাফল্যের পিছনে শ্রীমায়ের আশীর্বাদের প্রভাব উপলব্ধিই স্বামীজীর ঐ মনোভাবের সৃষ্টি করেনি। তাঁদের সকলের জীবনে তথা রামকৃষ্ণসঙ্ঘের জীবনে এক বিরাট

সংকটমুহূর্তে স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভ্রাতারা শ্রীমায়ের কাছে যে প্রাণপ্রদ অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং সহানুভূতি লাভ করেছিলেন তা স্বামীজীর হৃদয়ে সবচেয়ে কোমল স্থানটিকে স্পর্শ করেছিল। সেই মর্মস্পর্শী কাহিনীর উল্লেখ করে স্বামীজী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা সেক্সপীয়ার ক্লাবে 'আমার জীবন ও ব্রত' (My Life and Mission) বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ '...একদিন আমাদের গুরুদেবের দেহান্তের দুঃখময় দিন এসে উপস্থিত হল। ...আমাদের বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না। কয়েকটি "অদ্ভুত" ধারণা পোষণকারী অর্বাচীন তরুণের কথা কেই বা শুনবে? অন্তত ভারতবর্ষের তরুণদের কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। মাত্র দ্বাদশজন বালক লোকের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলছে, বলছে যে, তারা সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করতে দৃঢ়সংকল্প। সেকথা শুনে সকলেই উপহাস করত। উপহাস ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করল। আমাদের ওপর রীতিমত অত্যাচার শুরু হল। ...তার-পর উপস্থিত হল আমাদের সকলের জীবনের এক চরম দুঃসময়; কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে আমার জীবনে যেন তা নিদারুণ দুর্ভাগ্যের রূপ নিল। একদিকে আমার মা ভাইয়েরা। আমাদের পিতার সদ্যপ্রয়াণের ফলে আমাদের পরিবারকে তখন চরম দারিদ্র এসে গ্রাস করেছে। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের অনাহারে থাকতে হত। পরিবারে একমাত্র আমিই ছিলাম আশাভরসা—একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমার দুপাশে তখন দুটি জগৎ। একদিকে আমাকে দেখতে হচ্ছিল যে, আমার মা এবং ভাইয়েরা অনাহারে মরণাপন্ন; আর অপরদিকে আমি বিশ্বাস করতাম যে, আমার গুরুদেবের আদর্শ ভারত এবং সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণকর এবং তার প্রচার এবং বাস্তব রূপায়ণ করতেই হবে। সুতরাং আমার মনের মধ্যে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই সংগ্রাম চলতে থাকল।...সে কী হৃদয়-যন্ত্রণা; সেই যন্ত্রণার তীব্রতা ছিল অসহনীয়।... সেদিন আমাকে সহানুভূতি দেখানোর কেউ ছিল না।...শুধু একজন ছাড়া। কেবল সেই একজনের সহানুভূতিই আশীর্বাদ ও আশা বহন করে আনল। তিনি একজন নারী।...আমাদের গুরুদেবের সহধর্মিণী। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসহায়। আমাদের চেয়েও তিনি ছিলেন দরিদ্র।'[৪২]

বাস্তবিক, শ্রীমায়ের সহানুভূতি এবং আশীর্বাদ যদি সেসময় না আসত তাহলে কয়েকটি নির্বান্ধব, নিঃসহায় তরুণের পক্ষে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সূত্রপাত করা কখনই সম্ভব ছিল না। অর্থ তাঁর ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁর হৃদয়-উজাড়-করা ভালবাসা এবং প্রেরণার এমনই শক্তি ছিল, তাঁর সহানুভূতি ছিল এমনই প্রাণপ্রদ যে, পৃথিবীর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে কয়েকটি অল্পবয়স্ক তরুণ এক মহা 'সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিল'। যার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই জন্মলাভ করেছিল এক অভিনব আন্দোলন, সমগ্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের জন্যে একটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে যা ছিল দৈব-নির্দিষ্ট—যার নায়ক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীমায়ের সঙ্গে স্বামীজীর পূর্ব-উল্লেখিত সাক্ষাতের সময় গোলাপ-মা অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত শ্রীমায়ের নিম্নোক্ত কথা-গুলি স্বামীজীকে শুনিয়ে বলেছিলেনঃ 'ঠাকুর তোমার মাধ্যমে এইসব মহৎ ও বৃহৎ কাজগুলি করাচ্ছেন। তুমি তাঁর চিহ্নিত শিষ্য ও সন্তান।' স্বামীজী সেকথা শুনে গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেনঃ 'মা, আমি তাঁরই বাণী প্রচার করতে চাই এবং সেজন্যে যত সত্বর সম্ভব একটি স্থায়ী সঙ্ঘ স্থাপন করতে চাই। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে এইজন্যে, যত দ্রুত আমি করতে চাই তা পেরে উঠছি না।' শ্রীমা তখন নিজেই স্নেহকোমল কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বললেনঃ 'তার জন্যে তুমি কোন ভাবনা করো না। তুমি যা করেছ আর যা করবে তা চিরকাল টিকে থাকবে। এই কাজের জন্যেই তোমার জন্ম। জগতের মানুষ তোমাকে লোকগুরু হিসাবে মানবে। তুমি নিশ্চিত জেনো, ঠাকুর তোমার আকাঙ্ক্ষা অচিরেই পূর্ণ করবেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে পাবে তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।' সেকথা শুনে স্বামীজী ভক্তি-বিনত কণ্ঠে শ্রীমাকে বললেনঃ 'আশীর্বাদ করুন মা, তাই যেন হয়—আমার পরিকল্পনা যেন সত্বর ফলপ্রসূ হয়।'[২৩]

শ্রীমায়ের আশীর্বাদ সত্য হয়েছিল। শ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের মাসাধিককাল পরেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে 'রামকৃষ্ণ মিশন' তথা রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এই সঙ্ঘের জন্য শ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।[২৪] শ্রীমায়ের প্রেরণা ও আশীর্বাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর প্রার্থনার ফলশ্রুতি রামকৃষ্ণসঙ্ঘ। বাস্তবিক, শ্রীমা স্থূলদেহে না থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-পার্ষদগণ কে কোথায় যে ছড়িয়ে পড়তেন কে জানে! তাঁর পরোক্ষ প্রভাবে এবং তাঁর স্নেহের আকর্ষণে কালক্রমে সঙ্ঘের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। স্বামীজী তাই তাঁকে 'সঙ্ঘজননী'রূপে গুরুভাইদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। স্বামীজী জানতেন যে, ভবিষ্যতে সঙ্ঘকে শ্রীমাই তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও স্নেহের শক্তিতে লালন ও পুষ্ট করবেন। অর্থাৎ তিনি শুধু সঙ্ঘজননীই নন, সঙ্ঘের ধাত্রীজননীও। বলরামমন্দিরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা উপলক্ষে স্বামীজী যে সভা আহ্বান করেছিলেন তাতে ত্যাগী গুরুভাই ও গৃহী-ভক্তদের সম্বোধন করে 'প্রথমেই' আবেগময় কণ্ঠে কিন্তু স্পষ্টভাষায় স্বামীজী বললেনঃ 'মঠ ও মিশনের জন্য কিছু টাকা সংগৃহীত হয়েছে, আমাদের শ্রীশ্রীমা দেশে আছেন, তাঁর

মাসিক হাতখরচা বাবদ স্থায়ী তহবিলের সুদ থেকে সর্বাগ্রে কিছু দেওয়া উচিত মনে করি. এ-বিষয়ে আপনাদের কি মত? ঐ প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করলেন। তখন স্বামীজী বলছেন, তা হলে মাসে কত ধার্য করা যেতে পারে। উত্তরে অনেকে অনেক রকম বলছেন—তিনি পাড়াগাঁয়ে থাকেন, ব্রাহ্মণের বিধবা, যা কিছু সামান্য ৫।৭ টাকা দিলেই হবে ইত্যাদি। এইরূপে তাঁদের মধ্যে আলোচিত হয়ে মাসিক মাত্র দশ টাকা পর্যন্ত ধার্য করার সম্মতি মিলল। তখন স্বামীজী একটু বিমর্ষভাবে বলতে লাগলেন: সে কি ভাই. আমাদের সন্ন্যাস-জীবন, সন্ন্যাসীর তো "করতলভিক্ষা তরুতলবাস", এই হল আমাদের জীবন। আর "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সব কিছু ত্যাগ করে তপস্যাই আমাদের ব্রত, এই হল আমাদের আদর্শ। আমরা সন্ন্যাসী হয়েছি, বেটা ছেলে. প্রয়োজনমত ভিক্ষে করে মঠ চালাতে পারব, শ্রীশ্রীমাকে হাতখরচা বাবদ মাসিক ২৫ টাকার কম দিতে পারব না। শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে কর? তিনি শুধু তা নয় ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘ-জননী।'[২৫] বাস্তবিক, রামকৃষ্ণসঙ্ঘের পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, শুধু স্বামীজীর জীবৎকালেই নয়, তাঁর তিরোধানের পরেও যতদিন শ্রীমা মরদেহে ছিলেন ততদিন সঙ্ঘকে বহু দুর্যোগ এবং সঙ্কটলগ্নে তিনি আক্ষরিক অর্থেই রক্ষা করেছেন, পালন করেছেন। শুধু তাই নয়, আদর্শ ও পন্থা নিয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে সঙ্ঘভুক্ত ত্যাগী-সন্তানগণ তাঁরই মুখাপেক্ষী হয়েছেন এবং তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন।[২৬]

স্বামীজীকে দেখি, যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে শ্রীমায়ের উপদেশ এবং অভিমত প্রার্থনা করতেন এবং শ্রীমায়ের নির্দেশ এবং ইচ্ছাই স্বামীজী সব সময় শিরোধার্য করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর কোন দ্বিধা, সন্দেহ বা সংশয় ছিল না—কোন প্রশ্ন কোনদিন স্বামীজীর মনে ওঠেনি। (স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাইরাও এব্যাপারে সর্বদাই স্বামীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।) এসম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ বলেছেন: 'মঠে প্রথম প্রথম কার্যধারা নিয়ে অনেক সময় মতের পার্থক্য হলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন। ...শ্রীশ্রীমা যে-কোন সমস্যার সমাধান তৎক্ষণাৎ করে দিতেন—তাঁর যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা সকলেই দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করত। স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছা করলে অনেকের অমত হয়, তখন ঐ বিষয়ে স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "হ্যাঁ বাবা, মঠে দুর্গাপুজো করে শক্তির আরাধনা করবে বইকি। শক্তির আরাধনা না করলে জগতে কোন কাজ কি সিদ্ধ হয়? তবে বাবা, বলি দিও না, প্রাণী হত্যা কোরো না। তোমরা হলে

সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।" স্বামীজীর কিন্তু ইচ্ছে ছিল, নবমী-পূজার দিন দেবীর নিকট বলিদান হয়, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে তিনি সে-সংকল্প ত্যাগ করলেন এবং চিরতরে আমাদের সব কেন্দ্রে পশুবলির সংকল্প রহিত হল।'[২৭] এই আদেশ যদি ঠাকুর দিতেন তবে স্বামীজী হয়তো প্রশ্ন তুলতেন, শাস্ত্রবিচার করে বলিদানের সপক্ষে নানা যুক্তি দেখাতেন। কিন্তু শ্রীমায়ের আদেশ তাঁর কাছে ছিল সমস্ত যুক্তি-তর্ক-বিচারের অতীত। মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় স্বামীজীর নির্দেশে শ্রীমায়ের নামেই সংকল্প করা হয়[২৮] এবং শ্রীমায়ের হাত দিয়ে পূজককে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ান স্বামীজী। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের আনুষ্ঠানিক বৈদিক পূজাদিতে অধিকার না থাকায় তদবধি মঠের সমস্ত পূজা-অনুষ্ঠানাদিতে শ্রীশ্রীমায়ের নামেই সংকল্প করতে স্বামীজী নির্দেশ দেন।[২৯]

স্বামী সারদানন্দ আরও বলেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমা স্বামীজীর কাজের উদ্দাম আবেগ যেন অনেক সময় রাশ টেনে ধরে নিয়ন্ত্রিত করতেন। কলকাতায় প্লেগ-মহামারীর সময় স্বামীজী নিবেদিতা প্রভৃতিকে নিয়ে সেবাকার্য আরম্ভ করলেন, কিন্তু কার্যের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়তে থাকায় এবং সে পরিমাণ অর্থের সংস্থান না থাকায় স্বামীজী বিচলিত হয়ে পড়লেন, শেষ পর্যন্ত তিনি সেবাকাজ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বেলুড় মঠ বিক্রি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই কথা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে উত্থাপন করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "সে কি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সংকল্প করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ, তোমার ও-সব বিক্রি করবার অধি-কারই বা কোথায়? ...বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এইভাবে চলবে।" তখন স্বামীজী একটু সলজ্জভাবে বললেন, "তাইতো, আবেগভরে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম, সত্যি তো মঠ বিক্রি আমি করতে পারি না, সে অধিকার আমার নেই। রাজাকে [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] মঠের অধ্যক্ষ এবং শরতকে [স্বামী সারদানন্দ] সেক্রেটারি করা হয়েছে। এদেরই সব অধিকার। আমার অধিকার কোথায়? সেকথা যে আমার খেয়ালই ছিল না!"'[৩০]

সংঘজননীর যে-কোন আদেশ, যে-কোন ইচ্ছা স্বামীজীর কাছে ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে শেষ কথা। এ সম্পর্কে একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমা তখন ১০/২ নম্বর বোস পাড়া লেনের বাড়িতে থাকেন। চুরি করার অপরাধে মঠের এক উড়িয়া চাকরকে স্বামীজী তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। চাকরটি শ্রীমায়ের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। শ্রীমা তাকে সেখানে থাকতে বললেন এবং স্নানাহার করালেন। সেইদিন বিকেলে স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীমাকে প্রণাম করতে শ্রীমায়ের বাড়িতে আসেন। শ্রীমা তখন তাঁকে বললেনঃ 'দেখ, বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারে বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে

যাও।' স্বামী প্রেমানন্দ সভয়ে শ্রীমাকে বললেন যে, লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে স্বামীজী রুষ্ট হবেন। শ্রীমা তখন দৃঢ় কণ্ঠে বললেনঃ 'আমি বলছি, নিয়ে যাও।' সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোকটিকে নিয়ে প্রেমানন্দজী মঠে ভয়ে ভয়ে ঢোকামাত্র স্বামীজী বললেনঃ 'বাবুরামের কান্ড দেখ—ওটাকে আবার নিয়ে এসেছে!' সম্পূর্ণ ঘটনাটি এবং ঐ ব্যাপারে শ্রীমায়ের আদেশের কথা জানানো মাত্র বাবুরাম মহারাজের উপর রাগ করা তো দূরের কথা, স্বামীজী সানন্দে সে আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। স্বামী প্রেমানন্দকে অথবা চাকরটিকে আর একটি কথাও বললেন না স্বামীজী।[৩১]

সমাজের কল্যাণের জন্যে নারীর ভূমিকাকে পুরুষের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন স্বামীজী। তিনি মনে করতেন, নারীশক্তির সার্থক উদ্বোধনের উপরই সমাজ, দেশ এবং জাতির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে নারীশক্তি অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। ভারতের দুরবস্থার সেটি অন্যতম প্রধান কারণ। স্বামীজী বলেছেনঃ 'আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী ভারতে জন্মাবে।'[৩২] স্বামীজী তাই চেয়েছিলেন শ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের নারীদের জন্যে একটি মঠ স্থাপন করতে। স্বামীজী বরং মনে করতেন ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের চেয়েও বেশী প্রয়োজন সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘের। তিনি স্বামী শিবানন্দকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে লিখেছিলেনঃ 'তাঁর [শ্রীমায়ের] মঠ **প্রথমে** * চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে!...আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এইকথা বুঝতে পারো কি?'[৩৩] ভারতে ফিরে এসেও এই চিন্তা স্বামীজীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে স্বামী যোগানন্দের কথাবার্তা থেকে সেকথা জানা যায়। ঐ প্রসঙ্গে স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে গভীর আবেগভরে বলেছিলেনঃ 'আমাদের মা আধ্যাত্মিক শক্তির একটি বিশাল আধার, যদিও বাইরে গভীর সমুদ্রের মতো প্রশান্ত। তাঁর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে। যে আদর্শসমূহ তিনি তাঁর জীবনচর্যায় রূপায়িত করেছেন এবং অপরকে আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন তা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নারীর বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টাকেই অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত করবে না, সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতিকে তা প্রভাবিত করে তাদের হৃদয় ও মানস-লোকে অনুপ্রবিষ্ট হবে।'[৩৪] স্বামীজীর শারীরিক অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল

না এবং চিকিৎসকগণ তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন ; কিন্তু ঐ চিন্তা স্বামীজীকে এমনভাবে আবিষ্ট করে রেখেছিল যে তা বাস্তবায়িত করার পথে যে-কোন প্রতিবন্ধকের, তা যতই দুরূহ হোক না কেন, তিনি সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু স্বামী যোগানন্দের একটি ছোট্ট যুক্তিতে স্বামীজী শ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্ত্রীমঠ স্থাপনের পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করেন। এখানে স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই প্রসঙ্গে আলোচনা স্মরণ করা যেতে পারে।

গিরিশচন্দ্রঃ স্বামীজীর পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ অভিনব এবং আমাদের সমাজসংস্কার ও নারী-উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সাহসিক ভাবনা। স্বামীজীর সঙ্কল্প অবশ্যই বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং এই প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই। কিন্তু এটি অত্যন্ত আয়াসসাধ্য, স্বামীজীর স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় এ-ধরনের একটি দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ তাঁর পক্ষে নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। অবশ্য তাঁর নির্দেশ সবসময়ই আমরা নিঃসংশয়ে পালন করব। কিন্তু তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন এবং চিকিৎসকগণও তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছেন।

স্বামী যোগানন্দঃ যে পরিকল্পনা রূপায়ণে সমাজের সমৃদ্ধি এবং মানুষের কল্যাণ হবে বলে স্বামীজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন তা সম্পাদন করার পথে তাঁর দৈহিক অসুস্থতা এবং অন্য যে-কোন অন্তরায় তাঁকে কোনভাবেই সঙ্কল্প-চ্যুত করতে পারবে না। এই অসুস্থ শরীরেও তাঁর মনে এছাড়া আর অন্য কোন চিন্তার স্থান নেই। আমরা তাঁর শরীর নিয়ে কোন উদ্বেগ প্রকাশ করলে তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। শেষে স্ত্রীমঠ আরম্ভের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁকে বললামঃ 'সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যা তুমি ভাল মনে কর তা নিশ্চয়ই করবে ; কিন্তু তোমার কাছে অনুরোধ, মাকে লোকসমক্ষে নিয়ে এসো না। তোমার কি মনে নেই, ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সাধারণের কাছে প্রচার করলে তাঁর শরীর থাকবে না ? . ঠিক ঐ একই কথা মায়ের সম্পর্কেও খাটে।...তাই ভাই তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, মাকে তুমি এখন এসবের মধ্যে এনো না।' ...আমার কথা শেষ হতে না হতে স্বামীজী আমাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে সহাস্যে বললেনঃ 'মন্ত্রী, তুই আমাকে সত্যি একটি খুব মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিস। এবং ঠিক সময়েই এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিস। মাকে আমি এসবের মধ্যে আনব না। তাঁর যেমন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, তিনি সেভাবেই তাঁর মিশন চরিতার্থ করবেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়ার আমরা কে ? বরং তাঁর আশীর্বাদেই আমরা সবকিছু সম্পন্ন করতে পারি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি এবং অনুভব করেছি, তাঁর আশীর্বাদের শক্তি অসাধ্যসাধন করতে পারে।'[৩৫]

এই বিবরণটি শ্রীমাকে স্বামীজী কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার একটি সুস্পষ্ট আলেখ্য উন্মোচন করে দিয়েছে।

শ্রীমায়ের প্রতি স্বামীজীর সীমাহীন সম্ভ্রম কী অপরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করত সেসম্পর্কে স্বামী প্রেমানন্দ নীলকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজনকে পরবর্তীকালে বলেছিলেন, স্বামীজী যেদিন মাকে দর্শন করতে যেতেন, নিজেকে আগে থেকে প্রস্তুত করে নিতেন। একদিন ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন এবং বার বার ডুব দিতে লাগলেন, যেন পবিত্রতা আর আনতে পারছেন না। শেষে যদিও বা উঠলেন, সেবককে বলতে লাগলেনঃ 'ওরে আমার গায়ে গঙ্গাজলের ছিটে দে, গঙ্গাজলের ছিটে দে।' তারপর কোনরূপে মায়ের দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর চলতে পারলেন না ; ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ে গেলেন। মা তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে তুলে ধরলেন।[৩৬] আর একদিনের বর্ণনা এইরকমঃ স্বামীজী হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দের) সঙ্গে মঠ থেকে নৌকা করে মাকে দর্শন করতে যাচ্ছেন। তিনি বার বার গঙ্গার ঘোলা জল খাচ্ছেন দেখে হরি মহারাজ বলে উঠলেনঃ 'ঘোলা জল বার বার খাচ্ছ, শেষকালে কি সর্দি করে বসবে?' উত্তরে চিরনির্ভীক স্বামীজী বললেনঃ 'না ভাই, ভয় করে। আমাদের তো মন—মার কাছে যাচ্ছি, ভয় করে।'[৩৭] পূজার আসনে বসে সাধক যেমন অভীষ্ট দেবতাকে পূজা করার পূর্বে দেহ ও অন্তর শুদ্ধি করেন এও তাই। শ্রীমায়ের দর্শনে যাওয়ার অর্থ স্বামীজীর কাছে একটি সাধারণ ব্যাপার নয়, এ যেন তিনি পূজা করতে যাচ্ছেন মাকে। শ্রীমায়ের কাছে যাওয়া স্বামীজীর কাছে পবিত্রতম তীর্থ-পরিক্রমায় যাওয়ার সমতুল। তাই তাঁর দর্শন করতে যাওয়ার আগে নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করতেন তিনি।

মাতাপুত্রের অতি গভীর স্নেহ ও ভালবাসার আর এক ধরনের অনবদ্য. মর্মস্পর্শী একটি চিত্র বলরামবাবুর এক ভ্রাতুষ্পুত্রের স্মৃতিচারণ উদ্ধার করে উপহার দিয়েছেন স্বামী নির্লেপানন্দঃ 'স্বামীজীর শেষদিকের অসুখ। বেলুড়ে তাঁকে দেখতে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে নৌকো করে আমরা সবাই যাচ্ছি। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা অনেকে আছেন, এক নৌকো লোক। যোগীন-মা, [খুব সম্ভব] গোলাপ-মাও রয়েছেন। ওপরে দোতলায় স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমার কথাবার্তা হল। তারপর স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে এগিয়ে দিতে নীচে নেমে এলেন, সামনের ঘাট পর্যন্ত। আমাদের নৌকাখানা ভাঁটায় পলিমাটি ও বালিতে ঠেকে গিয়েছিল। স্বামীজীর গায়ে গেঞ্জি। আমি তখন ছোট ছেলে। সব খবর জানি না, বুঝি না। আমার তো তাঁকে বেশ মনে হল তিনি আমাদের [তখন ১২।১৩ বছরের বালক] একজনেরই মতো, বালকের মতোই মাল-কোঁচা এ'টে নিজেই শ্রীশ্রীমার নৌকা ঠেলে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে—আর সব মহারাজরা যোগ দিলেন। মাঝিরাও ভাবিত হয়েছিল—একনৌকাভরা লোক, কি করে ঠেলে জলে ভাসাবে—তাদের কাজটা স্বামীজীই আগু বাড়িয়ে করে দিলেন।

আরও মনে হচ্ছে, যেন স্বামীজী শেষমেশ—"জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়"—বা ওরূপ কিছু একটা ["জয় শ্রীমহামাঈ কী জয়"?] বলে নৌকাখানা ঠেলে দিলেন।'[৩৮]

আরও একটি ঘটনার বিবরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। শ্রীশ্রীমা, লক্ষ্মীদিদি, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, মাস্টারমশায় ('শ্রীম') প্রভৃতির সঙ্গে আঁটপুরে এসেছেন স্বামী প্রেমানন্দের পূর্বাশ্রমের বাড়িতে। স্বামীজী তখন সেখানেই ছিলেন। শ্রীমাকে দেখেই স্বামীজী ঠিক যেন একটি শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। স্বামীজীর সেই অনাবিল আনন্দ-প্রকাশের ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষদর্শী লক্ষ্মীদিদি এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'শ্রীমাকে পাইয়া স্বামীজীর খুবই আনন্দ। ইতিমধ্যে আমাদের মালপত্র আসিয়া পড়ে। তন্মধ্যে সকলের বিছানার মোটটি বেশ একটু বড় ছিল। উহা নামানো মাত্র স্বামীজী আনন্দভরে বালকের ন্যায় উহাকে ঘোড়া করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং হেট্ হেট্ করিয়া অঙ্গভঙ্গিসহ যেন দৌড়াইতে লাগিলেন। শ্রীমাও ছেলের আনন্দ দেখিয়া হাসিতেছেন ও আনন্দ করিতেছেন।'[৩৯]

শ্রীমা স্বামীজীর গান শুনতে ভালবাসতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি উত্তরাখণ্ডে পরিব্রজ্যায় যাত্রা করার আগে গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী শ্রীমায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁর কাছে যান। শ্রীমা তখন ঘুষুড়িতে এক ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। স্বামীজী সেসময় শ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ

প্রণিপাত করে তাঁর সন্তোষবিধানের জন্য ভক্তিমূলক গান গেয়ে শোনান। শ্রীমা স্বয়ং সে-সম্পর্কে বলেছেনঃ 'নরেনের কি পঞ্চমেই সুর ছিল! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ীর বাড়িতে। বলেছিল, "মা, যদি মানুষ হ'য়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।" আমি বললুম, "সে কি!" তখন বললে, "না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।"' অন্য একটি সূত্রে জানা যায় যে শ্রীমা স্বামীজীকে এই সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'বাবা, তোমার মাকে দেখে যাবে না?' স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'মা, আপনিই আমার একমাত্র মা!' 'একমাত্র মা' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর প্রতিষ্ঠার পর মিশনের সাপ্তাহিক সভা সাধারণত বলরাম মন্দিরে রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হত। বেশ কয়েকটি সভায় শ্রীমা স্বয়ং তাঁর সঙ্গিনী ও অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে শ্রীমা উপস্থিত থাকলে তাঁর আনন্দ-বিধানের জন্য স্বামীজী গানের পর গান গাইতেন।[৪০]

শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতি স্বামীজীর হৃদয়ে যে-আনন্দের হিল্লোল তুলত তার পরিচয় পাই নীচের এই ঘটনাটি থেকেওঃ

একবার শ্যামাপূজার দিনে শ্রীমা বেলুড় মঠে এসেছেন। এসে ঠাকুরঘরে গিয়ে 'আত্মারামে'র পূজোয় বসেছেন। পূজোয় বসে তাঁর দুই চোখ থেকে দর দর ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরতে থাকে। দুটি হাত কাঁপতে থাকে। বহুক্ষণ 'আত্মারাম'কে হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন। পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী আশুতোষ মিত্র দিয়েছেন এইভাবেঃ 'তাঁহার এই আত্মস্থ হইবার সংবাদ বৈদ্যুতিকগতিতে মঠবাসীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। ফলে সকলে আনন্দে অধীর হইয়া নিম্নে বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া খোল-করতাল-সহকারে গাহিতে ও নৃত্য করিতে থাকিলেন।...সকলে একত্রিত। একতানে প্রাণ মাতাইয়া এবং নিজেরাও মাতিয়া গাহিতেছেন—

> বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
> আয় সবাই মিলে, ডাকি "জয় মা" বলে।
> বাবা পাগল ভোলা, মা, পাগলী মেয়ে,
> কত রাঙ্গা মা ওরে দেখরে চেয়ে,
> ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
> মা পেয়েছিরে, আমরা মায়ের ছেলে।

স্বামীজী এতক্ষণ উপরে নিজ কক্ষে ছিলেন। নৃত্যগীত শুনিয়া আর থাকিতে না পারিয়া নীচে আসিয়া দলে ভিড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলের ভিতর অমানুষিক শক্তি জাগিয়া উঠিল, সকলে আত্মহারা হইয়া "বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে" ইত্যাদি আখর দিয়া গাহিতে লাগিলেন। স্বামীজী উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "গা, গা"। যাঁহারা নাচিতেছেন তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া নাচিতে উৎসাহ

দিলেন। এইবার নিজেই খোল লইয়া বাজাইতেছেন, আর গাহিতেছেন আর নাচিতেছেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য—ইহা যে দেখিয়াছে, সেই ধন্য!'[৬১]

একদিন স্বামীজী বোসপাড়া লেনের বাড়িতে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা তখন ওখানেই আছেন। এসম্পর্কে শ্রীমায়ের নিজের বর্ণনাঃ 'বোসপাড়ার বাড়ীতে আমরা আছি। শুনতে পাচ্ছি, নীচের তলায় নরেন এসে গোলাপকে বলছে, "গোলাপ-মা, আমার বড় খিদে পেয়েছে।" গোলাপ গোটাকতক মিছরির টুকরো নিয়ে নরেনের হাতে দিয়েছে। নরেন তো রেগেই খুন! আমি একটা থালায় করে খাবার পাঠিয়ে দিলুম। নরেন খায় আর বলে, "একেই বলি মা। ...পূজুরী বামুনের মেয়ে মা কেমন করে এমন হল আমি বুঝতে পারছি না"।'[৬২]

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজোর আগে স্বামীজী কাশ্মীর থেকে মঠে ফিরে আসেন। তখন তাঁর শরীর বেশ খারাপ। মহাষ্টমীর দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দের সঙ্গে স্বামীজী বাগবাজারে শ্রীমাকে দর্শন করতে আসেন। শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে উঠলে শ্রীমা স্বামীজীর মাথায় ডান হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীমায়ের আদরের সন্তান অভিমানভরে ও ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বললেনঃ 'মা, এই তো তোমার ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসতো যেতো বলে সে [ফকির] শাপ দিলে, "তিনদিনের ভেতর ওকে উদরাময়ে এখান ছেড়ে যেতে হবে"। আর কিনা তাই হল—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না! তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।' শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বই কি বাবা! তাঁরা তো আর ভাঙ্গতে আসেন না! আমাদের ঠাকুর হাঁচি, টিকটিকি পর্যন্ত মেনেছেন। শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই নিজের শরীরে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জান, খুড়তুতো দাদার (হলধারীর) অভিসম্পাতে ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে আসা একই কথা।' কিন্তু স্বামীজী তবুও অভিমানভরে বলতে থাকেন, শ্রীমা যতই বলুন না কেন, তিনি তাঁর যুক্তি মানতে রাজী নন। বরং বলতে থাকেন,

আসলে ঠাকুর কিছুই নন। শ্রীমা তখন সকৌতুকে উত্তর দিলেনঃ 'না মেনে থাকবার যো আছে কি, বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা!' এই কথা বলা মাত্র স্বামীজী সজলনয়নে শ্রীমায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে সেদিনকার মতো বিদায় নিলেন।[৪৩]

সত্যিই স্বামীজী শ্রীমায়ের পদতলে পরিপূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করেছিলেন—শিশু যেমন তার মায়ের কাছে করে। বিচার-বিতর্ক, যুক্তি-প্রশ্নের প্রসঙ্গ সেখানে ছিল অবান্তর। শ্রীমায়ের আর একটি উক্তি থেকে জানা যায় যে, একদা স্বামীজী বেদান্তবিচারের প্রাবল্যে শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।' সেকথা শুনে শ্রীমা সহাস্যে স্বামীজীকে বলেছিলেনঃ 'দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!' স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?'[৪৪] সাধারণ রীতি অনুসারে গুরু-পত্নীকেও গুরুরূপে গণ্য করা হয়। স্বামীজী কি সেই প্রচলিত রীতি অনুসারে শ্রীমাকে গুরু বলেছিলেন? না, তা নয়। বাস্তবিক, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা ছিলেন এক ও অভিন্ন। সত্যিই, নিবেদিতার ভাষায়, 'এ এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক'।[৪৫]

শ্রীমাকে স্বামীজী সাধারণ গুরুপত্নী হিসাবে দেখতেন না, শুধু সঙ্ঘজননী হিসাবেও নয়, তাঁকে দেখতেন বিশ্বজননীরূপেও।—এক বিরাট বিশ্বজোড়া মা। স্বামীজীর কাছে শ্রীমা এ সবই, আবার তার ঊর্ধ্বেও। বস্তুত, স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীমায়ের স্বরূপ কিভাবে ধরা পড়েছিল, তার সম্যক্ ধারণা বা বর্ণনা করা এককথায় অসম্ভব। অন্যের কথা কোন্ ছার, স্বয়ং স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যেও অন্তত কেউ কেউ যে প্রথমদিকে স্বামীজীর ধারণার অংশভাক্ হতে পারেননি তার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নিম্নোক্ত বর্ণনায়ঃ 'আমি মা ঠাকুরণের কাছে বেশী যেতাম না। স্বামীজী কি করে তা জানতে পারেন। শ্রীশ্রীমা তখন বলরাম মন্দিরে। সেখানে স্বামীজী একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"পেসন, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?" আমি বললাম—"না মশাই"। স্বামীজী—"সেকি? এক্ষুণ-ই যাও, মাকে প্রণাম করে এস।"

'তাই শুনে আমি তো মাকে প্রণাম করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি—কোন প্রকারে টিপ্ করে একটা প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বলছেন—"সে কি পেসন,—মাকে এই করে প্রণাম করতে হয়? সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর; মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।" বলেই তিনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। আমিও মাকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে চলে আসি। আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে, স্বামীজী আবার পেছনে পেছনে আসবেন।'[৪৬]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলতেনঃ 'শ্রীমাকে কিভাবে প্রণাম করতে হয় স্বামীজীই তা আমাকে শিখিয়েছিলেন। বুঝিয়েছিলেন মায়ের স্বরূপ কি তাও।'[৪৭] স্বামী শিবানন্দের পূর্বে উদ্ধৃত চিঠি থেকে জানা যায় যে, শুধু স্বামী বিজ্ঞানানন্দকেই নয়, অন্যান্য গুরুভাইকেও স্বামীজী শ্রীমাকে 'চিনিয়ে' দিয়েছিলেন। শ্রীমাকে যাতে তাঁর গুরু-ভাইরা শুধু গুরুপত্নী হিসেবে না দেখেন সে বিষয়ে স্বামীজী সদা-সচেতন ছিলেন—তা স্বামী শিবানন্দকে লেখা চিঠিতে এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীমায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তির সংবাদ পেয়ে স্বামীজীর উল্লাসের শেষ নেই, স্বামী নিরঞ্জনানন্দের মায়ের প্রতি গভীর ভক্তির জন্যে তাঁর যে-কোন ত্রুটি স্বামীজী উপেক্ষা করতে প্রস্তুত। আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা তাঁর চিঠিতে দেখা যায় যে, পুঁথিকার অক্ষয় কুমার সেনের—যাঁকে স্বামীজী আদর করে 'শাঁকচুন্নি' বলতেন—তাঁর মায়ের প্রতি ভক্তি অটুট আছে কি না তা জানার জন্য স্বামীজীর উদ্বেগের অন্ত নেই। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেনঃ 'বলি শাঁকচুন্নির কোনও কথাই তো তোমরা লেখ না! সে গেল কোথা? মাকে ভক্তি করছে তেমনি কি না?' [৪৮]

যখন বেলুড়মঠের নিজস্ব জমি কেনা হল তখন শ্রীমাকে স্বামীজী মঠের নতুন জমিতে নিয়ে গিয়ে নববস্ত্র পরিধান করিয়ে চেয়ারে বসান এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে অশ্রুপূর্ণলোচনে করজোড়ে বলতে থাকেনঃ 'মা, এতদিনে আজ আমার মাথায় যে বোঝা ছিল তা নেমে গেল—তোমাকে তোমার **নিজের জমিতে*** এনে। এখন তুমি হাঁফ ছেড়ে চারিদিকে বেড়াও, ঘুরেফিরে দেখ।'[৪৯] মঠের নিজস্ব জমি শ্রীমায়ের প্রার্থনার ফলশ্রুতি। বোধগয়ার মঠের ঐশ্বর্য ও সচ্ছলতা দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ত্যাগী-সন্তানদের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের অভাবের কথা স্মরণ করে শ্রীমায়ের মাতৃহৃদয় থেকে এক করুণ প্রার্থনা উৎসারিত হয়েছিল। শ্রীমা এসম্পর্কে স্বয়ং বলেছেনঃ 'বোধগয়ার মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, "ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত!" তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল।'[৫০] আবার অন্যত্র বলেছেনঃ 'আহা, এর (মঠের) জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি ...তার পর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।'[৫১] এসব থেকে বোঝা যায় কেন মঠের নতুন জমিতে শ্রীমাকে এনে স্বামীজী বলেছিলেন 'নিজের জমিতে'। অবশ্য বেলুড় মঠ শ্রীমায়ের আবাসস্থল না হলেও পূজা-পর্ব উপলক্ষে শুভাগমন করতেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী অদ্ভুতানন্দের

একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ 'মঠ হবার পরই স্বামীজী শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর পদধূলি এনে স্থাপন করে। তা আজও বেলুড় মঠে পুজো হয়। ...মা ঠাকরুণ যে কি, তা একমাত্র স্বামীজীই বুঝেছিল! তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী, তা আর কেহ বোঝে নি।'[৩২]

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কাশীপুরের বাগানবাড়িতে যাতে মা অন্তত কিছু-দিনও থাকতে পারেন স্বামীজী সে চেষ্টা করেছিলেন। মা নিজেই বলেছেনঃ 'তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] যাবার পর নরেন এরা বললে, "বাড়িটা তিন দিনও থাক্, আমরা ভিক্ষা ক'রে খাওয়াব মাকে—সদ্য সদ্য মায়ের মনে কষ্ট।" রামদত্ত-টত্ত এরা বললে "তোদের আর ভিক্ষে করে খাওয়াতে হবে না।" বাড়ী চুকিয়ে দিলে।'[৩৩] কাশীপুর থেকে বলরামবাবু শ্রীমাকে তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে কয়েক-দিন থাকার পর শ্রীমা বৃন্দাবনে বছরখানেক বাস করেন। এর ব্যয়ভার বলরামবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ বহন করেছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে শ্রীমা কামার-পুকুরে চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করছিলেন। রানী রাসমণির দৌহিত্র এবং মথুর-বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস শ্রীমাকে মাসিক সাত টাকা করে দিতেন। কিন্তু কয়েকমাস দেওয়ার পর শ্রীমায়ের বৃন্দাবনে বাসকালেই কালীবাড়ির দীনু খাজাঞ্চী ও অন্যান্যরা ঐ টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালেরও এই ব্যাপারে প্ররোচনা ছিল। স্বামীজী ঐ টাকা বন্ধ না করার জন্য খুব অনুরোধ করে-ছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। কামারপুকুরে শ্রীমায়ের কষ্টের কথা জানাজানি হওয়ার পর ভক্তসন্তানেরা মাঝে মাঝে শ্রীমাকে কলকাতায় এনে রাখতেন। কিন্তু শ্রীমায়ের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় ভাড়াবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হত। সঙ্ঘজননীর বাসস্থানের এই অনিশ্চয়তা স্বামীজীর অন্তরে গভীর দুঃখ এবং তীব্র গ্লানির সঞ্চার করত। তাই স্বামীজীর বরাবরের বাসনা ছিল শ্রীমায়ের জন্যে একটি স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমেরিকা থেকে লেখা স্বামীজীর চিঠিতে তাঁর সেই উদ্বেগ এবং ব্যাকুলতার কথা তিনি বার বার প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দকে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠি। সেই চিঠিতে স্বামীজী লিখছেনঃ 'প্রথমে মাতাঠাকুরাণীর জন্য একটি জায়গা করবার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছি ...যদি মায়ের বাড়িটি প্রথমে ঠিক হয়ে যায়, তাহলে আর আমি কোন কিছুর জন্য ভাবি না ...দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে। ...তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেইদিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না! যত শীঘ্র পারবে—। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। ...মায়ের জমিটা যেমন করেছ, অমনি আমি হুপ্ করে আসছি আর কি। জমিটা বড় চাই, building আপাতত মাটির ঘর ভাল, ক্রমে ভাল building তুলব, চিন্তা নাই।'[৩৪] আবার ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দেই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী

লিখছেনঃ 'মা-ঠাকুরানীর জন্য জমি খরিদ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিবে—অর্থাৎ বিল্ডিং আপাতত মাটির হউক, পরে দেখা যাইবে। কিন্তু জমিটা প্রশস্ত চাই। কি প্রকারে কাহাকে টাকা পাঠাইব, সমস্ত সন্ধান করিয়া লিখিবে।'[৫৫]

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর মঠের সকলকে লক্ষ্য করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা তাঁর চিঠিতেও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন স্বামীজীঃ 'মা-ঠাকুরাণীর জন্য একটা জায়গা খাড়া করতে পারলে তখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত। বুঝতে পারিস? দুই তিন হাজার টাকার মতো একটা জায়গা দেখ। জায়গাটা বড় চাই। আপাতত মেটে ঘর, কালে তার উপর অট্টালিকা খাড়া হয়ে যাবে। যত শীঘ্র পারো জায়গা দেখ। আমাকে চিঠি লিখবে। কালীকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করবে, কি রকম করে টাকা পাঠাতে হয়—Cook-এর দ্বারা কি প্রকারে। যত শীঘ্র পারো ঐ কাজটা হওয়া চাই। ঐটি হলে ব্যস্, আন্দেক হাঁপ ছাড়ি। জায়গাটা বড় চাই, তারপর দেখা যাবে। আমাদের জন্য চিন্তা নাই, ধীরে ধীরে সব হবে। কলকাতার যত কাছে হয় ততই ভাল। একবার জায়গা হলে মা-ঠাকুরানীকে centre (কেন্দ্র) করে গৌর-মা, গোলাপ-মা একটা বেডোল হুজুগ মাচিয়ে দিক।'[৫৬]

একমাসের মধ্যেই আবার ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর স্বামীজী এই কথাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। লিখছেনঃ 'পূর্বের পত্রে লিখিয়াছি যে, তোমরা মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা স্থির করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। যত শীঘ্র পারো।'[৫৭]

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আর একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখলেনঃ 'মা-ঠাকুরানীর জন্য পত্রপাঠ জায়গা অনুসন্ধান করিবে। ...একটা বড় জমি প্রথমে চাই; তারপর বাড়ী ঘর সব হবে। আমাদের মঠ [সন্ন্যাসীদের মঠ] ধীরে ধীরে হবে, ভাবনা নাই। ...যদি তুমি—কাহাকে টাকা পাঠাইব অর্থাৎ—কাহার নামে লিখিতে, তাহা হইলে আজই আমি টাকা পাঠাইতাম। টাকা পাইবামাত্রই জমি খরিদ করিবে। ...পরে আমাদের মঠের জন্য একটা জমি দেখিতে থাক। কাছাকাছি হওয়া চাই, অর্থাৎ দুইটা জমি যাহাতে অতি নিকটে হয়, এমত চেষ্টা করিবে। কলিকাতা হইতে কিছু দূরে হয়, চিন্তা নাই। ...দুটো জমির কথা ভুলবে না এবং তোমাদের মধ্যে কে এ কার্যের ভার লইবে, তাহা লিখিবে; অপিচ গিরিশ ঘোষ ও অতুলের সহিত পরামর্শ করিবে।'[৫৮]

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে লিখছেনঃ 'যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক; বাকি কাউকে আমি চাই না, মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। রাখাল ভায়া, তুমি উদ্যোগ করে সেইটি করে দেবে—মা ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা। আমার টাকাকড়ি সব মজুত; খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে শুনে কেনো। জমির জন্য ৩।৪ অথবা ৫ হাজার পর্যন্ত লাগে তো ক্ষতি নাই। ঘর-দ্বার এক্ষণে মাটির ভাল। একতলা কোঠার চেয়ে মাটির ঘর ঢের ভাল। ক্রমে ঘর-দ্বার ধীরে ধীরে উঠবে। যে নামে বা রকমে জমি কিনলে অনেক-

দিন চলবে, তাই উকিলদের পরামর্শে করিবে।' ঐ-চিঠিরই শেষাংশে লিখছেন: 'কিছু collection নেবে। তাতে দু এক হাজার টাকা হতে পারবে। তা হলে মা-ঠাকুরানীর জমির উপর দস্তুরমত ঘর-দ্বার হয়ে যাবে।'[৫৯] বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখছেন: 'মা-ঠাকুরানীর জন্য জমি কিনে দিলে আমি আপনাকে ঋণমুক্ত মনে করব। ...মা-ঠাকুরানীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত।'[৬০] রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সূত্রে জানা যায় স্বামীজী এদেশে ফিরে এসেও কলকাতায় শ্রীমায়ের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য জমি ক্রয় এবং গৃহনির্মাণ সম্পর্কে গুরুভাইদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আলোচনা করেছেন এমন কি এখন যেখানে মায়ের বাড়ি সেই জায়গাটিও স্বামীজী সম্ভবত দেখে রেখেছিলেন এবং ঐ জমির মালিক কেদারচন্দ্র দাসের[৬১] সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু ১৯০২ সালে স্বামীজীর হঠাৎ তিরোধানের ফলে কিছুদিনের জন্য ব্যাপারটি চাপা পড়ে। চার বছর পরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুলাই কেদারচন্দ্র দাস 'মায়ের বাড়ি'র জমিটি বেলুড় মঠকে দান করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর বিক্রয়লব্ধ সঞ্চিত ২৭০০ টাকা ও আরও কিছু অর্থ ঋণ করে স্বামী সারদানন্দ বাড়ি তৈরীর কাজে লাগেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বাড়ি তৈরী শেষ হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে শ্রীমা এই বাড়িতে পদার্পণ করেন। অবশ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বিশিষ্ট গবেষক সন্ন্যাসী স্বামী প্রভানন্দ মনে করেন, এমনও হতে পারে স্বামীজীকে হয়তো শ্রীশ্রীমা নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রথমে মূল মঠ তৈরি ও সংগঠনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে।

শ্রীমা ছিলেন স্বামীজীর চোখে সনাতন ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি, ভারতবর্ষের প্রতীক-বিগ্রহ। নিবেদিতা (তখন মিস মার্গারেট নোবল), মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস ওলিবুল ভারতবর্ষে এলে স্বামীজী তাঁদের নিয়ে বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে গিয়েছিলেন। তখনকার রক্ষণশীল সমাজ এই 'ম্লেচ্ছ' বিদেশিনীদের কিভাবে গ্রহণ করবে সেবিষয়ে স্বামীজীর সন্দেহ ছিল। তাঁর মনে ভয়ও ছিল শ্রীমা তাঁদের কিভাবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু স্বামীজী সবিস্ময়ে ও গভীর আনন্দের সঙ্গে দেখলেন শ্রীমা তাঁর ঐ বিদেশী সন্তানদের পরম আদরে ও স্নেহে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। স্বামীজী এ সম্পর্কে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন: 'শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন! ...ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?'[৬২] শ্রীমা এঁদের গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ স্বামীজীর চোখে সনাতন ভারতবর্ষ তাঁদের গ্রহণ করেছেন। এই উদারতা ঐ যুগে একজন অশিক্ষিতা রক্ষণশীল হিন্দু বিধবার পক্ষে

অকল্পনীয়—কিন্তু শ্রীমা যে ছিলেন অতুলনীয়া—তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। সেই অতুলনীয়াকে জগৎকে চেনালেন তাঁর অতুলনীয় সন্তান। শেষদিকে একদিন মাকে প্রণাম করে স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই!' ৩০

বেলুড় মঠের জনৈক বিশিষ্ট গবেষক সন্ন্যাসী-সূত্রে কথামৃতকার শ্রীম-র অপ্রকাশিত ডায়েরীতে উল্লেখিত একটি ঘটনার কথা জানা যায়। ২৩ এপ্রিল ১৮৯০ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের প্রায় বছর চারেক পর স্বামীজী একদিন গুরুভাইদের কাছে বলরামবাবুর বাসভবনে বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বহু বিষয়ে বহু কথা বললেও শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে কখনও কিছু বলেননি। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেনঃ 'কেন? ঠাকুর যদি ঈশ্বর হন তাহলে শ্রীশ্রীমা নিশ্চয়ই ঈশ্বরী।' স্বামীজীকে স্বামী যোগানন্দের একথা বলার উদ্দেশ্যঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যে স্বয়ং দেহধারী ঈশ্বর সেকথা যেহেতু স্বামীজী জানেন তাই শ্রীশ্রীমায়ের ঐশীস্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শ্রীমায়ের সম্পর্কে কিছু না বললেও স্বামীজীর মনে শ্রীমায়ের মহিমা বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে শুধু ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কিছু বলুন বা না বলুন স্বামীজীর হৃদয়ে শ্রীমা যে তার আগেই মহা মহিমায় অধিষ্ঠিতা হয়েছেন তার প্রমাণ আছে। বলরামবাবুর বাড়িতে স্বামীজীর ঐ কথা বলার মাস দুয়েক আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০-এ বলরামবাবুকে লেখা চিঠিতে আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই দেখেছি শ্রীমায়ের প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ভক্তি কী অপরূপভাবেই না আত্ম-প্রকাশ করেছিল! শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা নরেন্দ্রের সহজাত। তিনি কিছু না বললেও নহবতের মা আর মন্দিরের মা ভবতারিণী যে অভেদ—এই উপলব্ধি স্বামীজীর আর্ষ প্রজ্ঞায় যথা সময়ে প্রতিভাত হবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়ে-ছিলেন নরেন্দ্র শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্পণে না দেখে তাঁর স্ব-স্বরূপেই চিনুন। তা না হলে শ্রীমাকে নরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করবেন গুরুপত্নী হিসেবে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী হিসেবে। তা হলে তা হবে প্রতিফলিত মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। সে শ্রদ্ধা স্থায়ী হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, নরেন্দ্রনাথ যেমন তাঁর ভাবী বার্তাবহ তেমনি

শ্রীমায়েরও। নরেন্দ্রনাথ জগতকে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণকেই চেনাবেন না, চেনাবেন শ্রীশ্রীমাকেও ; গুরুভাইদের কাছেও তুলে ধরবেন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপ। সে-কারণে অপরোক্ষ উপলব্ধির আলোতেই প্রকৃত সত্য স্বামীজীর কাছে অপাবৃত হোক, তাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত। আমরা জানি না ঠিক কোন্ সময়ে সেই উপলব্ধি স্বামীজীর হয়েছিল। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দেখেছি, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীমা সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টি ও ধারণা কি রূপ নিয়েছিল।

॥ ২ ॥

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণসঙ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর পরেই যাঁর স্থান তিনি হলেন 'মহারাজ'[৬৩]—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীমায়ের প্রতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তির প্রথম লিখিত পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৯০ সনে বৃন্দাবন থেকে বলরাম বসুকে লেখা তাঁর একটি পত্রের ছত্রে ছত্রেঃ 'মাতাঠাকুরানী 'গয়াধামে সত্বর যাইবেন লিখিয়াছেন এবং 'গয়াধাম হইতে আসিয়া বেলুড়ে থাকিবেন। নিরঞ্জনের অত্যন্ত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা মাতাঠাকুরানীর উপর এবং আমাদের সকলেরই উচিত তাঁহার সেবা করা এবং তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, দেখা। আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার কোন সেবা করিতে পারিলাম না। তাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ আমাদের উপর। মাতাঠাকুরানী গঙ্গাস্নান করেন এবং গঙ্গাতীরে থাকেন—এটা আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু নিরঞ্জন যেন তাঁহাকে লইয়া একটা গোল-মাল না করে। কারণ, তিনি গোলমাল আদপে ভালবাসেন না। আমার অসংখ্য প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন এবং কহিবেন যেন আশীর্বাদ করেন তাঁহাদিগের চরণে আমার অচলা ভক্তি হয়।'[৬৩ক]

উদ্ধৃত অংশের শেষের বাক্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে 'তাঁহাদিগের চরণে' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের চরণে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাকে তিনি দেখছেন অভেদ দৃষ্টিতে এবং তাঁদের চরণে অচলা ভক্তির জন্য একান্ত অকিঞ্চনের মতো প্রার্থনা করছেন শ্রীমায়ের আশীর্বাদ। এই যে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা, এটি নিতান্ত ভাবোচ্ছ্বাসের ব্যাপার নয়। এর মূলে রয়েছে একটি আন্তরিক, প্রত্যক্ষ-প্রজ্ঞালব্ধ প্রতীতি। এই প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি উপদেশ স্মরণীয়। সেখানে

তিনি বলছেনঃ 'ঠাকুরের কৃপা পেতে হলে প্রথমে মাকে প্রসন্না করতে হবে। শ্রীশ্রীমাকে দেখলেই ঠাকুরকে দেখা হবে।'[৬৬]

একবার শ্রীমা (৫ নভেম্বর ১৯১২ — ১৫ জানুয়ারি ১৯১৩) কাশীতে লক্ষ্মী-নিবাসে আছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও তখন কাশীতে আছেন। তিনি প্রতিদিন সকালে লক্ষ্মীনিবাসে এসে গোলাপ-মার কাছে শ্রীমায়ের কুশল সংবাদ নিতেন। একদিন গোলাপ-মা উপরের বারান্দা থেকে (শ্রীমা গোলাপ-মাদের নিয়ে ঐ বাড়ির উপরে থাকতেন) বললেনঃ 'রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?' মহারাজ উত্তর দিলেনঃ 'মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।' এই বলে তিনি বাউলের সুরে গান ধরলেনঃ

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে॥
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াও রে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে॥
কমলাকান্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাও রে।
এ তো সুখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে বাও রে॥

গাইতে গাইতে তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন এবং গান শেষ হওয়ামাত্র 'হো হো হো' বলে সবেগে চলে গেলেন। শ্রীমা উপর থেকে মহারাজের এই অপূর্ব ভাব এবং নৃত্য দেখে আনন্দ করছিলেন।[৬৭] বলা বাহুল্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দের চোখে শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী ছিলেন শ্রীমা-ই। তাই দুর্গাপূজার দিন শ্রীমায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তিনি পেতেন পরম তৃপ্তি। একবার মহাষ্টমীর দিন তিনি একশ আটটি পদ্ম-ফুল দিয়ে শ্রীমায়ের চরণ পূজা করেছিলেন।[৬৮] স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ। দুর্গাপূজার সময়ে শ্রীমা বেলুড় মঠে উপস্থিত হতে না পারলে তিনি পূজা সম্পূর্ণ জ্ঞান করতে পারতেন না। আর, কোনও উৎসব উপলক্ষে শ্রীমায়ের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে মঠে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত—বিশেষত মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের হৃদয়ে। এসম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন স্বামী অমৃতানন্দ। বিবরণটি এইঃ 'এক বৎসর ঠাকুরের সাধারণ উৎসবের দিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা স্ত্রী-ভক্তদের লইয়া মঠে আসিয়াছেন। মহারাজ গেটে দাঁড়াইয়া "মহামায়ী কি জয়" রবে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন।...মা উপরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং নামিয়া আসিয়া, মহারাজের প্রার্থনায় ঠাকুর ঘরের সিঁড়ির প্রায় আট হাত দক্ষিণে আসনের উপর দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কম্পিত-হস্তে রোমাঞ্চিতকলেবরে ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করিলেন। মহারাজের আদেশে সাধু-ভক্তগণ দুই সারি হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। এবং করজোড়ে "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি স্তব পাঠ করিয়া মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। মা তখন চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া

মুখের ঘোমটা খানিকটা উপরে উঠিয়াছে, মহারাজ তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে পূর্বাস্য হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—চক্ষে ধারা। সেইদিন মহারাজ বালকের মত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনটার সময় দেখা গেল, বহুলোক উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে আর তিনি দুই হাতে তাহাদিগকে আটকাইতে গিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছেন ও বলিতেছেন, না না, যেতে দেওয়া হবে না—মার কষ্ট হবে। লোকগুলি তাঁহার কথা না শুনিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল, মহারাজের পরিচয় দিয়া বুঝাইয়া বলাতে নিবৃত্ত হইল।'[৬৯]

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শনের পর শ্রীমা যেদিন প্রথম মঠে পদার্পণ করেছিলেন সেদিনও মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে সেদিন শ্রীমাকে মঠে অভ্যর্থনার বিরাট সমারোহ। এ সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেনঃ 'মঠের প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কদলী-বৃক্ষ স্থাপিত হইল এবং পথের উভয় পার্শ্বে শতাধিক ভক্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন। মাতাঠাকুরাণীর গাড়ি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র কয়েকটি বোমা ছোঁড়া হইল এবং প্রবেশদ্বার হইতে শ্রীমা যেমন স্ত্রীভক্তগণসহ মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি ভক্তগণের মুখে উচ্চারিত হইতে থাকিল "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি প্রণামমন্ত্র। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আদেশ করিলেন যে, ঐ অবস্থায় কেহ মায়ের পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতে পারিবে না। ...শ্রীমাকে মঠ-বাড়িতে লইয়া গিয়া উপরের একখানি ঘরে বসানো হইল। তখন নীচে কালীকীর্তন চলিতেছে; আর ব্রহ্মানন্দজী বিভোর হইয়া শুনিতেছেন। সহসা দেখা গেল, তাঁহার শরীর অসাড়, হুঁকার নল হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে বহুক্ষণ। বহুক্ষণ এইভাবে অতীত হইলে শ্রীমাকে সংবাদ দেওয়া হইল; তিনি ব্রহ্মানন্দজীর কানে একটি মন্ত্র শুনাইতে বলিলেন। উহাতে আশ্চর্য ফল ফলিল: মহারাজ ব্যুত্থিত হইয়া গায়কগণকে উৎসাহ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ চলুক, চলুক"—যেন সবেমাত্র তিনি অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন!'[৭০]

মহারাজের দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ সেবক এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দ অনুরূপ একটি ঘটনার কথা বলেছেন, সেটি ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের এক তিথিপূজার দিন। স্বামী নির্বাণানন্দ বলেছেনঃ 'একবার মা আসবেন মঠে। সেদিন ঠাকুরের জন্মতিথি। মা আসবেন বলে মঠের গেট সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। মঠের গেট থেকে ঠাকুরঘর পর্যন্ত মঠপ্রাঙ্গণে মায়ের চলার পথে লাল সালু বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শরৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রমুখ গুরুভাই ও অন্যান্য সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে মহারাজ মঠের গেটে মায়ের গাড়ির জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বহু গৃহী পুরুষ এবং মহিলা ভক্তও। মায়ের গাড়ি দূর থেকে দেখামাত্র মহারাজের কণ্ঠে উচ্চারিত হল, "জয় মহামাঈকী জয়", "জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী জয়"। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সাধু ও গৃহী ভক্তরাও সেই জয়ধ্বনিতে যোগ দিলেন। স্ত্রী-ভক্তদের উলুধ্বনিতে মঠভূমি মুখরিত হয়ে উঠল। শ্রীমা সঙ্গিনীসহ গাড়ি থেকে নামলে মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, ও শরৎ মহারাজ তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। শ্রীমা সঙ্গিনীসহ লাল সালুর উপর দিয়ে হেঁটে চললেন ঠাকুরঘরে। সেখানে মহারাজের নির্দেশে শুকুল মহারাজ [স্বামী আত্মানন্দ] শ্রীমাকে ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে

ওঠার মুখে আরতি করলেন। একে ঠাকুরের জন্মতিথি তার উপর শ্রীমা এসেছেন। মহারাজের আনন্দ তখন দেখে কে! চঞ্চল বালকের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে মঠবাড়িতে আন্দুলের কালীকীর্তন আরম্ভ হল। বাবুরাম মহারাজ মহারাজকে ধরে নিয়ে এসে গানের আসরে বসিয়ে দিলেন। গান তখন খুব জমে উঠেছে। দেখা গেল মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে গানের তালে তালে মনোহর নৃত্য আরম্ভ করেছেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থা। নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। শরৎ মহারাজ ধরে ফেললেন এবং বসিয়ে দিলেন। ভাবের রেশ কিন্তু তার পরেও কিছুমাত্র কমার লক্ষণ দেখা গেল না। বসে বসেই গানের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের শরীর নৃত্যের ভঙ্গিতে দুলতে থাকল। গুরুভাইরা মহারাজের সেবকদের সাহায্যে তাঁকে ধীরে ধীরে গানের আসর থেকে তুলে নিয়ে মঠবাড়ির নীচের ঘরে নিয়ে এলেন। ভাব উপশমের নানা চেষ্টা হল। কিন্তু কোন ফল হল না। কাঠের পুতুলের মত তিনি বসে রইলেন। আধঘণ্টার বেশী সময় চলে গেল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে না আসায় সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মায়ের কাছে তখন খবর গেল। মা মহারাজের জন্য থালায় করে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন। গুরুভাইরা সেই প্রসাদ গ্রহণ করার জন্যে মহারাজকে অনেকবার গায়ে হাত দিয়ে বাহ্যচেতনা আনার চেষ্টা করলেন; কিন্তু কোন ফল হল না। মায়ের কাছে আবার খবর গেল। মা তখন স্বয়ং সেখানে এসে মহারাজের গায়ে হাত দিয়ে কোমল স্বরে বললেন, "ও রাখাল, প্রসাদ দিয়েছি। খাও।" সেই স্পর্শ এবং আহ্বানে যেন মন্ত্রের মত কাজ হল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন মহারাজ। চেয়ে দেখেন তাঁর পাশে স্বয়ং মা। চমকে উঠলেন মহারাজ। সর্বশরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি ব্যস্ত হয়ে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মা তাঁর হাত দুটি রাখলেন সন্তানের মাথায়। মিষ্টস্বরে বললেন, "বাবা, প্রসাদ খাও।" মহারাজ জড়ানো কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, মা, এই যে খাব।" সন্তানকে প্রকৃতিস্থ দেখে মা উঠে গেলেন। মহারাজ তখন প্রসাদ গ্রহণ করলেন।'[৭১]

স্বামী নির্বাণানন্দ দীর্ঘকাল গুরুসেবার সুবাদে শ্রীশ্রীমাকে মহারাজ কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন তা প্রত্যক্ষভাবে দেখবার এবং জানবার এরকম সুযোগ অনেক পেয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ 'মায়ের প্রতি ছিল মহারাজের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। অবশ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি কোন শব্দ দিয়েই মহারাজের ভাবকে প্রকাশ করা যাবে না। শুধু মহারাজই বা কেন, ঠাকুরের সব ছেলেরাই মাকে যে চোখে দেখতেন তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ভাব চেপে রাখা তাঁর পক্ষে খুব কষ্টকর হত বলে মহারাজ মায়ের কাছে খুবই কম যেতেন। আর ঐ একই কারণে মায়ের সম্পর্কে তিনি বলতেনও খুব কম—বলতে গেলেও নিজেকে সামলাতে পারতেন না। ওঁরা তো আর মাকে সাধারণ গুরু-পত্নী হিসাবে দেখতেন না। সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে জীবন্ত দেখতে পেতেন ওঁরা মায়ের মধ্যে। মহারাজ বলতেন, "মা হলেন সাক্ষাৎ জগদম্বা, নরদেহে স্বয়ং ভগবতী।" বলতেন, "ঠাকুর আর মা অভেদ।" একবার মহারাজের এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ, যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ তিনিই যদি রামকৃষ্ণ হন, তাহলে মা কে?"

মহারাজ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর যেমন 'তিনি'ই, মা-ও তেমনি 'তিনি'ই।" কথাটি বলেই মহারাজ এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে ভক্তটির আর কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস হল না। দু-তিন মিনিট বসেই ত্রস্তভাবে উঠে পালিয়ে বাঁচলেন। মহারাজ যা বললেন তার অর্থ ভক্তটি বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানিনা তবে তাঁকে আর কোন-দিন মহারাজের কাছে বা ঠাকুরের আর কোন সন্তানের কাছে ঐ জাতীয় প্রশ্ন করতে কখনও শুনিনি।' ৭২

মাতা-পুত্রের অপার্থিব সম্পর্কের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনাচিত্র পাওয়া যায় মহারাজের জনৈক সন্তান স্বামী বিজয়ানন্দের (পশুপতি মহারাজের) স্মৃতিচারণে। স্বামী বিজয়ানন্দ শ্রীমা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ উভয়কেই প্রথম দর্শন করেন একসঙ্গে এবং সেই প্রথম দর্শন তাঁর হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। তিনি তাঁর সেই দর্শন প্রসঙ্গে বলতেনঃ 'আমি অনেকের কাছে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা শুনেছিলাম। তাই তাঁকে দেখার একটা খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল। একদিন আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "আজ সকাল নটায় হাওড়া স্টেশনে গেলে তুমি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখতে পাবে। তিনি আজ ভুবনেশ্বর যাবেন।" সেই কথা শুনে আমি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে থাকি। দেখি, ভুবনেশ্বরের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে এবং অনেক ভক্ত, সাধু-ব্রহ্মচারী সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট রোলস রয়েস গাড়িতে করে একজন সম্ভ্রান্ত-দর্শন স্বাস্থ্যবান দীর্ঘকায় প্রৌঢ় সন্ন্যাসী স্টেশনে এলেন। সকলের মুখে শুনলাম তিনিই "মহারাজ" [স্বামী ব্রহ্মানন্দ]। আর ঐ গাড়িটি কুচবিহারের মহারাজের। মহারাজ কিন্তু প্ল্যাটফর্মে ঢুকে তাঁর ট্রেনে না উঠে পাশের প্ল্যাটফর্মে যে ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল সেইদিকে হাতজোড় করে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। দেখলাম মহারাজ একটি কামরার সামনে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর সোজা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। প্ল্যাটফর্মের উপরে ধুলো-ময়লা, কত কি নোংরা পড়ে আছে, আর কত লোক যাওয়া-আসা করছে! কিন্তু মহারাজ কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে ঐভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ঐ কামরাটিতে উঠে একজন মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শুনলাম, তিনিই শ্রীশ্রীমা। তিনি যাচ্ছেন জয়রামবাটী। তাঁর গাড়ি ও মহারাজের গাড়ি প্রায় একই সময়ে। শ্রীশ্রীমাকেও আমার সেই প্রথম দর্শন। দেখলাম, মায়ের মুখ ঘোমটায় ঢাকা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মায়ের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে হাতজোড় করে বললেন, "মা, আমি ভুবনেশ্বর যাচ্ছি। আপনাকে একবার ওখানকার মঠে পায়ের ধুলো দিতে হবে।" মা ঘোমটার ভিতর থেকে মাথা নাড়লেন। তারপর অনুচ্চস্বরে বললেন, "সাবধানে যেও, বাবা। শুনেছি ওখানে বড় ম্যালেরিয়া। সাবধানে থেকো—জল ফুটিয়ে খেও।" মায়ের গাড়ি ছাড়ার সময় হল। মহারাজকে দেখলাম কেমন ভাবস্থ হয়ে হাতজোড় করে মায়ের সামনে থেকে পিছনে হেঁটে ধীরে ধীরে কামরা থেকে নেমে এলেন। প্ল্যাটফর্মের উপর মায়ের উদ্দেশে আবার আগের মত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তারপর উঠে যুক্ত-করে দাঁড়িয়ে রইলেন যতক্ষণ না মায়ের গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। সে দৃশ্য আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারিনি।' ৭৩

শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হলেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ অভিভূত হয়ে পড়তেন, ভাব-সংবরণ করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। সেই কারণে তিনি শ্রীমায়ের সামনে বেশী যেতেন না। কোনও কারণে শ্রীমায়ের স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটুক, এটা তিনি চাইতেন না। এক-জন বলেছেনঃ 'একদিন আমি যখন শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আছি, মহারাজ আসিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া মা দোতলার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ উপরে গেলেন না। তিনি ও শরৎ মহারাজ, দুই বিরাট মহাপুরুষ, উঠানে পাশাপাশি দাঁড়াইলেন ও উপরের দিকে না তাকাইয়া, যুক্তকর নিজেদের মস্তকোপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করিয়া চিত্রার্পিতবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। আমার বোধ হইতেছিল সমস্ত বাড়ীখানিই যেন হিমালয়-প্রমাণ গাম্ভীর্যে ভরিয়া গিয়াছে।'[৭৪] দেখা যেত শ্রীমায়ের কাছে উপস্থিত হলে মহারাজ বালকের মতো আচরণ করতেন। ঐভাবে নিজেকে যেন ভুলিয়ে রেখে কোনও রকমে ভাব চেপে রাখার চেষ্টা করতেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ কথিত মহারাজের এইরকম আচরণের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমা তখন জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় এসেছেন। সেইসময়ে একদিন সকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ উদ্বোধনের বাড়ীতে এসে ছেলেমানুষের ঢঙে শ্রীমায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'মা, কেমন আছেন?' তখন শ্রীমায়ের মাথার কাপড় টানা, কিন্তু ঘোমটা ছিল না। তিনি বলেনঃ 'বাবা, পায়ে বাতের ব্যথা, বড় কষ্ট পাচ্ছি ; একটু একটু জ্বরও হয়।' মহা-রাজ মায়ের কথা শুনছেন আর চঞ্চল বালকের মতো এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন, যেন ছবিগুলি দেখছেন। 'মা, আপনাকে আমি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেব, আমি হোমিও-প্যাথির বই অনেক পড়েছি, ওষুধও আমার কাছে আছে, আপনাকে দেব, ভাল হয়ে যাবেন'—এইকথা বলেই আগের মতো প্রণাম করে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসলেন।[৭৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী-সন্তানদের মতো স্বামী ব্রহ্মানন্দও শ্রীমায়ের কোন আদেশ বা অভিমতকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলে মনে করতেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ তা নির্বিচারে পালন করতেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ঘটনাটি স্মরণীয়ঃ সেবার মহারাজকে ঢাকায় নিয়ে যাবার জন্যে বীরেন্দ্রনাথ বসু বেলুড় মঠে এসেছেন। কিন্তু মহারাজ যেতে রাজী হলেন না। বাবুরাম মহারাজ নিজে তাঁকে অনুরোধ করলেও কোন ফল হল না। তখন বাবুরাম মহারাজ বীরেনবাবুকে পরামর্শ দিলেনঃ 'এমনিতে হবে না, মা-ঠাকরুনের কাছে যাও, তিনি অনুমতি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' কৃষ্ণ-লাল মহারাজকে সঙ্গে দিয়ে বীরেনবাবুকে তিনি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ মাকে গিয়ে বললেনঃ 'মা, এটি মহারাজের ছেলে [অর্থাৎ মন্ত্রশিষ্য],

তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যেতে এসেছে, তিনি যেতে চাইছেন না।' মা বললেনঃ 'ছেলে এসেছে নিয়ে যেতে, তা যাবে বইকি। দেখ বাবা, খুব সাবধানে নিয়ে যাবে।' বীরেনবাবুর উদ্দেশ্য সফল হল। কারণ মায়ের ঐ কথা শোনার পর যাওয়ার ব্যাপারে মহারাজ আর কোন অমত করেননি।[৭৬]

সঙ্ঘজননীর অনুমতি ও অনুমোদন সর্বপ্রথমে না নিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোনও কাজ করতেন না—তা নিজের অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কেই হোক অথবা সঙ্ঘের কোন প্রয়োজনেই হোক। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তাঁর মনে তপস্যার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর মনের ইচ্ছা মাকে জানালেন এবং তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মা বলরামবাবুকে লিখলেনঃ 'শুনিলাম রাখাল পশ্চিমে যাইবে। গেলবারে জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইযাছিল। শীত অন্তে ফাল্গুন মাস নাগাদ গেলে ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কি বলিব!' মা বুঝেছিলেন ব্রহ্মানন্দের মনে তখন তপস্যার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। তাই শেষে লিখেছিলেনঃ 'তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কি বলিব!' মায়ের সেই অনুমোদন মাথায় নিয়ে তিনি কালবিলম্ব না করে তপস্যায় যাত্রা করলেন।[৭৭] আনুমানিক ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জনৈক গুরুভাইকে আধ্যাত্মিক জীবন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি পত্র লিখে তা অনুমোদনের জন্য মায়ের কাছে পাঠালে মা পত্র শুনে মন্তব্য করেনঃ 'রাখাল, যোগেনকে বলো, চিঠি সুন্দর হয়েছে ; আমার মত এতে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে।'[৭৮] মায়ের ঐ কথার পর পত্রটি সেই গুরুভাইকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পাঠিয়ে দেন।

সঙ্ঘজননী শ্রীমা ছিলেন তাঁর আরাধ্যা, তাঁর আশ্রয়। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই) মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় শ্রীমা লীলাসংবরণ করেন। মহারাজ তখন ভুবনেশ্বর মঠে। ঐদিন রাত্রি প্রায় একটার সময় জনৈক সেবক মহারাজের ঘরে ঢুকে দেখলেন যে, তিনি একটি আলোয়ানে সারা শরীর ঢেকে ইজিচেয়ারে গম্ভীরভাবে বসে আছেন। সেবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর জন্য তামাক সেজে আনবেন কিনা ; কিন্তু মহারাজ সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে সেইভাবেই বসে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে সেবকের আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস হল না।[৭৯] পরদিন সকালে মহারাজ অন্যান্য দিনের মতো বেড়াতে না গিয়ে সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী সারদানন্দের টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল —পূর্বরাত্রে ১টা ৩০ মিনিটে শ্রীমা দেহরক্ষা করেছেন। সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনে মহারাজের মুখ অব্যক্ত বেদনায় থম থম করতে লাগল, তিনি শুয়ে পড়লেন। খানিক পরে উঠে বললেনঃ 'আমি হবিষ্য করব।' তিন দিন তিনি কারও সঙ্গে কথা

বলেননি এবং বারো দিন জুতা ব্যবহার করেননি ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেছিলেন। দুঃখ করে বলেছিলেনঃ 'এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম।'[৮০]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেনঃ 'মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মত থাকেন, অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতাম!'[৮১]

উপসংহার

শ্রীশ্রীমা ছিলেন অবগুণ্ঠনবতী। শ্রীরামকৃষ্ণের দু-একজন অন্তরঙ্গ ও বয়স্ক ভক্ত ভিন্ন কোন পুরুষ ভক্ত তাঁর মুখ কখনও দেখেননি। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দও তার ব্যতিক্রম নন। শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বর বাসকালে একজন কালীবাড়ির খাজাঞ্চীকে শ্রীমা কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে খাজাঞ্চী বলেছিলেনঃ 'তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনও দেখতে পাইনি।' শুধু তাঁর বাহ্যিক রূপকেই নয়, তাঁর ঐশীরূপকেও শ্রীমা অবগুণ্ঠনের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। মায়ের এই দুই ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ মহান সন্তান সেই অবগুণ্ঠনের কিছুটা উন্মোচিত করে এক অপূর্ব মাতৃ-আলেখ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাতে মায়ের ঐশী স্বরূপের যে চকিত আভাস আমরা পাই তা আমাদের নিত্যক্ষণের স্মরণ, মনন ও অনুধ্যানে কতখানি ধরে রাখতে পারব জানি না, তবে ক্ষণকালের জন্যে হলেও অনন্তের সান্নিধ্যের আনন্দ তো আমাদের স্পর্শ করে যায়। সেও তো এক পরম প্রাপ্তি। দার্জিলিং-এ টাইগার হিল থেকে হঠাৎ মেঘমুক্ত হিমালয়ে সূর্যোদয়ের দুর্লভ মহিমা পলকের জন্যেও যার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সেই অনুভব করতে পারে মুহূর্তের জন্যে হলেও কোন্‌ ঐশ্বর্যবান সে হয়েছে!

শ্রীশ্রীমা ঃ সেবকচতুষ্টয়ের দৃষ্টিতে

'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।'

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ ইঙ্গিত করতে গিয়ে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই একথা বলেছেন।[১] তা সত্ত্বেও যা কথন-সামর্থ্যের অতীত, তাকেও মুখের কথায় প্রকাশের চেষ্টা করতে হয়। উদ্দেশ্য—লীলা-অনুধ্যান। শ্রীশ্রীমায়ের অনুধ্যান প্রসঙ্গেও তাই আমাদের অক্ষম কথার তুলি দিয়ে, তাঁর স্বরূপের আভাস-চিত্র না এঁকে থাকতে পারি না। যদিও জানি, তাতে মাতৃরূপের পূর্ণ আলেখ্য কখনই হবে না। আমরা এখানে মাকে দেখতে প্রয়াসী হব—তাঁর ঘনিষ্ঠ সেবকদের চোখের আলোতে। এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে একই বস্তুকে বিচিত্রভাবে দেখা যায়। একই চাঁদ—তবুও চন্দ্রিমার কতই বিভিন্ন অভিব্যঞ্জনা নানা জনে। সারদাদেবীকে আমাদের এই সাধারণ-চোখে দেখা—নিতান্তই আকাশের চন্দ্রমাকে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে ফেলার মতোই। কোনও আকাশচারী চন্দ্রলোক-অভিযাত্রী যেমনটি চিত্র দেখেছেন, আমাদের এই দেখার চেয়ে তা অতি স্বাভাবিক কারণেই স্বতন্ত্র। সারদা-চন্দ্রমার দিব্য-আলেখ্য অঙ্কনের জন্যও তাই আমরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সেবক-সন্তানদের শরণ নিতে বাধ্য। স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ), স্বামী যোগানন্দ (যোগীন মহারাজ), স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা মহারাজ), এবং স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ)—শ্রীমায়ের বিভিন্ন সময়ের এই অন্তরঙ্গ সেবকচতুষ্টয় হচ্ছেন যেন ঐ চন্দ্র-লোকচারী আলোকচিত্রী—তাঁদের ধ্যান-সংগৃহীত চিত্রাবলী আমাদের অনিপুণ চিত্রাঙ্কন-প্রয়াসকে প্রেরণা তো দেবেই, অনুধ্যানযোগ্য নব নব ভাবের সঞ্চারণাও করবে। তাঁদের ঘনিষ্ঠ-চোখে-দেখা শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-বর্ণাঢ্য কিছু ছবি তাই আমরা এখানে আমাদের মনন-বেদিকাতে স্থাপনা করছি—শুধু শান্তচিত্তে অপলকে নিরীক্ষণের জন্য। নচেৎ, অলৌকিক মাতৃচরিত্র ব্যাখ্যানের কি সাধ্য আছে আমাদের?

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নিয়োগকর্তা। ইংরেজী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ তখনও শেষ হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দেখেন লাটু পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গাতীরে ধ্যানে ডুবে রয়েছে। লাটু নিশ্চল নিস্পন্দ। ধ্যানমগ্ন লাটুকে ডেকে ঠাকুর বলে ওঠেনঃ 'ওরে লেটো! তুই এখানে বসে আছিস্; আর উনি যে নবতে রুটি বেলার লোক পাচ্ছেন না।' সহসা এই কথা কানে যেতেই লাটুর ধ্যান ভেঙে যায়—ভারী অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। যা-হোক উঠে দাঁড়িয়ে তক্ষুণি ঠাকুরের অনুগমন করেন;—তিনিও দ্রুতপদে লাটুকে সঙ্গে নিয়ে সটান নহবতে গিয়ে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীমাকে সাহ্লাদে সম্বোধন করে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বলেছিলেনঃ 'এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ত্ব, তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বলো, এ করে দেবে।'[২] লাটুও সেইদিনের সেই ক্ষণ থেকেই জননীর সেবাধিকার লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। উত্তরজীবনে এই স্মৃতি তাঁকে কিরকম উদ্দীপনা দিত, তা তাঁর নানা উক্তি থেকেই বোঝা যেত। যেমন, কাশীতে জনৈক ভক্তের কাছে একদিন আবেগভরে তিনি বলেছিলেনঃ 'দেখো! মা কতো কষ্টে না দিন কাটিয়েছেন! সামান্য এইটুকু ঘরে তিনি কতোদিন রইলেন, কেউ জানতে পারতো না। কখন যে গঙ্গাস্নানে যেতেন, কেউ টের পেতো না।...মার মত বৈরাগ্য হাম্নি ত দেখেনি! আউর তাঁর দয়ার কি তুলনা আছে? হামার বহু ভাগ্য যে, উনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) হামাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন—মায়ের কৃপায় হামার জীবন ত সার্থক হয়ে গেছে।...হামি আর তাঁর কি সেবা করেছি? তিনিই তো হামাকে ভালবাসা দিয়ে বেঁধেছেন। হামাদের কাছ হোতে তিনি ত কুছু পাবার আশা রাখেন না, বাকী তাঁর দয়ায় হাম্নে তাঁকে পেয়েছি।'[৩]

বাস্তবিকপক্ষে, সেই দক্ষিণেশ্বরের সময় থেকেই শ্রীশ্রীমা ও লাটুর মধ্যে একটা অপার্থিব সম্বন্ধ—জননী ও শিশুর অলৌকিক স্নেহ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। ভাবলে অবাক লাগে, জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কেউই যখন কিছুই জানেন না, একটি নিরক্ষর বালক কিন্তু তখন থেকেই মাতৃমহিমাতে বিভোর! লাটু শ্রীশ্রীমাকে সেবা করতেন, নিছক একটি আদিষ্ট কর্মরূপেই নয়, পরন্তু তিনি মাকে দেখতেন নিজ গর্ভধারিণী এবং ততোধিকরূপে— সাক্ষাৎ জগন্মাতা ভাবে। তাই অবোধ সন্তান মায়ের কাছে যেমন তার মানে-অভিমানে, দুঃখে-দৈন্যে, আবার সুখে-সম্পদে, সুদিনে-সুসময়ে, বিভিন্ন অবস্থাতেই সমুপস্থিত হয়ে প্রাণ জুড়ায়—আমরা লাটুকেও দেখি তাঁর বিচিত্র জীবনের নানা পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে এসেছেন সান্ত্বনা, সহানুভূতি, আনন্দ ও তৃপ্তির জন্য। দক্ষিণেশ্বরেই শুধু নয়, শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে, এবং তার পরেও আমরা লাটুকে বার বার দেখতে পাই জননীর পার্শ্বচর, ছায়ার মতো—তীর্থপর্যটনেও লাটু শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত সেবক। সেবকাগ্রণী লাটুকে তাঁর উপাস্যা জননীর সান্নিধানে অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত দেখাত—এবং অমন অদ্ভুত-চরিত্র-সন্তানের সেবার পটভূমিতে, মাতৃ-আলেখ্যখানিও আশ্চর্য দীপ্তিময়ী হয়ে উঠত।

উত্তরজীবনে লাটু মহারাজ কত কথাই না বলতেন;—সব কথার ফাঁকে ফাঁকে

কিন্তু তাঁর অনুপম মাতৃ-অনুধ্যানও লক্ষণীয়। তাঁর সরল সহজ ছোট ছোট মন্তব্য-গুলির মধ্যে অন্তরের অগাধ মাতৃভক্তিই ফুটে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যায়, লাটু মহারাজ একদিন কাশীপুরের নানা ঘটনা ও স্মৃতিচিত্র খুব আবেগের সঙ্গে বলে চলেছেন—অকস্মাৎ একটু থেমে তাঁর সেই অপূর্ব হিন্দী-বাংলা-মিশ্রিত ভাষায় গদগদ কণ্ঠে মন্তব্য করলেনঃ 'মায়ের মতো এমন বুদ্ধিমান মেইয়া লোক হাম্‌নে দেখলুম না। তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) সেবা করতে করতে হামাদের মধ্যে কেউ হতাশ হোয়ে পড়লে তিনি (শ্রীশ্রীমা) তা বুঝতে পারতেন। যোগীনভাইকে দিয়ে বলে পাঠাতেন—"ওকে হতাশ হোতে মানা কোরো। তাঁর শরীর ত আজকাল একটু ভাল রয়েছে, এখন তো ঘায়ের মুখ বাহিরের দিকে হয়েছে।" এমনি কোরে মা হামাদের সব সাহস দিতেন।'[৪] শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত তনু ত্যাগের কথা বলতে গিয়ে লাটু মহারাজ বলতেনঃ 'মা থাকতে না পেরে ঠাকুরের ঘরে এলেন এবং "মা কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!" বোলে কাঁদতে লাগলেন। মাকে কাঁদতে দেখে বাবু-রাম আর যোগীনভাই সেখানে গেলো আর গোলাপ-মা মাকে ধোরে ঘরে নিয়ে গেলো।...মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করলেন আর তাঁর গলার আওয়াজ শুনা গেলো না। মেইয়া মানুষের এমন ধৈর্য্য হাম্‌নে জীবনে দেখেনি।'[৫] উল্লিখিত স্মৃতি-চারণার অবসরে একটি ঘটনা এখানে স্মরণযোগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মায়া-তনু-খানি অগ্নিতে আহুতিদানের জন্য, পুষ্প-চন্দনাদিতে চর্চিত করে কাশীপুর মহা-শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলে, শূন্য উদ্যান-ভবনে তখন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর এক-মাত্র সন্তান এই লাটুই রয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর শ্রীমা তাঁর বিরহ-বেদনাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন।তখন ভক্তপ্রবর বলরাম ঐ দুঃসহ অবস্থা থেকে মাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনাপ্রদানের উদ্দেশ্যে, কিছুকালের জন্য তাঁকে তীর্থাদি পর্যটনে পাঠাতে মনস্থ করেন। এই তীর্থযাত্রাতেও লাটু শ্রীমায়ের সঙ্গী-সেবক হবার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। লাটু মহারাজ পরবর্তীকালে এই কথা স্মরণ করে বলতেনঃ 'শুনলুম মাকে ও লক্ষ্মীদিদিকে বলরামবাবু তীর্থে পাঠাচ্ছেন। সঙ্গে যোগীনভাই আর কালীভাই যাবে। মা তীর্থে যাচ্ছেন শুনে, তাঁর সঙ্গে হামার যাবার ইচ্ছা হোলো। মা তা' বুঝে নিলেন। তিনি হামাকেও সঙ্গে নিলেন। মাস্টারমশায় তাঁর পরিবারকেও মায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন আর গোলাপ-মাও তাঁর সঙ্গ ছাড়-লেন না। দেখো তো! মায়ের কৃপায় হামাদের তীর্থে যাওয়া হোলো। এমন ভাল-বাসা দিয়ে মা হামাদের সব বেঁধে রেখেছেন।'[৬]

এই তীর্থভ্রমণ-কালের অনেক স্মৃতি লাটু মহারাজের মুখে পরে শোনা যেত। লাটু মহারাজ বলতেনঃ '(কাশীতে) একদিন রাতে বিশ্বনাথের আরতি দেখে মা খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগলেন—হামাদের চেয়েও জোরে। বাসায় এসে তিনি সেই যে শুয়ে পড়লেন, আর কারুর সঙ্গে কথা বললেন না। শুনেছি, সেদিন অনেক রাতে উঠে তিনি আবার ধ্যেনে বসেছিলেন। গোলাপ-মা তাঁকে কত ডাকাডাকি করেছিলো, তবু সেদিনকার ধ্যেন ভাঙ্গেনি।...

'বৃন্দাবনে* মা আর লক্ষ্মীদিদি কোন কোন দিন যোগীনভাইকে আবার কোন কোন দিন হামাকে সঙ্গে নিয়ে যমুনার ধারে বেড়াতে যেতেন। তখন কালী-ভাই বনে বনে ঘুরতে (অর্থাৎ বনপরিক্রমায়) বেরিয়েছে।...

'যোগীনভাইকে দীক্ষা দেবার জন্যে ঠাকুর মাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। মা কাউকে মন্তর দিতে চাইতেন না। তিনি বারে বারে আদেশ করায় মা যোগীনভাইকে দীক্ষা দিলেন। ...বৃন্দাবনে ঠাকুরের ছবিতে ফুল দিয়ে মা রোজ পূজা করতেন আর একটা (অস্থির) কৌটা নিজের মাথায় ছুঁইয়ে রেখে দিতেন। একদিন সেই কৌটা তিনি হামাদের মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন। .. তিনি খুব কীর্তন শুনতে ভালবাসতেন। হামাকে আর লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভগবানজীর আশ্রমে মাঝে মাঝে নাম শুনতে যেতেন।'[৭]

বৃন্দাবনেও লাটু মহারাজের আপন স্বভাবসিদ্ধ স্বতন্ত্র উদাসীন এবং তপোময় জীবনযাপনরীতি, সেই দক্ষিণেশ্বরের মতোই সমান প্রবহমান ছিল। তাঁর বালকবৎ যথেচ্ছ আহার-বিহার-বিচরণ কখনও কখনও অন্যের চোখে বিরক্তিকর ঠেকলেও, শ্রীশ্রীমা কিন্তু এ-বিষয়ে বরাবরই স্নেহ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। যোগীন মহারাজ উত্তরকালে ঐ বৃন্দাবন-স্মৃতি প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেনঃ 'একবার লাটু মহারাজ কাউকে কিছু না বলে কোথায় যে ডুব মারলে আমরা তার কোনও পাত্তা পেলুম না। শ্রীশ্রীমা তার জন্য বড় ভাবিত হলেন। তিনদিন পরে নিজে এসে হাজির হোল। চুল উস্কো, চোখ মুখ লাল, যেন বিকারের রোগী। সবাই মিলে জিজ্ঞাসা করলুম—"কোথায় ছিলি?" কোন উত্তর দিলে না, শুধু হাসতে লাগলো! শেষে মা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বললে—"নদীর ধারে ছিলুম!" তারপর ঠিক ছেলেমানুষের মতো বললে—"বড় খিদে পেয়েছে মা, কুছু খাবার দিন।" মা তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এলেন। খেয়েদেয়ে কাউকে কিছু না বলে আবার চলে গেল। এসব দেখে মা বলতেন —"লাটুর সবই অদ্ভুত।"'[৮] 'লাটুর সবই অদ্ভুত'—শ্রীশ্রীমায়ের সেদিনের এই আশীর্বচনই যেন কিছুকাল বাদে লাটুকে পরিণত করবে 'অদ্ভুতানন্দে'।[৯]

শ্রীশ্রীমা তীর্থাদি দর্শন সেরে, কলকাতায় ফিরে এসে, বেলুড়ে গঙ্গার তীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে বেশ কিছুকাল ছিলেন। অদ্ভুতানন্দ সেখানেও পুনরায় শ্রীমায়ের সেবা-তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। একদিন মা লাটুকে বাজারে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিছু বিশেষ প্রয়োজনে। মায়ের অন্য সেবক যোগীন অনুপস্থিত তখন। লাটু মহারাজ স্বয়ং সেদিনের কথা স্মরণ করে পরে আবেগজড়িত কণ্ঠে

বলেছিলেনঃ 'মায়ের কথা শুনে হামনে বল্‌লুম—"এখন হামি যেতে পারবো না ; তার চেয়ে বরং যাই, যোগীনকে ডেকে দিই গে। হামার এখন ওসব হাঙ্গামা পোয়াতে মন যায় না।" দেখো! মা হামার মনের ভাব ঠিক বুঝে নিলেন, বললেন—"তোর গিয়ে কাজ নেই, থাক্‌ তুই যোগীনকেই ডেকে দে।" এ রকম কতো যে উৎপাত মায়ের কাছে করতুম! বাকী মা কখনো তাতে বিরক্ত হোতেন না। মায়ের সহ্যশক্তির কি তুলনা আছে? তাই যেখানে সেখানে ওনার কথা বলি না; সকলে বুঝবে না, বাকী উল্টা বুঝে সব গরবর্‌ কোরে ফেলবে।' [১০]

১৮৯৩ সালের বর্ষাকালে শ্রীশ্রীমা যখন পুনরায় বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটে বাড়িতে আগমন করেন, লাটু মহারাজ তখনও সেখানে ছিলেন। উত্তরকালে তিনি বলতেনঃ 'দেখো, নীলাম্বরের বাড়ীতে মা কঠোর পঞ্চতপা করেছিলেন। লোকশিক্ষার জন্য তিনিও এমন কঠোর করলেন। তপস্যা না থাকলে কারুর কুছু হবার যো নেই, জানো।' [১১]

বেলুড়ে মঠের জন্য নতুন জমি কেনা হলে (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮), সেখানেই স্থায়ী মঠের নির্মাণ-কার্যাদি শুরু হয়। মঠ তখন বেলুড়ের নীলাম্বরবাবুর বাগানে। ঐ নির্মাণ-কালের মধ্যেই মঠের নতুন জমিতে শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি অন্তত দু-বার পড়েছিল, এ-সংবাদ তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়। স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৮-এর ৯ ডিসেম্বর। ঐ প্রতিষ্ঠা-উৎসবের প্রায় মাসখানেক আগে কালীপুজার পূর্বদিন (১২ নভেম্বর ১৮৯৮) শ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থাপিত তদানীন্তন মঠে শুভাগমন করেন এবং নবারব্ধ মঠের ভূখণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বহস্তে বসিয়ে পুজা করেছিলেন। সেদিন লাটু মহারাজও জননী-সকাশে বেলুড়ে উপস্থিত ছিলেন, একথা তাঁর নিজ মুখের বর্ণনা থেকেই জানা যায়। স্মৃতিপ্রসঙ্গে তিনি জনৈককে বলেছিলেনঃ 'শ্রীশ্রীমা ত মঠে গিয়ে সেদিন নিজের হাতে ঠাকুরের পুজা করলেন। সেদিন মঠের সকলে মিলে তাঁর পায়ের ধূলি নিয়েছিলো; এখনও মঠে সে ধূলি পুজা হয়।* মা ত মঠবাড়ী দেখে খুব খুশী হোয়েছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দেখে বলেছিলেন—"বাঃ বেশ হয়েছে! এখানে এলেই ওখানকার কথা মনে পড়বে।"' [১২]

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর সেবক লাটুর স্নেহ-সম্বন্ধ যে অনেক কারণেই বিশেষত্বময়, তার কারণ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হলেও, উপলব্ধিতে আনন্দ আছে। লাটু যত বড় মহাত্মাই হোন না কেন, মায়ের চোখে কিন্তু চিরদিনই ছিলেন তিনি অদ্ভুত-ব্যবহার, আপনভোলা, আদরের শিশুটি। পক্ষান্তরে, লাটুও মায়ের নেওটা কচি খোকাটির মতো, সাক্ষাৎ জগদম্বাকে মনে করতেন যেন নিজের গর্ভধারিণী জননী —অথবা, কখনও প্রবীণ পিতার কাছে তাঁর স্নেহের কন্যাটি যেমন! তাই অদ্ভুত-ব্যবহার এই জ্ঞানী মাতৃভক্তকে মায়ের কাছে মান-অভিমান, আদর-আবদার-নালিশ, আকূতি-মিনতি, আর্তিসহ সমুপস্থিত যেমন দেখি, ঠিক তেমনই আবার মাঝে মাঝে

দেখি সন্তান-হিতাকাঙ্ক্ষী জনকের মতো শাসন-গম্ভীর ভাবে। বাস্তবিকই জননী-সন্তানের এই দিব্য-সম্বন্ধ আমাদের কাছে পরম আস্বাদনীয় হলেও, চির-রহস্যময়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি স্মৃতি-চিত্রঃ

গিরিশবাবুর গৃহে দুর্গাপূজা উপলক্ষে (১৯০৭ সালে) শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় এসে বলরাম-ভবনে ছিলেন। ঐকালে লাটু মহারাজও ঐ বাড়িরই নীচের একখানা ঘরে থাকতেন। শ্রীমা গাড়ি থেকে নেমে নীচের ঘরে তাঁর আদরের ছেলেটিকে দেখে স্নেহমাখা সম্ভাষণ করলেনঃ 'কি বাবা নাটু! কেমন আছ?' অদ্ভুত খেয়ালী অদ্ভুতানন্দ তৎক্ষণাৎ তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলে বসলেনঃ 'তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, সদরবাটীতে হামার সঙ্গে কেনো দেখা করতে এসেছো! যাও, এখুনি ভিতরে যাও: এখানে হামনে তোমার সঙ্গে কথা কইবে না।' বৃদ্ধ পিতা যেমন তাঁর চপলা বালিকা-কন্যাকে শাসন করেন—অবিকল সেই স্বর! ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে তক্ষুণি আবার বলতে থাকেনঃ 'হামাকে ত ডেকে পাঠালেই পারতেন। হাম্‌নে ত আপুনার গোলাম আছে, যাইয়া দেখা করতুম।'[১৩] সন্তানের ভাব দেখে জননীও হাসতে হাসতে উপরে চলে যান।

বলরাম-গৃহে মা সেবার প্রায় মাসখানেক ছিলেন। প্রতিদিনই মা স্বহস্তে লাটুর জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন। লাটু কিন্তু কি এক রহস্যঘন ভাবাবেশে থাকতেন। একই বাড়ির নীচের ঘরে থাকলেও, উপরে মায়ের কাছে তেমন যেতেন না। অবশেষে মা যেদিন জয়রামবাটীতে ফিরে যাবার জন্য যাত্রা করছেন—সেদিন এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়, এই মা-ছেলেকে কেন্দ্র করেই। সকলেই একে একে গিয়ে মাকে প্রণাম করে আসছেন, কিন্তু অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত কাণ্ড—তিনি মাকে প্রণাম নিবেদন করতে উপরে গেলেন না—আপনমনে নিজের ঘরে পায়চারি করছেন, আর বিড় বিড় করে বলছেনঃ 'সন্ন্যাসীকো কোহ পিতা, কোহ মাতা! সন্ন্যাসী নির্মায়া!' এদিকে যাত্রার সময় উপস্থিত—মা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন। অদ্ভুতানন্দের পদক্ষেপ ক্রমেই দ্রুততর, কণ্ঠস্বরও কিছু উচ্চগ্রামে তখন। সেই প্রথম-আগমন-দিনের মতোই, স্নেহময়ী জননী স্বয়ং সন্তানের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে তেমনই করুণাসিক্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'বাবা নাটু! তোমার আমাকে মেনে কাজ নেই, বাবা!' মায়ের এককথাতেই সুবিশাল হিমানীস্তূপ যেন খসে পড়ল! লাটু মহারাজ একেবারে দণ্ডবৎ শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সেবক-সন্তানের চোখের জলে জননীর নয়নেও তখন কী প্রবল অশ্রুবন্যা! লাটু তখন নিজের উত্তরীয় দিয়ে, মায়ের চোখের জল মোছাতে মোছাতে সান্ত্বনা দিচ্ছেনঃ 'বাপঘরে যাচ্ছ মা! কাঁদতে কি আছে? আবার শরোট্‌ তোমায় শীগ্‌গির এখানে নিয়ে আসবে, কেঁদো না মা! যাবার সময় চোখের জল ফেলতে আছে কি?'[১৪] এ মধুর দৃশ্যের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা আমাদের সাধ্যাতীত। উপস্থিত সকলেই সেদিন সেই অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সেবক লাটুর ঐ দরদমাখানো উক্তিতে ভক্তিরাজ্যের এক অমর মহাকাব্য সৃষ্টি হ'তে পারে।

বলরাম-ভবনে উল্লিখিত ঘটনার কালে লাটু মহারাজ প্রতিদিন মায়ের কাছে কেন যেতেন না, এ-রহস্য সমীপবর্তী অনেক ভক্তকেই সংশয়ান্বিত করে তুলত। একদিন

এক ভক্তকে তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেনঃ 'দেখো! মা বলরাম মন্দিরে মাঝে মাঝে আসতেন। হাম্‌নে বাহিরের ঘরে থাকতুম। হামাকে হামেশা লোকে জিজ্ঞেস করতো —"মশায়! মা উপরে রয়েছেন, আপ্‌নি এখানে কেনো?" তাদের বলতুম—"তাতে কি হয়েছে?" হামার মনের ভাব কেউ বুঝতো, কেউ বুঝতো না। কেউ কেউ আবার এ-কথা শুনে চটে যেতো। গালাগালি করতো। হামনে ত একদিন তাদের তাড়া দিলুম —"শালারা কেউ কুছু করবে না কেবল মা-ঠাউন, মা-ঠাউন বলে হুজুগ করবে। হাম্‌নে মানে না তোদের এমন মা-ঠাউনকে।'" কিন্তু কী আশ্চর্যমধুর মাতৃভক্তি! পর-ক্ষণেই আবেগ-জড়ানো কণ্ঠে বলে চললেনঃ 'মাকে মানা কি সহজ কথা রে! তাঁর (ঠাকুরের) পূজা তিনি গ্রহণ করেছেন, বুঝো ব্যেপার! মা-ঠাউন যে কি, তা একমাত্র তিনি বুঝে-ছিলেন, আর কঞ্চিৎ [কিঞ্চিৎ বলতে পারতেন না] স্বামীজী বুঝেছিলো। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে বহুৎ তপস্যার দরকার।' [১৩] কথাগুলির মধ্যে মধ্যাহ্নসূর্যের জ্ঞানদীপ্তি যেমন, আবার ঊষাকালের শিশিরস্নিগ্ধ ভক্তির ব্যঞ্জনাও তেমনই।

অনুরূপ আরও একটি প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। '১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যেদিন "উদ্বোধন অফিস" [তথা "মায়ের বাড়ী"] নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় সেইদিন লাটু মহারাজ সেইখানে গমন করেন নাই। ইহাতে নানা লোকে নানা কথা বলিতে থাকেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"মহারাজ! আপনাকে সেখানে যেতে বললে, আপনি গেলেন না কেন?" তাহাতে লাটু মহারাজ চুপ করিয়া থাকিতেন।...এইরূপ কথাই আর একদিন হইয়াছিল। সেদিন জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"উদ্বোধনে মা রয়েছেন, আপনি সেখানে থাকেন না কেন?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখো! তিনি (শ্রীশ্রীমা) কি কেবল ওখানেই আছেন, এখানে নেই? যেখানে বসে তাঁকে ডাকবো, সেইখানেই তিনি প্রকাশ হবেন। হামি মার কাছে গেলাম না বলে, মা কি হামার পর হয়ে যাবেন?"' [১৪] লাটু মহারাজ শ্রীমাকে কোন চিঠিপত্রাদিও লিখতেন না। কেন লিখতেন না সে সম্পর্কে সেবক স্বামী সিদ্ধানন্দকে একদিন লাটু মহারাজ বলেছিলেনঃ 'তুমি আমার কাছে এতদিন আছ, আমি এত লোককে চিঠি লিখি—তুমি তো জিজ্ঞাসা করতে পার, মাকে কেন লিখি না? কেন লিখি না জান? মা আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব জানছেন। তাঁকে লোক-দেখানো চিঠি লিখে কি হবে? যিনি আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব জানেন, তাঁকে চিঠি দেওয়ার কি দরকার? যারা বোঝে না, তাদের চিঠি দিতে হয়।' তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অনেকে শ্রীমাকে যে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখায় তার মধ্যে মেকি এবং ফাঁকিই ছিল বেশী। তাই কঠোর ভাষায় সেরকম 'তথাকথিত মাতৃভক্ত'দের তিরস্কার করে বলতেনঃ 'বেইমান হস নি।

তোরা ক্ষুদ্র জীব—মার উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি কিছুই নেই, কেবল মুখে মা, মা করিস! অমন মাতৃ-ভক্তি আমি চাই না। তোদের মত মাতৃ-ভক্তি আমার নেই।'[১৭]

কাশীর বিভূতিবাবু[১৮] লিখেছেনঃ "'তোদের মা-ঠাউনকে হামি মানে না"—এই কথা শুনিয়া আমি কেন অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। আশ্চর্য্য হইবারই ত কথা! কারণ এতদিন যাঁর সেবা করিলেন, তাঁকে মানেন না—এ কেমন কথা? পরে বুঝিতে পারিলাম যে, লাটু মহারাজ তাঁহার মাতৃভক্তি ইচ্ছাপূর্বক গোপন করিয়া রাখিতেন। একদিন তিনি বিশ্বনাথের পূজা দিবার জন্য ফুল বিল্বপত্র ইত্যাদি লইয়া বাহির হইলেন। বড় সড়কে আসিয়াই তাঁহার কেমন খেয়াল হইল, আমায় বললেন—"চলো, আগে মার কাছে যাই।" আমরা সকলে ত কিরণবাবুর বাড়ীর দিকে চললেম। দোতলায় মার ঘরের সামনে আসিয়া লাটু মহারাজ কেমন যেন হইয়া গেলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সেই সময় মা তাঁর সেবকের মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। এই দৃশ্যটি অতীব মনোরম। সেদিন মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তবে বিশ্বনাথের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন।'[১৯] ঘটনাটি সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

স্বামী যোগানন্দের শেষ অসুখের সময় তাঁর সেবার জন্যে শ্রীশ্রীমা তাঁর স্ত্রীকে আনিয়েছিলেন। যখন তাঁকে নিয়ে আসার কথা হচ্ছে সেই সময় একদিন স্বামী যোগানন্দকে দেখতে গিয়েছেন লাটু মহারাজ। দুজনের কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

স্বামী যোগানন্দ—'...একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি—এসব যোগাড়যন্তর জোরে দেবার জন্য মা ওকে (অর্থাৎ যোগীন স্বামীর স্ত্রীকে) আনাতে বলছেন। তোর কি মত? সন্ন্যাসী হোয়ে শেষে পরিবারের সেবা নিতে হবে? এতে আমি মত দিতে পারছি নি। আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না।'

লাটু মহারাজ—'আরে! রেখে দাও লোকের কথা—ওরা সব বলে। ওদের কথায় দোষ হবে না।'

স্বামী যোগানন্দ—'না রে না; তুই বুঝছিস নি। এতে লোকেরা বলবে কি জানিস্? ঠাকুরের সেবকেরা সন্ন্যাস নিয়েও মাগের সেবা নেয়। একথা উঠতে দেওয়া ভাল নয়।'

লাটু মহারাজ—'আরে! রেখে দাও লোকের কথা—ওরা সব বলে। ওদের কথায় কী আসে যায়? ধর্মে যদি কেউ খাঁটি থাকে, ওরা হৈ হৈ করলে কি হবে? ওদের কথা বিশ্বাস করবে কে? তুমি ভাই, মায়ের কথা শুনে তাকে আনাও।'[২০]—সন্ন্যাসীর জন্যে নির্দিষ্ট প্রচলিত সমস্ত বিধি-নিয়মের উপরে ছিল লাটু মহারাজের কাছে শ্রীমায়ের নির্দেশ, ঘটনাটি তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

সেবক অদ্ভুতানন্দের অনন্যসাধারণ দৃষ্টি—যে দৃষ্টিতে তিনি জগন্মাতাকে অহর্নিশ সর্বত্র দেখতেন, এবং সেই সর্বব্যাপিনীর সেবা করতেন, আমাদের কাছে তা ধ্যানেরই বিষয়। মনে পড়ে লাটু মহারাজের মুখের সেই মিষ্টি ভাষায় 'আমার সেই

দক্ষিণেশ্বরের মা' কথা কটিতে কী দূরস্পর্শী ভাবদ্যোতনা! এমন হৃদয়-নিংড়ানো কণ্ঠে তা তিনি বলতেন যে, যারাই কাছে থেকে শুনত তারাই মাতৃভাবের সহজ-স্বাভাবিক হর্ষে আপ্লুত হয়ে যেত। যখন তিনি কাশীতে থাকতেন, তখন একবার ওদিক থেকে জনৈক ভক্ত কলকাতা আসছে জেনে তার হাতে শ্রীমায়ের সেবার জন্য কাশীর বেগুন, পেয়ারা ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন এবং শ্রীমাকে জানাতে বলেছিলেনঃ 'আমার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা।'[২১] শ্রীমাকে সন্তানের ঐ কথা বলা হলে তিনি একটু মুচকি হেসেছিলেন। ঐ হাসির গভীরতা এবং সন্তানের ঐ সামান্য কথাটির মর্মব্যঞ্জনা সাধারণের পক্ষে কতটুকু আর বোধগম্য হবে? আবার মাতৃবলে বলীয়ান অদ্ভুত সন্তানের দৃঢ়বিশ্বাস-ব্যঞ্জক অভিমান-প্রকাশও কী অনবদ্য! দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য—বরাহনগর মঠে একদিন সকালে ঠাকুরের বাল্যভোগের জন্য হালুয়া তৈরী করতে গিয়ে শশী মহারাজ দেখেন—কড়া অপরিষ্কার। লাটু মহারাজ ঐ কড়াতে ছোলা সিদ্ধ করে রেখেছিলেন—আবার পরিষ্কার করে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন সম্ভবত। ঠাকুরের সেবাপ্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও শশী মহারাজের পক্ষে অসহনীয় ছিল। অধৈর্য শশী মহারাজ সেদিন লাটু মহারাজকে এইরকম অমনোযোগের জন্য বেশ কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন। ক্ষুব্ধ লাটু মহারাজ তাতে শশী মহারাজকে অভিমানভরে জবাব দিয়েছিলেনঃ 'হামি মাকে পত্র দিব; তোমার বাবা-মা, আউর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে?'[২২]

বর্তমান যুগে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মা-সারদার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে লাটু মহারাজ মনে করতেন। তাঁর মুখে তাই প্রায়ই শোনা যেতঃ 'তোমরা সীতা, সাবিত্রী, গার্গীকে আদর্শ কর এবং এ যুগে শ্রীমাকে আদর্শ কর। মা আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন। দেখছ না, মাকে জানবার জন্য আমি কতো তপস্যা করছি? মা কি আমার সোজা জিনিস্? তোমরা মাকে আদর্শ কর।'[২৩]

একদিন সেবকের প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলেছিলেনঃ 'মাকে কি মনে করি, জিজ্ঞাসা কচ্ছো?—তিনি মা লক্ষ্মী, আবার কখনও তিনি সীতা।'[২৪] গভীর এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সেবকের কাছে শ্রীমায়ের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকে তিনি এভাবে উন্মোচন করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই শ্রীমায়ের সম্পর্কে নীরবতাই কঠোর-ভাবে পালন করে এসেছেন সারাজীবন। তাঁর মনের একান্ত ভাবটি ছিল, সাধক কবির ভাষায়ঃ

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

তাঁর নীরবতার কারণও তিনি উল্লেখ করেছিলেন এইভাবেঃ 'আমি মার কথা যেখানে-সেখানে বলি না, ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা বলে থাকি। সকলে বুঝবে না, উল্টো বুঝবে, তাই।'[২৫] আর একবার বলেছিলেনঃ 'মাকে চিরদিনই মার মতই দেখতাম। মা আমাদেরই মা, এতে আর সন্দেহ কি আছে?'[২৬]

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম পর্বে স্বামী যোগানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও লোকব্যবহারে সামঞ্জস্য অনুসন্ধানে উৎসুক ছিলেন। একদা সেই ঔৎসুক্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের অলৌকিক সম্পর্কের উপরেও ছায়া বিস্তার করেছিল। সেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে রাত্রিযাপন করেছিলেন। রাত্রিতে একসময় তিনি দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যা শূন্য। ঘরের দরজা খোলা। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে স্বামী যোগানন্দ কোথাও ঠাকুরকে দেখতে পেলেন না। এত রাত্রে তাহলে তিনি কোথায় গেলেন?—স্বামী যোগানন্দের মনে এক দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হল। নিকটেই নহবতে শ্রীমা থাকেন। স্বামী যোগানন্দ ভাবলেন, ঠাকুর কথায় যা বলেন, কাজে কি তবে তার বিপরীত অনুষ্ঠান করে থাকেন?[২৭] পরের ঘটনা স্বামী যোগানন্দের নিজের ভাষাতেই উল্লেখ করিঃ 'ঐ চিন্তার উদয়মাত্র সন্দেহ ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হয়ে পড়লুম। পরে স্থির করলুম, নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ হলেও যা সত্য তা জানতে হবে। অনন্তর নিকটবর্তী একস্থানে দাঁড়িয়ে নবতখানার দ্বারদেশ লক্ষ্য করতে থাকলুম। কিছুকাল ওরূপ করতে না করতে পঞ্চবটীর দিক থেকে চটিজুতার চট চট শব্দ শুনতে পেলুম এবং অবিলম্বে ঠাকুর এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে বললেন, "কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?" তাঁর উপরে মিথ্যা সন্দেহ করেছি বলে লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলুম, ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারলুম না। ঠাকুর আমার মুখ দেখেই সকল কথা বুঝতে পারলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না করে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি"।'[২৮] শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর সন্দেহের যবনিকা অপসারিত হল চিরকালের মতো। আবার ঐ একই সময়ে আর এক অলৌকিক চিত্রদর্শনের ফলে শ্রীমায়ের জীবন ও চরিত্রের মহিমার স্বরূপ স্বামী যোগানন্দের দৃষ্টির সম্মুখে সহসা উন্মোচিত হল। সে-সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর দিক হইতে আসিতেছিলেন, তখন যোগীনের দৃষ্টি নহবতের উপর দিকে সহসা আকৃষ্ট হইলে তিনি দেখিলেন, চন্দ্রালোকে মা সমাধিস্থা, আর তাঁহার এই অনুভূতি হইল যে, মা সাধারণ মানবী নহেন। সম্ভবতঃ সেইদিন হইতেই যোগীন প্রকৃত মাতৃভক্ত হইয়াছিলেন এবং ভক্তির প্রেরণায় ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে স্বীয় জীবন প্রধানতঃ মাতৃসেবায়ই নিয়োগ করিয়াছিলেন।'[২৯] পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠজনের কাছে এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে স্বামী যোগানন্দের কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হয়ে আসত। তিনি বলতেনঃ 'ঠাকুর এবং মায়ের সেই ছবি আমার স্মৃতিতে সব সময় জাগরূক আছে। সেদিন আমি বুঝেছিলাম যে, তাঁরা উভয়েই দৈব সত্তা নিয়ে জন্ম-

গ্রহণ করেছেন। মানুষের প্রতি করুণায় তাঁদের নরশরীর গ্রহণ।'[৩০] সেদিনের সেই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল বাসের সুবাদে শ্রীমায়ের সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠেছিল। তিনি বলতেন: 'শ্রীমায়ের উপদেশ এবং শিক্ষা সবই তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকেন্দ্রিক—কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থ নির্ভর নয়। বর্তমান যুগের জটিল বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেও কিভাবে পবিত্র ও সংঘাতহীন সহজ জীবন যাপন করা সম্ভব, ঠাকুর এবং মা উভয়েই তা পৃথিবীকে দেখিয়ে গেলেন।'[৩১] প্রথম জীবনে অশুভ সন্দেহের বশে যে 'ভয়ানক অপরাধ' তিনি করেছিলেন তার জন্যে শুধু সে রাত্রিতেই নয়, জীবনে কোন দিনই তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: '[ঐ ঘটনার পর] গুরুপদে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রথমে তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের], এবং তাঁহার অন্তর্ধানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেবাতে প্রাণপাত করিয়া স্বামী যোগানন্দ পরজীবনে পূর্বোক্ত অপরাধের সম্যক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।'[৩২] বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পরে, শ্রীশ্রীমায়ের সেবাভার মুখ্যত যোগীন মহারাজই শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন এবং আজীবনই তিনি সে-ভারকে পরম গৌরবের সঙ্গে সাহ্লাদে বহন করেছেন। যোগীন মহারাজ বা স্বামী যোগানন্দকে সেবা-পরিতৃপ্তা শ্রীমা তাঁর 'ভারী' বলে নির্দেশ করতেন।[৩৩] যোগীন কেবল শ্রীমায়ের সেবাধিকারেই ধন্য হননি—পক্ষান্তরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষালাভেও কৃতকৃতার্থ ছিলেন। যোগীনই শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বপ্রথম। শ্রীশ্রীমা নিজমুখেও পরবর্তীকালে বলেছিলেন: 'ছেলে যোগেন হ'তে আমার দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়।'[৩৪]

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমরা তাঁর সেবানিরত যোগীনকে, ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত, নানা জায়গায় দেখেছি—কলকাতার কাশীপুরে, বলরাম-ভবনে, পুরীধামে, আঁটপুরে, কামারপুকুরে, জয়রামবাটীতে, কলকাতায় মাস্টারমশায়ের বাড়িতে, ঘুসুড়ির ভাড়াবাড়িতে, বেলুড়ের নীলাম্বরবাবুর বাগানে, বরাহনগরে সৌরীন ঠাকুরের বাড়িতে, কৈলোয়ারে, কাশীধামে, বৃন্দাবনে, কলকাতার বাগবাজারে 'গুদামওয়ালা' বাড়িতে এবং বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে। জয়রামবাটী-কামারপুকুরে যোগীন দীর্ঘকাল না থাকতে পারলেও, কলকাতায় ও বেলুড়ে তিনিই মায়ের প্রধান সেবকের ভূমিকায় থাকতেন এবং মায়ের তীর্থযাত্রাতেও ছায়াসদৃশ অনুসরণকারী ছিলেন।

শ্রীমা বলতেন: 'শরৎ আর যোগীন এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।'[৩৫] এই অন্তরঙ্গতা কত গভীর ছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া সম্ভব, যদি আমরা মাকে ও তাঁর যোগীনকে কখনও অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় অবলোকনের সুযোগ সন্ধানে প্রয়াসী হই। এক অলৌকিক চিত্রকে আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি। শ্রীমা তখন

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে রয়েছেন। মায়ের স্বভাবসিদ্ধ ধ্যান-তন্ময়তা একদিন সকলকেই বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। মায়ের ধ্যান সেদিন ক্রমে গভীর সমাধিতে পরিণত হওয়ায়, বাহ্যচেতনার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। এমনকি যোগীন-মা স্বয়ং অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও মায়ের সমাধি ভঙ্গ করতে বিফল হয়েছিলেন। অগত্যা 'ছেলে যোগেন' এসে মাতৃ-কর্ণে কোন বিশেষ মন্ত্র শোনানো-মাত্রই মা যেন কোন্ দিব্যলোক থেকে নেমে এলেন। সমাধি থেকে ব্যুত্থানের লক্ষণ দেখে সবাই আশ্বস্ত হলেন। অবিকল শ্রীরামকৃষ্ণেরই মতো, মায়ের তখনকার হাবভাব সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল। সমাধি থেকে নামার মুখে, ঠাকুর যেমনটি বলতেন, মা-ও ঠিক তেমনই আবেগ-জড়ানো অস্ফুট কণ্ঠে বললেনঃ 'খাব।' কিছু খাদ্য, জল ও পান মুখের সামনে ধরলে, ঠাকুরেরই অনুরূপ ভঙ্গিতে মা তা গ্রহণ করেন। এমনকি পানের খিলির সরু দিকটা দাঁতে কেটে ফেলে দিয়ে তবে খেলেন। বিস্ময়ের মধ্যেও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, তখন যোগীন মহারাজই মাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে দুঃসাহসী হয়েছিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাবিষ্টা মা-ও ঠিক ঠাকুরের মতোই সেবক-সন্তানের সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।[৩৬] ঘটনাটি বহু দিক থেকেই অসামান্য। সেব্য-সেবকের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য তো বটেই।

শ্রীমায়ের সম্পর্কে যোগীন মহারাজের উক্তি বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু যোগীন মহারাজ সম্পর্কে শ্রীমায়ের স্নেহজ্ঞাপক উক্তি ও ঘটনার সংখ্যা অনেক। সেগুলি থেকেই জানা যায় যোগীন মহারাজ শ্রীমাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন। সুতরাং সেব্য-সেবকের অপরূপ সম্পর্কের উপর আলোকপাতকারী সেই উক্তি ও ঘটনাগুলি এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বামী যোগানন্দের মাতৃগতপ্রাণতার মূল্যায়ন আমাদের ভাষায় সম্ভবপর নয়। শ্রীমা উত্তরকালে বলতেনঃ 'যোগীনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার ভার কি সকলে নিতে পারে? পারতো যোগীন, আর পারে শরৎ।'[৩৭] এ-উক্তি অনন্যসাধারণ। মায়ের হৃদয়-নিংড়ানো ভাষায় এমন আরও কত উক্তি আছে! যেমন বলতেনঃ 'ছেলে-যোগেন আমার খুব সেবা করেছে; তেমনটি আমার কেউ করতে পারবে না। পারে কেবল শরৎ [স্বামী সারদানন্দ]।'[৩৮] স্বামী যোগানন্দের মাতৃ-অনুরক্তি কত সহজ ও মর্মস্পর্শী ছিল, তা তাঁর জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর মধ্যেও সতত পরিস্ফুট হত। কেউ তাঁকে ভালবেসে দু-চারটি মাত্র পয়সা দিলেও, তিনি তা নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না করে জমিয়ে রাখতেন—যাতে মায়ের সেবায় তা কাজে লাগে অথবা মা তীর্থাদিতে গেলে ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন। এইভাবে যোগীন মহারাজ মায়ের জন্য মোট ছয়শ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। শ্রীমা তাই বলতেনঃ 'যোগীনের মত আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার যোগীনকে যদি কেউ আট আনা পয়সা দিত, সে রেখে দিত; বলত "মা তীর্থে টীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন"।'[৩৯] শ্রীশ্রীমা প্রতিবারেই জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে পূজার বেশ কিছুদিন আগে জয়রামবাটীতে যেতেন—দেবী-পূজার বাসনাদি নিজহাতে মেজে-ঘষে প্রস্তুত

রাখবার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করবার জন্য। মায়ের এই কায়িক শ্রম এবং মানসিক উদ্বেগ সন্তানের বক্ষে দারুণভাবে বাজত। তাই কিছু অর্থ হাতে সঞ্চয় হওয়ামাত্রই, তা দিয়ে পূজার বাসনের বিকল্প হিসাবে কাঠের বারকোশ ইত্যাদি যথেষ্ট সংখ্যায় তৈরী করিয়ে মাকে তিনি বলেছিলেন: 'তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।' শুধু তাই নয়, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার স্থায়ী ব্যয়নির্বাহের জন্য এবং মাকে ঐ-ব্যাপারে সর্বতোভাবে চিন্তামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে স্বামী যোগানন্দ তিনশত টাকায় তিন বিঘা জমিও কিনে দিয়েছিলেন।[৪০] এখানে আরও স্মরণযোগ্য যে, জয়রামবাটীতে মামাদের সাংসারিক অসচ্ছলতাও মাকে নানাভাবে পীড়া দিত—যোগীনের দৃষ্টি তাই সেদিকেও তীক্ষ্ম ছিল। মামাদের অন্যতম অভয়ের পড়াশোনার অধিকাংশ ব্যয়ও স্বামী যোগানন্দই বহন করতেন।

স্বামী যোগানন্দ শ্রীমাকে কোনদিনই মানবীরূপে দেখেননি ; তাঁর মধ্যে তিনি দেখতেন দেহধারিণী স্বয়ং আদ্যাশক্তিকে। তাই তাঁর সেবাও সাধারণ সেবকের দৃষ্টিতে হত না ; তাঁর সেবার প্রতিটি খুঁটিনাটি অঙ্গও ছিল জগজ্জননীর অনন্যসাধারণ উপাসনা। স্বামী সারদানন্দ বলতেন: 'যোগীন মহারাজ কখন মাকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করতেন না। মা চলে গেলে সে স্থান হতে ধূলি নিয়ে মাথায় দিতেন।'[৫১] স্বামী সারদানন্দ একবার তাঁকে বলেছিলেন: 'যোগীন, নরেনের সব কথা তো বুঝতে পারি না ; কত রকম কথা বলে—যখন যেটাকে ধরবে তখন সেটাকে এমন বড় করবে যে, অপরগুলো একেবারে ছোট হয়ে যায়।' প্রিয় গুরুভ্রাতার এমন অকপট সরল উক্তির জবাবে, যোগানন্দ সেদিন তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন: 'শরৎ, তোকে একটু কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর, তিনি যা বলবেন তাই ঠিক।' শুধু পরামর্শই নয়, স্বামী যোগানন্দ সেদিন তাঁকে সরাসরি মাতৃসকাশে নিয়েও গিয়েছিলেন।[৫২]

স্বামী যোগানন্দ বিশ্বাস করতেন, মানুষের কল্যাণের জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীমায়েরও শরীরধারণ। তাই শ্রীমায়ের ভাগবতী তনুর রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সদাসচেতন। স্বামীজী শ্রীমাকে কেন্দ্র করে তাঁর স্ত্রী-মঠের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন এবং যে-কোন প্রতিবন্ধক, তা যতই কঠিন হোক না কেন, তিনি অক্লেশে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন। একমাত্র স্বামী যোগানন্দের যুক্তিতেই স্বামীজী এব্যাপারে নিরস্ত হয়েছিলেন। স্বামীজীর কাছে যোগানন্দ যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায়, স্বামী যোগানন্দ শ্রীমাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন। স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে বলেছিলেন: 'সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যা তুমি ভাল মনে কর তা নিশ্চয়ই করবে ; কিন্তু এ-বিষয়ে

তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। তা হল এই যে. মাকে এখন লোক-সমক্ষে নিয়ে এসো না। তোমার কি মনে নেই, ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে সাধারণের কাছে. প্রচার করলে তাঁর শরীর থাকবে না? ঠিক ঐ একই কথা মায়ের সম্পর্কেও খাটে। আমি সবাইকে মায়ের কাছে যেতে দিই না বা তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতে দিই না। আমি দেখি যাতে কেবলমাত্র যথার্থ এবং পবিত্র-মনা ভক্তরাই তাঁর দর্শন পায়। তাই ভাই তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, মাকে তুমি এখন এসবের মধ্যে এনো না।'[৪৩]

শ্রীমায়ের একজন প্রখ্যাত জীবনীকার লিখেছেনঃ 'মায়ের সেবার ফলে পূতচরিত্র যোগানন্দজীর মনে এরূপ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, এককালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া মায়ের কৃপায় অবিকম্পিতপদে অনন্যসাধারণ পথে চলিতে সাহস পাইয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথম বারে বিদেশ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিলেন যে, যোগীনের সহিত মায়ের সেবায় একজন ব্রহ্মচারীও নিযুক্ত রহিয়াছেন. তখন তিনি এই বিষয়ে স্বামী যোগানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণান্তে জানিতে চাহিলেন. "মায়ের নিকট বহু প্রকারের লোকের আনা-গোনা আছে : সেখানে ব্রহ্মচারীর মন নিম্নগামী হইলে দায়ী হইবে কে?" যোগানন্দ সদর্পে বুকে হাত রাখিয়া উত্তর দিলেন. "আমি।" সেবক যোগানন্দের এই "আমি"র পশ্চাতে কাঁহার অদৃষ্ট শক্তি প্রেরণা জাগাইয়াছিল, তাহা খুলিয়া বলিতে হইবে কি?'[৪৪]

খুবই স্বল্পায়ু জীবনের শেষ দ্বাদশ বর্ষ শ্রীমায়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন যোগীন মহারাজ। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার মাত্র কিছুকাল বাদেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। শেষের দিন যখন আসন্ন. সেই সময় শ্রীমায়ের জনৈক সেবক একদিন উপরে পূজার ফুল দিতে গিয়ে দেখেন শ্রীমা নিজ কক্ষে পশ্চিমাস্যা হয়ে পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে আছেন আর তাঁর গণ্ডযুগল বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সেবক বুঝলেন কেন শ্রীমা কাঁদছেন। নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে তাই তিনি তাঁকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন। শ্রীমায়ের কাছ থেকে কোন উত্তর শোনা গেল না। কিছুক্ষণ পরে অধীরভাবে সেবককে প্রশ্ন করলেনঃ 'আমার ছেলে যোগেনের কি হবে. বাবা?' সেবক উত্তর দিলেনঃ 'ভাবছেন কেন, মা. সেরে যাবেন বৈ কি।' কিন্তু মা বললেনঃ 'আমি যে দেখেছি. বাবা...ভোর বেলা দেখলুম, ঠাকুর নিতে এসেছেন।' বলেই মা কেঁদে ফেললেন। পরক্ষণেই আবার সেবককে সতর্ক করে বললেনঃ 'কাউকে বলো না—বলতে নেই।' বললেনঃ 'যোগেন যে আমার ছেলে—সারদা [স্বামী ত্রিগুণাতীতা-নন্দ] যেমনটি. যোগেনও তেমনটি।'[৪৫] ২৮ মার্চ, ১৮৯৯, বিকেলবেলায়. মাতৃভক্ত মহাযোগী মাতৃঅংকে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করেন। সন্তানের অন্তিমক্ষণে মা দোতলায় নিজের ঘরে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের সময়েও যিনি অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই চিরলজ্জাশীলা শ্রীমা চীৎকার করে সন্তান-বিরহে আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ঐ সেবক লিখেছেনঃ 'ইতিপূর্বে কখনও শ্রীমাকে

চেঁচাইয়া কথা কহিতেও শুনি নাই। আজ তাহার ব্যতিক্রম হইল। তাঁহার আর্ত-নাদে ব্যথিত হইয়া গিয়া শ্রীচরণ দুইটি জড়াইয়া চুপ করিতে অনুনয়-বিনয় করিলাম। কোন ফল ফলিল না। তিনি ভৎর্সনা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যাও, যাও, আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল—কে আমায় দেখবে?"'[৪৬] পরদিন শোকাকুলা শ্রীমাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলতে শোনা গেলঃ 'বাড়ির একখানি ইট খসল।'[৪৭]

যোগানন্দের চিরসমাধিতে শ্রীমা কতখানি আকুল হয়েছিলেন, তা আমরা ভাল-ভাবে অনুভব করতে পারি, ভগিনী নিবেদিতার লেখা তৎকালীন দু-একখানা পত্র থেকে। ওলি বুলকে ভগিনী লিখেছিলেনঃ 'যোগানন্দ মঙ্গলবার মারা গেছেন। শ্রীমায়ের উপর নিদারুণ আঘাত।'[৪৮] আরও একখানি আবেগময়ী পত্রে নিবেদিতা ঐ ওলি বুলকেই জানাচ্ছেনঃ 'যোগানন্দের মৃত্যু শ্রীমা ও যোগীন-মার কাছে দারুণ বেজেছে। মৃত্যু কথাটি শ্রীমা যেন সইতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা। "জানি জানি সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সে কথা জানি আমি—কিন্তু সে যে আমার যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন"!'[৪৯]

স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'স্বামী যোগানন্দের প্রত্যেক স্মৃতিটি মায়ের নিকট অতি প্রিয় ছিল। যোগানন্দ মহারাজ তাঁহাকে একখানি লেপ করাইয়া দিয়া-ছিলেন। দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে উহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীমা একদিন শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষকে বলিয়াছিলেন, তুলাটা পিঁজাইয়া এবং খোল বদলাইয়া যেন লেপখানিকে নূতন করিয়া আনা হয়। কিন্তু একটু পরেই মায়ের মনে হইল, এরূপ করিলে প্রিয় সন্তানের প্রদত্ত জিনিসটির রূপ বদলাইয়া যাইবে ; সে স্মৃতিরও বিকৃতি ঘটিবে ; কথাটা ভাবিতেও যেন তাঁহার মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল ; তাই সংশো-ধন করিয়া বলিলেন, "না, বিভূতি, লেপটা নিয়ে গিয়ে কাজ নেই! এ লেপ যোগেন দিয়েছিল—দেখলেই তাকে মনে পড়ে।"'[৫০]

॥ ৩ ॥

স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে[৫১] শ্রীমায়ের সেবার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তাঁর আমেরিকা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত[৫২]—তিনবছরের কিছু বেশী সময়—পরম ভক্তি, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁর সেই গুরুদায়িত্ব তিনি সম্পাদন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে—তখন অবশ্য তিনি সারদাপ্রসন্ন মিত্র—নহবতে শ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেসময় শ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপকে এই বলে তিনি সারদাপ্রসন্নের কাছে আভাসিত করতে চেয়েছিলেনঃ

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥ [৫৩]

এই কথার তাৎপর্য সেদিনই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন কি? সম্ভবত পারেননি। কারণ লাটু মহারাজ বলেছেনঃ '[স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ] প্রথম প্রথম (শ্রীশ্রী) মাকে মানতো না, শেষে মাকে মেনেছিলো।' [৫৪] পরবর্তীকালে তাঁর নানা আচরণে শ্রীমায়ের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টির যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় শ্রীমায়ের ঐশী মহিমা সম্বন্ধে তিনি তখন নিঃসন্দেহ ছিলেন। শ্রীমাকে চিঠিতে তিনি 'মা ব্রহ্মময়ী' বলে সম্বোধন করতেন। [৫৫] কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'চণ্ডী'র অনুসরণে শ্রীমায়ের সম্পর্কে সংস্কৃতে একটি দীর্ঘ স্তোত্র রচনা করেছিলেন। স্তোত্রটির একটি প্রতিলিপি তিনি কুমুদবন্ধু সেনকে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকদিন ভোরে সেটি তাঁকে আবৃত্তি করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। [৫৬] হয়ত তিনি নিজেও প্রত্যহ তাই করতেন।

উদ্বোধনের ১ম বর্ষের (১৩০৬) ১৮শ সংখ্যায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে 'আনন্দময়ীর আগমন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখছেনঃ 'মেধস ঋষি সুরথ রাজাকে বলিতেছেনঃ

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ সেই জগন্মূর্তিস্বরূপ সর্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই ভক্তদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে [পৃথিবীতে] আবির্ভূত হন। যখন এইরূপে আবির্ভূত হন, তিনি নিত্য হইলেও তখন তাঁহাকে "উৎপন্ন" অথবা "অবতার" বলা যায়।' [৫৭]

কথাগুলি লেখার সময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের মানসনেত্রে কি শ্রীমায়ের মূর্তিটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি?

শ্রীমায়ের প্রতি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অসাধারণ ভক্তির নিদর্শন হিসেবে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর শ্রীমা কলকাতা থেকে বর্ধমানের পথে জয়রামবাটী অভিমুখে যাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন সেবক সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)। ঘটনাটির বিবরণ শ্রীমায়ের মুখে শুনে শ্রীমায়ের একসময়ের অন্যতম সেবক লিখেছেনঃ 'দামোদর পার হইয়া শ্রীমা পাল্কী অভাবে গরুর গাড়ীতে চলিয়াছেন আর সারদা মহারাজ লাঠি কাঁধে গাড়ীর আগে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। রাত্রিকাল—অর্ধরাত্রির উপর—প্রায় তৃতীয় প্রহর—শ্রীমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সারদা মহারাজ চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন, রাস্তার খানিকটা একস্থানে বানের জলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সেখানে এমন একটা খানা পড়িয়াছে যে,

সেখান দিয়া গাড়ী যাইবার আদৌ উপায় নাই। যাইতে গেলে গাড়ীর চাকা সেখানে পড়িয়া ভাঙিগয়া যায় এবং ঝাঁকড়ানিতে শ্রীমার নিদ্রা ত ভাঙিগয়া যাইবেই অধিকন্তু তাঁহার আহত হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে গাড়ীখানি অনায়াসে যায় এবং শ্রীমার নিদ্রাও না ভঙ্গ হয়, এরূপ একটা উপায়স্বরূপ মতলব আঁটিয়া নিজে উপুড় হইয়া ঐ খানায় শুইয়া পড়িলেন, কেহই জানিতে পারিল না. তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহার স্থূল শরীরের উপর দিয়া গাড়ীখানি যাইতে পারিবে। উদ্দেশ্য অবশ্য তাঁহার মহৎ ছিল. কিন্তু একবার ভাবিলেন না যে, ঐরূপ করায় তাঁহার মৃত্যু ত অনিবার্য— অধিকন্তু সেই জনমানবহীন স্থানে এবং গভীর নিশাকালে তিনি ব্যতীত শ্রীমাকে কে দেখিবে—কে শ্রীমার রক্ষণাবেক্ষণে মোতায়েন হইবে?—তিনি যে সে ভার লইয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।

'একটা কথা আছে—ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গাড়ীখানি খানার নিকটবর্তী হইলে শ্রীমার অকস্মাত নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় চন্দ্রালোকে তিনি দেখিতে পাইয়া ব্যাপারটা সব বুঝিলেন। চীৎকার করিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলেন এবং সারদা মহারাজকে তাঁহার কৃতকর্মের জন্য যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া হাঁটিয়া খানাটি পার হইলেন। গাড়ীও খালি হওয়ায় উহা নির্বিঘ্নে পার হইয়া আসিল—অবশ্য সারদা মহারাজকে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। পরবর্তীকালে শ্রীমা সারদা মহারাজের নিষ্ঠা ও গুরুভক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া এই গল্পটি আমাদের নিকটে করেন।'[৫৮]

এক হিসাবে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের এই আচরণ হঠকারিতা। কিন্তু এই 'হঠকারিতা'র মূলে শ্রীমায়ের প্রতি তাঁর যে ভক্তি ও ভালবাসা আমরা লক্ষ্য করি তা তুলনাহীন। আশুতোষ মিত্র শ্রীমায়ের প্রতি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপূর্ব ভক্তির আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'গোলাপ-মা একদিন শ্রীমার সমক্ষে বসিয়া সারদা মহারাজের বিষয় গল্প করেন—"যোগেন (যোগীন মা) একবার মার বাড়ীর জন্যে সারদাকে বেশ ঝাল দেখে লঙ্কা আন্‌তে বলেছে। সারদা বাগবাজার থেকে আরম্ভ ক'রে সব দোকানে যায় আর লঙ্কা চাখে—ঝাল কি না? ঐ রকমে চাখতে চাখতে ঝাল না পেয়ে বড় বাজারে গিয়ে হাজির। সেখানে ঝাল পেয়ে দু পয়সার লঙ্কা কিনে নিয়ে আসে। ততক্ষণে তার জিভ ফুলে ঢোল।—বাবা, কি গুরুভক্তি"!'[৫৯]

শ্রীমা যখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে ছিলেন তখন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সেবক হিসেবে শ্রীমায়ের কাছে ছিলেন। সেসম্পর্কে শ্রীমা স্বয়ং বলেছেন: '"এ বাড়িতে আমি যখন ছিলুম, তখন সারদা আমার কাছে থাকত। সে করত কি, তা জান?" আমরা শুনিতে আগ্রহান্বিত হইলে অঙ্গুলি দ্বারা ঠাকুরের ভাণ্ডার ঘরের পশ্চিমদিকে দেখাইয়া বলিতে থাকেন—"ওখানে একটা শিউলি গাছ আছে কি?" আমরা বলিলাম, "হ্যাঁ, মা, আছে।"

'শ্রীমা—"রোজ সন্ধ্যেবেলা একখানা চাদর কেচে শুকিয়ে রাখত। রাতে শুতে যাবার সময় চাদরখানা ঐ গাছতলায় বিছিয়ে রাখত। ভোরে উঠে ফুল তোলবার সময়

চাদরখানা গুটিয়ে তার উপর যত ফুল পড়ত, সব নিয়ে আমার পুজোর জন্যে সাজিয়ে রাখত। শিউলিফুল শেষ রাত্তিরে ঝরে কি না, তাই পাছে নোংরা মাটিতে পড়ে অশুদ্ধ হয় সেজন্য ওরকম করত। কি নিষ্ঠা—দেখলে?"'[৬০] স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেনঃ 'কলিকাতা ও জয়রামবাটীতে তিনি [সারদা মহারাজ] অন্য বহুভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছেন।'[৬১] ত্রিগুণাতীতানন্দজী তাঁর ইহজীবনের শেষ বারো বছর ছিলেন আমেরিকায়। প্রবাসে তিনি সর্বদাই শ্রীমাকে স্মরণ করতেন। প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে শ্রীমাকে পাঠাতেন কিছু প্রণামী। তাঁর চোখে শ্রীমা শুধু জননী এবং গুরুই ছিলেন না, ছিলেন 'ব্রহ্মময়ী'—লীলাবিগ্রহধারিণী স্বয়ং আদ্যাশক্তি।

॥ ৪ ॥

শ্রীমা বলেছেনঃ 'ছেলে যোগেনের পর থেকেই শরৎ [আমার সেবা] করছে।'[৬২] দেহত্যাগের বহু পূর্বেই স্বামী যোগানন্দ শরৎ মহারাজ বা স্বামী সারদানন্দকে মাতৃ-সমীপে নিয়ে গিয়ে তাঁর উপর সেই মহান উত্তরাধিকার ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন বলা চলে। অবশ্য স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের (২৮ মার্চ, ১৮৯৯) ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের সেবাভার গ্রহণের কার্যে ব্রতী হতে পারেননি। স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের সময় তিনি স্বামীজীর আদেশে প্রচার ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে পশ্চিমভারতে গিয়েছিলেন। তার পর মঠে ফিরে এসে তাঁকে মঠ-মিশনের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ঐসময়ে শ্রীমায়ের সেবায় মূলত ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল (সন্ন্যাস-জীবনে স্বামী ধীরানন্দ) নিযুক্ত ছিলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের উপর শ্রীমায়ের সেবার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকা যাত্রা করার পর ক্রমে স্বামী সারদানন্দের উপরেই শ্রীমায়ের সেবা-ভার এসে পড়ে এবং তদবধি শ্রীমা যতদিন মরদেহে বর্তমান ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন মায়ের প্রধান সেবক। শ্রীমা বলতেনঃ 'শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।'[৬৩] বলতেনঃ 'আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি। সে আমার বাসুকি, সহস্রফণা ধরে কত কাজ করেছে, যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।'[৬৪]

কলকাতায় থাকলে শ্রীমা শরৎ মহারাজের উপর এত নির্ভর করতেন যে বলতেনঃ 'শরৎ যে কদিন আছে, সে কদিন আমার ওখানে [কলকাতায়] থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না।'[৬৫] একবার, শরৎ মহারাজ তখন কাশীতে, শ্রীমায়ের কলকাতা যাবার কথা উঠলে তিনি (শ্রীমা) বললেনঃ 'শরৎ কলকাতায় না থাকলে আমার সেখানে যাবার কথা উঠতেই পারে না। কার কাছে যাব? আমি সেখানে আছি, আর শরৎ যদি বলে, "মা, কয়েকদিন অন্যত্র যাচ্ছি", তাহলে আমি বলব, "একটু থাম, বাবা, আমি আগে এখান থেকে পা বাড়াই, তারপর তুমি যাবে।" শরৎ

'ছাড়া আমার ঝক্কি কে পোয়াবে?'[৬৬] শরৎ মহারাজ তাঁর উপর মায়ের ঐ নির্ভরতার কথা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাই শ্রীশ্রীমা কলকাতায় থাকলে বা শীঘ্র তাঁর কলকাতায় আসার সম্ভাবনা থাকলে তিনি অন্যত্র যেতেন না।[৬৭]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন পায়চারি করতে করতে সহসা যুবক শরতের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হন। কয়েক মুহূর্ত ঐভাবে থাকার পর তিনি উঠে যান। উপস্থিত ভক্তদের ঐ সম্পর্কে কৌতূহল দেখে তিনি বলেছিলেনঃ 'দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।'[৬৮] আমরা জানি, পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দের উপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং তিনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরের গুরু-ভার অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করেছিলেন। কিন্তু শুধু কি সঙ্ঘরূপী শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভার বহনের ক্ষমতার পরীক্ষা করেছিলেন সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শরতের অঙ্কে উপবিষ্ট হয়ে? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণস্বরূপিণী সঙ্ঘজননী শ্রীমায়ের 'ভার' বহনের ক্ষমতারও পরীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি? যাইহোক, স্বয়ং শ্রীমা যাঁকে নিজের 'ভারী' বলে চিহ্নিত করে আনন্দ পেতেন, বলতেন, 'শরৎ আমার মাথার মণি'[৬৯]—সেই সারদানন্দ মহারাজ কিন্তু মায়ের 'দ্বারী' বা দ্বারবান বলে নিজের পরিচয় দিতেই গৌরববোধ করতেন। তাঁর এই দ্বারিত্ব-গৌরব যে কত আন্তরিক ও স্বতঃ-স্ফূর্ত ছিল তা একটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবেঃ মা তখন বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়িতে। স্বামী সারদানন্দ ঠিক মায়ের দ্বাররক্ষকরূপে নীচে তাঁর ছোট ঘরখানিতে সারাক্ষণ থাকেন--ঐখানে বসেই সঙ্ঘ পরিচালনার যাবতীয় কর্ম করেন ; তাঁর যাবতীয় লেখালেখি ও দেখাসাক্ষাতের কাজও সেখানেই। তিনি তখন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখতে আরম্ভ করেছেন। একদিন তিনি তাঁর দপ্তর খুলে লেখবার উপক্রম করছেন, এমন সময় শ্রীমায়ের জনৈক ভক্তসন্তান ঘরে ঢুকেই সারদা-নন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন। সারদানন্দ সকৌতুকে ভক্তটিকে বললেনঃ 'আমাকে যে এত বড় প্রণামটা করছ এর মানে কী, বল তো।' ভক্তটি উত্তর দিলেনঃ 'সে কী মহারাজ, আপনাকে [প্রণাম] করব না তো কাকে করব?' দীনতার মূর্তিমান বিগ্রহ শরৎ মহারাজ বললেনঃ 'তুমি যাঁর কাছে যাও ও যাঁর কৃপা পেয়েছ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।'[৭০]

বাস্তবিক, স্বামী সারদানন্দ নিজেকে কোন সময়েই 'মায়ের বাড়ি'র একজন সাধারণ ভৃত্য বা দ্বাররক্ষকের বেশী মনে করতেন না। একবার উদ্বোধনে অপরিচিত কোন ব্যক্তি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে, তিনি নিজেকে 'দারোয়ান' বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর কথা ও আচরণে কৃত্রিমতার লেশমাত্র না থাকায় তাঁকে বাড়ির

দারোয়ান বলেই ঐ ব্যক্তিটি বিশ্বাস করেছিলেন।[৭১] এ সম্পর্কে আরও একটি প্রাসঙ্গিক স্মৃতিঃ একবার জনৈক দর্শনার্থী-যুবক অসময়ে মায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলে, প্রকৃত দ্বাররক্ষকের মতোই দৃঢ়কণ্ঠে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেনঃ 'এখন মার কাছে যেতে দেব না;—তিনি এই মাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।' অধৈর্য যুবকটিও অদ্ভুত সেই দ্বাররক্ষককে ক্রোধের বশে বলে ফেলেনঃ 'মা কি কেবল একা আপনার?' শুধু বলা নয়, তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে, উপরে চলে গেলেন। ভৃত্যের অভিমান শোভা পায় না। সারদানন্দও যুবকটির গতিরোধ না করে, একপাশে সরে দাঁড়ালেন। ভক্তটি সটান মাতৃসমীপে গিয়ে প্রণাম করতেই কেমন যেন এক অপরাধ-বোধ এসে তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছিল। বিদায় নেবার সময় মায়ের চরণ দুখানি জড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'মা আজ এক বড় অন্যায় করে এসেছি। সিঁড়ি দিয়ে আসবার সময় শরৎ মহারাজকে ধাক্কা দিয়ে এসেছি। কি করে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব? আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' কৃত অপরাধের জন্য এভাবে অনুশোচনা প্রকাশ করায় মা তাঁকে অভয় দেন। মায়ের কাছ থেকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস লাভ করেও, যখন সিঁড়ি দিয়ে যুবকটি নামছেন, তখন লজ্জায় ও গ্লানিতে মনে মনে ভাবছেন, শরৎ মহারাজকে কেমন করে আর মুখ দেখাবেন—তাঁর সঙ্গে আবার দেখা না হলেই এখন বাঁচা যায়। কিন্তু হায়! কর্তব্যনিষ্ঠ প্রহরারত দ্বাররক্ষক যে ঠিক আগের মতোই সিঁড়ির একপাশে দণ্ডায়মান রয়েছেন! অনুতপ্ত যুবক তৎক্ষণাৎ তাঁর পায়ে ধরে কৃত-কর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলে স্বামী সারদানন্দ তাঁকে নিজহাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'অপরাধ আবার কি? এমন ব্যাকুল না হলে কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়?'[৭২]

কলকাতায় শ্রীমায়ের কোন স্থায়ী আবাস না থাকায় স্বামী সারদানন্দও স্বামীজীর মতো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে নির্মিত বাগবাজারে 'উদ্বোধন কার্যালয়' বা 'মায়ের বাড়ি' তাঁর সেই সযত্নলালিত অভিলাষের বাস্তব রূপ। কিন্তু এই নির্মাণকার্যের জন্য তিনি গুরুতর আর্থিক বোঝার ভার স্বস্কন্ধে বহন করতেও দ্বিধা করেননি। পরে এপ্রসঙ্গে তিনি নিজেই একবার বলেছেনঃ 'যখন উদ্বোধনের বাড়ী হয় তখন এগার হাজার টাকা দেনা। ঐ দেনা ঘাড়ে নিয়ে বাড়ী করা হল। বই বিক্রী ইত্যাদি দ্বারা তা শোধ হয়েছিল। মাকে রাখবার জন্যে এই বাড়ী করা। তাঁকে কেন্দ্র করে—তাঁর জন্যেই সব, এই ভাবে ভরপুর হয়ে তখন সকল কাজ করতুম।'[৭৩]

কলকাতায় মায়ের জন্য বহু-প্রত্যাশিত ও সংকল্পিত আবাস তৈরি হলেও, ১৯০৯-এর আরম্ভকাল পর্যন্ত মাকে সেখানে অধিষ্ঠিত করার কোনও সুযোগ স্বামী সারদানন্দের সম্মুখে ছিল না। সারদানন্দ তাই অধীর হয়ে উঠছিলেন—কেমন করে, কি-উপায়ে মাকে ঐ নতুন বাড়িতে নিয়ে আসা যাবে। এমন একটি চিন্তায় যখন তিনি

আকুল, ঠিক তখনই সহসা জয়রামবাটী থেকে মায়ের এক জরুরী পত্র এসে উপস্থিত। মা সারদানন্দকে অবিলম্বে জয়রামবাটী যেতে আহ্বান জানিয়েছেন। মা লিখেছিলেন, তাঁর ভাইয়েরা বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে পৃথক-অন্ন হতে চলেছে। তাই এইসময়ে সারদানন্দের উপস্থিতি সেখানে একান্ত প্রয়োজন। মায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবীর লোকান্তরগমনের (জানুয়ারি ১৯০৬) পরে, কার্যত শ্রীশ্রীমা তাঁর ভাইদের সংসারের অভিভাবিকাস্বরূপই ছিলেন। অতএব তাঁদের এই সাংসারিক পরিস্থিতিতে, মা খুব স্বাভাবিক কারণেই অস্বস্তিবোধ করছিলেন। এই কারণেই সেবক-সন্তান সারদানন্দকে কাছে ডাকা। মাতৃভক্ত সন্তানও আর কালবিলম্ব না করেই জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ। এই দিনটি স্মরণীয় এই কারণে যে, বাস্তবিক শ্রীমায়ের 'ভারী' হিসাবে স্বামী সারদানন্দের যাত্রারম্ভ হয়েছিল ঐ তারিখ থেকেই—যে-যাত্রার বিরতি ঘটেছিল তাঁর (স্বামী সারদানন্দের) দেহযাত্রার পরিসমাপ্তিতে।

জয়রামবাটীতে মাতৃ-সন্নিধানে থেকে সারদানন্দ শ্রীমায়ের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর ভ্রাতাদের বিষয়-সম্পত্তি বিভাগ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে মধ্যস্থতা করেছিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে সংসারী লোকদের মধ্যে যেমন বহুবিধ স্বার্থ-সঙ্ঘর্ষ, মতবিরোধ এবং কলহ হয়ে থাকে, মায়ের ভাইদের মধ্যেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। অথচ, ঐ পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাস করেও শ্রীমা সকল কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর স্বকীয় সুমহান বৈশিষ্ট্যে বিরাজ করতেন। সন্ন্যাসী সারদানন্দও এই শান্ত মহিমোজ্জ্বল মাতৃমূর্তি দর্শন করে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আরও অভিভূত হতেন। এই কালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ 'আমাদের তো দেখছ—পান থেকে চুন খসলে আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভায়েরা কি কাণ্ডই করছেন; অথচ তিনি যেমন তেমনটিই আছেন —ধীরস্থির!'[৭৭] সেবকের দৃষ্টিতে সত্যই অপূর্ব স্নিগ্ধ, অথচ অনাড়ম্বর একখানি মাতৃ-আলেখ্য!

জয়রামবাটী থেকে শ্রীমাকে নিয়ে সেবক সারদানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়ের নতুন আবাসে প্রবেশ করেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে, রবিবার। মায়ের 'দ্বারী' স্বামী সারদানন্দ তাঁর বহু-ঈপ্সিত মায়ের বাড়িতে মাকে এনে অধিষ্ঠিত করে নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেছিলেন। বস্তুত, ঐদিন থেকেই উদ্বোধন কার্যালয়ের ভবনটি রামকৃষ্ণ-ভক্ত-পরিমণ্ডলে 'মায়ের বাড়ি' বলেই পরিচিত হতে থাকে। অদ্যাবধি এই 'মায়ের বাড়ি' একাধারে শক্তিপীঠরূপে পরমতীর্থ এবং স্বামী সারদানন্দের অপূর্ব মাতৃসাধনার মহতী স্মৃতিসৌধ।

স্বামী সারদানন্দ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতেন দেহধারী স্বয়ং ভগবান বলে, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবীর ঐশীসত্তা সম্বন্ধেও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক ভক্তের সঙ্গে তাঁর যে-কথা হয়েছিল তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

'জনৈক ভক্ত—মহারাজ, ঠাকুর যে অবতার তা না হয় তাঁর দিব্য ভাব দেখে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী সে কথা মনে আনতে পারি না কেন?

স্বামী সারদানন্দ—ঠাকুরকে যদি ভগবান বলে বিশ্বাস করতেই পেরে থাক তবে এ সন্দেহ তোমার আসে কেন?

ভক্ত—আমার এ সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছে না।

স্বামী সারদানন্দ—তা হলে বল ঠাকুরকে অবতার বলে তোমার ঠিক ধারণা হয়নি।

ভক্ত (বিনীতভাবে)—না মহারাজ, ঠাকুরে সে বিশ্বাস আমার আছে।

স্বামী সারদানন্দ (দৃঢ় কণ্ঠে)—তোমার তা হলে বিশ্বাস ভগবান একটি ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়েকে বে করেছিলেন?'[৭৫]

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গাপূজার কয়েকদিন শ্রীমা বেলুড় মঠের উত্তরের বাগান-বাড়িতে (এখন যেটি 'লেগেট হাউস' নামে পরিচিত) ছিলেন। অষ্টমীর দিন সন্ধি-পূজার পরে স্বামী সারদানন্দ একজন ব্রহ্মচারীকে বললেনঃ 'এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।' ব্রহ্মচারী ভাবলেন গিনিটি দুর্গাপ্রতিমাকে প্রণামী দিতে হবে। তাই শরৎ মহারাজকে নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামী সারদানন্দ বললেনঃ 'ও বাগানে মা আছেন ; তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হ'ল।'[৭৬]

অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ, স্বামী সারদানন্দের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা ছিলেন তেমনই। স্বামী সারদানন্দ বিশ্বাস করতেন, সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী এবার সারদাদেবীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। একটি শ্লোকে তিনি বলছেনঃ

যথাগ্নের্দাহিকা শক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥[৭৭]

শুধু কথাতেই নয় তাঁর সকল আচরণেও শ্রীমায়ের প্রতি তাঁর ঐ মনোভাব প্রতি-ফলিত হত। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্রের লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ 'মায়ের ইচ্ছার উপর তিনি [স্বামী সারদানন্দ] কখন নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেন না।...তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা দৈব-নির্দেশ। মানুষের মন-গড়া আইন সেখানে প্রযোজ্য নয়। শরৎ কখনই সে ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রতিবাদ করেন নাই। প্রতিবাদ ত দূরের কথা। তাঁহার মন স্বতঃই মানিয়া লইত যে মায়ের ইচ্ছাই ঠাকুরের বিধান। বলিতেন, মা ও ঠাকুর কি আলাদা?'[৭৮] স্বামী সারদানন্দকে একবার একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'আপনারা যে মাকে এত ভক্তি করেন সেটা কি গুরুপত্নী বলে?' মহারাজ উত্তর দেনঃ 'না, তা নয়। ঠাকুর ও মা অভেদ। তবে ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করা চলতো, মার সঙ্গে চলে না।'[৭৯]

শ্রীমায়ের শিষ্য এবং দীর্ঘকাল স্বামী সারদানন্দের একান্ত সচিব স্বামী অশেষা-নন্দ বলেছেনঃ 'স্বামী সারদানন্দের কাছে শ্রীসারদাদেবী ছিলেন দেহধারিণী

জগন্মাতা স্বয়ং। শ্রীমায়ের প্রতি স্বামী সারদানন্দের ভক্তি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সাধুদের কাছে কিংবদন্তী হয়ে আছে। মায়ের প্রতি তাঁর ভক্তি সঙ্ঘের সাধুদের মাকে বুঝতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং মায়ের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে গভীর করেছিল।'[৮০] স্বামী অশেষানন্দের এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও। তিনি স্বামী সারদানন্দ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন: 'স্বামী সারদানন্দ একদিন আমাকে বললেন "তুমি যে এতবড় প্রণাম করছ, কি চাও তুমি?" আমি বললাম, "শ্রীশ্রীমা আমাকে যা দিয়েছিলেন, তাছাড়া আমাকে আপনি দয়া করে কিছু বিশেষ আধ্যাত্মিক নির্দেশ দিন।" উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বললেন, "তা হয় না। মা যা তোমাকে দিয়ে গেছেন আধ্যাত্মিক জীবনে তার চেয়ে বড় আর কিছু কেউ তোমাকে দিতে পারবে না জেনো—তিনি যা বলে দিয়েছেন তাই অধ্যাত্মজীবনের শেষ কথা জানবে। তাঁর দেওয়া পবিত্র নাম জপ করেই তুমি সবকিছু পাবে। আমাদের মা-ই জগন্মাতা স্বয়ং। বিশ্বাস করো। তাঁকে ধরে থাকো—তোমার যা কিছু প্রয়োজন, সব তিনি তোমার জন্য [সময় মতো] করবেন।"'[৮১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভক্তগোষ্ঠীর বাইরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের মহিমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ প্রাণধন বসু মায়ের শেষ অসুখের সময় কিছুদিন চিকিৎসা করেছিলেন। প্রথমে জানতেন না কার চিকিৎসা তিনি করছেন। কয়েকদিন পরে শ্রীমায়ের প্রতি স্বামী সারদানন্দ প্রমুখের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখে সম্ভবত তাঁর কৌতূহল হয়। শরৎ মহারাজকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন: 'আচ্ছা, শরৎ মহারাজ (অন্যদিন শরৎ বলিতেন [স্বামী সারদানন্দ তাঁর বাল্যবন্ধুর পুত্র হওয়ার সূত্রে]), আমি এতদিন কার চিকিৎসা করছি?' উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বললেন: 'পরমহংসদেবের সহধর্মিণী—আমাদের সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের।' সেদিন থেকে প্রাণধন বাবু ভিজিটের টাকা ও গাড়িভাড়া আর নিতেন না। টাকা দিতে গেলে স্বামী সারদানন্দকে তিনি 'খুব অন্তরের সঙ্গে গদগদভাবে' বলেছিলেন: 'তোমরা আজীবন অতি নিষ্ঠার সহিত যাঁর সেবা ক'রে জীবন সার্থক ক'রছ, আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে—শেষ জীবনে তাঁর একটু সেবা করবার chance (সুযোগ) দাও।' ডাক্তার বসু ছিলেন খ্রীষ্টান এবং এর আগে মাকে যতদিন দেখে-ছেন ততদিন তাঁর পুরো ভিজিট (তখনকার দিনে ষোল টাকা) এবং মোটর ভাড়া (পাঁচ টাকা) নিতেন।[৮২] বলা বাহুল্য, তাঁর মনোভাবের পরিবর্তনের মূলে ছিল স্বামী সারদানন্দের মায়ের প্রতি আচরণ ও শ্রদ্ধার প্রভাব।

একনিষ্ঠ সেবক সারদানন্দ মাকে যে জগন্মাতা বা দেবী ভাবেই অহর্নিশ প্রত্যক্ষ করতেন, এ ধরনের বহু নজির আছে। কিন্তু তবুও ঐ উপলব্ধির একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, সারদানন্দের চোখে ঐ দেবী একাধারে যেন মা ও মেয়ে এই উভয়

রূপেই ধরা দিয়েছিলেন; অথবা মাতৃসকাশে সেবক সারদানন্দকে আমরা যেমন সন্তান-রূপে দেখি, তেমনই আদরিণী কন্যা সমীপে স্নেহময় পিতার মূর্তিতেও দেখে আবিষ্ট না হয়ে পারি না। আবার হয়তো কখনও মনে হবে, নবাগতা বধূমাতার কাছে যেন তাঁর প্রাজ্ঞ শ্বশুর।

প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদেশানন্দ তাঁর স্মৃতিচারণায় অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বলেছেনঃ 'যিনি স্বামী বিবেকানন্দ-কর্তৃক সারদানন্দ আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন, সেই মাতৃগতপ্রাণ মায়ের দ্বারী মহাভাবময়ী দেবীকে উভয়ভাবেই [একাধারে মা ও মেয়েকে] যুগপৎ প্রত্যক্ষ করেন। উদ্বোধনে দ্বারের সংলগ্ন ঘরে বসিয়া মহারাজ পাহারা দিতেন, যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, যখন তখন গিয়া মাকে বিরক্ত না করেন, তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়; অবাঞ্ছিত অনধিকারী মাকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার পবিত্র দেহে পীড়া উৎপাদন না করে, হাঙ্গামহুজুগের অবকাশ না পায়। মায়ের একখানি ফটো পাওয়াও তখন কঠিন ব্যাপার! মা গোপনে থাকিতে চান, শরৎ মহারাজ সেজন্য সর্বপ্রকারে সতত যত্নশীল [যেন তরুণী কন্যার কোনও প্রকার সঙ্কোচের কি লজ্জার কারণ না ঘটে!]; আবার যখন মা কোন ভক্তকে স্বয়ং বিশেষভাবে কৃপা করেন, তখন ভক্তিবিনম্রচিত্তে মস্তক অবনত করিয়া বলেন, "ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন"।' স্বামী সারদেশানন্দ তাই মন্তব্য করেছেনঃ 'মা-রূপে মেয়ে-রূপে অদ্ভুত লীলা।' [৮৩]

'এক সময়ে মা কোয়ালপাড়াতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভীষণ অসুস্থ, পিত্তের প্রবল প্রকোপে শরীরে অসহ্য জ্বালা,—যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। মহারাজ কলিকাতা হইতে সুযোগ্য ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও বিশ্বস্তসেবক ভূমানন্দকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসা, সেবাযত্নে ফলোদয় না হওয়াতে পরে নিজেই আসিয়াছেন অতিশয় ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া। কন্যা দেহের জ্বালায় অস্থির! "ঠাণ্ডা কর—ঠাণ্ডা কর" বলিতেছেন। চিকিৎসক-সেবকের চেষ্টা বিফল! স্নেহময় পিতা বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া বিষণ্ণবদনে কাতরনয়নে বিদীর্ণহৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—স্নেহপুতলী কন্যার মর্মান্তিক যন্ত্রণা! আর্ত দুহিতা পিতার গায়ে হাত দিলেন, দেহের শীতলতায় হাতের জ্বালা উপশম হইল। "আঃ বাঁচলুম!" বলিয়া সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। পিতার প্রাণ উৎফুল্ল হইল। ভরসা পাইয়া তাড়াতাড়ি গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন, আরও কাছে গিয়া বসিলেন। অম্বিকা তাঁহার লম্বোদরের স্নিগ্ধ উদর স্পর্শ করিয়াই হউক, অথবা হৈমবতীর ন্যায় পিতা হিমালয়ের দেহের শীতল স্পর্শেই হউক, সোয়াস্তি-শান্তি পাইলেন, দারুণ জ্বালার উপশম হইল। বাবা-মেয়ে দুজনেরই প্রাণ ঠাণ্ডা!!' [৮৪] শেষ অসুখের সময় ভুগে ভুগে মায়ের অবস্থা তখন এমন যে, কখনও কখনও পথ্যাদি গ্রহণ করতে চাইতেন না—ওষুধ সেবনেও ঘোর আপত্তি করতেন। এমন অবস্থাতেও সন্তান সারদানন্দের কথা কিন্তু কোনমতেই প্রত্যাখ্যান করতেন না। তখন যেন তিনি একটি পিতৃস্নেহাকাঙ্ক্ষিণী বালিকা মাত্র! একদিনের চিত্র—রাত্রি ১২টা—কিছুই খাবেন না মা, শিশুর মতো সেবিকার বিরুদ্ধে অনুযোগঃ 'আমি খাব না। তোর একই কথা,

"মা, খাও আর বগলে কাঠি লাগাও"।' জ্বর দেখার থার্মোমিটারকে মা 'কাঠি' বলতেন। সেদিন না খাওয়ার প্রবল জিদ দেখে, সেবিকা অগত্যা বললেনঃ 'তবে কি, মা, মহারাজকে ডাকব?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তরঃ 'ডাক্ শরৎকে, আমি তোর হাতে খাব না।' সন্তান সারদানন্দ এলেই তাঁর হাত দুখানি ধরে আদরিণী কন্যার মতো মা নালিশ জানালেনঃ 'একটু হাত বুলিয়ে দাও তো, বাবা! দেখ না বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে। খালি "খাও, খাও" এদের রব, আর জানে খালি বগলে কাঠি দিতে। তুমি ওকে বলে দাও যেন বিরক্ত না করে।' মেয়ের নালিশ শুনে কন্যাবৎসল পিতা অমনি সস্নেহে বলেনঃ 'না মা, ওরা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।' কিছুক্ষণ এইভাবে সান্ত্বনা দিয়ে, পরে আস্তে আস্তে অনুনয় জানানঃ 'মা, এখন কি একটু খাবেন?' পিতৃ-সোহাগিনী মেয়ে অমনি বলেনঃ 'দ্যাও'। সেবিকা পথ্য নিয়ে এলে, আবার বায়নাঃ 'না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে খাব না।' সেবক সারদানন্দ ফিডিংকাপ হাতে নিয়ে সামান্য একটু দুধ খাইয়ে, মিষ্টি করে বলেনঃ 'মা, একটু জিরিয়ে খান।' জননী পরমতৃপ্তির সঙ্গে মন্তব্য করেনঃ 'দেখ তো, কি সুন্দর কথা—"মা, একটু জিরিয়ে খান।" এ কথাটা আর ওরা বলতে জানে না? দেখ তো, বাছাকে এই রাতে কষ্ট দিলে। যাও বাবা, শোও গিয়ে।' অন্তরের কৃতার্থতা নিয়ে বিদায় নিতে চাইলে, মা বললেনঃ 'এসো বাবা, বাছার কত কষ্ট হ'ল।'[৮৫] বড় মর্মস্পর্শী চিত্র।

স্বামী সারদেশানন্দ লিখছেনঃ 'পূজনীয় শরৎ মহারাজ [উদ্বোধনে] নিত্য তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলে [শ্রীমা] এমন ঘোমটা টানিয়া বসেন যে, মহারাজ অন্তরালে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "আমাকে যেন মনে করে শ্বশুর!!"'[৮৬]

স্বামী সারদানন্দের জীবনের এক একটি কর্ম যেন বিশ্বব্যাপিনী জগজ্জননীর মহাপূজারই এক এক অঙ্গ—এক একটি উপচার! যতপ্রকার কর্মে হাত দিয়েছেন, ছোট বড় সকল ক্ষেত্রেই একান্ত মাতৃনির্ভর শিশুর মতোই তিনি সর্বাগ্রে মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে স্বামী সারদানন্দ জয়রামবাটী গিয়ে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেনঃ 'ঠাকুর তোমাদের সর্বদা রক্ষা করছেন, বাবা; কোন ভয় নেই।'[৮৭] সেই অমোঘ আশীর্বাদের বলে বলীয়ান হয়ে স্বামী সারদানন্দ পাশ্চাত্য-যাত্রা করেছিলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। পুরীতে স্বামী তুরীয়ানন্দ কঠিন পীড়ায় শয্যাগত। গুরু-ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে, তাঁর সম্পর্কে যে পরবর্তী পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করবেন সে খবর জানিয়ে স্বামী সারদানন্দ সর্বাবস্থায় তাঁর সকল শক্তির উৎস শ্রীমাকে জয়রামবাটীতে পত্র প্রেরণ করলেনঃ[৮৮]

'পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণ কমলেষু—মা, আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। গত মঙ্গলবার আমি ও সান্যাল কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া বুধবার প্রাতে এখানে পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিবার কারণ, হরি মহারাজের

কঠিন পীড়া—তাহা আসিবার পূর্বে আপনাকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছি। আশা করি সেই পত্র পাইয়াছেন, উহা দেশড়ার ডাকে দিয়াছিলাম।

এখানে আসিয়া দেখিলাম হরির অসুখ খুব কঠিন বটে, তবে এখনও মন্দের ভালর দিকে। ডাক্তাররা বলিতেছেন, যদি কোনও উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দশ-বারো দিন বাদে তাহাকে কলিকাতায় কোনরূপে লইয়া যাওয়া চলিবে। হরি এখন একেবারে শয্যাশায়ী। তাহার বাঁ হাত-পায়ে ও ডান পায়ে তিন জায়গায় কাটিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দিতে হইয়াছে। সেজন্য পাশ ফিরিয়া শুইবার পর্যন্ত সাধ্য নাই। দিবারাত্র চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া অদ্ভুত সহ্য গুণ দিয়াছেন, তাই সে আপনাদের উপর নির্ভর করিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া আছে ও আনন্দের সহিত কথাবার্তা গল্পগান করিয়া কাটাইতেছে। আশীর্বাদ করিবেন তাহাকে [স্বামী তুরীয়ানন্দকে] যেন এ যাত্রা আরোগ্য করিয়া শীঘ্র কলিকাতায় লইয়া যাইতে পারি। হরির অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল মহারাজ ভাল আছেন। হরির অসুখের দরুণ বিশেষ ভাবিত ও ভীত হইয়াছিলেন। আমরা আসায় ও ডাক্তারেরা একটু ভাল বলায় ভয় একটু কমিয়াছে। আপনাকে অসংখ্য প্রণাম জানাইতেছেন।...

শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান
শ্রীশরৎ'

উৎসবে-আনন্দে অথবা দুঃখে-বিপদে মা-সারদাই সারদানন্দের গতি—সকল গতির শেষ গতি। সারদানন্দ মাকে পত্র লিখে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেনঃ 'মঠে প্রতিমা আনিয়া পূজা হইতেছে—আশীর্বাদ করিবেন, সুসম্পন্ন হয়।'[৮৯] আবার কোথায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী—মানুষের দুঃখে ব্যথিত সারদানন্দ সেখানেও মায়েরই করুণাপ্রার্থী। একবার[৯০] জীবদুঃখকাতর, দরদী সন্তানের লেখা একখানি করুণ-পত্র শুনতে শুনতে মা অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি। সারদানন্দ তাঁর কাছে কাতর-প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, যাতে তাঁর দয়ায় মানুষের দুঃখকষ্টের লাঘব ও অবসান হয়। অশ্রুপূর্ণলোচনে আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মা ঐ প্রার্থনার উত্তরে তক্ষুণি বলে-ছিলেনঃ 'লোকের দুঃখকষ্ট আর দেখতে পারি না, ঠাকুর, তাদের সকল দুঃখজ্বালার অবসান কর।'[৯১]

তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'লীলাপ্রসঙ্গ' রচনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অন্তরে অন্তরে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ঠাকুরেরই তদানীন্তন প্রকট-মূর্তি শ্রীমায়ের আশীর্বাদ তাঁর ঐ গ্রন্থ সৃজনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও উৎস।[৯২] গ্রন্থখানি

অসম্পূর্ণ বলে অনেকে তাঁকে পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ করতেন। কিন্তু সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করেননি। আসলে তখন তাঁর সকল কর্মপ্রেরণার উৎসস্বরূপিণী শ্রীমা লীলাশরীর ত্যাগ করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন: 'মায়ের লীলাসংবরণের পরে তাঁহার কর্মশক্তি সহসা কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং গ্রন্থ লিখিবে কে?'[১৩]

সঙ্ঘ পরিচালনার ব্যাপারেও স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের উপর যে কতটা নির্ভরশীল ছিলেন তা তাঁর নিজের কথা থেকেই জানা যায়। স্বামী ঈশানানন্দ প্রমুখকে তিনি একবার বলেন: 'এই দেখ না, ১৯১৬ খৃঃ শেষের দিকে বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল ঢাকা-দরবারে বলেন যে. স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের--রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা গেরুয়া পরে, অথচ রাজনীতিতে বাংলার ছেলেদের উস্কানি দেয়, স্বামী বিবেকানন্দের বই এদের প্রেরণার উৎস এবং সন্ন্যাসীরা এদের পরামর্শদাতা। তিনি ছেলেদের সাবধান করে দেন, তারা যেন মিশনের সাধুদের সঙ্গে না মেশে। মঠ-মিশনের প্রতি এইরূপ কটাক্ষ করায় রামকৃষ্ণ মিশনের হিতৈষী বাংলার জনসাধারণ ও ভক্তেরা খুবই বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েন। সমাধানের জন্য অনেকে আমাদের পরামর্শ দিতে থাকেন যে. মঠের যে-সব সন্ন্যাসীর পূর্বে রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব ছিল. তাদের আলাদা করে দেওয়া হোক। এই সময় মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। আমরা তো সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খুবই চিন্তিত, এ-সব শুদ্ধসত্ত্ব উচ্চমনা সাধু কয়জনকে মঠ থেকে আলাদা করে দিতে হবে, এ চিন্তাই করতে পারি না।

'তখন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ধীরে ধীরে সমস্ত নিবেদন করলাম। শ্রীশ্রীমা ধীরভাবে সব শুনে সুমিষ্টভাবে দৃঢ়তার সহিত বলে উঠলেন. "ওমা! এ-সব কি কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যে-সব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে. দেশের দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে. তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।"

'তখন আমি লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে কিভাবে দেখা করব, এই উপায়ের জন্য স্বামীজীর বাল্যবন্ধু আলিপুরের এটর্নি দাশরথি সান্যালের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁরই ব্যবস্থাপনায় ১৯১৭ খৃঃ প্রথমদিকে নির্দিষ্ট দিনে লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হল এবং স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশনের কার্যধারা তাঁর নিকট বিবৃত করলাম. তিনি সমস্ত শুনে তাঁর ঢাকা-দরবারের ভাষণের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং তারপর সেই ভাষণ প্রত্যাহার (withdraw) করে চিঠি দ্বারা জানালেন। এতে জনসাধারণের ও ভক্তদের মন থেকে সংশয়-মেঘ অন্তর্হিত হল।'[১৪]

সারদানন্দের মাতৃসেবা এত বিচিত্রমুখী যে, গভীর মনন ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছাড়া, তা

সাধারণভাবে আলোচ্য হতেই পারে না। তাঁর জীবনে এমন বহু ঘটনা আছে, যা একটু অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে যে, সেসবের মূলে রয়েছে তাঁর অপরিসীম মাতৃভক্তি। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে—জয়রামবাটীতে নতুন বাড়ির তথা জগদ্ধাত্রীর নামে কেনা জমির অর্পণনামা রেজিস্ট্রি করার সেই ঘটনাকে। শ্রীমা জয়রামবাটীতে এলে, তাঁর ভাইদের সংসারে তাঁদেরই একজনের ঘরে থাকতেন। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নানাকারণে তাঁর সেখানে ঐ পরিবেশে থাকা বড়ই কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। স্বামী সারদানন্দ মায়ের এই অসুবিধা নিরাকরণের জন্য খুব বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অবশেষে শ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে, সারদানন্দের অশেষ যত্নে ও শ্রমে পুণ্য-পুকুরের পশ্চিমপাড়ে একখন্ড জমি সংগ্রহ করে সেখানে একখানা ছোট বাড়ি তৈরী করা হল—যে-বাড়ি ইদানীং 'মায়ের নতুন বাড়ি' বলে সবার কাছে পরিচিত। ১৯১৬ সালের ১৫ মে এই নতুন বাড়িতে শ্রীশ্রীমা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেন। নতুন বাড়িতে মায়ের গৃহপ্রবেশের মাস দেড়েক পরে সারদানন্দ জয়রামবাটীতে যান। মায়ের ইচ্ছা ছিল ঐ বাড়ির জমি ইত্যাদির জন্য শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর নামে একখানি অর্পণনামা প্রস্তুত করিয়ে তা বেলুড় মঠের পরিচালনাধীনে প্রদান করা। শরৎ মহারাজ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করলেন। কোতলপুর থেকে সাব-রেজিস্ট্রারকে জয়রামবাটীতে আনানো হল। এ সম্পর্কে স্বামী ঈশানানন্দ লিখেছেনঃ '...শরৎ মহারাজ মায়ের বাড়ীর বাহিরে উঠানে আসন পাতিয়া তাকিয়া, সিগারেট, পান, পাখা ইত্যাদি লইয়া পূর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু পরেই [সাব] রেজিষ্ট্রার সাহেব আসিয়া পালকি হইতে নামিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান, বয়স কম,—২৭/২৮ হইবে। শরৎ মহারাজ স্থূলকায়, বয়স প্রায় ৫০-এর উপর। রেজিস্ট্রার সাহেব পালকি হইতে নামিলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিশেষ সম্মানের সহিত "আসুন আসুন" বলিয়া রেজিস্ট্রারকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। রেজিস্ট্রার আসন গ্রহণ করিলে মহারাজ বসিলেন এবং নিজেই পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে একজন মহারাজের হাত হইতে পাখা লইতেই তিনি ডিবা খুলিয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবকে সিগারেট ও দেশলাই দিলেন। রেজিষ্ট্রার প্রথম বিশেষ কিছু বুঝিতে পারেন নাই ; ক্রমশঃ শরৎ মহারাজের উপর আমাদের সশ্রদ্ধভাব দেখিয়া এবং মহারাজের ঐরূপ ভদ্র ব্যবহারে, সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। পরে চা ও পান খাইয়া তিনি রেজিষ্ট্রির কাজ আরম্ভ করিলেন।

'শ্রীশ্রীমা বাড়ীর মধ্যে রাধু প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া মৃদুস্বরে দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া টিপ সহি দিয়া কার্য সম্পাদন করিলেন। শরৎ মহারাজ রেজিষ্ট্রারকে কিছু জলযোগ করাইয়া পালকিতে তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার সহিত একটু অগ্রসর হইয়া রওনা করাইয়া দিলেন। মহারাজ এক গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করিয়া যেন মনে মনে স্বস্তি ও আনন্দ বোধ করিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া আমাদের কিন্তু অনেকেরই প্রথমে একটু অস্বস্তিবোধ হইতেছিল, পরে বুঝিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীমায়ের কাজ মান-অভিমান ত্যাগ করিয়া ঐরূপ একনিষ্ঠভাবেই করিতে হয়।'[২৩] ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ। সারদানন্দের মতো মাতৃসাধক

মহাপুরুষের পক্ষেই এমন ঐকান্তিক সেবা সম্ভবপর। একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, ঐ মুসলমান যুবককে যে আন্তরিক আদর ও সম্মান সেদিন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ দেখিয়েছিলেন, তা একজন সাব-রেজিস্ট্রারকে তোষণের জন্য নয়। সেদিনের সেই প্রাণঢালা সমাদর ছিল জগন্মাতার কার্যে সহায়ক একজনের প্রতি মাতৃভক্ত সেবকের হৃদয়ের পূজা।

মাতৃগতপ্রাণ সারদানন্দ মায়ের সেবা সম্পর্কে সর্বদা কিরকম সজাগ ছিলেন এবং মা জয়রামবাটীতে থাকলে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য ও সেবার কথা ভেবে কত চিন্তান্বিত থাকতেন সে-সম্পর্কে কিছু নিদর্শন এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। একটি চিঠিতে তিনি জয়রামবাটীতে লিখছেনঃ 'শ্রীমার বাতের কথা শুনিয়া ভাবিত আছি। একটু কমিয়াছে কিনা লিখিয়া সুখী করিবে। আর একটি ছোট শিশিতে করিয়া বাঘের চর্বির তেল শীঘ্র পাঠাইব। শুনিলাম উহা বাতের [পক্ষে] খুব ভাল; মালিস করিতে হয়। শ্রীশ্রীমাকে যোগীন-মার, আমার ও এখানকার সকলের সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবে। তিনি এখান হইতে যাওয়াতে সব শূন্য হইয়া রহিয়াছে। যদি শ্রীশ্রীমাকে ফাল্গুনে আনিতে পার তো বড় ভাল হয়। এই বাত বাড়িয়াছে—শীতকালে না জানি কতই কষ্ট হইবে।'[১৬] আর একটি চিঠিতে তিনি লিখছেনঃ '৮/১০ দিনেরও অধিক হইল শ্রীশ্রীমার কোন সংবাদ না পাইয়া আমরা সকলে বিশেষ চিন্তিত আছি। তিনি কেমন আছেন জানিয়া সত্বর সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার শারীরিক কুশল সংবাদ পত্রদ্বারা জানাইতে ভুলিও না।...তিনি শারীরিক কুশলে থাকিলে সপ্তাহে সপ্তাহে সংবাদ দিবে এবং শরীর পুনরায় অসুস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ জানাইবে ও প্রতিদিন বা একদিন অন্তর একখানি করিয়া পত্র দিবে।'[১৭] আবার এক সপ্তাহ পরে ঐ ব্যক্তিকেই লিখছেনঃ 'শ্রীশ্রীমার জ্বর পুনরায় হইয়াছিল জানিয়া ভাবিত রহিলাম। কারণ, আবার না হয়। যাহা হউক, তোমরা সকলে তাঁহার নিকটেই আছ এবং সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছ, ইহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তজ্জন্য তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের এবং...শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত ছেলেদের সর্বতোভাবে কল্যাণ হউক, ইহাই ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি।'[১৮] আবার অন্য এক সময়ে একজনকে লিখলেনঃ 'তোমাদের ভরসাতেই মাকে দেশে পাঠাইলাম।'[১৯]

সারদানন্দের সেবাদৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী, যার দিগন্তে ছিলেন শুধুই মা। কিন্তু তা বলে একটি দিনের জন্যও—এমনকি সেবাকার্যের অনুরোধেও তিনি মায়ের ইচ্ছার উপরে কখনও নিজের ইচ্ছাকে চাপাতে চেষ্টা করেননি। 'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন'—এটাই কিন্তু ছিল তাঁর সেবা-পরিচর্যার মূলে। মায়ের শেষ অসুখের সময় তাঁর নিরাময়ের জন্য স্বামী সারদানন্দ কী প্রাণপণ চেষ্টাই না করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাদির যথোপযুক্ত আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে, নানারকম শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দৈব-প্রতিকার-ব্যবস্থারও ত্রুটি হয়নি। আসন্ন মাতৃবিরহকাতর সন্তান, সাধারণ মানবীয়ভাবেও সেদিন যেরকম ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তা-ও সেবার ইতিহাসে এক আশ্চর্য নজিররূপে অক্ষয়

হয়ে রইবে। পূর্ণজ্ঞানী সন্তান, আর তাঁর আরাধ্যা জননী স্বয়ং বিশ্বেশ্বরী আদ্যাশক্তি। তবুও, কত মায়িক উপকরণ! ভক্তিভাবের রাজ্যে বুঝি এমনটাই হয়ে থাকে। সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায়, মায়ের বাড়িতে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা এবং কমলা—এই পাঁচ মহাবিদ্যার অর্চনা এবং পাঁচ গ্রহের পূজা শুরু হল। বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে শতরূপ চণ্ডীপাঠ হয়েছিল। বারাসতের মহাশ্মশানে বিধিমতো স্বস্ত্যয়নও অনুষ্ঠিত হয়েছিল—কোথাও কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনি।[১০০] এত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সুসম্পন্ন হল—ডাক্তারী, কবিরাজী— এত চিকিৎসা-সমারোহ, কিন্তু মায়ের দেহের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি দেখা যাচ্ছিল না। সারদানন্দের তখনকার দিনলিপি থেকে জানা যায়, মায়ের জন্য কতরকম চিকিৎসা ও সেবায়োজনই না হয়েছিল। ব্যাধির জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মা সহসা বলে ওঠেনঃ 'আমাকে গঙ্গার তীরে নিয়ে চলো। গঙ্গার ধারে আমি ঠাণ্ডা হব।' মাতৃ-আজ্ঞা পালন করতে সন্তান তখনই প্রস্তুত। সারদানন্দ গঙ্গাতীরে মায়ের বাসোপযোগী বাড়ি পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন। এমনকি, কাশীধামে মাকে নিয়ে যাওয়া চলে কিনা, সে চিন্তাও করেছিলেন। কিন্তু ডাক্তাররা মায়ের ঐ অবস্থায় নাড়াচাড়ার অনুমতি দেননি।[১০১] লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যে-কোন মূল্যে, যে-কোন উপায়েই হোক, মাকে সুস্থ ও শান্ত করাই সেবক সারদানন্দের ধ্যানজ্ঞান ও লক্ষ্য ছিল।

শ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় স্বামী সারদানন্দ কতখানি উদ্বিগ্ন থাকতেন সে-সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র লিখেছেনঃ 'শরৎচন্দ্রের সকল সতর্কতা —সমগ্র চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মায়ের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র বুঝিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের আহ্বান অনুভব করিয়া মা এবার শরীর-ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সংসারে তাঁহার লীলার অবসান হইয়াছে। এখন কেবল ভক্তদিগকে শেষ সেবার সুযোগদান মাত্র বাকী।...

'অন্তরে ঝড় বহিতেছে, কিন্তু বাহিরে শরৎচন্দ্র স্থির—অতিস্থির। মিশন-সম্পর্কীয় সকল কার্যেরই ব্যবস্থা, বিধান সমভাবে চলিতেছে। তাহাতে কোথাও ভুল-ভ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তর মায়ের জন্য নিরন্তর আকুল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, কচ্ছপ নদীতে চরে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে আড়াতে—যেখানে তার ডিমগুলি আছে। আবার বলিতেন, ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে কোটে। ঢেঁকির পাট পড়ছে। একহাতে ধান ঠেলে দিচ্ছে, কাঁড়া ধান তুলে নিচ্ছে আর একহাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে! আবার মুখে খদ্দেরের সঙ্গে হিসেবও করছে। কিন্তু তার পনর আনা মন পড়ে রয়েছে ঢেঁকির পাটের ওপর, পাছে হাতে পড়ে যায়। ইহাই প্রকৃত অভ্যাসযোগ। শরৎচন্দ্রের অন্তরের আকুল ক্রন্দন—মা-মা-মা। অহোরাত্রি মা। কিন্তু বাহিরে সেই হাসিমুখ, কথায় সেই উৎসাহ-ভরা বুক, সেবায় পাছে কোন ভুল-চুক হয়, অনুক্ষণ তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি।'[১০২]

স্বামী সারদানন্দের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে শ্রীশ্রীমা ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটে লোকলীলা সংবরণ করলেন। উপরোক্ত জীবনীকার দুটি ছোট বাক্যের

মধ্যে স্বামী সারদানন্দের হৃদয়ের নিদারুণ শূন্যতাকে মর্মস্পর্শী ভাষায় এইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন: 'পরদিন বেলুড়মঠের প্রাঙ্গণে মায়ের চিতা জ্বলিল এবং নিবিল। কিন্তু মাতৃমন্ত্রের সিদ্ধ সাধক শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে জীবনে তাহা আর নির্বাপিত হইল না।'[১০৩] শুধু দিনলিপিতে তাঁর দূরবগাহ শোক ও ভক্তির সাক্ষ্য হয়ে রইল এই কয়টি কথা: 'July 20, TUESDAY—Holy Mother in peace and glory of Mahasamadhi at 1.30 a.m. (night)'[১০৪]

৩১ শ্রাবণ, ১৩২৭ তারিখের (১৫ আগস্ট ১৯২০, অর্থাৎ শ্রীমায়ের শরীর-রক্ষার সাতাশ দিন পরের) একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন: 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শরীর রক্ষার পরে প্রথম পত্র বোধহয় তোমাকেই লিখিতেছি। চেষ্টা করিয়াও এতদিন মনকে ঐরূপ কার্যে নিযুক্ত করিতে পারি নাই।'[১০৫] এই সামান্য কয়টি কথা থেকেই শ্রীমায়ের অদর্শনের পর তাঁর মনের অবস্থা কিরকম হয়েছিল তা বুঝতে পারা যায়। অন্তরে একটি আকুল ক্রন্দনধ্বনির অনুরণন চলছিল সর্বক্ষণ, কিন্তু বাইরে কোনও উচ্ছ্বাস ছিল না—প্রশান্ত, গম্ভীর, স্থিতধী। শ্রীমাকে কেন্দ্র করে, যা কিছু সব তাঁরই জন্যে—এই রকম একটা ভাবে ভরপুর হয়ে সারদানন্দ এতদিন সব কাজ করে এসেছিলেন। কিন্তু মায়ের অদর্শনে তাঁর সহস্রমুখী কর্মজীবনের মূল প্রেরণাশক্তি তিরোহিত হয়ে গেল। তিনি নিজেই বলেছেন: 'মা চলে গেলেন, আর সব উৎসাহ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। শরীরটা তো খুব ভালই ছিল, কিন্তু মার দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও পড়ে গেল।'[১০৬]

শরীর-মন ভাঙলেও সারদানন্দের মাতৃসেবার অবসান কিন্তু হয়নি কোনদিনও। তাঁর মর্তজীবনের শেষক্ষণটি পর্যন্ত মায়ের 'দ্বারী' রূপেই তাঁকে আমরা দেখেছি, মায়ের 'ভারী'কে কখনও হারাইনি। যাঁর সেবাব্রতে সিদ্ধ হয়ে তিনি নিজ 'সারদানন্দ' নামকে সার্থক করেছিলেন, এখন থেকে সেই তিনিই—সেই জগদম্বা শ্রীসারদাই হলেন তাঁর সমগ্র জীবনের আলোক, তাঁর চরিত্র-প্রভা। মায়ের ব্যক্তিগত সেবাই এখন থেকে রূপান্তরিত হল ব্যাপক বিশ্বরূপিণী মাতৃসেবায়। শ্রীমা একদা বলেছিলেন: 'এর পর যখন তাঁর (ঠাকুরের) ছেলেরা আসবে, আমার অভাবে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে বেড়াবে, একটু বিশ্রাম করবার জন্য লোকের দ্বারস্থ হবে, সে আমি সইতে পারব না। এরপর তোমরা এখানে [জয়রামবাটীতে] একটা কিছু কোর, যাতে তারা দুটি খেতে পায়, একটু আশ্রয় পায়।'[১০৭] মায়ের ঐ উক্তিকেই আদেশরূপে গ্রহণ করে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া দিনে জয়রামবাটীর পুণ্য-ক্ষেত্রে 'মাতৃমন্দির' প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী সারদানন্দ, চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন মায়ের জগৎজোড়া ছেলে-মেয়েদের কাছে। বেলুড়মঠে, ঠিক যে ভূমিখণ্ডের উপর শ্রীমায়ের দিব্য তনুকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে যে মন্দির আমরা দেখি (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯২১

খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর) তাও স্বামী সারদানন্দেরই অনুপম মাতৃভক্তির আর এক নিদর্শন।

একদিন স্বামী গঙ্গানন্দ কোনও একজনের গর্হিত আচরণের উল্লেখ করে স্বামী সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা পেয়েও সে কি করে অমন কাজ করতে পারল। প্রশ্ন শুনে মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন এবং তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেনঃ 'যে ভাবের চিন্তায় নিজের ক্ষুদ্র বিশ্বাস ভক্তির হানি হয় তা কখনো মনে স্থান দিয়ো না। তাকে তোমরা আজ এমন দেখছ, দশ বছর পরে সে যে একজন মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়াবে না, কী করে জানলে? তখন তোমরাই বলবে, "তা হবে না? সে যে মার কত কৃপা পেয়েছিল!" মার মহিমা, মার শক্তি কতটুকু, আমাদের কী সাধ্য বুঝি। এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি। এদিকে তো রাধু রাধু করে অস্থির, কিন্তু শেষকালে বল্লেন, "একে পাঠিয়ে দাও।" তাঁকে বললুম, "মা, আপনি রাধুকে পাঠিয়ে দিতে বলছেন, পরে যখন আবার দেখতে চাইবেন তখন কী হবে?" মা বললেন, "না, আর আমার ওর উপর কিছুমাত্র মন নাই।"

'এইভাবে মায়ের কথা বলতে বলতে স্বামী সারদানন্দ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং আপনমনে গান ধরলেনঃ

তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি॥
বিচিত্র ভবের মেলা ভাঙ্গ গড় দুটি বেলা ;
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি।
এতকাল রইলাম কাছে, বেড়াইলাম পাছে পাছে,
চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি॥'[১০৮]

পদগুলি যেন স্বামী সারদানন্দেরই অন্তর থেকে উৎসারিত। পদগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নিবিড় অনুভূতির আবেগময় ব্যঞ্জনা।

শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণের পর একবার কাশীধামে প্রাচীন সাধুরা শরৎ মহারাজকে অনুরোধ করেছিলেনঃ 'আপনি মায়ের বিষয় লিখিয়া রাখিলে পরবর্তীকালের মানুষ শ্রীশ্রীমা কি ছিলেন, তাহা সঠিক জানিতে পারিবে। আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা লিখিয়া জগতের মহা উপকার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীও আপনি লিখিলে ভাল হয়। আপনি লিখুন।' উত্তরে শরৎ মহারাজ কিছু না বলে উপরোক্ত গানটি আবৃত্তি করেছিলেন মাত্র।[১০৯]

* * * *

স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ—এই সেবকচতুষ্টয়ের দিব্য জীবনালোকে যেমন আমরা শ্রীশ্রীমাতৃআলেখ্যকে যথা-

শক্তি অবলোকনের প্রয়াস পেলাম, তেমনই সুযোগ পেলাম মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহ-পরিমণ্ডলের মাঝে সমাসীন তাঁর প্রিয় সন্তানদের জীবনানুধ্যানের। তথাপি একথা সংশয়াতীত সত্য যে, এই অবলোকন ও অনুধ্যান এখনও অসম্পূর্ণ। এতদধিক আরও সত্য যে, আমাদের এই অসম্পূর্ণতাই পরম গৌরব। মাকে শুধু তাই বলি—

অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর॥

শ্রীমা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের দশজন সন্ন্যাসী-শিষ্যের দৃষ্টিতে

অবতারপুরুষের স্বরূপ সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তাঁকে চিনে নেন তাঁর লীলাপার্ষদরা। অথবা বলা চলে, তিনি ধরা দেন তাঁর লীলাপার্ষদদের কাছে। কিন্তু দর্শনমাত্রই নয়, ক্রমশ। এ ভগবানের অবতারলীলার একটি বিশেষত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও এটি আমরা লক্ষ্য করেছি। সেখানে দেখি ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন। আবার দেখি, তিনিই নানাভাবে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন তাঁর লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবীর ঈশ্বরীয় সত্তার তত্ত্বটিও। এটি যদি শ্রীশ্রীঠাকুর না করতেন, তাহলে সম্ভবত তাঁর ত্যাগী-ভক্তদের পক্ষেও শ্রীমাকে চিনে নেওয়া সহজ হত না। কারণ অন্তরালবর্তিনী শ্রীমায়ের অসাধারণত্বের কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিল না। সে যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা যে স্বয়ং পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি, অর্থাৎ শ্রীমা যে স্বয়ং আদ্যাশক্তি—দেখা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ত্যলীলার সময়ে এই তত্ত্বভাবনা তাঁর অন্তরঙ্গ ত্যাগী-সন্তানদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুরে (১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫—১৫ আগস্ট ১৮৮৬) তখনকার একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেইসময়ে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে তাঁর কয়েকজন ত্যাগী-ভক্ত ভিক্ষায় বার হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) ও শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ)। এঁরা প্রথমেই শ্রীমায়ের নিকট গিয়ে বলেনঃ

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি॥

—'হে শঙ্করপ্রিয়া সদাপূর্ণা অন্নপূর্ণা পার্বতি, জ্ঞানবিজ্ঞানে সিদ্ধির জন্য আমাকে ভিক্ষা দিন।' শ্রীমায়ের কাছে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করে, তাঁর চরণধূলি মাথায় নিয়ে তাঁরা পথে অগ্রসর হন।[১] তাঁদের এই আচরণ, বিশেষত কিভাবে তাঁরা শ্রীমায়ের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করেন, সেটি লক্ষ্য করবার বিষয়। এই ঘটনার কিছু পরে, সম্ভবত ১৮৮৮ সনের শেষের দিকে, স্বামী অভেদানন্দ শ্রীমা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত স্তোত্র রচনা করেন।[২] এই স্তোত্রে তিনি শ্রীমাকে পরমাপ্রকৃতি অথবা আদ্যাশক্তি জগজ্জননী রূপে

প্রণাম নিবেদন করেছেন। তাঁর এই স্তোত্ররচনা অবশ্যই একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত নয়। বরং ভাবা যেতে পারে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদদের মুখপাত্ররূপেই এই স্তুতি করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের দেবীত্ব সম্পর্কে এই বোধ শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী-সন্তানদের নানা উক্তি ও আচরণে একান্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্যঃ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং স্বামী সুবোধানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই দশ ত্যাগী-পার্ষদের দৃষ্টিতে শ্রীমা।[৩] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ত্যাগী-পার্ষদদের জীবনের সব ঘটনা অবশ্য আমাদের জানা নেই। এঁদের মধ্যে কারও কারও পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত আজও প্রকাশের অপেক্ষায়। স্বতন্ত্রভাবে এঁদের প্রত্যেকের উক্তি ও উপদেশের সংকলন সম্পর্কেও সেই কথা। তাই শ্রীমা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সন্ন্যাসী-সন্তানদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশ বিশদভাবে আলোচনা করা দুঃসাধ্য। সেই কারণেই ভূমিকায় দুই-একটি সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। যাই হোক, শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্ত দশ লীলাসহচর তাঁদের আচরণ ও উপদেশের মাধ্যমে শ্রীমাকে যেভাবে

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা
চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাম্।
পিব ভৃঙ্গমনো ভবরোগহরাং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥
কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ী নমোঽস্তু তে॥
লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে।
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥
পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥
দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥
স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥
প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
প্রদায় চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্॥
জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং শ্রীমায়ের সেবক চতুষ্টয়—অর্থাৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ—শ্রীমাকে কি চোখে দেখতেন সে বিষয়ে পূর্ববর্তী দুটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।—সম্পাদক

আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন তারই একটি রূপরেখানির্মাণ এই রচনার লক্ষ্য। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সীমিত হলেও প্রাপ্ত তথ্য-উপাদানের উপর নির্ভর করেই এই রূপরেখা-গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে।

॥ ১ ॥

স্বামী শিবানন্দ

বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী-সন্তানগণ বিশেষভাবে শ্রীমায়ের উপস্থিতি কামনা করতেন, কারণ শ্রীমাকে তাঁরা সাক্ষাৎ জগদম্বা জানতেন। তাঁদের এই জ্ঞান এবং দুর্গাপূজার সময় শ্রীমাকে নিয়ে তাঁদের দিব্য আনন্দের কিছু পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। ১৯১৬ সনে মঠের দুর্গাপূজার একটি বিবরণ পাওয়া যায় স্বামী শিবানন্দের একটি পত্রে। স্বামী তুরীয়ানন্দকে লেখা এই পত্রে লক্ষ্য করি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'এবার আবার শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষরূপে হইল—অনুমানের আর প্রয়োজন ছিল না।'[৪]

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর তারিখে একটি চিঠিতে মহাপুরুষ মহারাজ লিখছেন: 'এ আশ্রমে [কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে] এবার শ্যামা ও জগদ্ধাত্রী পূজা প্রতিমায় অতি আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীমাও আশ্রমের অতি নিকটে একটি বাটীতে রহিয়াছেন—পূজার সময় তিনি প্রতিমার সন্নিকটে ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাইতেন, তাহাতে মূর্তি যেন সজীব হইয়া উঠিত এবং ভক্তদের চিত্তে উৎসাহ, আনন্দ ও পবিত্রতার স্রোত বহিয়া যাইত।'[৫]

জনৈক ভক্ত দুর্গাপূজার ছুটিতে বাড়ি এসে শ্রীমায়ের মূর্তি (সম্ভবত দুর্গা-প্রতিমার স্থলে) পূজা করছেন জেনে তিনি ভক্তটিকে লিখছেন (২৭ অক্টোবর ১৯১৫): 'শ্রীশ্রীমার মূর্তি পাইয়া পূজা করিতেছ শুনিয়া আমার বিশেষ আনন্দ হইল। তোমাদের জীবন ধন্য হইয়া যাইতেছে।'[৬]

বেলুড় মঠের তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের তত্ত্বাবধানে স্বামী শিবানন্দ নিয়মশৃঙ্খলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন—তরুণ সাধুদের মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু সঙ্ঘজননী শ্রীমা যখন কোনও ক্ষেত্রে তাঁকে ক্ষমার আদেশ দিয়েছেন, তখনই তিনি তা নির্বিচারে নতশিরে সানন্দে মেনে নিয়েছেন। শ্রীমায়ের বিধানকে তিনি জানতেন চরম আদালতের বিধান। একবার জনৈক ব্রহ্মচারী ভয় পান, তাঁকে কোনও একটি অন্যায় কাজের জন্য মহাপুরুষ মহারাজ মঠ থেকে সরিয়ে দেবেন। ভীত ব্রহ্মচারী একবস্ত্রে পদব্রজে জয়রামবাটী গিয়ে শ্রীমায়ের শরণ নেন। শ্রীমা তাঁকে আশ্রয় দিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে ডাকযোগে একটি চিঠি দেন।

চিঠিতে বলেনঃ 'বাবাজীবন তারক, ছোট নগেন তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে। তুমি তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে আমার কাছে চলে এসেছে। তা, বাবা, মায়ের কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে। তুমি, বাবা, তাকে কিছু বলো না।' উত্তর না আসা পর্যন্ত শ্রীমা উক্ত ব্রহ্মচারীকে নিজের কাছে রেখে দেন। পত্রপাঠ মহাপুরুষ মহারাজ উত্তর দিলেনঃ 'ছোট নগেন আপনার নিকট গিয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ...তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন। ...আমি তাহাকে কিছুই বলিব না।' ব্রহ্মচারী মঠে ফিরে এলে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেনঃ 'ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি?'[৭] এই সম্পর্কে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একবার মহাপুরুষ মহারাজ স্থির করেন মঠে দুর্গাপূজা হবে না। বাবুরাম মহারাজ [স্বামী প্রেমানন্দ] অসুস্থ হয়ে বলরাম মন্দিরে ছিলেন। দুটি বিশিষ্ট ভক্ত তাঁকে গিয়ে বলেনঃ 'মহারাজ, এবার মঠে দুর্গা-পূজা করবার খুব আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, এবার আর মঠে পূজা হবে না।' বাবুরাম মহারাজ তাঁদের পরামর্শ দিলেনঃ 'তোরা এক কাজ কর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী উদ্বোধনে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে পূজা করবার ইচ্ছা প্রকাশ কর। তিনি কি বলেন দেখ্।' শ্রীমায়ের কাছে গিয়ে সব বলতে তিনি বললেনঃ 'মা দুর্গা যদি নিজের ইচ্ছায় আসেন তবে আমাদের হ্যাঁ না করবার কি আছে?' ভক্ত দুটি তখনই বেলুড় মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে শ্রীমায়ের কথা বললেন। মহাপুরুষ মহারাজ সেকথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই বললেনঃ 'মা বলেছেন, তাহলে পূজো হবে।'[৮] বলা বাহুল্য সেবার যথারীতি মঠে দুর্গাপূজা হল। প্রত্যক্ষ-দর্শী সূত্রে জানা যায়ঃ 'ইহার পর থেকে মহাপুরুষ মহারাজেরও দুর্গাপূজার উপর একটা অদ্ভুত আগ্রহ দেখেছি। তারপর থেকে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দুর্গাপূজা করেছেন এবং স্থায়ীভাবে দুর্গাপূজার ব্যবস্থাও করেছেন শুনেছি।'[৯]

শ্রীমায়ের প্রতি স্বামী শিবানন্দের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ব্যবহারে, কথাবার্তায় এবং চিঠিপত্রে। শ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানদের প্রতিও তাঁর আন্তরিক ভালবাসা। স্বামী অপূর্বানন্দ এই বিষয়ে লিখেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণকে তিনি [স্বামী শিবানন্দ] আপনার হইতেও আপনারজন মনে করিয়া ভালবাসিতেন—কত সেবা-যত্ন, আদর-আপ্যায়ন করিতেন তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। শ্রীমায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সব কিছুই মহা-পুরুষজীর [স্বামী শিবানন্দের] অতি প্রাণের জিনিস ছিল।'[১০]

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাই জনৈক ভক্তকে তিনি লেখেনঃ 'প্রভুর ইচ্ছায় যতদিন তোমাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে ততদিন হইতেই তোমাদের বড়ই আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। তোমরা শ্রীশ্রীমার দয়া পাইয়াছ—ইহাই মূল কারণ, তাহার সন্দেহ নাই।...শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা তোমাদের উপর সর্বদা বর্তমান এবং সেইজন্যই আমারও

তোমাদের সঙ্গে এত ভাব। তোমরা যে গাছের গোড়ায় জল দিতেছ, কাজেই শাখা-প্রশাখায় তাহা পৌঁছিবে।'[১১]

মায়ের স্বরূপ প্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেনঃ 'তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি, জগজ্জননী। শাস্ত্রে যে কালী, তারা, ষোড়শী ইত্যাদি দশমহাবিদ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে, মা-ঠাকরুন ছিলেন সেই দশমহাবিদ্যার একজন। ঠাকুরের যুগধর্ম-সংস্থাপনরূপ নরলীলা পূর্ণ করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁকে সাধারণ মানব কি বুঝবে? আমরাও প্রথমটা তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। নিজের ঐশী ভাব এত গোপন করে থাকতেন যে, তাঁকে কিছুই বুঝবার জো [উপায়] ছিল না। তিনি যে কি ছিলেন তা একমাত্র ঠাকুরই জানতেন। আর স্বামীজী কতকটা বুঝেছিলেন।[১২]

শ্রীশ্রীমায়ের এক জন্মদিনে মহাপুরুষ মহারাজ বলছেনঃ 'আমাদের ভক্তি নেই, তাই এসব দিনের ঠিক ঠিক মাহাত্ম্য বুঝতে পারিনে। আজ কি যে-সে দিন! মহামায়ার জন্মদিন! জীবজগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহামায়া আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষলীলা বোঝা বড় শক্ত। তিনি কৃপা ক'রে না বোঝালে কে বুঝবে? কি সাধারণভাবে তিনি থাকতেন! আমরা তাঁকে কি বুঝব? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন। ...আমাদের মায়ের নাম সারদা। ঐ মা-ই স্বয়ং সরস্বতী। তিনি কৃপা ক'রে জ্ঞান দেন—জ্ঞান অর্থাৎ ভগবানকে জানা—ঐ জ্ঞান হলেই ঠিক ঠিক পাকা ভক্তি সম্ভব। জ্ঞান না হ'লে ভক্তি হয় না। শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক জিনিস—মায়ের কৃপা হলেই তা হওয়া সম্ভব। মা-ই জ্ঞান দেবার মালিক।'[১৩] আবার কোন শ্রীপঞ্চমীর দিন জনৈক ব্রহ্মচারী বেলুড় মঠে প্রতিমায় দেবী সরস্বতীর পূজা করতে বসবার আগে মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে গেছেন; তাঁকে লক্ষ্য করে মহাপুরুষ মহারাজ উচ্চকণ্ঠে বললেনঃ 'মা-ই সাক্ষাৎ সরস্বতী, তাঁর কৃপায় আমাদের মঠে নিত্য তাঁর পূজো হয়। তিনিই কৃপা ক'রে সকলের অজ্ঞান দূর করেন, জ্ঞান ভক্তি প্রদান করেন।' 'জয় মা, জয় মা' বলে মহাপুরুষজী ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠে জোড়হস্তে বিনম্রভাবে মায়ের উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন।[১৪]

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর ত্যাগের পর এক ভক্তদম্পতি শোকার্ত হয়ে বেলুড় মঠে আসেন এবং মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করে নিজেদের অন্তরের প্রবল শোক কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন করেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁদের প্রতি খুব সহানুভূতি প্রকাশ করে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। তারপর মহাপুরুষ মহারাজ একরকম ভাবাবিষ্ট হয়ে বলতে লাগলেনঃ 'মা তো এখন সর্বব্যাপিনী, সকলের মধ্যেই, সকল স্থানেই তাঁকে দেখতে পাবে। যে তাঁকে প্রাণভরে ডাকবে, সে-ই দর্শন পাবে। তিনি এতদিন একস্থানে ছিলেন। এখন সর্বত্র

আছেন। দুঃখের কোন কারণ নেই, ব্যাকুল হয়ে আন্তরিকভাবে ডাকলেই দর্শন দেবেন।'[১৫] একটি পত্রে তিনি এই ভাব প্রকাশ করে লিখছেনঃ 'যে ভক্ত তাঁর অভাবে যত দুঃখ অনুভব করিবেন, তিনি তাঁকে তত বেশী দেখিতে পাইবেন ও হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিবেন; কারণ তিনি [শ্রীমা] সাধারণ মানবী নন, সাধিকাও নন বা সিদ্ধাও নন। তিনি নিত্যা সিদ্ধা, সেই আদ্যাশক্তির এক অংশ-প্রকাশ; যেমন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি তেমনি। এ যুগে ভগবানের ভক্তরূপে অবতার, যুগধর্মসংস্থাপক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায় হইয়া গোপনে (যেমন প্রভুও গোপনে) অতি দীনভাবে দীন পিতামাতার ঔরসে ও গর্ভে, বঙ্গের এক নগণ্য গ্রামে অবতীর্ণা হইয়া জীবের ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণের জন্য সর্বদা তৎপরা থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার কৃপা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহার সেই অহেতুকী মাতৃ-স্নেহ যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। সর্বভূতের অন্তরাত্মা সেই কুণ্ডলিনী শক্তি, সেই জগজ্জননী অহেতুকী স্নেহের পরবশ হইয়া যে ভক্তকে একবার শ্রীকরকমলদ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহার চৈতন্য হইয়াছেই হইয়াছে বা হইবেই হইবে, ইহাই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।'[১৬]

শ্রীমায়ের জন্মতিথিতে মহাপুরুষ মহারাজের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিত। এই রকম এক জন্মতিথিতে দেখা যায় মহাপুরুষ মহারাজ ভোর থেকেই মাতৃগতপ্রাণ শিশুর মতো 'মা মা' বলে ডাকছেন। মায়ের কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা করছেনঃ 'মা, মা, মহামায়া! জয় মা, জয় মা! মা, আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিবেক, অনুরাগ, ধ্যান, সমাধি দিন। ঠাকুরের এ সঙ্ঘের কল্যাণ করুন, সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন, জগতের শান্তি বিধান করুন।' কিছুক্ষণ চুপ করে আবার বলছেনঃ 'আমাদের ভক্তি নেই, তাই এ-সব দিনের মাহাত্ম্য ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনে। আজ কি যে-সে দিন? মহা-মায়ার জন্মদিন। জীবজগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহামায়া আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।'[১৭] স্বামী শিবস্বরূপানন্দ (মতি মহারাজ) বলেছেনঃ 'মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, "আমাদের মা সাধারণ মানবী নন—অবতারবরিষ্ঠের লীলাসঙ্গিনী। ঠাকুরের লীলাপুষ্টির জন্য তিনি নরদেহধারণ করেছেন; রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য সকলের সঙ্গেই এই মা-ই এসেছেন। কিন্তু তাঁকে কে চিনতে পারে? বৌটির মত ঘোমটা দিয়ে থাকতেন—তিনি কৃপা করে না বোঝালে কে বুঝবে তাঁকে! মানুষের সৌভাগ্য যে তাঁরা আসেন কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য যে খুব কম জনই তাঁদের চিনতে পারে।

> অদ্যাবধি গৌড়লীলা করেন গোরা রায়,
> কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

যার দৃষ্টি আছে সেই শুধু ঠাকুর ও মাকে চিনতে পেরেছে।" যেই মায়ের শরীর দাহ শেষ হল আর বৃষ্টি শুরু হল। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "দেবতারা মহামায়ার চিতায় শান্তিবারি বর্ষণ করে চিতার আগুন নেবাচ্ছেন। আজ থেকে এই স্থান মহা-তীর্থ হয়ে গেল। সতীর দেহের এক একটি অংশ পড়ে একান্নটি পীঠ হয়েছে আর

আজ সেই সতীর সারা দেহটা এখানে দাহ করা হল। তাহলে বোঝ, বেলুড় মঠ কি জায়গা! শুধু পীঠ নয় মহাপীঠ! মহাপীঠ! জয় মা! জয় মা!!"'[১৮]

একবার এক যুবক-ভক্ত কয়েকদিন মঠ-বাস করার পর মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ি'তে শ্রীমাকে এবং 'বলরাম মন্দিরে' স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দকে (তখন তাঁরা সেখানে ছিলেন) দর্শন করতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে খুব সন্তোষ প্রকাশ করে মহাপুরুষ মহারাজ তাকে বলেছিলেনঃ 'প্রথম বাগবাজারে যাবে—মাকে দর্শন করবে। তিনি আমাদের সকলের মা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী; ঠাকুরের লীলাপুষ্টির জন্য নরদেহ ধারণ করেছেন। তাঁর অবস্থিতিমাত্রেই জগৎ ধন্য হয়ে যাচ্ছে। মাকে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। তাঁর ভাব এত চাপা যে, তাঁকে কে বুঝবে? তিনি মোটেই ধরা দিতে চান না। সাধারণ গৃহস্থের ঘরের মেয়েদের মতো থাকেন—সব কাজকর্ম করেন, ভক্তসেবা যেন তাঁর প্রধান কাজ! কে বলবে যে তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! ঠাকুর আমায় একদিন বলেছিলেন, "ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা—অভেদ"। মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে খুব ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা করবে। তিনি প্রসন্না হলেই জীবের ভক্তি মুক্তি সব হয়।'[১৯] মহাপুরুষ মহারাজ স্বামীজীর মতো বিশ্বাস করতেন যে মায়ের আবির্ভাবের একটা যুগান্তকারী তাৎপর্য আছে—বিশেষত নারীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে। তাঁর একদিনের একটি উক্তিতে তাঁর এই বিশ্বাসের পরিচয় মেলেঃ 'এ যুগের সমগ্র নারীজাতির আদর্শ হলেন তিনি।... জগতের সমগ্র নারীজাতিকে জাগাবার জন্য মহাশক্তিরূপিণী মা এসেছিলেন নরদেহে। দেখ না, মায়ের আগমনের পর থেকেই সব দেশের নারীজাতির মধ্যে কি অভিনব জাগরণ শুরু হয়েছে। তারা এখন নিজেদের জীবন পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্য বদ্ধপরিকর। এখনও হয়েছে কি? এই ত সবে মাত্র আরম্ভ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি অদ্ভুত নারীচরিত্রের বিকাশ হয়েছিল, এ যুগে মেয়েদের ভিতর তার চাইতে বড় বড় আধারের বিকাশ হবে। মেয়েদের ভিতর আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়ে অতি আশ্চর্যজনক জাগরণ এসেছে, আরও আসবে। এসব ঐশী শক্তির খেলা! সাধারণ মানুষ এ সকলের গূঢ় মর্ম কিছুই বুঝতে পারে না।'[২০]

॥ ২ ॥

স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সেবক এবং প্রথম বিস্তৃত জীবনীকার স্বামী অন্নদানন্দ বলতেনঃ 'মায়ের সম্পর্কে গঙ্গাধর মহারাজকে কিছু বলতে খুব কমই শুনেছি। ঠাকুর এবং স্বামীজী সম্পর্কেই তিনি বেশী বলতেন। তবে আমাদের

বা খুব অন্তরঙ্গ কোন ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁকে কখনও কখনও বলতে শুনেছি, "মা হলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী। স্বয়ং ভগবান এবার রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর স্বয়ং ভগবতী আমাদের মা-রূপে। ভগবান আর ভগবতী মিলেই তো অবতারলীলা। দেখ না, ঠাকুরের আগে ভগবান যতবার এসেছেন অবতার হয়ে—সেই রামচন্দ্র থেকে চৈতন্যদেব পর্যন্ত—ততবার ভগবতীকেও আসতে হয়েছে। সীতা বল, রাধা বল, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া—আমাদের মা-ই সব হয়েছিলেন। মায়ের স্বরূপ ঠাকুর নিজেই আমাদের কারও কারও কাছে স্বয়ং প্রকাশ করেছিলেন। একজনকে [স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে] বলেছিলেন,

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥

স্বামীজী মাকে বলতেন, জ্যান্ত দুর্গা। তাই তো মঠে আরতির সময় মায়ের উদ্দেশ্যে চণ্ডী থেকে 'সর্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে' স্তব গাওয়া হয়।"'[২১]

একবার শ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে মন্দিরে মঙ্গলারতির পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর ঘরে একজন ভক্তকে গান গাইতে বলায় সে একটি রাধার গান গায়। তাতে স্বামী অখণ্ডানন্দ ভক্তটিকে বলেনঃ 'ও আবার কেন? মায়ের গান জান না?' তারপরে আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেনঃ 'না, না—আমাদের মা তো সবই।'[২২] সেদিন দেখা গেল মহারাজ শুধু মায়ের কথাই ভাবছেন। বলেছিলেনঃ 'আজ মায়ের তিথি-পূজা বলে কেবলই মায়ের কথা মনে পড়ছে।' পরে বলেছিলেনঃ 'কাশীপুরে [মহা-সমাধির পর] ঠাকুরের দেহ তখনও ঘরে। ওঃ [মায়ের] সে কি করুণ কান্না! মা যে বাড়ীতে থাকেন, তা কেউ বুঝতে পারত না। মা এসে আছড়ে পড়লেন, আর কান্না—"মা গো, কোথা গেলি গো; আমাকে কার কাছে রেখে গেলি।" মা ঠাকুরকে মাতৃ-ভাবে দেখতেন, এইটিই এখানে দেখবার। এরপর কিন্তু আর কখনও মায়ের এরকম কান্না দেখা যায়নি। এই একটিবার তাঁকে এমন উতলা হতে দেখেছি।'[২৩]

গঙ্গাধর মহারাজ মাকে যে পূজো নিবেদন করতেন তা ছিল অন্তরের উজাড় করা ভালবাসা ও ভক্তির অর্ঘ্য। তা ছিল তাঁর ভাবের পূজো। মায়ের পূজো কিভাবে হবে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ 'মা নাও, মা খাও, মা পর—এই তো পূজা। খুব প্রাণ থেকে বলতে হয়—"মা, এই নাও, তোমারই জিনিস তোমাকে দিচ্ছি। কত ভক্ত তোমাকে আজ কত ভাল ভাল জিনিস দিচ্ছে। আমি যা পেরেছি, এনেছি। আর তো কিছু পাইনি। তুমি নিজগুণে নাও মা"—কেঁদে কেঁদে বলবে আর মনে করবে তিনি যেন প্রসন্না হয়ে সব নিচ্ছেন। আর হোম করবে যেন সর্বস্ব আহুতি দিচ্ছ—আটাশটি বেলপাতা মায়ের নাম বলে বলে দেবে। তা নয়, সারাদিন মায়ের পূজো হচ্ছে—এদিকে মায়ের ছেলেরা সব না খেয়ে শুকুচ্ছে, আর ওদিকে মায়ের ভোগই নাবছে না। আমাদের মা এরকম চাইতেন না। ভাবের পূজো—বুঝলে?'[২৪]

একবার সারগাছি আশ্রমে কিছু নতুন গোলাপ ফুলের চারা লাগানো হয়েছে। চারা দিন দিন বেড়ে উঠছে। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা আগতপ্রায়। স্বামী অখণ্ডানন্দ ঐ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বলেছিলেনঃ 'মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, "মা, যদি ফুল হয় তো তোমায় সাজাবো।" বলব কি! তিথিপূজার কদিন আগে কুঁড়ি দেখা দিল। ধীরে ধীরে ঠিক তিথিপূজার দিন ভোরে পাঁচটি ফুল গাছ আলো ক'রে ফুটল, আর মনের আনন্দে মাকে নিবেদন করলাম।'[২৫]

স্বামী অন্নদানন্দ বলেছেনঃ 'স্বামীজী স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখেছিলেন, "কর্ম, কর্ম, কর্ম, হাম আউর কুছ নেহি মাঙতে হেঁ—কর্ম, কর্ম, কর্ম, even unto death ...ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহো-ভাগ্যম্।"* স্বামীজীর সেই অগ্নিগর্ভ প্রেরণাকে পাথেয় করে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে লোককল্যাণব্রতে নিজেকে আজীবন নিয়োজিত রেখে-ছিলেন। শরীরের কষ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করে তিনি জনকল্যাণকর্ম করে যেতেন, রোগ ভোগ সত্ত্বেও বিশ্রাম নিতেন না। ক্রমাগত অনিয়মে ও বারংবার ম্যালেরিয়ায় ভুগে এবং তা সত্ত্বেও অবিরাম পরিশ্রমের ফলে স্বামী অখণ্ডানন্দের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়তে থাকে। গুরুভাইরা তাঁকে বার বার অনুরোধ করেন কলকাতায় এসে বিশ্রাম নিতে এবং চিকিৎসা করাতে। কিন্তু সেকথায় তিনি কর্ণপাত করলেন না। স্বামীজী তাঁকে মানুষের সেবায় প্রাণপাত করতে বলেছিলেন। তাই করতেন তিনি তখন। অব-শেষে তাঁর অসুখের খবর শ্রীমায়ের কাছে পৌঁছল। সেই সংবাদ শুনে শ্রীমা তাঁকে কলকাতায় ডেকে পাঠান। সেটা ১৯১৫ সাল। স্বামী অখণ্ডানন্দ সঙ্গে সঙ্গে "উদ্বোধনে" মায়ের চরণে এসে প্রণত হলেন। তাঁর উপর সঙ্ঘজননীর আদেশ হল, "এখন থেকে তুমি বলরাম মন্দিরে থাকবে। কবিরাজ তোমার চিকিৎসার ভার নেবেন। তিনি যেমন বলবেন, ঠিক সেইরকম মেনে চলবে। আর আমাকে না জানিয়ে তুমি কোথাও যাবে না।" স্বামী অখণ্ডানন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে সুবোধ বালকের মতো সেই আদেশ শিরোধার্য করে বলরাম মন্দিরে এসে থাকতে লাগলেন। শ্রীমায়ের নির্দেশে তাঁর কবিরাজী চিকিৎসা চলতে থাকল। এইসময়ে একদিন স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলরাম মন্দিরে আসেন এবং বলেন, "ভাই, তুমি এতদিন এখানে এসেছ, একবার মঠে গেলে না!" স্বামী অখণ্ডানন্দ বললেন, "মা জোর করে আমাকে সারগাছি থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। এখন মায়ের নির্দেশে কবিরাজ আমার চিকিৎসা করছেন। মায়ের আদেশ—তাঁকে না জানিয়ে আমার কোথাও যাওয়া চলবে না এখন। সুতরাং এখন তো ভাই মাকে না জানিয়ে কোথাও যেতে পারব না। গেলেই মা বকবেন, মঠে গেলেও।" স্বামী প্রেমানন্দ তাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে মঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য "উদ্বোধনে" গিয়ে শ্রীমায়ের অনুমতি নেন। তার-পর দুই গুরুভাই মঠে যান।'[২৬]

পরিব্রাজক জীবনে যখন তিনি তপস্যায় বেরিয়েছেন তার প্রাক্কালে সঙ্ঘজননীর আশীর্বাদ ও অনুমতি নিয়েছেন তিনি। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি পরিব্রজ্যায় যাবার আগে স্বামীজী ও তিনি শ্রীমাকে প্রণাম করতে গেলে শ্রীমা তাঁকে বলেন: 'বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলাম। তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জানো—দেখো, যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।'[২৭] স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রব্রজ্যাকালে শ্রীমায়ের ঐ আদেশ সবসময় স্মরণ রেখেছিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ বিশ্বাস করতেন, শ্রীমা-ই হলেন এযুগের নারীর আদর্শ। তিনি মেয়েদের শ্রীমায়ের আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করতেন।[২৮]

সঙ্ঘজননী শ্রীমা স্বামী অখণ্ডানন্দের হৃদয়ে কোন্ স্থান অধিকার করেছিলেন তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্বামী অখণ্ডানন্দের একনিষ্ঠ সেবক তথা জীবনীকার স্বামী অন্নদানন্দের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে: 'দেখিতে দেখিতে ১৩২৭ সালের বিষাদমাখা ৪ঠা শ্রাবণ আসিয়া পড়িল। "রাত্রি ১টায় শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উদ্বোধনে মহাসমাধিলাভ করিয়াছেন"—সকাল সাতটায় এই মর্মে এক তারবার্তা পাইয়া অখণ্ডানন্দ এতই অভিভূত হইলেন যে, উহা পাঠ করিবার কালে তিনি যে অবস্থায় বসিয়াছিলেন, চিত্রপুত্তলিকার মতো সেই অবস্থায় সমস্ত দিন বসিয়া রহিলেন—দেহ স্থির, নেত্র নিষ্পলক! ইহার পরও পাঁচ ছয় দিন স্বাভাবিকভাবে তিনি কোন কাজকর্ম করিতে সমর্থ হন নাই।

'যথা সময়ে এই উপলক্ষে একটি বিশেষ পূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করা হয়। এই বৎসরই অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা সপ্তমীতে শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা যথাযথ সুসম্পন্ন হইল। পরদিন আশ্রম হইতে দুই মাইল দূরে অখণ্ডানন্দের প্রিয় স্থান "রাজসাগরে" সেই বটবৃক্ষমূলে নির্জন সুগম্ভীর প্রাকৃতিক পরিবেশে আয়োজিত হইল সপ্তদিবসব্যাপী এক বিরাট মহোৎসব। যে আসিল সেই প্রসাদ পাইল—অবারিত দ্বার। দিবারাত্র "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ও মুহুর্মুহু: মাতৃনামের জয়ধ্বনিতে নীরব বনস্থলী মুখরিত হইয়া উঠিল।'[২৯]

॥ ৩ ॥

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

১৮৯৭ সনে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ [তখন তাঁর পূর্বাশ্রমের হরিপ্রসন্ন নামে পরিচিত] যখন আলমবাজার মঠে যোগ দেন, সেইসময়ে শ্রীমার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সম্ভবত শ্রীমাকে তিনি কিছুদিন পর্যন্ত গুরুপত্নীর অধিক কিছু মনে করতেন না। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করে দেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিভাবে স্বামীজী তাঁকে শ্রীমায়ের স্বরূপ বুঝিয়ে দেন সেটি বিজ্ঞানানন্দজী পরবর্তী কালে একদিন বেলুড় মঠে ভক্তদের নিকট ব্যক্ত করেন। সেদিন তিনি বলেন: 'আমি মাঠাকরুণের কাছে বেশি যেতাম না। স্বামীজী কি করে তা জানতে পারেন। শ্রীশ্রীমা তখন বলরাম-মন্দিরে। সেখানে স্বামীজী একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন—"পেসন, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?" আমি বললাম, "না মশাই।" স্বামীজী বললেন—"সে

কি? এক্ষুণ-ই যাও, মাকে প্রণাম করে এসো।" তাই শুনে আমি তো মাকে প্রণাম করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি—কোনও প্রকারে টিপ করে একটা প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বলছেন—"সে কি পেসন,—মাকে এই করে প্রণাম করতে হয়? সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর; মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।"—বলেই তিনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। আমিও মাকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে চলে আসি।'[৩০]

সেইদিন থেকে তিনি মাকে চিনেছেন, বুঝে নিয়েছেন তাঁর স্বরূপ। জেনেছেন, তিনি শুধু গুরুপত্নী নন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী—তাঁর একান্ত আপনজন। তাই বিজ্ঞানানন্দজী বলেছেন: 'মা তো আমার আপনার জন, মায়ের কাছে মন তো সদাই নত।'[৩১]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একদিন উদ্বোধনে গিয়েছেন। ১৯১২-১৩ সনের কথা। উপরে শ্রীমা, একতলায় বিজ্ঞানানন্দজী বসে আছেন। যথাসময়ে উপর থেকে ডাক এল মাকে প্রণাম করবার। তিনি অতঃপর বলছেন: 'এক এক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—অন্তরে এক এক করে সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি পদ্ম (চক্র) ফুটে উঠছে। পরমানন্দে গোটা দেহমন ভরে উঠলো।' বিজ্ঞানানন্দজীর এই উক্তি প্রকাশ করে স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর একটি স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'এটি একটি মায়ের সম্বন্ধে [তাঁর] বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-অনুভব। ভক্তের সমস্ত . . . সত্তাকে নাড়া দিয়ে আমূল রূপান্তরিত করা ইনটিগ্র্যাল একস্‌পিরিয়েনস্‌। পেরাগের [প্রয়াগের] এই নীরব দীর্ঘ তপস্বী মায়ের জীবৎকালে এই অনুভব-কথা পরম বোদ্ধা শ্রদ্ধেয় রাখাল-মহারাজ-সকাশে নিবেদন করে, ব্রহ্মরসিককে বলে পরম সুখ পান। ভবের খেলা ভাঙবার আগে ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে [তিনি] মায়ের মহিমা খুব বলতেন।'[৩২]

১৯৩৩ সনে এলাহাবাদে ভক্তদের কাছে তিনি বলেন: '...মায়ের নাম জপ করি—"মা আনন্দময়ী" বলে। মা'র নামের একটি বিশেষ গুণ আছে। তিনি স্ত্রীলোক থেকে আর তাদের কুভাবে দেখার হাত থেকে রক্ষা করেন। এটি আমি বেশ অনুভব করেছি। তাঁর নামেতে ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ধন, দৌলত সবই লাভ হয়। চণ্ডীতেও আছে—তিনি ঋদ্ধি সিদ্ধি সব দিতে পারেন। ঠাকুরের নামের চাইতে মায়ের নামে আমি বল পাই বেশী।'[৩৩] আর একদিন তিনি বলেন: 'সাধারণ লোকে স্ত্রীলোকদের ঠিকভাবে দেখতে পারে না—তাই পরস্পরের মনে পাপ আসে। ... ঠাকুরের ভিতর যে আধ্যাত্মিক শক্তি সদা সর্বদা খেলা করত, তার কাছে অন্য সব শক্তি হার মেনে যেত; কাম ক্রোধ সব সেই শক্তির কাছে কেঁচো! এসব রিপুদের দমন করতে হলে ঐ শক্তির কথা ভাবতে হয়—ঠাকুরকে স্মরণ করতে হয়—মাকে স্মরণ করতে হয়। তাহলে মন থেকে ওসব হীনভাব চলে যাবে। শক্তি পূজা করা বড় শক্ত। ঠাকুর ও মার কৃপা আছে বলেই আমাদের সঙ্ঘের মধ্যে সাধুরা শক্তিপূজায় সিদ্ধ হতে পারছে।'[৩৩ক]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলতেন: 'ঠাকুর চৈতন্য-স্বরূপ, মা চিন্তা-স্বরূপিণী। ... মা সর্বশক্তিময়ী।'[৩৪] তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখার উপদেশ দিয়েছেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকে একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন: 'ঠাকুরের কাছে মন্ত্র নেওয়া আর মার কাছে মন্ত্র নেওয়ায় কোন তফাৎ নেই। ঠাকুর আর মা কি ভিন্ন? আমি তো মার নামেও মন্ত্র দিয়ে থাকি।'[৩৫] অন্য এক সময়ে জনৈক ভক্তকে তিনি উপদেশ দেন এই বলে: 'ঠাকুর ও মাকে অভেদ-দৃষ্টিতে দেখবি। মনে রাখবি, ঠাকুরের কৃপা না হলে মাকে পাওয়া যায় না, আবার তেমনি মায়ের কৃপা না হলেও ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। মার কাছে শক্তি চাইতে হয়। শক্তি না হলে কোন কাজ হয় না।'[৩৬] একবার এক ভক্ত রুদ্রাক্ষের একটি জপমালা শোধনের জন্য বিজ্ঞানানন্দজীর হাতে দেন। মালাটি হাতে নিয়ে তিনি বলেন: 'আমি তো ঠাকুর ও মায়ের নাম মালায় জপ করে মালা শোধন করে থাকি।' বিজ্ঞানানন্দজী তিনবার শ্রীশ্রীঠাকুর ও তিনবার শ্রীমায়ের নাম মালাতে জপ করে সেটি মাথায় ঠেকিয়ে ভক্তকে ফিরিয়ে দেন।[৩৭] ১৯৩১ সনে একদিন এলাহাবাদ মঠে দুইজন সন্ন্যাসীকে ভগবানলাভের বিষয়ে উপদেশ দেবার সময়ে তিনি বলেন: 'সমস্ত সংস্কারের পুঁটুলি ফেলে দিয়ে যে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারে সেই তো সন্ন্যাসী।'[৩৮]

বাল্মীকি-রামায়ণ ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় বিজ্ঞানানন্দজী প্রায় সর্বক্ষণ সীতারামের ভাবে তন্ময় থাকতেন। এইসময়ে তিনি একদিন (১৯৩৪ সনের ডিসেম্বরে) ভক্তদের কথায় কথায় বলেন: 'কয়েকদিন পূর্বে বাইরে শুয়ে আছি; এমন সময় হঠাৎ ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন—"কই আমার ধনুর্বাণ কোথায়?" তাই ভাবলাম ঠাকুর ও মায়ের ছবিও রামায়ণে দেব। ছোট একখানি ব্লক করিয়ে ফেললাম। কিন্তু ব্লকটা ইংরাজী মতের হয়ে গেছে ... মা আগেই বসে গেছেন। ঠাকুর মা'র বাঁদিকে বসেছেন। তা আর কি করা যাবে। মায়ের যা ইচ্ছা—তিনি আগেই বসে পড়লেন।'[৩৯] এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঠাকুর ও শ্রীমাকে তিনি রামচন্দ্র ও সীতা দেবী রূপেই দেখতেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের একটি দিব্য দর্শনের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একবার উত্তর প্রদেশের এক ভক্তের গৃহে গিয়েছিলেন। ভক্তটির ইষ্ট দেবতা শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর ঠাকুরঘরের বেদীতে ছিল রামচন্দ্র এবং সীতা দেবীর পট। বিজ্ঞানানন্দজী ঠাকুরঘরে রামচন্দ্র আর সীতা দেবীকে প্রণাম করবার পর সেই সিংহাসনে দেখলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা বসে আছেন। স্পষ্ট সেই দর্শন।[৪০]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ জানতেন, কৃপাময়ী মায়ের শরণ নিলেই সব হয়ে যায়, তিনি দয়া করেন সহজেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি: 'মাকে ডাকবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা

হয় না। মা—বড় ভাল।’[৪১] ‘মা তো রক্ষা করছেনই, ডাক আর নাই ডাক! তবে ডাকলে আরো আনন্দে বিভোর হবে। ... মাকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে পারলে ভারি আনন্দ। এতে দাদা কোন সন্দেহ নেই!’[৪২] ‘... পূর্বে ভগবানকে পিতৃভাবে আরাধনা করবারই ঝোঁক ছিল। মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা সবই করতাম কিন্তু বাপের দিকেই টান ছিল বেশী। এখন “মা” “মা” বলি সকাল সন্ধ্যায়—আর মনে হয়, ঠিক যেন মায়ের কোলের শিশুর মতন আছি। তাঁর কোলেই বসে রয়েছি।’[৪৩]

পরিণত বয়সে বিজ্ঞানানন্দজী একদিন বলেন: ‘সব রকমই তো কিছুটা করা গেল, এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে পড়ে আছি। এখন এই মনে হচ্ছে যেন তাঁদের নাম ক’রে ক’রে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।’[৪৪]

মহাপ্রয়াণের পূর্বে বিশ-বাইশ দিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন—প্রায় বিনা চিকিৎসায়। এই সময়ে জ্ঞাতসারে তিনি কারও সেবা নেননি। দিনরাত্রি তখন তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিল একাক্ষর একটি নাম—‘মা’। সেবকরা তাঁর ঘর থেকে ভেসে আসা ‘মা’ ‘মা’ ধ্বনি নিরন্তর শুনতেন। সেই ‘মা’-ডাকটি পরম নির্ভরতার সুরে চিহ্নিত। মাকে কেমন করে ধরে থাকতে হয় সেটি ভক্তদের যেন তিনি বিশেষভাবে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন।

॥ ৪ ॥

স্বামী প্রেমানন্দ

১৩১৯ সালে (১৯১২) দুর্গাপূজায় শ্রীমা ষষ্ঠীর দিন এসে একাদশী পর্যন্ত মঠের উত্তরদিকের বাগানবাড়িতে ছিলেন। কথা ছিল ষষ্ঠীর দিন বিকালে শ্রীমা মঠে এসে পৌঁছবেন। কিন্তু সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলেও মায়ের গাড়ি মঠে এসে পৌঁছল না দেখে স্বামী প্রেমানন্দ চঞ্চল হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। মঠের প্রবেশদ্বারে তখনও মঙ্গলঘট ও কলাগাছ বসানো হয়নি দেখে বললেন: ‘এসব এখনও হয়নি, মা আসবেন কি!’ দেবীর বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গাড়ি মঠের ফটকে এসে পৌঁছল। গোলাপ-মা শ্রীমাকে হাত ধরে সন্তর্পণে গাড়ি থেকে নামালেন। নেমেই মা সহাস্যে বললেন: ‘সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।’[৪৫] বাস্তবিক, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ শ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞান করতেন। মঠে দুর্গাপূজাও ছিল প্রকারান্তরে তাঁরই পূজা। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে ১৩১৯ সালে মঠের ঐ দুর্গোৎসবের আর একটি ঘটনাচিত্র: ‘ষষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া প্রেমানন্দ-স্বামী ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণ গাড়ী টানিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিতেছেন। প্রেমানন্দ-স্বামী আনন্দে টলিতেছেন—চোখমুখ দিয়া যেন আনন্দ ঠিকরিয়া পড়িতেছে! মহানবমীর দিন দ্বিপ্রহরের পর গোলাপ-মা আসিয়া বলিলেন, “শরৎ, মা-ঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুশি, তোমাদের তাঁর আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।” শরৎ-মহারাজ [স্বামী সারদানন্দ] আনন্দ-গম্ভীর কণ্ঠে “বটে?” বলিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বাবুরাম-মহারাজের [স্বামী প্রেমানন্দের] দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বাবুরাম, শুনলে?”

...উভয়ে তখন আনন্দে কোলাকুলি।'[৪৬] উদ্ধৃত অংশে লক্ষ্য করবার বিষয় শ্রীমায়ের আশীর্বাদবার্তায় স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের আনন্দঘন ভাবটি। এই আনন্দের কারণ, তাঁরা সেই মুহূর্তে অনুভব করেছেন, তাঁদের দুর্গাপূজো সার্থক। শ্রীমা তুষ্ট, জগন্মাতা দুর্গাও অতএব প্রসন্ন। শ্রীমা-ই যে স্বয়ং দুর্গা!

১৯১৬ সালে দুর্গাপূজায় সপ্তমীর দিন শ্রীমা মঠে এসেছিলেন এবং যথারীতি উত্তরের বাগানবাড়িতে ছিলেন। হঠাৎ শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু অসুস্থ হয়ে পড়ায় শ্রীমা কলকাতায় ফিরে যেতে চান—এই সংবাদ স্বামী ধীরানন্দ স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখকে দেন এবং স্বামী প্রেমানন্দকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন শ্রীমাকে মঠে থেকে যেতে অনুরোধ করেন। স্বামী প্রেমানন্দ তার উত্তরে বলেছিলেনঃ 'মহামায়াকে কে, বাবা, নিষেধ করতে যাবে? তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করবে?' অবশ্য রাধু সুস্থ বোধ করায় শ্রীমা নিজেই যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছিলেন।[৪৭]

বাবুরাম মহারাজ বলতেনঃ 'শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর অভেদ।'[৪৮] তাই তিনি পরিণত বয়সেও এবং মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও বাইরে কোথাও যেতে হলে শ্রীমায়ের অনুমোদন না নিয়ে এক পা-ও অগ্রসর হতেন না। একবার পূর্ব-বঙ্গের ভক্তরা তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি শ্রীমায়ের চরণে তা নিবেদন করেন এবং বলেনঃ 'মা, আমি মূর্খ মানুষ, আমায় নানা স্থানের লোক এসে টানা-টানি করে, আমি গিয়ে কি করব, মা?' শ্রীমা তখন বলেছিলেনঃ 'ভয় কি, বাবুরাম, ভয় কি? ঠাকুর তোমার কণ্ঠে বসে কথা কইবেন।' মায়ের অভয়-আশীর্বাদ শিরোধার্য করে বাবুরাম মহারাজ পূর্ববঙ্গ যাত্রা করেছিলেন।[৪৯] এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ণনাটি দীর্ঘ হলেও বাবুরাম মহারাজ শ্রীমাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন সে-সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে তা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

স্বামী প্রেমানন্দের স্নেহভাজন ভক্ত ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) বাংলা ১৩২১ সনের (১৯১৪ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৬, ১৭, ১৮ই মালদহে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। তাঁদের এবং মালদহের সমস্ত ভক্তদের একান্ত ইচ্ছা স্বামী প্রেমানন্দ সেই উৎসবে যোগদান করেন। ইতি-পূর্বে স্বামী প্রেমানন্দ ঐ উৎসবে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। উৎসবের দিন স্থির হওয়ার পর ধীরেন্দ্র চিঠি দিয়ে স্বামী প্রেমানন্দকে সব জানান। কিন্তু কোন উত্তর পান না। পুনরায় চিঠি দেন। কিন্তু তারও কোন উত্তর না আসায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে বাবুরাম মহারাজের উত্তর এল। তাতে তিনি জানালেন যে বিভিন্ন কারণে তাঁর উৎসবে আসা হবে না। সকলে খুব হতাশ হয়ে গেলেন। উৎসবের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকী। অগত্যা ধীরেন্দ্র ও দুজন যুবক ভক্ত

বেলুড় মঠে আসেন। তাঁদের দেখে মহারাজ [স্বামী প্রেমানন্দ] খুব খুশী। শিশু-স্বভাব মহারাজ বললেনঃ 'তোরা এসেছিস্? ভাবছিলাম তোরা বুঝি আমায় আর ডাকলিই না।' স্নানাহারের পর বিকেলবেলা ধীরেন্দ্র মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ '"মহারাজ, কবে এখান থেকে রওনা হলে আপনার পক্ষে সুবিধা হয় তাহা জানতে পারলে ভাল হয়।"

বাবুরাম মহারাজ—এইত এলি, এখনই রওনা হওয়ার কথা? এসেছিস ২।১ দিন বিশ্রাম কর্ না রে?

ধীরেন্দ্র—২।১ দিন এমনি কেটে যাবে। ওখানে ওঁরা সব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। মালদহে আমাদের যাবার তারিখটা জানিয়ে দিলে ওঁরা নিশ্চিন্ত হতেন।

বাবুরাম মঃ—যাওয়া কি আমার ইচ্ছায় হয়?

ধী—তবে কার ইচ্ছায় হয় মহারাজ?

বাবুরাম মঃ—শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা যদি হয় তবে যাওয়া হবে। আমরা তো কত কি ইচ্ছা করি, কিন্তু কটা কাজ নিজেদের ইচ্ছামত করতে পারি?

ধী—শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা কি ক'রে বুঝবেন, মহারাজ?

বাবুরাম মঃ—কেন, সাক্ষাৎ মা জগদম্বা রয়েছেন বাগবাজারে? তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। তিনি যদি অনুমতি দেন তবে যাওয়া হবে।

ধী—শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কবে যেতে চান?

বাবুরাম মঃ—চল না, কাল সকালেই যাওয়া যাবে। সকাল বেলা দেখবি এখান দিয়ে অনেক নৌকা কলকাতার দিকে যায়। একখানাকে ডাকলে এখানে লাগিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে।

'ধীরেন্দ্র যেন আশা ও নৈরাশ্যের ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া কেবল উঠিতেছেন ও পড়িতেছেন। মন খুবই উদ্বিগ্ন। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইলেন। একখানা নৌকা ডাকিলেন। নৌকা ঘাটে লাগিলে বাবুরাম মহারাজকে ডাকিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন মহারাজ নিজেই বরাবর নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

'অল্প সময়ের মধ্যে নৌকা বাগবাজার ঘাটে পৌঁছিল। আমরাও মাতৃমন্দিরে পৌঁছিলাম। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ নীচের ছোট ঘরটিতে বসিয়াছিলেন। সেখানে বাবুরাম মহারাজ শরৎ মহারাজের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন—খবর আসিল। বাবুরাম মহারাজ উপরে গেলেন। ধীরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া জোড়হস্তে বসিলেন। ধীরেন্দ্রও প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। শ্রীশ্রীমা মন্দিরস্থিত খাটখানির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাদদ্বয় ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন, মাথায় অর্ধ ললাট পর্যন্ত কাপড়, মুখ অর্ধাবৃত। জনৈক ব্রহ্মচারী একখানা পাখা হাতে শ্রীশ্রীমার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীশ্রীমা—বাবুরাম, কেমন আছ?

বাবুরাম মঃ—এখন ভালই আছি, মা।

শ্রীশ্রীমা—মঠের সব ভাল তো?

বাবুরাম মঃ—মঠের সব ভাল আছে, মা।

শ্রীশ্রীমা—আর খবর কি?

বাবুরাম মঃ—মা, আমি তো মূর্খ মানুষ। আমাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে। (ধীরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এরা এসেছে মালদহ থেকে। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব হবে, এরা চায় আমি সেখানে যাই।

শ্রীশ্রীমা—সে তো অনেক দূর। তোমার না এর মধ্যে অসুখ হয়েছিল?

বাবুরাম মঃ—হাঁ, ১২।১৪ দিন পূর্বে একবার জ্বর হয়ে গেছে।'

শ্রীশ্রীমা—তবে এ গরমের মধ্যে, একবার অসুখও হয়ে গেছে, এতদূর নাই গেলে।

বাবুরাম মঃ—আচ্ছা মা, বেশ, বেশ।

'বাবুরাম মঃ এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেলেন। মহারাজকে দেখিয়া মনে হইল যেন মা তাঁহার অভীপ্সিত আদেশ দিয়াছেন এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। নীচে স্বামী সারদানন্দের সহিত পুনঃ নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল।

'এদিকে ধীরেন্দ্রের মনের অবস্থা কি হইল ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন এবং পরে শ্রীশ্রীমাকে সকল কথা নিবেদন করিয়া বলিলেন, "মা, আজ দেড় মাস দুইমাস যাবৎ মালদহে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। সকলেরই বহুদিন থেকে সঙ্কল্প—পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে এই উৎসব করেন। সকলেই আশা ক'রে রয়েছে। তিনি না গেলে হাজার হাজার লোক নিরাশ হবে, উদ্যোক্তারা মর্মাহত হবেন। মালদহ বেশী দূরে নয়, মা। আজ রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া ক'রে রওনা হ'লে কাল দুপুরেই সেখানে পেঁৗছে আহারাদি করা যায়। রাস্তায় কোন কষ্ট হবে না। প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভাল বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে যাব স্থির করেছি। আপনি অনুমতি না দিলে উৎসবই পন্ড হয়ে যাবে। বেশী দিন না রইলেন, অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য বাবুরাম মহারাজকে অনুমতি না দিলে সব নষ্ট হবে। সকলে কত আশা ক'রে বসে আছে!"

শ্রীশ্রীমা—সে দূর নয় বলছ। এত কাছে কি?

জনৈক ব্রহ্মচারী—মালদহ, যেখান থেকে বড় বড় ফজলী আম আসে, মা।

শ্রীশ্রীমা—সে তো খুব দূর নয়ই বটে।

ধীরেন্দ্র—হ্যাঁ, মা, মোটেই দূর নয়। আজ রাত্রি ১০টায় রওনা হ'লে কাল দুপুর হতে না হতেই সেখানে পেঁৗছানো যায়। বাবুরাম মহারাজের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেভাবেই নিয়ে যাব, মা। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীশ্রীমা—আচ্ছা, বাবা, তোমরা সকলে একটু যাও। আমায় কিছুক্ষণ ভেবে দেখতে দাও।

'শ্রীশ্রীমা একা মন্দিরে রহিলেন। ধীরেন্দ্র নীচে আসিয়া দেখিলেন বাবুরাম মহারাজ শরৎ মহারাজের সঙ্গে বেশ আলাপাদি করিতেছেন। ধীরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন —মালদহ যাইবার ব্যাপারে বাবুরাম মহারাজ তো কখনও কোন অমত দেন নাই অথচ শ্রীশ্রীমা যখন অমত প্রকাশ করেন তখন তিনি একটি কথাও বলিলেন না! তিনি মার আদেশে যেন মহা আনন্দিত হইয়াই নীচে নামিয়া আসিলেন। অপর দিকে ইহাও ভাবিয়া ধীরেন্দ্র স্তম্ভিত হন যে, সাধু-মহাপুরুষদের চরিত্রে বিপরীত ভাবের কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! কোথায় মহারাজের এই কথা—"তোরা বুঝি আমায় আর ডাকলিনি" আর কোথায় শ্রীশ্রীমার "নাই গেলে" কথায়—"আচ্ছা, বেশ, বেশ, তাই হবে।"

'কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী উপর হইতে বলিলেন, 'বাবুরাম মহারাজকে মা ডাকছেন, বল।" বাবুরাম মহারাজকে খবর দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মার সঙ্গে পুনঃ দেখা করিতে চলিলেন। ধীরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। বাবুরাম মহারাজ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীশ্রীমা—হাঁ বাবুরাম, এরা এত ক'রে বলছে। তবে কি তুমি যাবে?

বাবুরাম মঃ—আমি কি জানি, মা? আমি কি জানি? আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করব। জলে ঝাঁপ দিতে বলেন, জলে ঝাঁপ দিব; আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আগুনে ঝাঁপ দিব; পাতালে প্রবেশ করতে বলেন তো পাতালে প্রবেশ করব। আমি কি জানি? আপনার যা আদেশ।

'কথাগুলি বাবুরাম মহারাজ এত ভাবাবেগে বলিলেন যে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব নিঃস্তব্ধ। বাবুরাম মহারাজের চোখ মুখ আরক্তিম হইয়া গেল। সকলেই যেন কি এক অদ্ভুত ভাবে কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ হইয়া রহিল। শ্রীশ্রীমাও কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না; "বুঝে প্রাণ বুঝে যার।" কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীমার অমৃতময়ী বাণীতে সেই নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল।

শ্রীশ্রীমা—এরা শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করছে, এত ক'রে বলছে, যাও একবার এসো গিয়ে। তবে বেশী দিন থেকো না।

'শ্রীশ্রীমার কথায় বাবুরাম মহারাজ কিছুক্ষণ পরই চরণধূলি গ্রহণ করিয়া নীচে নামিলেন। ব্রহ্মচারী তখন ধীরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমাকে মা ডাকছেন, শুনে যাও।" ধীরেন্দ্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এরা সব মহাপুরুষ। এদের শরীর জগতের কল্যাণের জন্য। দেখো, এদের শরীরের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।" ধীরেন্দ্র বলিলেন, "মা, এখান থেকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে বার্থ রিজার্ভ ক'রে বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে যাব। সঙ্গে নানা-প্রকার খাবার থাকবে। সেখানেও ভাল বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব যাতে মহারাজের কোন অসুবিধা না হয়। আপনি ভাববেন না, মা। এ বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখবই।" শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, এসো গিয়ে!"'[৫০]

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি এই একান্ত আনুগত্যের আদর্শ তিনি স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন ১৯১৭ সনে লেখা একটি পত্রে। সেখানে তিনি বলছেনঃ 'শ্রীশ্রীমার আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম কর্ম। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; যাকে যা বলিবেন সে তাই করিতে বাধ্য।'[৫১] বলা বাহুল্য, এই বাধ্যতাবোধ বাইরে থেকে কোন আরোপিত ব্যাপার নয়, একান্তই তাঁর অন্তরের।

ভক্তদের কাছে তিনি শ্রীমায়ের অনন্ত ধৈর্য আর অপার করুণার কথা শতমুখে কীর্তন করেছেন। বার বার শ্রীমায়ের স্বরূপ এবং তাঁর আবির্ভাবের হেতু বর্ণনা করেছেন, চেষ্টা করেছেন শ্রীমায়ের প্রতি তাঁদের ভক্তিবিশ্বাস জাগ্রত করে তোলার। একবার পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁয় উৎসব-ভাণ্ডারে দ্রব্য সম্ভারের আয়োজন দেখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করে জনৈক মুখ্য উদ্যোক্তাকে বলেনঃ 'দেখ্, যদি কখনও তোদের

আয়োজিত দ্রব্যাদি কম হবে বলে আশংকা হয়, তবে শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করে প্রার্থনা করলেই সকল অভাব দূর হবে জানবি। শ্রীশ্রীমা হলেন সাক্ষাত অন্নপূর্ণা।'[৫২]

১৯১৭ সনে এক মহিলাভক্তকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেনঃ 'তুমি যে আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কৃপা পেয়েছ এ সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে নিশ্চয় জানিও, তোমার কোটী জন্মের তপস্যার ফলে শ্রীশ্রীমার দর্শন হয়েছে। লোহ একবার পরশপাথর ছুঁলেই সোনা হয়। তুমি জান আর নাই জান পরশপাথর রূপ মার শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শে তোমার দেহ মন রূপ লৌহ সোনা—কিনা ভোগ আসক্তি ত্যাগ করে যোগ ভক্তি লাভে অনুরাগী—হয়েছে। মানুষ জন্ম সফল করেছ। বিশ্বাস কর, চাই নাই কর। শ্রীশ্রীমা মানুষ-দেহধারিণী হলেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু। জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন। আমার মনে হয় যখনি তোমার প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে তখনি তোমার শিক্ষা দীক্ষা সব হয়ে গেছে।'[৫৩] 'পরশপাথর' শব্দটি আবার দেখি আর একটি চিঠিতে। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সম্পর্কে শব্দটি একযোগে প্রযুক্ত। চিঠিতে প্রেমানন্দজী বলছেনঃ 'আমরা ত অসার অবিদ্যা-গ্রস্ত লৌহখণ্ড, কিন্তু ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা যে পরশপাথর, তাঁহাদের স্পর্শে আমরা নিশ্চয়ই সোনা না হয়ে যাই কোথা?'[৫৪]

শ্রীমায়ের কাছে কৃপাপ্রাপ্তি এক পরমপ্রাপ্তি, তাঁর দর্শনলাভও তেমনিই পরম-লাভ। শ্রীমায়ের ভক্তদের কোনও ভয় স্পর্শ করতে পারে না। শুধু চাই আন্তরিক বিশ্বাস। স্বামী প্রেমানন্দজী সেই বিশ্বাস উদ্দীপিত করে দিচ্ছেনঃ

'বিশ্বাস কর—নিশ্চয় আমরা সিদ্ধ হব, মুক্ত হব, যখন শ্রীশ্রীমার দর্শন পেয়েছি।'[৫৫]

'"আমরা খাস-তালুকের প্রজা, ব্রহ্মময়ী আমার রাজা।" রাখ এটি সর্বদা স্মরণ, এড়িয়ে যাবে শমন সদন। শ্রীশ্রীমার ভক্তদের কোন ডর নাই, কোন ভয় নাই।'[৫৬]

'পূজনীয়া শ্রীশ্রীমার পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণা করে যমপুরীতে গেলে যম বেচারাও আতঙ্কে পালাবে মনে রেখো।'[৫৭]

একজনকে লিখছেনঃ 'ছি! ডুববে কেন? ও-সব ভাব মনে আসতে দিও না। কত জন্মের সুকৃতির বলে "মার" আশ্রয় পেয়েছ। তাঁর কৃপা পেলে কি মানুষ কখনও ডুবে? তুমি আবার কতজনকে তুলবে, এই ধারণা দিবারাত্র হৃদয়ে পোষণ করবে। You are the chosen children of our Lord —নইলে কৃপা করবেন কেন? Depression -গুলো দূর করে দিবে। ভাববে "মার" কৃপায় আমরা নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ।'[৫৮]

'তোরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরিত্র অনুকরণ কর্ না। তিনি ত এখনও জীবিতা রয়েছেন। আর তোরাও ত তাঁর কৃপা পেয়েছিস্, তাঁর দর্শন পেয়েছিস্. একি কম ভাগ্যের কথা! সাক্ষাৎ জগদম্বার কৃপা! ফটোতে ত' মা কত স্থানে ভোগ খাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ঐ বেতো শরীরে, নিজে কাহারও সেবা নিচ্ছেন না। পরিচিত হউক, আর অপরি-

চিত হউক, যে কেউ দেশে তাঁর কাছে যাচ্ছে তাকে কত যত্ন, কত সেবা! দেশে নিজে রাঁধেন, জল তোলেন, এমন কি ভক্তদের জন্য কোথায় ভাল দুধ, ভাল আনাজ, আহা, তার জন্য এক মাইল পর্য্যন্ত খুঁজে মা নিজে নিয়ে আসেন। ভক্ত প্রসাদ পেয়ে গেল, বাড়ীতে ঝি চাকর বাসন মাজবার কেউ নেই, তার হুঁস নেই, শ্রীমা নিজে তাদের লুকিয়ে সক্‌ড়ি পাড়ছেন।'[৫৯]

যিনি স্বয়ং ভগবতী, সাক্ষাৎ জগদম্বা, তিনি কেন ভক্তসেবায় অথবা তুচ্ছ সাংসারিক কর্মে নিরত? স্বামী প্রেমানন্দ এই বিচিত্র রহস্যেরও উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন তাঁর একটি পত্রে। সেখানে তিনি বলছেনঃ

'—রাজরাজেশ্বরী, সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন!– এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন! ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছিল, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তৈরীর জন্য—আর মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট কচ্ছেন, গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য্য- অপারিসীম করুণা–সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমান রাহিত্য।'[৬০]

প্রেমানন্দজী অনুভব করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তির দিক দিয়ে শ্রীমা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরকেও অতিক্রম করে গিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমা সর্বদাই নিজেকে ঢেকে রেখে-ছেন, তাঁর মহিমা বুঝবে কে! এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ বলছেনঃ 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধা-রাণী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন! ঐশ্বর্য্যের লেশ নাই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য্য ছিল; তাঁর ভাবাবেশ সমাধি এসব আমরা জন্মে দেখেছি—কত দেখেছে! কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি!—জয়মা!! জয়মা!!! জয় শক্তিময়ী মা !!! দেখচ না কত লোক সব ছুটে আসছে! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে—সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন।—অনন্তশক্তি—অপার করুণা! জয়মা!—আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত "বাজিয়ে বাছাই করে" লোক নিতেন!...আর এখানে—মা'র এখানে কি দেখ্‌ছি? অদ্ভুত অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন।—সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন,—আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে! —মা! মা! জয়মা!'[৬১]

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মর্তব্য। স্বামী গৌরীশানন্দের স্মৃতিচারণায়ঃ 'জয়-রামবাটী হইতে আমি ও জগদানন্দস্বামী তারকেশ্বর হইয়া মঠে ফিরিয়াছি (১৯১৬)। ঠাকুরের আরতি হইয়া গিয়াছে। উপরের বারান্দায় ঠাকুরের সাতজন সন্ন্যাসী সন্তান বসিয়াছিলেন ও মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] আরাম কেদারায় বসিয়া শটকায় তামাক খাইতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তিনটি ছেলেকে চিঠি দিয়ে মার কাছে পাঠিয়েছিলুম, তিনি তাদের কৃপা করেচেন কি? আমি বলিলাম,—আপনার চিঠি আমিই মাকে পড়ে শোনাই। চিঠি শুনে, সদ্য-জ্বরমুক্ত হয়েছেন দুর্বল শরীর, স্বগতভাবে বললেন,—ছেলে আমার বিদেশ থেকে শেষকালে এই জিনিস পাঠালে?

মহারাজ স্তব্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহার হাত হইতে শটকা খসিয়া পড়িল। সকলেই চুপচাপ। কয়েক মিনিট পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেনঃ ধন্য মা! তিনি ঐ সব বিষ নিজে গ্রহণ করে আমাদের মতন সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখচেন! তিনি ঐ বিষ গ্রহণ না করলে আমরা কবে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম। বলিয়াই দুই হাত তুলিয়া ভাবাবেগে বারবার মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।'[৬২]

এই বিষয়ে স্বামী প্রেমানন্দ এক ভক্তকে একদিন বলেনঃ 'শ্রীশ্রীমাঠাকরুণকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়, তিনি শক্তি-স্বরূপিণী কি না, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়তো। মাঠাকরুণের ভাব সমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন? তাঁর ধারণা করবার শক্তি কত!!'[৬৩]

শ্রীমায়ের উপর তাঁর ভালবাসা-ভক্তি-বিশ্বাসের পরিচায়ক কয়েকটি ছোট কিন্তু অসাধারণ ঘটনাঃ 'উদ্বোধন হইতে কার্তিক [স্বামী নির্লেপানন্দ] মঠে আসিয়াছেন। তিনি প্রণাম করিতেই বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ওরে, যাবার সময় নৌকায় ওঠবার আগে আমাকে বলে যাস। তখন মঠের তরকারি-বাগান ও ফুলের বাগিচা রান্নাঘরের নিকটে ছিল। তিনি যথেষ্ট বাছা ফুল ও তরকারি এবং শ্রীশ্রীমার প্রিয় আমরুল শাক ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। বলিলেন, বাবুরামের দণ্ডবত বলিস, আর এগুলো মাকে দিস। এক সময় মঠ হইতে নিত্য মাকে দুধ ও ফুল পাঠাইতেন।'[৬৪]

'মামাদের বিষয় জমিজমা ভাগ করিয়া দিবার জন্য শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী যাইবেন। মঠে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—মা-ঠাকরুণের আদেশে যাচ্চি, ভাগবাঁটোয়ারার কাজ জানি না। তুমি আশীর্বাদ কর যাতে কাজটা সুষ্ঠু-ভাবে করে মা-ঠাকরুণকে উদ্বোধনে নিয়ে আসতে পারি। বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন,—তুমি যাঁর আদেশে যাচ্চ তাঁর আদেশ পেলে আমরা বর্তে যাই। আমি বলচি, তুমি যাও, ঠিক পারবে।'[৬৫]

'শ্রীশ্রীমার এক শিষ্য তাঁহার হাত হইতে গৈরিক বস্ত্র নিয়া কাশীতে গিয়াছেন, বাবুরাম মহারাজ তখন কাশীতে। জনৈক সাধু বলিলেন, মা নিজে সন্ন্যাসী নন, তোমাকে কি করে সন্ন্যাস দেবেন? সঙ্গে সঙ্গে বাবুরাম মহারাজ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, মার দেওয়া গৈরিককে যদি সন্ন্যাস বলে স্বীকার না কর তো তোমাদের এই বিধির সন্ন্যাসও আমি মানি না।'[৬৬]

জয়রামবাটীকে স্বামী প্রেমানন্দ পুণ্য তীর্থস্থল জ্ঞান করতেন। শ্রীমায়ের পূত সান্নিধ্যের আকর্ষণে তিনি সেখানে একাধিকবার গিয়েছেন, প্রতিবারই তাঁর জীবনচর্যা প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের পবিত্র সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁদেরও প্রতি দেখি প্রেমানন্দজীর আশ্চর্য ভক্তি। একবার জয়রামবাটী থেকে ফিরে তিনজন ভক্ত বেলুড় মঠে স্বামী প্রেমানন্দের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে যান। ভক্তরা কথা বলে যেই প্রেমানন্দজীকে প্রণাম করতে

গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই-তিন-হাত পেছিয়ে এসে বলে ওঠেনঃ 'তোমরা জয়রাম-বাটী হতে এসেচ, তোমরা সোনা হয়ে গেছ—সোনা হয়ে গেছ! আমি কি তোমাদের প্রণাম নিতে পারি? জয় মা! জয় মা!!'[৬৭]

প্রেমানন্দজীর এই আচরণ ও উক্তি শ্রীমায়ের প্রতি তাঁর ভক্তির উৎকর্ষের একটি দীপ্ত প্রমাণ। ভগবানের ভক্তের যিনি ভক্ত, তিনিই তো ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত!

॥ ৫ ॥

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুরে সেই সময়ে স্বামী অভেদানন্দ স্বামীজী এবং আর দুই গুরুভ্রাতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্রীমায়ের নিকট কিভাবে ভিক্ষা প্রার্থনা করে-ছিলেন সেই বিষয়ে প্রবন্ধের সূচনায় বলা হয়েছে। শ্রীমায়ের মধ্যে সেদিন তিনি দেবী অন্নপূর্ণাকে দেখেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের অল্প কয়েকদিন পরেই শ্রীমা বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই তীর্থযাত্রায় শ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের তিন সন্ন্যাসী-সন্তানঃ স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দ। এছাড়া ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের কয়েকজন স্ত্রীভক্ত। বৃন্দাবনে শ্রীমা এক বছর বাস করেছিলেন। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে যোগীন মহারাজ, লাটু মহারাজ প্রভৃতিকে শ্রীমায়ের কাছে রেখে শ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে অভেদানন্দজী বৃন্দাবন পরিক্রমায় বার হন। বৃন্দাবন-পরিক্রমার কিছুকাল পরে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতার কথা এতদিন সকলের অগোচরে ছিল। বৃন্দাবনে তা প্রকাশিত হয়। পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে অভেদানন্দজী তাঁর 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে লিখেছেন, বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থানের সময় '...একদিন শ্রীমা শ্রীরাধার বিরহভাবে আবিষ্ট হইলেন। শ্রীরাধা যেমন তাঁহার প্রাণবঁধুর বিরহে ব্যাকুল হইতেন, তেমনি শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলাস্থল নিধুবনের সন্নিকটে রাধারমণের মন্দির, যমুনাপুলিনঃপ্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে প্রেমাশ্রুধারা বর্ষণ করিতেন এবং ঘন ঘন ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন।'[৬৮] বৃন্দাবন থেকে কলকাতায় ফেরার পথে তাঁকে মাস্টারমহাশয়ের (শ্রীম-র) স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। এটি ছিল শ্রীমায়ের আদেশ। অভেদানন্দজী প্রথমে নিজেকে একটু বিপন্নবোধ করেছিলেন, কারণ নিকুঞ্জদেবীর স্নায়বিক দুর্বলতা ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বিচার করেনঃ 'মায়ের আদেশ অমান্য করা আমার সাধ্য কি!' সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবেন যে, শ্রীমায়ের আশীর্বাদে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হবে না। 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে এই যাত্রার বিবরণ দিয়ে অভেদানন্দজী লিখেছেনঃ '...ক্রমাগত দুইদিন গাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া নিরাপদে হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ...আমিও আশ্বস্ত হইলাম এবং বুঝিলাম যে, সমস্তই শ্রীমা

ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা। তাঁহাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে তাঁহারা সমস্ত ভয় ও বিপদ হইতে সন্তানকে রক্ষা করেন।'[৬৯]

১৮৮৮-৮৯ সনে শ্রীমা যখন 'বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সঙ্গে বাস করছিলেন, সেই সময়ে অভেদানন্দজী বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে—১৮৮৮ সনের শেষাংশে অথবা ১৮৮৯ সনের প্রথমদিকে—শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের স্তোত্র রচনা করেন। অভেদানন্দজীকৃত শ্রীমায়ের স্তোত্রটি বহুজনবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের নানাকেন্দ্রে এটি নিয়মিত গীত হয়ে থাকে। এই স্তোত্রের মাধ্যমে অভেদানন্দজী জগতের কাছে শ্রীমায়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীমাকে তিনি এখানে বলেছেন: পরমাপ্রকৃতি যিনি অভয়া, বরদা, ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রী এবং দয়াস্বরূপা। অভেদানন্দজী লিখেছেন: 'শ্রীমার স্তোত্র রচনা করিয়া আমি ঐ সময়েই শ্রীমাকে শুনাইয়াছিলাম এবং শ্রীমা শুনিয়া আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।" সেইসময় আমি শ্রীমার হস্ত হইতে জপের মালাও (রুদ্রাক্ষের) পাইয়াছিলাম।'[৭০]

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীমায়ের আশীর্বাদকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয়রূপে

জানতেন। আর শ্রীমা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা যে অভেদ এই বোধে তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত।

ভক্তদের নিকট একটি উপদেশে অভেদানন্দজী বলছেনঃ 'যে ভাবেই সাধন কর না কেন, মা দ্বার খুলে না দিলে উপায় নেই। অবশ্য ঠাকুরকে ধরলেই মাকেও ধরা হয়, যেমন শিব আর শক্তি অভেদ।'[৭১]

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীমাও তাঁর কাছে ছিলেন অবতার আবার নিজের মা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেনঃ 'শ্রীশ্রীমায়ের বার্দ্ধক্যের ফটো অনেক আছে। আমি তো বারণ করেছি, তা না ছাপানোই ভাল। অবতারের বার্দ্ধক্য দেখাতে নেই। তিনি পূর্ণ। ফ্রাঙ্ক ডোরাক কেমন তৈলচিত্র এঁকেছে! মায়ের ফটো খুব ভাল হয়েছে। এমনটি আর এদেশে আঁকতে পারবে না। ঠিক ষোড়শী মূর্তি। যেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে বসে আছেন। মা আমাদের নিজের ছেলের মতই দেখতেন। গুরুভাইরা এক একজন শরীর ছাড়তেন আর মা কেঁদে আকুল হতেন। ...ঠাকুর আর কি শোকতাপ পেয়েছেন? মাকে অনেক সইতে হয়েছে।'[৭২]

শ্রীমায়ের এক পুণ্য জন্মতিথির দিন অভেদানন্দজী বলেনঃ 'জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী আজ পৃথিবীতে এসেছেন...। শ্রীশ্রীমাই হলেন সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, আবার মুক্তিদাত্রী, মহামায়া।'[৭৩]

॥ ৬ ॥

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের রামকৃষ্ণ-ভক্তি সুবিদিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করতে পারতেন, করেছেন। তাঁর অনুরূপ ভক্তি ছিল শ্রীমায়ের প্রতিও। ১৯১১ সনে শ্রীমা যখন দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থান দর্শন করতে আসেন সেই সময়ে রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিসে শ্রীমা স্বচ্ছন্দ

জপের মালা লাভ করছেন। জপমালা কেন? জপমালার সঙ্গে জপমন্ত্রপ্রাপ্তির সম্পর্কের কথা এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে হয়। যদি সেই প্রাপ্তির ঘটনা বৃন্দাবনে একবছর কিংবা দেড় বছর আগে ঘটে থাকে—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য যা বলেছেন—তবে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে শ্রীমায়ের নিকট থেকে অভেদানন্দজীর জপমালালাভ তারই পরিণতি বলা যায়। মনে রাখা দরকার, ঠিক এই সময়েই তিনি শ্রীমায়ের স্তোত্র রচনা করেছেন।

দীক্ষাপ্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এবং কোনও রকম বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা বলতে পারি শ্রীমায়ের স্পর্শপূত জপমালালাভ অভেদানন্দজীর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা—যে-কারণে সেটি তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর দিক থেকে এটি শ্রীমায়ের বিশেষ কৃপালাভেরই একটি নিদর্শন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানরা সকলেই ছিলেন শ্রীমায়েরও সন্তান। তবুও তাঁর যে-কয়েকজন ত্যাগী-শিষ্যকে বিশেষভাবে শ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত বলে চিহ্নিত করা যায়, অভেদানন্দজী তাঁদের অন্যতম। [বিশ্ববাণী, ৪৫ বর্ষ, পৃঃ ৮৩-৪ তে দীক্ষাপ্রাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।]



দক্ষিণ ভারতে 'জগজ্জননী' সারদাদেবীর ভ্রমণ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে ব্যাঙ্গালোরের ডঃ পি. বেংকটরঙ্গমকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রের ফটো

[শংকরীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে]

Mylapore
1.2.11

My dear doctor,

A very happy news to you. Our most holy Mother is on Her way to Rameswaram. She is coming here to bless all of you. You should never lose this very rare and unexpected opportunity to worship the Motherhood of God in Her. She is your real Mother. Come and be blessed by Her. She is expected here on the 11th of this month. Please collect as much money as you can from your friends, and admirers of our Mission. We shall have to meet the expenses of a big party consisting of ten souls. See that our holy Mother does not lack in [anything]. Feel within your [being] that the whole responsibility is on you and you alone. It is so fortunate you are to have the Mother of the Universe at your very door ! Come to worship Her as soon as She places Her holy feet on this soil. With my best love and blessings.

I am
Yours affly.,
Ramakrishnananda

Dr. P. Venkatarangam,
Frasertown Dispensary,
Frasertown,
New Extension,
Bangalore.

বোধ করেন, কিসে তিনি আনন্দে থাকেন—সব দিকে ছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অতন্দ্র প্রয়াস। শ্রীমাকেও রামনাদের দেওয়ানকে বলতে শোনা যায়ঃ 'আমার আর কি প্রয়োজন? আমাদের যা কিছু দরকার সব শশীই ব্যবস্থা করছে।'[৭৪] পুরী থেকে শ্রীমা যখন মাদ্রাজে এলেন তখন গ্রীষ্মকাল। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কিভাবে তখন শ্রীমায়ের কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করতেন তার কিছু আভাস পাই স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-কৃত রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবনচরিতে। সেখানে দেখিঃ 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একটি মোটরগাড়িতে করিয়া মাকে স্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিলেন। মোটরে বসিবার গদিটী গরমে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আপনার পরিধেয় বস্ত্র কলের জলে ভিজাইয়া গদিটী ঠান্ডা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মায়ের মধ্যে ঠাকুরকে দেখিতে পাইতেন। তাই ঠাকুরের মতই মায়ের সেবা করিতেন।'[৭৫] 'অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় ঠাকুর এবং মা অভেদ—একথা তিনি [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] প্রায়ই বলিতেন।'[৭৬]

উক্ত জীবনী-গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী বিশুদ্ধানন্দ লিখেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিলে শশী মহারাজ [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] ভাবে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যখন দক্ষিণদেশে তীর্থ পর্যটনে যান, তখন তাঁহাকে পাইয়া শশী মহারাজের কি আনন্দ ও উৎফুল্ল ভাবই না দেখিয়াছি! শ্রীশ্রীমার যাহাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, সেজন্য শশী মহারাজ স্বীয় দেহমনের সমগ্র শক্তি একীভূত করিয়া সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যতদিন শ্রীশ্রীমা দক্ষিণ দেশে ছিলেন, ততদিন শশী মহারাজ আহারনিদ্রা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার অনুসরণ ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবার যে এরূপ সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছেন, এজন্য শশী মহারাজ নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান মনে করিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শ্রীশ্রীমার দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে উক্ত দেশবাসী বহু লোকের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। মাতাঠাকুরাণীর এই তীর্থভ্রমণের সময় শশী মহারাজ এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভগ্ন হইয়া যায়, তিনি আর সুস্থ হইতে পারেন নাই।'[৭৭]

ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একদিন শ্রীমায়ের চরণে মাথা রেখে শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তব আবৃত্তি করেছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে। ঘটনাটি এইঃ ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের পিছন দিকে আশ্রমেরই জমির উপর একটি পাহাড়ের টিলা আছে। শ্রীমা যখন ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে তিনি (শ্রীমা) অপর দুই-একজনের সঙ্গে সেই টিলায় উঠে আপন মনে সূর্যাস্ত দেখছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে এই খবর পৌঁছাল। 'শুনিয়াই তিনি যেন কেমন বিহ্বলচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "এ্যাঁ, মা পর্বতবাসিনী হয়েছেন!" বলিয়াই ত্বরান্বিত হইয়া ঐ

দিকে অগ্রসর হইলেন।... রামকৃষ্ণানন্দজীর দেহ স্থূল, দ্রুত চলিতে পারেন না ; আবার ঐটুকু পাহাড় উঠিতেই হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ঐ ভাবেই তিনি সেখানে পৌঁছিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মায়ের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।...আর বলিতে লাগিলেন, "কৃপা, কৃপা!" শ্রীমা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া যেন অবোধ সন্তানকে শান্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে রামকৃষ্ণানন্দজী প্রকৃতিস্থ হইয়া বিদায় লইলেন।'[৭৮]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অন্তরের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল শ্রীশ্রীমায়ের পাদস্পর্শে দক্ষিণ ভারত পবিত্র হবে এবং তাঁর দর্শন ও উপদেশে ঐ অঞ্চলে রামকৃষ্ণ-আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হবে। তাঁর মনের সেই ঐকান্তিক বাসনা চরিতার্থ হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলেছিলেনঃ 'এই আমার শেষ।'[৭৯] বাস্তবিক শ্রীমা কলকাতায় ফিরে আসার কিঞ্চিদধিক চার মাস পরেই শশী মহারাজ কলকাতায় উদ্বোধনে দেহরক্ষা করেন। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। মহাসমাধির কিছুদিন আগে একদিন কবিরাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আপনি স্বপ্নে শ্মশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন কি?' স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উত্তর দিলেনঃ 'ওসব দেখি না ; তবে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি দেখি।'[৮০] শরীর ত্যাগের দু-তিন দিন আগে একদিন সকালে তিনি হঠাৎ ব্যস্তসমস্তভাবে সেবককে বললেনঃ 'ঠাকুর, মা, স্বামীজী এসেছেন ; আসন পেতে দে।' প্রথমে সেবক কিছুই বুঝতে পারেন না, পরে শশী মহারাজ আবার তাঁকে আদেশ করলে সেবক সে আদেশ পালন করলেন। সেবক দেখলেন শশী মহারাজ কোন অদৃশ্য দৃশ্যের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে তিনবার প্রণাম করলেন এবং প্রণামান্তে বললেনঃ 'তাঁরা চলে গেছেন।'[৮১] এই সময় শ্রীমাকে দেখার জন্যে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাই স্বামী ধীরানন্দ[৮২] শ্রীমাকে আনতে জয়রামবাটী যান। কিন্তু শ্রীমা আসতে চাননি। মাত্র কিছুদিন আগে তাঁর এই সন্তান তাঁর যে আপ্রাণ সেবা করেছিলেন সেই স্মৃতির সঙ্গে তাঁর এই প্রাণঘাতী পীড়ার খবর তাঁকে নিয়ত যন্ত্রণাবিক্ষত করছিল। প্রাণপ্রিয় সন্তানের রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখ এবং অমানুষিক রোগযন্ত্রণা জননী হয়ে তিনি কি করে স্বচক্ষে দেখবেন? আর যদি তাঁর সামনেই সন্তানের দেহত্যাগ হয় তাই বা তিনি সহ্য করবেন কিভাবে? তাছাড়া 'উদ্বোধনে'র মতো স্বল্প পরিসর বাড়িতে তাঁর ও তাঁর সঙ্গের লোকজনের উপস্থিতি রোগীর অসুবিধারই সৃষ্টি করবে। এইসব অনেক ভেবে শ্রীমা স্বামী ধীরানন্দকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেন।[৮৩]

শ্রীমা স্থূলশরীরে শশী মহারাজের কাছে যাননি ঠিকই, কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে সন্তানের কাছে যে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন তা আমরা আগেই দেখেছি। এই ঘটনার পরও দেখি শ্রীমা সূক্ষ্মদেহে সন্তানের শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দিব্যচক্ষে শ্রীমাকে দর্শন করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলে উঠলেন: 'মা এসেছেন।'[৮৪] সম্ভবত তাঁর এই দর্শন দেহরক্ষার পূর্ব রাত্রিতে হয়েছিল। পরদিন সকালে অলৌকিক এই দর্শনের কথা তিনি সুগায়ক পুলিনবাবুকে [পুলিন বিহারী মিত্রকে] বলেন এবং ঐ সম্পর্কে গিরিশবাবুকে দিয়ে একটি গান রচনা করতে অনুরোধ করেন। গানের প্রথম চরণটি হবে 'পোহাল দুঃখরজনী', সেকথাও গিরিশবাবুকে জানিয়ে দিতে শশী মহারাজ পুলিনবাবুকে অনুরোধ করেন। তাঁর ভাব ও দর্শনকে অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি অনুপম সঙ্গীত রচনা করে দিলেন এবং পুলিনবাবু গানটিতে বেহাগরাগিণীতে সুরারোপ করে গানটি গেয়ে শোনালেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মুদ্রিতনয়নে আবিষ্টমনে অনেকক্ষণ ধরে এই সঙ্গীতটি শুনলেন:

> পোহাল দুঃখরজনী
> গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন ;
> নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ ;
> হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী॥
> বরাভয়করা দিতেছে অভয় ;
> তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয় ;
> বাজাও দুন্দুভি, শমনবিজয় ; মার নামে পূর্ণ অবনী॥
> কহিছে জননী, 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণপদ দেখনা।
> নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা ;
> (হের) মম পাশে করুণার দুটি আঁখি ভাসে।
> ভুবন-তারণ গুণমণি।'

পরম তৃপ্তিতে ভরে গেল তাঁর অন্তর। অচিরে গানটি শুনতে শুনতে অথবা শোনার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে মাতৃভক্ত এই বীরসন্তান চিরকালের মতো চক্ষু মুদ্রিত করলেন। মহাসমাধির অল্পক্ষণ পূর্বে দেখা গেল তাঁর মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং সর্ব শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে—মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে।[৮৫]

চোখের সামনে জনক ও জননীকে আবির্ভূত দেখেই কি মাতৃগতপ্রাণ সন্তানের এই মরণজয়ী আনন্দ প্রকাশ? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে সন্তানের দেহরক্ষার সংবাদ জননীর কাছে জয়রামবাটীতে পৌঁছিলে তিনি কাতরকণ্ঠে বলে উঠলেনঃ 'শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।'[৮৬]

॥ ৭ ॥

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

শ্রীমা সম্পর্কে স্বামী অদ্বৈতানন্দের উক্তি কোথাও লিপিবন্ধ আছে কিনা আমাদের জানা নেই। বস্তুত, তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত আজও প্রকাশিত হয়নি—সম্ভবত যথোপযুক্ত উপাদানের অভাবে। সে যাই হোক, তিনি তাঁর অন্যান্য গুরুভ্রাতার মতো শ্রীমাকে যে পরমশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন সেটি অনায়াসে এবং সুনিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়। বয়সে প্রবীণ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়েও কয়েক বছরের বড় ছিলেন এবং তাই সংঘে তিনি 'বুড়ো গোপাল মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীমা এই বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে তিনি (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) শ্রীমায়ের বাজার করে দিতেন। তাই প্রায় প্রথম থেকেই শ্রীমায়ের পূত সান্নিধ্যে আসার এবং তাঁর সেবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে আনা হলে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাঁর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের উপর। শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরে তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতেন এবং শ্রীমায়ের কাজেও সাহায্য করতেন। কাশীপুরে ডাক্তারের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য বিশেষ পথ্য প্রস্তুতের প্রণালী শিখে তিনি সেটি শ্রীমাকে শিখিয়ে দিতেন।

১৮৯০ সনে যখন শ্রীমা গয়াধামে যান, তখন স্বামী অদ্বৈতানন্দ তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে শ্রীমায়ের দেখাশুনা করেন। শান্ত, সমাহিতচিত্ত স্বামী অদ্বৈতানন্দ নীরব সেবার মধ্য দিয়েই শ্রীমায়ের পূজা করেছেন।

১৮৯৮ সনের ডিসেম্বরে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর অদ্বৈতানন্দ মহারাজের প্রধান কর্মক্ষেত্র দেখি মঠের সব্জির বাগান—যেটি তাঁর চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে। মঠের বাগানে যে তরকারি উৎপন্ন হত তার কিছু অংশ তিনি মাঝে মাঝে শ্রীমাকে পাঠিয়ে দিতেন। শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই প্রবীণতম ত্যাগী-পার্ষদের সঙ্গে কত নিঃসঙ্কোচে কথা বলতেন তার একটি বিবরণ দিয়েছেন আশুতোষ মিত্রঃ 'মঠ হইতে গোপাল দাদা আসিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিবার পর, প্রসাদ পাইতে পাইতে তাঁহার পায়ের বাতটা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীমা বলিলেন, "ও আর এ কাঠামোয় সারবে না—সঙ্গের সাথী হয়ে আছে। তা তুমি কেমন আছ?" গোপাল দাদা বলিলেন, "আমাকেও বাতে বেশ কষ্ট দেয়, তবু ত অনেক খাটি। ছেলেরা কেউ দেখে না। তবু মঠের জমীতে

যা হয়, দুটো তরী-তরকারী করেছি—ঢেঁড়স, বেগুন, কাঁচকলা হচ্ছে—তরকারী আর বড় কিনতে হয় না। তোমার এখানে ত মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি।" শ্রীমা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি সেকেলে লোক—তুমি ত আর ছেলেদের মত থাকতে পারবে না। মঠও ত একটা সংসার—খাওয়া দাওয়া ত আছে—তুমি থাকতে পারবে কেন?—তাই দেখে থাক।"[৮৭]

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীমায়ের প্রতি অচলা ভক্তি আশ্রয় করে, সেইসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংসারের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে অদ্বৈতানন্দজী তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে দেন। শ্রীমায়ের স্বরূপ ব্যক্ত করে ভক্তদের প্রতি তিনি বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন কিনা জানি না। যদি নাও দিয়ে থাকেন, তবে বলা যেতে পারে, তার প্রয়োজনও হয়ত ছিল না। কারণ 'মাতৃসেবাপরায়ণ' এই নিরভিমান নীরব সন্ন্যাসী তাঁর ঐকান্তিক সেবা আর ভক্তির মাধ্যমেই শ্রীমাকে চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

॥ ৮ ॥

স্বামী তুরীয়ানন্দ

পরমবৈদান্তিক, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন আমেরিকায় (১৮৯৯-১৯০২) তখন তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত 'মা' 'মা' ধ্বনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী-সন্তানের মতো তিনি জানতেন, মা-র কৃপা ব্যতীত বস্তুলাভ হয় না। এই-প্রসঙ্গে আমরা তুরীয়ানন্দজীর একটি উপদেশ স্মরণ করতে পারি। সেখানে তিনি বলছেনঃ 'মায়ের সন্তান হও, তিনি তাঁর সন্তানদের সাহায্য করার জন্যে সবসময় প্রস্তুত। মার কাছে প্রার্থনা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। ...আমরা বুঝি আর না বুঝি, মা-ই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।'[৮৮] এই 'মা' বিশ্বজননী। আবার শ্রীমা-ই এই বিশ্বজননী।

তুরীয়ানন্দজীর নানা পত্রে শ্রীমা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। সেইসব চিঠিতে শ্রীমায়ের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেইসঙ্গে নিজের দীনতা। ১৯১৬ সনে বেলুড়মঠে শ্রীমায়ের উপস্থিতিতে দুর্গোৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে এই সংবাদপ্রাপ্তির পর তিনি প্রেমানন্দজীকে লেখেনঃ 'শ্রীশ্রীমার শুভাগমন ও উপস্থিতিতে যে সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন এবং আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইবে ইহা ত জানা কথা।'[৮৯] পত্রে তিনি 'শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে' তাঁর অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেছেন।

১৯১৩ সনে মাস্টারমহাশয়কে তিনি একটি চিঠিতে লিখছেনঃ 'শ্রীশ্রীমাতা-

ঠাকুরাণীর কুশল সংবাদ এবং তিনি ইতিমধ্যে কলিকাতায় আসিয়াছেন কিনা জানিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত আছি। এক লাইন লিখিয়া তাঁহার শ্রীচরণকুশল-সংবাদ জানাইবেন। তাঁহার পাদপদ্মে আমাদের অজস্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিবেন।'[২০]

শ্রীমায়ের শ্রীচরণকুশল-সংবাদ পাওয়ার জন্য যেমন তিনি ব্যাকুল তেমনই তাঁর আগ্রহ শ্রীমায়ের শ্রীচরণদর্শনে। ১৯১৭ সনে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে দেখিঃ 'শরৎ মহারাজ ভুবনকে এক "তার" করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটী যাইবার কথা আমাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন। ...যদি মা সোমবার দেশে যান তাহা হইলে সেইখানে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণদর্শন করিতে পারিব, এই ভরসা আছে।'[২১]

জনৈক ভক্তকে লেখা একটি পত্রে তুরীয়ানন্দজী করুণাময়ী শুভদা শ্রীমায়ের একটি ছবি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন—ইহা মহা আনন্দের সংবাদ। কত লোকেই যে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া জুড়াইবে, তাহার সংখ্যা নাই। ধন্য মার কৃপা! আর কি সহনশীলতা। বেজার ভাব আদৌ নাই। দিন রাত নিরন্তর লোক আসিতেছে, আর সকলেরই কল্যাণ করিতেছেন অকাতরে।'[২২]

শ্রীমায়ের কৃপালাভ হলে সকল শঙ্কা দূর হয়ে যায়। তখন শুধু নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ করতে হয়, যা কিছু জ্ঞাতব্য তিনিই জানিয়ে দেন। এইবিষয়ে তুরীয়ানন্দজী যথাক্রমে ১৯০৮ ও ১৯১৯ সনে লেখা দুটি পত্রে বলছেনঃ 'শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়াছ, সুতরাং আর ভয় কি? এখন আনন্দে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক।'[২৩]

'মঠে আসিয়াছিলে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছ—জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তাঁহার কৃপায় সকল বিষয়ই জানিতে পারিবে। গুরু, ইষ্ট অভেদ—এ তত্ত্ব তিনিই কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন।'[২৪]

ভক্তির পরিণতি সমর্পণে। শ্রীমায়ের চরণে সবকিছু সমর্পণ করতে পারলে জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে। একথা তুরীয়ানন্দজী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি পত্রে তিনি যা বলেছেন সেটি মনে রাখার মতো। তুরীয়ানন্দজী লিখেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমার চরণপ্রান্তে তোমার পুত্রকে কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া তুমি বড়ই এক সুন্দর ভাব প্রকাশ করিয়াছ। এইরূপেই স্ত্রী, ধন, জন, এমন কি, নিজেকেও তাঁহার পদে অর্পণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়। ভক্তের বাঞ্ছা ইঁহারা আপনারাই পূর্ণ করিয়া থাকেন।'[২৫]

শ্রীমাকে তুরীয়ানন্দজী কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীমা সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তিটি থেকেঃ 'কী মহাশক্তি জগতের কল্যাণের জন্য রয়েছেন! যে মনকে আমরা এখানে [কণ্ঠদেশে] ওঠাতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, সেই মনকে তিনি সেখানে "রাধু রাধু" ক'রে জোর ক'রে নাবিয়ে রেখেছেন। বোঝ ব্যাপারটি কী! জয় মা মহাশক্তি!'[২৬]

॥ ৯ ॥

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

স্বামীজী ১৮৯৪ সালে, প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে আমেরিকা থেকে এক পত্রে লিখেছিলেনঃ 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও। নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে, কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়। নিরঞ্জন এমন কার্য করছে যে, তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে।'[১৭] আমরা এখানে স্বামীজীর পত্রোক্ত ঐ নিরঞ্জনের মাতৃভক্তির দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি ফেরাব। নিরঞ্জন—অর্থাৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দের অতিশয় স্বল্পপরিসর জীবনকালের সকল ঘটনা বা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আমাদের কাছে এখনও সুব্যক্ত নয়—বরং, বলা চলে অমন অনুপম একখানি জীবনচিত্র লোকলোচনের অগোচরেই থেকে গেছে। তবুও এই বীর সন্ন্যাসীর অসাধারণ মাতৃভক্তির সংবাদটুকু আমাদের অগোচর নেই—স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দই একথা সোচ্চার গৌরবে ঘোষণা করে দিয়ে গেছেন। অতঃপর, বিশ্বাস-ভক্তির প্রতিমূর্তি মহাকবি গিরিশের একদিনের একটি প্রাসঙ্গিক কথাকেও আমরা মূল্যবান সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করতে পারি। শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ এবং তা জানা ও মানার প্রসঙ্গে, একদা একটি রহস্যপূর্ণ কথোপকথনের মাঝে, স্বয়ং ভক্ত ভৈরব গিরিশ সহসা মন্তব্য করে বসেনঃ 'আমিই কি প্রথমে মানতুম—নিরঞ্জনই আমার চোখ খুলে দিলে।'[১৮] কথাটি সাধারণ একজনের নয়, কথাটি তাঁরই মুখের অকপট স্বীকৃতি, যাঁর 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস ভক্তি'। একথার সূত্র করতে গেলে, তদানীন্তনকালের ভক্ত-পরিমণ্ডলের ভাবধারার সঙ্গে একটু পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে শ্রীশ্রীমা তখনও জগদম্বারূপে সকল ভক্তহৃদয়ে প্রকট নন। এমনকি ঘনিষ্ঠ মহলেও, মা তখনও গুরুপত্নী হিসাবেই সম্মানিতা মাত্র। অন্তরঙ্গ ত্যাগী-সন্তানরাও তাঁদের অন্তরের ভাবকে তখনও পর্যন্ত বাইরে কারও কাছে প্রকাশ্যে বলতেন না, বা প্রচার করতেন না। এককথায়, শ্রীশ্রীমা দেবীরূপে তখনও পর্যন্ত ভক্তসমাজে আবির্ভূতা নন, যদিও মুষ্টিমেয় কয়েকজন অন্তরঙ্গ পরিকরই শুধু তা উপলব্ধি করতেন। আর সেইসব উপলব্ধির আদৌ প্রচার ছিল না বলে, মাকে কেউই তেমনভাবে মানতে শুরু করেননি। ঐরকম দিনেও, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কিন্তু মাতৃমহিমাকে সগৌরবে ও অসঙ্কোচে সকলের কাছে সোচ্চারে বলতেন। প্রয়োজন হলে, তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে তাঁর স্বকীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির কারণ নির্ণয় করে, ভক্তদের হৃদয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যস্বরূপকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হতেন। মা যে কেবলমাত্র গুরুপত্নী হিসাবেই শ্রদ্ধেয়া নন, জগজ্জননী আদ্যাশক্তিরূপেই উপাস্যা, এই মঙ্গল-বার্তাটি একমাত্র নিরঞ্জনানন্দই সর্বপ্রথম সর্বসমক্ষে প্রচার করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র যখন পুত্র-শোকে বিহ্বল হয়ে, নিজেকে নিতান্তই অসহায় অবলম্বনহীন ভেবে বড়ই দীনদশায়

পড়েছিলেন, তখন এই নিরঞ্জনানন্দই তাঁকে জীবন দান করেছিলেন—তাঁকে জয়রাম-বাটীতে নিয়ে গিয়ে, শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে পেঁাছে দিয়ে। গিরিশের আধ্যাত্মিক জীবনে ঐ প্রত্যক্ষ মাতৃসন্নিধিতে কিছুকাল বাস এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণ-সকাশে উপনীত হতে নিরঞ্জনানন্দই তখনকার দিনে এক প্রধান সহায়ক-যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী-শিষ্যগণের মধ্যে বরিষ্ঠ কয়েকজনের জীবনেই তাই দেখি নিরঞ্জনানন্দের প্রচুর প্রভাব ও প্রেরণা। স্বামী বিরজানন্দের জীবনী-পাঠকের জানা আছে, বাল্যে একাধিকবার তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সাহচর্যেই জয়রামবাটীতে মাতৃসমীপে গিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বীর সন্তান নিরঞ্জনানন্দ। নিরঞ্জনানন্দের এই বীরভাবের পরিচয় আমরা কাশীপুর উদ্যান-ভবনে এবং পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে পেয়েছি। যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের এবং স্বামী বিবেকানন্দের পীড়িতাবস্থায়, দ্বাররক্ষীর ভূমিকায় সেবক নিরঞ্জনানন্দ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। অনুরূপ ভূমিকায় তাঁকে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কাছেও পাই। শ্রীশ্রীমায়ের স্বমুখের ভাষায় একটি ঘটনা বর্ণনা করিঃ হরিশ এই সময়ে কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি, এসে বাড়ির ভিতর যেই ঢুকেছি, অমনি হরিশ আমার পিছুপিছু ছুটছে। হরিশ তখন ক্ষেপা। পরিবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাই। তাড়াতাড়ি ধানের হামারের চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আমি আর পারলুম না। তখন নিজ মূর্তি এসে পড়ল। আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ ক'রে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল। তারপর নিরঞ্জন এলে তাকে বললুম, "ওকে পাঠিয়ে দাও"।'[১১]

এই ঘটনার সময় নিরঞ্জনানন্দ কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে কামার-পুকুরের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা শুনেছেন, তৎক্ষণাৎ স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে নিরঞ্জনানন্দও জননী-সকাশে ছুটে আসেন—আজ্ঞাবহ পবননন্দন মহাবীরের মতো। আশ্চর্য এই যে, নিরঞ্জনানন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উন্মাদ হরিশও বিনা বাক্যব্যয়ে কামারপুকুর ছেড়ে চলে যান এবং জানা যায়, ক্রমে তিনি নিরাময়ও হয়েছিলেন। সেবক নিরঞ্জনানন্দের তেজস্বিতায় মা স্বয়ং কত প্রসন্না ছিলেন, কতখানি নির্ভর করতেন তাঁর উপর, তা-ও মায়ের মুখের ঐ ছোট দুটি কথাতেই বেশ স্পষ্টঃ তারপর নিরঞ্জন এলে তাকে বললুম, "ওকে পাঠিয়ে দাও"।'

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ যদিও দীর্ঘায়ু ছিলেন না, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির তাড়না ভোগ করেছেন খুব। সহসা কেমন তাই ভাবান্তর হয়ে, হিমালয়ক্রোড়ে হরিদ্বারে চলে গিয়ে চিরবিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। মায়ানির্মুক্ত সন্ন্যাসী সেইকালে বড় কোমল ও শিশু-স্বভাবের হয়ে গিয়েছিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর আশ্চর্য মাতৃগতপ্রাণতা যেন উথলে পড়ছিল। ছোট শিশুর মতো শুধু মা মা মা—এই ধ্বনি কণ্ঠে; সর্ব বিষয়ে মায়ের মুখ চেয়ে অপেক্ষা করা; মায়ের হাতে খাওয়া; মায়ের

স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্যমাত্রই গ্রহণ; সব কাজেই মায়ের নির্দেশের অপেক্ষা! দিবানিশি মায়ের চরণ-ছায়ায় অবস্থান—যেন সহায়-সম্বলহীন নিরাশ্রয় শিশুটি। শ্রীশ্রীমা-ই তখন নিরঞ্জনানন্দের ধ্যান-জ্ঞান-সাধন-সাধ্য। এই বিশেষ ভাবটি অন্যের কাছে যতই মুগ্ধকর হোক, সন্তানবৎসলা জননীর হৃদয় কিন্তু ক্রমেই উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে উঠেছিল। মা হয়তো বা বুঝতে পারছিলেন, ঐহিকভাবে সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ অতি-আসন্ন। অবশেষে একদিন সত্য সত্যই সন্তান মাতৃচরণে প্রণতি জানিয়ে, বিদায় প্রার্থনা করে বসলেন। অবোধ শিশুর মতো নিরঞ্জনানন্দ মায়ের চরণ-দুখানির উপরে লুটিয়ে পড়ে, আকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়েন তখন।[১০০] আবার আবদারও ধরলেন যেন মা সদাসর্বদা অনুক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন—একক্ষণের জন্যও তিনি চরণ-ছাড়া না করেন। শ্রীশ্রীমাও অগত্যা ছল ছল নেত্রে অঙ্গীকার না জানিয়ে পারেননি। জননীর আশীর্বাদ ও সম্মতি লাভ করে নিরঞ্জনানন্দ হরিদ্বার যাত্রা করেন। সেটাই ছিল শেষ-যাত্রা।

॥ ১০ ॥

স্বামী সুবোধানন্দ

খোকা মহারাজ বা স্বামী সুবোধানন্দ ছিলেন শ্রীমায়ের আদরের 'খোকা'। তাঁর শিশুসুলভ আচরণের একটা উদাহরণ দিইঃ দক্ষিণভারতের তীর্থাদি দর্শন করে শ্রীমা আসবেন বেলুড় মঠে। মায়ের গাড়ি এসে লাগল মঠের প্রবেশ দ্বারে। গাড়ি থেকে নেমে মা সঙ্গের স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে মঠবাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, সমবেত ভক্তগণ আবৃত্তি করছেন 'সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...'। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কড়া নির্দেশ ঐসময় কেউ যেন মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম না করে। লজ্জাপটাবৃতা মায়ের মুখ তো ঘোমটায় পুরো ঢাকা। ঐসময় চলার পথে প্রণাম করলে তাঁর চলতে অসুবিধা হবে—প্রণামের হুড়োহুড়িতে মা পড়েও যেতে পারেন। আর মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে পরিবেশও ভাবগম্ভীর। হয়ত মাও ছিলেন ভাবস্থা। তাই মহারাজের ঐ আদেশ লঙ্ঘন করার সাহসও কারও নেই। কিন্তু হঠাৎ কে যেন দ্রুত পদক্ষেপে শ্রীমায়ের সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর পাদস্পর্শ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সকৌতুকে বলে উঠলেনঃ 'ধর, ধর ; কে কে?' জানা গেল তিনি খোকা মহারাজ।[১০১]

শ্রীমায়ের প্রতি স্বামী সুবোধানন্দের গভীর শ্রদ্ধার স্বাক্ষর রয়েছে ভক্তদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে। বিভিন্ন পত্রে তিনি শ্রীমায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, সেই সঙ্গে ভক্তের কাছে তুলে ধরেছেন শ্রীমায়ের স্বরূপটি। ১৯১৮ সনে কাশী থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেনঃ 'এখানকার পূজারীরা নকল অন্নকূট করে, আর যিনি আসল

জগৎজননী তাঁর অন্নকূট কত বড়, যিনি সমস্ত জগতের লোককে এবং জীবজন্তু সকলকে খাওয়াইতেছেন। ঐ সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে [মন] যে শরীর থেকে কোথায় চলিয়া যায় তার কিছু ঠিক থাকে না। ঠাকুর কখন কখন বলিতেন, এবার স্বয়ং মহামায়া নররূপে বেড়াতে এসেছেন, যখন সকল রকম সম্প্রদায়ের লোক আসিবে, তখন আর থাকিবে না।'[১০২] শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত উল্লেখ করে তিনি এখানে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শ্রীমা-ই স্বয়ং মহামায়া।

শ্রীমায়ের কৃপালাভ, তাঁর দর্শনলাভ যে পরমপ্রাপ্তি সেকথা খোকা মহারাজ নানা-ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এইপ্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি চিঠির বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত হলঃ

'...তোমাদের মুক্তির জন্য কেন ভাব? যখন তুমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে দর্শন করিয়াছ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনিয়াছ।'[১০৩]

'যখন শ্রীশ্রীমার দর্শন ও তাঁর কৃপা লাভ করিয়াছ তখন কিসের ভাবনা?'[১০৪]

'শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর যে-সমস্ত মেয়ে ও পুরুষকে কৃপা করিয়াছেন, বলতে হবে যে পূর্ব জন্মের বহু ত্যাগ তপস্যা ব্যতীত তাঁদের কৃপা দয়া লাভ হয় না।'[১০৫]

'তুমি জানিয়া রাখিবে যেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কৃপা করিয়াছেন, সেইদিন সেই মুহূর্ত হইতে তোমার ও তোমাদের ভাগ্য ফিরিয়াছে। এখন কতলোক মার দর্শন পায় নাই সে জন্য কত দুঃখ করে, ঠাকুর কিংবা মা যাকে ধরা দেন, চিনাইয়া দেন সেই জানিতে পারে। সূর্যের আলোতে সূর্য দেখা যায়। তাঁহার কৃপাতে ও দয়াতে লোকে তাঁদের জানিতে পারে ও তাঁদের দর্শন লাভ হয়। মাকে যদি আপনার করে নিতে পার, তাঁদের কৃপায় দয়ায় সব তোমার হবে।'[১০৬]

শ্রীমায়ের অপার্থিব ভালবাসার উল্লেখ দেখা যায় একটি চিঠিতে। সেখানে তিনি বলেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পূর্বে আপন মনুষ্য দেহে বর্তমান ছিলেন। এখন মা প্রত্যেক ছেলে মেয়ে ও ভক্তদের অন্তরে। মাকে ও ঠাকুরকে যে যত চিন্তা করিবে, সেই তত তাঁহাদের বিষয় জানিতে পারিবে। তাঁহাদের সহিত একবার যে কথা কহিয়াছে, মিশিয়াছে, তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসা জীবনে ভুলিতে পারিবে না। পিতামাতা সেইরূপ ভালবাসা জানে না।'[১০৭]

দেখা যাচ্ছে, স্বামী সুবোধানন্দ তাঁর উপদেশে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের কথা প্রায়ই একসঙ্গে বলেছেন। অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পর্কে যেকথা খাটে, শ্রীমায়ের সম্পর্কেও তা-ই। ঠাকুর ও শ্রীমাকে অভেদজ্ঞানে দেখতে হবে, এটি সহজে বুঝিয়ে দেবার জন্যই, মনে হয়, পবিত্র দুইটি নাম তিনি বার বার একসঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

জনৈকা মহিলাভক্তকে শান্তির একটি নিশ্চিত পথ দেখিয়ে স্বামী সুবোধানন্দ এক পত্রে বলেছেনঃ '...যখন কোন কাজকর্ম না থাকিবে, সেইসময় নিকটবর্তী মেয়েদের লইয়া ঠাকুরের ও মাতাঠাকুরাণীর কথাবার্তা কহিবে, তাহাতে বুঝিতে পারিবে, মনে এক শান্তির উদয় হইবে, যে বলিবে, যে শুনিবে সকলেরই উপকার...।'[১০৮] আর একটি পত্রে

দেখি, তিনি বলছেনঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে খুব চিন্তা করিবে।'[১০৯] স্বামী নারায়ণানন্দ (ইন্দ্র মহারাজ) বলেছেনঃ 'স্বামী সুবোধানন্দ বলতেন, "ঠাকুর আর মা-ঠাকরুন যেন টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তি যেমন অভিন্ন তাঁরাও তাই। একে অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাঁরা পরস্পরের পরিপূরক। মা হলেন মহামায়া—আদ্যাশক্তি। ভগবান তাই নরদেহে অবতীর্ণ হলে তিনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসেন। নতুবা অবতারলীলা পূর্ণ হয় না। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন সীতা হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা হয়ে, বুদ্ধদেবের সঙ্গে যশোধরা হয়ে. মহাপ্রভুর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে। আর এবার এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের মা-ঠাকরুন হয়ে।"'[১১০]

ঠাকুর ও শ্রীমায়ের কথা শ্রবণ-মনন এবং তাঁদের ধ্যানচিন্তা—ভক্তদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য, এই হল সুবোধানন্দজী নির্দেশিত পথ।

* * *

শ্রীমাকে ঠাকুরের উপরি-উক্ত দশজন ত্যাগী-সন্তান কি চোখে দেখতেন তার কিছু পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এব্যাপারে লিপিবদ্ধ তথ্য-উপাদানের অভাবের কথা আগেই বলেছি। সেই কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার ত্রুটি থেকেই গেল। তবে মূল কথাটি সবক্ষেত্রেই এক। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীমা এঁদের সকলেরই দৃষ্টিতে ছিলেন একাধারে স্নেহময়ী মা, সঙ্ঘজননী এবং দয়াস্বরূপা ভক্তি-বিজ্ঞানদাত্রী জগন্মাতা।

শ্রীমা ঃ পঞ্চশিখার আলোকে

পশ্চিম দিগন্তের আকাশে অস্তরাগের বর্ণচ্ছটা। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে জ্বলছে প্রদীপ। জ্বলছে ধূপকাঠি। পূত শুদ্ধ আবহে অনুভূত হচ্ছে যেন ভক্ত-হৃদয়ের আকূতি, একটি আত্ম-সমর্পণের প্রসন্ন প্রণতি।

মন্দিরে চলেছে পঞ্চ প্রদীপের আবর্তি। পাঁচটি দীপশিখাই অনন্য। কিন্তু প্রত্যেকটি শিখা তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও একই দীপারতির ঐকতানে মেতে উঠেছে। পঞ্চশিখার স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে শ্রীশ্রীমায়ের আনন্দমূর্তি, বিভাসিত হয়ে উঠেছে জগজ্জননীর দৃপ্ত মহিমা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচজন চিহ্নিত গৃহী-ভক্তের হৃদয়ে দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি গিরিশকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'চৈতন্য হোক'। হৃদয়-দীপে তাঁর জ্বলে উঠেছিল বিশ্বাসের অমৃত শিখা। বলরাম বসুকে চিহ্নিত করেছিলেন জগন্মাতার রসদ্দাররূপে। তাঁর হৃদয়-দীপে জ্বলে উঠেছিল সেবার স্নিগ্ধ শিখা। দুর্গাচরণ নাগকে দিয়েছিলেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ। তাঁর হৃদয়-দীপের শিখাটিতে ভক্তির অশ্রুনত ব্যঞ্জনা। পুঁথি-লেখক অক্ষয় মাস্টারের বুকে রেখেছিলেন যাদু-স্পর্শ। তাঁর হৃদয়-দীপের শিখাটি সর্ব-সমর্পিত দীনতার শিখা। আর কথামৃত-লেখক মহেন্দ্র মাস্টারের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন জগন্মাতার কাছে, 'মা, মাঝে মাঝে দেখা দিস। নইলে কি নিয়ে থাকবে?'—তাঁর প্রহ্লাদের ভাব। তাঁর হৃদয়-দীপের শিখাটি উজ্জ্বল জ্ঞানশিখা। এই পঞ্চশিখার আলোকে সমুদ্ভাসিত যে জগজ্জননীর মর্ত-মহিমা—তা আমরা সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতেনঃ 'আমাদের গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক ; সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেও হয় মৌলিক হতে হবে, নয় তো কিছুই না।' শ্রীরামকৃষ্ণের যে পাঁচজন গৃহী-সন্তানের বিষয় আমরা আলোচনা করেছি—তাঁরা প্রত্যেকেই মৌলিকতায় ভাস্বর, নানা দিক থেকে তাঁদের জীবন ছিল একান্তভাবেই মৌলিক। এবং প্রত্যেকেই তাঁরা মৌলিক বলেই—তাঁদের মানসচৈতন্যে বিভাসিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যেকটি রূপচিত্র মৌলিকতার দাবি রাখে। এই পাঁচখানি চিত্ররূপ দিয়ে সাজিয়েছি একটি মুক্ত প্রদর্শনীর রূপমঞ্চ। এইসব রূপচিত্রগুলি দেখে অন্তত কিছুটা ধারণা করা যাবে জগজ্জননী সারদাদেবীর মাহাত্ম্য। এ সকল চিত্র-চরিত্রগুলি ধূপ-ছায়ার মতো। ধূপ আছে বলেই ছায়া দেখা যায়। একান্তে অনুভব করা যায় আজও তাঁদের অমল অস্তিত্ব।

॥ প্রথম শিখা ॥

অন্যান্য অধিকাংশ ভক্তের মতো জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষও শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে প্রথমে বিশেষ কিছুই জানতেন না। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহও বোধ করেননি। নিজমুখেই একদা তিনি বলেছিলেনঃ 'আমরাই কি আগে মাকে জানতুম?

পরে নিরঞ্জন আমাদের চোখ খুলে দিলে।'[১] অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস—এবং এ বিশ্বাসের শিকড়-সন্নিধি তাঁর চেতনার গভীরে। মর্মের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্থায়ী আসন। গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের চিরপদাশ্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি বলতেনঃ 'তাঁকে মানা, ভালোবাসা, পুজো করা কঠিন নয়, তাঁকে ভুলাই কঠিন।'[২]

গিরিশের অখণ্ড বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর নিজের চাইতেও বেশী ভালবাসতেন। দ্বন্দ্বমুখর, গিরিশের জীবন। তাঁর দ্বন্দ্ব কল্পনা ও কর্মশক্তিতে, সংশয়ে ও প্রত্যয়ে, হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে। সব দ্বন্দ্বের নিঃশেষ অবসান ঘটিয়ে ঠাকুর বকলমা নিয়েছিলেন গিরিশের। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর বকলমা দিয়েছিলেন। একান্ত বিশ্বাসে সর্ব-সমর্পিত গিরিশ-মানসে শ্রীশ্রীমা জগদম্বারূপে নিত্য অধিষ্ঠিতা। একদিন গিরিশচন্দ্র তাঁর বাড়ির ছাতে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলরাম ভবনের ছাতে শ্রীশ্রীমাকে দেখিয়ে বললেনঃ 'ঐ দেখ, মা ও বাড়ির ছাতে বেড়াচ্ছেন।' গিরিশ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'না, না, আমার পাপ নেত্র ; এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না।'[৩]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণভরে সেবা করার জন্য তাঁকে পুত্ররূপে পেতে চেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি দ্বিতীয় পক্ষে একটি পুত্রসন্তান পেয়েছিলেন। গিরিশের বিশ্বাস ছিল ঠাকুরই তাঁর ঘরে পুত্ররূপে এসেছেন। ১৮৯০ সালের শেষ ভাগ। শ্রীশ্রীমা তখন বরানগরে সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়িতে বাস করছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে একদিন গেছেন সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়িতে। তিন বছরের শিশু। অস্থির হয়ে শ্রীশ্রীমা উপরে যেখানে ছিলেন সেদিকে দেখিয়ে উঃ উঃ করতে থাকে। একজন সেবক শিশুটিকে দোতলায় নিয়ে যান। শিশু শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে পড়ে প্রণাম করল। নীচে নেমে এসে পিতাকে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর হাত ধরে টানতে থাকল। আবেগে উত্তেজনায় গিরিশ কেঁদে ওঠেন, বলেনঃ 'ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি—আমি যে মহাপাপী।' বালক নাছোড়বান্দা। শেষে বাধ্য হয়ে গিরিশচন্দ্র শিশুটিকে কোলে করে কম্পিত কলেবরে অশ্রুপ্লাবিত চোখে উপরে উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বললেনঃ 'মা, এ হতেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হল আমার।'[৪] এই ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ করে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেনঃ 'শ্রীযুক্ত মাষ্টারমহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত পূর্ব হইতেই তাঁহাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তগোষ্ঠীর দ্বারা তিনি গিরিশের আগমনের পর হইতেই প্রকাশ্যভাবে জগদম্বারূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে লজ্জাশীলা মা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন ; ভক্তগণ তাঁহার দর্শন পাইতেন না, নীচে প্রণাম জানাইয়া বিদায়

লইতেন। গিরিশাদির আগমনের পর হইতে শ্রীমাও ভক্তজননীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিলেন।'[৫]

কিন্তু কাল সেই পুত্রকে গ্রাস করে নিলে গিরিশচন্দ্র মুষড়ে পড়েছিলেন। গুরু-ভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁকে নিয়ে গেলেন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। একদিন প্রণামের অবকাশে গিরিশ মাতৃমুখ দেখে চমকিয়ে ওঠেন, বলেনঃ 'অ্যাঁ, মা তুমি!' যৌবনে একদা বিসূচিকা রোগ থেকে যে মাতৃমূর্তির স্বপ্নাদেশ পেয়ে গিরিশের প্রাণ-রক্ষা হয়েছিল, তাঁরই প্রতিচ্ছায়া শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে দেখে গিরিশের ধারণা হয় শ্রীশ্রীমাই অতীতে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। তবুও নিশ্চিত হবার জন্য তিনি লোকমারফৎ প্রশ্ন করে পাঠালেন, শ্রীশ্রীমা পূর্বে এইভাবে কখনও তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন কি না? শ্রীশ্রীমা স্বীকার করেন। অতঃপর জিজ্ঞাসু গিরিশ আর একদিন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তুমি কি রকম মা?' শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হল এ প্রশ্নের শাশ্বত উত্তরঃ 'আমি সত্যিকারের মা ; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।'[৬] এই অভয়ের বাণী শুনে গিরিশের বিশ্বাসের নীলাকাশ থেকে দ্বিধা সন্দেহের ক্ষীণ মেঘখণ্ডও চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়ে যায়।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত অকৃত্রিম ভালবাসায় শান্ত হয়েছে গিরিশের অশান্ত হৃদয়, প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে মন। কিন্তু তাঁর ভেতর থেকে স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিল বৈরাগ্য-ব্যাকুলতা। পূর্বেও হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে শান্ত করেছিলেন। এবার সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে তিনি উপস্থিত হলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। অনুমতি প্রার্থনা করলেন তাঁর। কিন্তু শ্রীশ্রীমা আপত্তি জানালেন। বাক্যনিপুণ নাছোড় গিরিশচন্দ্র আধঘণ্টা ধরে নানা যুক্তির অবতারণা করলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। তথাপি শ্রীশ্রীমায়ের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থেকে গেল। অতঃপর গিরিশচন্দ্র ডুব দিলেন চিত্তের গভীরে। নতজানু হয়ে মেনে নিলেন মাতৃ-আদেশ। হঠাৎ এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মনের দিগন্ত। মুহূর্তের মধ্যে গিরিশচন্দ্র তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবন পরিচালনার জন্য খুঁজে পেলেন পথ-নির্দেশ। গিরিশ ফিরে এলেন আবার সংসারে প্রাত্যহিক তাঁর দিনচর্যার মাঝখানে। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্র এবং অনুপম তাঁর লোকশিক্ষার ধারাটি সম্মুখে রেখে মনোনিবেশ করলেন গ্রন্থ-রচনায়। এই ঘটনা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের। আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে পাই 'উদ্বোধন' পত্রিকার মন্তব্যঃ 'এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া গিরিশ কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা দীক্ষা লইয়া পুস্তকসকলের প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।'[৭]

বছর পাঁচেক পরে শ্রীশ্রীমা তখন সরকার বাড়ি লেনে হলুদের গুদাম বাড়িতে বাস করছিলেন। গিরিশ সেখানে প্রায়ই যেতেন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে। সেদিন জয়রামবাটী যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন মা। গিরিশচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে দু-হাত জোড় করে গিরিশচন্দ্র বললেনঃ 'তোমার

কাছে যখন আমি আসি তখন আমার মনে হয় যেন আমি ছোট্ট শিশু, নিজের মায়ের কাছে যাচ্ছি।'[৮] সত্য সত্যই শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এলে গিরিশচন্দ্রের ভিতরের হাস্যোজ্জ্বল প্রাণময় বালকমূর্তিটি যেন বেরিয়ে আসত সব বাধাবন্ধ উপেক্ষা করে। প্রসঙ্গত এখানে আর এক সমালোচকের সমার্থক উক্তি স্মরণীয়ঃ 'গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে যেমন আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স প্রভৃতি সকল কথা ভুলিয়া পিতার স্নেহের বালক হইয়া যাইতেন, এখানেও তদ্রূপ সকল কথা ভুলিয়া শ্রীশ্রীমার স্নেহে আপ্যায়িত হইয়া বালকের ন্যায় কয়েক মাস নিশ্চিন্ত মনে [জয়রামবাটীতে] কাটাইয়াছিলেন।'[৯] এটি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। গিরিশচন্দ্র তখন কিছুদিন জয়রামবাটীতে মাতৃ-সান্নিধ্যে কাটিয়ে এসেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহান অভিনেতা, সমকালের একজন প্রথম সারির সাহিত্যিক। একদিন মাতৃ-সান্নিধ্যে এসে অন্তরের ভাবাবেগ সামলে নিয়ে উপস্থিত সকলকে বলতে থাকেনঃ 'ভগবান ঠিক আমাদের মত মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পারো যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পারো যে, মহামায়া সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও আর সব রকম কাজকর্মই করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।'[১০] এই প্রসঙ্গ নিয়েই শ্রদ্ধেয় কালীমামার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের একবার তুমুল তর্ক বেধেছিল। কালীমামা শ্রীশ্রীমায়ের দেবীত্ব মানতে চান না। তিনি বলেনঃ 'কই আমরা তো এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি—আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।' গিরিশবাবু তাঁকে বলেনঃ 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া তোমাকে দিদিরূপে সমস্ত জীবন ভুলিয়ে রাখতে পারেন না? যাও, যদি ইহ ও পর-জন্মে মুক্তি চাও তো এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও।'[১১]

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ। গিরিশ তাঁর বাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। তাঁর একান্ত বাসনা শ্রীশ্রীমা যেন তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত থাকেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের শরীর তখন ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অত্যন্ত কাহিল, খুবই ক্লান্ত। শারীরিক কারণেই তাঁর পক্ষে কোথাও কোন উৎসবে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। চিকিৎসকেরও নিষেধ। কিন্তু গিরিশ বেঁকে বসেছেন, মা না এলে তিনি পূজা করবেন না। তাই গিরিশের বাড়িতে অবশেষে মা এলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখেই কল্পারম্ভ হল। সেবার গভীর রাতে ছিল সন্ধিপূজার সময়। তাই স্থির হল শ্রীশ্রীমা শারীরিক দুর্বলতার জন্য ঐ সময়ে আসবেন না। এই খবর শুনে আশাহত গিরিশ মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। স্থির করে ফেললেন সন্ধিপূজার সময় তিনিও আর পূজা-মণ্ডপে যাবেন না। হঠাৎ গভীর রাতে খিড়কির দরজায় শোনা গেল শ্রীশ্রীমায়ের মৃদু কণ্ঠস্বরঃ 'আমি এসেছি।' গিরিশ ছুটে গেলেন। শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে এলেন পূজা-

প্রাঙ্গণে। পূজাপ্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীশ্রীমা দাঁড়িয়ে থাকলেন আর ভক্ত গণ এসে তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতেই শে পর্যন্ত সম্পন্ন হল 'সন্ধিপূজা। সকলের মনেই অপার আনন্দ। উৎসাহে ও প্রাণপ্র প্রেরণায় পরিপূর্ণ হল ভক্তের অন্তর। সার্থক হল সন্ধিপূজা। নবমীর পূজাও এভাবেই কেটে গেল। গিরিশ পরিতৃপ্ত। এ প্রসঙ্গে একথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে গিরিশচন্দ্রই প্রথম পুরুষভক্ত যিনি প্রকাশ্যে শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা প্রচার করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, গিরিশচন্দ্রই ভক্তদের মধ্যে প্রথম যিনি মাতৃ-পূজার প্রথম প্রচলন করেছিলেন। স্বামীজী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবানন্দজীকে লিখেছিলেন 'গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য।'[১২]

বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে গিরিশচন্দ্র-অভিনীত দক্ষযজ্ঞ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, জনা, পাণ্ডবগৌরব, কালাপাহাড় ইত্যাদি নাটকের অভিনয় দেখে ছিলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের বিবরণ থেকে জানা যায় শ্রীশ্রীমা দক্ষযজ্ঞ অভিনয় দর্শন করে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। একবার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পাণ্ডবগৌরব নাটকে গিরিশচন্দ্র কঞ্চুকী সেজেছিলেন। অভিনয় শেষে শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এভাবেই নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র তাঁর নটজীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার লাভ করেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে।

গিরিশচন্দ্র অনেক নাটক, কবিতা, গান রচনা করেছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে তাঁর লেখনীতে শ্রীশ্রীমা স্থান পেয়েছিলেন কি? হ্যাঁ, পেয়েছিলেন। বিচিত্র সে ঘটনা। যক্ষারোগাক্রান্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। সশরীরে না গিয়েও শ্রীশ্রীমা তাঁকে দর্শন দান করেছিলেন। মাতৃদর্শনলাভে আনন্দিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গিরিশ-চন্দ্রকে ডেকে গানের ভাবটি বলে দেন। এবং গিরিশচন্দ্র লেখেনঃ

পোহাল দুখরজনী
গেছে 'আমি আমি' ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী।
বরাভয়-করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি, শমন বিজয়, যার নামে পূর্ণ অবনী।
কহিছে জননী 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণপদ দেখো না।
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা॥
হের মম পাশে, করুণায় দুটি আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ-গুণমণি'॥

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর অনুরোধে বিখ্যাত গায়ক পুলিন মিত্র মহাশয় এই গানটি তাঁকে গেয়ে শোনান এবং এই গান শোনার পরই তিনি দেহত্যাগ করেন।

গিরিশচন্দ্র দেহত্যাগ করেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে। চতুর্থীর কাজের দিন গিরিশের আত্মীয়-স্বজন শ্রীশ্রীমাকে নিতে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা গেলেন না, বললেনঃ 'সে নেই—আর কি সেখানে যেতে ইচ্ছা করে? আহা, একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল। কি ভক্তি বিশ্বাসই ছিল!'[১৩] বিশ্বাস ভক্তির সেই অমৃত-শিখাটি আজও প্রোজ্জ্বল এবং আরতি করে চলেছে জগজ্জননী শ্রীশ্রীমাকে।

॥ দ্বিতীয় শিখা ॥

সাতান্ন নম্বর রামকান্ত বসু স্ট্রীটের একদা 'বলরাম-ভবন' বর্তমানে 'বলরাম-মন্দির'। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবদ্দশায় যাকে বলতেন 'দ্বিতীয় কেল্লা' বা 'কলকাতার কেল্লা'। শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ভগবান এই মন্দিরে নিত্য পূজিত, সঙ্গে প্রতিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমা। এই বলরাম-ভবনের গৃহকর্তা বলরাম বসু শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, মা জগদম্বার চিহ্নিত রসদ্দার। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে তাঁকে দেখেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ 'বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা', 'বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন'—ইত্যাদি। সেবামূর্তি বলরামের সঙ্গে স্বভাবতই শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, ফলে বলরাম-মানসে শ্রীশ্রীমা জগদম্বার আসনে অধিষ্ঠিতা, তেমনি আবার শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-ছায়ার মধ্যে বলরামের ভাবটিও মনোহর। মাতৃ-আশীর্বাদে ধন্য বলরাম জীবন-পথের সহজ শান্ত পথযাত্রী—অনেকটাই স্থিতপ্রজ্ঞের ভাব।

বলরাম 'লজ্জাপটাবৃতা' শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে। দুর্গাপুরী দেবী বিরচিত 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় যে একদিন বলরাম তাঁর পরিজনদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনের মুখে নাতি 'মানিক' তাঁর হাত ধরে বলে উঠলঃ 'দাদু দাদু, ঐ দ্যাখ, মা ঠাকরুণ বেরিয়েছেন।' বলরাম মায়ের শ্রীমুখ দর্শন করলেন এবং দ্রুত পদে গিয়ে শ্রীমায়ের চরণে দণ্ডবৎ হলেন।[১৪]

শ্রীঠাকুরের দেহধারণকালে শ্রীশ্রীমা বলরাম-ভবনে দুবার এসেছিলেন। বলরামের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী গুরুতর পীড়িত। দক্ষিণেশ্বর থেকে পালকি করে গিয়ে শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখে এসেছিলেন। দ্বিতীয় বারের গমন সম্বন্ধে তিনি নিজমুখে বলেছিলেনঃ দুবার এসেছিলুম। আর একবার—তখন আমি শ্যামপুকুরে—রাতে হেঁটে রামের মার [বলরাম-গৃহিণীর] অসুখ দেখতে আসলুম।'[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলা-সংবরণের পর শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বসুপরিবারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল। বাগবাজারের শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি নির্মাণের পূর্বে কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের 'বড় ঘাটি' ছিল এই বলরাম-ভবন। তিনি এই ভবনের দোতলায় উত্তর-পশ্চিমের কোনার ঘরটিতে বাস করতেন। বিরহবিধুরা শ্রীশ্রীমাকে পুত্রতুল্য বলরাম সাদরে নিজের বাড়িতে এনে সেবাযত্ন করেন। শোকাতুরা জননীকে তীর্থদর্শন করাতে

উদ্যোগী হন। কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীমা সঙ্গী-পরিবৃতা হয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন এবং বলরামবাবুদের 'কালাবাবুর কুঞ্জে' প্রায় একবছর সাধন-ভজন করেছিলেন। এবং এর পর শ্রীশ্রীমা প্রায় একবছর কাল কামারপুকুরে স্বামীর ভিটায় শাক বুনে হরি-নাম করে দীনভাবে দিনযাপন করেছিলেন। তখন তাঁর ভাতের সঙ্গে নুনটুকুও জুটতো না। অকস্মাৎ একদিন কামারপুকুর তীর্থে উপস্থিত হন বলরাম-গৃহিণী কৃষ্ণভাবিনী ও তাঁর শ্বাশুড়ী মাতঙ্গিনী দেবী। শ্রীশ্রীমায়ের আদর-যত্নে আপ্যায়িত হয়ে তাঁরা ফিরে গিয়ে কলকাতার সব ভক্তদের কামারপুকুরের সংবাদ দেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিদারুণ দারিদ্রের কাহিনী শুনে ভক্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তাঁদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে অপরাধবোধের তাড়নায়। এদিকে বলরাম কালবিলম্ব না করে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে কলকাতায় নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। তাছাড়াও শ্রীশ্রীমা যখনই পুরীতীর্থে গিয়েছেন সেখানে বলরামবাবুদের 'ক্ষেত্রবাসীর মঠে' বা তাঁদের জমিদারি কোঠারে গিয়ে বসবাস করেছেন। যেমন বলরাম, তেমনি তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী, পুত্র রামকৃষ্ণ ও অন্যান্যেরাও শ্রীশ্রীমাকে দেবীজ্ঞানে সেবাপূজা করেছেন। ভক্ত বলরাম নতজানু হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে কেবল যে ভক্তি-অর্ঘ নিবেদন করে গেছেন তাই নয়, সুগভীর প্রজ্ঞা-দৃষ্টি সম্পাতে দুটি মাত্র শব্দ-যোজনায় শ্রীশ্রীমায়ের যথার্থ স্বরূপটিকে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকেই হয়তো জানেন না ভক্ত বলরামই সর্বপ্রথম মাকে 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'[১৬] বলে অভিহিত করেন। ভক্তি ও প্রজ্ঞার অপরূপ আলোকিত সমন্বয় ঘটেছিল বলরামের চরিত্রে। তাই ভক্ত হয়েও অভ্রান্ত প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে মাতৃচরিত্রের মৌল স্বরূপটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

• বলরাম তাঁর তপোশুদ্ধ ও সেবা-প্রণত প্রত্যহ-চর্যায় শুধুমাত্র পরমগুরু শ্রীরাম-কৃষ্ণের হৃদয়ই জয় করেননি, পরন্তু জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ লাভেও ধন্য হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন তাঁর প্রিয় বলরাম। সুখে দুঃখে আনন্দবেদনায় পুত্রের মতোই বলরাম ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য সহযাত্রী। স্বামীজী গাজীপুর থেকে বলরামবাবুকে একটি চিঠিতে লিখছেনঃ 'শুনিয়াছি, মাতাঠাকুরানীও আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন।' বলরাম সমস্ত জীবন তাঁর উপরে ন্যস্ত এই বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা রেখে গেছেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই বলরামবাবু কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। স্বামী বিবেকানন্দ কাশী থেকে ছুটে এলেন। স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইয়েরা শয্যাশায়ী বলরামের সেবায় নিযুক্ত হলেন। শ্রীশ্রীমা তখন গয়াতীর্থ থেকে ফিরে কুম্বুলিয়াটোলায় কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়িতে বাস করছেন। তিনি কৃষ্ণভাবিনীর প্রার্থনায় ব্যাকুল হয়ে বলরাম-ভবনে চলে আসেন এবং বলরামবাবুকে দর্শন ও পরম আশীর্বাদ দান করেন। ভাগ্যবান বলরাম সকল সেব্য-চিকিৎসাদি ব্যর্থ করে দিয়ে সব মায়িক সম্বন্ধ ছিন্ন করলেন ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে (১৩ এপ্রিল ১৮৯০)। শোনা যায় শ্রীশ্রীমা ভাবচক্ষে দেখেছিলেন দাস্যভাবের প্রতিমূর্তি বলরাম দিব্য-রথে চড়ে স্বর্গে আরোহণ করেন। বলরাম চলে

গেছেন কিন্তু সেবার স্নিগ্ধ শিখাটি হয়ে আজও যেন প্রজ্বলিত হয়ে আছেন শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে।

॥ তৃতীয় শিখা ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমশাই ওরফে দুর্গাচরণ নাগকে দেখিয়ে নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেনঃ 'এরই ঠিক ঠিক দীনতা, একটুও ভান নেই।'[১৭] শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুই শিষ্য—নরেন্দ্রনাথ ও নাগমহাশয় সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেনঃ 'নরেনকে ও নাগমহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন তত বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হল যে মায়া হতাশ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। নাগ মহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু মহামায়া যত বাঁধেন, নাগ মহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।'[১৮] 'তৃণাদপি সুনীচেন'—তৃণের চেয়েও আনত—সত্যি নিরভিমানিতার ও দীনতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন সাধু নাগমহাশয়। তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ ছিলঃ 'তুমি জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।'[১৯]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেদিন একাদশী। শ্রীশ্রীমা আহারে বসেছেন। এমন সময় বাড়ির ঝি এসে খবর দিলঃ 'মা, নাগমহাশয় কে? তিনি প্রণাম কচ্ছেন, কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন, মনে হয় রক্ত বেরুবে। মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) পেছন থেকে কত বলছেন থামবার জন্য, কিন্তু কোন বাক্যই নেই—যেন হুঁশ নেই। পাগল না কি, মা?' শ্রীশ্রীমায়ের প্রাণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। তাঁর নির্দেশে স্বামী যোগানন্দ কম্পমান নাগমশায়কে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমা দেখেন নাগমশায়ের কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, পা টলমল করছে। ভাবে মাতোয়ারা নাগমশায়ের মুখে কেবল 'মা মা' শব্দ। পর্দানশীন ও লজ্জাপটাবৃতা জননী তাঁকে ধরে বসান, চোখের জল মুছিয়ে দেন, লুচি, ফল, মিষ্টি তাঁকে খাওয়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না। নাগমশায় শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে হাত দিয়ে বসে আছেন, আর সারাক্ষণ মুখে শুধু 'মা মা' রব। শ্রীশ্রীমা তাঁর মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, ঠাকুরের নাম শোনান। কিছুক্ষণ পরে তাঁর হুঁশ এলে শ্রীশ্রীমা নিজে খেতে বসেন ও নাগমশায়কে প্রসাদ খাইয়ে দেন। খাবার পরে বিদায়ের সময় নাগমশায় বলতে থাকেনঃ 'নাহং নাহং ; তুহুঁ তুহুঁ'। ফেরার পথে আনন্দে আত্মহারা নাগমশায় বারংবার বলতে থাকেনঃ 'বাপের চেয়ে মা দয়াল। বাপের চেয়ে মা দয়াল।'[২০] সম্ভবত এটিই নাগমশায়ের প্রথম মাতৃদর্শন।

মহাভক্ত নাগমশায়ের দীন ভাব ও ভক্তিরসের প্রাবল্য অনেকের কাছেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করত। শ্রীশ্রীমা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কয়েকমাস বাগবাজারে গঙ্গার ধারে

'হলুদ গুদাম' বাড়িতে ছিলেন। নাগমশায় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে এসেছেন। তাঁকে একটি শালপাতায় করে যথা নিয়মে প্রসাদ দেওয়া হল। তিনি ভক্তির আতিশয্যে পাতাশুদ্ধ প্রসাদ খেয়ে ফেললেন। আর একবার শ্রীশ্রীমা একখানি কাপড় দিয়েছিলেন নাগমশায়কে। তিনি সেখানি শিরোভূষণ হিসাবে চিরকাল ব্যবহার করে গেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁর সর্বসমর্পিত ভক্তি ও বিনীত সেবাপরায়ণ মনোভাবের পরিচয় মেলে অন্য একটি ঘটনায়ঃ নাগমশায় একদিন মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরে নিজেদের গাছের এক ঝুড়ি আম মাথায় করে মায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। ভালো জাতের সুস্বাদু আম। কতকগুলি আমের গায়ে আবার চুনের ফোঁটা দেওয়া। নাগমশায় ঝুড়ি মাথায় করেই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঝুড়িটি কারও হাতে তুলে দিতে তিনি রাজি নন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা সামনে বসে মাকে আম খাওয়াবেন। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে নাগমশায়কে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আনা হল। একজন ব্রহ্মচারী মাথা থেকে ঝুড়ি নামিয়ে নিলে নাগমশায় শ্রীশ্রীমায়ের চরণ বন্দনা করেন। তিনি তখন ভাবে প্রায় বেহুঁশ। চোখে অবিরল অশ্রুধারা। মুখে শুধু 'মা মা'। আমগুলি কেটে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হল। পূজান্তে যোগীন-মা একটি শালপাতায় কিছু প্রসাদ শ্রীশ্রীমাকে দিলেন। শ্রীশ্রীমা তা থেকে কিছু প্রসাদ আর একটি শালপাতায় তুলে দিয়ে বললেনঃ 'খাও।' ভাববিহ্বল নাগমশায়ের তখন কিছু খাওয়ার অবস্থা নেই। শ্রীশ্রীমা তাঁর হাত ধরে কয়েকবার খেতে বললে নাগমশায় একটুকরো আম নিয়ে মাথায় ঘষতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে তাঁকে নীচের তলায় নিয়ে যাওয়া হল। বহুক্ষণ পরে তিনি স্বস্থ হলেন। কিন্তু সেদিন আর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারলেন না। একটু পরে বাড়ি ফিরে গেলেন।'[২১]

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি নাগমশায়ের যেমন ভক্তিশ্রদ্ধা—তেমনি আবার তাঁর উপর ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহদৃষ্টি। একটি ছোট্ট অথচ ইঙ্গিতবহ ঘটনাঃ একজন ভক্ত একদিন লক্ষ্য করলেন, শ্রীশ্রীমা তাঁর শয়নঘরের দেয়ালে টাঙানো স্বামীজী, গিরিশবাবু ও নাগমশায়ের ছবিগুলি মুছে, তাতে চন্দনের টিপ দিয়ে শেষে ছবিতে হাত স্পর্শ করে চুমো খেলেন। নাগমশায়ের ছবিখানি দেখে শ্রীশ্রীমা অতঃপর স্বগতোক্তি করলেনঃ 'কত ভক্তই আসছে ; কিন্তু এমনটি আর দেখছি না।'

সাধু নাগমহাশয় সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের আর একটি উক্তিও এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ 'বাঙাল-দেশীয় দুর্গাচরণ আসত। তার কি গুরুভক্তিই ছিল! ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁর জন্য তিন দিন খুঁজে খুঁজে আমলকী এনে দিলে। তিন দিন আহার-নিদ্রা নেই। একবার শালপাতে প্রসাদ দিলুম [গুদামওয়ালা বাড়িতে] পাতা শুদ্ধ খেয়ে ফেললে! কাল, শুকনো চেহারা—কেবল চোখ দুটি বড় আর উজ্জ্বল ছিল। প্রেমের চক্ষু, সর্বক্ষণ প্রেমাশ্রুতে ভেজা থাকত।'[২২] ভক্তির দিব্যানন্দে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে কতটা বিলীন করে দেওয়া যায় সাধু নাগমহাশয় তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিবৃত্তে। মাতৃ-চরণ-প্রান্তে নিত্য প্রজ্জ্বলিত ভক্তির এই অশ্রুনত-শিখাটি আজও অকম্প্র। সন্ধ্যা-

আকাশের নির্জন সজল শুকতারাটির মতো শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তির নিঃশব্দ বন্দনা-গীতি রচনা করে চলেছে।

॥ চতুর্থ শিখা ॥

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' গ্রন্থের অমর রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন নিজের সম্বন্ধে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে লিখেছিলেনঃ 'সংসার প্রবাহে স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে পরম দয়াল ঠাকুরের কাছে গিয়া পড়িয়াছিলাম। তিনি নিজগুণে ভিখারীকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছেন।' তিনিই আবার তাঁর পুঁথিতে গুরুমাতা বন্দনায় লিখেছেনঃ

জগত-জননীরূপে এখন লীলায়।
পূর্ণিত অন্তরাধার স্নেহ-করুণায়॥
মহামন্ত্র মা প্রণব করি উচ্চারণ।
পদতলে নতশিরে পরশে চরণ॥

অক্ষয়কুমার সেনকে শ্রীশ্রীমা বলতেন 'অক্ষয় মাস্টার' আর স্বামী বিবেকানন্দ নাম রেখেছিলেন 'শাঁকচুন্নী'। পুঁথি লেখা আরম্ভ হলে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁকে বরাহনগর মঠে ঠাকুরের বাল্যলীলা শুনে আশীর্বাদ করেছিলেন। স্বামীজীই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট। শ্রীশ্রীমা তখন বেলুড়ে বসবাস করছিলেন। অক্ষয়কুমার শ্রীমাকে পুঁথি পড়ে শোনান। 'শ্রবণান্তে মাতা তবে কৈল আশীর্বাদ। নির্বিঘ্নে সমাধা পুঁথি পূর্ণ হবে সাধ।' শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করে অক্ষয়কুমার 'তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের লীলালোচনা করিতে লাগিলেন।' বিশেষত একবার তখন 'অক্ষয় মাস্টার' কামারপুকুরে অবস্থান করছিলেন। শ্রীশ্রীমা সেই সময় ঠাকুরের সময়কার প্রাচীন গ্রামবাসীদের ডেকে অক্ষয়কে দিয়ে পুঁথি পড়িয়ে শোনালেন এবং মা স্বয়ং দু-হাত তুলে গ্রন্থের সাফল্য কামনা করলেন।

বাঁকুড়ার ময়নাপুর-নিবাসী 'শাঁকচুন্নী'র বরাবরই শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের সকলের কাছেই প্রীতিভাজন ছিলেন অক্ষয় মাস্টার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী স্বয়ং পূজনীয় ব্রহ্মানন্দজীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে শাঁকচুন্নীর খোঁজ নিয়ে লিখছেনঃ 'শাঁকচুন্নীর কোনও কথাই ত তোমরা লেখ না! সে গেল কোথা? মাকে ভক্তি করছে তেমনি কি না?' স্বামীজীই আবার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকে লিখছেনঃ 'শাঁকচুন্নী যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে তাহা পরম সুন্দর। কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই। এই মহাদোষ। দ্বিতীয় edition-এ শুদ্ধ করিতে বলিবে।'—স্বামীজীর এই নির্দেশানুসারে 'অক্ষয় মাস্টার' তাঁর পুঁথির দ্বিতীয় সংস্করণে জুড়ে দিয়েছিলেন 'গুরু-মাতৃ-বন্দনা' অধ্যায়টি।

শ্রীশ্রীমাও তাঁর এই সন্তানটিকে বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখতেন। শ্রীশ্রীমা যেখানেই থাকুন অক্ষয়চন্দ্র মাঝে মাঝেই তাঁর চরণবন্দনা করে আসতেন। ১৩০১ সালে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা ও তাঁর গর্ভধারিণী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীশ্রীমা কথামৃতকারকে লিখেছিলেনঃ 'অক্ষয় মাষ্টার ডাক্তার

আনিয়া আমার আরোগ্য করিয়াছেন।'[২৩] ভক্তির ঐকান্তিকতায় এবং বিশ্বাসের গভীরতায় অক্ষয় মাস্টারের হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ। একদিন অক্ষয় মাস্টার শ্রীশ্রীমায়ের নিকট এসে 'মা' বলে ডাকতেই শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'হ্যাঁ, বাবা।' অক্ষয় মাস্টার বললেনঃ 'মা, আমি বললুম "মা" আর তুমি বললে "হ্যাঁ"! আর কিসের ভয়?' শ্রীশ্রীমা অমনি তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেনঃ 'না, বাবা, অমন কথা বলো না। "যার আছে ভয়, তারই হয় জয়"।'[২৪]

দারিদ্র ও সাংসারিক নানা জ্বালা-যন্ত্রণায় নিপীড়িত অক্ষয় মাস্টার প্রাক্তনের অনিবার্য অনুশাসনে জাগতিক সুখ বেশী পাননি এই জীবনে। তবু মাঝে মাঝেই দেখা যেত ছোট একখানি ধুতি পরে, দীর্ঘ একটি লাঠি নিয়ে খালি পায়ে অক্ষয় মাস্টার আসছেন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। স্ব-মস্তকে বহন করে নিয়ে আসছেন নানা-বিধ দ্রব্য সামগ্রী। শোনা যায় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে অক্ষয় মাস্টার বৃদ্ধ বয়সের রোগ ও পারিবারিক অশান্তি থেকে মুক্তিলাভের জন্য আকুল প্রার্থনা করতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমা আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেনঃ 'তোমার শেষ বয়সে একটু ভোগ আছে।' অসহ্য হাঁপানি রোগে পীড়িত অক্ষয় মাষ্টার ঐ কথার উল্লেখ করে বলতেনঃ 'সেই একটুতেই যা যন্ত্রণা! তিনি যদি আঙুলটা আর একটু লম্বা দেখাতেন, তবে এ শরীরে আর সহ্য হত না।' তিনি ১৯১৯ সালের ৮ই জুলাই তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ 'শেষ জীবনে বড়ই কষ্ট পাইলাম। কষ্টটা চন্দনের ন্যায় অঙ্গরাগ মনে করা উচিত ছিল, কিন্তু তা পারিলাম না। কষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তাই উন্নতির পথ।' কিন্তু তা সত্ত্বেও অক্ষয় মাস্টারের মনের গভীরে একটি অভিমান বরাবরই ছিল এবং রচনার মধ্যেও তার কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। তিনি পুঁথিতে লিখেছেনঃ

এক মর্মভেদী দুঃখ বড় বাজে প্রাণে।
কেন এত দুঃখ হেন মাতা বিদ্যমানে॥
স্মরিলে দুঃখের কথা ফেটে যায় ছাতি।
সিংহের শাবক খাই শিয়ালের লাথি॥[২৫]

পুঁথিতে এ সম্পর্কে আরও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য দেখা যায়ঃ

সম্মুখে পেয়েছি এবে সব দুঃখ কব।
মার ছেলে কেন কহ এতেব সহিব॥
দেখি অসংসারিগণে অতিশয় টান।
গৃহীরা কি বানে-ভাসা পরের সন্তান॥[২৬]

ভক্ত-হৃদয়ের শুদ্ধ অভিমানের রসে সিক্ত হওয়ায়—পুঁথির বহু অংশ আন্তরিকতার ঐশ্বর্যে ও মানবিকতার গুণে ঝলমল করছে এবং তারই ফলে বহু পাঠকের কাছে পুঁথিখানি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীমা এই পুঁথির একজন সমঝদার ছিলেন। তিনি যেমন 'কথামৃতের' প্রশংসা করতেন, তেমনি বলতেনঃ 'অক্ষয় মাষ্টারের পুঁথিও বেশ।' শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু ভক্ত নর-নারী আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধার

সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন প্রসঙ্গে যাঁরা গবেষণা করছেন—তাঁদের কাছেও নানাদিক থেকে পুঁথির একটি বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে।

জয়রামবাটী থেকে উত্তর-পশ্চিমে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত ময়নাপুর গ্রাম। বাঁকুড়া জেলারই অন্তর্গত। অক্ষয় মাস্টার শেষ জীবনে তাঁর জন্মভূমি ময়নাপুরে বাস করতেন। একদিকে শ্রীশ্রীমায়ের দেশে থাকাকালে তাঁর খবর ও আশীর্বাদ পাবার জন্য অক্ষয় মাস্টার মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাতেন, আবার অন্যদিকে তাঁর খুঁত-খুঁতানির শেষ নেই। বিভিন্ন সময়ে মায়ের কাছে নিবেদন করেছেন তাঁর দ্বিধা, কুণ্ঠা, সন্দেহ। একবার শ্রীশ্রীমা তাঁকে তাঁর চিঠির উত্তরে লিখেছিলেনঃ 'আমার আপনার পর কেউই নাই, সকলেই সমান...আমার মনের মধ্যে কিছুই দুই-দুই নাই।' সাংসারিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও মায়ের সেবার জন্য অক্ষয় মাস্টার জিনিসপত্র পাঠাতেন একথা আগেই বলা হয়েছে। ময়নাপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ভৈষা ঘিও কখন কখন মাকে পাঠাতেন। প্রায় দুধের মতো সাদা সেই ঘি গরম ভাতের উপর পরিবেশন করে শ্রীশ্রীমা তাঁর সন্তানদের বলতেনঃ 'অক্ষয় মাস্টারের পাঠানো ঘি, কেমন সুস্বাদ খেয়ে দেখো।'

তিয়াত্তর বছর বয়সে 'অক্ষয় মাস্টার' দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁর ছোট ভাই জ্যেষ্ঠের অন্তিম কাল উপস্থিত দেখে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম শোনাতে শুরু করেন। অক্ষয় মাস্টার গুরুর প্রিয় নাম শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে ওঠেনঃ 'তোমরা চুপ কর, আমি ঠাকুর ও মাকে দেখতে পাচ্ছি।'[২৭] ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়—কিন্তু পিছনে রেখে যায় তার অম্লান সুগন্ধ-প্রবাহ। অক্ষয় মাস্টার কবে চলে গেছেন তাঁর নশ্বর দেহটি রেখে এই মর্তের মাটিতে, কিন্তু তাঁর জীবন-সাধনা আজও ছড়িয়ে দিচ্ছে ধূপারতির মধুর গন্ধরাশি। সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে দীনতার শিখাটি হয়ে আজও যেন একান্তে উচ্চারণ করে চলেছে আরতির প্রণাম-মন্ত্রঃ

জয় জয় শ্রীশ্রীমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ-ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥

॥ পঞ্চম শিখা ॥

জগৎ ও জীবনের নানা জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একদা আত্মহত্যার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঝড়ের এঁটো পাতার মতো এসে পড়েছিলেন অশেষ করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রয়ে। পরিণামে তাঁর নিজের জীবন হয়েছিল অমৃতায়িত এবং তিনি সেই মধু বিতরণ করেছিলেন বিশ্বজনের কাছে। অনন্ত সেই মধুভাণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। মহেন্দ্রনাথের জীবনাঙ্গনে রামকৃষ্ণ-সূর্যের উদয় সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর জীবনাকাশে রামকৃষ্ণ-সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই উদিত হয়েছিল সারদা-চন্দ্র। সেকারণে সেটি অনেকেরই নজরে তেমন পড়ে না। আজকের প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করি যে সারদা-চন্দ্রের বিমল কিরণই সংসারতাপদগ্ধ মহেন্দ্রনাথের জীবনকে স্নিগ্ধ সুন্দর ও রসমাধুর্যে

নিত্য নবীন করে রেখেছিল এবং তাঁর প্রতিভার বাগানে হেমন্তের শিশিরকণার মতো নিঃশব্দে বিচিত্র সুন্দর গোলাপ-রজনীগন্ধা সকল ফুটিয়েছিল। তাদেরই বেশ কয়েকটি নিয়ে সাজানো পুষ্পাধার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'।

শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলার কালে শ্রীশ্রীমা প্রায় অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন বিশেষত পুরুষ ভক্তদের কাছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সাত মাস পরে মহেন্দ্র তাঁর রোজনামচার শিরোনামায় লিখেছেনঃ 'শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমা চরণ ভরসা।' মহেন্দ্র কৈশোরে তাঁর গর্ভধারিণী জননীকে হারিয়েছিলেন। মাতৃগতপ্রাণ মহেন্দ্রের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর আপন জননীই শ্রীশ্রীমায়ের রূপ ধরে তাঁর জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহেন্দ্র-গৃহিণী নিকুঞ্জদেবীর ছিল শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাতায়াত। নিকুঞ্জদেবী তাঁর বড় ছেলেটির মৃত্যু-শোক সামলাবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কিছুকাল বাস করেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে শুনেই মহেন্দ্র শ্রীশ্রীমায়ের ঘরোয়া জীবনের প্রত্যহ-দিনচর্যার পরিচয় লাভ করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর অপার সন্তানস্নেহের অমল করুণাধারা-প্রবাহের সামান্য ধারণা করতে পেরেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবসানের পর মহেন্দ্রের বিশ্বভুবন ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে-সময়ে শ্রীশ্রীমা রামকৃষ্ণ-ভাব-রঞ্জিতাকারা গুরুশক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহেন্দ্রের চেতনার পীঠস্থানে। দুবছরের মধ্যে নিকুঞ্জদেবী তাঁদের পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। এবং তারপর পরিবারের অনেক ব্যক্তি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করেন। এমন কি মহেন্দ্রও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ধন্য হন।[২৮] ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর (২১ আশ্বিন ১২৯৫) মহেন্দ্রের পৈত্রিক বাড়ি যা বর্তমানে 'কথামৃত ভবন' নামে পরিচিত, সেই বাড়ির তেতলায় ছাত সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটিতে শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে 'মংগলঘট' স্থাপনা করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পট প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজার প্রবর্তন করেছিলেন।

মহেন্দ্র শ্রীশ্রীমাকে সেবা করেছিলেন সাক্ষাৎ জননীর মতো। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের পৈত্রিক বাড়িতে, কলুটোলাস্থ একান্ন নম্বর ভবানী দত্ত লেনের বাড়িতে, দু-নম্বর হেমকর লেনের বাসায় তিনি শ্রীশ্রীমাকে রেখে সেবাযত্ন করেছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে তখন শাক বুনে ও ছেঁড়া কাপড় গিঁট দিয়ে পরে দিনযাপন করছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই দারিদ্র ও দৈন্য-দুর্দশার খবর কলকাতায় ভক্তদের মধ্যে প্রথম প্রচারিত হয় ভক্ত বলরামের স্ত্রীর মাধ্যমে। শ্রীশ্রীমায়ের এই দৈন্য-দশা ভক্তদের যেন আত্মগ্লানির চাবুক মারে এবং ভক্তগণ সচেতন হয়ে ওঠেন এ সম্পর্কে। অনেকেই এ সময়ে মাতৃ-দুঃখ মোচনে তৎপর হয়ে ওঠেন। সে সময় থেকেই মহেন্দ্রও শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য প্রতিমাসে কিছু টাকা পাঠাতে শুরু করেন।[২৯] এভাবে দেখা যায় শ্রীশ্রীমা একই সঙ্গে মহেন্দ্রের প্রত্যক্ষ এই জীবনের

প্রতিটি দিনচর্যায় আপনার মা রূপে একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছেন, আবার তাঁর অধিমানসলোকের অনন্য অন্তরালে ধ্যানের আসনেও সর্বকল্যাণ বিধাত্রী ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী জগজ্জননী রূপে সম্প্রতিষ্ঠিতা। মহেন্দ্রের চেতন অনুভবে এবং বোধ-বৃত্তের পরিমণ্ডলেই নয় তাঁর মগ্নচৈতন্যেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা। মহেন্দ্র স্বপ্নযোগে বারংবার সান্নিধ্যলাভ করেছেন শ্রীশ্রীমায়ের। মহেন্দ্র একদিন কালীঘাটে মা'কালীর পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরে রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন শ্রীশ্রীমায়ের করুণাময়ী কল্যাণীমূর্তি। আবার কয়েকদিন পরে স্বপ্নে দেখেন শ্রীশ্রীমা নিজেই কালীঘাটের মন্দিরে মা'কালীকে বিল্বপত্র দিচ্ছেন। এছাড়া আরও নানা ভিন্ন পট-ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮। মহেন্দ্র তখন পূর্ণোদ্যমে কথামৃত রচনা করছেন। একরাতে স্বপ্ন দেখলেন শ্রীশ্রীমা দেবী অন্নপূর্ণার ভূমিকায় সমাসীন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রসন্ন উজ্জ্বল মূর্তি। মায়ের মুখের বাম পাশ দেখা যাচ্ছে। অনেকটা প্রসন্নমামার মুখের আদল। কিন্তু গৌর বর্ণ। যে যা প্রার্থনা করছে তাকে তাই দান করছেন শ্রীশ্রীমা। কেউ বা ওষুধ চাইছে। মা তাও দিচ্ছেন। মহেন্দ্রের চেতনায় উদ্ভাসিত শ্রীশ্রীমায়ের ভাবমূর্তির একটি আভাস রয়েছে তাঁর অপ্রকাশিত এক কবিতার অংশে। কবিতাটি তাঁর গর্ভধারিণী স্বর্ণময়ী দেবীকে উদ্দেশ করে লেখা। স্বর্ণময়ী দেবী শিশু মহেন্দ্রকে নিয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন। কবিতায় মহেন্দ্র লিখছেন:

আর দেখেছিলে কি মা
নহবতের ঘর বকুলতলায়
যেথা জগতের মাতাঠাকুরাণী, মা আমার,
ধরি নারীরূপে যাপিবেন কাল,
দ্বাদশ-বর্ষ ধরে,
রামকৃষ্ণদেব নারায়ণ শ্রীপতির
চরণদুটি সেবিবার তরে?
যেন পতিগতপ্রাণা সীতাদেবী
এসেছেন চিত্রকূটে
কিংবা পঞ্চবটীবনে, রাজসুখ ত্যজি,
সেবিতে কমল-লোচন-শ্রীরামপদ॥

মহেন্দ্র-মানসে শ্রীশ্রীমা সম্প্রসারিত রামকৃষ্ণশক্তি বা ভুবনেশ্বরী দেবীরূপে নিত্যপূজিত হলেও কৈশোরে মাতৃহীন মহেন্দ্রের তিনিই একান্তভাবে মা। পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা। মহেন্দ্র স্বপ্নে দেখেন শ্রীশ্রীমা তাঁকে নিজ হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন। আবার একদিন শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিখানি স্বপ্নে দর্শন করতেই তিনি আবদার করে ধরেন: 'মা, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকো।' একই ভাবের অনুবর্তন দেখতে পাই তাঁর জাগ্রত চেতনাতেও। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ মে শ্রীশ্রীমাকে তিনি চিঠিতে লিখছেন: 'মা, শরণাগত কর। সব শক্তি তো তোমারই।'* আবার তিনদিন পরে আরেকটি চিঠিতে লিখছেন: 'মা, তুমিই বিপদনাশিনী, তুমি রক্ষা কর।' শ্রীশ্রীমা তাঁকে সান্ত্বনা দেন, ভরসা দিয়ে চিঠি লেখেন: 'সংসার জ্বলন্ত আগুন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা হলে কি না হতে পারে?' আরেকটি চিঠিতে তিনিই আবার মহেন্দ্রকে লিখছেন:

'আর তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] যখন দর্শন করিয়াছ, তখন কোন কিছুতেই ভয় নাই।' নিত্য অভয়দাত্রী শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রের বড় প্রিয়জন। মহেন্দ্রও তাঁর একান্ত ভালোবাসার ধন।

শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রের সেব্য, আরাধ্য, ধ্যানগম্য। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মজয়ন্তী প্রকাশ্যে প্রবর্তিত হবার অনেক আগেই মহেন্দ্র সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি পালন করেছিলেন। তারিখটি ছিল ২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৯—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি। মহেন্দ্র সকাল হতেই চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে। সারাদিন কাটালেন জপ-ধ্যান করে। আর শুধু বছরের একটি দিনই নয়, মহেন্দ্রের প্রত্যহ-দিনচর্যার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের পূজা-উপাসনা, তাঁর ধ্যানধারণা। একটি মাধুর্যমণ্ডিত ঘটনাঃ শ্রীশ্রীমা তখন দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি তীর্থ পরিক্রমা করছিলেন, তাঁর সেবক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিস্তৃত বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছিলেন মহেন্দ্রকে। তীর্থ-পরিক্রমা শেষ হলে মহেন্দ্র ১৯১১ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে ইংরেজীতে চিঠি লিখে পাঠালেনঃ 'হ্যাঁ সত্যিই, এই কয়েকটি দিন তোমরা সকলে একটা মহোৎসবে মেতে গিয়েছিলে। কিন্তু বিশ্বাস করবে কি, এই অতি দীন আমিও শ্রীশ্রীমায়ের পূত-সঙ্গে ভ্রমণকারী তোমাদের সহযাত্রী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি মাদ্রাজ থেকে মাদুরা, মাদুরা থেকে রামেশ্বর, সেখান থেকে আবার মাদ্রাজ এবং শেষে বাঙ্গালোর গমন ও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। আমি সূক্ষ্মরূপে শ্রীশ্রীমায়ের দক্ষিণদেশে ভ্রমণের সর্বত্র তোমাদের সকলের পরমানন্দের অংশভাক্ হয়েছি।' এভাবে মহেন্দ্র তাঁর দিনচর্যার প্রতিটি মুহূর্তে—শয়নে স্বপনে জাগরণে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে নিজের হৃদয়ে একটি শান্তির মঙ্গলঘট স্থাপন করেছিলেন।

মহেন্দ্রের 'কথামৃত-দুরূহ-ব্রত' পালনের ক্ষেত্রেও শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা ছিল অনন্য-স্বতন্ত্র—যদিও অন্তরালবর্তিনী শ্রীশ্রীমা এখানেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছেন। লোকচক্ষুর অগোচরে থেকেই মহেন্দ্রের কথামৃত-রচনার পশ্চাতে শ্রীশ্রীমায়ের অসাধারণ শ্লাঘ্য ভূমিকা। মহেন্দ্র তাঁর রোজনামচাতে সংগৃহীত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সঙ্কলন করে তৈরী করলেন একটি পাণ্ডুলিপি। ১১ জুলাই ১৮৮৮ রথযাত্রার দিন মহেন্দ্র তাঁর পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে, বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। পাণ্ডুলিপির পাঠ শুনে শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রের এই সারস্বত প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। দেখা যায় মহেন্দ্র আবার শ্রীশ্রীমাকে তাঁর পাণ্ডুলিপির একাংশ পড়ে শুনিয়েছিলেন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মার্চ তারিখে। শ্রীশ্রীমা তখন বাস করছিলেন দুই নম্বর হেম কর লেনে মহেন্দ্রের কাছেই। এভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সমর্থন, উৎসাহ, প্রবর্তনা ও আশীর্বাদ লাভ করে মহেন্দ্র প্রকাশ করলেন ছোট্ট একটি পুস্তিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র কুড়ি। এই গ্রন্থেরই তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৯২। সাধু মহীন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট হতে উপাদান সংগ্রহ করে জনৈক সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন 'পরমহংসদেবের উক্তি' প্রকাশ করেন। প্রকাশকরূপে ঘোষিত সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন দ্বিধাগ্রস্ত মহেন্দ্রনাথের ছদ্মনাম। এই পুস্তিকা পাঠ করেই স্বামী বিবেকানন্দ মহেন্দ্রনাথকে 'লক্ষ সাবাস' জানিয়েছিলেন।

মাঝখানে নানারকমের জটিল সাংসারিক সমস্যা ও আধিভৌতিক অস্বস্তিতে বিব্রত হয়ে মহেন্দ্র তাঁর কথামৃত-সাধনাতে তত আর মনোনিবেশ করতে পারছিলেন

না। কিন্তু তাঁর সাধনক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীমায়ের ছিল সদা-সজাগ দৃষ্টি। ১৮৯৫ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে মহেন্দ্রনাথকে শ্রীশ্রীমা লিখছেনঃ 'কল্যাণবরেষু.... যে বিষয়গুলি অর্থাৎ ঠাকুরের যে কথাগুলি বলিবার জন্য বাছিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বাছিয়া রাখিবেন।'[৩০] মহেন্দ্র তাঁর মাতৃ-বাণীতে উৎসাহিত হয়ে আবার জোর কদমে এগিয়ে চললেন মহাগ্রন্থ সম্পাদনার পূর্বপ্রস্তুতির নিদিধ্যাসনায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে আশ্রয় করে মহেন্দ্রের সারস্বত সাধনা নতুন একটি খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করল এরপর থেকে। এই সময় মহেন্দ্র 'A leaf from the Gospel of Sri Ramakrishna'—শীর্ষক কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং ইংরেজী 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'ডন' পত্রিকাতে এগুলি প্রকাশিত হয়।, এগুলি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ মাস্টারমশাইকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠিতে লিখলেনঃ 'এই বিরাট কাজ আপনার জন্যই পড়েছিল। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আছেন।'[৩১] রামকৃষ্ণ মিশন এসোসিয়েশনের সাপ্তাহিক আসরে মহেন্দ্র ইংরেজীতে ও বাংলায় কথামৃত পাঠ করে শোনালেন। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি লেখক মহেন্দ্রকে অভিভূত করল। কিন্তু নিন্দার কণ্টকও পথে চলতে গিয়ে তাঁর পাদুখানিকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলল। সহৃদয় সংবেদনশীল মহেন্দ্র পুনর্বার দ্বিধাকুণ্ঠার ঘোরে পড়লেন। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সব কিছু নিবেদন করে চিঠি লিখলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই তারিখে শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রকে আশ্বস্ত করে লিখলেনঃ 'বাবাজীবন, তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন্ ভয় নাই। এক সময় তিনি তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনি প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।' প্রেরণা-পূর্ণ অভয়দাত্রী জননীর এই আশীর্বাদ পত্রটি উল্লেখ করেই 'শ্রীম' ১৯১০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে লিখেছিলেনঃ 'মা ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে যখন শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়ন-দুরূহ-ব্রত তোমার অকৃতি সন্তান গ্রহণ করেছিল, তুমি আশীর্বাদ করিয়াছিলে ও অভয়প্রদান করিয়াছিলে।' শ্রীশ্রীমায়ের এই আশীর্বাদ-বজ্র ধারণ করেই মহেন্দ্র সন্দেহ-দ্বিধার কুয়াসা ভেদ করে এগিয়ে চললেন। তিনি 'শ্রীম' ছদ্মনামে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'—তত্ত্বমঞ্জরী, উদ্বোধন, বামাবোধিনী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। এবং ফলত শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমহলে তথা সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যে প্রভূত উৎসাহের আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। প্রথমে ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত কথামৃত-ধারা ক্রমে ক্রমে বিপুল বিশাল ব্যাপ্ত কুলপ্লাবী প্লাবনী গঙ্গার আকার ধারণ করল। পবিত্র এই ভাবগঙ্গা থেকে অমৃত সংগ্রহ করলেন উদ্বোধনের প্রকাশক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী। তিনি উদ্বোধন কার্যালয় থেকে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রথম ভাগ প্রকাশ করলেন। সেদিনটি ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি। ১১ মার্চ ১৯০২। উৎসর্গ-পত্রে

'শ্রীম' লিখলেনঃ 'মা, ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব উপস্থিত। এ আনন্দের দিনে আমাদের এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন।' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এই নূতন নৈবেদ্য। ক্রমে কথামৃত-অনুরাগীদের মধ্যে উদ্দীপনা ও আলোড়ন আরও বিশাল ও ব্যাপক হয়ে দেখা দিল। উৎসাহের আবেগে খরস্রোতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললেন 'শ্রীম'। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরও তিনটি বড় নৈবেদ্য সুন্দরভাবে রচনা করে সাজালেন এবং শ্রদ্ধা-বনতচিত্তে মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করলেন। মাত্র আট বছরের মধ্যে কথামৃতের চারটি ভাগ প্রকাশিত হল। এই চারটি বড় নৈবেদ্য ছাড়াও 'শ্রীম' বেশ কয়েকটি ছোট নৈবেদ্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে উৎসর্গ করলেন। ছোটখাট নৈবেদ্যগুলি হচ্ছে চারভাগ কথামৃতের বিবিধ সংস্করণ। শ্রীশ্রীমায়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল কথামৃতের আরও কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিনি বলেছিলেনঃ 'মাষ্টারের বইও বেশ - যেন ঠাকুরের কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছে। কি মিষ্টি কথা! শুনেছি, ঐ রকম বই আরও চার-পাঁচ খণ্ড হতে পারে এমন [সব সংগ্রহ] আছে। তা এখন বুড়ো হয়েছে, আর পারবে কি?'[৩২] শ্রীশ্রীমা অন্যত্রও বলেছিলেনঃ 'আহা মাষ্টার মশায়ের দেহটি ভাল থাকলে আরও কত উপদেশ বেরুত এবং লোকের কত উপকার হত।'[৩৩] মাস্টারমশায়েরও ইচ্ছা ছিল ছয় সাত খণ্ড কথামৃত সম্পূর্ণ করার পর শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী লিখবেন। কথামৃতকার তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে যেতে পারলেন না। শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকট হবার পরে এবং কথামৃতকারের নিজেরও প্রয়াণোত্তরকালে কথামৃত পঞ্চম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে শ্রীশ্রীমা ছিলেন কথামৃতপাঠের নিত্য শ্রোতা ও যথার্থ সমঝদার। তিনি কখনও কখনও কথামৃতের অন্তর্ভুক্ত তথ্যের উপর আলোকসম্পাত করেছেন, তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, কখনও বা কথামৃতে প্রকাশিত তত্ত্ব ও তথ্যসমূহের যাতে ভুল ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কল্যাণী শক্তি যে তাঁকে সারাজীবন সর্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছিল—সে বিষয়ে মহেন্দ্র ছিলেন নিঃসন্দেহ। শ্রীশ্রীমা একদিন কথামৃতপাঠ শ্রবণান্তে নিকুঞ্জদেবীকে বলেছিলেনঃ 'বৌমা, বোলো আমি হাড়ভাঙ্গা আশীর্বাদ করছি।'—এমন কি শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণের পর মহেন্দ্র দিশেহারা হয়ে পড়লে শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রের স্বপ্নগোচর হয়ে তাঁকে শক্তি জুগিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণের পরের বছর দেবীপক্ষের পঞ্চমীতে মহেন্দ্র একটি চিঠিতে লিখছেনঃ 'সেদিন স্বপ্ন দেখিলাম মা বলিতেছেন, "তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখিয়াছিলে, সে দেহ মায়িক, এই দেখ আমি সেইরূপই রহিয়াছি।"'[৩৪] ঠিক তেমনি তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে শ্রীশ্রীমাই তাঁর কথামৃত-সাধনাকে সর্বতোভাবে সিদ্ধিযুক্ত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর কৃপায়ই সম্ভব হয়েছে এই অসাধ্য সাধন। এই মহৎ বিশ্বাসে স্থিত হয়েই তিনি কথামৃতের ভূমিকায় নির্দ্বিধায় লিখেছিলেনঃ '(মা), তোমার আশীর্বাদ ও অভয়বাণী এ দাসানুদাসের একমাত্র অবলম্বন।'

শ্রীম-র কথামৃত-রচনায় রয়েছে একটি গাম্ভীর্য, পেলবতা ও মেজাজ, যা মনে

করিয়ে দেয় জয়রামবাটীর কোল ঘেঁসে বয়ে যাওয়া স্নিগ্ধ সুন্দর সহজ সচ্ছল আমোদর নদকে, ততোধিক মনে করিয়ে দেয় জয়রামবাটী-পল্লীতে শ্রীশ্রীমায়ের শান্ত মধুর পরিপাটি অথচ ঊর্ধ্বাঙ্গী জীবনচর্যা। বস্তুত কথামৃতের ভাব, ভাষা, ভঙ্গিমা, উপস্থাপনা—সব কিছুর উপরই শ্রীশ্রীমায়ের প্রশান্ত ক্ষমাসুন্দর স্নিগ্ধ স্বচ্ছন্দ জীবনাচরণের, প্রত্যহের সুশৃঙ্খল দিনচর্যার মোহন প্রচ্ছায়া। শুধু কি তাই? ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামকৃষ্ণভাগবতের ব্যাখ্যাতারূপে যে মহেন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর মধ্যেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছেন শ্রীশ্রীমা—যাঁকে নিবেদিতা একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ 'সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এই সব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মত।'[৩৫] সত্যিই আকাশ জল বাতাস আলোর মতোই মাতৃসত্তার শুদ্ধ নীরবতা নম্র নিবিড়তায় যেন ছড়িয়ে আছে—জড়িয়ে আছে কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়—সর্বত্র সঞ্চারিত করে দিব্য লাবণ্যের অমৃত-সুধা। এবং সে-বাতাবরণ নিত্য স্বাগত জানাচ্ছে সংসারতাপদগ্ধ লক্ষ মানুষকে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে'।

রামকৃষ্ণভাগবত রচনা ও ব্যাখ্যার দুরূহ কর্মযোগ শেষ করে শ্রান্ত ক্লান্ত শিশুর মতো মহেন্দ্র নিবেদন করেন তাঁর প্রাণের আর্তি ঃ 'মা, গুরুদেব, আমাকে [এবার] কোলে তুলে নাও।' সত্যিই অতঃপর একদিন মহেন্দ্র মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন। মহেন্দ্র চলে গেছেন এই মর্তভূমি ত্যাগ করে কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর সাধনার ফল-ফসল কথামৃত—যার অশেষ ভাবব্যঞ্জনা ও দিব্য ফলশ্রুতির মধ্যে সর্বত্র অনুভব করা যায় শ্রীশ্রীমায়ের শক্তি, স্নেহ ও আশীর্বাদ। কথামৃতের মধ্য দিয়ে মহেন্দ্রের হৃদয়-দীপের উজ্জ্বল জ্ঞানশিখাটি আজও মাতৃচরণপ্রান্তে জ্বলছে। এবং সংসার-তাপদগ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষকে আত্মজ্ঞানাগ্নিদানে মুক্তির পথ দেখিয়ে চলেছে।

পঞ্চদীপের আরতি শেষ হয়ে গেছে কবে। পঞ্চশিখা নির্বাপিত। কিন্তু পঞ্চশিখার আলোক-বন্দনায় নানারূপে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল যে বিশ্ববিমোহিনী জগজ্জননীর মাতৃমূর্তিখানি, ভক্ত-হৃদয়ের চিত্ত-চেতনায় ভাস্বর হয়ে আছে তা শাশ্বত কালের জন্য।

৩৫। নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৯৬৮), পৃঃ ১৯১

শ্রীশ্রীমা ও সাধিকা চতুষ্টয়

স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া যখন অবতারের লীলাসঙ্গিনীরূপে মর্তধামে অবতীর্ণা হন, তখন অবতার-পার্ষদবৃন্দের ন্যায় তাঁর সঙ্গেও তাঁর নিজস্ব লীলা-সহায়িকাগণ পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গেও এসে-ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদরা। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন প্রধানত তিনজন—গোলাপসুন্দরী, যোগীন্দ্রমোহিনী এবং সন্ন্যাসিনী গৌরীপুরী। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-মণ্ডলীতে তাঁরা যথাক্রমে 'গোলাপ-মা', 'যোগীন-মা' এবং 'গৌরী-মা' নামে সুপরিচিত। এই তিনজনের মধ্যে প্রথম দুজন ছিলেন শ্রীমায়ের আমৃত্যু সঙ্গিনী। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং অসাধারণ মর্যাদায় তাঁদের বিভূষিতা করে বলেছেনঃ ওরা আমার জয়া-বিজয়া। আবার এঁদের উপলব্ধিতে শ্রীশ্রীমা ছিলেন সাক্ষাৎ শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, প্রেমময়ী রাধিকা এবং শত্রুমর্দিনী বগলা। ঈশ্বরকৃপায় এঁরা দুজনেই সর্ববিধ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যলাভ করে সর্বক্ষণ তাঁকে সেবা এবং তাঁর অনুপম লীলা-বৈচিত্র্য ও মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ-তম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। গৌরী-মার দৃষ্টিতেও শ্রীশ্রীমা ছিলেন জগন্মাতা স্বয়ং। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম ছিল শ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহধন্য। শ্রীশ্রীমা বলতেনঃ 'গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যন্ত যে উস্কে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।' এই তিনজন ছাড়া আরও একজনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি অবশ্য সাধারণভাবে শ্রীশ্রীমায়ের লীলাপার্ষদ ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন অন্যতম লীলাসহায়িকা। তিনি হলেন অঘোর-মণি দেবী—'গোপালের মা'। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি তাঁর ইষ্ট 'গোপাল'রূপে দেখতেন। জীবনের অন্তিম লগ্নে 'গোপালের মা' শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে তাঁর প্রাণের গোপালকেই দেখেছেন, তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েছেন। সদা অবগুণ্ঠনবতী নিভৃতচারিণী শ্রীশ্রীমায়ের লোকপাবনী মহিমময়ী জীবনলীলার নিগূঢ় রহস্যসৌন্দর্য উদ্ঘাটিত এবং প্রচারিত হওয়ার ব্যাপারে এই কয়েকজন মহীয়সী সাধিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অপরূপ কৃপাসিঞ্চনে এঁদের সকলের অন্তর্লীন অধ্যাত্ম-বীজ অঙ্কুরিত করেছিলেন, আর শ্রীশ্রীমা তাঁর পদপ্রান্তে চির আশ্রয় দিয়ে সেই অংকুরকে ধীরে ধীরে মহীরূহে পরিণত করে জনমানসে অত্যুচ্চ ভক্তিশ্রদ্ধার আসনে এঁদের সুপ্রতিষ্ঠিতা করেছেন। বস্তুত এঁদের জীবন ও সাধনা—সব কিছুই অনুক্ষণ শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। অবশ্য এঁদের কথা আলোচনার মূল তাৎপর্য—শ্রীশ্রীমায়ের গুপ্তলীলামাধুরীর প্রকাশ্য রসাস্বাদন করার সুযোগ লাভ করে কৃতার্থ হওয়া।

গোলাপ-মা

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে করতেই গোলাপ-

সুন্দরী দেবী, পরবর্তীকালে 'গোলাপ-মা' নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের করুণাময়ী রূপটির সঙ্গে পরিচিতা হন। পারিবারিক শোকে এমন শান্তির প্রলেপ শ্রীশ্রীমা তাঁর অন্তরে মাখিয়ে দেন যে, গোলাপ-মা উপলব্ধি করতে বাধ্য হলেন—এখানেই তাঁর চিরজীবনের আরাধ্য আশ্রয়। শ্রীশ্রীঠাকুর জানতেন—কোন্ হাঁড়ির মুখে কোন্ সরা চাপা দিতে হয়। তাই তিনি গোলাপ-মা ও যোগীন-মাকে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। গোলাপ-মাও দীর্ঘ ছত্রিশ বছর শ্রীশ্রীমায়ের ছায়াসঙ্গিনীরূপে তাঁর কর্তব্য পরম নিষ্ঠাভরে পালন করে গেছেন। গোলাপ-মাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেনঃ 'ও (শ্রীশ্রীমা) সারদা সরস্বতী।'[১] কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের অতুলনীয় মাতৃভাব ও সর্বজীবে সন্তানবোধের অপূর্ব আস্বাদ পেয়ে বিহ্বল মোহিত হয়েছিলেন। তিনিও শ্রীশ্রীমাকে কখনও মাতৃভাবে, কখনও কন্যাভাবে, কখনও সখীভাবে, আবার অন্তরের অন্তস্তলে ইহপরকালের মুক্তিদাত্রী মহামায়ারূপে সেবা ও পূজা করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রকট হবার পর থেকে গোলাপ-মা-ই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতমা সঙ্গিনী, সেবিকা, সচিব, কর্ত্রী। মায়ের স্নেহে তিনি শ্রীশ্রীমাকে সর্বদা আগলে রাখতেন। গাড়িতে যাতায়াত করার সময় গোলাপ-মা-ই শ্রীশ্রীমায়ের হাত ধরে তাঁকে ওঠা-নামা করাতেন। শ্রীশ্রীমাও পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাঁর সমস্ত নির্দেশ মেনে নিতেন। নিষ্কাম কর্ম ও ভগবদ্বুদ্ধিতে সেবা—শ্রীশ্রীমায়ের এই দুই মূল আদর্শকে সামনে রেখে গোলাপ-মা তাঁর নিভৃত-জীবন যাপন করতেন। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত তিনি হাসিমুখে 'মায়ের বাড়ি'র বৃহৎ সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করতেন, প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতেন—তিনি যা কিছু করছেন, তা সবই ঠাকুর ও মায়ের কাজ মনে করেই, কোন স্বার্থবুদ্ধিতে নয়। আবার, উদয়াস্ত কর্মের অবকাশে মায়ের অনুসরণে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত জপধ্যানে কাটাতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিতা গোলাপ-মা দীনদুঃখীর অভাব মোচনে সদা তৎপর থাকতেন। পারিবারিক সূত্রে তাঁর প্রাপ্য মাসিক দশটাকার প্রায় সবটাই তিনি দান করে ফেলতেন। রোগগ্রস্ত প্রতিবেশীর জন্য ডাক্তার, ওষুধের খরচ দিয়ে তিনি অনেক সময় ঋণ করতেও বাধ্য হয়েছেন। তবুও, পরের সেবা থেকে কখনও বিরত হননি, এমনই ছিল তাঁর সাধনা।

শ্রীশ্রীমায়ের উদার-হৃদয়ের স্পর্শে গোলাপ-মা গোঁড়ামি এবং শুচি-অশুচির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় সাধনজীবনের শেষভাগে গোলাপ-মা সর্ব-সংস্কারবিমুক্তা হয়ে সর্বজীবে ঈশ্বরভাব আরোপ করতে পেরেছিলেন। একদিন অব্রাহ্মণ সেবকস্পৃষ্ট ডাঁটা-চচ্চড়ি শ্রীশ্রীমাকে খেতে দেখে গোলাপ-মা প্রতিবাদ জানালে মা উত্তরে বলেন যে, ভক্তের কোন জাত নেই। সঙ্গে সঙ্গেই গোলাপ-মাও মায়ের উচ্ছিষ্ট মুখে ফেলে নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করেন।[২]

শ্রীমাকে সীতারূপে চিনেছিলেন গোলাপ-মা এবং সেকথা সকলের মাঝে

নিঃসঙ্কোচে তিনি প্রচারও করেছিলেন। ঘটনাটি হল এইঃ শ্রীমা তখন রামেশ্বর তীর্থ থেকে কলকাতায় ফিরেছেন। কেদারবাবু তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন। তিনি শ্রীমাকে প্রশ্ন করেনঃ 'রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন?' মা বললেনঃ 'বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন।' গোলাপ-মা তখন ঐ দিক দিয়ে বারান্দায় যাচ্ছিলেন। তিনি মায়ের ঐকথা শুনে বললেনঃ 'কি বললে, মা?' মা একটু চমকে উঠে বললেনঃ 'কই, কি বলব? বলছি এই—তোমাদের কাছে যেমন শুনেছিলুম, ঠিক তেমনটিই দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল।' তখন গোলাপ-মা বললেনঃ 'না, মা, আমি সব শুনেছি, এখন আর কথা ফেরালে কি হবে? কেমন গো কেদার?' এই কথা বলতে বলতে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন ও যোগীন-মা প্রভৃতিকে সব বলতে লাগলেন।[৩]

প্রাত্যহিক কর্মের নিখুঁত, সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান যে পরিণামে ভগবৎ পূজার সমতুল মর্যাদা লাভ করে এবং চিত্তের প্রশান্তি এনে দেয়—শ্রীশ্রীমায়ের এই নির্দেশ গোলাপ-মা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। মা বলতেনঃ 'অপচয় করতে নেই, অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিতা হন।'[৪] গোলাপ-মা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইটি পালন করে এসেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ধানের পরেও গোলাপ-মা উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ি'র সংসার আগের মতোই শান্ত চিত্তে পরিচালনা করেছেন, মায়ের মতোই সেবা ও স্নেহে মন্দিরের সাধু-ব্রহ্মচারীদের শ্রীশ্রীমায়ের বিয়োগব্যথা ভুলিয়ে রেখেছিলেন।

যোগীন-মা

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাঃ 'যোগীন সামান্যা রমণী নহে।'[৫] স্বামী বিবেকানন্দের মতে—শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের ফলে ভারতবর্ষে 'গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের' অভ্যুদয় হবে। গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি সেই মহীয়সীদিগেরই অগ্রবর্তিনী।[৬] আর, শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁর এই লীলাসঙ্গিনী সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বললেনঃ 'যোগেন আমার জয়া—আমার সেবিকা, বান্ধবী, আমার চিরসঙ্গিনী।'[৭]

ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসুর মাধ্যমে শ্রীমতী যোগীন্দ্র মোহিনী দেবী (যোগীন-মা) জীবনের চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও কৃপা পেয়ে নবজীবন লাভ করলেন। দক্ষিণেশ্বরে কয়েকবার যাতায়াত করার পরই যথাকালে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের

দর্শনলাভ ও পরিচয়। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য করুণা ও স্নেহ পূর্ণ মাতৃমূর্তির সন্ধান পেয়ে একদিকে অপার শান্তি লাভ করলেন, অপরদিকে মায়ের পদতলে তিনি চিরকালের জন্য আত্মসমর্পণ করলেন। অদ্ভুত এই প্রেমের বন্ধন। যোগীন-মা তাঁর এতকালের জীবন যেন অতি সহজেই ভুলে গেলেন! ঘন ঘন মায়ের কাছে না আসতে পারলে যেন মন টেকে না। মায়ের প্রাত্যহিক সেবা-পরিচর্যার সামান্য ভার পেলেও যেন কৃতার্থবোধ করেন। মায়ের চুল বেঁধে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল যোগীন-মায়ের। শ্রীশ্রীমায়ের তা এত পছন্দ ছিল যে, তিন চার দিন পরেও তিনি তা খুলতেন না, বরং বলতেনঃ 'ও যোগেনের বাঁধা চুল, সে যেদিন আসবে সেই দিন খুলবো।'[৮]

ভবিষ্যতের অন্যতমা প্রধানা লীলাসঙ্গিনীর হৃদয়ে যে অপূর্ব মাতৃভাব উদ্বোধিত করেছিলেন শ্রীশ্রীমা, তার জ্বলন্ত নিদর্শন পাই—দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীশ্রীমায়ের জয়রাম-বাটী রওনা হয়ে যাবার পরমুহূর্তেই যোগীন-মায়ের তীব্র ব্যাকুলতাপূর্ণ কান্নায়। জগতের প্রিয়তম বস্তু হারিয়েও বুঝি মানুষ এত বিহ্বল হয় না। মায়েরই কৃপায় যোগীন-মায়ের উপলব্ধিতে সেদিন উদ্ভাসিত হয়েছিল মায়ের স্বরূপ—পৃথিবীতে একমাত্র আরাধ্যা, সর্বজীবের মুক্তিদাত্রী হলেন ইনিই অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা। কাজেই তাঁর তিলেক অদর্শনও যে যোগীন-মায়ের অসহ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পূত সান্নিধ্যের অমোঘ ফলরূপে অল্পকালের মধ্যেই যোগীন-মায়ের জীবনে তীব্র ঈশ্বর-ব্যাকুলতা দেখা দিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের সময় তিনি সংসার-স্বজন ত্যাগ করে বহু তীর্থ দর্শনের পর শ্রীবৃন্দাবনধামে গভীর তপস্যায় কালাতিপাত করছিলেন। কিছুদিন পরে শোকাতুরা শ্রীশ্রীমাও তাঁর সঙ্গে মিলিতা হন। তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীমা 'ও যোগেন গো' বলেই কাঁদতে শুরু করলেন এবং যোগীন-মাও তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। এই নিদারুণ বিরহ ব্যথায় যোগীন-মা-ই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত প্রিয়জন। বিধাতার এমনই নির্বন্ধ—উত্তর-কালে যিনি শোকসন্তপ্ত নরনারীর শোক হরণ করবেন, তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভার পড়ল যোগীন-মায়ের উপর। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—কর্ম ও ধর্মের ত্রিবেণী রচনা—যোগীন-মায়ের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 'মায়ের বাড়ি'র দৈনন্দিন কাজের যে অংশটুকু তাঁর ওপরে অর্পিত ছিল, তা তিনি পরম নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর প্রাত্যহিক জীবন কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। অত্যুচ্চস্তরের সাধিকা হয়েও যোগীন-মা আধ্যাত্মিক জীবনের যে-কোন সমস্যায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছেই ছুটে আসতেন।

শ্রীশ্রীমাকে যোগীন-মা একাধারে জননী ও সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী মহামায়া-রূপে উপলব্ধি করতেন। জয়রামবাটীতে মা ম্যালেরিয়াতে ভীষণ অসুস্থ। কলকাতা থেকে ডাক্তার সহ শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা ও গোলাপ-মা ওখানে গিয়ে উপস্থিত। ওঁদের অতদূর ছুটে আসার জন্য শ্রীশ্রীমা যোগীন-মাকে অনুযোগ করলে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ 'তোমায় না দেখে যে থাকতে পাচ্ছিলুম নি, মা। অসুখ শুনে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিল, তাই ছুটে এলুম।'[৯]

একবার জয়রামবাটীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অগণিত লোকক্ষয়ের সংবাদ মাকে পড়ে শোনাতে, তিনি যখন দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র অট্টহাস্য শুরু করলেন, তখন যোগীন-মা (মতান্তরে গোলাপ-মা) করজোড়ে—'সম্বর মা, সম্বর' বলে প্রার্থনা করার পর মা শান্ত ও প্রকৃতিস্থা হলেন।[১০]

গৌরী-মা

প্রথম দর্শনের পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর কালবিলম্ব না করে গৌরী-মাকে নহবতে নিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিলেনঃ 'ওগো ব্রহ্মময়ী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে—এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।'[১১] আমাদের সামান্য ধারণায় বলতে পারি—স্বয়ং মা ভবতারিণী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর লীলাপার্ষদদের এনে দিয়েছিলেন আর ঠাকুর নিজেই 'জ্যান্ত দুর্গা'র কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর চিহ্নিতা লীলা-সঙ্গিনীদের।

অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে গৌরী-মা শীঘ্রই উপলব্ধি করলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ণাবতার এবং শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ভগবতী, জীবোদ্ধারে এবারে ঈশ্বর সশক্তিক মর্তে আবির্ভূত। 'জ্যান্ত জগদম্বা'র সঙ্গে তাঁর ছিল এক অপূর্ব সম্পর্ক। কখনও মাতা-পুত্রী, কখনও সঙ্গিনী, আবার কখনও সখীরূপে অনুক্ষণ ভাবিতা থেকে গৌরী-মা মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের সেবা-পরিচর্যায়। ঠাকুর একদিন শ্রীশ্রীমায়ের সামনেই গৌরী-মাকে প্রশ্ন করে বসলেনঃ 'তুই কাকে বেশী ভালবাসিস?' 'মায়ের মেয়ে' সঙ্গে-সঙ্গেই গান গেয়ে জবাব দিলেনঃ

> রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী।
> লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
> তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল, 'রাই কিশোরী'।[১২]

একদিন শেষ রাতে নহবতের ঘাটে গৌরী-মার সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে শ্রীশ্রীমা এক কুমীরের ঘাড়ে পা দিয়ে ফেললেন। তখন গৌরী-মা তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেনঃ 'কুমীর নয় মা, কুমীর নয়; ও শিব, তোমার চরণপরশ পাবার লেগে পড়ে আছে' এবং পরে যোগ করেনঃ 'তুমি অভয়া, তোমার আবার ভয় কিসের?'[১৩]

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকটাবস্থায় জনৈকা ভক্তিমতীর প্রতিকূল মন্তব্যে শ্রীশ্রীমা তাঁর গায়ের সব অলঙ্কার খুলে ফেললে গৌরী-মা সেই ভক্তিমতীর উদ্দেশে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেনঃ 'তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তোমায় কি এমন বেশ ধরতে আছে! তোমার গায়ে সোনা থাকলে তাতে জগতেরই কল্যাণ।'[১৪]

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীমা বৈধব্য-চিহ্ন গ্রহণ করতে গেলে ঠাকুর স্ব-রূপে

দর্শন দিয়ে তাঁকে ঐ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং বৃন্দাবনে গৌরী-মার কাছ থেকে শাস্ত্রীয় সমর্থন জেনে নিতে নির্দেশ দেন। পরে শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে গৌরী-মার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ঐ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, গৌরী-মাও দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেনঃ 'ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী; তুমি সধবার বেশ ত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।'[১৫]

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ সম্পর্কে কি অবিচল প্রত্যয় ছিল গৌরী-মায়ের, তার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাকঃ

বৃন্দাবনে গৌরী মায়ের সাধন-গুহায় রাত্রিবেলায় তিনি ও শ্রীশ্রীমা বসে কথা বলছেন, এমন সময় দুটি সাপ গুহার মধ্যে ঢুকে পড়াতে শ্রীশ্রীমা ভয়ে গৌরী-মাকে জড়িয়ে ধরেন। গৌরী-মা কিন্তু শান্ত দৃঢ় স্বরে বললেনঃ 'ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে ওরা! কিছু ভয় নেই মা, পেসাদ পেয়ে এক্ষুণি চলে যাবে।'[১৬] জয়রামবাটীর জমিদার শম্ভুনাথ রায়কে গৌরী-মা বলেনঃ 'বাবা, তোমার মত ভাগ্যবান কে? তোমার খাসতালুকে মা ব্রহ্মময়ী প্রজা হয়ে বসে আছেন।'[১৭] একবার কামারপুকুরে জনৈক বৃদ্ধ সাধুকে শ্রীমায়ের স্বরূপের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছিলেনঃ 'ইনি মা কমলা, এঁর হাতের প্রসাদ পাওয়া মহাভাগ্যের কথা।'[১৮]

স্বীয় গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবীও সিদ্ধ সাধিকা ছিলেন। প্রবল অবহেলা ও অনিচ্ছাভরে শুধুমাত্র কন্যার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যান এবং প্রণাম করার আগেই নিজ ইষ্টদেবীকে শ্রীশ্রীমারূপে দণ্ডায়মানা দেখেন। ফলত সেইদিন থেকেই গিরিবালা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। গৌরী-মায়ের কী আনন্দ! গিরিবালা দেবীর আমন্ত্রণে ঠাকুর ও মা তাঁর কলকাতার বাড়িতে পদধূলি দিয়েছিলেন।[১৯]

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা একদিন গৌরী-মাকে বলেন যে, ওখানকার লোকেরা মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে যে, তিনি নাকি ছেলেদের সাধু সন্ন্যাসী করে দিচ্ছেন, অজাতকে মন্ত্র দিচ্ছেন। গৌরী-মা উত্তর দিলেনঃ 'তোমার কাছে সন্ন্যাস পাওয়া তো মহাভাগ্যের কথা মা।...আর জাতপাতের যিনি মালিক, তাঁর কাছে এলে জাত যাবে, কে বলে এমন কথা? আচ্ছা, দেখছি আমি।' সঙ্গে-সঙ্গেই গৌরী-মা সমাজপতিদের কাছে গিয়ে সিংহিনীর মতো তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কারা এমন কথা প্রচার করছ যে, মা-ঠাকরুণের কাছে গেলে জাত যাবে?...তিনি সামান্য নারী নন, তিনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, জগতের কল্যাণে নারীদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। ...যে তাঁকে বুঝবে, সে উদ্ধার পাবে।'[২০] পরের দিনই সমালোচকরা মায়ের পা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন।

বিষ্ণুপুর স্টেশনের প্ল্যাটফরমে হিন্দুস্থানী কুলী-মজুরদের উদ্দেশ্যে করে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করার নির্দেশ দেন গৌরী-মাঃ 'জানকীমায়ীকে প্রণাম কর।' সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত জনতা 'জানকী মায়ীকি জয়' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে

শ্রীশ্রীমাকে একে একে প্রণাম করতে থাকে এবং কেউ কেউ তাঁর কাছে দীক্ষা লাভ করে কৃতার্থ হয়।[২১]

শ্রীনলিনচন্দ্র মিত্র নামে জনৈক ভক্ত একবার গৌরী-মাকে কিছু টাকা আশ্রমসেবার জন্য দিতে এলে গৌরী-মা তাঁকে বলেনঃ 'আমার ইচ্ছে, এ টাকা তুই ব্রহ্মময়ীর সেবায় দে' এবং পরে তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেনঃ 'মায়ের পায়ে টাকা রেখে প্রণাম কর। সার্থক হবি তুই, সার্থক হবে তোর টাকা।'[২২] গৌরী-মায়ের উত্তরজীবনের বিচিত্র কর্মস্রোত-ধারা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়ে ভারতীয় নারীসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ ছিলঃ 'এ দেশের মায়েদের বড় দুঃখু, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।'[২৩] কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রেরণাদাত্রী ছিলেন শ্রীশ্রীমা—যিনি নিবেদিতার ভাষায়ঃ 'ভারতীয় নারী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা' এবং 'প্রাচীন ও নবীনের সংযোগস্থল'। বস্তুত, শ্রীশ্রীমায়ের মহত্তম জীবনাদর্শ সর্বক্ষণ চোখের সামনে না দেখতে পেলে গৌরী-মা এই দুঃসাধ্য কর্মে ব্রতী হতে চাইতেন কি না—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রাচীন ভারতের নারীর আদর্শ—নিঃস্বার্থ সেবা, ত্যাগ, মমতা, সংযম ও সহিষ্ণুতা —একদিকে যেমন শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনকে অলৌকিক স্তরে উন্নীত করেছে, অন্য-দিকে আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান—শিক্ষানুরাগ, মানবপ্রেম, দৃঢ়চিত্ততা, গোঁড়ামি ও সংস্কারহীনতা, প্রখর বাস্তববোধ, যে-কোন পরিবেশের জন্য মানসিক প্রস্তুতি—একই সঙ্গে তাঁর জীবনে মিশ্রিত হয়ে সর্বকালের জন্য তাঁকে অনুপম মহিমায় বিভূষিতা করেছে। গৌরী-মা এই অতুলনীয়া 'মা'-এর নামানুসারে তাঁরই অনুমোদন ও আশীর্বাদ ধন্য হয়ে বাংলা ১৩০১ সালে ব্যারাকপুরে গঙ্গাতীরে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন, যেখানে 'আদর্শ গৃহিণী ও জননী, আদর্শ সাধিকা ও আচার্যা গড়িয়া উঠিতে পারেন'। এই মহান্ প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালের মধ্যেই বৃহদা-কারে কলকাতা মহানগরীর বুকে নবোদ্যমে কাজ শুরু করল। গৌরী-মা এইবার শ্রীশ্রীমায়ের অধ্যাত্ম জীবনাদর্শ—ত্যাগ, তিতিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ এবং নিষ্কাম সেবা বাস্তবে রূপায়িত করতে দৃঢ়সংকল্পা হয়ে স্থাপন করলেন আধুনিক ভারতের প্রথম নারী-মঠ।

গোপালের মা

স্বামী বিবেকানন্দ একদা ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যাদের কাছে যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—'আহা! তোমরা প্রাচীন ভারতকে দেখে এসেছ, উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপবাস ও রাত্রিজাগরণ—সে ভারত বিদায় নিচ্ছে—আর সে ফিরবে না'[২৪], তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর পরম পূজনীয়া 'গোপালের মা' (শ্রীমতী অঘোরমণি দেবী)।

গোপালের মা উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সহায়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীশ্রীমা সাধারণ নারী নন, তিনি 'গোপাল'রূপী শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি ছাড়া তাঁর 'গোপাল' পূর্ণ নন। নহবতে শ্রীশ্রীমা একান্তবাসিনী থাকায় ঠাকুরের ঘরে তাঁর বিচিত্র লীলা দর্শন করার সুযোগ পেতেন না। কোনদিন ঠাকুরের ঘর একটু ফাঁকা দেখলেই গোপালের মা ছুটে এসে বলতেনঃ 'ও বৌমা, শীগ্যির চল, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো, তোমাদের একত্তর না দেখতে পেলে মনে আমার তৃপ্তি হয় না।'[২৫]

শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রকট হওয়ার বহুদিন পর একদিন গোপালের মা উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ি' এলে, মা তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যতা হন, কিন্তু বৃদ্ধা তাঁকে নিবৃত্ত করেন। এতেই বোঝা যায়, ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীমাকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন। সেদিন ব্রাহ্মণী নিজে ঠাকুরের জন্য রান্না করে মাকে বললেনঃ 'বৌমা, তুমি কাছে বসে আমার গোপালকে খাইয়ো।...তুমি যা বলবে, গোপাল তাই শুনবে।' কী অপূর্ব উপলব্ধি! শিব যে শক্তির কাছে বাঁধা পড়ে আছেন! ভোগ নিবেদনের পর শ্রীশ্রীমা বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে বলেনঃ 'আপনার রান্না চমৎকার! খেয়ে ঠাকুর খুব খুশী হয়েছেন।'[২৬]

বাগবাজারে যে তিন-চারখানি ভাড়াবাড়িতে উদ্বোধন ('মায়ের বাড়ি') হবার আগে শ্রীসারদাদেবী বাস করতেন—সেই সেই জায়গায় দেখা করতে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে আসতেন। শুধু হাতে আসতেন না। শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য সজনে ফুল শুকিয়ে, কাঁঠাল বীচি শুকিয়ে নিয়ে আসতেন।[২৭]

প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণীর ভীষণ আচার-বিচার ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিকে একদিন তাঁর দেওয়া প্রসাদী বাতাসা রাস্তায় যাতায়াতের কারণে অশুচি বোধ হওয়ায় তিনি নিজে খেতে পারেননি, বাগানের মালীকে খেতে দিয়েছিলেন। অবশ্য বাৎসল্যভাবের সাধিকা গোপালের মা শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ ভাবতেন। অন্যসময় তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) প্রসাদ খেতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। শ্রীসারদাদেবীকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সুবাদেই 'বউমা' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা ছিলেন অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই শ্রীমায়ের উচ্ছিষ্ট তিনি প্রসাদ জ্ঞান করতেন। একদিন শ্রীমাকে তিনি বলেনঃ 'বউমা, কি খাচ্ছিস্ একটু দেনা।'[২৮]

জীবনের শেষ দু-বছর ব্রাহ্মণী নিবেদিতার ইচ্ছানুসারে তাঁর বাসাতেই থাকতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে একদিন ব্রাহ্মণী তাঁকে প্রশ্ন করলেনঃ 'আমার গোপাল কেমন আছে?' মা উত্তর দিলেনঃ 'তিনি তো ভালই আছেন।'[২৯] অন্তিম সময়ের কয়েকদিন আগে শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখতে গেলে ব্রাহ্মণী বলে ওঠেনঃ 'গোপাল এসেছ?...আজ তুমি আমাকে কোলে নাও।' মা তাঁর মাথা কোলে তুলে নিতে ব্রাহ্মণী তাঁর পায়ে হাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে গেলেন।[৩০] তখন সেবিকা মায়ের পদধূলি ব্রাহ্মণীর মাথায় মাখিয়ে দিলেন। আজ ব্রাহ্মণীর অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত—

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও তাঁর ইষ্টদেবতা গোপাল এক ও অভেদ। শ্রীশ্রীমাও ঐ কাজে কোন বাধা দিলেন না, পরন্তু ধ্যানস্থা হয়ে পড়লেন।

উপসংহার

অবতারপুরুষদের নরলীলা সম্যক্ পুষ্টিলাভ করে তাঁদের চিহ্নিত পার্ষদবৃন্দের মাধ্যমে। বিশ্বের যে কোন মহাপুরুষ বা অধ্যাত্ম-রাজ্যের যে কোন ক্ষেত্রেই এটি একটি সাধারণ সত্যরূপে পরিদৃষ্ট হয়। জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর মর্তলীলা-বিলাসেও দেখা যায় উপরি-আলোচিত স্ত্রীভক্ত ও সাধিকারা একটি বিশেষ সক্রিয় ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রচ্ছন্ন মহাশক্তির আধার শ্রীশ্রীমাকে মূলত এই সাধিকারাই সমগ্র জীবজগতের মুক্তিদায়িনীরূপে সর্বসাধারণের কাছে বিশেষভাবে তুলে ধরেছিলেন। পক্ষান্তরে, শ্রীশ্রীমাও অকুণ্ঠচিত্তে নিঃসংকোচে বিশেষভাবে এঁদের কাছেই স্ব-স্বরূপটি প্রকাশ করেছিলেন। এই সাধিকাবৃন্দের সমস্যাপীড়িত দুঃখজর্জরিত জীবনগুলিকে উপলক্ষ করে আদর্শ গৃহিণী ও শ্রেষ্ঠা তপস্বিনীর আপাতবিরোধী দুই রূপের পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান শ্রীশ্রীমা নিজ জীবনে রূপায়িত করেছিলেন। তার ফলে পরবর্তীকালে অসংখ্য ভক্ত-সন্তান শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পেয়েছেন নতুন পথের ইঙ্গিত। আর তাঁর অভয় ও করুণার যুগল মহিমায় স্নাত হয়েছে নিরাশাগ্রস্ত, আর্ত, ব্যাকুল বিশ্বের অজস্র নরনারী।

নিবেদিতার 'ধ্রুবমন্দির'

॥ ১ ॥

ভারতীয় মাতা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দঃ মাতা সারদার কাছে নিবেদিতাকে সমর্পণ

স্বামী বিবেকানন্দের আহবানে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভারতীয় নারীদের শিক্ষাদানের জন্য। 'নারী ও জনগণ'--উভয়ের উন্নয়নই ছিল বিবেকানন্দের ভারতীয় জীবনব্রত। যাঁর উপর নারীশিক্ষার ভার স্বামীজী অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, স্বতই তাঁকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করার ভারও তাঁকে নিতে হয়েছিল। শিক্ষাতত্ত্ব কি তা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল যথেষ্টই জানতেন—স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব থেকেই। কিন্তু ঐ শিক্ষানীতিকে ভারতীয় খাতে প্রবাহিত করতে হলে, ভারতবর্ষ আসলে কি--তাও জানা দরকার। তাই স্বামীজী প্রথমেই নিবেদিতা প্রভৃতি অনুরাগী-দের নিয়ে ভারতবর্ষের নানাদিকে পরিভ্রমণ করেছিলেন। ওঁরা দেখেছিলেন—হিমশিখরা, সমুদ্রমেখলা ভারতকে, বনরাজিনীলা, নদীজপমালা ভারতকে। দেখেছিলেন—জেলে-মালা-মুচি-মেথরের, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভারতকে; শোভায় শক্তিতে সম্পন্ন ভারতকে; শোষণে জীর্ণ কিন্তু গভীরে স্পন্দিত ভারতবর্ষকে।

ভারতবর্ষের রূপরেখা দেখার পরে মার্গারেটকে জানতে হবে ভারতীয় নারীকে। ভারতীয় নারীর আদর্শ কি? পাশ্চাত্যে স্বামীজী অক্লান্তকণ্ঠে ভারতের নারী-আদর্শের কথা বলেছেনঃ 'ভারতে জননীই আদর্শনারী, মাতৃভাবই ইহার প্রথম ও শেষ কথা।...ভারতে ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করা হয়।'[১]

পাশ্চাত্য-পৃথিবী নারীর জায়াভাবকে প্রধানত গ্রহণ করেছে, সেখানে মাতৃভাবের প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞার সীমা নেই। সে অবজ্ঞার শর যেন স্বামীজীর আদর্শ-প্রতিমাকে বিদ্ধ করেছিল। তিনি ভালবাসার যন্ত্রণায় হাহাকার করে বলেছিলেনঃ 'সেই সর্বমহিমময়ী, যিনি আমায় এই শরীর দিয়াছেন [এই পাশ্চাত্যদেশে] তিনি কোথায়?...কোথায় তিনি, যিনি আমার প্রয়োজন হইলে বারবার জীবন দিতে প্রস্তুত? কোথায় তিনি, আমার প্রতি যাঁহার স্নেহ অফুরন্ত—তা আমি যতই দুষ্ট বা হীন-প্রকৃতির হই না কেন?...ধন্য আমাদের জননী! যদি মায়ের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়াই মরিতে চাই।'[২]

পাশ্চাত্যনারী মার্গারেট যাতে ভারতীয় নারী-আদর্শের মধ্যে নবজন্ম গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য স্বামীজী তাঁকে এনে সমর্পণ করেছিলেন ঐ আদর্শের পরাকাষ্ঠা এক

পরমা মাতৃমূর্তির পদতলে। তিনি আর কেউ নন—জননী সারদাদেবী। স্বামীজী, প্রেরণার উদ্দীপ্ত মুহূর্তে ভারতীয় নারীর আদর্শপ্রতিমারূপে তিন পৌরাণিক চরিত্রের নামোচ্চারণ করেছিলেন—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। এঁরা নারীর তিন আদর্শের বিগ্রহ। এঁদের মধ্যে সীতাকে স্বামীজী মাতৃত্বের প্রতীক বলে নির্দেশ করেছেন। সীতার মধ্যে অবশ্যই মাতার ধরিত্রীসহন ছিল, কিন্তু নিখিল মাতৃত্বে তিনি প্রতিষ্ঠিত নন, তিনি বিশেষভাবে লব-কুশেরই মাতা। বিশুদ্ধ মাতৃত্বের প্রকাশ তখনই ঘটবে যখন সেখানে বাৎসল্যের পিছনে রক্তমাংসের বন্ধন থাকবে না। যশোদার ছিল সেই ভালবাসা, যাকে বলা হয়েছে প্রতীক বাৎসল্য, কারণ কৃষ্ণ তাঁর নিজেব সন্তান নন। কিন্তু সে ভালবাসা তো স্বয়ং শিশু ভগবানের জন্য! অপরপক্ষে এই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য—যাদের অধিকাংশই সামান্য সাধারণ দুঃখী দুর্গত—প্রয়োজন ছিল একজন মাতার, যিনি কবির কল্পনায় নয়, বাস্তব জীবনে এসেছিলেন এই আশ্বাস নিয়েঃ 'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।'[৩] স্বামীজী এই নিত্য অথচ ব্যক্তিগত মাতাকে জানতেন, কিন্তু তখনই অবরোধের দ্বার খুলে তাঁকে বহিঃপৃথিবীতে স্থাপনের সময় আসেনি। অথচ তাঁকে চিনতে হবে, শুধু খোলা চোখ দিয়ে নয়, গভীর চোখ দিয়ে—এবং তাঁকে জানাতে হবে পৃথিবীর কাছে। স্বামীজী নিশ্চয় ভেবেছিলেন, মার্গট সে কাজে সমর্থ। তাই তাঁর কাছে খুলে দিয়েছিলেন অবরোধের দ্বার।

মনে হতে পারে, স্বামীজী খুবই ঝুঁকি নিয়েছিলেন মার্গারেট নোবলকে সারদাদেবীর কাছে এনে। নিবেদিতার মধ্যে ছিল 'জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি'। ধাবমান অগ্নি তিনি। তাঁকে স্বামীজী এনে হাজির করলেন শান্তকিরণ প্রদীপের সমীপে! কিন্তু স্বামীজী জানতেন, তিনি কি করেছেন। নিবেদিতা অবিলম্বে দেখলেন—এ তো সামান্য প্রদীপের আলোক নয়—এ হল সেই আলোক, যা তখনও প্রকাশিত থাকে যখন সূর্য-চন্দ্র-তারকা আলোক দেয় না। নিবেদিতা বুঝলেন—আলোকের আলোক যা, তারই উৎসের সম্মুখীন তিনি।

কিভাবে নিবেদিতা তা বুঝেছিলেন, তা দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তাঁর বোধের প্রমাণ প্রথমাবধি পাই তাঁর পত্রাবলী থেকে।

অথচ ভুল বুঝবার কারণ ছিল প্রচুর। ইংলন্ড থেকে আগত এই মনস্বিনী নারী বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধিতে ভাস্বর, সংঘর্ষে উদ্দীপ্ত, নব নব সৃষ্টিক্ষেত্রে ধাবিত—ইনি কি পেতে পারেন সারদাদেবীর কাছ থেকে, যিনি লৌকিক অর্থে অশিক্ষিতা, হয়ত পড়তে পারেন কিন্তু লিখতে পারেন না, অবরোধবাসিনী, সদা অবগুণ্ঠিতা, বহির্জীবন বলতে কিছু নেই, বৃহত্তর পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত নন! কেন মুহূর্তে নিবেদিতা বিজিত হলেন, যেখানে তিনি সুদীর্ঘ সংগ্রাম করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পর্যন্ত? তাঁর উপর এসে পড়েছিল কোন্ নিঃশব্দ অথচ সর্বাত্মক আক্রমণ, যা তাঁকে অলক্ষ্যে পরাভূত করে, পরাজয়ের আনন্দগান তুলে দিয়েছিল তাঁর কণ্ঠে?

সারদাদেবীর একটি অপ্রতিরোধ্য পরিচয় মার্গারেট নোবলের কাছে অবশ্য ছিল—তিনি তাঁর গুরুর গুরুপত্নী। এই পরিচয়ের প্রতি লৌকিক নমস্কার তিনি অবশ্যই জানাতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাঁর মনে জাগরূক ছিলই—রামকৃষ্ণ যদি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হন, তাহলে তাঁর পত্নীর মধ্যে অবশ্যই ঊর্ধ্বতর শক্তির প্রকাশ থাকবে। নিবেদিতা সেই উত্তরের সন্ধান করেছেন। যদি যথাযোগ্য উত্তর তিনি না পেতেন, গৃহীত আনুগত্যের জন্য হয়ত সরে গিয়ে ভাববার চেষ্টা করতেন—অবতারের পত্নীরা অবতারের উপযুক্ত মহিমা নিয়ে আসবেনই—এটা সাধারণ সত্য নয়. পূর্বনির্ধারিত ধারণার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে না পৃথিবীর বাস্তব সত্য। কিংবা তিনি সংশয়িত বিশ্বাসের সঙ্গে ভাবতেও পারতেন, ও বস্তু উক্ত নারীর মধ্যে আছে, আছেই, দুর্ভাগ্য আমার তাকে দর্শন করতে পারলাম না! নিবেদিতার ভাগ্য ওহেন চিত্ত-সংকটের মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়নি। তিনি সারদাদেবীর মধ্যে এমনি ঐশী মহিমা দেখতে পেয়েছিলেন যে. নিজের ভগিনীর সন্তানেরা যাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে সারদাদেবীকে প্রণাম করে, তার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, এবং এস কে র‍্যাটক্লিফের মতো সমাজবিজ্ঞানীর (স্টেটসম্যানের এককালীন সম্পাদক) যখন প্রথম সন্তান হবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তখন মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন--জন্মাবার পরে তিনি ঐ সন্তানটিকে নিয়ে যাবেন সারদাদেবীর কাছে, যিনি আপাতদৃষ্টিতে খুব 'সাদাসিধে হিন্দু রমণী', তবু **'আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।'**[৪]

শেষোক্ত কথাগুলি নিবেদিতা লেখেন ২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ তারিখের চিঠিতে। তার অনেক আগে, সারদাদেবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের অল্পদিন পরে, ২২ মে, ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে, তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শেষে লেখেনঃ 'তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী **মহত্তমা এক নারী।'**[৫] দুই পত্রের মধ্যে ব্যবধান কিছু-বেশী পাঁচ বছর। এই সময়ের মধ্যে নিবেদিতা সারদাদেবী সম্পর্কে 'One of the greatest' থেকে 'The greatest'—এই ধারণায় পেঁছে গেছেন—পত্রের সাক্ষ্য তাই বলে। আমরা যোগ করব—যদিচ পত্রসাক্ষ্যে আমরা পাঁচ বছরের ব্যবধান পাই, বস্তুত-পক্ষে অনেক আগেই তিনি ঐ ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন।

॥ ২ ॥

নিবেদিতার পূর্বে রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে সারদাদেবী : নিবেদিতার রচনার শ্রেষ্ঠত্ব

সারদাদেবীর সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ ১৭ মার্চ, ১৮৯৮ (যেদিনটি সম্বন্ধে নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'Day of days')—আর শেষ সাক্ষাৎ ১২ মে, ১৯১১। মধ্যে ১৩ বছরেরও কিছু বেশী ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে উভয়ের অজস্রবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে; ভারতবাসের একেবারে গোড়ার দিকে নিবেদিতা কিছুদিন

শ্রীমায়ের সঙ্গে থেকেছেন। বহু ভাগ্য তাঁর, ১৮৯৮ এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রীমা বেলুড়ে মঠের নবক্রীত জমিতে প্রথম পদার্পণ করলে, তাঁকে মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাতে ও মঠের জমি ঘুরিয়ে দেখাতে পেরেছিলেন।[৬] পরে তিনি পৃথক বাড়িতে চলে গেলেও, শ্রীমায়ের কাছে এসে অনেক সময় কাটাতেন। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অনেক কথা নিবেদিতার পত্রাবলীতে পাই। পত্রের মধ্যে নিবেদিতা অধিকন্তু শ্রীশ্রীমা ও তাঁর পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন, মায়ের বাড়ির অনেক সংবাদও। এ ছাড়া নিবেদিতা তাঁর ১৯১০ সালে লেখা 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' (বইটিকে পরে 'আচার্যদেব' বলে উল্লেখ করব) বইয়ে শ্রীমায়ের চরিত্র-চিত্রণও করেছেন। তার বহু আগে লেখা 'কালী দি মাদার' বইয়েও শ্রীমায়ের কথা আছে। শ্রীমায়ের বিষয়ে নিবেদিতার এইসব লেখার ইতিহাসমূল্য এবং সাহিত্যমূল্য সবিশেষ।

নিবেদিতার রচনার গুণবিচারে আসার জন্য, তাঁর পূর্বে শ্রীমা সম্পর্কে কোন্ ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়।

কেশবচন্দ্র সেনের পত্রপত্রিকাতেই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ব্রাহ্ম-পত্রিকার বাইরেও রামকৃষ্ণ-সংবাদ বেরোয়। এই সকলের মধ্যে রামকৃষ্ণ-সহধর্মিণীর কথা অল্প-স্বল্প এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কামসম্পর্কহীন দাম্পত্য-জীবনের সূত্রেই কেবল সারদাদেবীর উল্লেখ মেলে। এইসব জায়গায় সারদাদেবীর ব্যক্তিচরিত্র সম্বন্ধে কিছুই পাই না।[৭]

রামকৃষ্ণমণ্ডলীভুক্তদের দ্বারা রচিত গ্রন্থাদিতেই আলোচ্যকালের পূর্বে (অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের পূর্বে, যখন নিবেদিতা প্রথম শ্রীমায়ের সঙ্গে পরিচিত হন) কিছু-কিছু শ্রীমায়ের চরিতকথা পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীকাররূপে কথিত ডাঃ রামচন্দ্র দত্তর 'পরমহংস-দেবের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৯১) গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ, পত্নীকে ষোড়শী পূজা,

সেজন্য শ্রীমায়ের জননী শ্যামাদেবীর ক্ষোভ ও রোষের কথা আছে। (কন্যা যদি দেবী-রূপে পূজা পায় তাহলে প্রচলিত অর্থে ঘরণী হবার পথ যে বন্ধ হয়ে গেল!) শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে 'আনন্দময়ী মাতা' বলেছিলেন, সে ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখও মেলে। শ্রীমায়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইটুকু পাইঃ 'তাঁহার [সারদাদেবীর] নম্র প্রকৃতি ও উদার স্বভাবের জন্য সকল স্ত্রীলোকেই বশীভূত ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট সর্বদা স্ত্রীলোকেরা অগ্রসর হইতে পারিতেন না, তাঁহারা মাতার নিকট আরাম পাইতেন।'[৮] রাম দত্ত অবতারসঙ্গিনী হিসাবে শ্রীমায়ের বন্দনাও করেছেন।[৯]

রাম দত্ত বা সুরেশ দত্তের গ্রন্থে সারদাদেবীর স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ—তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করেছেন অক্ষয়কুমার সেন তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'তে, যা ১৮৯৫ সাল থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোটামুটি সমাপ্ত হয়। পুঁথি রচনার পিছনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা ছিল। স্বামীজী ১৮৯৪ সালে পুঁথির কিছু অংশ পড়ে অত্যন্ত প্রশংসার পরে একটি সমালোচনা করেন—সূচনায় শক্তির বন্দনা নেই কেন? স্মরণ করব, স্বামীজীর রামকৃষ্ণ-প্রণামঃ 'সশক্তিক নমি তব পদে।' সুতরাং ধরে নিতে পারি, স্বামীজীর উপদেশ বা নির্দেশেই পুঁথিতে সারদা-দেবীর চরিতকথা বর্ণিত হয়েছিল। আমরা অক্ষয় সেনকে নমস্কার করে বলব—তাঁর লেখাতেই শ্রীমা সারদাদেবী প্রথম ব্যাপক প্রকাশিত। তখন পর্যন্ত সংঘটিত শ্রীমায়ের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি তিনি যথাসম্ভব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[১০]

ইতিহাসের দিক দিয়ে বলতে গেলে, এই সকলের ভিতর থেকে আমরা প্রথম সারদাচরিত্র লাভ করি। অক্ষয় সেন স্বীকার করেছেন, তিনি ঠাকুরের শিষ্যগণের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছেন, অনেক তথ্যই তাঁদের মারফত জেনেছেন। অক্ষয় সেনের স্বভাবে নিরভিমান নম্রতা ছিল, তাই অপরের উপদেশ অনুযায়ী (যদি তা সৎ

উপদেশ হয়) চলতে তিনি রাজি ছিলেন। সেদিক দিয়ে বলা চলে, ঘটনা-ব্যাপারে অন্তত অক্ষয় সেনের পুস্তক রামকৃষ্ণমণ্ডলীর দ্বারা স্বীকৃত গ্রন্থ। স্বয়ং শ্রীমা অক্ষয় সেনের বর্ণিত ঘটনার প্রামাণিকতা স্বীকার করেছেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁর অমর গ্রন্থ 'লীলাপ্রসঙ্গে' পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের জীবনের যেসব গভীররসাত্মক কাহিনী বলেছেন, তার অধিকাংশই অক্ষয় সেনের গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

আমাদের আলোচ্য পর্বের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যগণের কাছ থেকে শ্রীমায়ের বিষয়ে এমন লেখা যথেষ্ট পাই না, যাদের মধ্যে মাতৃচরিত্র রূপায়িত। স্বামী অভেদানন্দের সংস্কৃতে অপূর্ব মাতৃস্তোত্র অবশ্য এরই মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল—যথা, 'প্রকৃতিং পরমাং'। অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও একই দৃষ্টিতে শ্রীমাকে দেখেছেন। (পরবর্তীকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের লেখা একটি চিঠি আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি, যার মধ্যে ১৯১১ সালে তিনি এই 'বিশ্বজগতের জননী'কে অভ্যর্থনা জানাতে আহ্বান করেছেন মাদ্রাজী এক ভক্তকে।) এই কালের মধ্যে (১৮৯৪) স্বামীজী একটি জ্বলন্ত চিঠিতে শ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলে চিহ্নিত করে বলেন, তিনি মায়ের আশীর্বাদে 'হুপ্ করে' সমুদ্র নামক পগার পার হয়ে আমেরিকা হাজির হয়েছিলেন। মায়ের মঠ তৈরী করার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠার কথাও ঐ চিঠিতে পাই। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না, তাই মা ঠাকুরানীর পূজা চাই ; 'জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম'—স্বামীজী বলেছিলেন।[১১]

স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্যের বক্তৃতাবলীতে দু-একবার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে সারদাদেবীর কথা বলেছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে এবং ইংলন্ডে উইম্বলডনে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে বক্তৃতার মধ্যে মহনীয় ভাষায় তিনি সারদাদেবীর কথা শুনিয়েছেন। কিভাবে সারদা তাঁর সন্ন্যাসী স্বামীকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে সংসারে টেনে নিয়ে যেতে চাই না, আমি তোমার শিষ্যা হতে চাই, এবং সেইভাবে তাঁর প্রথম ও প্রধান শিষ্যা হয়ে উঠেছিলেন—স্বামীজী শ্রদ্ধাগম্ভীর কণ্ঠে তা বর্ণনা করেন।[১২]

এই ধরনের কথা স্বামীজী ২৭ জানুয়ারি ১৯০০, ক্যালিফোর্নিয়া প্যাসাডেনা শেক্সপীয়ার ক্লাবে 'আমার জীবন ও ব্রত' বক্তৃতাকালেও বলেছিলেন। অতিরিক্ত বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পরে সদ্য-সন্ন্যাসী বালকদের প্রতি সারদাদেবীর কোন্ গভীর সহানুভূতি ছিল।[১৩]

এইসকল রচনার মূল্য আমরা স্বীকার করি, বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যগণের রচনাগুলির গুরুত্ব, কারণ শেষোক্ত উচ্চ অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন পুরুষদের স্বীকৃতি সারদাদেবীর পরমা প্রকৃতির রূপ উদ্ঘাটিত করে দেয়। তবু একথা বলতেই হবে, লৌকিক সাহিত্যের বিচারে ঐসব ক্ষেত্রে সারদাদেবী 'চরিত্র' হয়ে ওঠেননি। স্বামীজী অবশ্য 'মদীয় আচার্যদেব' বক্তৃতার মধ্যে দু-এক আঁচড়ে শ্রীমায়ের চরিত্র-মহিমাকে ফুটিয়েছেন। কিন্তু তার পরিমাণ সামান্যই। অক্ষয় সেনের বিবরণে

শ্রীমায়ের চরিতকথা পাই, তথাপি স্বীকার্য, সেখানে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় নেই, নেই চিত্রণসৌন্দর্য কিংবা ভাবগভীরতা।

এইখানে নিবেদিতার রচনার মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। তাঁর লেখাতেই সারদাদেবী প্রথম উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠেছেন। পুরুষ লেখকদের যে-সুযোগ ছিল না, তা তাঁর ছিল—তিনি শ্রীমায়ের 'জেনানা'র মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন; তাঁকে সাক্ষাৎ দেখেছেন দিনের পর দিন, অতি ঘনিষ্ঠভাবে। আর দেখার চোখও ছিল তাঁর। তাঁর ছিল নিজস্ব অসাধারণ মনস্বিতা—পশ্চাদ্‌পটে প্রচণ্ড শক্তিশালী পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। ধর্মযাজকের পরিবারের কন্যা তিনি, নিজেও বাল্যাবধি ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী, ফলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গভীর জ্ঞান তাঁর আয়ত্তে, খ্রীষ্টীয় সাধক-সাধিকাদের দারুণ ত্যাগ ও তপস্যার ইতিহাসও। সেই সঙ্গে ঠিক বিপরীত বস্তুর সঞ্চয়ও তাঁর ছিল—পাশ্চাত্যের আধুনিক যুক্তিশীলতা। এই সকল মানসিক ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়ে তিনি শ্রীমায়ের সমীপবর্তী হয়েছিলেন। অবশ্যই তিনি যাচাই করে-ছিলেন। তাই, যখন শ্রীমায়ের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন তখন প্রয়োজনীয় বহিদৃষ্টি বজায় রেখেছিলেন, কেননা যাঁদের জন্য লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই বিদেশী— তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা ও ভাবনার আশ্রয় তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। শ্রীমায়ের বাঙালী সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিলই। প্রতিভার পার্থক্যের কথা তুলছি না, তা অপরিসীম—দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলছি। শ্রীমায়ের বাঙালী সঙ্গিনীরাও মাকে অবরোধের অন্তরালে অতি নিকট থেকে বৎসরের পর বৎসর দেখেছেন। তাঁরা ঐকালে হয় অত্যন্ত সংকীর্ণ বুদ্ধিতে শ্রীমাকে গ্রহণ করেছেন, কিংবা তাঁকে অবতারসঙ্গিনী মেনে নিয়ে নির্বিচার ভক্তিপুষ্পে অর্চনা করে গেছেন। তাঁদের দর্শনে সেই নির্লিপ্ততা ছিল না, যা উত্তম রচনার আবশ্যিক গুণ।

বাইরের মানুষ সশ্রদ্ধ অথচ বিচারশীল দৃষ্টি নিয়ে যদি দেখেন, তাহলে নূতন তাৎপর্য ধরা পড়ে। যেমন তা ধরা পড়েছিল মিসেস ওলি বুলের চোখে (সারা সি বুল; নরওয়ের খ্যাতনামা দেশপ্রেমিক এবং বিশ্ববিখ্যাত ভায়োলিনবাদক ওলি বুলের পত্নী)। শ্রীমাকে দর্শনের পরে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি পত্রযোগে ম্যাক্সমূলারকে লিখে পাঠান, তার মধ্যে নূতন দৃষ্টির আলো আমরা দেখতে পেয়েছি।

সারা বুল ঐ পত্রটি লেখেন ১১ জুলাই ১৮৯৮। ম্যাক্সমূলার সেটিকে সাদরে তাঁর Ramakrishna and His Sayings বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। ম্যাক্সমূলারের বইটি বেরোয় একই বৎসরে অক্টোবর মাসে। সে হিসাবে বলা যায়, সারা বুলই শ্রীমায়ের বিষয়ে প্রথম বিদেশী লেখক। তারপরে উল্লেখ্য ম্যাক্সমূলারের রচনা, যিনি তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে 'Ramakrishna's Wife' নামে একটি অধ্যায় যোগ করেছেন। অধ্যায়টিতে অবশ্য শ্রীমায়ের চরিতকথা বিশেষ নেই, তবে সশ্রদ্ধভাবে বলা হয়েছেঃ সারদাদেবী স্বেচ্ছায় নিজ স্বামীর আদর্শ স্বীকার করে সন্ন্যাসিনীর জীবন বরণ করেছিলেন। এইসঙ্গে ম্যাক্সমূলার দৃঢ় কঠোরভাবে সারদাদেবীর প্রতি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের হঠাৎ-উথলে-ওঠা সহানুভূতির বন্যাকে শাসন করতে চেয়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে কামসম্বন্ধ স্থাপন না করার মতো 'বর্বর ব্যবহার' রামকৃষ্ণ করেছিলেন—এই ছিল মজুমদারের অভিযোগ। উক্ত অভিযোগই বর্বর কাণ্ড বলে প্রতিভাত হয়েছিল ম্যাক্সমূলারের কাছে।

মুদ্রিত রচনার হিসাবে শ্রীমা সম্বন্ধে সারা বুল বা ম্যাক্সমুলারের লেখা নিবেদিতার অগ্রবর্তী, কিন্তু নিবেদিতার অপ্রকাশিত পত্রমধ্যে শ্রীমায়ের পূর্বতর উল্লেখ আছে। আমাদের সংগ্রহমতো, ১৮৯৮ ইস্টার সপ্তাহে অখণ্ডানন্দ স্বামীকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতেই মায়ের কথা প্রথম পাই। ঐ চিঠিতে তিনি লেখেনঃ 'আপনার উপদেশ অনুযায়ী আমি বৃহস্পতিবার সকালে সরাসরি সারদার কাছে গিয়েছিলাম। কী চমৎকার! গোপালের মা সেখানে ছিলেন; স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং আরও কয়েকজন। [পরিবেশ] মধুর ও প্রাণোত্তপ্ত—নিজের বাড়ির মতোই যেন।'[১৪]

এর পরে ২২ মে তারিখের চিঠিতে নিবেদিতা সারদাদেবীর যে-বর্ণনা দেন, সেটি তারিখ অনুযায়ী শ্রীমায়ের প্রথম পারিপার্শ্বিকসহ চিত্রিত রূপ। এই বর্ণনা ও পরবর্তী পত্রগুলিতে অনুরূপ আরও বর্ণনার সঙ্গে যদি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আচার্যদেব' গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ যোগ করি, তাহলে কোন দ্বিধা না রেখে বলব —নিবেদিতা শ্রীমায়ের বিষয়ে, পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার না হয়েও, শ্রেষ্ঠ লেখক।

॥ ৩ ॥

শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক

নিবেদিতা তাঁর ক্রম-পরিণত জীবনে 'লোকমাতা' হয়ে উঠলেও একজনের কাছে চিরদিনের 'আমার খুকি' থেকে গিয়েছিলেন—তিনি নিবেদিতার 'হোলি মাদার' বা 'মাতাদেবী'। সারদাদেবী নিবেদিতাকে গভীর স্নেহে 'খুকি' বলতেন। স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশিয়ে বলতেনঃ 'আমার প্রাণের সরস্বতী।' 'যেন দেবী'—একথাও তিনি নিবেদিতা সম্বন্ধে বলেছেন।

নিবেদিতা মাতাদেবীকে ব্যাকুল হয়ে ভালবাসতেন। অস্থির হয়ে উঠতেন—কিভাবে মায়ের একটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যায়। বিভিন্ন স্মৃতিকথায় বা রচনায় তার বিবরণ আমরা কিছু কিছু পেয়েছি। ভালবাসার অম্লান কিরণে ধোয়া সেই ছবিগুলি। তেমন দুটি বিবরণ আমরা পরপর উদ্ধৃত করছিঃ

'বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী [সারদাদেবী] কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ঐসময়ে সেইরূপভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য-উদ্ঘাটনেই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ-

হাস্যে চাহিতেন, তখন মায়ের আদরে বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন সেদিন তাঁহার যে-আনন্দ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন ; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন।'[১৫]

'একদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নিবেদিতার কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়াছিলেন। নিবেদিতাকে তাতে ভারী সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শ্রীমা খুব খুশী হলেন। পাঁচবছরের মেয়েকে যেমন চুমু খায়, তেমনি চুমু খেয়ে আদর করলেন। শ্রীমা নিবেদিতাকে গভীর, অতি গভীরভাবে ভালবাসতেন। "আমার প্রাণের সরস্বতী" বলে প্রায়ই ডাকতেন। নিবেদিতাও মায়ের আদরে গলে যেতেন।

'প্রায় প্রতি বিকালে নিবেদিতা শ্রীমার কাছে এসে পদধূলি নিতেন। প্রতি রবিবার অবশ্যই আসতেন শ্রীমার ঘর পরিষ্কারের জন্য। বিছানা ঝাড়া, মেঝে পরিষ্কার করা, সাবানজলে দরজা জানালার কাঁচ ধোওয়া—এইসব করে চারিদিক ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে তুলতেন। এ কাজকে নিবেদিতা পরম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিতান্ত অনুগত সন্তানের মতো তিনি সেবা করতেন। শ্রীমার সামান্যতম সুখ-সুবিধার জন্যও ব্যস্ত থাকতেন।'[১৬]

নিবেদিতা ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪, চিঠিতে লিখেছেনঃ 'তাঁকে কতরকমের আরামে রাখতে যে সাধ আমার হচ্ছে। একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কম্বল, আরও কত কি দরকার। সব সময় ভিড়—লোকজন ঘিরে আছেই। তাঁকে একটি সুন্দর রঙিন ছবি দেবার ইচ্ছা।'[১৭]

নিবেদিতা নিজেকে কৃতার্থজ্ঞান করেছিলেন যেদিন বাগবাজারে বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপন করতে সমর্থ হন। বিদ্যালয়টিকে বলা চলে স্বামীজীর ইচ্ছামূর্তি। সেই মূর্তির বোধন দিবসে (১৩ নভেম্বর ১৮৯৮) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন স্বয়ং সারদাদেবী। তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেনঃ 'আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।'[১৮] ঐদিন কোন্ বিরাট আনন্দের তুফান উঠেছিল নিবেদিতার হৃদয়সাগরে, তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। পূর্ণচিত্তে নিবেদিতা বলেছিলেনঃ 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারিনা।'[১৯]

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্যে শ্রীমাকে পেয়ে (যখন সেখানে অধিকন্তু উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ) নিবেদিতার আনন্দের আকার কিছুটা অনুমান করতে পারব, পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ভবনে মাতাদেবীর আগমনে নিবেদিতার বিহ্বলতা দেখে। তারই দুটি ছবিঃ 'মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল, ঐ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্রপুষ্প আনাইয়া গৃহদ্বারে টাঙাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সংবর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয়-স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মতো অকারণ কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদিগের এবং কখনও দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।'[২০]

'একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, "মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর।" সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মার গাড়ি আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ি হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুরদালানে বসাইলেন। মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, "বেশ পদ্যটি।" তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, "বেশ তো শিখেছে মেয়েরা!" পরে সিস্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।'[২১]

শেষোক্ত বিষয়টির সূত্র—৬ অক্টোবর ১৯০৯, বিদ্যালয়ে শ্রীমায়ের আগমন। ঐ প্রসঙ্গে নিবেদিতা ৫ অক্টোবর ১৯০৯ চিঠিতে লিখেছেনঃ 'শুক্রবার অপরাহ্ণে আমাদের প্রিয় মাতাদেবী, সারদাদেবীকে, মস্ত অভিনন্দন দেবার আশা রাখি—ঐ ভাবে স্কুলের বর্তমান পর্ব শেষ করব।'[২২]

নিবেদিতার খুবই ইচ্ছা ছিল, পরদিন (৭ অক্টোবর) তিনি বিদ্যালয়ের বালিকাদের নিয়ে মিউজিয়ামে যাবেন এবং মাতাদেবীকে সঙ্গে পাবেন। শ্রীমায়ের হঠাৎ অসুখের জন্য তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ৭ অক্টোবর বড় দুঃখের সঙ্গে লিখেছেনঃ 'আজ বড়-বড় মেয়েদের নিয়ে মিউজিয়ামে যাচ্ছি। মাতাদেবীও যেতেন, কিন্তু অসুস্থ।

৫৭ নম্বরে [অর্থাৎ বলরাম-ভবনে] আহারাদি করে গতকাল স্কুলে এসেছিলেন। সব জড়িয়ে তাঁর পক্ষে ব্যাপারটা বেশিরকম হয়ে গিয়েছিল। শরীর বিশেষ খারাপ।... কি-যে বিশ্রী লাগছে!' [২৩]

নিবেদিতার ২৬ জুলাই ১৯০৪, চিঠিতে শ্রীমায়ের আর একবার বিদ্যালয়-ভবনে আসার সংবাদ পাই। মিস ম্যাকলাউডকে ঐ তারিখে নিবেদিতা লেখেনঃ 'গতকাল তোমার কথা বিশেষভাবে মনে হচ্ছিল কারণ আবার আমরা স্কুল আরম্ভ করেছিলাম—আমার প্রথম স্কুল ঘরেই। এবং মাতাদেবী, প্রথমবারের মতো করে না হলেও, এসে-ছিলেন—তাঁর আশীর্বাদ জানাতে।' [২৪]

মাকে কেন্দ্র করে নিবেদিতা আনন্দের হাট বসাতে চাইতেন—মাকে ঘিরেই যেন সকল শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়। বিদ্যালয় শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যে তিনি মায়ের বাড়িতে ছোটখাট প্রদর্শনীর আয়োজন করে ফেলেছিলেন। ৭ জুন ১৮৯৯ তারিখের চিঠিতে লিখেছেনঃ 'আমরা ছোটদের সব বই, তাদের জন্য মাদুর এবং সেলাই-সরঞ্জাম জোগাড় করেছি, এবং মাতাদেবীর বাড়িতে আমার পুরনো ঘরটিতে সেসব সাজিয়েছি। মেয়েদের মা-মাসী, খুড়ি-জেঠিরা সেগুলি দেখতে এসেছিলেন। ছোট্ট চমৎকার প্রদর্শনী। সন্তোষিনীর কাজ দারুণ দেখতে। দুটি তাকের উপরে পাতাসাজানো ফুল-দানি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী দৃশ্যটির উপর দৃষ্টিপাত করছিলেন।' [২৫]

নিবেদিতার কেবলই সাধ—মাকে সব কিছুর মাঝখানে বসিয়ে রাখবেন। ১৫ মার্চ ১৮৯৯ লিখেছেনঃ 'সোমবার ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মদিন। শ্রীমা এসে পূজা-ঘরে তাঁর প্রতিকৃতির কাছে বিশেষ পূজা করেছিলেন। তারপরে তাঁর সঙ্গিনীরা ফল-মূল আনলে তিরিশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি বসে প্রসাদ পেলাম। খাবার আগে বাচ্চাদের লম্বা হয়ে প্রণাম করার মধুর দৃশ্য যদি দেখতে—আর তাদের কলকাকলি। সুন্দর, ছোটখাট Holy Eucharist-এর [যীশুর নৈশভোজ] তুল্য ব্যাপারটা, সেই-সঙ্গে বড়দিনের ভোজ। বিকালে শ্রীমা, তাঁর সঙ্গিনীরা, বাচ্চারা আর আমি সকলে মিলে সাতটা গাড়ি করে চ্যাটার্জি নার্সারির অর্কিড দেখতে গেলাম—নার্সারিতে মেয়েদের দিন ঐটি। কদাপি মনে করো না, এর দ্বারা বাড়াবাড়ি খরচ হয়েছে কিছু। দুবার চল্লিশ জন করে লোক নিয়ে গেল—কিন্তু গাড়ি ভাড়া ১২ টাকারও কম।' [২৬]

২ মার্চ ১৯০৫ তারিখের চিঠিতে অমনই আর এক বাসনাঃ 'পরের বুধবার ১০০ মহিলা ও শিশু নিয়ে স্টিমারে বোটানিক্যাল গার্ডেন যাওয়ার ইচ্ছা। ঐ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মদিন [অর্থাৎ জন্মতিথি]। তবু আশা রাখি, মাতাদেবী যেতে পারবেন।' [২৭]

মাকে প্রথম ক্যামেরায় ধরে রাখার চেষ্টাতেও নিবেদিতার বিশেষ ভূমিকা ছিল। শ্রীমায়ের যে ছবিটি এখন ঘরে-ঘরে পূজিত, সেটি তোলার ব্যবস্থা সারা বুল ও নিবেদিতাই করেন। মায়ের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ, এবং বিচিত্র কথা—শ্রীরামকৃষ্ণের 'পূজিত' ছবিটিও তাঁর একই বয়সে তোলা। নিবেদিতার আবাসে মায়ের ছবি তোলা হয়। মায়ের কাপড় ঠিকঠাক গুছিয়ে তাঁকে ফটোগ্রাফারের সামনে বসিয়ে দেন

নিবেদিতা ও সারা বুল। মা ছবি তুলতে মোটেই রাজি ছিলেন না—প্রথমত লজ্জা, দ্বিতীয়ত স্বামী যোগানন্দের গুরুতর অসুস্থতার জন্য তিনি তখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তা-কাতর। প্রথমে তিনি ক্যামেরার দিকে কিছুতে তাকাবেন না—সেই অবস্থায় একটি ছবি ওঠে, যেটিতে দেখা যায় তিনি নতদৃষ্টি। এই ছবিতে মায়ের দক্ষিণ পদাঙ্গুলি ঢাকা ছিল, অথচ তাঁর শ্রীচরণ দর্শনের বাসনা ভক্তজনের থাকবেই; তাই আর একটি ফটো তোলা হয়, যাতে পায়ের ডগা কিছুটা দেখা যাচ্ছে এবং তিনি চোখ খুলেও আছেন। তৃতীয় একটি ছবি ওঠে মা ও নিবেদিতাকে নিয়ে।

নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে এই ফটো তোলার প্রসঙ্গ আছে। তিনি পাশ্চাত্যে নানাজনের কাছে এই ফটো পাঠান। কিন্তু এই ফটো যে 'সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য নয়'—তাও নিবেদিতা তাঁর বান্ধবী মিসেস হ্যামন্ডকে লিখেছিলেন, ৪ জানুয়ারি ১৮৯৯। ৯ মার্চের চিঠিতে একইজনকে লেখেনঃ 'জেনে রেখো, তাঁর ঐ ফটো তোলার অর্থ—এক্ষেত্রে তিনি [মাতাদেবী] জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের বাইরে কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিকে সরাসরি তাকালেন, বা তেমন কেউ তাঁর মুখ দেখলেন। তাই বলে এর জন্য কোনো আত্ম-সচেতনতা তাঁর ছিল না—একবিন্দুও না। স্বামীজী, এমন কি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর বিবাহের পরে [বিবাহকালে বয়স মাত্র পাঁচ] অবগুণ্ঠনহীন দেখেননি।'[২৮]

৮ ডিসেম্বর ১৯০৪ মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা এক চিঠিতে লিখেছেনঃ 'আমি একটু আগেই মাতাদেবীর শ্রীচরণ ধৌত করতে গিয়েছিলাম। সেই ধ্রুবমন্দির থেকে তোমার জন্য যে আশীর্বাদ তিনি জানিয়েছেন—তাই তোমাকে পাঠাচ্ছি।'[২৯]

মায়ের পা ধোয়াতে যাওয়া নিবেদিতার পক্ষে অভিনব কোন কাজ নয়—তবু মনে হয়, ঐ পত্রে উক্ত কাজের কথা তিনি একটু বিশেষভাবে লিখেছিলেন—অন্তরের গভীরে খুবই বিচলিত ছিলেন বলে। পরের সপ্তাহে একইজনকে লেখা একটি চিঠি থেকে কারণটি অনুমান করতে চাইঃ 'তোমাকে গতবার লেখার পর থেকে ক্রমান্বয়ে আমার প্রিয়জনদের বাড়িগুলির উপরে ব্যাধি ও মৃত্যুদেবীর করপ্রসার ঘটেছে। অবর্ণনীয় দুঃখের গাঢ় ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি। আমি জানি, তুমি তোমার ভালবাসা আর শুভেচ্ছা পাঠাবে। আমাদের ভালবাসা কী সকরুণভাবে অপ্রচুর ও সামান্য। তাই চেষ্টা করি, ঈশ্বরের অনন্ত করুণার রূপটি অনুভব করতে; তাতে এই স্বস্তিবোধ করি যে, এই পৃথিবী আমাদের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে নেই। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছি - তিনি আমাকে "না" বলতে পারবেন না, তা জানি। তার মানে নয় আমি যোগ্য বা অযোগ্য- আমার যোগ্যতার হিসেবে কিছু এসে যায় না—ওতে কোনোই হেরফের হবে না—কারণ "তিনি" ভালবাসেন, "তাঁতে" প্রত্যাখ্যান নেই।'[৩০]

নিবেদিতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি ছিলেন মাতাদেবী।

এতক্ষণ নিবেদিতার দিক দিয়েই দেখছিলাম। শ্রীমায়ের দিক দিয়ে দেখলে দেখব—সেখানে ভালবাসার অন্তহীন সাগর। অপরের প্রদত্ত বিবরণ থেকে তার কিছু আভাস আমরা পাই। তেমন দুটি চিত্রঃ

'সিস্টার নিবেদিতা আসিয়া মাকে প্রণাম-করিয়া বসিলেন। মা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি ছোট পশমের তৈয়ারী পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।" সিস্টার উহা পাইয়া আনন্দে একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, আর বলেন, "কি সুন্দর, কি চমৎকার!" আবার আমাদের দেখান এবং বলেন, "কি সুন্দর মা করেছেন দেখ!" মা বলিলেন, "কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে কি ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!"'[৩১]

'একবার নিবেদিতা ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমায়ের কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন, "নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোনো দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।"'[৩২]

নিবেদিতাকে লেখা মায়ের একখানি চিঠি পাওয়া গেছে—মূলে অবশ্য নয়—ইংরাজি অনুবাদে। মায়ের চিঠির ইংরাজি করে স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতাকে পাঠান, ১১ এপ্রিল ১৯০০। সারদানন্দ এই প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে লিখেছিলেনঃ 'শ্রীশ্রীমা কুশলে আছেন। তোমাকে এক সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন। আমি মূল পত্রের সহিত উহার ইংরাজি অনুবাদ পাঠাইতেছি। মনে হয়, পত্রের ইংরাজি অনুবাদ পাইলে তুমি আনন্দিত হইবে।' দুঃখের বিষয়, মূল বাংলা চিঠিখানি পাওয়া যায়নি, কিন্তু সারদানন্দ-কৃত ইংরাজি অনুবাদটি পাওয়া গেছে, যেটি নিবেদিতা উল্লাসের সঙ্গে স্বহস্তে কপি করে অন্তরঙ্গ মহলে বিতরণ করেছিলেন। মিসেস ওয়াটারম্যান ঐ চিঠি পড়ে নিবেদিতাকে গভীর আনন্দে বলেনঃ 'আহা! কি মধুময় প্রাণ!' সেই উক্তি, নিবেদিতার ধারণায় পত্রটির গুণ সম্বন্ধে মধুরতম উক্তি।

পত্রটির পুনশ্চ বঙ্গানুবাদ এইঃ

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

জয়রামবাটী
২১শে চৈত্র

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু,

স্নেহের খুকি নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি আমার নিত্য শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার কাছে তোমার যে-ফটোটি রহিয়াছে, তাহার দিকে অনেক সময় চাহিয়া থাকি, তখন মনে হয়, তুমি যেন আমাদের মধ্যেই রহিয়াছ। তুমি কবে, কোন্ বৎসরে ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি। তোমার

ব্রহ্মচর্যপূত হৃদয়ে আমার জন্য যে প্রার্থনা জাগিয়াছে, তাহা যেন পূরণ হয়। আমার শারীরিক কুশল। আমি আনন্দে আছি। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন, এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর ভালয়-ভালয় ফিরিয়া এসো, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূরণ করুন ; ভাবী আশ্রমটি যেন সকলকে যথার্থ শিক্ষা দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণবায়ুস্বরূপ—তিনি বন্দনামন্ত্র নিজেই গান করিতেছেন, তুমি সেই নশ্বর সকল বস্তুর মধ্যেই নিত্যসঙ্গীত শুনিতেছ। বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, পাহাড় পর্বত সকলই প্রভুর স্তোত্র গাহিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষ মা কালীর গান করিতেছে নিশ্চয় জানিও, যার কান আছে সে শুনিতে পায়।

শ্রীমতী ওয়াটারম্যানের গভীর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া খুশী হইলাম। যে অনুভব করে—দেহ গত হইলেও তাহার প্রিয়তম হারাইয়া যায় নাই—সেই যথার্থ আলোক পাইয়াছে। আমার কথা শুনিয়া সে বল পাইয়াছে, একথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সে যেন তোমার কাজের সহায় হয়। শ্রীমতী মেরাইট সীওয়েলকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিবে।

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করো, ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কাজ করিতেছ। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা তুমি যখন ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না।[৩৩] ধ্রুব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যালাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রভুর নাম ও লীলা উভয়ই কত সুন্দর।

তোমার মাতাঠাকুরানী

নিবেদিতার মৃত্যু শ্রীমায়ের বুকে বাণের মতো বিঁধেছিল। বেদনা অশ্রু হয়ে ঝরেছিল। সরলাবালা সরকার নিবেদিতার মৃত্যুর পরেই তাঁর বিষয়ে ক্ষুদ্র একটি বই লেখেন। অপূর্ব রচনা! সেটি শ্রীমাকে যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল, তখন কি প্রতিক্রিয়া হয় তার বিবরণ এইঃ 'নিবেদিতার ভক্তির কথা পড়তে সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। দেখলুম, মায়েব চোখ দিয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ঐ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "আহা, নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল! আমার জন্যে যে কি করবে ভেবে পেত না! রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধুলো নিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিতেও সঙ্কুচিত হচ্ছে।" কথাগুলো বলেই মা নিবেদিতার কথা ভেবে স্থির

হয়ে রইলেন। তখন উপস্থিত সকলেও নিবেদিতার কথা যা জানতেন বলতে লাগলেন। দুর্গাদিদি বললেন, "ভারতের দুর্ভাগ্য যে তিনি এত অল্পদিনে চলে গেলেন।" অপর একজন বললেন, "তিনি যেন ভারতেরই ছিলেন। নিজেও তাই বলতেন। সরস্বতী পূজার দিন খালি পায়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে বেড়াতেন।" পুস্তক-পড়া শেষ হল। শ্রীশ্রীমা তখনও...নিবেদিতার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, "যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী [অন্তরাত্মা], জান মা?"[৩৬]

নিবেদিতাকে মাতাঠাকুরানী এতই ভালোবাসতেন যে, তাঁর দেওয়া যে-কোন সামান্য জিনিসকেও যত্নে রক্ষা করেছেন। নিবেদিতা তাঁকে একবার একটি জার্মান সিলভারের কৌটা দেন। তাতে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখিতেন। বলিতেন, পূজার সময়ে কৌটাটি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা প্রদত্ত একখানি এণ্ডির চাদর জীর্ণ হইয়া গেলেও মা ফেলিয়া দিতে রাজি হন নাই। বলিয়াছিলেন, "ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়েছিল। ওখানি থাক।" তিনি সেই ছেঁড়া এণ্ডির ভাঁজে-ভাঁজে কালজিরা দিয়া তুলিয়া রাখিলেন; বলিলেন, "কাপড়খানি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কি মেয়েই ছিল, বাবা! আমার সঙ্গে প্রথম-প্রথম কথা কইতে পারত না। ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাংলা শিখে নিলে।"' এই সঙ্গে জানানো যায় উদ্বোধন-বাড়িতে ২৩ মে ১৯০৯ তারিখে, মাতাঠাকুরানী প্রথম পদার্পণ করে দোতলার ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন—সেই ঠাকুরঘরে যে-বেদীর উপর ঠাকুরকে বসানো হয়, 'তার সুন্দর চন্দ্রাতপ' নিবেদিতাই স্বহস্তে প্রস্তুত করেছিলেন।[৩৮]

॥ ৪ ॥

নিবেদিতার রচনায় শ্রীমায়ের নিকট-চিত্র

পত্রে বা গ্রন্থে নিবেদিতা-প্রদত্ত সারদাদেবীর বিবরণে যেসব ভাব বা বিষয় বিশেষ-প্রকারে ফুটেছে, তাদের কয়েকটিকে আমি ক্রমান্বয়ে উপস্থিত করব। একটি হল, মায়ের অন্দরমহলের ছবি।

সত্যই ছবি! নিবেদিতা মাকে যেন চালচিত্র সুদ্ধ এঁকে দিয়েছেন। মায়ের কোনও জীবনীকারই এইসকল চিত্রকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরে, ২২ মে ১৮৯৮ তারিখে মিসেস হ্যামন্ডকে লেখা তাঁর চিঠিতে প্রথম তেমন একটি বর্ণনা আমরা পাই: 'অনেকবার ভেবেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা-নাম্নী মহিলাটির বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখব। শুরুতে বলি, তিনি পঞ্চাশ পেরোয়নি এমন হিন্দুবিধবার মতো সাদা কাপড় পরেন। পরার ধরন—কাপড় প্রথমতঃ কোমরে স্কার্টের আকারে

জড়ানো থাকে; তারপরে শরীরের উপর দিয়ে গিয়ে মাথা ঢেকে রাখে অনেকটা nun-এর অবগুণ্ঠনের মতো। পুরুষমানুষ কথা বলতে এলে তাঁকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; তিনি সাদা কাপড়ের ঘোমটা নামিয়ে দেন সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে; সরাসরি কথা বলেন না; বেশি বয়সী কোনো মহিলাকে মৃদুস্বরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কিছু বলে দেন; সেই মহিলাটি তাঁর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন জোরে। এইজন্য মনে হয়, আচার্যদেব [স্বামীজী] কখনো এঁর মুখ দেখেননি। এই সঙ্গে কল্পনায় দেখে নাও, ইনি সবসময়ে মেঝেয় ছোটমাদুরে বসে আছেন। অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কি স্নিগ্ধ ভালোবাসা এঁর। অথচ বালিকার মতোই হাসি-খুশি। সেদিন যখন আমি জোর করে বললুম, স্বামীজীকে এখানে আমাদের মধ্যে আসতে হবে, নইলে আমরা চলে যাব -সেই শুনে তাঁর কি হাসি—তুমি যদি দেখতে! আচার্যদেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন—এই খবর নিয়ে যে-সন্ন্যাসীটি এসেছিলেন, তিনি আমাকে সত্যই চলে যাবার জন্য জুতো পরতে উঠতে দেখে রীতিমতো ভড়কে গেলেন, এবং দ্রুত স্বামীজীকে ডেকে আনতে ছুটলেন--তখন সারদার উচ্ছ্বসিত হাসির রূপ যদি দেখতে! আর কি যে মিষ্টি তিনি! আমাকে বলেন, আমার খুকি।'[৩৬]

আর একটি ছবি, ৯ মার্চ ১৮৯৯, চিঠিতেঃ 'ভালো কথা, মাতাঠাকুরানীর কাছে তোমার একটা চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। উষ্ণ এক সন্ধ্যায় সঙ্গিদের সঙ্গে বসেছিলেন, সেখানে তোমার চিঠি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলাম। তাঁরা তৃপ্তিতে "আহা!" বলে উঠেছিলেন, আর আনন্দ প্রকাশ করছিলেন, নিজেদের ডানদিকের কাঁধে চুমু খাচ্ছিলেন। [অর্থাৎ আনন্দে ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধ একটু উঁচু করে কাঁধে মুখ ঠেকাচ্ছিলেন, যা নিবেদিতার কাছে নিজ কাঁধে চুমু খাওয়ার কথা মনে হচ্ছিল।] শুধু অমন একটি চিঠি লিখে, তুমি কিভাবে তাঁদের মন গভীরভাবে স্পর্শ করেছো, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।... পুরুষেরা তাঁকে পূজা করবার জন্য অন্তঃপুরের দরজা পর্যন্ত কিংবা কখনো তার ভিতরে এলেই, অবিলম্বে তাঁর মুখের উপর লম্বা ঘোমটা নেমে আসে, যদিও কখনো কখনো প্রান্তে একটু ফাঁক থাকে, যাতে নিম্ন-চোখে তাকানো যায়। এই নিয়ে আমি এত মজা করেছি যে, পুরুষেরা বাইরে অপেক্ষা করার কালে সারাক্ষণ তিনি হেসে লুটোপুটি, কিন্তু কোনো চাকর কিম্বা কোনো সন্ন্যাসী সিঁড়ির উপর উঠে এসে যেমনি চেঁচিয়ে জানালেন —অমুকচন্দ্র অমুক শ্রীমাকে প্রণাম জানাতে আসছেন—অমনি সমস্ত ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে ঘনীভূত, সমস্ত কথা স্তব্ধ, হাতপাখার নড়াচড়াও বন্ধ, ঘোমটা মুখে নেমে আসে নিঃশব্দে, সারা গা কাপড়ে ঢেকে যায়, ঘরের মাঝখানে বসে থাকলে, আধখানা শরীর দরজার দিকে ঘুরে যায়—সবকিছু ঘটে যায় নীরবে। তারপর আগন্তুক বাইরে এসে দাঁড়ায়, চৌকাঠে মাথা ঠেকায় কিংবা ভিতরে এসে শ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ করে বলেঃ সে এই এই কাজ করতে যাচ্ছে। লোকটি হয়ত সদ্য কলকাতায় এসেছে, মায়ের জন্য কিছু প্রণামী এনেছে, কিংবা সে বাইরে যাচ্ছে তাই মায়ের আশীর্বাদ চায়। শ্রীমা তখন পার্শ্ববর্তিনীর কাছে অতি মৃদুস্বরে সস্নেহে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন। সেগুলি উচ্চতর স্বরে লোকটির কাছে শোনানো হয়। সব শেষে লোকটি আবার প্রণত হয়,

শ্রীমা হাত জোড় করেন, যার দ্বারা বোঝা যায়, তিনি আশীর্বাদ করছেন। তখন লোকটি চলে যায়। আবহাওয়ার ভার কমে, আগেকার ভাব ফিরে আসে, কথা শুরু হয়, পাখা নড়তে থাকে, ঘোমটা খসে পড়ে।'[৩৭]

নিবেদিতা 'আচার্যদেব' গ্রন্থে এই ছবিটিই অন্য ভাষায় দিয়েছেনঃ 'আমি শ্রীমায়ের ঘরে সারা দুপুর কাটাতাম। তারপর গ্রীষ্ম এলে তাঁর স্পষ্ট আদেশে তাঁর বাড়ীতেই শুতে হল আমাকে, যেহেতু সেখানে কিছু ভালো বন্দোবস্ত ছিল। অন্য কোনো ঘরে নয়, সকলের সঙ্গেই এক ঘরে শুতাম—সাদাসিধে ঘরটি ঠাণ্ডা, লাল রঙের মেঝে তার, মেঝেয় সার-সার মাদুর ও বালিশ পাতা, এবং মশারি টাঙানো।...

'তিনি "সুরে সঙ্গীতে নিত্য পূর্ণ"—তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার আক্ষরিক পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর অধ্যাত্ম সন্তানদের একজন বলেছিলেনঃ "আর তিনি পূর্ণ মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়।" যে-ঘরে তিনি পূজাদি করেন তা ভরপুর থাকে পরম স্নিগ্ধতায়।'.

'শ্রীমায়ের আবাসে দিনগুলি শান্তি ও মাধুর্যে ভরা। প্রত্যূষের অনেক আগেই সকলে একে-একে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করেন ; বিছানার মাদুরের উপর থেকে চাদর ও বালিশ সরিয়ে, তার উপর স্থির হয়ে বসেন, মুখ ঘোরানো থাকে দেওয়ালের দিকে, হাতে-হাতে ঘুরতে থাকে জপের মালা। তারপরে ঘর পরিষ্কারের ও স্নানাদির সময় আসে। পর্বের দিনে শ্রীমা এক সঙ্গিনীর সঙ্গে পালকিতে গঙ্গাস্নানে যান। তার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণ পড়েন। তারপরে নিজের ঘরে মা পূজায় বসেন। অল্পবয়সীরা প্রদীপ জ্বালায়, ধূপ-ধুনা দেয় ; গঙ্গাজল, ফুল ও পূজার জোগাড় করে। এই সময়ে গোপালের মা-ও এসে নৈবেদ্য তৈরীতে সাহায্য করেন। তারপর দুপুরের আহার ও বিকালের বিশ্রাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঝি লণ্ঠন জ্বালিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের কথালাপের মধ্যে ; সকলে উঠে পড়ে ; পট বা বিগ্রহের সামনে আমরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করি ; গোপালের মা ও শ্রীমায়ের পদধূলি নিই ; কিংবা বাধ্য মেয়ের মতো মায়ের সঙ্গে ছাতে উঠি গিয়ে ; তুলসীতলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসি। বহু ভাগ্য তার, যে মায়ের পাশে তাঁর সান্ধ্য ধ্যানের সময়ে বসবার অনুমতি পায়—মায়ের সব পূজার শুরু ও শেষ যে গুরু-প্রণামে—সেই প্রণাম করতে সে শেখে স্বয়ং মায়ের কাছ থেকে।'[৩৮]

১৯০১ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে নিবেদিতা ইংল্যান্ডে অ্যাংলিক্যান মিস্টার হুডের এক আশ্রমে কিছুদিন থেকে সেখানকার অবিরাম পূজা, প্রার্থনা ও তপশ্চর্যার রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মায়ের বাড়ির অভিজ্ঞতাকে তিনি মিলিয়ে দেখেছিলেন। ৩ অক্টোবর ১৯০১, সেই প্রসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডকে লেখেনঃ '"গেস্ট মিস্ট্রেস" আমাকে বললেন, এই সম্প্রদায় ভক্তিসাধনার ব্যাপারে কঠোর নিয়মব্রতী। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমায়ের পূজা-অর্চনার পরিমাণের চেয়ে বেশীকিছু নয় দেখে গভীর তৃপ্তি পেলাম। এদের আরাধনা আরম্ভ হয় সকাল ৬টায়, দিনের শেষ অনুষ্ঠান ৯৷৷টায়। সব জড়িয়ে প্রতিদিন সাধারণ উপাসনা ৪৷৷ ঘণ্টার। অবশ্য ব্যক্তিগত উপাসনাও সেই সঙ্গে আছে।'[৩৯]

মাকে অজস্র মহিলা ঘিরে থাকতেন। তাঁদের অনেকেই মাকে জ্বালাতেন—নিবেদিতা তাতে রাগ করতেন। ৪ মে ১৯০৫, লিখেছেনঃ 'প্লেগের গতিক খারাপ। মাতাদেবী শীঘ্রই কলকাতা ছেড়ে যাবার ইচ্ছা করেছেন জেনে ভালো লাগছিল—কিন্তু এখন শুনছি, খুব শীঘ্র তিনি যাচ্ছেন না। এটা বুদ্ধির কাজ নয়। মাকে ঘিরে থাকে নানা মানুষ, যারা তাঁর ভালোত্বের সুযোগ নেয়—আর সারাক্ষণ তাঁকে সব সহ্য করতে হয়।'[৪০]

অপর পক্ষে মাকে ভক্তিতে ভালবাসায় ঘিরে রাখতেন এমন নারীরাও ছিলেন। তারকাবৃত চন্দ্রমার মতো মাতৃমণ্ডলীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মাতাদেবী থাকতেন। গোলাপ-মা, যোগীন-মা, লক্ষ্মীদেবী, সর্বোপরি গোপালের মা-র অনেক কথাই নিবেদিতার পত্রে ও রচনায় ছড়িয়ে আছে। সিদ্ধ তাপসী গোপালের মা—শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে মাতা বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেজন্য সারদাদেবীকে বৌমা ভিন্ন যিনি কখনও ভাবেননি—তাঁর বিষয়ে অপরূপ ভাষায় বিস্তারিতভাবে নিবেদিতা লিখেছেন, সেসব কথা বলার স্থান এ নয়। এটুকু জানানো যায়—মায়ের বাড়িতে গোপালের মাকে নিবেদিতা বহুবার দেখেছেন—এবং গোপালের মা তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তাঁর 'ম্লেচ্ছ' কন্যা নিবেদিতার বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন।

যোগীন-মার (যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস) কাছ থেকে নিবেদিতা অতীব আগ্রহে ভারতীয় পুরাণের গল্পকথা শুনতেন মায়ের বাড়িতে বসে। সেসব কাহিনী তিনি বহুলাংশে ব্যবহার করেছেন তাঁর 'ক্র্যাডল্ টেলস্ অব হিন্দুইজম্' বইয়ে।

নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলেন, এবং মায়ের বাড়িতে ইনি যখন থাকতেন তখন এঁর সঙ্গ খুব উপভোগ করতেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'আমাদের ভালবাসার মাতাদেবী এখানে এসেছেন, তাঁর ছোট দরবারটি নিয়ে। কি কাণ্ড! সেদিন রাত্রে লক্ষ্মীদিদি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিষয়ে [লক্ষ্মীদিদির বিষয়ে] কী কথা বলেছিলেন জানালেন—"তুই এখনই অপর পারে—জীবন্মুক্ত।" লক্ষ্মীদিদি সুখ-দুঃখের অতীত। এ সবই খেলা—কিছুই স্পর্শ করে না তাঁকে। এ সমস্ত কথাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য—কিন্তু কী অদ্ভুত লাগল তাঁর নিজ মুখ থেকে শুনতে—অথচ একেবারে অহংশূন্য।'[৪১]

লক্ষ্মীদেবী রঙ্গে-কৌতুকে মায়ের অন্দরমহলকে মাতোয়ারা করে রাখতেন। নিম্নের ছবিটি কী মনোহারীঃ '২/১ বাগবাজার স্ট্রীটের উপর শ্রীমার ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতি বৈকালে এক বিরাট আনন্দের হাট ঠাকুরঘরেই বসিত। মা স্বয়ং উপস্থিত। চতুর্দিক হইতে বাবুরাম মহারাজের মা, বলরাম-গৃহিণী, যোগীন মা ও তাঁহার মা, গোলাপ মা, অসীমের মা, মেনীর মা, মাস্টার-গৃহিণী, গৌর মা প্রভৃতি আরও অনেক মহিলা ভক্তবৃন্দ পরস্পর মিলিতেন। অঘোরমণিকেও মধ্যে মধ্যে ইহার ভিতর এক-জন প্রধানারূপে দেখা যাইত।...নিবেদিতাও তাঁহার নিকটস্থ স্কুলবাটী হইতে এই আসরে যোগদান করিতেন।

'এক সময় কয়েকদিন উপরি উপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরম পবিত্রাত্মা লক্ষ্মীমণি দেবী সকলকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিলেন।...গোলাপ মা তাঁহার জামাতা

পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী হইতে নানারূপ পিতলের গহনা—বালা, হার, অনন্ত, বাজু, রূপার পাঁইজোর প্রভৃতি জোগাড় করিয়া সুন্দর নববস্ত্রে লক্ষ্মীমণিকে বৃন্দের ভূমিকায় সুসজ্জিতা করিতেন। লক্ষ্মীদেবী বালবিধবা, তাঁহাকে এমনই দেখিতে সোনার গৌরীর মত, কোনো অলঙ্কার আভরণের প্রয়োজন ছিল না, তবু বৃন্দের ভাবটি স্পষ্ট ও চাক্ষুষ করিবার জন্য ঐ সজ্জা। তিনি চমৎকার নকল করিতে পারিতেন। গলাও মিষ্ট। অসম্ভব রকমের স্মরণশক্তি ছিল। পালাকে পালা এক একদিন দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া লক্ষ্মীদেবী গাহিতেন।...

'নিবেদিতা রামপ্রসাদের গান শুনিতে বিশেষ ভালবাসিতেন। বাংলা কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। রামপ্রসাদী শুনিবার জন্য তাঁহাকে পালার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। কীর্তন শেষ হইয়া গেলে লক্ষ্মীদেবী ফরমাসমাফিক প্রসাদী সুর ধরিতেন।

'নিবেদিতা বালিকার ন্যায় আমোদ ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি নিজে থাবা গাড়িয়া মেঝেতে চতুষ্পদ সিংহ হইয়া গেলেন, এবং পিঠের উপর লক্ষ্মীদেবীকে চাপাইয়া জগদ্ধাত্রী বানাইলেন। মুখে ঠিক সিংহের মত তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য সকলে হাসিয়া লুটোপুটি।'[৩৯]

এই হাসির উৎসবের উপরে মায়ের হাসি জলতরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ত। তাঁর হাসির উল্লেখ আগেই দেখেছি নিবেদিতার চিঠিতে। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ জয়রামবাটীতে থাকাকালে শ্রীমায়ের গ্রাম-সম্পর্কে ভানুপিসীর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতেন। পিসী চরকায় সুতো কাটতেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ চরকার শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গাইতেন। নিবেদিতা সেকথা শুনেছিলেন। 'ভানুপিসী যখন শ্রীমায়ের সহিত কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তখন ভগিনী নিবেদিতা এই ঘটনা শুনিয়া একখানি চরকা লইয়া আসিয়াছিলেন এবং পিসীকে উহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঠাকুরের গান শুনাইতে বলিয়াছিলেন। গান শুনিয়া নিবেদিতা খুব আনন্দ করিয়াছিলেন।'[৪০]

এখানে শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার একটি মনোরম সংলাপ উল্লেখযোগ্য।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন এসেছেন। নিবেদিতা অনেক কষ্টে কিছু বাংলা শিখেছেন এবং অকুতোভয়ে তার প্রয়োগ করছেন—আর মাতাদেবীর উপরই।

নিবেদিতা—মাতাদেবী, আপনি হন আমাদিগের কালী।

মা—না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনকে যখন মায়ের বাংলা কথা ইংরাজী করে বোঝানো হল, তখন উভয়ে যথোচিত আশ্বাস দিলেন।

নিবেদিতা—মাতাদেবীকে এত কষ্ট করিতে হইবে না। আমরা তাঁহাকে উহা ছাড়াই জননীরূপে দেখিব। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগের শিব।

শ্রীমা (হেসে)—তাহলে না হয় দেখা যাবে।[৪১]

॥ ৫ ॥

রামকৃষ্ণ-সারদা সম্পর্ক প্রসঙ্গে নিবেদিতা

সারদা যাঁর শক্তি সেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদার সম্পর্কের কথাও নিবেদিতার লেখায় অল্পবিস্তর ব্যাখ্যাত পাই। কালানুক্রমিক ভাবে এই জাতীয় বক্তব্যের রূপ পরীক্ষা করতে পারি।

২২ মে ১৮৯৮-এর চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করার আগে মাতাদেবীর পরামর্শ নিতেন। অসামান্য গভীর ভাষায় সারদার আত্মবিলয়ের রেখাঙ্কন করেছেন ৯ মার্চ ১৮৯৯ তারিখের চিঠিতে। নিজের স্বামীর কাছে পর্যন্ত সারদা অবগুণ্ঠনে থাকতেন, স্বামীও পত্নীর মুখ দর্শন করতে পারতেন না—এই কথা লেখার পরে নিবেদিতার ভাষ্যঃ 'তাঁর মতো স্বামীকে পূজা করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি—এমন কাউকে ভাবতে পারো? মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনো-কখনো উদিত হবেন—এই লোভ তো থাকতে পারত! না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয়, ইনি তাও চাননি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি।'[৪৫]

শ্রীমায়ের আত্মবিলয় সম্বন্ধে অনেক কথাই পড়েছি। কিন্তু এখানে যে অভিনব তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, এবং তাতে যে নূতন 'মাত্রা' যোজিত হয়েছে—তার তুল্য কিছু পেয়েছি কিনা সন্দেহ।

১৬ মার্চ ১৮৯৯-এর চিঠিতে পাই, সারদাদেবী নিবেদিতাকে বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর অবতার'[৪৬]—একথা তিনি স্বয়ং ঠাকুরের কাছ থেকেই শুনেছেন।

এর কিছুদিনের মধ্যেই নিবেদিতা 'কালী দি মাদার' বইটি লেখেন—তাতে দীর্ঘ রামকৃষ্ণকথা ছিল। সেখানে ঠাকুরের মহাসমাধির কথা বলতে গিয়ে নিবেদিতা স্বল্পাক্ষরে চোখের জলে ধোয়া মৌন বেদনার প্রতিমাকে এঁকেছেন—মৃদু তুলিকার পবিত্র রেখায়ঃ 'অবশেষে এল শুক্লপক্ষের এক গ্রীষ্মকালীন রাত্রি—তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] চারপাশে শিষ্যরা সমবেত—তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, এবার সময় হয়েছে সেই পরমলোকে প্রস্থানের, যেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন নেই।

'এমন কি সেই মুহূর্তেও একজনের মনে যে-প্রশ্ন জেগেছে, তারই উত্তর দেবার জন্য তিনি উচ্চকিত হয়ে উঠলেন। এবং তারপরে—একজনের গান তাঁর বড় ভাল লাগত, সে ঈশ্বরের নাম গান করতে লাগল—তিনি এঁদের ছেড়ে চলে গেলেন। পরে রাত্রির অন্ধকারে এলেন এক নারী, তাঁর চরণতলে বসে তাঁকে "মা" বলে ডেকে মৃদুস্বরে রোদন করতে লাগলেন। সেই নারী—তাঁরই স্ত্রী।'[৪৭]

১৯১০ সালের গোড়ায় প্রকাশিত 'আচার্যদেব' গ্রন্থে (যেটি পূর্বে কয়েক বৎসর ধরে লেখা চলছিল) নিবেদিতা বিস্তারিতভাবে শ্রীমায়ের কথা লেখেন। ঠিকভাবে বলতে গেলে—এই প্রথম বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে শ্রীমায়ের জীবন এবং ব্যক্তিমহিমা উপস্থাপিত হল। এই লেখার মধ্যে এমন কোন-কোন উক্তি আছে যা শ্রীমায়ের বিষয়ে সিদ্ধ বাক্যের

মতো—আজও যা তাঁর চরিত্রের মহিমা বোঝাতে উল্লিখিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বালিকা সারদার বিবাহ, পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করে সারদার সহধর্মিণী ও সন্ন্যাসীর জীবন এইসব ঘটনার উল্লেখ করার পরে, নিবেদিতা একটি কাহিনীচিত্রের মধ্য দিয়ে উভয়ের পারস্পরিক ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধের রূপটিকে তুলে ধরেছেন। তার পরেই মন্তব্য করেছেন অথচ কী অসাধারণ ছিল শ্রীমায়ের অহংশূন্যতা! (যার কিছু রূপ আগেই দেখেছি।) ঐ অংশটি এইরূপঃ

'পত্নী একদিন উৎফুল্ল শিশুর মতো গর্বভরে স্বামীর কাছে একঝুড়ি ফল ও শাকসব্জী এনে হাজির করেন। তাতে স্বামী গম্ভীর হয়ে বলেন, "এত বাড়াবাড়ি খরচ কেন?"—"অন্তত আমার জন্য নয়"—বলে, নীরব অশ্রুতে নয়ন ভরে, তরুণী পত্নী চলে গেলেন—তাঁর মুখের উজ্জ্বলতা লুপ্ত হয়েছে সহসা আঘাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থির হয়ে পড়লেন। কাছের ছেলেদের ডেকে বললেন ব্যাকুলভাবে, "ওরে, তোদের কেউ গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আন। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তিও উড়ে যাবে।"

'মাতাদেবী এমনই প্রিয় ছিলেন ঠাকুরের কাছে। অথচ মায়ের চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, আরাধ্য স্বামীর বিষয়ে কথা বলবার সময়ে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাস কখনো ফুটত না। স্বামীর একটি কথাকে সফল করার জন্য তিনি সর্বাবস্থায়, বিপদে বা সম্পদে, সুমেরুবৎ অটল—কিন্তু সেই স্বামীকে তিনি "ঠাকুর" বা গুরুদেব ছাড়া কিছুই বলেন না—কখনো স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কসূচক আত্মগরিমা যুক্ত একটি কথাও তাঁকে বলতে শোনা যায়নি। তাঁর পরিচয় জানে না এমন কারো পক্ষে তাঁর কথাবার্তা থেকে কোনোমতে অনুমান করা সম্ভব নয় যে, চারপাশের অন্য কারো থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে তাঁর দাবি অধিকতর, বা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। শিষ্যার মধ্যে পত্নী হারিয়ে গেছেন দীর্ঘদিন আগে—যদিও পত্নীর পরম বিশ্বস্ততাটুকু রয়ে গেছে।'

এর পরই নিবেদিতা সেই বাক্যটি লিখেছিলেন, যা পরবর্তীকালে বহুল উদ্ধৃত ও উচ্চারিত হবেঃ 'সারদাদেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরমবাণী।' এর সঙ্গে নিবেদিতা একটি প্রশ্ন যোগ করে দেনঃ 'কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, না, নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ?' [১৮]

॥ ৬ ॥

'ভারতীয় নারী-আদর্শের চরমবাণী সারদা'—কেন?

কোন্ অর্থে সারদাদেবী ভারতীয় নারী-আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরমবাণী—তা ব্যাখ্যা করতে বহু পৃষ্ঠা প্রয়োজন—আর সেও হবে অবধারিত ব্যর্থ চেষ্টা। এখানে কেবল সংক্ষেপে এইটুকু বলা চলে—এই পৃথিবীতে ধর্মজীবনে এবং সামাজিক জীবনে মাতৃ-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, এবং তাঁর শিক্ষায় সারদাদেবী 'মাতাঠাকুরানী' হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু ভারতীয় মাতৃত্বের আদর্শের বিরুদ্ধে একালের বুদ্ধির প্রতিবাদ আছেই। ভারতীয় মাতা সর্বস্ব দিয়ে ছেলেকে ভালবাসেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ভালবাসা অজ্ঞান, অন্ধ, স্নেহে দুর্বল—তার সংস্পর্শে সন্তানও চরিত্রে দুর্বল। (রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত দুটি ছত্র স্মরণ করব কি?—'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,/রেখেছ বাঙালী করি, মানুষ করোনি।') অর্থাৎ ভারতীয় মাতার প্রেমে জ্ঞানের স্পর্শ নেই। ঐ আদর্শ অতীতের সুদূর সৌন্দর্যের দৃশ্য, কিন্তু বর্তমানের বস্তু-সংঘর্ষে অ-দৃশ্য অথবা অদৃশ্য হলেই মঙ্গল।

নিবেদিতা তাই প্রশ্ন করেছেনঃ সারদাদেবী কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, না, নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ?

নিবেদিতা অতঃপর, নানাভাবে, যতখানি স্পষ্ট বক্তব্যে, ততোধিক অর্থগর্ভ ইঙ্গিতে, বলতে চেয়েছেন—সারদাদেবী একইসঙ্গে নূতন আদর্শেরও প্রথম প্রকাশ।

ঐকথা বলার অসুবিধা ছিলই। যেকথা আগে বলেছি—সারদাদেবী আপাতত পর্দানশিন ব্রাহ্মণ-বিধবা, আধুনিক শিক্ষা নেই, সামান্য পড়তে পারেন, কিন্তু লিখতে পারেন না; শেষোক্ত ব্যাপারে তিনি তাঁর 'নিরক্ষর' স্বামীকে অতিক্রম করেছেন, কারণ 'নিরক্ষর' রামকৃষ্ণের বাল্যকালের হস্তাক্ষর একেবারে মুক্তো। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদাদেবীর আরও পার্থক্য—রামকৃষ্ণের বহির্জীবন ছিল, এবং পুঁথি পড়া বিদ্যা না থাকলেও শ্রুতিযোগে শাস্ত্রের সারভাগ তাঁর আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল; তাঁর অসাধারণ প্রতিভা অবিরাম অলংকৃত বাক্যস্রোতে যেভাবে প্রবাহিত হত, পৃথিবীর সেরা জ্ঞানী-গুণীকে তা স্তম্ভিত করেছে। এই বাণীর ঐশ্বর্য সারদাদেবীর ছিল না। নিবেদিতা এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। গোড়ার দিকের একটি চিঠিতে শ্রীমায়ের মহিমার পরিচয় দিতে গিয়ে পাশ্চাত্যদেশীয় বান্ধবীকে তাঁকে বলতে হয়েছিলইঃ 'অভিজ্ঞতা ও বাস্তববোধের বাইরে, চিন্তারাজ্যে, এই মহিলাদের পরিধি ব্যাপ্ত নয়। অনুভূতি-রাজ্যেই এঁদের যত শক্তি। এঁরা এমন কোন শিক্ষা পাননি যার দ্বারা নিজেদের চিন্তাকে অপরিচিতের কাছে আবেদন-যোগ্য করার মতো করে গঠন করতে পারেন।'[৪৯] নিবেদিতার এই কথাগুলি সত্য, আবার সত্য নয়ও। সত্য এইজন্য যে, আধুনিক শিক্ষার পরিশীলিত ভাষা ও ভঙ্গি শ্রীমায়ের আয়ত্ত ছিল না, বহুবচনের বিন্যাসে একবচনকে গরীয়ান করতে তিনি সমর্থ ছিলেন না। আবার কথাটা সত্য নয় এইজন্য যে, অনুভূতি-রাজ্যের বাইরে আত্মবিস্তারের অসীম ক্ষমতাও সারদাদেবীর ছিল। সারদাদেবীর মধ্যে বস্তুজ্ঞান অপেক্ষা বস্তুর সত্যজ্ঞান ছিল অধিক। এবং ঐ সত্যজ্ঞান—'জ্ঞান' ও 'অনুভূতি'র সমন্বয়ে গঠিত। সে ব্যাপারটি নিবেদিতার চোখে প্রথমেই ধরা পড়েছিল, এবং পূর্বোক্ত পত্রের প্রায় দশ মাস আগে লেখা এক পত্রে নিবেদিতা মিসেস হ্যামন্ডকে বলেছিলেনঃ 'এঁকে একটু ভালভাবে জানলে দেখা যাবে—সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধ এঁর চূড়ান্ত, প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো কিছু করবার আগে এঁর পরামর্শ নিতেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্যরা এঁর উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন। ...প্রতি ব্যাপারে এঁকে স্মরণে রাখা হয়।...এঁর ইচ্ছাকে আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়।'[৫০] এই চিঠিতেই আছে, একজন সন্ন্যাসী নিবেদিতার ইচ্ছানুসারে যখন সারদাদেবীকে

Magnificat (যীশুজননী মেরীর গান) পড়ে শুনিয়েছিলেন, তখন তিনি তা গভীরভাবে উপভোগ করেছিলেন। অপরিচিত ধর্মসংস্কৃতির বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েও তার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে তাঁর এতটুকু দেরি হয়নি। এই জিনিসটি নিবেদিতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে প্রসঙ্গটি বিস্তারিত আকারে বলেছেনঃ 'শ্রীমা পড়তে পারেন। রামায়ণ পাঠে অনেক সময় কাটে। কিন্তু লিখতে পারেন না। তবু মনে করার কারণ নেই তিনি অশিক্ষিত নারী। সাংসারিক অথবা ধর্মীয় বিষয় পরিচালনায় দীর্ঘ কঠিন অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই শুধু, অধিকন্তু ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও প্রধান-প্রধান তীর্থস্থানগুলি দর্শনের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে মানবের পক্ষে সর্বোচ্চ-সম্ভব আত্ম-বিকাশের সৌভাগ্য তিনি পেয়েছেন। বিরাটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে অসচেতনে বহন করেছেন। তার গরিমাকে পুনরুচ্চারিত হয়ে উঠতে দেখা যায় যখন তিনি যে-কোন নূতন ভাব বা অনুভূতির মর্মভেদ করেন অবিলম্বে, অব্যর্থভাবে।

'মাতাঠাকুরানীর এই ক্ষমতার পরিচয় প্রথম ভালোভাবে উপলব্ধি করি কিছুদিন আগে এক ইস্টার-দিবসে যখন তিনি আমাদের আবাসে এসে দর্শন দেন। এর আগে তাঁর সঙ্গ করার সময়ে তাঁর ভাবধারা অনুধাবনে আমি এত বেশী মগ্ন থাকতাম যে, বিপরীত ভূমিকায় তাঁকে লক্ষ্য করার কথা মনেই হয়নি। শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীরা সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখার পরে ঠাকুরঘরে বসে খ্রীষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য শুনবার ইচ্ছা-প্রকাশ করলেন। তখন আমাদের ছোট ফরাসী অর্গানযোগে ইষ্টারের গীতবাদ্য করা হল। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান-স্তোত্র শ্রীমার কাছে অজ্ঞাত ও বিদেশীয় হলেও যে-রকম দ্রুত তার মর্মানুভব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে উন্মোচিত হল—সারদাদেবীর ধর্ম-সংস্কৃতির মহিমা কি বিরাট! এই একই ক্ষমতা শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শপূত শ্রীমার সঙ্গিনীদের মধ্যে অল্পাধিক দেখা যায়। কিন্তু সারদাদেবীর মধ্যে তার প্রত্যয় ও শক্তি অসীম—সে এক সমুচ্চ শিক্ষার অভ্রান্ত ফলশ্রুতি।

'এই গুণেরই বিকাশ লক্ষ্য করেছিলাম এক সন্ধ্যাকালে, যখন নিজ ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে আসীন মাতাঠাকুরানী আমাকে ও আমার গুরুভগিনীকে ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি বর্ণনা করতে বললেন। প্রচুর হাসিখুশির মধ্যে আমরা বর, কনে, খ্রীষ্টান পুরুত, প্রভৃতির বর্ণনা সহ ব্যাপারটা কি বললাম। কিন্তু বিবাহ-প্রতিজ্ঞাটি শুনে তাঁর মনে যে-ভাবোদয় হল, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। "সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শক্তিতে-অশক্তিতে যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে"—কথাগুলি শোনামাত্র সকলেই "আহা-হা!" করে উঠলেন আনন্দে, কিন্তু শ্রীমার পরি-তৃপ্তিই সর্বাধিক। বারবার কথাগুলি তিনি শুনতে চাইলেন; বারবার বললেন, কী অপূর্ব ধর্মকথা! কী অপূর্ব ধর্মকথা!'[৬১]

নিবেদিতা দেখেছিলেন, এই পর্দানশিন মহিলা তাঁর অবরোধের মধ্যে বিশ্বভুবনকে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। ২২ মার্চ ১৯০৪ তারিখের চিঠিতে তিনি লেখেনঃ 'মুসলমান

ছাত্রেরা আমাকে "এশিয়ায় ইসলাম" বিষয়ে তাঁদের কাছে এক থিয়েটার হলে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এইকথা যখন গত রবিবার মাতাদেবীকে জানিয়েছিলাম তখন তাঁর সে কী আনন্দ!'[৩২]

নিবেদিতা তাঁর ভারতবাসের সূচনাপর্ব থেকেই শ্রীমায়ের মুক্ত দৃষ্টি ও সহজ প্রজ্ঞার রূপ লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি জেদ ধরেছিলেন, ভারতীয়দের মধ্যে যখন কাজ করতে এসেছেন তখন তিনি ভারতীয়দের মধ্যেই বাস করবেন—আধুনিক অনুকরণকারী ভারতবর্ষে নয়, পুরাতন ভারতবর্ষে। স্বামীজী তাঁকে সারদাদেবীর কাছে পেঁৗছে দিলে যা ঘটল, তা স্বামীজীর পক্ষেও বিস্ময়কর ছিল। তিনি শ্রীমায়ের মহিমার কথা যথেষ্টই জানতেন, পাশ্চাত্যনারীরা তাঁর কাছ থেকে সস্নেহ অভ্যর্থনা লাভ করবেন, এও তাঁর ধারণার অন্তর্গত—কিন্তু কদাপি ভাবতে পারেননি—মাতাঠাকুরাণী (স্বয়ং রক্ষণশীল বিধবা, অধিকতর রক্ষণশীল বিধবাদের দ্বারা পরিবৃত) ঐ ম্লেচ্ছ মেয়েগুলির সঙ্গে একপাত্রে আহার করবেন! সেকালের গোঁড়া সমাজে ব্যাপারটি যে কল্পনাতীত, তা স্বামীজীর উৎফুল্ল বিস্ময় থেকেই বোঝা যায়। ১৮৯৮, মার্চ মাসে তিনি রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে লিখেছিলেনঃ 'শ্রীমা এখন এখানে। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তারপর কি কাণ্ড, ভাবতে পারো—**মা তাঁদের সঙ্গে খেলেন পর্যন্ত!** দারুণ ব্যাপার নয় কি?'[৩৩]

স্বামীজীর পক্ষে ব্যাপারটি বিস্ময়কর—কম বিস্ময়কর ছিল না পাশ্চাত্য মহিলাদের কাছে পর্যন্ত। একসঙ্গে খাওয়ার কাণ্ড নিয়ে তাঁরা সম্ভবত বেশী বিচলিত হননি (একেবারে হননি তা নয়। নিবেদিতা ২২ মে ১৮৯৮, চিঠিতে লিখেছিলেনঃ 'শ্রীমা আচার-বিচারে বরাবরই রক্ষণশীল। সেইসব কিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি বিদেশী মেয়ে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড, তাঁর কাছে গেলেন। এঁদের সঙ্গে খেলেন পর্যন্ত। আমরা যেতেই ফল খেতে দেওয়া হল, তাঁকেও দেওয়া হল। সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ফল তিনি একসঙ্গে গ্রহণ করলেন!! এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।'[৩৪])—ভাতের হাঁড়ির ধর্মের পুরো শক্তি তাঁরা পুরো বুঝতে সত্যই সমর্থ ছিলেন না—তাঁরা অভিভূত হয়েছিলেন ঐ নারীর মর্যাদা ও স্বচ্ছ বুদ্ধির গরিমায়। বহু বৎসর ধরে পাশ্চাত্যে তাঁরা মিশনারী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্রবাদ্য মারফত ভারতীয় নারীর কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অন্ধতার বিষয়ে বহুকিছু শুনে এসেছেন—এই নারীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের মনে হল—কী মিথ্যা সেই সকল কথা! শ্রীরামকৃষ্ণের উপমার ছায়ায় বলা যায়—তাঁদের বহুদিনের ভ্রান্ত ধারণার অন্ধকার দূর হয়ে গেল এই একটি নারীর আলোক শিখা থেকে। কেবল সারদাদেবীর উদারতা, স্নেহ, বা সহজ বুদ্ধি নয়—দৃঢ় বিচারশীল প্রজ্ঞায় তাঁরা চমকিত হলেন। ম্যাক্সমুলারকে লেখা সারা বুলের ১১ জুলাই ১৮৯৮ তারিখের যে-পত্রের উল্লেখ আগে করেছি—সে চিঠির বক্তব্য

কেবল মিসেস বুলেরই ছিল না, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতারও। ভারতীয় নারীর বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থীদের নির্বিচার আক্রমণের বিরুদ্ধে ম্যাক্সমুলার মিসেস বুলের পত্রটি তুলে ধরেছিলেন—তাতে খুশী হয়ে নিবেদিতা ৯ জানুয়ারি ১৮৯৯, চিঠিতে লেখেন, 'মাতাদেবী পূর্ববৎ।...ম্যাক্সমুলার সেন্ট সারার চিঠির সুন্দর ব্যবহার করেছেন, তাই না?' ৫৫

মিসেস বুল লিখেছিলেনঃ 'আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদাদেবীকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছি। তিনি "আমার মেয়েরা" বলে আমাদের গ্রহণ করলেন। বললেন যে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। আমাদের একেবারেই অপরিচিতভাবে দেখলেন না। গুরুর কাছে আনুগত্য বলতে কি বোঝায়, একথা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল—তাঁর ক্ষেত্রে আবার নিজ স্বামীই গুরু—তিনি জানালেনঃ কাউকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক বিষয়ে নিজের সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে কাজ করলেই, সে কাজ যদি কোনো ক্ষেত্রে গুরুর অননুমোদিত হয় তবু—গুরুকে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।

'স্বামীর সঙ্গে বাল্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ তিনি। স্বামীকে যখন সানন্দে সন্ন্যাসীর জীবন যাপনে অনুমতি দিলেন, তখন স্বামীর গভীর বন্ধুতা পেলেন, ও তাঁর শিষ্যারূপে গৃহীত হলেন। স্বামী তাঁকে দিন-দিন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুললেন। অপরপক্ষে পতি-সান্নিধ্যে অতিবাহিত বৎসরগুলিতে ইনি স্বামীর পরামর্শদাতা ছিলেন। ইনি নিরন্তর প্রার্থনা করেছেন, আমার বাসনাকে শুদ্ধ ক'রে তোলো, যাতে চিরদিন তোমার যোগ্য হতে পারি। দারিদ্র ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ, কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।'

গুরুবাদী এই সমাজে, নিজে গুরুর আসনে বসে থেকেও (বহু মানুষের কাছে তিনি পরম গুরু), এই নারী যখন বলেছেন—ঐহিক বিষয়ে গুরুর সবকথা মানবার প্রয়োজন নেই, সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে গুরুর অননুমোদিত কর্ম করলেও, তা গুরুর শ্রেষ্ঠ সেবা—তখন তাঁর প্রচন্ড চিত্তশক্তি যে-কোনও সময়ের পক্ষেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

এদেশীয় ছুঁৎমার্গী রক্ষণশীলতার পুরো রূপ নিবেদিতা গোড়ায় বুঝতে পারেননি বলে, তাঁকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়ে শ্রীমা কতখানি মনঃশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ধারণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অল্পদিনের পরে তা কিছুটা বুঝে তিনি জোর করে কাছাকাছি অন্য একটা বাড়িতে উঠে যান। একথা তিনি 'আচার্যদেব' গ্রন্থে বলেছেন। কিন্তু শ্রীমায়ের সংসারে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিলই, বহু সময় সেখানে কাটাতেন, ও মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করতেন অবাধে। তাঁর পাঠানো ভোগকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ঘরোয়া চাঞ্চল্য ঘটলে শ্রীমা কেমন কঠোরভাবে তাকে নিরস্ত করেন তাও আগে দেখেছি।

নানা পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে নিবেদিতা শ্রীমাকে তাঁর এই আশ্চর্য বুদ্ধি ও

বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে দেখেছেন। মহিলা হিসাবে নিবেদিতা জানতেন, মহিলা-দের দলকে একই সঙ্গে সন্তুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে কতখানি ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। মাতাঠাকুরানীর সঙ্গে পরিচয়ের গোড়াতেই তাঁর সেকথা মনে হয়েছিল।—'তাঁর মহিমার একটা উত্তম দৃষ্টান্ত দিই। কলকাতায় তিনি যখন থাকেন, তখন সদাসর্বদা ১৪-১৫টি উচ্চবর্ণের হিন্দু-মহিলা তাঁকে ঘিরে থাকেন—যাঁরা রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি ক'রে সকলকে অস্থির ক'রে মারতেন—যদিনা তিনি তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং প্রফুল্লতা দ্বারা এঁদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি রক্ষা করে চলতেন।' এইকথা বলে নিবেদিতা নিজে কিন্তু বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি। সুতরাং যন্ত্রস্থ কৌতুকে তারপরেই লিখেছেনঃ 'তাই বলে সত্যিই আমি ঐসব মহিলার স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনো কটাক্ষ করছিনা, আমি নারীজাতির সাধারণ স্বভাব অনুমান করে এইকথা বলছি।'[৫৬]

নিবেদিতা কলকাতায় আসার কিছু পরেই 'এমপ্রেস' নামক সচিত্র ইংরাজী পত্রিকায় ভারতীয় সমাজের অন্তর্দেশের বিবরণ লিখতে শুরু করেন। সেজন্য তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের মেয়েদের ছবি তুলিয়ে প্রকাশ করেন। অন্তরঙ্গ মহলে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল। সেইসময়ে তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন শ্রীমা। নিবেদিতা ১৮ জুন ১৮৯৯, চিঠিতে লিখেছেনঃ 'আমার "জেনানা" প্রবন্ধ বেরুবার পরে মাতাদেবী যখন শান্তভাবে বললেন, সন্তোষিনীর মা [প্রবন্ধের জন্য] তার ছবি তুলতে দিয়ে আসলে তাঁকেই সাহায্য করেছে—তখন তার মূল্য আমার কাছে কতখানি ছিল নিশ্চয় বুঝবে।'[৫৭] একই চিঠিতে 'সদানন্দের বিরুদ্ধে বিকট মিথ্যা দুর্নামের বিরুদ্ধে সদানন্দকে সমর্থন করতে মাতাদেবীকে দেখে' নিবেদিতা লিখেছেন, 'মা যে কী—সবে বুঝতে আরম্ভ করেছি।'[৫৮]

এই 'সবে বুঝতে আরম্ভ করা' শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছেছিল, আমরা তা দেখেছি এবং আরও দেখব। সে যাইহোক, শ্রীমায়ের বুদ্ধি-বিবেচনার নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ নিবেদিতার চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন, তাঁর ছোট্ট এক ভাগিনেয়কে (আনন্দমোহন বসুর পুত্র) নিবেদিতার কাছে কিছুদিন রেখে দেবেন—উন্নততর শিক্ষার জন্য। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা ছিল, সারদাদেবী বোধ-হয় সেই প্রস্তাবে রাজি হবেন না। নিবেদিতা কিন্তু শ্রীমাকে জানতেন বলে মনে করেছিলেন—না, উনি আপত্তি করবেন মনে হয় না। (৪ এপ্রিল ১৯০১ চিঠি) বাগ-বাজারে হিন্দু মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়স্থাপনের ক্ষেত্র শ্রীমা বহুলাংশে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন ; ক্রিস্টিনও তাঁর কাজ আরম্ভ করার আগে শ্রীমায়ের কাছ থেকে সেই সাহায্য চেয়েছেন। 'ক্রিস্টিন বিধবাদের মধ্যে কাজ করতে রাজি যদি সে তার পুরনো শক্তি ফিরে পায়—আর যদি মাতাদেবী কলকাতায় ফিরে এসে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন।'[৫৯] ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪-এর চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'মাতাদেবী এখন এখানে আছেন। কি ছোট্ট, রোগা আর কালো হয়ে গেছেন—গাঁয়ে থাকার কষ্টে শরীর

যেন একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বের মতোই সেই স্বচ্ছ বুদ্ধি, উন্নত মর্যাদা, নারীত্বের মহিমা—অবিকল।'[৬০]

নিবেদিতা প্রতিদিনের ছোটখাট ঘটনায় ঐ শ্রীমায়ের প্রজ্ঞা-মহিমা দেখেছেন,[৬১] বড় ঘটনাতেও দেখেছেন। তেমনি একটি ঘটনার কথা তিনি অবশ্যই জানতেন, যার সূচনা স্বামীজীর জীবনকালেই, সমাপ্তি স্বামীজীর দেহান্তের অল্প পরে। ঘটনাটি —বাহ্যত ঘনঘটাসম্পন্ন নয়, কিন্তু মনোলোকে তার অসীম গুরুত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ যে কেন সারদাদেবীকে স্বয়ং সারদা-সরস্বতী, জ্ঞানদেবী, মনে করতেন, তার কিছু আভাস ঘটনাটির মধ্য থেকে পাওয়া যায়।

ঘটনাটি বিবেকানন্দ জীবনীতে গুরুত্বযুক্ত। স্বামীজী দূর হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গিয়েছিলেন ১৯০১ জানুয়ারি মাসে—অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপটেন সেভিয়ারের দেহত্যাগে শোকার্ত মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে, সেই-সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের অদ্বৈত আশ্রমের বাস্তব আকার দেখতে। অদ্বৈত আশ্রমে বিশুদ্ধ অদ্বৈতের সাধনাই যদিচ একমাত্র অনুমোদিত, তথাপি স্বামীজীর দু-একজন সন্ন্যাসী-শিষ্য একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা করছিলেন। স্বামীজী অদ্বৈত আশ্রমের এই নীতিলঙ্ঘনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন; এবং তাঁর ইচ্ছার সম্মানে পটপূজা বন্ধ করেও দেওয়া হয়। তথাপি স্বামীজীর উক্ত শিষ্যরা মন থেকে সন্তুষ্ট হননি। তাঁদের সংশয় এমনই গভীর ছিল যে, স্বামীজীর ইচ্ছার ঔচিত্যকে পর্যন্ত প্রশ্নাধীন করে, তাঁরা শ্রীমাকে পত্র দিয়েছিলেন। শ্রীমা তার যে উত্তর দেন, রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে সেটি অমূল্য দলিল। তার মধ্যে রামকৃষ্ণপন্থীরা চরমে কোন্ মতবাদী—দ্বৈত না অদ্বৈত-বাদী—তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু ঐ পত্রের মধ্যে শ্রীমায়ের চরিত্রের আগ্নেয়রূপ কম উদ্ঘাটিত হয়নি। তিনি যে একেবারে নির্বিকার সত্যসূর্য—তা ওখানে প্রমাণিত।

পত্রটির একটি প্রতিলিপি, সৌভাগ্যের বিষয়, আমি ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠ থেকে আবিষ্কার করতে পেরেছি। ১৫ ভাদ্র ১৩০৯ তারিখে লিখিত ঐ পত্রমধ্যে শ্রীমা বলেনঃ 'আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য—তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈত-বাদী।'[৬২]

সারদাদেবীর এই বক্তব্য আমাদের চমকিত নয়, একেবারে স্তম্ভিত করে দেয়. বিশেষত যদি পত্রটির পটভূমিকার কথা স্মরণ করি। সারদাদেবীর যিনি স্বামী-গুরু-ঈশ্বর—যাঁর পূজায় তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়োজিত—সেই রামকৃষ্ণের পট-পূজা বন্ধ করার ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে—সেখানে তিনি কোন্ উত্তর দিলেন, না—অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা বন্ধ করিয়ে স্বামীজী ঠিকই করেছেন!! আমাদের লৌকিক বুদ্ধিতে এ-বস্তু অলৌকিক। এ-জিনিস একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-পত্নীর পক্ষেই করা সম্ভব।

নিবেদিতা অবশ্যই এ ঘটনার কথা জানতেন। এমনই ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়ে শ্রীমায়ের জ্ঞানময়ী মূর্তি তাঁর গোচর হয়েছে। তাই তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্বের প্রধান রচনা 'আচার্যদেব' গ্রন্থে নিম্নের কথাগুলি লিখতে পেরেছেন, 'নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ' রূপে উপস্থিত করার কালেঃ 'প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সমন্বয় সরলতম নারী জীবনেও কিভাবে করা সম্ভবপর, তাঁকে দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আমার কাছে তাঁর অধ্যাত্ম-মহিমার মতোই অপূর্ব ঠেকেছিল তাঁর সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য, তাঁর উদার মুক্তমনের মহিমা। যত নূতন বা জটিল সমস্যাই তাঁর কাছে উপস্থিত করা হোক, আমি কখনো তাঁকে উদার ও মহৎ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে কুণ্ঠিত দেখিনি। এক দীর্ঘ নীরব প্রার্থনার মতো তাঁর সমগ্র জীবন। ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হলেও তিনি প্রতি ক্ষেত্রে নিজেকে পরিবেশের উপরে উন্নীত করতে পারেন। অপকৃষ্ট আচরণে যদি কেউ পীড়িত করে থাকে তাঁকে —আর কিছু না ক'রে এক সঘন বিচিত্র নীরবতায় নিজেকে গুটিয়ে নেন। যদি কেউ তাঁর অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী সামাজিক সমস্যার যন্ত্রণার কথা জানায়, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিতে ঘটনার মর্মে প্রবেশ ক'রে সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে সমাধানের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। আর যখন কঠোরতার প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে কোনোরকম বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হন না। যে-ব্রহ্মচারীকে আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শাস্তি দিয়েছেন, তাকে তদ্দণ্ডেই স্থান ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হবে—তাঁর আদেশ। তাঁর দৃষ্টিতে সাধুর আচরণ যে লঙ্ঘন করেছে সে কখনই তাঁর সাক্ষাতে আসতে অনুমতি পাবে না। এই ধরনের দোষী এক ব্যক্তিকে একদা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "দেখছ না, ওর ভিতরের নারীমহিমাকে আঘাত করেছ তুমি—সর্বনাশ।"'[৬৩]

এই কথাগুলি নিবেদিতা যখন লিখেছেন, তখনও তাঁর মাতৃদর্শন সমাপ্ত হয়নি। আরও বছর খানেক পরে, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখে লিখেছেনঃ 'সম্প্রতি সারদানন্দের সঙ্গে যথেষ্ট দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে—গ্রন্থপ্রকাশের কারণে, এবং যেহেতু আমি স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনী সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করতে শুরু করেছি। সুতরাং সেই গোড়াকার দিনগুলিতে যেন ফিরে যাচ্ছি যখন ওঁরা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। প্রিয় মাতাদেবী ঐকালের প্রামাণ্য সাক্ষী হিসাবে বর্তমান। পূর্ণ তিনি—মাতাদেবী!—পূর্ণ মধুর্যে, মৌনে। আর কী জ্যোতির্ময়! ইদানীং আরও গভীরভাবে বুঝতে পারছি, তিনি কত সত্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ছিলেন।'[৬৪]

॥ ৭ ॥

শ্রীমাকে প্রণাম জানাতে দেশপ্রেমিকদের আগমন : নিবেদিতার পত্রে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ

সারদাদেবীর সুদৃঢ় চরিত্রশক্তির পরিচয় অন্য একদিকে দর্শন করে নিবেদিতা গভীর শ্রদ্ধাবোধ করেছিলেন। নিবেদিতা স্বদেশী-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এবং সারদাদেবী তা খুবই জানতেন। সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারের রূপ দেখে মায়ের ক্ষোভের সীমা ছিল না, যদিও বিশ্বজননীরূপে তিনি কদাপি তাদের সর্বনাশ চাইতে পারেননি। কারণ তারাও 'আমারই ছেলে', কিন্তু একইসঙ্গে 'স্বদেশী'-করা সন্তান-দের জন্য তাঁর স্নেহের আঁচল বিছানো ছিল। স্বদেশী-আন্দোলনের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, তাই তার এত প্রাণশক্তি—একথা ঐ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা অরবিন্দ বলেছেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকা-নন্দ তখন সশরীরে বর্তমান ছিলেন না—কিন্তু রামকৃষ্ণের 'শক্তি' সারদাদেবী তো ছিলেন। তাঁকেই জননীরূপে স্বীকার করে দেশপ্রেমিকরা আসতেন তাঁর চরণ-বন্দনায়। সরকারের দ্বারা দেশপ্রেমিকদের নিদারুণ উৎপীড়নের সেইসময়ে, যখন পুলিশ সহস্র লোলুপ চোখে সন্ধান করছে কোথায় আছে ষড়যন্ত্র বা তার উৎস—সেই সময়ে শ্রীমায়ের কাছে বিপ্লবীদের আসা-যাওয়া রামকৃষ্ণসঙ্ঘের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক ছিল। সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ তা জানতেন—কিন্তু ঝুঁকি নেবার শক্তি ও সাহস ছিল তাঁর—কদাপি কাউকে আসতে নিষেধ করেননি। আর নিত্য বর্ষিত ছিল মাতাঠাকুরানীর স্নেহ ও আশীর্বাদ এই দুঃসাহসী সন্তানদের জন্য। তারই স্পর্শ পেয়ে, আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ডাক দিয়ে লিখেছিলেন : 'চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমনি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শী পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও, আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।'[৬৫]

শ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে আসেননি কে?—অরবিন্দ, দেবব্রত বসু থেকে আরম্ভ করে, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রায় সকল মহান বিপ্লবীই। মাতৃমন্দিরে সমাগত 'দেবতার দীপহস্ত' সন্তানদলের দিকে তাকিয়ে নিবেদিতা মোহিত হয়েছেন, এবং পত্রের পরে পত্রে সেকথা লিখেছেন : 'সকল দলই সমবেতভাবে বলছে, নতুন চেতনা এসেছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ থেকেই। যাঁরা কারামুক্ত হয়েছেন, তাঁরা মাতাদেবীকে প্রণাম জানাতে আসছেন। মাতাদেবী বলছেন, "কী সাহস। এমন সাহস কেবল ঠাকুর আর স্বামীজীই আনতে পারেন। দোষ যদি কারো হয়, সে তো তাঁদেরই।" অপূর্ব! মাতাদেবী অপূর্ব—নয় কি?'[৬৬]

'মাতাদেবী নিখুঁত—পূর্ণ! বো [বউ, অর্থাৎ শ্রীমতী অবলা বসু] গতরাত্রে তাঁর পাদস্পর্শের জন্য এসেছিল। চমৎকার, নয় কি? সকল বিরাট দেশপ্রেমিকই ও কাজ এখন করেন—সকলেই স্বীকার করেন, ডাক এসেছিল স্বামীজীর কাছ থেকেই। সেদিন যখন মাতাদেবীকে বললাম—"মা, রামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন, একদিন তোমার অগুন্তি ছেলে হবে, সেদিন তো প্রায় এসে গেল, সারা দেশই যে দেখছি তোমার।" —তখন তিনি বললেন, "তাই তো দেখছি।"'[৬৭]

'গতরাত্রে সে [ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু] বোকে এনেছিল মাতাদেবীকে প্রণাম করাতে। এর থেকে সুন্দর কিছু ভাবতে পারো? আমাদের প্রিয় মাতাদেবী তার সঙ্গে কী মধুর ব্যবহার না করলেন! বো মিষ্টি খেয়েছিল।'[৬৮]

'ক্রিস্টিন চলে যাবার ঠিক আগে স্বামীজীর ভাইদের মধ্যে যে বড় [অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ] তার সঙ্গে দেখা হল। দারুণ আকার। সারা দেশের কি যে পরিবর্তন ঘটে গেছে কি বলব! সবাই নিজেদের স্বামীজীর শিষ্য বলছে—সেও তাদের একজন!! মাতাদেবীকে একদিন বললাম, "শ্রীরামকৃষ্ণ তোমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমার অনেক ছেলে হবে, সেদিন তো এসে গেল, গোটা ভারতই যে তোমার।"—তিনি উত্তর দিলেন, "তাই তো দেখছি।"'[৬৯]

'ফিরে এসে আবার লেখার টেবিলে বসতে পেরেছি এবং মাতাদেবীর সান্নিধ্যে যেতে পেরেছি—এতে যে কী অপূর্ব লাগছে কি বলব! অপূর্ব! অপূর্ব! এ জিনিস তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। এই স্থানটির একটি পরম অস্তিত্ব সত্যিই বর্তমান। মানুষের অন্তর্লোকের পরিপূর্ণ একটি কল্পলোক এখানে আছে—আছেই। সবাই এখন বলছে—স্বামীজীই হলেন নব ভাবধারার উৎস, এবং তাঁরা মাতাদেবীর চরণ স্পর্শ করতে আসছেন, আর সারদানন্দ কিছুতে কাউকে ফিরিয়ে দেবেন না। এটা কি অসাধারণ কাণ্ড নয়?'[৭০]

॥ ৮ ॥

পরমা শান্তির প্রতিমা

কিন্তু কোন্ রূপে সারদাদেবী নিবেদিতার কাছে সবচেয়ে নিবিড় নিকট? তা কি মাতাঠাকুরানীর সহনশীলতা, সেবা, স্বচ্ছ বুদ্ধি, বিবেচনা-শক্তি, ধৈর্য, মাধুর্য, করুণা, স্নেহ?—এদের কোন একটি বা একাধিকের জন্য? আমরা মনে করি, সবকিছুই অর্থাৎ সবকিছু জড়িয়ে যে-অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব—তারই জন্য। সে ব্যক্তিত্বের মৌল প্রকাশ কিন্তু অপরূপ শান্তিতে। এই শান্তির রূপ স্বামীজী একবার একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন, যেটি উৎসর্গ করেন নিবেদিতাকেই। মায়ের নাম না করে স্বামীজী নিবেদিতাকে মায়ের কথাই কবিতাটির মধ্যে বলেছেন। সেখানে স্বামীজী বলেনঃ

> 'সে শান্তি ধেয়ে আসে শক্তির আকারে মহাবেগে, কিন্তু তা শক্তি নয়। তা অন্ধকারের অন্তলীন আলোক, তীব্র জ্যোতির মাঝে ছায়ার আভাস। আনন্দ তা, অনির্বচনীয়; বেদনা তা, অননুভূত; অমর জীবন তা, অযাপিত; নিত্য মরণ তা, অশোচিত; তা সঙ্গীতে সম আর পবিত্র ছন্দের যতি; মুখর ভাষণের অন্তরের নৈঃশব্দ্য; বাসনার উচ্ছ্বাসের তরঙ্গমধ্যে হৃদয়ের ক্ষান্তি ও ধৃতি। নয়নের অগোচর পরম সুন্দর সে; সে অগীত সুর আর অজ্ঞেয় জ্ঞান; জন্মতরঙ্গের অন্তরঙ্গ মৃত্যু। ঝঞ্ঝার শিরে সে নিশ্চল নিরোধ—সৃষ্টিগর্ভ সেই মহানেতি। সেখানে নিত্য ঝরে হাসির কিরণ। সেই শান্তি, জীবনের পরম লক্ষ্য—সেই হল ধ্রুবলোক।'[৭১]

আধ্যাত্ম পিপাসার ও অনুভূতির 'জ্বলন্তরূপ' স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দর্শন করার সুযোগ নিবেদিতার হয়েছিল। স্বামীজীর মধ্যে তিনি অধ্যাত্ম চরিত্রের অন্যতর রূপও দেখেছেন—যেখানে শিবযোগী সমাধির মহানির্জনতায় তুষারশৃঙ্গ হিমালয়ের মতো চিরস্থির হয়ে যেতেন। বিরল সেইসকল দর্শনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু নিবেদিতা নাম্নী ধাবমান অগ্নিপতাকা বোধহয় গভীরে চাইত বিরতির ক্ষান্তি এবং শান্তির অপার্থিব জ্যোৎস্নাকিরণ—আর সে জিনিস তিনি পেয়েছিলেন মাতাঠাকুরানীর সান্নিধ্যে। প্রতিদিনের সংগ্রামে বিক্ষত হৃদয় নিয়ে তিনি ছুটে আসতেন মাতাঠাকুরানীর কাছে। ঐ শান্তিসরোবরে অবগাহনের জন্য। ছুটে আসতেন কান্না নিয়ে—মাগো, আমি তোমার ক্লান্ত মেয়ে, এসেছি তোমার কাছে, কোলে তুলে নাও।

চিঠির পর চিঠিতে নিবেদিতা মাতাঠাকুরানীর মধ্য থেকে ছড়িয়ে পড়া পরমা-শান্তির সুধাকিরণের কথা বলেছেন। নন্দলাল বসু 'দশরথের মৃত্যুদৃশ্য' এঁকে-ছিলেন। ছবিটি নিবেদিতার পুরো ভাল লাগেনি, কিন্তু একাংশে সেটি তাঁর মনকে ছুঁয়েছিল। 'ছবিটিতে শান্ত নির্জন পরিবেশ আছে; ঠিক শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়; তাই আমার বড় ভাল লাগছে।'[৭২]

ইতিপূর্বে নিবেদিতার রচনা থেকে শ্রীমায়ের পরিবেশের যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত

করেছি, সেগুলির মধ্যে মায়ের শান্তিসদনের কিছু পরিচয় আছে। এখানে আরও দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক্‌ঃ 'চারিদিকে ঘণ্টা বাজছে, সুর ভেসে আসছে—এখন যে সন্ধ্যারতির কাল। ...একে আমি বলি শান্তিলগ্ন। ...সন্ধ্যাদীপ জ্বলছে... অন্তঃপুরের নারীরা প্রণত হয়েছেন বিগ্রহের সামনে; এই সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকেই সারদাদেবীর গৃহে, ঠিকভাবে বলতে গেলে আশ্রমে, মহিলাদের অনেকে নিঃশব্দে জপমালা ঘুরিয়ে চলেছেন।'[৭৩]

'শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু—শিশু ভগবান। শিশুর কাছে কেউ কিছু চায়?—দিতে হয় সর্বকিছু তাঁকে। আকাশ-বাতাস তাই পূজায়-পূজায় পূর্ণ। সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজছে। মধু! মধু! জীবন কর্মহীন, অর্থহীন—আঃ ভাবতেও অসীম শান্তি! সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর—এ সর্বকিছু যেন মাতাদেবীর সান্নিধ্যের মতো। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতো তাঁর সঙ্গ—বিশেষত যখন তিনি পূজার আসনে—অপরূপ! অপরূপ!'[৭৪]

নিবেদিতার কাছে সারদাদেবী ক্রমে মেরী মাতা হয়ে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্যের সমগ্র ধর্মীয় সংস্কৃতি যে-মাতৃরূপের সামনে অবনত, খ্রীষ্টীয় সংস্কারে যিনি সর্বোচ্চ মাতৃত্বের প্রতীক, সেই মানবপুত্রের কুমারী জননীর সঙ্গে নিবেদিতা সারদামাতার সাদৃশ্য দর্শন করেছেন। এতে শ্রীমায়ের অপার্থিব চরিত্রমহিমার কিছু আভাস মেলে। মেরী ও সারদা উভয়ের মধ্যেই নিবেদিতা 'অপ্রতিরোধী সহন' দেখেছিলেন।[৭৫] আরও গভীর সত্তায় উভয়ের ঐক্য দেখেছেন—তার সর্বোত্তম রূপ প্রকাশিত হয়েছে সারদা-দেবীকে লেখা ১১ ডিসেম্বর ১৯১০, চিঠিতে। সারা বুলের জন্য বস্টনের এক গির্জায় প্রার্থনা করার সময়ে নিবেদিতার মনে মেরীমাতার স্থানে ভেসে উঠেছিল সারদামাতার রূপচ্ছবি। তিনি গির্জা থেকে ফিরে তাঁর ডায়েরীতে লেখেনঃ 'গির্জায় গিয়াছিলাম। সারদাদেবীকে আমার মেরীমাতা বলিয়া মনে হইল।'[৭৬]

পত্রটির পটভূমিকায় কিছু হৃদয়গ্রাহী সংবাদ আছে।

সারদাদেবী প্রথম থেকেই সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাকে অবিচ্ছেদ্য স্নেহে বেঁধে ফেলেন। দেবমাতা ও ক্রিস্টিন এই দুই বিদেশিনীও তাঁর গভীর স্নেহলাভ করেছেন। নিবেদিতা তাঁর পত্রে বার বার এই সব বিদেশিনী কন্যাদের প্রতি মাতাদেবীর ভালবাসার কথা বলেছেন। 'মাতাদেবী বললেন, ধ্যানের সময়ে তিনি সারাকে তাঁর বামে এবং জয়াকে [মিস ম্যাকলাউড] তাঁর সামনে সারাক্ষণ দেখছেন।'[৭৭] 'মাতাদেবী এখন কাছাকাছি বাস করছেন; সর্বদাই সারা ও জয়ার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তোমার [সারার] জন্য ভালবাসা ও আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন।'[৭৮] 'মাতাদেবী গতরাত্রে প্রগাঢ়ভাবে তোমার [মিস ম্যাকলাউড] কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। তোমার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা।'[৭৯] 'মাতাদেবীকে বললাম তুমি [মিস ম্যাকলাউড]



শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা

১৩০৫ সাল : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

ফটো : মিঃ হ্যারিংটন ব্যবস্থাপনায় : মিসেস ওলি বুল

স্থান : বাগবাজার (বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার আবাস)

এখনও তাঁর কন্যা রয়ে গেছ। তারপর এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের সুমহৎ উক্তিও শোনালাম। মা আমার—মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি—কী যে মিষ্টি! সব সময়ই তোমাকে আশীর্বাদ।'[৮০] 'মাতাদেবী প্রায়ই তোমার [দেবমাতার] কথা বলে থাকেন। [তুমি যাবার পরে] প্রথম রাত্রে তোমার শূন্যস্থানটির দিকে গভীর ব্যথার সঙ্গে দেখালেন।'[৮১] এঁরাও সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছেন যাতে মাতাদেবীর কৃচ্ছ্র-কঠোর জীবনে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য আসে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে, নিবেদিতা কয়েকটি চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে—শ্রীমায়ের খরচ, তাঁর জন্য একটি আবাসভবন নির্মাণের বিষয় আলোচনা করেছেন।[৮২] সারা বুলের সঙ্গেও তিনি একই ধরনের আলোচনা করেছেন, তার বিশেষ কারণ, সারা এই সময় থেকে মাতাদেবীর জন্য নিয়মিত অর্থসাহায্য করতে থাকেন। (এই সাহায্য এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য সারা বুলকে রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম রসদ্‌দার মনে করা হয়।)

১৯১০ সালে মিসেস বুল যখন শেষ অসুখে শয়ান তখন মাতাঠাকুরানীর মাতৃ-হৃদয় বিচলিত হয়েছিল, তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে বার বার সারা মেয়ের খবর নেন, এমনকি তাঁকে চিঠি লেখেন পর্যন্ত। দুর্লভ সেই পত্রটির প্রতিলিপি আমরা পেয়েছি। যেটি মায়ের হয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন। সেই ইংরাজী চিঠির শেষে মা বাংলায় মস্ত আকারে 'মা' শব্দটি লিখে দিয়েছিলেন।

২৮ জুলাই ১৯১০ তারিখের ঐ পত্রের সঙ্গে নিবেদিতা ঐদিন সারাকে নিজেও চিঠি লেখেন। তার মধ্যে ছিলঃ 'প্রিয় মাতাদেবী তোমার নিরাময়ের জন্য উৎকণ্ঠিত। আজ সকালে তোমাকে চিঠি লিখবেনই। সারা সপ্তাহ ধরে তোমাকে টেলিগ্রাফ করতে চাইছেন; যদিও [সেটা তাঁর পক্ষে অতীব ব্যয়সাধ্য হবে এই ভেবে] আমরা কিন্তু কিন্তু করছি। জানই তো তাঁর কাছে ১৫ কি ২০ ডলার কত বেশি টাকা। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ও টাকাকে সদ্ব্যবহার মনে করতে প্রস্তুত।

'লখিদিদি [লক্ষ্মীদেবী], শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি, এখানে আবার এসেছেন, আর দক্ষিণেশ্বর ও অতীতের ঘটনার কথা অবিরাম চলেছে। কী অপূর্ব কাণ্ড তার ফলে চলেছে, বুঝতেই পারো।'

সারা বুলকে পাঠানো মায়ের চিঠিতে ঠিকানা ছিল—১২, গোপাল চন্দ্র নিয়োগী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। তারিখঃ ২৮.৭.১৯১০। চিঠিটি অনুবাদে এইঃ 'মা, তুমি খুবই অসুস্থ, একথা শুনে খুবই চিন্তায় আছি। তোমার কন্যা নিবেদিতার কাছে শুনলাম, তুমি এখন একটু ভাল আছো। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তোমার দ্রুত রোগমুক্তির প্রার্থনা করি। তুমি ভালো হয়ে উঠলে আমার কত আনন্দ হবে কি বলব।

'আমি এখন এখানেই আছি। আমার সকল সন্তানই ভালো, কেবল যোগীন [যোগীন মা] নয়। তার শরীর তেমন ভালো নয়, সেজন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা আছে, আর ভারি দুঃখ পাচ্ছি।

'শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে তোমার হয়ে আমি তুলসী আর বেলপাতা দিয়েছি, আর

তিন সন্ধ্যা তাঁর সামনে বসে তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি। আমার জানতে ইচ্ছা হয়, জয়া [মিস ম্যাকলাউড] কি তোমার কাছে যাচ্ছে? তাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ দিও, আর ক্রিস্টিন যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে তাকে জানাতেও ভুলো না। তোমার এই অসুখের সময় তোমার মেয়ে [ওলিয়া] কাছে নেই, একথা জেনে খুবই দুঃখ হল।

'এখন এইসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পূজার সময় নিবেদন-করা পুষ্পচন্দন তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। আমার গভীর ভালবাসা আশীর্বাদ অনুভব করো। তোমাকে খুব ভালবাসি, অন্তর থেকে আশীর্বাদ করি। তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আছি, তবু যেন সদাই মনে হয়, তুমি কাছেই আছো।

তোমার মা।' [৮৩]

নিবেদিতা মায়ের এই পত্রের উল্লেখ করে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখে সারাকে লিখেছেনঃ 'অনেক আগেই তুমি প্রিয় মাতাদেবীর চিঠি পেয়ে গেছ। তোমার কথা তিনি অবিরাম জিজ্ঞাসা করেন। পূর্ণ বিশ্বাসের দর্পণ তিনি—যদি কাউকে একবার ভালবেসেছেন, সে ভালবাসা চিরদিনের জন্য—এই তাঁর জীবন সত্য।' [৮৪] কেবল গুরুতর অসুস্থতাই নয়, সারা বুলের জন্য প্রার্থনার অন্য বিশেষ কারণ উপস্থিত হয়েছিল। যে সারা বুল তাঁর আত্মস্থ বুদ্ধির জন্য সুপরিচিত ছিলেন, তিনি এই পর্বে বিচিত্র রহস্যবাদী ভাবনা-কল্পনার প্রকোপে পড়েছিলেন, ফলে তাঁর উজ্জ্বল চিত্তে অপচ্ছায়াপাত হয়েছিল। নিবেদিতা চেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও বিবেকানন্দের আশীর্বাদে যেন সেই অন্ধকার কেটে যায়। এর জন্য নিবেদিতাকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়, এবং সেই কঠোর সংগ্রামে, বহুল শক্তিক্ষয় করে, তিনি জয়ী হয়েছিলেন—মৃত্যুর আগে সারা বুলের চেতনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল। এমনই মনঃশক্তি প্রয়োগের কালে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লেখেনঃ 'সারার জন্য প্রার্থনা করো, তাঁকে ভালোবাসো, বিশ্বাস রাখো তাঁর উপর, বিশ্বপ্রবাহ বইয়ে দাও তাঁর দিকে, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে তাঁর দিকে তাকাও, কিংবা যুক্ত করো মাতাদেবীর ভাবনাকে তাঁর সঙ্গে।' [৮৫]

এর আগেই নিবেদিতা তাঁর অধুনা-খ্যাত ১১ ডিসেম্বর ১৯১০ তারিখের পত্রটি সারদাদেবীকে লেখেন। গদ্যে লেখা এই পত্রটি অখণ্ড গীতিকবিতা ছাড়া কিছু নয়। নিসর্গ-প্রেমিকা নিবেদিতা—প্রকৃতির স্নিগ্ধতম মধুরতম প্রকাশগুলিকে চয়ন করে তাদের দ্বারা মাকে সাজিয়েছেন। ঠিকভাবে বলতে গেলে তাদের সাহায্যে মায়ের স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাই বলে এমন যেন মনে করা না হয়, নিবেদিতা কতকগুলি অলংকৃত বাক্য রচনা করতে ব্যস্ত ছিলেন। না। তিনি শ্রীমায়ের অস্তিত্বের গভীর সত্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন কোমলতম অনুভূতির তুলিকায়, এবং আমরা স্বীকার করব, তিনি যে-সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, এখনও তা অন্যের অনায়ত্ত। নিবেদিতা লিখেছিলেন—মৌনের মহাসঙ্গীত।

অননুকরণীয় পত্রটির উপযুক্ত অনুবাদ অসাধ্য, তবু অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন। ঈষৎ পরিবর্তনসহ সজনীকান্ত দাসের অনুবাদটি উপস্থিত করছিঃ 'আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গির্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ী, হাতের বালা, সবকিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম, অভাগী সারার রোগের ঘরটিকে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ। আর মাগো, জানো কি, ভাবলাম সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময়ে তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা করে কি বোকামিই করতাম। কেন বুঝিনে যে, তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাটাই সব—সব কিছু! মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা। সেই যে রবিবারটি কয়েকমাস আগে, পূণ্যভরা সেই দিনটিতে গঙ্গাস্নান সেরে ছুটে তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য, তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে, আর কি যে শান্তি আর মুক্তি বোধ করেছিলাম তোমার বাঞ্ছিত আবাসে! প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে! সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ যারা নিঃসহায়। আমরা তোমার কাছে খুব শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করবার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বই কি! সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।

'বেচারা সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিও। রাগদ্বেষের অতীত সমুচ্চ শান্তিতে সমাহিত থাকে নাকি তোমার ভাবনা! তা কি পদ্মপাতায় শিশির-বিন্দুর মতো ভগবানের বুকের শিহরিত ভালবাসা নয়—যা পৃথিবীতে স্পর্শ করে না কখনো!

প্রিয়তমা মা আমার, তোমার চিরকালের বোকাখুকী,

নিবেদিতা।'[৮৫]

॥ ৯ ॥

তিনি চির আশ্রয়

উপরের পত্রে সারদামাতা সম্বন্ধে নিবেদিতার চরম কথাটি পেয়ে গেছি। এখন মাতাদেবীর জন্য নিবেদিতার ব্যাকুল ভালবাসার কথাগুলি দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করব।

সারদাদেবীর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ের পরে মিস ম্যাকলাউড তাঁকে 'মা' বলে ডাকতে বলেন—তখন নিবেদিতার বুকে ব্যথার মোচড় লেগেছিল—এঁকে মা বলব, কিন্তু তাতে কি আমার নিজের জননীর ঠাঁই হারিয়ে যাবে না আমার মন থেকে?[৮৭] না, নিজের মা হারিয়ে যাননি—নিবেদিতা অবিলম্বে বুঝেছিলেন, নিখিল জননীর অন্দরমহলে তাঁর নিজ জননীর ভালবাসার আসন আগে থেকেই পাতা আছে। শ্রীমায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটিকে নিবেদিতা নিজ জীবনে মহালগ্ন বলে মনে করতেন বলে পরবর্তীকালে এই দিনকে নিবিড় আবেগে স্মরণ করেছেন। 'আগামীকাল সেন্ট প্যাট্রিক দিবস।...এক বছর আগে এই দিনটিতে আমরা সকলে মাতাদেবীকে দর্শন করেছি। তুমিই [মিস ম্যাকলাউড] আমাকে ঐ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলে।'[৮৮] 'জানো, আজ থেকে ঠিক ৬ বছর আগে আমি মাতাদেবীর চরণদর্শনে গিয়েছিলাম।'[৮৯]

মায়ের কাছে আশ্রয় পাবার পরে নিবেদিতা নামক মায়ের ছোট্ট খুকিটি মায়ের কাছে কেবলই ঘুরঘুর করতেন। 'আমি একাদশী করছি মজা করে', নিবেদিতা, ১৮ জুন ১৮৯৯, লিখেছেন, 'সাদা শাড়ি পরেছি—আর সারাদিন মায়ের কাছাকাছি আছি।'[৯০]

১৮৯৯-এর মাঝামাঝি পাশ্চাত্যে গিয়ে নিবেদিতা ১৯০২-এর সূচনা অবধি সেখানে থাকেন। এই কালের চিঠিপত্রে তিনি মাতাঠাকুরানীর সংবাদের জন্য এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে মনে হয়, তাঁর কাছে শ্রীমা যেন অসীম সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মাস্তুলদণ্ড, যেখানে সমুদ্রপাখি ফিরে যায় সন্ধ্যার আশ্রয়ের জন্য—সারাদিনের পাখামেলা সন্ধানের পরে।

'তুমি যথাসময়ে [কলকাতায় গিয়ে]...মাতাদেবীর কাছে যেতে পারবে', নিবেদিতা ২৫ ডিসেম্বর ১৯০০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, 'আমার কি যে ভালো লাগছে তা ভাবতে!'[৯১] 'কী কাণ্ড! তুমি ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে মাতাদেবীকে দেখবে। ভাবতেও অপূর্ব লাগে।'[৯২] 'অনেকদিন ধরে মাতাদেবীর জন্য উদ্বিগ্ন। ...তাঁর কাছে ফিরে যেতে খুবই ব্যস্ত।'[৯৩] 'তোমার গতবারের চিঠি পড়লাম। মাতাদেবী জোর দিয়ে বলেছেন—আমাকে ফিরে যেতেই হবে। পড়ে খুবই আনন্দ হল। সারা [মিসেস বুল] যদিও উল্টোকথা বলেছেন তবু ধরে নেওয়া যায়—আমি বেরিয়ে পড়েছি।'[৯৪] 'মাতা-

দেবীর কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মনপ্রাণ ব্যাকুল।'[৯৫] 'শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে পারলে খুশি হব। তোমার মতোই আমি অনুভব করি, মাতাদেবীর ইচ্ছা সব সময়েই ধ্রুব।'[৯৬] 'বিশেষ করে আমি মাতাদেবীর জন্য উদ্বিগ্ন। শুনেছি তিনি বড় রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছেন।'[৯৭] 'সারদাদেবীর আবাসে ফিরে যেতে কী যে ব্যাকুল, কি করে বোঝাব? যত সব আজে-বাজে কাজ নিয়ে আছি।'[৯৮] 'স্বামীজী ও মাতাদেবীর কাছে ফিরে যেতে চাই—আমার আকাঙ্ক্ষা তাতে কেন্দ্রীভূত।'[৯৯]

পরবর্তীকালে নিবেদিতার চিঠিতে শ্রীমায়ের দর্শন-অদর্শনের আনন্দ-বেদনার ঢেউ ওঠাপড়া করেছে। ২০ জানুয়ারি ১৯০৩, লিখেছেনঃ 'সেন্ট ডোরাকে বলো, মাতাদেবীর সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।'[১০০] ২৩ এপ্রিল ১৯০৩, লিখেছেনঃ 'এখনো মাতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। কিছু একটা সারাক্ষণই বাধা দিয়ে যাচ্ছে।'[১০১] 'মাতাদেবী সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে কলকাতায় আসছেন, আশা করা যায়। স্বামী সারদানন্দ মনে করেন, তিনি আর আমাদের ছেড়ে যাবেন না। তাঁর আশা যেন সার্থক হয়।'[১০২] 'তোমার কথা মাতাদেবী সব সময়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে নিরন্তর ভালবাসা ও আশীর্বাদ পাঠান। মাতাদেবী—আমাদের চিরকালের মা-ই আছেন—সেই অনির্বচনীয় মহিমা আর মাধুর্যের নির্ঝর।'[১০৩] 'গতকাল মাতাদেবী আমাকে দেখতে এসেছিলেন। [নিবেদিতা গুরুতর অসুস্থতার পরে তখন নিরাময়ের পথে।] আমার বিপন্মুক্তিতে কত না খুশি। এমন ভালবাসায় ভরা মুখ আমি কোথাও দেখিনি।'[১০৪] 'মাতাদেবী একেবারে পাশের পাড়ায়', নিবেদিতা দুঃখ করে লিখেছেন, 'কিন্তু রোজ যেতে পারি না, এত কাজের চাপ।'[১০৫] 'মাতাদেবীকে অল্পবয়সী দেখায়, আনন্দময়ী, সারাক্ষণ কাজ করছেন, অথচ বয়স ৬৫ [৫৫]-এর বেশি। আমাকে তাঁর থেকে বুড়ি দেখায়, অথচ আমার বয়স পঁয়তাল্লিশও নয়।'[১০৬] 'সন্ধ্যায় যখন মাকে ঘিরে মেয়েরা বসে থাকেন, তখন তাঁর কাছে যেতে খু-ব ভালো লাগে। মায়ের গলার স্বর ১১ বছর আগে যা শুনেছি তেমনি তারুণ্যময়, হাসি তেমনি আনন্দভরা, প্রতিটি ভাবভঙ্গি, নড়াচড়া মনোহারী। মাথায় একটুও পাকা চুল নেই।'[১০৭] 'গতকাল মাতাদেবী দীর্ঘ তীর্থযাত্রার পরে কলকাতায় ফিরেছেন,' সংকোচ আর অবুঝ অভিমানের আলোছায়াভরা ভাষায় নিবেদিতা লিখেছেন, 'আমি এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। এই শান্তিটুকু পেয়ে মনে হয় তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।'[১০৮]

মায়ের বাড়িতে এমন কি ছিল যে, সেখানে উপস্থিত হবার জন্য নিবেদিতার অমন হৃদয়াবেগ? নিবেদিতা সেটি একবার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেনঃ 'আহা, মায়ের বাড়িতে এত মাধুর্য! যদি কেউ সেখানে দিনের কাজ আরম্ভ করার আগে কোনো প্রয়োজনে হাজির হয়, তাহলে সেখানে কত না উত্তপ্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদ পায়।'

না, এটা মূল কথা নয়। সেটা কি, নিবেদিতা তারপরেই লিখেছেনঃ '"তোমার কাছে কিছু চাই না—তুমি এসেছ, আহা কি সুন্দর!"—এই ভাবটি সেখানে ভরে আছে। ও জিনিস অনির্বচনীয়।'[১০৯]

নিবেদিতা দেখেছিলেন—মাতাদেবী সহস্র কাজে লিপ্ত থেকেও কী নির্লিপ্ত! যখন মনে হচ্ছে তিনি বস্তুমগ্ন, তখন যথার্থত তিনি আত্মমগ্ন। তার একেবারে ফটোচিত্রই রয়েছে—নিবেদিতার সঙ্গে মায়ের ফটোটি দেখলেই তা বোঝা যায়। তাতে দেখি, মা নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে আছেন, কী গভীর স্নেহ তাঁর নয়নে। কিন্তু সত্যই কি তিনি নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন? দ্বিতীয় নজরে দেখি—মায়ের চোখে অসীম সুদূরতা, সেখানে কোনও নির্দিষ্টতা নেই। মায়ের অন্যান্য যেসব ফটো পাওয়া যায়, সেগুলি যে-কেউ পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন—সর্বত্রই আছে দুটি নিশ্চয়-লক্ষণ—আশ্চর্য অতল শান্তি এবং দূরপ্রসার—যা অন্তর্মগ্নতার অপর রূপ।

শ্রীমায়ের এই স্বভাবলক্ষণ নিবেদিতা বার বার নিকট থেকে দেখেছেন। মা ভালবাসতেন গভীরভাবে, মৃত্যুতে কাঁদতেন—কিন্তু সে কান্না নিত্যপ্রেমের করুণাবৃষ্টির মতো, আসক্তিতে কর্দমাক্ত হত না। স্বামী যোগানন্দের মৃত্যুকালীন ঘটনার কথাই ধরা যাক। যোগানন্দ মায়ের মন্দিরের প্রথম প্রহরী, মায়ের একেবারে সন্তানের মতো—তাঁর মৃত্যুতে মা দারুণ শোকার্ত হলেন। যোগানন্দকে দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন, নিবেদিতা বর্ণনা করেছেনঃ 'অকস্মাৎ উপরতলা দীর্ঘ ক্রন্দনে আকুল হয়ে উঠল —নীচে পূজার শব্দের সঙ্গে মিশে তা ছড়িয়ে পড়ল। পুরবাসিনীরা বুঝেছিলেন—এতদিন যিনি এই গৃহের কর্তা ছিলেন, তিনি চিরতরে চলে যাচ্ছেন। যোগীন-মার তুষারশীতল শুদ্ধতা টুটে গেল। মনে হল, তাঁর ও মায়ের বুক বুঝি ফেটে গেল।'[১১০]

নিবেদিতা আর একটি চিঠিতে লিখেছেনঃ 'মাতাদেবী মৃত্যু কথাটি যেন সইতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা। "জানি, জানি, সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সেকথা জানি—কিন্তু সে যে আ-মা-র যোগীন—তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন।"'[১১১]

অপরূপ শেষ বাক্যটি—একদিকে রয়েছে অনন্ত সাগরের ব্যঞ্জনা, বারিবিন্দু ফিরে গেছে নিজের সমুদ্রে—'যোগীন গেছে আমার প্রভুর কাছে।' অন্যদিকে সেই সাগরে উঠেছে মাতার অভিমানভরা দীর্ঘশ্বাসের ঢেউ—'কিন্তু সে যে আ-মা-র যোগীন।'

ঠিক একইকালে আর একটি মৃত্যু-কথা নিবেদিতা বলেছেন—সে বিবরণে দেখিঃ অনন্যমৃত্যুর আশীর্বাদ শ্রীমা দিয়েছিলেন, একটি নচিকেতা বালককে। সে বর্ণনাটি পড়ে মনে হয়, শ্রীমা যেন নিজের একটি বালক-সন্তানের সঙ্গে খেলা করছিলেন একটি দ্বার খুলে দিয়ে, অন্য দ্বারে দাঁড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন। নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'সদানন্দের মুখে আর একটি মুমূর্ষু বালকের কথা শুনলাম। মা তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। "তাহলে কি আমার মৃত্যু নিকটে?" ছেলেটি বলেছিল। "মায়ের আদেশ"—এই বলে ওঁরা কথা এড়িয়ে গেলেন। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বলল—"নিশ্চয়ই। মাকে আমার প্রণাম। তাঁর কথা তো শুনতেই হবে। আপনারা আমাকে নিয়ে চলুন।" তখন ওঁরা শয্যাশুদ্ধ তাকে বাইরে আনলেন। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নতনেত্রে চেয়ে রইলেন। ত্রিগুণাতীত তার সারা গায়ে গঙ্গা মাটিতে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ, তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার নাম লিখতে লাগলেন। ছেলেটি সেই লেখা দেখতে-দেখতে বলল—"ওসব নাম মুছে একটি নাম রাখো—আমি ঐ নামটি

নিয়েই এতদিন বেঁচেছি—মরণের সময়ে ঐ নামটি নিয়েই যাব।" যখন তাই করা হল তখন সে মায়ের দিকে তাকালো বিদায় নিতে। তারপর সকলে তাকে বয়ে নিয়ে চলে গেল। সারাপথ সে চমৎকার কথা বলল। নদীতীরে পৌঁছানোমাত্র—মৃত্যু।'[১১২]

এমন সংসক্তি ও বৈরাগ্যের যুগ্মলীলা কি শ্রীমায়ের জীবনের সাধারণ সত্য নয়? শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময়ে শ্রীমা তারকেশ্বরে গিয়েছিলেন 'হত্যা' দিতে। দুদিন নিরম্বু উপবাসে কাটল—দেবতার দয়া নেই। তৃতীয় দিন গভীর রাত্রে ইঙ্গিত এল এবং কী ভীষণ! 'এমন সময় [তিনি] একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন—সাজানো অনেকগুলি হাঁড়ির একটার উপর আঘাত করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া দিলে যেমন আওয়াজ হয়, এ যেন সেই রকম। ঐ শব্দে জাগিয়া উঠিয়াই সহসা শ্রীমায়ের মনে হইল, "এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি?"'[১১৩]

গোপালের মার মৃত্যুশয্যার ঘটনার কথাও স্মরণ করতে পারি। গোপালের মা নিবেদিতার বাড়িতে আছেন, তাঁর দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে শ্রীমা এসেছেন (ধরে নিতে পারি, নিবেদিতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন)। গোপালের মাকে যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা' বলেছেন, তাই শ্রীমা তাঁর বৌমা; শ্রীমায়ের তিনি অসীম ভক্তির পাত্রী। শ্রীমা গোপালের মার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলে বৃদ্ধা ক্ষীণস্বরে বললেনঃ 'গোপাল এসেছ?' এই বলে হাত বাড়িয়ে কি যেন চাইলেন। গোপালের মা চাইলেন—শ্রীমায়ের চরণধূলি—মাকে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে সেই মুহূর্তে অভেদরূপে দর্শন করেছেন। পূর্বে যা ছিল অসম্ভব কাজ—এখন তাই করলেন শ্রীমা—পদধূলি দিলেন তাঁকে—কারণ এখন আর তিনি 'বৌমা' নন, বিশ্বমাতা; লৌকিক নন, লোকোত্তর।

নিবেদিতার চরম ও পরম কামনা—তিনি যেন মাতাদেবীর ভুবনে উন্নীত হতে পারেন। মৃত্যুর বছরখানেক আগে একটি চিঠিতে সেই কথা লিখেছেনঃ 'যদি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য চলে যাই, তাহলে আমার বন্ধুরা যেন দুঃখ না করে, কেননা আমি অবিলম্বে ধ্যান শুরু করে দেব, আর চেষ্টা করব—মাতাদেবী যে অপূর্ব ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করেন সেখানে পৌঁছতে। আহা-হা! তাঁর মতো মধুরিমা আর স্নিগ্ধশান্তি, সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার গহন গভীরতা ও স্নেহ—কল্পনাতীত! কী অসাধারণ জীবন তাঁর—পূজার ব্যাপক বিধিব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান—যে পূজা তাঁরই স্বামীর—যার আয়োজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যরা করে দেন। স্বামীকে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর বলে পূজা করেন, তবু অতিরিক্ত আছে তাঁর জন্য গভীর মানবিক স্নেহ—কোমলতা। "তাঁকে দেখেই ছিল আমার সুখ"—একরাত্রে মাকে বলতে শুনলাম। এমন জীবন যাপন করে তিনি যেন পদ্মপত্রের উপরে জলবিন্দু হয়ে উঠছেন—পৃথিবীকে সকল বিন্দুতে স্পর্শ করে আছেন, কিন্তু তার দ্বারা পরিবর্তিত বা প্রতারিত নন—দিব্যানন্দে পরিপূর্ণ।'[১১৪]

নিবেদিতার মতো নারী যাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ভারত ও মানবজাতির দ্বারা অধিকৃত, যাঁর নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর ছিল না এমনই কর্মে পূর্ণ—তিনি ১৯ নভেম্বর ১৯০৯ তারিখে লিখেছেনঃ 'মাতাদেবী দুদিন আগে তাঁর গ্রামে গেছেন। ফলে সবকিছু শূন্য।'

এই সময়ের কিছু-বেশি সাড়ে পাঁচ বছর আগে নিবেদিতা লিখেছিলেনঃ 'মাতাদেবী এখন এখানে আছেন। সেই একই মা। তিনি যখন এখানে থাকেন আমাদের আশ্রয় থাকে।'[১১৫]

লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকের কথাটি নিবেদিতা লিখে গেছেন।

পঞ্চপ্রদীপে মাতৃদর্শন

পাঁচটি চিত্র।

প্রথম চিত্র।

বেলুড় মঠে এক প্রাচীন সাধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল এক ভক্তের। ভক্তটি চিরকুমার আকৈশোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে যুক্ত। দীক্ষিত। নানাভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর, সঙ্ঘ এবং সাধুদের সেবা করে থাকেন। কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান।

কথায় কথায় ভক্তটি বললেন ঐ সাধুকেঃ আর মহারাজ, কিছুই তো হল না।

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন সাধুটি। 'এমন কথা মনেও স্থান দেবে না। একটা জিনিস সবসময়ে মনে রাখবে। অন্য অনেক জায়গায় (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বাইরে) অনেক সাধু আছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই বড়। কিন্তু তাঁরা কেউই সাক্ষাৎ জগজ্জননীর কৃপা লাভ করেননি—যা তোমার গুরুদেব লাভ করেছেন। যা পেয়েছ তা ধরে পড়ে থাক।'

ভক্তটি একাধিকবার সজল নেত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন এই রচনাটির লেখকের কাছে। বলেছেনঃ জানেন, মহারাজের কথায় সেদিন থেকে আর একটু ভালবাসতে শিখলাম গুরুদেবকে। আর এই ভাবটা হৃদয়ে বদ্ধমূল হল যে, মা সাক্ষাৎ জগজ্জননী।

দ্বিতীয় চিত্র।

ঐ প্রাচীন সাধুর কাছে এসেছেন একটি তরুণী। নানান সমস্যা তাঁর। বলছেন আর কাঁদছেন। কাঁদছেন আর বলছেন। সাধুটি স্থিরভাবে সব শুনে চলেছেন।

সব শুনে সাধুটি বললেনঃ একটা কাজ কর। সোজা মায়ের মন্দিরে চলে যাও। এখন নিরিবিলি আছে। এখানে যা যা বললে, যেমন করে বললে, ঠিক তেমন করে এই কথাগুলি মাকে গিয়ে বলে এস।

সেই তরুণীটির ঐ সমস্যাগুলি দূর হয়েছিল বছরখানেকের মধ্যে। দূর হয়েছিল ধীরে ধীরে, আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক কিছু ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যাঁরা সমস্যাগুলির জটিলতা জানতেন, তাঁদের কাছে মনে না হয়েই পারে না যে, সেগুলির সমাধান ছিল সত্যিই অভাবনীয়।

বলা দরকার, যে-প্রাচীন সাধুটির কথা বলা হল তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত।

তৃতীয় চিত্র।

ইনিও একজন প্রাচীন সাধু। আবাল্য মায়ের সেবা করেছেন। এখন শরীরের বয়স আশির কোঠায়। কিন্তু চলায়-ফেরায়, শারীরিক পটুত্বে, তাঁর অর্ধেক বয়সের লোকেদের লজ্জা দেন। অনেকদিন পরে মঠে এসেছেন। মঠ-অফিসে বসে কথা হচ্ছে উপস্থিত সাধুভক্তদের সঙ্গে। একটু পরে উঠলেন। বেরোবেন দীর্ঘ সফরে। কয়েকটি রাজ্য ঘুরবেন। পিছন থেকে বললেন একজনঃ মহারাজ, অনেক দূরের পথ। একা

যাবেন না। হনহন করে চলতে চলতে উত্তর দিলেন মহারাজঃ একা তো নই। সঙ্গে মা আছেন।

চতুর্থ চিত্র।

এক জায়গায় উৎসব। এক প্রবীণ সাধু এসেছেন সেই উপলক্ষে। তাঁকে ঘিরে সাধুভক্তদের মজলিস বসেছে। মণ্ডলীর এক পক্ষ গুণগান করছেন ঠাকুরের। অন্য পক্ষ মহিমাকীর্তন করছেন মায়ের। জমে উঠেছে আপসে এই মধুর কলহ। হঠাৎ একজন জিজ্ঞাসা করলেন সাধুটিকেঃ মহারাজ আপনি কি বলেন?

—আহা বেশ তো চলছিল। আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

—তবু একটু কিছু বলুন না মহারাজ।

—কি বলব বল তো? আমি তো দেখি (পরিধেয় বস্ত্রের একটি প্রান্ত কোমরের ডানদিক থেকে কোনাকুনি টেনে বাঁদিকের কাঁধে ফেলার ভঙ্গি করে) এমনটা করলেই—বাবা। আর (কাপড়টি একই ভঙ্গিতে ছড়িয়ে গায়ে দিয়ে মাথায় ঘোমটা তোলার ভাব করে) এমনটি করলেই—মা। কোন তফাৎ তো দেখি না।

সভা স্তব্ধ। মুহূর্তে সকলের মন ভরে গেল এই সিদ্ধান্তে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন।

পঞ্চম চিত্র।

এক সাধু। ইনিও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক। পরে সাধারণ সম্পাদক। (আরও পরে তিনি সঙ্ঘগুরু পদে বৃত) প্রথম দুটি পদে ঐ পূজ্য সাধুটি থাকাকালে বহুদিন এই লেখকের সৌভাগ্য হয়েছে, বেলুড় মঠের মন্দিরগুলিতে তাঁর প্রণাম করা দেখার।

সত্যি কী সুন্দর সেই প্রণাম! বিশেষ করে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম। ঐ তো ক্ষীণতনু এক সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রণামের সময় সেই তনু, প্রণামের সময়কার সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ সব মিলে যেন এক অনন্য ধ্রুপদী কারুকলা। সামনে গঙ্গা। প্রভাতী মধুর বাতাস। মন্দিরে মা আর মায়ের ছেলে। কোথায় সেই সর্বজনমান্য সন্ন্যাসী! কোথায় তিনি, আপাতদৃষ্টিতে যাঁর উপর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বিশ্বব্যাপী কর্মধারার সর্বোচ্চ দায়িত্বভার ন্যস্ত! এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল হৃদয়কে এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় যে, এই সঙ্ঘের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ-শক্তি মা। তিনিই সমগ্র সাধুমণ্ডলী ও ভক্তমণ্ডলী সহ এই সঙ্ঘকে ধারণ ও পালন করছেন। অন্যরা মায়ের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সঙ্ঘের সেবা করছেন।

এই পাঁচটি চিত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে পাঁচটি বীজ। একঃ শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ জগজ্জননী। ব্রহ্মশক্তি। যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। দুইঃ তিনি আমাদের মা। আমাদের সবচেয়ে আপনজন। সুখদুঃখের সব কথা যাঁকে বলা যায়। যাঁর কাছে প্রাণভরে কাঁদা যায়। নির্দ্বিধায় সব চাওয়া যায়। তিনঃ তিনি সর্বদা সন্তানের সঙ্গে থাকেন। আমাদের সব ভার নিজের হাতে তুলে নিতে যিনি সর্বদা প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। চারঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন। পাঁচঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি মা। (আইনের চোখে যার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ভাবের চোখে যার পরস্পর-পরিপূরক দুই মহাকেন্দ্র—শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ, বেলুড় ও শ্রীসারদা-মঠ, দক্ষিণেশ্বর। দুই-ই চালাচ্ছেন মা।)

শ্রীশ্রীমা কে, শ্রীশ্রীমা কি, কি তাঁর স্বরূপ, কেন তাঁর মাতৃলীলা—এ সম্পর্কে নিগূঢ় সাধারণ সূত্রগুলি দিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানেরা। তাঁদের ঐসব উক্তি, স্তব ও স্তোত্রগুলির উপর ভবিষ্যতে না জানি কত ভাষ্য-টীকা রচিত হবে। এঁদের সব কথার সার বোধহয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু মাতৃভাব-সাধনাই করেননি বা মাতৃভাব প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেননি। সর্বকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন মাতৃভাবের এক অনুপম বিগ্রহ। একটি মাতৃমূর্তি। সেই মাতৃমূর্তি—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের পর যে-সাধুরা এলেন তাঁরা শ্রীশ্রীমায়ের তাত্ত্বিক দিকটি সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন থেকেছেন। তাঁরা শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেছেন। অনেকে তাঁর কাছে দীক্ষালাভ করেছেন। তাঁর সেবা করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের কাছে মায়ের কথা শুনেছেন। মায়ের প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ আচরণ লক্ষ্য করেছেন। সর্বোপরি পেয়েছেন মায়ের অপার ভাগবতী ভালবাসা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে মায়ের শক্তিকে, প্রভাবকে সক্রিয়ভাবে, সচেতনভাবে, সানন্দে স্বাগত জানিয়েছেন। বরণ করেছেন তাঁর শিক্ষা। নিজেদের সত্তাকে উন্মুক্ত করে মেলে ধরেছেন মাতৃশক্তির কাছে। ফলে, মা তাঁদের গড়ে নিয়েছেন মনের মতন করে। এঁদের দৃষ্টান্তগুলি না পেলে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবধারায় জীবনগঠনের আদর্শ বা 'মডেল' মিলত না। আমাদের পরম সৌভাগ্য, এঁদের অনেককে দর্শন-প্রণামের মূল্যবান সুযোগ হয়েছে আমাদের। তাঁদের পুণ্য সঙ্গপ্রভাবে শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-অনুধ্যান থেকে যে পাঁচটি বীজ হৃদয়ে ধারণা হয়েছে সেগুলির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এখন এই বীজগুলি ঐ সাধুরা কিভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন, কিভাবে সেগুলি তাঁদের জীবনে পুষ্পিত-পল্লবিত হয়েছিল, তাঁরা নিজেরা এ-বিষয়ে কি বলেছেন তার একটা আভাস, ঝলক বা 'ঝাঁকি-দর্শন' পাওয়ার চেষ্টা করা যাক। এখানে মাত্র পাঁচজনের কথা বলা হবে। চারজন সন্ন্যাসী ও একজন সন্ন্যাসিনী। এই নির্বাচন স্থানের কথা ভেবে এবং বক্তব্যকে একটু বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সাধু ও ভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিত এই পাঁচজন নিঃসন্দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের পরবর্তী প্রজন্মের উজ্জ্বল প্রতিনিধি। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় এঁরা ছিলেন অচলপ্রতিষ্ঠ। আর মা এঁদের দিয়ে সঙ্ঘের সেবা করিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। আমাদের লক্ষ্য, তাঁদের জীবনে মায়ের প্রভাব এবং মায়ের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাময় ভাবটি ধ্যান করা। তাঁদের কাছে মায়ের কথা শোনা। এই পাঁচটি জীবন যেন পঞ্চপ্রদীপ। তাঁদের সারাজীবনই যেন আরতি। এই পঞ্চপ্রদীপের আরতির আলোয় আমরা শ্রীশ্রীমাকে একটু দেখি। এই পাঁচজন হলেন স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ ও প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

স্বামী বিরজানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে দুই যুগের মধ্যে একটি সেতুর মতো। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সঙ্গ ও স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে উঠেছিল। বরাহনগর মঠের কাল থেকে তিনি সঙ্ঘভুক্ত, আবার রামকৃষ্ণ-সন্তানদের পরবর্তী যুগের গঠনে তাঁর ভূমিকা সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

অক্টোবর ১৮৯১।

স্বামী বিরজানন্দ (তখন তরুণ ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ) বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সঙ্গে আনন্দে বাস করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলশরীরে নেই কিন্তু তাঁর লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা আছেন জয়রামবাটীতে। মঠে তাঁর কত কথা হয়। তরুণ তাপসের হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগে মাতৃদর্শনলাভের। সুযোগও এসে গেল একদিন। জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজা হবে। স্বামী সারদানন্দ যাবেন সেখানে। সঙ্গে নিয়ে চললেন নবীন ব্রহ্মচারীকে।

'...শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে উপনীত হইলাম। মা আমার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন। আমাদের পাইয়া তাঁহার সে কি আনন্দ!' উত্তরকালে স্মৃতিচারণ করেছেন বিরজানন্দজীঃ 'কি করিবেন, কোথায় রাখিবেন, কি রান্না করিয়া খাওয়াইবেন যেন ভাবিয়া পান না! এইজন্য দিনরাত খাটিতে লাগিলেন। নানা ব্যঞ্জনাদি নিজ হাতে দুবেলা রাঁধিতে ব্যস্ত থাকিতেন...। মায়ের হাতের বাড়া ভাত ও তরকারী (মাছচাটুই যাহা ঠাকুর খাইতে খুব ভালবাসিতেন, কড়াইয়ের ডাল, পোস্ত-চচ্চড়ি, প্রভৃতি) বলিয়া এবং মা নিজে আরও খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন—এইজন্য প্রায় দ্বিগুণ খাইয়া ফেলিতাম। সে রান্না কি যে সুস্বাদু ও মিষ্ট লাগিত তাহা বলা যায় না। যেন... স্বর্গীয় কিছু : এখনও যেন মুখে লাগিয়া রহিয়াছে!'[১]

তখনকার মায়ের বাড়ির বাইরের দিকে একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল চারজনের। এই চারজন হলেনঃ স্বামী সারদানন্দ, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, হরমোহন মিত্র ও স্বামী বিরজানন্দ (কালীকৃষ্ণ)। ওদিকে জগদ্ধাত্রীপূজার আয়োজন চলছে। মায়ের যেন নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় নেই। ছেলেমানুষ বিরজানন্দজী মায়ের ফাইফরমাস খাটছেন। কখনও বা আঁকশি ও সাজি নিয়ে ফুল তুলে আনছেন নদীর ধার থেকে। বাকি সময় কাটছে ধ্যানজপ, গল্পগুজব, খাওয়া, বেড়ানো ও ঘুমে। আর দিদিমার কাছে ঠাকুরের পুরনো কত কথা শুনে।

জগদ্ধাত্রীপূজা হয়ে গেল নিষ্ঠার সঙ্গে। সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে। '...হঠাৎ পূজার ২।৩ দিন পর হইতে আমরা সকলেই (পূর্বোক্ত চারজন) ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম। ছোট্ট ঘরটিতে পাশাপাশি সকলে পড়িয়া জ্বরে কাঁপিতেছি ও ছট্‌ফট্ করিতেছি। মায়ের ভাবনাচিন্তার অবধি নাই। মাঝে মাঝে আসিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া খবর লইয়া যাইতেন। সে কি ভালবাসা ও করুণামাখা দৃষ্টি! মা কেবল বলিতেছেন, "মাগো, কি হবে, ছেলেরা সকলেই পড়ে পড়ে ভুগছে। এমন গাঁ যে দুধসাগুর জন্যও দুধ পাওয়া যায় না।" তিনি ঘটী হাতে করিয়া বাহির হইতেন, গাঁয়ের প্রতিঘরে যাহাদের গাভী আছে, তাহাদের কাছে ছেলেদের পথ্যের জন্য কাতরভাবে দুধভিক্ষা করিতেন। যাহার কাছ হইতে যাহা পাইতেন—একপোয়া আধপোয়া একছটাক—ঘুরিয়া ঘুরিয়া লইয়া আসিতেন।...

'যাহা হউক, আমরা সকলে কয়েক দিনে সারিয়া উঠিলাম ও অন্নপথ্য করিলাম। মা রোজ খিড়কী পুকুরে...জাল ফেলাইয়া মাছ ধরাইতেন ও মাছের ঝোল রাঁধিতেন।...

'মায়ের আদরযত্নে আমরা শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিলাম। আমরা থাকিলেই মার খাটুনি বেশী হইবে, তিনি আর কাহাকেও রাঁধিতে দিবেন না, লুচি ও নানারকম ব্যঞ্জনাদি নিজে প্রস্তুত করিবেন; দিনরাত ক্রমাগত খাটিয়া খাটিয়া নিজেও অসুখে পড়িতে পারেন, আর আমাদেরও জ্বরের পুনরাক্রমণ হইতে পারে, তখন মা ভীষণ উদ্বিগ্ন হইবেন—এই সব ভাবিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা শীঘ্র ফিরিবার দিন স্থির ও গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করিলাম। মা আর একটু সারিয়া বল পাইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বুঝাইয়া সম্মত করা হইল। খাওয়া দাওয়া করিয়া গরুর গাড়ীতে উঠিবার সময়...মা খিড়কি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুখ ফুলিয়া লাল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দিকে চাহিয়া ও তাঁহাকে ফেলিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছি মনে হওয়ায় আমাদেরও অন্তর গভীর বিষাদে ও ব্যথায় পূর্ণ হইল। সকলেই যেন চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন। সে কি করুণ দৃশ্য! আমি কিছুতেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। ...আমাদের গরুর গাড়ীগুলি ছাড়িল, মাও একটু দূরে দূরে থাকিয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন, বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ফিরিলেন না। তালপুকুর পার হইয়া গ্রামের বাহিরে বিস্তীর্ণ মাঠে পড়িলাম। গাড়ী হইতে যতদূর গ্রামের দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দেখিলাম, মা তালপুকুরের ধারে আমাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এমন অভাবনীয় ভালবাসা কি নিজের মাও বাসিতে পারেন? বাড়ীর মাকে তো খুব ভালবাসিতাম, তিনিও কত ভালবাসিতেন, কিন্তু এ যে জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা!

'শূন্য হৃদয় লইয়া বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলাম—শূন্য হৃদয়ই বা বলি কেমন করিয়া? মায়ের অপার্থিব ভালবাসা, প্রেমময়ী জগন্মাতার অসীম ভালবাসায় ভরা হৃদয় লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মায়ের কথা যাহা সামান্য শুনিয়াছিলাম, তাহাতে কে জানিত যে মা এইরূপ মা—এ রকম করিয়া মন প্রাণ কাড়িয়া লইয়া আপনার হইতেও আপনার করিয়া নিবেন। বাবাকে দেখি নাই বটে, মাকে ত পাইলাম। নির্গুণ অধম সন্তানের প্রতি কী অহেতুকী কৃপা, অহেতুকী ভালবাসা! যে না পাইয়াছে, যে মাকে না দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না।'[২]

আশ্চর্য ছবি! মূল্যবান নথি। এমন চিত্র যা অনাগত কালের সাধুভক্তরা ধ্যান করবেন। চিত্রটিতে মায়ের বাৎসল্যের যে ছবি আছে তার তুলনা মেলা ভার।

১৮৯৩। গ্রীষ্ম প্রায় শেষ।

শ্রীশ্রীমা আছেন বেলুড়ে। আলমবাজার মঠ থেকে বিরজানন্দজী একদিন গেলেন মাতৃদর্শনে। মা রাত্রে থাকতে বললেন। পরের দিন সকালে মঠে ফেরার আগে মাকে প্রণাম করতে গিয়েছেন। মা বললেন করুণামাখা স্বরেঃ 'বাবা, তোমায় দেখে আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হ'ল। তোমার কেমন গোলগাল শরীরটি ছিল, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এখন চেহারা কি রকম খারাপ হয়ে গেছে। ওরা সাধু ফকির মানুষ, তোমায়

কিই বা খাওয়াবে। তুমি বাড়ি গিয়ে থাক, ওষুধপত্র আর পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে শরীরটা সারিয়ে নাও। ...তাতেই ভাল হবে। ...[বাড়িতে] ধ্যান জপ পূজা পাঠ নিয়ে থাকবে।'[৩]

আদেশ শুনে তো বিরজানন্দজী কান্নায় ভেঙে পড়বার উপক্রম। বাড়ি গিয়ে থাক—অর্থাৎ সাময়িকভাবে হলেও পূর্বাশ্রমে ফিরে যাও। যে-কোন সাধুর কাছেই এ এক নিদারুণ আদেশ। পূজনীয় যোগীন মহারাজ তখন ছিলেন ঐ বাড়িতেই। তাঁকে সব কথা জানালেন গোলাপ-মা।

যোগীন মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন বিরজানন্দজীকে (তখনও তিনি কালীকৃষ্ণ)ঃ 'তোমার দীক্ষা হয়েছে?'

বিরজানন্দজীঃ 'না।'

পূজনীয় যোগীন মহারাজঃ 'তবে মাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন, কি ধ্যানজপ করবে। কাল সকালে স্নান ক'রে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।' পরের দিন সকালে মাকে প্রণাম করে বিরজানন্দজী নিবেদন করলেন যোগীন মহারাজের শেখানো কথা। তখন মা তাঁকে কৃপা করে মহামন্ত্র দান করলেন এবং নির্দেশ করলেন সাধনপ্রণালী। কিন্তু তিনি এতকাল যে-ভাব অবলম্বন করে ধ্যানচিন্তা করে আসছিলেন মায়ের প্রদত্ত সাধন-প্রণালী যে তা থেকে আলাদা! মাকে বললেন সেকথা।

মা শুনে বললেনঃ 'তার চেয়ে এই-ভাল।'[৪]

কী আশ্চর্য! মায়ের ঐ একটি কথায় বিরজানন্দজীর সব দ্বন্দ্ব কোথায় উড়ে গেল এবং মায়ের উপদিষ্ট ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। স্পষ্টতই মা আর এখন শুধু মা নন। তিনি এখন সন্তানের আধ্যাত্মিক জীবনের ভারও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন।

আবার বিদায়ের পালা। 'তখন বর্ষাকাল,...সন্ধ্যাবেলা— অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, টিপ টিপ ক'রে জল পড়ছে। ভরা গঙ্গা কুয়াসায় ঢাকা।' মাকে প্রণাম করে বিরজানন্দজী নৌকায় উঠলেন। নৌকা থেকে দেখতে পেলেন, '...মা ছাদের উপর থেকে গঙ্গার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যতক্ষণ নৌকা হতে দেখা গেল সেইরকম ভাবেই রয়েছেন দেখলুম। প্রাণের ভেতর বিষম আলোড়ন হতে লাগলো। পরে শুনেছিলুম মাকে বৃষ্টিতে ওইভাবে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোলাপ-মা তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় মা অশ্রুসিক্ত চোখে বলেছিলেন আহা কালীকৃষ্ণের মনে কতই কষ্ট হচ্ছে তাই ভাবছি ও তাকে দেখছি।'[৫]

মা ছেলেকে শরীর সারানোর জন্য পাঠালেন। কিন্তু দূর থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য কঠোর দৃষ্টি রেখেছিলেন। ছেলেও তাঁর সুখ-দুঃখের কথা অকপটে মাকে জানাতেন। এমনভাবে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে খুলে মেলে না ধরলে সেই শক্তি আধারের উপর কাজ করবে কিভাবে?

'মা, আমি তোমার...অকৃতী সন্তান। দেখুন মা, একজন লোক যদি অন্য কাহারও কাছ থেকে যত্ন আদর পায় তা হলে তাহার প্রতি স্বভাবতই একটা টান বা ভালবাসা

পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় যে আপনি মানুষ হয়ে এসে আমাদের কত অভাবনীয় যত্ন আদর ভালবাসা স্নেহ মায়া দয়া করিলেন তবুও পাপ মন আপনাকে ভালবাসিতে পারিল না। ...মা, আপনি আমায় আশ্বাস দিয়াছেন, "হবে হবে"। মা, তাহা ক্রমে ক্রমে হবে, না হঠাৎ একদিন হবে? ক্রমে ক্রমে হইলে তো এতদিনে (২।৩ বৎসরে) একটুও হ'ত। মা, নিজগুণে দয়া করুন। মঠের যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন কে আর তাঁর কৃপা ভিন্ন নিজের জোরে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন? আপনার যদি কৃপা থাকে তাহা হইলে অতি অকিঞ্চন যে আমি, আমিও কি সন্ন্যাসী হইতে পারিব না?...(স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের) মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) আপনার বিষয়ে বলিয়াছেন,—"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় রয় যায়॥" আপনি মনে করিলে সকলই করিতে পাবেন।'...

'মা, আপনার অপার করুণা—কেবল অবিশ্বাসের জন্য কতই ভাবিয়া মরি। মা, আপনাকে যেন কখনই না ভুলি। ...মা, আমার ভার সমস্ত তোমার উপর দিলাম। তুমি মা, আমায় হাত ছাড়া করিও না—তাহা হইলে আমি পড়িয়া যাইব। যে পথে যে ভাবে গেলে আমি শীঘ্র শীঘ্র আপনার শ্রীচরণকমলে প্রস্ফুটিত হইতে পারি আপনি সেই দিকে আমায় জোর করিয়া লইয়া যাইবেন।'...

'মা, আপনি আমাকে বলিয়াছেন "সর্বদা তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিও," তাহা আমি পারিব কিরূপে? মন তো আমার বশ নয়, আপনি কৃপা করিয়া রাখাইবেন—আপনার কাছে আমার এই আবদার।"[৬]

'মা, আমার প্রতি স্বভাবতই আপনার বিশেষ কৃপা আপনি নিজগুণেই করিয়াছেন, সুতরাং আমি তাহার জন্য আর প্রার্থনা করিব কি? আপনি সদা সর্বদাই আমার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, আমি আপনাদের পাইবার জন্য কি বা সাধনভজন করিতে পারিব? আপনার শ্রীচরণে ঐকান্তিক ভালবাসা ও ভক্তি না হইলে আমার মনে শান্তি কেমন করিয়া হইবে?"[৭]

মার্চ ১৯০৪।

আবার মাতৃসকাশে জয়রামবাটীতে বিরজানন্দজী। মাঝে কয়েক বৎসর দুজনের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়নি। বিরজানন্দজীর শীর্ণ শরীর। দেখে মা শিউরে উঠলেন। তিনি অন্তর্যামিনী। 'বুঝলেন এ দেহের ব্যাধি নয়।

প্রশ্ন করলেন মাঃ 'ধ্যান কোথায় কর? হৃদয়ে না সহস্রারে?'

—'সহস্রারে, কেননা ওখানে ধ্যান করতে ভাল লাগে। খুব আনন্দ পাই।'

—'বাবা করেছ কি? ও যে শেষ অবস্থার কথা—পরমহংস অবস্থার কথা। একেবারেই কি অত উঁচুতে মনকে রাখতে পারা যায়? প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে নামিয়ে এনে সেখানে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়।'

এর আগে অনেক চিকিৎসা, নিয়ম পালন, পথ্যাদিতে যা হয়নি, মায়ের এই সামান্য বিধানে তাই হল। ধীরে ধীরে সেরে উঠলেন বিরজানন্দজী। জীবনের অপরাহ্ণে এই ঘটনার উল্লেখ করে গভীর আবেগের সঙ্গে বলতেন তিনিঃ 'সিদ্ধগুরুর দরকার এই

জন্যেই। মায়ের এই উপদেশ যদি না পেতুম তা হলে হয়তো জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতো, চিররুগ্ন থাকতুম অথবা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটতো।'[৮]

১৯০৫। আমেরিকায় যাওয়ার কথা উঠল বিরজানন্দজীর। যাওয়া হয়নি, কিন্তু এই উপলক্ষে মায়ের সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয় তা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বিরজানন্দজীঃ 'মা, আমি বড়ই দুর্বল, কিছুই জানিনা, আমেরিকা গিয়ে আমার দ্বারা কি কাজ হবে কিছুই বুঝতে পারছিনা। আপনি রক্ষা করুন, আশীর্বাদ করুন।'

মাঃ 'বাবা, ঠাকুর রক্ষা করবেন, তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, হে ঠাকুর, তুমি আমার ইহকাল পরকাল রক্ষা কর।'

বিঃ 'মা, সাধনভজন তো কিছুই হ'ল না। কিছুই উপলব্ধি হ'ল না, ঠাকুরের দর্শন পেলুম না, কি হবে?'

মাঃ 'বাবা, আর কত সাধনভজন করবে? ঠাকুরের দর্শন তো পেয়েছো।'

বিরজানন্দজী প্রথমে বিস্মিত। পরে বুঝলেন মায়ের কথার গূঢ় অর্থ। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করা মানে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই দর্শন লাভ করা।

বিঃ 'মা, আমেরিকায় গেলে তো অনেকে মন্ত্রদীক্ষা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে, তখন কি করব?'

মাঃ 'দেবে।'[৯]

এরপর কোন্ পাত্রকে কি মন্ত্র দিতে হবে মা সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উপদেশ দিলেন স্বামী বিরজানন্দকে।

পদ্মফুলকে রং করার চেষ্টা অর্থহীন। শ্রীশ্রীমা ও বিরজানন্দজীর সম্পর্কের সৌন্দর্যও সেইরকমই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অতি সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ এই সম্পর্ক। প্রতীকীও বটে। স্বামী বিরজানন্দ রামকৃষ্ণ-সন্তানদের পরবর্তীকালের সাধুদের উজ্জ্বল প্রতিনিধি।

শ্রীশ্রীমা প্রথমে তাঁর এই সন্তানকে দিয়েছেন ভালবাসা। তারপর একে একে দিয়েছেন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের আহার। দিয়েছেন দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য। তারও পরে দিয়েছেন আধ্যাত্মিক সম্পদ। এবং পরিশেষে দিয়েছেন 'চাপরাস'। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বিস্মিত ও নির্বাক হতে হয় এই ভেবে যে, সেদিন শ্রীশ্রীমা স্পষ্টই জানতেন যে, তরুণ তাপস কালীকৃষ্ণ একদিন উত্তরণ লাভ করবেন স্বামী বিরজানন্দরূপে এবং উত্তরজীবনে তাঁকে সঙ্ঘগুরুর আসনে বসতে হবে। আর স্বামী বিরজানন্দ? তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের চরণে। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিরজানন্দের সম্পর্কটি উত্তরকালের সাধুভক্তদের ধ্যানচিত্র ও আদর্শ।

স্বামী শঙ্করানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ, বেলুড়ের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ (১০ মার্চ ১৮৮০—

১৩ জানুয়ারি ১৯৬২)। তাঁর অধ্যক্ষতার কাল জুন ১৯৫১—জানুয়ারি ১৯৬২। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগ দেন। শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় স্বামী শঙ্করানন্দের তিনটি কাজ রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আন্দোলনে চিরস্মরণীয়। একঃ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের যে-মন্দিরটি আছে সেটি গড়ে তোলার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করে-ছিলেন। দুইঃ স্বামী সারদানন্দজীর নির্দেশে তিনি জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির-নির্মাণকার্য স্বামী উমানন্দের সাহায্যে তদারক করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মন্দির-নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। তিনঃ পরম্পরার দিক দিয়ে স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ, বেলুড় ও শ্রীসারদা-মঠ, দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে যোগসূত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তান, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের চিরদিনের 'মহারাজ', স্বামীজীর 'অভিন্নহৃদয়' গুরু-ভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত স্বামী শঙ্করানন্দ যেন এই ভূমিকার জন্য শ্রীশ্রীমা-কর্তৃক নির্বাচিত। কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! কী তাৎপর্যমণ্ডিত নির্বাচন! শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর শতবার্ষিক আবির্ভাবতিথিতে তিনি কয়েকজন উপযুক্ত ত্যাগী নারীকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দান করেন। তাঁরা স্বামী শঙ্করানন্দ ও প্রাচীন সন্ন্যাসীদের নির্দেশে ক্রমে নিজেদের সংগঠিত করেন। ২ ডিসেম্বর ১৯৫৪ তারিখে স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীসারদা-মঠ, দক্ষিণেশ্বরের উদ্বোধন করেন। ১ জানুয়ারি ১৯৫৯ শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-তিথির দিন শেষরাত্রে স্বামী শঙ্করানন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের যোগ্যশিষ্যা, স্বামী সারদানন্দের মানসকন্যা ও শ্রীসারদা-মঠের অধ্যক্ষা সরলাদেবীকে বেলুড় মঠে যথারীতি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করেন। অতঃপর তাঁর নাম হল প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা পুরী। আগস্ট ১৯৫৯-এ সারদামঠের কয়েকজন সন্ন্যাসিনীকে ট্রাস্টি নিযুক্ত করে বেলুড়মঠ-কর্তৃপক্ষ সারদামঠের ভার তাঁদের হস্তে অর্পণ করেন। মে ১৯৬১-তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মিশন রেজিস্ট্রি হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ায় স্বামী শঙ্করানন্দ গভীর স্বস্তি অনুভব করেন।

স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী (১৯৫৩-৫৪) উৎসবের কালে, উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে (১২ পৌষ ১৩৬০, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩) বেলুড় মঠে জনসভায় একটি বাণী দেন। সেই বাণীটি পরে 'উদ্বোধনঃ শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা'য় (বৈশাখ ১৩৬১) 'শুভেচ্ছাবাণী' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান নথি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের পরবর্তী সাধুরা শ্রীমাকে কি চোখে দেখেছেন ও তাঁর সম্পর্কে কি ভেবেছেন তার একটি সারসঞ্চয় পাওয়া যাবে তাঁদের অন্যতম স্মরণীয় প্রতিনিধি স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের এই বাণীটি থেকে। তার অংশঃ 'শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা এবং মানবজাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার জীবন অত্যন্ত সাদাসিধা ও ঘটনাবৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু উহা যে মহান আদর্শের প্রতীক, সেই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই উহা সমস্ত জগতে এক মহতী বার্তা ঘোষণা করিতেছে। তিনি ছিলেন ভারতীয় নারীচরিত্রের চরম উৎকর্ষস্বরূপা, এবং বলিতে গেলে সার্বভৌম আদর্শের প্রতিকৃতি, যাহা সকল জাতি ও কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

'শ্রীসারদাদেবীর জীবনে আমরা একাধারে আদর্শ পত্নী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ

সন্ন্যাসিনীর অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। তিনি ছিলেন তাঁহার দেবোপম স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী এবং জগতে তাঁহারই জীবনব্রত-পরিপূর্তির সহায়িকা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। মাতৃভাবের পূর্ণবিকাশই ছিল সারদাদেবীর জীবনের মহত্তম দিক। তাঁহার স্বার্থলেশহীন স্নেহ সর্বপ্রকার ভেদবৈষম্য অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতির উপর সমভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। সারদাদেবীর জীবন বর্তমান যুগের নারীজাতিকে আহ্বান জানাইতেছে নারীত্বের যথার্থ মহিমা বিকাশ করিয়া তুলিবার জন্য—যে মহিমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দিব্য মাতৃভাব।'[১০]

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (১৩ জুন ১৮৮৩—১৬ জুন ১৯৬২) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ, বেলুড়ের অষ্টম অধ্যক্ষ। 'তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সার্থক সন্তান ছিলেন। তাঁহার ভিতর মাতৃভাবের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল।'[১১]

এই লেখক যতবার বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে গিয়েছে ততবারই ফিরে এসেছে এক আশ্চর্য অনুভব নিয়ে। তার মনে হয়েছে যে, সে এসেছে মায়ের কাছে। এক ভাগবতী মা। এক স্বর্গীয় মা। পার্থিব কোন জননীর ভালবাসা যার তুলনায় মহাসাগরের কাছে গোষ্পদ। হিমালয়ের কাছে বল্মীক। কথাটা সে কারও কাছে বলেনি। বলতে পারত না। অমন বলিষ্ঠ সুপুরুষকে মা বলে মনে হয়—একথা বলা যায় কেমন করে? অনেক বৎসর পরে একদিন শ্রীসারদা-মঠের এক প্রবীণ সন্ন্যাসিনী কথায় কথায় বলেছিলেন তাকেঃ 'স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী পুরুষ শরীরে মা ছিলেন।' কথাটি যেন আলোর মতো জ্বলে উঠেছিল তার মনে। সাধু না হলে সাধুর কথা কি বলা যায় এমন করে? সত্যিই মা যেন তাঁর আপন হৃদয়টি তাঁর এই ছেলেটির অন্তরে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ শৈশবে তাঁর জনক-জননীকে হারিয়েছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন ম্যাক্সমূলারের লেখা 'রামকৃষ্ণ হিজ লাইফ অ্যান্ড সেইংস' বইটি পড়ে! শুরু হয় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত। পরিচয় হয় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো রামলাল চট্টোপাধ্যায়, কথামৃতকার শ্রীম ও 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে। শরৎবাবু একদিন রামলালদাদাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ মা কেমন আছেন?

মা! এই ছোট্ট শব্দটি যেন তুফান তুলল মাতৃহারা তরুণের মনে। 'মাতৃনাম শ্রবণে প্রবেশ করিতেই জিতেন্দ্রনাথ [বিশুদ্ধানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম] উচ্চকিত শিহরিত হইলেন,—যেন জন্মজন্মান্তরের বহু আকাঙ্ক্ষিত সুধামাখা ঐ একাক্ষর নাম তরুণের হৃদয়তন্ত্রীতে এক অশ্রুতপূর্ব সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া তাহার সমগ্র সত্তাকে নিমেষে অভিভূত করিয়া ফেলিল; ভাবিলেনঃ "কে এই মা! কোথায় তিনি!"' সেইদিনই রামলালদাদাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর

পরিচয় ও সন্ধান জানিয়া লইলেন, সেই সঙ্গে শ্রীধাম জয়রামবাটীর পথনির্দেশও সংগ্রহ করিলেন।'[১২]

এবার শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে তাঁর সন্তান বিশুদ্ধানন্দজীর নিজের স্মৃতিচারণ একটু শোনা যাক। 'অহৈতুকী ভালবাসা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য জীবনে প্রথম লাভ করিয়াছিলাম শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শে আসিয়া। ঐ ভালবাসার প্রকৃতি সে-ই বুঝিতে পারে যে নিজে আস্বাদন করিয়াছে—ভাষায় উহা প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার অপার্থিব স্নেহের শক্তি আমার তরুণ প্রাণকে এতই বিপুলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল যে. পিতা-মাতার এবং গৃহের অপরাপর স্বজনবর্গের ভালবাসা যেন অতি স্বাভাবিকভাবেই পিছনে পড়িয়া যাইতে বেশী সময় লাগে নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে (১৯০৬) জয়রাম-বাটীতে তাঁহার প্রথম দর্শন পাই। ...বর্ধমান হইয়া গিয়াছিলাম মনে পড়ে, অনেক কষ্টও হইয়াছিল....শ্রান্ত দেহ, কথঞ্চিৎ অবসন্ন মন ; মনে হইতেছিল, কেহ যদি সঙ্গে করিয়া মায়ের নিকট আমাকে লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। একা একা তাঁহার সম্মুখীন হইবার সঙ্কোচ যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী--দেবীমান্যা মহীয়সী সাধিকার নিকট গিয়া কি বলিব. তিনিই বা আমাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন ইত্যাদ্যাকার নানা চিন্তা চিত্তকে আকুল করিতেছিল। কিন্তু সকল উদ্বেগ ও সংশয় নিমেষে কাটিয়া গেল যখন মায়ের নিকট আসিলাম। দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেন.—"কেমন আছ বাবা? আসতে কষ্ট হয় নি তো?" বহুদিন পরে গৃহে প্রত্যাগত পুত্রের সহিত জননী যেরূপ কথা বলেন ও আচরণ করেন ঠিক সেইরূপ! "বস" বলিয়া সযত্নে নিকটে বসিতে দিলেন। প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম সত্যই ইনি মা।

'জয়রামবাটীতে তাঁহাকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, কাশীতে এবং কলিকাতা-তেও দেখিয়াছি। সব সময়েই তাঁহাকে পাইয়াছি চিরস্নেহময়ী জননীরূপে।

'মনে পড়ে. ১৯০৭ সালে আরও দুইজন গুরুভ্রাতার সহিত একত্রে তাঁহার নিকট যখন সন্ন্যাসের বস্ত্র ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাদের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"ঠাকুর এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো। পাহাড় পর্বতে বনে জঙ্গলে যেখানে থাকুক না কেন, এদের দুটি খেতে দিও।" "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"—দুর্গম ত্যাগের পথে সন্তানকে অম্লান মুখে ঠেলিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার স্নেহ-কোমল মাতৃহৃদয় একটুও ঘুমাইয়া পড়ে নাই! তাই সন্ন্যাসি-সন্তান তাহার চরম বৈরাগ্যের মুহূর্তে জগতের সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিলেও, মনে মনে অনবরত সাধিলেও—পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম—"আমার দেহ নাই, গেহ নাই, জনক নাই, জননী নাই, আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই"—কিন্তু একটি সম্বন্ধ সে অস্বী-কার করিতে পারিতেছিল না—সমস্ত হৃদয় দিয়া সে উপলব্ধি করিতেছিল একজন তাহার আছেন—মা—ইহলোক-পরলোকের সকলকে, সব কিছুকে লইয়া যিনি বিরাজ করিতেছেন—সংসারে যিনি বাস করিতেছেন সন্তানকে সংসারের পারে লইয়া যাইবার জন্য।...

'শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ত্যাগী যুবক ভক্তদের পাইলে যেন আনন্দে আত্মহারা হইতেন।...শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যেও এ ভাবটি লক্ষ্য করিয়াছি। একবার জয়রামবাটীতে আমরা কাশী হইতে দুইজন সন্ন্যাসী গিয়াছি—স্বামী অচলানন্দজী (কেদার বাবা) ও আমি। কয়েকজন গৃহস্থ ভক্তও তখন আছেন। রাত্রে সকলে একসঙ্গে খাইতে বসা হইয়াছে। খাওয়া দাওয়া'র অনেকক্ষণ পর—শুইতে যাইবার আগে মা আমাদের দুই-জনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গিয়া দেখি জননী দুই হাতে দুই গ্লাস দুধ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন, "খাও।" এত পর্যাপ্ত দুধ ছিল না যাহাতে সকলকে দেওয়া যায়। বলিলেন, "বাবা ওরা (গৃহস্থ ভক্তগণ) তো বাড়ীতে কত খেতে পারে, তোমাদের আর কে খাওয়াবে বলো?"...

'মা ছিলেন মৃদুতা, লজ্জা, সরলতা পবিত্রতার পূর্ণ প্রতিমূর্তি। উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভূতি তাঁহার করতলগত হইয়াছিল, কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন মা। এই পরিচয়ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।'[১৩]

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিশুদ্ধানন্দজীর নানা উক্তি ও আচরণ এই প্রসঙ্গে স্মরণ ও ধ্যানযোগ্য। তার কিছু এখানে পরিবেশিত হল।

'ঠাকুর আর মা কি আলাদা, টাকার এপিঠ-ওপিঠ।'[১৪]

'কেউ কেউ...জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের ঠাকুর বড়ো না মা বড়ো?" আমি বলি, "নিজে একটু ভেবে দেখ না। এই তোমাদের ঠাকুর আমাদের মাকে পূজা করলেন, আর মা কত সহজভাবে তাঁর পূজা গ্রহণ করলেন। তাহলেই বুঝে নাও।" রাম-অবতারে আর কৃষ্ণ-অবতারে শক্তির যথার্থ মর্যাদা হয় নি, বরং অবমাননা হয়েছিল বলতে হবে। এবার এসে তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন—স্ব-শক্তিকে পূজা করে। শক্তিকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসালেন।...আর কোথাও এ রকম দেখাতে পারো? কতখানি শ্রদ্ধা থাকলে সম্ভব বলো ত! এ যুগে মাতৃভাব। এ বড়ো শুদ্ধ ভাব।'[১৫]

'গ্রীষ্মের দিন। নাইরোবি (কেনিয়া) হইতে সদ্য-প্রত্যাগত একটি ভক্তছেলে অসট্রিচ-পালকের অতি সুন্দর একখানি পাখা অধ্যক্ষের [স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর] করকমলে অর্পণ করিল। তিনি আনমনে পাখাটি একবার বুকের কাছে ঘুরাইয়া জিহ্বাগ্র দংশন করিয়া বলিলেন, "আহা, এইটি দেখে ভাবলুম ঠাকুরের সেবার জন্য পাঠাবো, কিন্তু ভুল হয়ে গেল! এখন আর তা চলবে না। —আচ্ছা, মায়ের পূজারীকে ডাকো, এটি মা'র কাছে পাঠাই। ছেলের ব্যবহার-করা জিনিস মা'র সেবায় লাগবে, তাতে আপত্তি হবে না।" পূজারীকে দিয়া তখনই পাখাখানি শ্রীমন্দিরে প্রেরণ করিলেন।'[১৬]

'শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী, তাঁর সন্তানের কোন ভয় নাই নিশ্চিত জানিবে। তিনি যেভাবে তোমাকে রাখিয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকো এবং শরণাগত হইয়া যথাসাধ্য তাঁকে ডাকিয়া যাও। সন্তানকে তিনি সর্বদা রক্ষা করেন।'[১৭] •

'নিজ ক্ষুদ্র সত্তাটি মাতৃসত্তায় ডুবাইয়া রাখিলে কর্মমাত্রই উপাসনায় পরিণত হয়। ইহাই আত্মসমর্পণ-যোগ।'[১৮]

'...আমাদের মায়ের...কাছে আপন-পর নেই,—সমান ভালবাসা সকলের উপর। তাই ত আমি নাম দিয়েছি "গণ্ডিভাঙ্গা মা"।'[১৯]

'"যতদিন মা স্থূলশরীরে ছিলেন কত ছুটোছুটি—জয়রামবাটী, কলকাতা।... তারপর, আর দৌড়ঝাঁপ নেই, —বুকের ভেতর, স্থির! একবারে এইখানে বসে আছেন।" ...শেষের কথাটি বলিবার কালে দক্ষিণ কর হৃদয়ে রাখিয়াছিলেন।'[২০]

'পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা (শরীর ত্যাগের) ...পরে...স্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন তিনি সর্বদা আমার সঙ্গেসঙ্গে রহিয়াছেন।...এখন যেন তাঁর অভয়ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া কত আনন্দ ও শান্তিতে আছি।'[২১]

স্বামী মাধবানন্দ

কবিদের মধ্যে কাউকে কাউকে বলা হয় 'কবির কবি'। তেমনই সাধুমণ্ডলীতে কাউকে কাউকে বলা চলে 'সাধুর সাধু'। অন্য সাধুরা তাঁকে কিরকম সম্মান দিচ্ছেন, কথাপ্রসঙ্গে কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম, উক্তি বা জীবনচর্যার উল্লেখ করছেন— এ থেকে বোঝা যায় তাঁরা কত বড়। এইরকম এক সাধুর সাধু ছিলেন—শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সন্তান, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৮—৬ অক্টোবর ১৯৬৫)। ১৯২৯-এ তিনি হন মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক। ১৯৩৮-এ সাধারণ সম্পাদক। মার্চ ১৯৬২-তে সহকারী অধ্যক্ষ। আগস্ট ১৯৬২-তে অধ্যক্ষ।

মঠের পুরনো সাধুদের কাছে আকৈশোর শুনেছিঃ স্বামীজী আদর্শ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝতেন, এমন একটি চরিত্র যাতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ সুন্দরভাবে সমন্বিত। পূজনীয় মাধবানন্দজী এইরকম একটি ব্যক্তিত্ব। শুনেছিঃ শ্রীশ্রীমায়ের বিখ্যাত উক্তি—সাধু ভাল, বিদ্বান সাধু আরও ভাল। যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতির দাঁত—পূজনীয় নির্মল মহারাজকে লক্ষ্য করেই প্রথম বলা হয়েছিল। আরও শুনেছিঃ একদিন মা কয়েকজনকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। তরুণ নির্মল মহারাজও ছিলেন পঙ্‌ক্তিতে। সেইসময় তাঁকে দেখিয়ে মা বলেছিলেনঃ 'এই ছেলেটি "কবি" হবে। "কবি" মানে জানো? "কবি" মানে জ্ঞানী।'

সুপুরুষ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মাধবানন্দজী নিজে ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। ('বিশ্রাম আবার কী? কার্যান্তরই তো বিশ্রাম।'—কতবার যে শুনেছি তাঁর শ্রীমুখে।) অন্যের কাছ থেকে কাজ আদায়ে কঠোর। যাকে বলে 'হারড টাস্ক মাস্টার'। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের এই 'কঠোর' সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ-পদে বৃত হওয়ার পর যেন 'মা' হয়ে যান। ভাল-বাসায় ভরা তখন তিনি। অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি নাকি বড় বেশি উদার, বড় বেশি অকৃপণ, দীক্ষাদানের ব্যাপারে একটু বেছেটেছে দেওয়াই বোধহয় ভাল—এইরকম মৃদু

অনুযোগ ও বিনম্র প্রস্তাবের উত্তরে বলেছিলেন এই মহান্ সন্ন্যাসীঃ 'মা যদি বেছে-টেছে কৃপা করতেন তাহলে কি আমি তাঁর কৃপা পেতাম? ওসব বাছবিচারে আমি নেই। মায়ের দেখানো পথেই আমি চলব।' একবার একজন এক সুদীর্ঘ পত্রে তাঁর জীবনের তাবৎ কলঙ্ককথা অকপটে বিবৃত করে লেখেন, তিনি জানেন যে, তিনি কৃপার অযোগ্য। কৃপা না পেলে তাই তাঁর মনে করার কিছু নেই জেনেই কৃপাভিক্ষা করছেন তিনি। মাধবানন্দজীর একান্ত সচিব পত্রটির মর্ম কুণ্ঠিতভাবে মহারাজজীকে জানিয়ে বললেনঃ ইন্টারভিউ-এর জন্য বরং একদিন ওঁকে আসতে চিঠি দিই একটা? সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন মাধবানন্দজীঃ মা তো আমাকে ইন্টারভিউ নিয়ে কৃপা করেননি। তুমি ওকে (দীক্ষার) দিন ঠিক করে আসতে লিখে দাও।

এই অসাধারণ কৃপাময় সাধুটি তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক জীবন মায়ের আদলেই গড়ে তুলেছিলেন বা, বলা যেতে পারে, মা তাঁর এই প্রিয় সন্তানের জীবনটি তাঁর আপন আদলেই গড়ে দিয়েছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা বলা হল তার পরিপ্রেক্ষিতে মা সম্পর্কে তাঁর একটি রচনা 'শ্রীমা সারদাদেবী' খুঁটিয়ে পড়লে (যাকে বলে 'টু রীড ইন বিটুইন দি লাইনস') মা সম্পর্কে অসাধারণ আলোকসম্পাত তো মেলেই, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের এই ছেলেটিও বোধহয় ক্ষণিকের জন্য হলেও আমাদের উপলব্ধির দিগন্ত কৃপা করে স্পর্শ করে যান। স্বামী মাধবানন্দ লিখছেনঃ 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাশক্তি হইয়াও শ্রীশ্রীমা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়াই তাঁহার দিব্যজীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার পুণ্যপ্রভাব অলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অসংখ্য নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। নতুবা তাঁহার অদর্শনের মাত্র তেত্রিশ চৌত্রিশ বৎসরের ভিতর (রচনাটির প্রকাশকাল ১৯৫৪) তাঁহার নামে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি হইত না। ...শ্রীমা-সম্বন্ধে তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] বলিয়াছিলেন, "ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।.. ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।" শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দও বেলুড় মঠে লিখিত তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "...শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। ..মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে...।' তাঁহারই সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দজীও এক পত্রে লিখিতেছেন, "...একি মহাশক্তি! ...যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি নে, সব মার নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনন্তশক্তি- অপার করুণা।...সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে। মা, মা! জয় মা!"

'শ্রীমার এইরূপ অবারিত দ্বার ছিল বলিয়াই আমাদের মত অনেকে তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। মনে পড়ে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি দিনের কথা। পূজনীয় শশী মহারাজ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন কলিকাতায়, বলরাম বাবুর বাটীতে। আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়করূপে তিনি অন্য দু'চার কথার পরে লেখককে বলিলেন, "আর, মার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নাও। তাহ'লে সব হবে।" প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই শ্রীশ্রীমার মহিমা যথার্থ বুঝিয়াছিলেন, এবং সেইজন্যই অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন।...১৯০৮ সালের শেষভাগে পঠদ্দশায় তিন

বন্ধুর সহিত জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শনলাভ করি। দুঃখের বিষয় সেই দর্শনের অতি অস্ফুট স্মৃতিই এখন মনে রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী যাই ১৯১০ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, মঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পূজনীয় বিরজানন্দ স্বামীর সহিত। ...মনে আছে, মা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অতি যত্নের সহিত খাওয়াইতে ব্যগ্র ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনি যে, ঠাকুরই সব ; সাধনভজন সকলের সহজসাধ্য নয়, উহা মাথা ঠান্ডা রাখিয়া করিতে হয় এবং সঙ্ঘের কাজ ঠাকুরেরই সেবা। ...তাঁহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার কথা [কখনও] মনে উঠে নাই। তাঁহার চরণতলে বাস করিতেছি, ইহা ভাবিয়াই তৃপ্তিবোধ করিতাম।...কি উদ্বোধনে কি অন্যত্র, অনেক ছোটখাট ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাঁহার সহজ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ ও অহেতুক করুণার নিদর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ইহাতে আমাদের গুণপনা কিছু নাই, ইহা তাঁহারই জগজ্জননীসুলভ মাহাত্ম্য। পরে যখন ভক্তগণরচিত তাঁহার স্মৃতি-কথা পাঠ করি, তখন এক একবার মনে হইয়াছে, মাকে ঐরূপ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত ভাল হইত। কিন্তু তাঁহারই উক্তি হইতে আমরা ইহা জানিয়া আশ্বস্ত হই যে, তিনি দীক্ষাদান-কালে শিষ্যের যাহা কিছু করণীয় সব করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ গুরু হইতে এইখানেই তাঁহার পার্থক্য। ...সূর্য উঠিলে তাহাকে দেখাইবার জন্য দীপাদির প্রয়োজন হয় না। অবশ্য লোকে কৃতজ্ঞতাহেতু আরাত্রিকহিসাবে তাঁহার সম্মুখে দীপাদি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ...শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবী উভয়েরই জীবনে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁহাদিগকে বড় করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদের পবিত্রতা, লোভরাহিত্য, অনহংকার, দয়া, প্রেম, ধৈর্য, ক্ষমা, ত্যাগ, তপস্যা, ঈশ্বরানুরাগ প্রভৃতি অসংখ্য স্বাভাবিক সদ্গুণ তাঁহাদের অসাধারণত্ব পদে পদে প্রকাশ করে। ...শ্রীসারদাদেবী সত্যসত্যই শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা ছিলেন, এবং তাঁহারও জীবন আশৈশব কর্মময় ছিল। "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—এ জগতে কর্ম করিতে করিতেই শতবৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে—উপনিষদের এই উপদেশ যেন শ্রীসারদাদেবীর জীবনে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছে। আর দেখিতে পাই যে, তাঁহার ঐ কর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরার্থেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি আজীবন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কায়িক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালে তিনি উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া জয়রামবাটী অঞ্চলে কত লোকে সারদাদেবীকে গঞ্জনা দিয়াছে, এক সময়ে তাঁহাকে দারুণ অভাবের মধ্য দিয়াও যাইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি ঘুণাক্ষরেও উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারই যত্নে লালিত ভ্রাতাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতে তিনি কম কষ্ট পান নাই ; বিশেষতঃ শেষ জীবনে তাঁহার আজন্ম পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু ও তাহার স্বামিশোকে বিকৃতমস্তিষ্ক জননীর হস্তে তিনি অকারণে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও তাঁহার উদারতা ও চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হয় নাই। এই দুঃখময় সংসারে কিভাবে জীবনযাপন করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে, তিনি তাহাই নিজ দোষদৃষ্টিরহিত জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" ...জড়বাদপূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত শক্তিশালিনী মহীয়সী নারীর আবির্ভাব বাস্তবিকই জগতের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। উহা ভারতের এমন কি সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতির এক মহা-

অভ্যুত্থানেরই সূচনা করে; বিশেষতঃ ভারতীয় নারীগণ শ্রীশ্রীমার জীবনবেদ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সনাতন আদর্শ বজায় রাখিয়াও আধুনিক পরিস্থিতির সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারিবেন। বিদেশীয় নারীগণও তাঁহাদের মধ্য দিয়া ভারতের যুগযুগান্তের পরীক্ষিত নিবৃত্তিমার্গের পরিচয় পাইবেন।...শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিলেও সূক্ষ্মশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ জীবোদ্ধার-কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি পতির অদর্শনের অত দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বেচ্ছায় মায়াবন্ধন গ্রহণ করিয়া ধরাধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। ধর্মজগতের ইতিহাসে তাঁহার তুলনা মিলে না। শিবশক্তির এই অপূর্ব লীলা-অনুধ্যান করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা সকলেই ধন্য হইয়াছি।'[২২]

শ্রীশ্রীমায়ের দেবীত্ব সম্পর্কে মাধবানন্দজী প্রতি মুহূর্তে কিরকম সচেতন থাকতেন এবং ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবধারায় কতটা এবং কিভাবে চালিত হতেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য।

এক॥ শ্রীশ্রীমায়ের একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদে মায়ের একটি ছবি এঁকেছেন এক শিল্পী। এক সাধু দেখে বললেনঃ কী সব কাণ্ড! মায়ের ঠোঁটে খানিক লাল রং লাগিয়ে বসে আছে। মাধবানন্দজী তৎক্ষণাৎ বললেনঃ তাতে কী? মা-দুর্গার ঠোঁটেও তো লাল রং দেওয়া হয়।

দুই॥ একটি লোক আবাল্য মঠে যায়। বয়সে তরুণ। কলেজের ছাত্র। একদিন প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন মাধবানন্দজীকেঃ মহারাজ, শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরচিন্তা করতে হবে। কিন্তু তা হবে কেমন করে? অন্য কাজকর্মও তো আছে?

প্রথমে মাধবানন্দজী কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পরে টেবিলে রাখা একটা কাগজ তুলে নিলেন—একটা 'ফর্ম' বা আবেদন-পত্র। আবেদনকারীর স্বাক্ষরের জায়গাটায় আঙুল ছুঁইয়ে বললেনঃ 'এটা কী?

—একটা লাইন মহারাজ।

—ঠিক। কিন্তু কীরকম লাইন?

—স্ট্রেট লাইন (সরল রেখা) মহারাজ।

—ভালো করে দেখে বলো?

—ডটেড্ লাইন (ফুটকি ফুটকি দেওয়া রেখা) মহারাজ।

—ঠিক বলেছ। তা দেখ, ডটেড্ লাইন হলেও "ইট হ্যাজ অল দি এফেক্ট অফ এ স্ট্রেট লাইন" (ফুটকি ফুটকি দেওয়া, অর্থাৎ মাঝে মাঝে ফাঁক থাকা সত্ত্বেও এতে সরলরেখার কাজই হয়ে যাচ্ছে) নয় কি? তাহলে দেখ, তুমি যদি তোমার জন্য সব কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ভগবানের নাম করতে পার, স্মরণ-মনন রাখতে পার, তাহলে তোমার ওই তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তার ফলই হবে। (একটু থেমে, উদাস-দৃষ্টিতে তাকিয়ে, স্নেহপূর্ণ স্বরে) মা কী বলতেন জানো? "বাবা আমরা তো মেয়েমানুষ। সংসারের কাজ তো ছাড়া যাবে না। এই জল দিয়ে ভাতের হাঁড়িটা

চাপালাম। চাল ফুটতে লাগল। সেই ফাঁকে একটু জপ সেরে নিলাম। আবার ডালের জল চাপালাম। গরম হতে লাগল। আবার একটু জপ করে নেওয়া গেল। একটু পরে ডাল ছেড়ে আবার জপ। এইরকম আর কি বাবা..."।'

তিন॥ তাঁর শেষ রোগশয্যায় মায়ের এই ছেলে মাঝে মাঝে প্রাণভরে উচ্চারণ করতেন—মা, মা। আর মহাসমাধির দিনটিতে বার বার তাঁর ওষ্ঠে ফুটে ওঠে এই মধুর, প্রিয় নাম—মা, মা। তাঁর শেষ কণ্ঠস্বরে এই নাম ঘোষণা করে মায়ের ছেলে মায়ের কোলে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েন!

প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা

ছোট্ট দুটি দৃশ্য।

একটি ছোট্ট মেয়ে বেলুড় মঠে দর্শন ও প্রণাম করছেন স্বামীজীকে। বিস্ময়ভরা দুটি চোখ দিয়ে দেখছেন তাঁর মূর্ত মহেশ্বররূপ আর তাঁর বড় বড় দুটি চোখ। অনুমান করতে বাধা নেই, স্বামীজীর অমোঘ আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে মেয়েটির শিরে।

আবার দেখি ঐ ছোট্ট মেয়েটি গিয়েছেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। মা তাঁকে দেখেই বলছেনঃ এটি কাদের মেয়ে? বেশ মেয়েটি।[২০]

কি আছে এই অতি সাধারণ দৃশ্য দুটিতে? যা আছে, তা কি আজও জানি। তবে এইটুকুই বলা যায় যে, যা আছে তার কিছুটাও স্পষ্ট হতে সময় লেগেছে অধ শতাব্দীর কিছু বেশি!

প্রথম দৃশ্যে স্বামীজী জীবনপ্রান্তে দেখে আশীর্বাদ করে গেলেন তাঁর একটি প্রিয় স্বপ্নের ভাবী রূপকারকে! আর দ্বিতীয় দৃশ্যে, জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা নির্বাচন করে নিলেন তাঁর লীলার এক প্রধান সহায়িকাকে!

সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি হলেন পরবর্তীকালের পূজনীয়া মাতাজী প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণাজী (জুলাই ১৮৯৪—জানুয়ারি ১৯৭৩)। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম সরলাবালা দেবী। এই লেখকের বিশ্বাস, পূজনীয়া ভারতীপ্রাণাজী শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের এক অনন্যসুন্দর অবদান। শ্রীমা সারদাদেবীর অন্তরঙ্গতম লীলা-সঙ্গিনী। স্বামী বিবেকানন্দের এক মহান্ স্বপ্নের রূপকার।

পূজনীয়া ভারতীপ্রাণাজীর দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন? প্রশ্নটি রামকৃষ্ণ-বেদান্ত পথের পথিকদের মনে আসবেই। কিন্তু হায়, এর ঠিক-ঠিক উত্তর মেলা প্রায় অসম্ভব। ভারতীপ্রাণা রেখে গিয়েছেন একটি জীবন। আর সেই জীবনই তাঁর বাণী। সেই জীবন থেকে জীবন পেয়ে কত মেয়ে সন্ন্যাসিনী হচ্ছেন ও হবেন। তাঁরাই উপলব্ধি করবেন সেই জীবনের অন্তর্নিহিত বাণী। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আত্মগোপনের পদ্ধতিটি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর এই কন্যা!

তবে একটি নথি আছে। সেটি তাঁর বৈদান্তিক সন্ন্যাস গ্রহণের আগে লিখিত এবং তাঁর পূর্ব নামে (শ্রীমতী সরলাবালা দেবী) স্বাক্ষরিত। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দশম অংশ হিসাবে এটি সঙ্কলিত। নথিটি অত্যন্ত মূল্যবান। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বহু তথ্য এবং সাধনপথের বহু ইঙ্গিত এটিতে আছে যা শ্রীশ্রীমা তাঁর এই মেয়েটির মাধ্যমেই জগতের কাছে ব্যক্ত করে গিয়েছেন। ভারতীপ্রাণা তাঁর জীবনে ও আচরণে এই শিক্ষাগুলি সারা জীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বলে শ্রীসারদা-মঠের প্রধান সন্ন্যাসিনীদের কাছে শুনেছি। উল্লিখিত নথিটি থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ ও তার তাৎপর্য এখানে উদ্ধৃত ও অনুধ্যান করা যাক খুব সংক্ষেপে—আমাদের পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরের কিছু আভাস এ থেকে মিলবে এই আশায়।

শ্রীশ্রীমা তাঁকে বলছেন একটি প্রসঙ্গেঃ 'ঠাকুরের কৃপায় সব সোজা হয়ে যাবে।... সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "শ, ষ, স—তিনটে স। যে সয় সেই রয়।"' এরপর শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে প্রার্থনা করলেনঃ 'ঠাকুর রক্ষা কর।'[২৪] শ্রীশ্রীমায়ের এই উপদেশ ও প্রার্থনা সেই প্রসঙ্গে অব্যর্থ ফলপ্রসূ হয়েছিল। এই উপদেশ ও শ্রীমায়ের প্রার্থনার এই রক্ষাকবচ ছিল ভারতীপ্রাণাজীর চিরসাথী।

দীক্ষাপ্রাপ্তির পর শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে তিনি কিছু ফুল দেবেন। কি বলে দেবেন ভাবছেন। শ্রীশ্রীমা বলে দিলেন তাঁর মনের প্রশ্নের উত্তরঃ '"আমার যা কিছু সব তোমায় দিলুম" বলে ফুলগুলি আমার পায়ে দাও।' এরপর ঠাকুরকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীমা বললেনঃ 'ইনিই তোমার সর্বস্ব। এঁকে ডেকো, তাহলেই তোমার সব হবে।'[২৫]

তাঁর সব কিছু সত্যই সেদিন থেকে শ্রীশ্রীমাকে দিয়েছিলেন ভারতীপ্রাণাজী। ঠাকুরকে জেনেছিলেন তাঁর সর্বস্ব বলে। সব ছোড়ে সব পাওয়ে—সাধুদের এই কথার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতীপ্রাণাজী।

একবার শ্রীশ্রীমা-দর্শনে যেতে তাঁর কিছুদিন দেরি হয়। শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখে বললেনঃ 'কি মা, এসেছ? অনেকদিন আসনি যে? তোমার জন্য কত ভাবছি।' ভারতীপ্রাণাজীর মন্তব্যঃ 'মা আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আমার প্রাণটা আনন্দে ভরিয়া গেল।'[২৬] মা-মেয়ে। চিরচেনা। নিত্য সম্পর্ক। এই প্রাণভরা আনন্দ ছিল তাঁর অক্ষয় সম্পদ।

একবার কাশীতে শ্রীমা তাঁকে বলেনঃ 'যে একবার ঠাকুরকে ডেকেছে, তার আর ভয় নাই। ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে কৃপা হলে তবে প্রেমভক্তি হয়। এই প্রেমটা অতি গোপনীয় জিনিস, মা। ব্রজগোপীদের প্রেমভক্তি হয়েছিল। তারা এক কৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই জানত না। নীলকণ্ঠের গানে আছে, "ও প্রেমরত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে।"' এরপর শ্রীমা গানটি গাইলেন। ভারতীপ্রাণাজী বলছেনঃ 'কি মিষ্ট গলায় মা এই গানটি গাহিয়াছিলেন তাহা আজ পর্যন্ত যেন কানে লাগিয়া আছে।'[২৭] শুধু কি গানটি? গানের প্রসঙ্গে মায়ের শিক্ষাটি এবং প্রেমভক্তি গোপন রাখার তুকটিও কি নয়?

পূজনীয়া গোলাপ-মা একটি ঘটনা বলেছিলেন ভারতীপ্রাণাজীকে। তাতে ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন দুবার (একবার শ্রীমাকে

আর একবার গোলাপ-মাকে)। এক॥ 'সে [গোলাপ] জানে না তুমি কে? গোলাপ কোথায়? আসুক না?'[২৮] দুই॥ 'জান না ও কে? এক্ষুণি গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওগে।'[২৯]

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে যোগেন-মার একটি সংশয়ও ঠাকুর একটি দর্শন দিয়ে কাটিয়ে দেন। ঠাকুরের এই দর্শনদান ও বাণীর সারমর্ম ছিল—এক॥ শ্রীশ্রীমা গঙ্গার মতো সদা পবিত্র। দুই॥ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অভেদ। ('ওকে একে অভেদ জানবে।'[৩০])

এই দুটি ঘটনায় কথিত ঠাকুরের ইঙ্গিতটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করতেন বলেই ভারতীপ্রাণাজী উত্তরকালের জন্য এটি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এমন মনে করা কি ভুল হবে?

শ্রীশ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় একবার একজন সাধু-সন্তান তাঁকে দর্শন করে চলে যান। সেই সময় মায়ের মাথায় কাপড় দেওয়া ছিল না। শ্রীমা পরে বলেন সেবিকা ভারতীপ্রাণাকেঃ 'আমার মাথায় কাপড় দেওয়া নেই, কাপড়টা দিয়ে দাওনি কেন?... এখনই এই করছ!'[৩১] শ্রীশ্রীমায়ের দেওয়া এই শালীনতার শিক্ষা কখনও বিস্মৃত হননি ভারতীপ্রাণাজী।

ভারতীপ্রাণাজীকে শ্রীশ্রীমায়ের আর একটি প্রত্যক্ষ উপদেশ এইরকমঃ 'দেখ মা, আমি...প্রার্থনা করেছিলুম, "ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনও কারও দোষ না দেখি।"'[৩২]

শ্রীশ্রীমা একবার ভারতীপ্রাণাজীকে একখানি গরদের কাপড় দেন। তাতে আপত্তি তোলেন একজন। তাঁর যুক্তিঃ 'কেবল ওকে কেন কাপড় দিচ্ছ, মা? আরও পাঁচজন তো আছে।' শ্রীশ্রীমায়ের উত্তরঃ 'আমি ওকে দেব না তো দেবে কে? ওর আর আছে কে বল?'[৩৩]

শরীর ত্যাগের আগে শ্রীশ্রীমা স্বামী সারদানন্দজীকে ডেকে ভারতীপ্রাণাজী প্রমুখের ভার তাঁকে দিয়ে যান। আর শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির পর ভারতীপ্রাণাজীর প্রতি স্বামী সারদানন্দজীর নির্দেশঃ 'এতদিন মাকে মানবীরূপে সেবা করেছ, এখন তাঁর স্বরূপ জানবার চেষ্টা কর। মানবজন্ম লাভ করেছ...জগতে একটা দাগ রেখে যাবে। ভগবান লাভ করে তারপর যাবে।'[৩৪]

কী অসাধারণ নির্দেশ! কী অমোঘ আশীর্বাদ! স্বামী সারদানন্দের এই একটি কথায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রধানা লীলাসঙ্গিনী প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণাজীর জীবন ও সাধনার সারাৎসার বিধৃত।

শ্রীশ্রীমায়ের হাতে নিজেকে নিঃশর্তে ছেড়ে দেওয়ার, তাঁর শ্রীচরণে নিঃশেষ আত্ম-সমর্পণের যে দৃষ্টান্ত ভারতীপ্রাণা রেখে গিয়েছেন তার তুলনা সত্যিই বিরল। 'যখন যেভাবে মাগো রাখিবে আমারে, সেই সুমঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।'—এই ধ্রুবপদে বাঁধা ছিল তাঁর জীবন। তাই ষাট বছর নীরব তপস্যার জীবন কাটিয়ে এক পুণ্যলগ্নে শ্রীশ্রীমা যখন তাঁকে এক বিশেষ ভূমিকায় আনলেন এবং উনিশ বছর রাখলেন, সেই ভূমিকাও তিনি স্বচ্ছন্দে পালন করলেন।

১৯৫৩-৫৪। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। ওদিকে বেলুড়মঠ-কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন উৎসব-সমাপ্তির পূর্বেই স্থাপিত হবে মায়ের মঠ, স্বামীজীর স্বপ্নের স্ত্রীমঠ—শ্রীসারদা-মঠ। ২ ডিসেম্বর ১৯৫৪, গঙ্গার পূর্ব উপকূলে দক্ষিণেশ্বরে সুরধুনী-কাননে এই মঠ স্থাপিত হল। বেলুড়মঠ-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মায়ের মঠের অধ্যক্ষ হলেন মায়ের মেয়ে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা—'মাতাজী'। এইদিন থেকে তিনি বা তাঁর পরে যিনি ঐ আসনে বসেছেন বা বসবেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তমণ্ডলীর কাছে শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় শুরু হল ভারতীপ্রাণাজীর জীবনের এক নতুন অধ্যায়, এক নতুন ভূমিকা। যে ভূমিকার জন্য মা-ই তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন এবং নেপথ্যে প্রস্তুত করেছিলেন এত বৎসর ধরে।

শ্রীশ্রীমায়ের শেষ শয্যাপার্শ্বে একদিন কাতর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন সেবা-নিরতা ভারতীপ্রাণাঃ 'মা, আপনি আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন. আমাকে ফেলে যাবেন না।'

উত্তরে বলেছিলেন শ্রীশ্রীমাঃ 'তোমাকে যে মা আমার অনেক কাজ করতে হবে, কাজ শেষ হলে তো আমার কাছেই যাবে।'

পরবর্তীকালে ভারতীপ্রাণাজীর মন্তব্যঃ 'তখন কি আর বুঝেছিলুম. আমাকে তাঁর এই সব কাজ করতে হবে।'[৩৫]

১৯৫৪-৭৩ ।

শ্রীশ্রীমায়ের দেওয়া মঠের মায়ের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেলেন ভারতীপ্রাণাজী। শ্রীসারদা-মঠ ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের মূলকেন্দ্র ও শাখা কেন্দ্র-গুলির সব কাজের প্রাণকেন্দ্র মাতাজী। মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের এবং যেসব দীক্ষিত সন্তানের অধ্যাত্মজীবনের ভার তিনি নিয়েছিলেন তাঁদের সকলের আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে তাঁর ছিল সস্নেহ, সতর্ক দৃষ্টি। আর এ কাজও তিনি করতেন শ্রীশ্রীমায়ের আদলে অর্থাৎ নিজের আচরণ দিয়ে। তাঁর অপূর্ব নিষ্ঠা, নিরভিমানিতা, নিয়মানুবর্তিতা, তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি তাঁর অনুরাগ সকলের কাছে ছিল সুস্পষ্ট, প্রেরণাপ্রদ ও অনুসরণযোগ্য। এই নিষ্ঠা ও ভগবদ্বুদ্ধি স্বভাবতই সঞ্চারিত হত মঠবাসিনীদের জীবনে। বলতেন ভারতীপ্রাণাজীঃ 'জীবন দেখাও, শুধু আলোচনা করে কী হবে।'[৩৬] বলতেনঃ 'মন মুখ এক না থাকলে আমার ভাল লাগে না।'[৩৭] তাঁর গুরুভাবকে আবৃত করে থাকত তাঁর মাতৃভাব। দীক্ষিত সন্তান, ভক্ত, ব্রহ্মচারিণী, সন্ন্যাসিনী—সকলেরই তিনি ছিলেন 'মা'।

জীবনের শেষ দিনটির (৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩) শেষ মুহূর্তেও তিনি ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে সকলের জন্য আকুল প্রার্থনা নিবেদন করেছেন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে। মধ্যে মধ্যে আকুল কণ্ঠে করেছেন 'মা' 'মা' বলে মাকে সম্বোধন। অনন্তের সুরে আজন্ম-সাধা তাঁর হৃদয়। তাই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর গৈরিক হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে—'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম', 'চিদানন্দ রূপো শিবোঽহম্', 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ'।[৩৮]

পরমা জননীর কোলে চলে গেলেন তাঁর পরমপ্রিয় কন্যা! সন্ন্যাসিনী হলেন ব্রহ্মলীন। কিন্তু কী অগাধ আধ্যাত্মিক সম্পদ রেখে গেলেন উত্তরকালের জন্য। কী মহান্ উত্তরাধিকার রেখে গেলেন রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-পথ-পথিকদের জন্য। রেখে গেলেন আশীর্বাদঃ 'শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কাছে আমি প্রার্থনা করি তাঁদের কাজে জীবন সমর্পণ করে আমরা যেন ধন্য হই। তাঁদের করুণা ও আশীর্বাদ সর্বদা যেন আমাদের উপর থাকে; আমরা সকলেই যেন অনন্ত শান্তি ও আনন্দের অধিকারিণী হই।'[৩৯]

* * *

বলা হল মাত্র পাঁচজনের কথা। এমন পাঁচজন যাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সন্তানদের পরবর্তী ত্যাগী-সন্তানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রশ্নাতীত। এমন পাঁচজন মায়ের কথা বলেছেন যাঁরা বলেছেন কথা দিয়ে নয়—জীবন দিয়ে। মা যাঁদের মাধ্যমে রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে—রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আন্দোলনকে।

শ্রীমা ঃ দীক্ষিত গৃহী-সন্তানদের দৃষ্টিতে

ধর্মের ইতিহাসে সারদাদেবী অধ্যাত্ম-শক্তির কেন্দ্রে স্বস্থিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে অনন্ত সত্যের দ্রষ্টা, স্বামী বিবেকানন্দ সেই সত্যের প্রবক্তা, প্রচারক ও ভাষ্যকার এবং সারদাদেবী তারই ব্যবহারাদর্শ। মায়ের গুরুভাব দেবীভাবেরই প্রকাশ। আবার সেই দেবীভাব মাতৃভাবের সঙ্গে অন্বিত। শাস্ত্রমতে অবশ্য মাতাকে ও গুরুকে দেবী-ভাবে পূজার্চনার বিধান স্বীকৃত। শ্রীশ্রীমা তাঁর অগণিত মন্ত্রশিষ্য বা ভাবদীক্ষিত গৃহী-সন্তানদের চোখে গুরুভাব বিমণ্ডিতা হয়েও মাতৃরূপেই প্রকাশমানা। তাঁর মধ্যে অলৌকিক করুণা, পবিত্রতা ও আশ্রিতবাৎসল্যের অপরিমেয় আন্তরিক বৈভব ইত্যাদি গৃহী-সন্তানদের ত্রিতাপদগ্ধ জর্জরিত জীবনে শান্তির ধ্রুব পথ-নির্দেশক। গৃহী-সন্তানদের সঙ্গে গুরুরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্ক যুগপৎ এক অধ্যাত্ম-দেবীশক্তি ও অত্যাশ্চর্য স্নেহকোমল কল্যাণী অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল বলে বাস্তব-জীবনে তার প্রকাশরূপও ছিল অপূর্ব। ত্যাগী ও গৃহী সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গী সমকেন্দ্রিক হতে পারে না—একথা শ্রীশ্রীমা জানতেন। সংসারে থেকেও যথার্থ অধিকারীকে ত্যাগের পথে এগিয়ে দেওয়াই ছিল মায়ের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েই কতজনকে অধিকারীভেদে সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিয়ে গৃহত্যাগী করিয়েছেন—আবার কাউকে বিবাহাদি করে সংসার-ধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছেন, বলেছেনঃ 'সে কি গো! সংসারে সবই দু'টি দু'টি। এই দেখ না—চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি, তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি।'[১]

শ্রীশ্রীমা তাঁর গুরুশক্তির অভয়-অঙ্কে যাঁদের গ্রহণ করেছিলেন—মন্ত্র-দীক্ষায় কৃতার্থ গৃহী-সন্তানেরা তাঁদের মধ্যে বৃহত্তর একটি অংশ। এই দীক্ষিত গৃহী-সন্তানদের দৃষ্টিতে মায়ের গুরু-দেবী-মাতা এই পরস্পর-সাপেক্ষ ত্রিবিধ রূপের বিকাশ আদ্যাশক্তির স্নেহঘন মূর্তিরূপে দ্যোতিত হয়েছে। গৃহজীবনে অনন্ত মানবিক কল্যাণসাধন যেমন মায়ের একমুখীন সাধনা—তেমনি মাতৃগতপ্রাণ সন্তানদেরও তাঁর প্রতি অনন্ত আকূতি। অতএব, গৃহী-সন্তানদের দৃষ্টিতে মায়ের সামগ্রিক স্বরূপ বিচার করতে চাইলে মায়ের প্রতি তাঁদের অনন্ত-নির্ভরতার কথা আলোচ্য, আবার এই নির্ভরতার উৎস শ্রীশ্রীমা কেন তার যথাযোগ্য সন্ধানও নিতে হয়। গৃহী-সন্তানদের প্রতি মায়ের উপদেশ-নির্দেশ, আচার-আচরণেরও চিত্রচয়ন প্রয়োজন। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একবার শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন—এত ভক্তের ব্যক্তিগত মঙ্গলচিন্তা করা যখন তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়—তখন দীক্ষিত সন্তানের সংখ্যা কম হওয়াই ভালো। উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ 'আমি ঠাকুরের উপর ভার দিই। তাঁর কাছে রোজ বলি,

"যে যেখানে আছে, দেখো।" আর জান, এসব ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র, তিনি আমাকে দিয়েছিলেন—সিদ্ধমন্ত্র।' অর্থাৎ শিষ্যের কল্যাণ শুধু গুরুর মনে রাখারই উপর নির্ভর করে না—মন্ত্রেরও একটা শক্তি আছে।[২] এই মন্ত্রশক্তি বিষয়েই শ্রীশ্রীমা রাসবিহারী মহারাজকে বলেছিলেনঃ 'মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে। তাইতো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের পাপ নিতে হয়।...ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়।'[৩] মায়ের এই উক্তির আলোকেও দীক্ষিত সন্তানেরা তাঁর পতিতোদ্ধারিণী সত্তার অহৈতুক কৃপা ও করুণা, ভক্তের কল্যাণসাধনের অসীম আকাঙ্ক্ষা ও আকৃতিকেই অনুভব করেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত গৃহী-সন্তানদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ গৃহী-লীলাসহচরবৃন্দের মধ্যে অন্তত একজন তাঁর কাছে দীক্ষালাভ করেছেন—তিনি শ্রীম। শ্রীম মাকে শুধু গুরুপত্নী হিসেবেই দেখতেন না, দেখতেন সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরূপ হিসেবে। এঁদের প্রসঙ্গ প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যে-সমস্ত গৃহী-সন্তানদের মধ্যে স্বপ্নসিদ্ধি ঘটেছে—তাঁদের শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণ ও মননাশ্রয়ের মধ্য দিয়ে মায়ের সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যানধারণা। তৃতীয়ত, কুলগুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর পুনরায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণ এবং তাঁদের দৃষ্টিতে মায়ের ভাবমূর্তি। চতুর্থত, ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ দীক্ষাগ্রহণকারী গৃহী-সন্তানদের তাঁর সম্বন্ধে ধারণা।

শ্রীশ্রীমা যোগানন্দ স্বামীকে ১৮৮৬-৮৭ সালে সর্বপ্রথম দীক্ষাদান করেন। তারপরে তিনি কবে, কোথায় এবং কাকে প্রথম দীক্ষা দেন—তা জানা যায় না। তবে এ তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায় যে, এ কাজ কখনও বন্ধ হয়নি। যতদূর জানা যায়, মা প্রথম দিকে সার্পেনটাইন লেনের অতুল ও নারায়ণ নামে দুটি ছেলেকে দীক্ষা দেন। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত মায়ের কথা লোকে খুব কমই জানত এবং সেকারণেও মায়ের দীক্ষিত সন্তানের সংখ্যা কম। কিন্তু ১৮৯৮-১৯০৯ কালসীমার মধ্যে মায়ের দীক্ষিত সন্তানের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। শেষ পর্যায়ে ১৯০৯ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে মায়ের কাছে গৃহী-সন্তানদের দীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁরা এসেছেন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে অবিরাম স্রোতে। ১৮৮৭-১৯২০ এই সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর কাল বহু নরনারী মায়ের কাছে যাতায়াত করেছে। প্রথম একাদশ বর্ষের বিবরণ মেলেই না। দ্বিতীয় একাদশ বছরের প্রাপ্ত বিবরণ পরিমাণে খুব বেশী না হলেও তা আমাদের মানসিক আকৃতি ও জিজ্ঞাসা তৃপ্তির সহায়ক। তৃতীয় পর্যায়ের একাদশ বছরের মায়ের গৃহী-সন্তানদের প্রতি আকর্ষণ এবং বিপরীতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে গৃহী-সন্তানদের মনন ও ধ্যানের বহু পরিচয় নথিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থাকারে কিংবা পত্রিকায় মুদ্রিত নানাস্তরের মানুষের

এই স্মৃতিচারণগুলি মায়ের প্রত্যক্ষ মাতৃরূপ ও অধ্যাত্ম ভাবরূপের পরিচয় বহন করে।

ঠাকুর বলতেনঃ 'দেবস্বপ্ন সত্য।' দেবস্বপ্ন দর্শন করে তদনুযায়ী আচরিত ক্রিয়াকর্ম ও জপ করতে সক্ষম হলে ভক্তসন্তানের আধ্যাত্মিক সমুন্নতি লাভ সম্ভব। একে বলে স্বপ্নসিদ্ধি। শ্রীমায়ের স্বপ্নসিদ্ধ গৃহী-ভক্তের অন্যতম হলেন সুরেন্দ্র সেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর কাছে ধর্মজীবনের কারণে দীক্ষা-সন্ন্যাস প্রার্থনা করেন। অবধারিত দীক্ষার দিনে স্বামীজী অপর কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়ে তাঁকে ডেকে বলেনঃ 'ঠাকুর বললেন, আমি তোর গুরু নই ; ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন, যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও বড়।' স্বামীজীর এই কথায় মর্মাহত সুরেন্দ্রবাবু নিজেকে তাঁর অনুপযুক্ত বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন—তিনি ঠাকুরের কোলে বসে আছেন এবং এক উজ্জ্বল দেবীমূর্তি তাঁকে বলছেনঃ 'একটি মন্ত্র নাও।' ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য এ বিষয়ে সুরেন্দ্রবাবুর বক্তব্য উল্লেখ করেছেনঃ 'আমি ঠাকুরের কোলে বসিয়া আছি ; মন্ত্রতন্ত্রের কোনদিনই ধার ধারি না। তথাপি তিনি মন্ত্র নিতে জেদ করায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? "আমি সরস্বতী"—বলিয়াই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, এতে কি হবে? উত্তর দিলেন, কবি হতে পারবি।...অবজ্ঞাভরে বলিলাম, আমি কবি হতে চাই না। দেবীমূর্তি কহিলেন, কবি মানে জানিস? কবি মানে জ্ঞানী। এই কথা বলিয়া, জপ করিবার প্রণালী পর্যন্ত দেখাইয়া দিয়া, অন্ততঃ ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ করিলেন।' এইভাবে প্রায় ন-বছর কেটে যাবার পর শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রেরণায় মাকে দর্শন করতে তিনি জয়রামবাটী যান। সেখানে চার-পাঁচ দিন থাকেন। দ্বিতীয় দিন মা তাঁকে ডেকে দীক্ষা নিতে বলেন এবং তৃতীয় দিন লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন মা তাঁকে দীক্ষা দেন। দীক্ষার সময় মা তাঁর ডান হাত সুরেন্দ্রবাবুর মস্তকে এবং বাঁ হাত তাঁর চিবুকে রেখে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মায়ের দেওয়া মন্ত্র শুনে সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল পূর্বের সেই স্বপ্নদর্শনের কথা স্মরণ করে ক্ষণিকের জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। প্রকৃতিস্থ হবার পরে দেখলেন—তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্তি ও মায়ের মূর্তি এক। তিনি সেই স্বপ্নের কথা মাকে বলবার চেষ্টা করলে মা তাঁকে বললেনঃ 'কেন, মিলছে না? ঠিক মিলেছে তো?' ভক্তমানসে মায়ের অলৌকিক শক্তির স্বরূপ প্রতিভাত হল। অথচ ঐশ্বরিক হয়েও তিনি অত্যাশ্চর্যরূপে স্নেহমমতায় জড়ানো পার্থিব মাতা।[৪]

শিলং-এর এক ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার স্বপ্নে মা ও ঠাকুরকে দেখেন ও ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি কোঠারে গিয়ে ঐ বিষয়ে মায়ের কাছে বললে মা বলেনঃ 'ঠিক দেখেছ।' পরদিন তিনি তাঁকে দীক্ষা দেবার সময় বললেনঃ 'ঠাকুর তোমাকে যা দিয়েছেন, তা তুমি করবে। আমিও তোমাকে কিছু দিচ্ছি।' এই বলে তিনি আর একটি মন্ত্র দিলেন। সন্তানের প্রতি মায়ের

অপার করুণা ভক্তমনের ভাব ও ভাবনাকে আন্দোলিত করল।[৫] মায়ের অবতারত্বে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে শিলং-এর এক গৃহী-ভক্ত পণ করেন যে, সাতবার স্বপ্নে মায়ের দর্শন না পেলে তাঁকে দেখতে যাবেন না। সেই সাতবার পূর্ণ হলে একবার সম্ভবত ১৯১২ সালে জয়রামবাটীতে মাকে দর্শনের জন্যে এলেন এবং মায়ের কাছে দীক্ষা লাভ করেন। ভক্তের দৃষ্টিতে মায়ের স্বতঃস্ফূর্ত কৃপা ধরা পড়ল।[৬]

একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীভক্ত (বিনু) স্বপ্নে মা ও ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং স্বপ্নেই দেখেন—মা যেন তাঁকে মন্ত্র দিচ্ছেন। কিন্তু স্বপ্নলব্ধ দীক্ষা অপূর্ণ থেকে যাওয়ায় তিনি মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা পাবার জন্যে ব্যাকুল হলেন। ১৯১৩-১৪ সালে তিনি কয়েকজনের সঙ্গে উদ্বোধনে যান। অধীর আগ্রহে উপরে উঠে দেখলেন একজন স্ত্রীলোক অর্ধাবগুণ্ঠনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কয়েকজন পুরুষ-ভক্ত তাঁকে প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। তিনিই শ্রীশ্রীমা অনুমান করে স্ত্রীভক্তটি ছুটে গিয়ে তাঁর পা ধরে বসে পড়লেন এবং মাকে তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত জানিয়ে দীক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। শুনে প্রসন্ন মুখে মা বললেনঃ 'বেশ তো, আজই আমি তোমায় দীক্ষা দেবো।' ভক্তটি হাত-পা ধুয়ে এসে দীক্ষা গ্রহণ করবার পর মা বললেনঃ 'দক্ষিণা দাও।' কিন্তু ভক্তটির সঙ্গে কিছুই ছিল না। তাই মা তার দু-হাত ভরে ফুল, কমলালেবু, কুল প্রভৃতি দিয়ে বললেনঃ 'বল—আমার পূর্বজন্মে, ইহজন্মে জানত অজানত যা কিছু পাপ পুণ্য করেছি সব তোমাকে সমর্পণ করলুম।' গৃহী-ভক্ত হিসেবে মায়ের কাছ থেকে এই ব্যবহার পেয়ে তিনি অভিভূত হলেন। খুঁজে পেলেন মায়ের সঙ্গে তাঁর নিত্যকালের দিব্য সম্পর্ক।[৭]

মায়ের অন্যতম গৃহী-ভক্ত লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী ঠিক স্বপ্নলব্ধ না হলেও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমীর দিন ভোরবেলায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুনতে পান যে, ঠাকুর তাঁকে নাম ধরে ডাকছেন এবং তাঁকে অগ্নি-অক্ষরে লেখা একটি নাম দেখিয়ে বলছেনঃ 'এই নাম জপ করে চল—সময়ে বীজ পাবি।'[৮] এর প্রায় দেড় বছর পর (১৯১৪ সালের বিজয়াদশমীর পরের দিন সকালে) লাবণ্যকুমার কলকাতায় মায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষাদান কালে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই মা যে-মন্ত্র দেন, তা ঐ স্বপ্নলব্ধ নামটিই—শুধু বীজ সংযুক্ত করা।[৯] লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী মায়ের প্রকাশরূপের মধ্যে 'যতো গুপ্ত ততো ব্যক্ত'—এর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করেছেন। অপূর্ব লজ্জাবতী গৃহস্থ-ঘরের কুলবধূর মতো মহামায়া আপনাকে আবৃত রাখতেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ 'অপূর্ব এবং অনন্তভাব গুণতনু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবের বিকাশ, বিলাস, তদীয় পার্ষদগণের এবং মুমুক্ষু দর্শকগণের চক্ষে অল্পবিস্তর ধরা পড়িলেও মহাশক্তি ব্রহ্ম-ময়ীর সমধিক ভাববিকাশ, বিলাস ক্বচিৎ ধরা পড়িত। এত গুপ্ত এবং গভীর ছিলেন

তিনি। তাঁহাদের [প্রধানত শ্রীরামকৃষ্ণের] পার্ষদগণকে জিজ্ঞাসু ভক্তগণ শ্রীশ্রীমায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কিছুই বলিতে চাহিতেন না।...দেখিয়াছি তখন শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিত ভক্তগণ ছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পর্যন্ত অন্য কাহাকেও দেওয়া হইত না।...সংগোপনে থাকায় অভ্যস্থা মাকে তাঁহার পার্ষদগণ আরও সংগোপনে রক্ষা করিতেন।...ইদানীং আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখিতেছি ধর্মপিপাসু লোকসংখ্যা বিপুলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় আকৃষ্ট হইতেছেন।...আরও বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে দেখিতেছি, কিছুকাল যাবৎ যাঁহারা এই ভাবধারায় আকৃষ্ট তাঁহাদের প্রধান আকর্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের কথা জানিবার এবং শুনিবার। মা মহাশক্তি, তাঁহার বিকাশ-বৈভব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু লোকের অল্পই জানা। এমন কি কিছুই জানা নয়, শুধু নামমাত্র শোনা।'[১০] লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী আরও বলেছেনঃ 'পূজ্যপাদ "শ্রীম" আমার সহিত প্রথম পত্রালাপে লিখিয়াছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা অভেদ। একই সত্তা। খোলসে মাত্র তফাৎ। নর আর নারী দেহ।'[১১] এই পরিচয়ের কার্যকরী মীমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহী-সন্তান লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে বলেছেন—পূজ্যপাদ অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের স্তোত্রগীতি রচনা করেছেন। মাকে তা শোনানোর ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্রই মা চমকে উঠে বললেনঃ 'কি স্তোত্র? কার স্তোত্র?' মহারাজ বিনীত কণ্ঠে তখন জানালেন যে. তা মায়েরই স্তোত্র-গীতি। বিস্ময়াভিভূতা মা বললেনঃ 'বাবা, আমার আবার কি স্তোত্র?' কিন্তু ভক্তের আন্তরিক আকুতিতে মা স্থিরভাবেই শুনতে লাগলেন—'প্রকৃতিং পরমাং...'। কিন্তু অভেদানন্দ মহারাজ যখন গাইলেন—'রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং'—তখন দেখা গেল তা শুনে মা স্পন্দনহীনা হয়ে পড়েছেন। মাতৃরূপের এই পরমাশ্চর্য রূপের পরিচয় ভক্তের লেখনীতে যেভাবে বিবৃত হয়েছে—সেই দৃষ্টিকোণেই আমরা বিষয়টিকে দেখতে চাইঃ '"তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্" উচ্চারিত হইবামাত্র তাঁহার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। "তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং" বলার পর অভেদানন্দ মহারাজ দেখিলেন মা আর সেখানে নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া আছেন অথবা মা নিজেই ঠাকুরে পরিণতা হইয়াছেন। মহারাজ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্তোত্রগীতি গাহিতেছিলেন। তিনিও যেন তাঁহার মধ্যে রহিলেন না। তিনি কি দেখিয়াছিলেন তাহা আমাদের বলিয়া যান নাই। কিন্তু আমরা এই না-বলার মধ্যে অনেক কিছু নিত্যনূতন ভাবে পাইতেছি।'[১২] কি পেয়েছিলেন লাবণ্যকুমার তার একটু আভাস তাঁর নিজের কথাযঃ 'অগ্নি আর অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন অভেদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা মা-ও তেমনি অভেদ। ইহা সাধারণ দৃষ্টির গোচরীভূত নহে। তাঁহার কৃপাধন্য যাঁহারা এ কেবল তাঁহারাই জানেন। আর শুধু ব্রহ্মশক্তি নহে পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণশক্তি এবারও জীবের অশেষ ভাগ্যে প্রকটিত প্রকটিতা হইয়াছেন। সুতরাং ঠাকুরকে যদি যুগেশ্বর, যোগেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর বলি তবে শ্রীশ্রীমা সারদাকেও আমরা নিঃসন্দেহে যুগেশ্বরী, যোগেশ্বরী এবং যজ্ঞেশ্বরী বলিব।'[১৩] শ্রীশ্রীমায়ের ঈশ্বরী ও মাতৃসত্তার সম্মিলিত রূপ এই গৃহী-সন্তানের দৃষ্টিতে কী গভীর শ্রদ্ধা ও মগ্নময় অনুভূতি সঞ্চার করেছিল—তারই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তিনি দিয়েছেনঃ '"লজ্জাপটাবৃতা" চির-

অবগুণ্ঠনবতী মা—তোমার মানবদেহধারণের শতবর্ষ জয়ন্তী-উৎসবমুখে তোমার ঘোমটা খুলিয়াছ। স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তুমি। আবার স্বয়ং ব্রহ্মকর্তৃক সম্পূজিতা—মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিতা তুমি,—তোমার স্থূলদেহে আবির্ভাব এবং বিদ্যমান থাকাকালীন বিরল ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোমার ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর তেমন কেহ শ্রীমুখারবিন্দ দর্শনের এবং তোমার রাতুল চরণযুগল দর্শন-স্পর্শনের সুযোগ লাভ করে নাই। কিন্তু আজ? দেখিতেছি দিকে দিকে অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—যদিও ঐশশক্তির নর-নারীদেহে আবির্ভূত-আবির্ভূতা হইবার সময় হইতেই এই জাগরণের পালা আরম্ভ। স্বয়ং ঠাকুরের নরদেহাবলম্বনে প্রকটিত "ভাবৈশ্বর্য" অল্পাধিক প্রকাশিত হইলেও তুমি স্বয়ং মহাশক্তি "সুগুপ্তা" না থাকিলেও, "গুপ্তা" ছিলে, আজ, মা তুমি "ব্যক্তা" —সুব্যক্তা হইয়া চলিয়াছ।

'সর্ব চেতনার সারভূতা সর্বচেতনাসমাহৃতা তুমি—"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভীধীয়তে" আজ "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—চৌদ্দ পোয়া দেহাবলম্বনে প্রকটিতা তুমি বিশ্বব্যাপ্তা হইয়া চলিয়াছ—তোমার কৃপাবলে জীবের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে। "বুদ্ধিরূপেণ", "শান্তিরূপেণ" প্রভৃতি শতরূপে তো তুমি আছই, এখন "মাতৃরূপেণ" যুগপ্রয়োজনে তুমি আসিয়াছ—বিশেষ ভাবে। জীবের রুদ্ধদৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। বিকৃতদৃষ্টি সৃষ্টিপ্রপঞ্চ হইতে অপসারিত হইতেছে। মানুষ দিব্য দৃষ্টি, খাঁটি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতেছে। যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতেছে। যাহা ভুল দেখিত তাহা ঠিক দেখিতেছে।

'ধূলার ধরণীতে তুমি আসিয়াছ এবং আছ, থাকিবেও আরো বহুকাল। তুমি যাহাকে যেমন দেখিবার শক্তি দিয়াছ সে তেমন দেখিতেছে—আর প্রচারের ধূম লাগিয়াছে। কেহ দেখিতেছে—ঠাকুর ও তুমি অভিন্ন! বহির্দৃষ্টিতে খোলসে মাত্র তফাৎ! পৃথক করিয়া ঠাকুরকে কেহ বলিতেছে পরমপুরুষ, তোমাকে বলিতেছে—পরমা প্রকৃতি। কেহ দেখিতেছে তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা, আদ্যাশক্তি। কেহ দেখিতেছে একান্ত গ্রাম্য বলিয়া গ্রাম্য কুলবধূ—আকারে-প্রকারে চাল-চলনে। যে যাহা দেখিতেছে—ঠিকই দেখিতেছে, তবে তারও ঊর্ধ্বে আরও দেখিবার কত কি! "কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

'কেহ বা আফশোষ করিতেছে তুমি শ্রীচৈতন্যলীলায় উপেক্ষিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া! তদীয় পার্ষদগণ, ভক্তগণ, ভাবাধারাপ্রচারকগণ প্রিয়াজীর প্রতি নাকি অবিচার করিয়া গিয়াছেন। তবে এই সারদা-জীবনালোকে যদি আমরা প্রিয়াজীকে দেখি—আফশোষের কি আছে? সতী-সীতা, রাধা, প্রিয়াজী ইঁহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিবার আলোক আজ পাওয়া গিয়াছে। যুগনায়ক ও যুগনায়িকারা কি বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবনালোকে তাহা আমরা দেখিতেছি। তখন যাহা হয় নাই, এখন হইতেছে। "যখন যেমন তখন তেমন।"...

'আর আমাদের কথা—অত শত দেখা বুঝা ভাবা চিন্তার প্রয়োজনই বা কি? আমরা জানি, বুঝিঃ—

> "মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই?
> দুখের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই।"

'উপসংহারে আর একটি কথা। ...স্বয়ং ঠাকুর ও মায়ের নূতন সংস্করণের

আবির্ভাবও আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে একটুখানি হুঁশিয়ার থাকা আমাদের কল্যাণপ্রদ। খাঁটি অবতার আর মেকী অবতার।

"Beware of false prophets !" (Christ)

'"সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।" (শ্রীচৈতন্যভাগবত) ইত্যাদি সতর্ক বাণী আমাদের জন্য রহিয়াছে।

'"কপালমোচন"—এ আর যখন তখন যত্র তত্র হয় না। এবার জীবের বহুভাগ্যে "কপালমোচন" অবতরণ করিয়াছেন। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক দেশলাই কাঠিতে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্ন দিবালোকে জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া চলিয়াছে। চক্ষুষ্মান দেখিতেছে, লণ্ঠন নিয়া খোঁজাখুঁজির দুর্ভাগ্য কি তবুও আমাদের যাইবে না?'[১৪]

মায়ের কয়েকজন গৃহী-ভক্তের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যাত্মরূপ এবং স্নেহকাতর মাতৃহৃদয় কিভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে—তার কিছু পরিচয় এবারে বিবৃত করা যেতে পারে। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, একদিকে তা যেমন মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ, আবার অন্যদিকে মায়ের জীবনের নানা কথা ও কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ক্ষমা, ধৈর্য, তিতিক্ষা, সংযম-সাধনার এক অপূর্ব রূপালেখ্য। একজায়গায় তিনি লিখেছেনঃ 'মার জীবনের সর্বাধিক ও সর্বোত্তম কথা সকল হইতেছে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানদের লইয়া। এবং তাঁহার জীবনেতিহাসের অধিকাংশ উপাদান তাঁহাদের বিবরণগুলি হইতেই পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহারা যে ভাব, অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উহা লিখিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে।'[১৫] বলা বাহুল্য বিবৃতির কেন্দ্র-মুখিনতা লেখকের নিজস্ব মাতৃ-মনোভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভক্তসেবার সকল শ্রম শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে এক মহাজাগতিক আনন্দে রূপায়িত হত। মানদাশঙ্কর উল্লেখ করেছেনঃ 'মাতৃভাবই ছিল মায়ের জীবনের সকল কর্মের উৎস।'[১৬] উদ্বোধনে তাঁর সেই মাতৃস্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা রূপ দেখেই তিনি বলেছেনঃ 'এখন সবই সুস্পষ্ট। এবং সেই পরিচ্ছন্ন দৃশ্যমালা হইতে আমাদের মনে মার যে পরিপূর্ণ ছবি ফুটিয়া ওঠে, তাহাই এখন আমাদের দেখিবার ও বুঝিবার সর্বপ্রধান বিষয়। ছবিখানি অপরূপ! মা এখন মুক্তহস্তা জগত্তারিণী মা—মুক্ত হস্তে জগৎকে কৃপা বিতরণ করিতেছেন,... তাহাদের সেবা করিতেছেন, সান্ত্বনা দিতেছেন, অভয় বাণী শুনাইতেছেন। মাভৈঃ, মাভৈঃ—এই মহা ভাব-তরঙ্গে চারিদিক প্লাবিত করিতেছেন।'[১৭] তাঁর দৃষ্টিতে মায়ের স্বরূপ যথার্থই ব্যক্ত হয়েছেঃ 'এই বিশ্ব-বিজয়িনী মায়ের কোন প্রকাশ প্রচারের প্রয়োজন হয় নাই। ...কিন্তু যিনি সকলের মা—সকলের আশা, বল, ভরসা, আশ্রয়, তাঁহাকে কেহই চাপিয়া-ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। ...কিন্তু দেখিয়াছি, মার কথা যাহারা কখনও কিছু জানে নাই, এমন কি, তাঁহার নামটি পর্যন্ত শুনে নাই এবং তাঁহার অস্তিত্বের কোন খবর রাখে নাই, তাহারাও একটু আভাস, একটু

ইঙ্গিত, একটু সংবাদ বা একটি মুখের কথা পাইয়াই দূর দূরান্তর হইতে তাঁহার ...কৃপা করুণা লাভে ধন্য হইয়া হৃষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরিয়াছে। ...আর এইভাবে তাঁহার চরণাভিমুখে ছুটিয়াছিল অগণিত লোকের ধারা।'[১৮] বালক-যুবা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, সাধু-অসাধু, উচ্চ-নীচ, পাপী-পুণ্যাত্মা সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সকলেই তাঁর সন্তান। সকলের দায়িত্বই তাঁর নিজের দায়িত্ব। মায়ের এই মহৎ মাতৃমূর্তি উন্মোচন করে মানদাশঙ্কর লিখেছেনঃ 'জীবনে আর ভয়-ভাবনা করিবার কিছু নাই, মা আছেন। আর এই অনন্ত-প্রাপ্তির জন্য কোন মূল্য লাগে নাই। ...রোগ, ক্লান্তি, অনবসর—ইহার কিছুই তাঁহার ঐ কার্য ব্যাহত করিতে পারে নাই। ...ইহার [মায়ের এই পরমাশ্চর্য কার্যাবলীর] কোন ক্রম বা অগ্র-পশ্চাৎ নাই। ইহা আগাগোড়া সমভাবেই সাধিত।'[১৯] মায়ের মধ্যে 'প্রাণের আহ্বান ও সাড়া যেমন তিনি পেয়েছেন—তেমনি সেই মাতৃহৃদয়ের মহা আকর্ষণের মধ্যে তিনি কোন বাহ্য গরিমার সন্ধান পাননি। মায়ের সম্বন্ধে মানদাশঙ্কর আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বলেছেনঃ 'এই নাম-মাত্র প্রচারের উপর মার যে কোন নির্ভর ছিল তাহাও নয়। তাঁহার কার্যের সর্বাপেক্ষা বড় সহায় ছিল ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত তাঁহারই অন্তরের নীরব আহ্বান—"ছেলেরা, তোরা আয়।" সে অমোঘ আহ্বান হৃদয়ের মহাকাশে তরঙ্গ তুলিয়াছে...। ইহা উচ্ছ্বাস নহে, সত্য কথা। দেখা যায়, অনেকে তাঁহাকে আগে স্বপ্নে দেখিয়াছে অথবা স্বপ্নে তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়াছে...। কেহ কেহ আবার কোন প্রকারে তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য একটু কথা জানিয়াই একটা দিব্য আকর্ষণে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে।'[২০]

শ্রীশ্রীমায়ের একজন বিশিষ্ট গৃহী-সন্তান নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বলেছেনঃ 'বেলুড়মঠে স্বামী ধীরানন্দজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজের নিকট দেখেছেন। ...আমার জীবনের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদাই আমার দিকে নজর রাখতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। ...যাই হোক্ ১৯১৮তে একদিন বলরাম মন্দিরে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে আবার বললেন—"তুই মার কাছে যেয়ে দীক্ষা নে।"' সব শুনে স্বামী তুরীয়ানন্দ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে বললেনঃ 'জন্মে জন্মে যে মহাশক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তিনি বন্ধনমুক্ত করবার জন্য উদ্বোধন-বাড়িতে বসে আছেন। কৃষ্ণলাল তোমার পরম সুহৃৎ যে—যে মহামায়াকে মুনিঋষিরা ধ্যানে পায় না—সেই মহামায়ার শ্রীচরণে এত আগ্রহের সঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে।' দীক্ষাকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বলছেনঃ 'দীক্ষাকালে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরের খাটটির উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন, আমি নীচে তাঁর সামনে একটি কুশাসনে বসেছিলাম। মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?" আমি খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে বললাম—আমাদের বাড়িতে আমার বাবা ত এক সময়ে খুবই কালীপূজা করতেন। অবশ্য এ কথা বলার আগেই মা বললেন—"বুঝেছি তোমরা শাক্ত।" তারপর পতিতপাবনী শ্রীশ্রীমা এই দীন সন্তানকে মহামন্ত্র দান করলেন। ...দীক্ষা হয়ে গেলে আমি মাকে বললাম, "মা, আমাকে কি তুমি নিরামিষ খেতে বলবে?" মা বললেন—

"সে কি! তুমি নিরামিষ খাবে কেন? আমার ছেলেরা নিরামিষ খাবে কেন? তুমি খাবে দাবে আর ফুর্তি করবে। যা প্রাণে চায় তাই পরবে আর যা প্রাণে চায় তাই খাবে, বাকীটা আমি দেখবো।"' এরপরেই নরেশচন্দ্র মায়ের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেনঃ 'আমি যে আদ্যাশক্তি জগন্মাতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছি অথবা জ্ঞান ভক্তি এবং মোক্ষদায়িনী শ্রীগুরুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, সে সব ভুলে গেছি। সামনে মা শুধুই মা—তবে সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন সেই মা।' মাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলেন নরেশচন্দ্রঃ 'যদি ইষ্টমন্ত্র জপ করতে না পারি তাহলে কি হবে?' মা বেশ উত্তেজিত ভাব দেখিয়ে বললেনঃ 'সে কি ইষ্টমন্ত্র জপ করবে না?' তখন মায়ের অন্য রূপ। কিন্তু এর পেছনেও মায়ের মনে করুণা ও কৃপা পূর্ণভাবে বিরাজ করছিল।[২১] মা নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে দ্বিতীয়বার নতুন বীজ সংযুক্ত করে মন্ত্র দিয়ে বলেছিলেনঃ '"এই তোমার শেষ জন্ম। মরবার সময় ঠাকুর আসবেন। আমি আসবো। ...আমি এসে কোলে করে তোমাকে নিয়ে যাবো।" ...মা এসব কথা যখন বলছিলেন তা যেন সাধারণ ভূমি থেকে নয়। তাঁর সর্বশরীরে একটা বিশেষ ভাবের খেলা হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে এত স্থির হয়ে যাচ্ছিলেন যেন ঠিক ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। করুণাময়ী, পতিতপাবনী মা তাঁর এই দীন পতিত সন্তানকে কতভাবে যে আশ্বাস দিতে চাচ্ছিলেন আর তা বলে যেন শেষ করতে পারছিলেন না।'[২২]

অপর এক গৃহী-ভক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্তী শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে বলেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে যেই গিয়াছে সেই অনুভব করিয়াছে, সে জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস পাইয়াছে—অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। স্বতঃই মনে হয়, অনন্তশক্তিময়ী মা যে করুণামূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করিবার, ভালোবাসিবার ও পূজা, প্রণাম করিবার সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে একমাত্র আশ্রয় এবং অভয়।'[২৩]

ধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা তাঁর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের করুণা-কাহিনী বিবৃত করেছেনঃ 'উদ্বোধনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ডেস্ক-এ বসে লিখছেন। সিঁড়ির কাছে যেতেই হেঁকে বললেন "কে যায়? মার দেহ ভাল নয়, যেয়ো না।" আমি কোন কথা না শুনে তাঁকে ধাক্কা মেরেই মার কাছে গেলাম। মা পূজায় বসেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়েই বুঝলেন দীক্ষাপ্রার্থী। একটু হেসে বললেনঃ "কাল এসো"।' পরের দিনের দীক্ষান্ত অনুভূতিকে তিনি বর্ণনা করেছেনঃ 'চিবুকে হাত রেখে কানে মহামন্ত্র দিলেন। একটা Electric Current-এর মতো পা থেকে মাথা অবধি চলে গেল—সে আনন্দময় অনুভূতি শুধু অনুভবের—বর্ণনার নয়।'[২৪] প্রসঙ্গত ধীরেন্দ্রকুমারের আর একটি অভিজ্ঞতার কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ 'কামারপুকুরে যুগী শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে গ্যারিসন সাহেব প্রশ্ন করলেনঃ তুমি মাকে দেখেছ, মায়ের কিছু অসাধারণ ঘটনা (Miracle) সম্বন্ধে কিছু বল। উত্তরে তাঁকে বললামঃ তুমি নিজেই তো মায়ের করুণার বড় উপমা। খুব কম সময় আর অল্প অর্থ ব্যয় করে আমরা এসেছি কলকাতা

থেকে। তুমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কামারপুকুরে এসে হাজির হয়েছ। এটাই মায়ের করুণার ভাল দৃষ্টান্ত নয় কি!' [২৫]

একবার বোম্বাই থেকে এক পারসী যুবক সোরাব মোদী মাতৃদর্শনে আসেন। স্বামীজীর কিছু গ্রন্থাদি পাঠ করে তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মদর্শন বিষয়ে আগ্রহ জাগে। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটী থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগে জীর্ণশীর্ণ হয়ে দুর্বল শরীরে কলকাতায় ফিরেছেন বলে ভক্তগণ মাতৃদর্শনে বঞ্চিত আছেন। কিন্তু সোরাব মোদীকে দেখে সারদানন্দজীর কৃপা হওয়ায় তাঁকে উপরে যেতে দিলেন। শ্রীমায়ের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়ে সোরাব মোদী প্রার্থনা করলেনঃ 'মাইজী, কুছ মূলমন্ত্র দীজিয়ে জিসসে খুদা পহচানা জায়।' শুনেই মা রাসবিহারী মহারাজকে আগ্রহভরে বললেনঃ 'দেব? দিই দিয়ে।' সেবক রাসবিহারী মহারাজ বিস্মিত হয়ে বললেনঃ 'কাউকে দর্শন পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না, সবে অসুখ হতে উঠেছ, শরৎ মহারাজ শুনলে কি বলবেন? এখন নয়, এর পরে হবে।' মা বললেনঃ 'আচ্ছা, তুমি শরৎকে জিজ্ঞাসা করে এস।' মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী রাসবিহারী মহারাজ শরৎ মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করতে ছুটলেন। কিন্তু প্রদত্ত অনুমোদন সহ ফিরে এসেই দেখেন—তার পূর্বেই শ্রীমা গঙ্গাজল নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন। দীক্ষা হয়ে গেলে তিনি বললেনঃ 'বেশ ছেলেটি, যা বললুম ঠিক বুঝে নিলে।' [২৬] সোরাব মোদী পরবর্তীকালে বোম্বাইতে প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক হয়েছিলেন। চোখের ছানি অপারেশনের জন্য বৃদ্ধ বয়সে তিনি বোম্বাই-এর রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালে ভর্তি হন। এই সময়ে তৎকালীন আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কাছে তাঁর দীক্ষাপ্রসঙ্গ জানতে চান। সোরাব মোদী বলেনঃ 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে মায়ের কাছে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।' মায়ের দীক্ষিত সন্তান হয়ে মায়ের সম্বন্ধে এ-কথাই তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেনঃ 'যদিও মা আমার ভাষা বুঝতেন না, এবং আমিও মায়ের ভাষা জানতাম না—কিন্তু আমার আন্তরিক জিজ্ঞাসা ও আকুতি তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। ভাষা আমার দীক্ষার সময়ে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মা বাংলাতেই যা বলার বলে-ছিলেন। আমার তা বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি এবং আমার বক্তব্যও মায়ের বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি দেখেছি। কারণ তিনি ছিলেন অন্তর্দর্শিনী। আর তাঁর ভালবাসার কথাই বা কি বলব! মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমি মাকে বলেছিলাম, "যাই মা।" আমাকে অবাক করে দিয়ে মা বলেছিলেন, "'যাই' বলতে নেই বাবা, 'আসি' বলতে হয়।" মায়ের এই ছোট্ট কথাটি শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কী অদ্ভুত ভালবাসামাখানো কথা! বস্তুত, মাকে আমার মনে হয়েছিল মা "Wonderful and Beautiful!"' [২৭] (সোরাব মোদী ইংরেজীতে এটি বলেছিলেন।)

বরিশালের প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত রাত্রে স্বপ্ন দেখেন—এক মাতৃমূর্তি তাঁকে বেরিয়ে আসবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। ইতিপূর্বে মায়ের কোন ছবিও তিনি দেখেননি। তথাপি তিনি জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা হয়ে মাতৃসান্নিধ্যে এলেন—এবং শ্রীমায়ের মধ্যে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি হুবহু দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলেন। শ্রীশ্রীমা কিন্তু কোন

বিস্ময় প্রকাশ করলেন না—স্নেহমধুর কণ্ঠে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো বললেনঃ 'বাবা, এসেছ? আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম।'[২৮]

মায়ের গৃহী-সন্তান নিরুপমা রায়ের জবানীতে জানা যায়—তাঁর ছোট জা কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেন এবং তাঁদেরও মন্ত্রগ্রহণ করতে বলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি মাতৃসকাশে দু-তিনবার যান এবং দীক্ষার প্রস্তাব করতেই শ্রীমা সম্মত হলেন। কিন্তু নিরুপমা দেবীর স্বামীর মায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণে মানসিক সংশয় ছিল। অবশেষে একদিন শেষরাতে তিনি এক দিব্য দর্শনে উল্লসিত হয়ে চিৎকার করতে থাকেনঃ 'ঠাকুর স্বয়ং—সিংহাসনে আসীন, জ্যোতির্ময় মূর্তি... আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ওর কাছে মন্ত্র নিতে তোর মনে দ্বিধা, যেখানে মন্ত্র নিলে পুনর্জন্ম হবে না? যা যা, কোন সংশয় রাখিস নি।"' দীক্ষার পর মা বললেনঃ 'তোমার মনে যে বড় দ্বিধা ছিল!' তিনি মায়ের পাদপদ্মে পতিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ 'মা, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি!'[২৯]

অপর এক ভক্তসন্তান নিশিকান্ত মজুমদারের জীবনেতে ঘটে স্বপ্নে মাতৃদর্শন। তিনি বলছেনঃ 'এক রাত্রে স্বপ্ন দেখি, কালীঘাটের মা-কালী আমাকে চারিখানি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিলেন, আমি যেন ছোট ছেলেটি। ঐ দেবীমূর্তি নারীমূর্তিতে পরিবর্তিত হইয়া বলিলেন, তোমার ভয় কি? . তারপরে একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন, এটি জপ কল্লেই তোমার সব হয়ে যাবে। এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যাই। ...স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি সম্মুখে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।'[৩০]

স্বপ্নসিদ্ধির মতো বহু গৃহী-সন্তানের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্দর্শিনী সত্তার পরিচয়ও ধরা পড়েছে। মহেন্দ্রবাবু নামে এক গৃহী-সন্তান বলেনঃ 'স্ত্রীর দীক্ষার দিন আমি নীচে বসিয়া ভাবিতেছি, যে প্রসাদ পাইলাম তাহা মায়েরই প্রসাদ কিংবা সাধুরাই খাইয়া দিয়া গেল বুঝিলাম না। একটু পরেই মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি তিনি একটি সন্দেশ যেন আমাকে দেখাইয়াই খাইতেছেন! আমি প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, খাও।'[৩১] ঠিক এমনি অভিজ্ঞতা সুরেনবাবুরও। মায়ের সম্মুখের আসনে বসে তাঁর মনে হল—পুঁথিতে আছে যে, মায়ের পদতল রাঙা, কিন্তু পদতল তো দেখতে পেলেন না! মনে হওয়া মাত্রঃ 'অমনি মা তাঁহার পা দুইখানি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন, যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত হইলাম।'[৩২] এ-জাতীয় ঘটনা আরও ঘটেছে অনেক গৃহী-সন্তানের জীবনে।

ভক্তসন্তানদের কাছে বিভিন্ন সময়ে প্রতিভাত হয়েছে মায়ের বিভিন্ন রূপ—স্নেহে কোমল, অলৌকিকে অপরূপ এবং বাস্তবে সমুজ্জ্বল। মৃন্ময়ী রায় বলেনঃ 'তিনি [শ্রীশ্রীমা] ছিলেন অদোষদর্শিনী, ক্ষমাস্বরূপিণী। মাতা সন্তানের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। মাতৃত্বের এই মহাসাধনা বলেই মা সকলকে আপনার করেছিলেন।'[৩৩]

মীরা মিত্র বলেনঃ 'মায়ের তারুণ্যের দীপ্তি যেন প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো। স্নিগ্ধতা আছে উগ্রতা নেই—দীপ্তি আছে, দহন নেই। যথার্থ সহধর্মিণী, স্বামীর যথার্থ মনোবৃত্ত্যনুসারিণী। যথার্থ নির্বাসনা, ভোগরহিতা মাকে এইখানে দেখা যায়—কি সংযম, কি তিতিক্ষা! ...কি আশ্চর্য সমদর্শিতা, কি অপার স্নেহ!'[৩৪] মাতৃস্মরণে আশা রায় কি পেয়েছেন সেসম্পর্কে তিনি বলছেনঃ 'সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মন যখন বিধ্বস্ত অশান্ত দিশেহারা তখন পাই আশার আলো, পথের সন্ধান—মাতৃ-অনুধ্যানে। অপার করুণাময়ী করুণাধারায় সিঞ্চিত করে সবাইকে কোলে টেনে নিয়ে শ্রেয়ের পথ দেখিয়ে গেছেন।'[৩৫]

বীণাপাণি ঘোষের দৃষ্টিতে শ্রীমায়ের অন্য রূপ ধরা পড়েছে। তিনি বলছেনঃ 'আমাদের চোখের সামনেই সংসারচিত্র ধরে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, অরণ্য-পর্বতবাসী না হয়েও দোষদৃষ্টি ত্যাগ করা যায় এবং কেমন করে করা যায়—আমাদের তাই শেখাতেই মায়ের শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেঁদে বলা, "ঠাকুর দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও।"... আমাদের প্রতি মায়ের এই শিক্ষা এবং আদেশ।'[৩৬] নলিনীকান্ত ব্রহ্ম জানিয়েছেনঃ 'শ্রীমা ত্যাগের প্রতিমূর্তি ছিলেন। ...তিনি সত্যসত্যই বিদ্যাস্বরূপিণী ছিলেন। ... তিনি ছিলেন ত্যাগের, সাধনার, তপস্যার ভাস্বর প্রশান্ত মূর্তি।'[৩৭] শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে মৃণালিনী দেবীর উপলব্ধিঃ 'আমার বুদ্ধিতে উদয় হল গুরু-ইষ্ট একাধারে মা নিজেই।'[৩৮]

সরযূবালা বলেনঃ 'মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী, একথা মা যদি নিজে দয়া করে বুঝিয়ে না দেন, তা হলে আমাদের সাধ্য কি বুঝি! তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব এইখানেই যে, মায়ের ভিতরে আদৌ "অহঙ্কার" নেই। জীবমাত্রই অহং-এ ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে "তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা" বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহঙ্কারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন।'[৩৯]

কোয়ালপাড়া মঠে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে গৃহী-ভক্ত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত সঙ্কোচের সঙ্গে নিবেদন করলেনঃ '"মা, সাধন-ভজন কিছু হয়ে উঠছে না।" মা অভয় ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় আমি করবো।" বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমার কিছু করতে হবে না? ...তবে এখন হতে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি আমার নিজ কৃত কর্মের উপর নির্ভর করে না?" মা—"না, তুমি কি করবে? যা করতে হয় আমি করবো।" শ্রীশ্রীমায়ের এই অহেতুক কৃপায় আমি নির্বাক হইলাম।'[৪০]

কলমার (অধুনা বাংলাদেশে) বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত এবং তাঁর সহধর্মিণী ইন্দুবালা দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সন্তান ছিলেন। বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত অনুমান ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের কোন একদিন উদ্বোধনের বাড়িতে দীক্ষালাভ করেন। বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তের কন্যা অভয়া দাশগুপ্ত লিখেছেনঃ 'দীক্ষার দিনটিকে এবং তাঁর বিশেষ

অনুভূতিকে বিনোদেশ্বর মন্ত্রগুপ্তির মতোই গোপন রেখেছিলেন। যেমন মন্ত্র, তেমনই মন্ত্রদাতা—এ দুয়ের ব্যাপারেই তিনি চিরকাল নীরব। মহামূল্য রত্নরূপে এসব তাঁর অন্তরতমস্থানে গোপন ছিল। অথচ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেলেদের প্রসঙ্গে তিনি সরব এবং বাঙ্ময়। কেবল শ্রীশ্রীমায়ের পা ছড়ানো ছবিখানা দেখলেই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে পড়তঃ "এই আমাদের আটপৌরে আপন মা। এই মাকেই আমরা দেখেছি, পেয়েছি, এই মা-তেই আমাদের যত আবদার আর নির্ভরতা।" সে নির্ভরতা যে কত গভীর, তা বিনোদেশ্বরের সমগ্র জীবন অনুধাবন করলে বোঝা যায়। তাঁর কণ্ঠে স্বরচিত একটি গান প্রায় প্রতিদিন শোনা যেতঃ

মায়ের শ্রীপদ ভুলো না ভুলো না।
ওরে মূঢ় মন পেয়ে এ রতন
হেলায় খেলায় ছেড়োনা ছেড়োনা॥
জাননা কি মন মায়ের করুণা,
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি পেয়ে কৃপা কণা ;
তাঁহারি ইচ্ছায় মূক বেদ গায়,
ব্রহ্মজ্ঞান পায় আশ্রিত যে জনা॥'[৪১]

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা অভয়া দাশগুপ্ত তাঁদের মায়ের দীক্ষা প্রসঙ্গে জানিয়েছেনঃ 'একবার বিনোদেশ্বর এবং ইন্দুবালা তাঁদের শিশুসন্তানসহ শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনমানসে কলকাতা আসেন। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কয়েকদিনের অসুস্থতায় শিশুসন্তানটি মারা যায়। আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় তাঁরা দুজনেই বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বিশেষত ইন্দুবালা এই আঘাতে একেবারে ভেঙে পড়েন। তখন তাঁর বয়স অল্প। তাতে সন্তানের মৃত্যুর আঘাত। এই আঘাতে আত্মসম্বরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

'এই অবস্থায় বিনোদেশ্বর শোকার্ত ইন্দুবালাকে নিয়ে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসেন। শ্রীশ্রীমাকে ইন্দুবালার এই প্রথম দর্শন। মায়ের কাছে এসেই তিনি মায়ের চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন। যন্ত্রণা বেদনা সব মায়ের কাছে নিবেদন করেন। মুখে তাঁর প্রশ্নঃ "কেমন করে দিন কাটবে? কি নিয়ে থাকব?" এমন সময় শোনা গেল গোলাপ-মার তিরস্কারঃ "তুমি কেমন মেয়ে গা? এ সময় কি মাকে ছুঁতে আছে?" শোকার্ত মেয়েটি একথা শুনে লজ্জায়-অভিমানে, অপরাধবোধে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল শ্রীমায়ের কণ্ঠস্বরঃ "এমন দুঃখের সময় আমার কাছে আসবে না তো কোথায় যাবে?" ইন্দুবালা জীবনের আরম্ভপর্বেই শুনলেন শ্রীশ্রীমায়ের অভয় ঘোষণা। জানলেন—মা সবসময়ের মা সকলের মা। পেলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয়। শ্রীশ্রীমা সন্তানের অগোচরে সন্তানকে চিরদিনের মত কোলে তুলে নিলেন। শ্রীমা ইন্দুবালার সব কথা শুনলেন। বললেনঃ "এখন তো মন অস্থির। এখন দীক্ষা হবে না। পরে হবে।"

'ইন্দুবালার মন শান্ত হয়না। নিজেকে স্থির করতে পারেন না। শ্রীশ্রীমা তাঁর একজন সন্ন্যাসী-সেবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—উদ্বোধনের বাড়িতে তাঁর নিজের

কোন ফটোর কপি আছে কিনা। সেবক নেই বলাতে মা ভাল করে খুঁজে দেখতে বললেন। একটু পরে সেবক জানালেন—কোন ভক্তের অনুরোধক্রমে একটি ছবি পূর্বব্যবস্থামত তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আছে। ভক্তটি পরদিনই সে ছবি নিতে আসবেন। শ্রীমা সেবককে নির্দেশ দিলেন: "ছবিখানা তুমি এই মেয়েটিকে দাও। কাল যার আসবার কথা তাকে বললেই হবে পরে এসে নিয়ে যেতে। আজ ছবিখানা তুমি একে দাও।" প্রথম দিনেই ইন্দুবালা শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠের অভয় আশ্বাসই শুধু শুনলেন না—এমন কিছু পেলেন যা জীবনের পরমসম্পদ হয়ে ওঠে।

'পরদিন বিনোদেশ্বর ইন্দুবালাকে নিয়ে আবার এসেছেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। ইন্দুবালা এখনও শান্ত হতে পারেননি। মা গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। ইন্দুবালাকে সঙ্গে যেতে বললেন। ইন্দুবালা স্নান করে এসেছেন। গঙ্গাস্নানের ইচ্ছে নেই। তাই গেলেন না। ঠাকুরঘরের সামনে বসে থাকলেন স্থির নিস্পন্দ হয়ে। কিন্তু চিত্ত অস্থির। চোখে জলের ধারা। মা গঙ্গাস্নান সেরে ফিরলেন। ছাদে যাচ্ছেন। ইন্দুবালাকে সঙ্গে যেতে বললেন। ইন্দুবালা স্থির। মা বললেন: "চুল ভিজে থাকলে অসুখ করবে যে!" যেন নানাপ্রসঙ্গ দিয়ে মেয়ের শোক দূর করতে চাইছেন। মা ছাদ থেকে নেমে এলেন। এবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হবে। মা ঠাকুরঘরে গেলেন। ভোগ অন্তে ভক্তদের প্রসাদ নেবার পালা। ছেলে ভক্তদের ব্যবস্থা আগে। মেয়ে ভক্ত অল্প। মেয়ে ভক্তরা ঠাকুর-ঘরের সামনের ঘরে বসলেন। প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। সবাই প্রসাদ খাচ্ছেন। ইন্দু-বালা স্থির। তাঁর হাত নড়ে না। তিনি মনে ভাবছেন—মা যদি নিজের থালা থেকে একটু প্রসাদ দেন! মুখে উচ্চারণ করার দরকার হল না। অন্তরের কথা অন্ত-র্যামিনীর কাছে পৌঁছে গেল। মা নিজের থালা থেকে একটু প্রসাদ শোকার্ত অভি-মানী সন্তানকে তুলে দিলেন। ইন্দুবালার ইচ্ছা পূর্ণ হল। তাঁর অন্তর যেন সহসা ভরে উঠল। তিনি সেই প্রসাদটুকুই খেলেন। আর কিছু খাওয়ার মতো অবস্থা তাঁর সেদিন ছিল না। অথচ ভাবছেন—প্রসাদ সব না খেয়ে ওঠার অপরাধের কথা। সেই ভাবনা তাঁকে পীড়িত করছে। তিনি ভাবতে চেষ্টা করছেন—মা তো সব জানেন —তাঁর আজকের এই অক্ষমতা তিনি বুঝবেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমায়ের মুখে শোনা গেল: "এ কি সহ্য করা যায়। সদ্য এমন হয়েছে!" ইন্দুবালা এই ঘটনার কিছু-কাল পরে উদ্বোধনে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

'উপরোক্ত ঘটনা ইন্দুবালার জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেন এই কৃপালাভের ঘটনা তাঁর জীবনের নিয়ামক শক্তি হয়েছিল। তাঁর দীর্ঘজীবনকালের সুখে দুঃখে সম্পদে সঙ্কটে কখনও এই স্মৃতি তাঁর কাছে ম্লান হয়নি। প্রতিদিনের জীবনে প্রথম দর্শনে প্রাপ্ত কৃপাসম্পদ তাঁর উপলব্ধিতে সত্য হয়ে উঠেছে। শ্রীমায়ের নিজের হাতে দেওয়া ছবিখানা ইন্দুবালার দীর্ঘজীবনের প্রতিদিনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী এবং আক্ষরিক অর্থে তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল। ছবি বা ফটো হিসাবে তিনি তা দেখতেন না। সত্যি করে শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহসান্নিধ্যই তিনি পেতেন। প্রতিদিনের সাহচর্যের মধ্য দিয়ে ইন্দুবালা শ্রীমায়ের কোলে চির আশ্রয় লাভ করেন।'[৪২]

কুন্তলিনী দাশগুপ্ত বলেন: 'শিশুর মত সরল প্রাণে আমি চাহিয়াছিলাম তাঁহার

কৃপা ও আশীর্বাদ। আর তিনিও চিরকল্যাণময়ী জননীর মত স্নেহের সঙ্গে তাহা দান করিয়া আমার প্রাণমন ভরিয়া দিয়াছিলেন। বেশ মনে আছে, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ব্যবহার বুকের ভিতর এক একটি আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছিল।'[৮৫] করুণা মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল মায়ের জীবনের আর একটি তাৎপর্যঃ 'তাঁহার [মায়ের] জীবন হয়ত বিরাট কর্মবহুল ছিল না, কিন্তু জীবনের প্রত্যেকটি দৈনন্দিন ঘটনা অতিশয় শিক্ষণীয়।'[৪৪] মায়ের গৃহী-সন্তান মীরা সিংহ বলেছেনঃ 'প্রেম, স্নেহ, ত্যাগ ও সেবা তাঁর [মায়ের] প্রতিটি ছোটখাট কাজের সাথে সুন্দর-ভাবে জড়িয়ে ছিল। সেবাধর্ম দিয়ে তিনি তাঁর নারীত্বকে পূর্ণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন "সেবারূপিণী আনন্দময়ী"। ...তাঁর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার কোন রকম চেষ্টা আমরা দেখি না। ...চুপি চুপি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলত তাঁর সাধনা। তিনি সর্বংসহা মাতৃরূপে তাঁর সবকিছু ঢেকে রেখেছিলেন।'[৪৫] সুদূর মফঃস্বল থেকে একটি অল্পবয়স্কা বালবিধবা ক্ষীরোদবালা রায় দীক্ষার জন্য উদ্বোধনের বাড়িতে এসেছিলেন। মায়ের বাড়িতে আসবার পথেই তাঁর মাথা ঘুরতে থাকে এবং বমি হতে থাকে। মা স্নান করতে যাচ্ছিলেন—শুধু যেন তাঁরই অপেক্ষায় দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের কাছেই মাতৃদর্শনের অভিলাষ জানাতে তিনি একটু হেসে বললেনঃ 'বাছা, আমিই মা।' ক্ষীরোদবালার আনা মিষ্টি ঠাকুরকে উৎসর্গ করে শ্রীশ্রীমা তাঁকে প্রসাদী ফল ও সরবৎ দিয়ে বললেনঃ 'প্রসাদ খাও, বমি হবে না।' প্রসাদ খেয়ে ক্ষীরোদবালা অনেক সুস্থ বোধ করলেন। তারপর মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর ঘরে গেলেন। তাঁর দৃষ্টিতে মায়ের রূপ কিভাবে ধরা দিয়েছিল—তা তাঁর জবানীতেই আমরা তুলে ধরছিঃ 'দেখিলাম, মা আমার রাজরানীর মতো বিশ্বজননীরূপে আসনে উপবিষ্টা ; গোলাপ-মা, গৌরী-মা, যোগীন-মা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়া আমার মাকে খুব আপন বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু অপর যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া কি রকম সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল।' ক্ষীরোদবালার মনও ছিল ব্যথাক্লিষ্ট। তাঁর ব্যর্থ হয়ে ফিরলে চলবে না। মাকে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে বললেন যে, তাঁকে দীক্ষা দান না করে মা যদি ফিরিয়ে দেন, তবে তিনি আর বাঁচবেন না। মা কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললেনঃ 'না, তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে।' তারপর তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করে জানলেন যে, ক্ষীরোদবালা একাদশীতে কিছু খান না, মাথায় তেল দেন না, চুলও ছোট করে ছেঁটে ফেলেছেন। মা বললেনঃ 'কেশের সেতু পার হয়ে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ ...সে কাজ হয়ে গেছে। এখন আমি বলছি, আর কঠোরতা কোরো না। কালকে তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে। কালকে আটটার সময় এখানে এসে পৌঁছুবে। দীক্ষা নেওয়ার দিন একটু গঙ্গাস্নান ও মাকালীকে দর্শন করলে ভাল হয়।' মাতৃসন্নিধানে ক্ষীরোদবালার তখন মনে হলঃ 'তোমাকে দর্শন করিয়াই আমার কালীদর্শন হইয়া গিয়াছে, তোমার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছি।'[৪৬] দীক্ষার দিন

ক্ষীরোদবালার অভিজ্ঞতা হলঃ '...কিছু ফল-মিষ্টি, ফুল-বেলপাতা এবং একখানা সরু লালপেড়ে কাপড় লইয়া বাগবাজারে তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। মাকে এক অপূর্ব মূর্তিতে দেখিলাম। হলুদে রং-এর একখানা কাপড় পরিয়া মা যেন আমার ইষ্টরূপে দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে, শীগ্‌গির এসো ঠাকুরঘরে।" ঠাকুরের সামনে তিনি নিজেই একখানা আসন পাতিয়া উহা হাত দিয়া ঘসিয়া মাজিয়া দিলেন। ভাবিলাম, এই আসনে কি করিয়া বসিব। সঙ্গে সঙ্গে মা তাঁহার দক্ষিণ পা দ্বারা আসনখানা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হয়েছে তো? বাবা! মেয়েটি কম নয়!" আমি যাওয়ার সময় গাড়োয়ানকে দেওয়ার জন্য দুটি টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলাম কিন্তু সে সময় আমার সে টাকার কথা মনেও নাই। আমি আসনে বসিতে যাইব তখন মা বলিলেন, "বাছা, তুমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী ঠাকুরের আশ্রিত হ'তে এসেছ, তোমার আঁচলে দুটো টাকা বাঁধা রয়েছে। ওটা খুলে রেখে এসো।" অমনি টাকা দুটি খুলিয়া দেয়ালের কাছে রাখিয়া দিলাম এবং আসনে বসিলাম। ...আমি সেদিন মাকে যাহা দেখিয়াছিলাম, ভাবিলাম সেই মা তো এই মা নন। ভাবিয়াই আমি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মা আমাকে হাত ধরিয়া আসনে বসাইলেন এবং আমার মাথায় হাত দিয়া অতি মধুর কণ্ঠে "মাভৈঃ" এই আশ্বাসবাণী তিন বার উচ্চারণ করিলেন এবং বলিলেন, "ভয় নেই, এই তোমার জন্মান্তর হয়ে গেল। জন্মান্তরে যত কিছু করেছিলে, সব আমি নিয়ে নিলুম। এখন তুমি পবিত্র, কোন পাপ নেই।" সঙ্গে সঙ্গে আমারও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল; মা আমাকে দীক্ষাদান করিলেন।'[৭৭] সাধন-ভজন সংক্রান্ত কোন সংশয় মনে উদয় হলে তার মীমাংসা করে নেবার জন্যও মা তাঁর দাক্ষিণ্যের কথা ক্ষীরোদবালাকে জানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মাকে দেখেই তিনি সকল বিষয়ে সংশয়োত্তীর্ণা হয়েছিলেনঃ 'মনে হইত সবই হইয়াছে, সবই পাইয়াছি, আর কিছু পাওয়ার বাকী নাই। মা আমার বিশ্বজননী, রাজরাজেশ্বরী ইষ্টদেবী; গুরুরূপে আমার সামনে দণ্ডায়মানা; আমার পাইবার আর কি থাকিতে পারে?'[৭৮]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ মনে করেন যে, যোগীন মহারাজ ও সারদা মহারাজের ন্যায় মাস্টারমহাশয়কেও মা দীক্ষা দিয়েছিলেন। মাস্টারমহাশয়ের স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী মায়ের দীক্ষিত সন্তান ছিলেন। মায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় তাঁর নানা আচরণের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট। মা দক্ষিণেশ্বরে থাকলে নিকুঞ্জদেবী সময় সময় তাঁর কাছে গিয়ে থাকতেন। সঙ্গী পেলে সময় সময় নিজ হাতে খাবার প্রস্তুত করে জয়রামবাটী পাঠিয়েছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে ১৮৮৬ সালে শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে যান—তখন মাস্টারমহাশয় নিকুঞ্জদেবীকেও তাঁর সঙ্গী হিসেবে সঙ্গে পাঠান। মায়ের জয়রামবাটী অবস্থানকালে নিকুঞ্জদেবী কয়েকবার মায়ের কাছে গিয়ে থেকেছেন এবং তাঁর সেবা করেছেন। কলিকাতা থেকে তখন মায়ের জন্য নানারকম মিষ্টি প্রভৃতি নিয়ে গিয়েছেন। কলিকাতা থেকে জয়রামবাটীর দিকে গেলে নিকুঞ্জদেবী মাঝে মাঝে নানারকম খাবার নিজে তৈরি করে পাঠাতেন।

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ধনী-নির্ধন, দুঃস্থ অনাথ আতুর সকল শ্রেণীর মানুষই মায়ের কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন এবং একটি আলোকিত সমন্বয়ে ঋদ্ধ জীবনপথের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯১০ সালে শ্রীশ্রীমা ও গৌরী-মা প্রভৃতি জয়রামবাটী থেকে কলকাতা আসবার পথে বিষ্ণুপুর স্টেশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় একটি হিন্দুস্থানী কুলী মাকে দেখে ছুটে এসে বলেঃ 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায়নে কিত্‌নে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইত্‌নে রোজ তু কাঁহা থী?' (তুমি আমার জানকী মা, কতদিন থেকে তোমাকে আমি খুঁজছি। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?) মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি ফুল আনতে বলেন। সে তা এনে মায়ের পায়ে দিলে, মা সেখানে বসেই তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[৪১]

মাতৃহৃদয়ের অপরিসীম স্নেহের সঙ্গেই শ্রীশ্রীমা তাঁর গৃহী-সন্তানদের দীক্ষা দান করে তাদের মুক্তির ও শান্তির সকল ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন। মায়ের দীক্ষাদানের ইতিবৃত্তের নানা দৃষ্টান্তের মধ্যে তার পরিচয় আছে। গৃহী-সন্তানেরা যেমন তাঁকে অন্তরের আকুলতায় আঁকড়ে ধরেছে—তেমনি তিনিও 'ভবপারের কান্ডারী' রূপে অকাতরে তাদের কাছে টেনে নিয়েছেন। স্বপ্নে যেমন দীক্ষা পেয়েছেন—তেমনি দীক্ষাপ্রার্থী না হয়ে শুধু মাকে প্রণাম বা দর্শন করতে এসেও দীক্ষা পেয়েছেন। দীক্ষার কোন আকাঙ্ক্ষা বা ধারণা না নিয়েও কেউ কেউ মায়ের কাছে অযাচিত দীক্ষা পেয়েছেন। মা অত্যন্ত অসময়ে যেখানে সেখানে ও যে কোন অবস্থায় দীক্ষা দান করে অহৈতুক কৃপা বর্ষণ করেছেন। গৃহী-সন্তানের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা সকলের মুক্তি ও কল্যাণের সর্বময়ী কর্ত্রী। মানুষের চিরন্তন আশ্রয়ের মাতৃ-প্রতীক। তিনি নিত্য করুণাময়ীই শুধু নন, করুণামূর্তি।

শ্রীমা ঃ মনীষিবৃন্দের দৃষ্টিতে

॥ ভূমিকা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা প্রচারে প্রথমদিকে ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেন এবং পরে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমায়ের মহিমা ভক্তগোষ্ঠীর বাইরে খুব একটা প্রচারিত ছিল না। তাঁর তিরোধানের বেশ কিছু পরে অবশ্য ভক্তমণ্ডলীর বাইবেও কোন কোন মনীষী তাঁর কর্মজীবন ও ভাব-জীবন নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। তারপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা উৎসবে এবং পত্রপত্রিকায় বহু আলোচনা হয়েছিল। সেই সমস্ত আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের প্রতি যেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তেমনই তাঁর জীবন ও চরিত্রের আধুনিক যুগোপযোগী মূল্যায়নের চেষ্টাও লক্ষণীয়।

॥ আলোচনার শ্রেণীনির্দেশ ॥

শ্রীমায়ের তিরোভাবের আগে, অব্যবহিত এবং অল্প পরে তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল। তিরোভাবের আগে তাঁর সম্বন্ধে যেসব আলোচনা বা মন্তব্য করা হয়েছে তার সবকটিতেই প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক-ভাবে তাঁর কথা লেখকেরা উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনায় তাঁর অবদান কতখানি সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনও আলোচনা এইসময় হয়নি। তিরোধানের অব্যবহিত পরে তো ভক্তমণ্ডলীর বাইরে তাঁর সম্পর্কে একটিও লেখা চোখে পড়েনি। তিরোভাবের প্রায় চার বৎসর পর তাঁর সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করেছিলেন প্রখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু শতবার্ষিকী উপলক্ষে একমাত্র তাঁকে অবলম্বন করেই অনেক আলোচনা, স্মৃতিচারণা হয়েছে। এই সমস্ত লেখার একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়বে। শ্রীমায়ের জীবন ও সাধনার মূল্যায়ন-প্রয়াস এই সমস্ত লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবন ও আদর্শের গুরুত্ব-আলোচনা শতবার্ষিকী-প্রবন্ধাবলীর মুখ্য প্রয়াস। এটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর দেহরক্ষার (১৯২০) প্রায় তেত্রিশ বৎসর পর (১৯৫৩) শতবার্ষিকী উৎসবে সময়ের ব্যবধানই নির্মোহ-দৃষ্টিতে মূল্যায়নের অবকাশ এনে দিয়েছে। এমনকি, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-ভক্তমণ্ডলীর লেখাতেও অনুরাগের সঙ্গে অনুধ্যান, ভক্তির সঙ্গে বিচারণার বিমিশ্র প্রয়াস চোখে পড়ে। ভক্তদের হৃদয়ে তিনি গুরু বা ইষ্ট বা জগজ্জননীর জীবন্ত বিগ্রহরূপে যেমন প্রতিভাত হয়েছেন, তেমনই তাঁর অসামান্য জীবন এবং অতুলনীয় কর্ম কিভাবে জাতীয় জীবন

উন্নয়নে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বিধানে প্রেরণার উৎস হতে পারে, তার চিন্তাও স্থান পেয়েছে। ভক্তির আন্তরিক অনুরাগে এবং মননের অনুচ্ছ্বসিত বিশ্লেষণে শ্রীমায়ের জীবন-পর্যালোচনা শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত আলোচনাসমূহের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ এনে দিয়েছে। একালের মানুষ প্রধানত এইরকম মূল্যায়নেরই পক্ষপাতী। সুতরাং, এই রীতির আলোচনাগুলি যে খুবই যুগচিত্তস্পর্শী এবং বুদ্ধিজীবিসমর্থিত হবে, তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়।

আমাদের উপস্থাপনার সুবিধার জন্য মনীষিবৃন্দের দৃষ্টিতে শ্রীমায়ের জীবন-পর্যালোচনাকে তিনটি স্তরে ভাগ করে নিচ্ছিঃ

(১) প্রথম পর্যায়ে শ্রীমায়ের জীবিত থাকাকালে তাঁর সম্পর্কে মনীষিগণের আলোচনা বা উল্লেখ ;

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে তিরোভাবের অব্যবহিত এবং স্বল্পপরবর্তী সময়ে তাঁর সম্পর্কে বিচারণা বা স্মৃতিচারণা ;

(৩) তৃতীয় পর্যায়ে শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবং তার পরবর্তীকালে পত্রপত্রিকায়, বিভিন্ন স্মারকগ্রন্থে এবং সংগ্রহ-পুস্তকে ব্যাপকভাবে শ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শের বিশ্লেষণ।

এবার পর্যায়ক্রমে আলোচনার ধারা অনুসরণ করে দেখা যাক, বিভিন্ন স্তরে মাতৃ-চিন্তার কোন্ কোন্ দিক লেখকদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে।

॥ প্রথম পর্যায়ঃ তিরোধানের আগে ॥

এই পর্যায়ে প্রধানত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের কথা এসেছে।

প্রথমেই পাশ্চাত্য মনীষী ম্যাক্সমূলারের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের 'শ্রীরামকৃষ্ণঃ তাঁর জীবন ও বাণী' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ম্যাক্স-মূলারকে লেখা ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের একটি চিঠির উল্লেখ আছে। এই চিঠিতে প্রতাপচন্দ্র ম্যাক্সমূলারকে জানিয়েছেন যে, অধ্যাত্মক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার দিকটি খুবই প্রশংসনীয় ছিল বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এমন কতকগুলি দিক ছিল যেগুলি মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর প্রধান অভিযোগ এই যে, তিনি স্ত্রীর প্রতি খুব নির্মম ব্যবহার করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের লেখা চিঠির ভাষা হুবহু উদ্ধৃত না করে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার সারমর্মটুকু শুধু উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি লিখছেনঃ 'মজুমদার রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ প্রায় প্রমাণিত বলে মনে করেন, সেটি তাঁর স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার। এই কথায় তিনি [প্রতাপচন্দ্র] এইটি বোঝাতে চাইছেন যে, তিনি [রামকৃষ্ণ] সতের বৎসর বয়সে উপনীতা হবার আগে পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীকে ভুলে গিয়েছিলেন অথবা অবহেলা করে-ছিলেন।'[১]

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁর গ্রন্থে এই অভিযোগের উত্তর দিচ্ছেন এইভাবেঃ 'ভারতবর্ষে একে মোটেই নিষ্ঠুর আচরণ বলা যায় না। বিবাহের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নীর বয়স ছিল পাঁচ বৎসর। * পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে স্বামীগৃহ এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট যাবার আগে পর্যন্ত তার নিজ পিত্রালয়ে থাকবে—এটি ভারতে একটি স্বীকৃত প্রথা।'[২]

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত তথ্য-অনুসারে ম্যাক্সমূলার জানতে পেরেছিলেন যে, সতের বৎসর বয়সে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী পতিসন্নিধানে এলেন, তখন তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীর শর্ত মাথা পেতে নিয়েই সারদামণি তাঁর সঙ্গে বাস করে পরম পরিতুষ্টি লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, শ্রীমা যখন এলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে সংসারপথে টেনে নিতে চান, না ইষ্টপথে সহায়তা করতে চান! পত্নী তখন তাঁকে একান্ত অভিপ্রেত উত্তর দিয়েছিলেন ; প্রজ্ঞাবতী মৈত্রেয়ীর মতো তিনি সংসারসুখভোগের মায়া মুহূর্তে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বামীকে অধ্যাত্মজীবনপথে সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এইজন্যই তাঁদের দাম্পত্যজীবনে কোন দৈহিক সম্পর্কের নিদর্শন নেই। পারস্পরিক সম্মতিতে তাঁদের সম্পর্কের যে-দিক নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, তাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তৃপ্ত এবং সুখী ছিলেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জুলাই ম্যাক্সমূলারকে লেখা শ্রীমতী ওলি বুলের চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে ম্যাক্সমূলার দৃঢ়ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, উভয়ের মিলিত জীবনে দেহসম্পর্কের নিদর্শন নেই বলেই এতে নিষ্ঠুরতা আছে বলে মনে করা যায় না। বরং এই অভিযোগের জন্য তিনি খুব বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রতাপচন্দ্রের অভিযোগের উত্তরে তিনি বলছেন—প্রথমত, পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত সম্পর্কের মধ্যে অবিচারের কোন প্রশ্নই ওঠে না (Volenti nonfit injuria)। দ্বিতীয়ত, সারদাদেবী নিজে কখনও তাঁর প্রতি স্বামীর আচরণকে নিষ্ঠুর বলে মনে করতেন না। তিনি নিজে যেখানে অভিযোগের কোন কারণ খুঁজে পাননি, সেখানে গায়ে পড়ে অন্যের অভিযোগ জানাবার কি অর্থ? এ তো একরকম অনধিকার-চর্চা। ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী অথবা অন্য কোন সূত্র থেকে এ-ধরনের অভিযোগ আর পাননি। সুতরাং, এটিকে একক এবং বিচ্ছিন্ন একটি দৃষ্টান্ত বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যেহেতু নৈয়ায়িক (dialogic) পদ্ধতিতে তথ্য যাচাই করছেন, সেজন্য একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তও তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছে, অবজ্ঞাত বা বর্জিত হয়নি। কিন্তু এই অভিযোগের যৌক্তিকতা বা সারবত্তা সম্বন্ধে তিনি তীব্র সংশয় জ্ঞাপন করেছেন।

এই পর্যায়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেনঃ 'রামকৃষ্ণ কে। কে তাই জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে

এই সোনার বাঙলায় এমন সোনার চাঁদ—গোরাচাঁদের পর—আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই। আহা—তাঁহার ভাগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল। বনিতা-বিলাস দোষে উহা কখনও কলুষিত হয় নাই। তাঁর যখন বিবাহ হয়—তখন তাঁহার পত্নীর বয়স আট বৎসর। বিবাহের আট বৎসর পরে ঐ সতীলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। লক্ষ্মী তখন ষোড়শী যুবতী। রামকৃষ্ণদেব ঐ লক্ষ্মীকে বিধিমতে পূজা করেন ও নিজের জপের মালা তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গের পর রামকৃষ্ণ-চন্দ্রে ষোড়শ-কল-চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে। ঐ শোভা ইতিহাসে অতি দুর্লভ। অনেক অনেক সাধু-মহাজন সহ-ধর্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা।—চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমতি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শীপূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্র-মণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে ত একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণ-প্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।'[৩]

ব্রহ্মবান্ধবের এই কবিত্বপূর্ণ মন্তব্যের মধ্যে দুটি জিনিস অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অন্তরঙ্গে অবস্থান না করেও তিনি এই সাধকদম্পতি সম্পর্কে অনুরাগ-মিশ্রিত শ্রদ্ধার অধিকারী। দ্বিতীয়ত, তাঁর শ্রদ্ধাসন্নত উক্তির মধ্যেই চকিত উদ্ভাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের নিহিতার্থটুকু প্রতি-ফলিত হয়েছে। '...শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা।' —এই সংক্ষিপ্ত উক্তিতে উভয়ের মধ্যেকার কামনাশূন্য হৃদয়সম্পর্কের দিকটি যেমন উদ্ঘাটিত হয়েছে, তেমনই প্রচলিত দাম্পত্যজীবনের ঊর্ধ্বে যে অধ্যাত্মসূত্রের বন্ধনে স্বামী এবং স্ত্রী সংযুক্ত ছিলেন, তার দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। এই যোগসূত্রেরই আর এক নাম 'ত্যাগ'—সংসারের মোহময় আবেশকে ত্যাগ। কিন্তু অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যের মহিমায় আবার এই ত্যাগই স্বীকৃতির চরমোৎকর্ষ—'অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা'।

সেকালের দু-একটি সাময়িক পত্রিকাতে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের (১৫-১৬ আগস্ট ১৮৮৬) পর তাঁর সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছিল, তাদের মধ্যেও প্রাসঙ্গিকভাবে দৈহিকসম্পর্কহীন উভয়ের দাম্পত্যজীবনের উল্লেখ আছে। বোঝাই যাচ্ছে—শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর স্বতন্ত্র মূল্য সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবিগণ তখনও খুব মনস্ক হননি। এর প্রধান কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীমায়ের জীবন ও কর্মধারা তখন আলাদাভাবে প্রচারিত হয়নি। তিনি অনেকখানি লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে প্রধানত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর এবং নিজ স্বামী এবং পিতৃপরিবারের মধ্যে আপনার কর্মশক্তিকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কাজেই স্বামীর সাধনায় সহধর্মিণী হিসাবে তাঁর অবদান বা গুরুত্বের কথাই এই পর্বের লেখাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে।

॥ দ্বিতীয় পর্যায় : তিরোধানের পরে ॥

শ্রীমায়ের দেহোপরম ঘটে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণ, ইংরেজী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই। দেহরক্ষার অব্যবহিত পরে তাঁর সম্পর্কে তেমন একটা আলোচনা চোখে পড়েনি। ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' (জুলাই ১৯২০), 'বেদান্তকেশরী' (জুন ও জুলাই ১৯২০) এবং বাঙলা 'উদ্বোধন' (শ্রাবণ ১৩২৭) পত্রিকায় তাঁর তিরোভাবের সংবাদটুকু শুধু প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র একটি সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯২০) এবং 'বেদান্তকেশরী'র দুটি সংখ্যায় (অক্টোবর ১৯২০ ; নভেম্বর ১৯২০) তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছিল। তবে অনুমান হয়, এই রচনাগুলি সম্পাদকীয় দপ্তর কর্তৃক লিখিত—সুতরাং ভক্তমণ্ডলীরই রচনা। তিরোধানের ঠিক পরের মাসের 'উদ্বোধনে' (ভাদ্র ১৩২৭) শ্রীমায়ের সম্পর্কে দুটি লেখা বেরিয়েছিল। একটি শ্রীমায়ের ভক্তমণ্ডলী এবং সেবিকাদের অন্যতমা সরলাবালা দাসীর লেখা ('মায়ের কথা'), অন্যটি 'শ্রী—' এই সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে কোন অনামা লেখকের লেখা ('মা')। ঠিক এর পরের মাসের 'উদ্বোধনে'ও (আশ্বিন ১৩২৭) শ্রীমায়ের সম্পর্কে বিমলানন্দ নাথ নামে একজন ভক্তের একটি স্মৃতিচারণমূলক রচনা ('মাতৃদর্শনে') প্রকাশিত হয়েছিল। 'উদ্বোধনে'র এই তিনটি রচনাই শ্রীমায়ের ভক্তজনেরই প্রণীত। 'শ্রী—' ছদ্মনামের অন্তরালেও কোন অন্তরঙ্গ ভক্তই আবেগাপ্লুত চিত্তে মায়ের কথা স্মরণ করেছেন বলে মনে হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রায় চার বৎসর পরে 'প্রবাসী'তে (বৈশাখ ১৩৩১) নাম উল্লেখ না করেও এই লেখাটির কথা বলেছেন।

শ্রীমায়ের স্থূল দেহাবসানের প্রায় চার বছর পরে তাঁর সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন প্রখ্যাত মনস্বী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৩১) তৎকালে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তিনি শ্রীমায়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা করেন। এই রচনায় তিনি শ্রীমায়ের একটি আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। শ্রীমায়ের জীবনচরিত রচনার জন্য তিনি দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেন।

প্রথমত, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমায়ের ভক্তদের অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা রচিত জীবনীগ্রন্থ। এইরকম গ্রন্থ স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের ভক্তি এবং অনুরাগের আলিম্পনে রঞ্জিত হবে। কিন্তু এ-ধরনের গ্রন্থেরও গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার কথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করেছেন। কারণঃ 'যাহাতে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কোনও কথা কাজ ঘটনা আখ্যায়িকাই তুচ্ছ নহে। কাহারও জীবন্ত ছবি মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে এগুলি আবশ্যক।'

দ্বিতীয়ত, শ্রীমায়ের একটি নিরপেক্ষ জীবনচরিত রচনার প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, এমন একটি জীবনচরিত লেখা উচিত 'যাহাতে সরল ও অবিমিশ্রভাবে কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা টিপ্পনী, ভাষ্য থাকিবে না।' এই ধরনের চরিতগ্রন্থের গুরুত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ '...রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগেরও রামকৃষ্ণ ও সারদামণিকে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক।'•

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, এ-পদ্ধতিতে লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনচরিতের প্রয়োজনীয়তার কথাও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্যক্ত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এ-ধরনের একটি চরিতগ্রন্থের প্রয়োজন অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারও অনুভব করেছিলেন। তিনি এ-পদ্ধতির নাম দিয়েছেন নৈয়ায়িক পদ্ধতি (dialogic process)। অনেকটা ন্যায়ের পূর্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষের অভিমত বিনিময়ের পর কোন বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পদ্ধতির মতো। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি, সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করে গ্রহণবর্জনের পন্থায় একটি ধারণা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। একে আমরা বলতে পারি নির্মোহ তথ্য ও বিচারনির্ভর রীতি। এই রীতিতেই অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে চরিতগ্রন্থটি রচনা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমায়ের এইরকম একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করার জন্যই আগ্রহী এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের আহ্বান জানিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, একালের ভক্তিতে আস্থাহীন, যুক্তিবাদী, শিক্ষিত মানুষের কাছে শ্রীমায়ের এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে এইভাবে উপস্থাপিত করার যে জরুরী প্রয়োজন আছে, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উভয়েই প্রায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণচরিত লেখার সময় স্বামীজীর প্রেরিত পরিমিত তথ্য, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের চিঠি এবং 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যাতে প্রাপ্ত বিবরণ ছাড়া অন্য কোনও আকর থেকে তেমন সহায়তা পাননি। তবে তিনি স্বামীজীর প্রেরিত বৃত্তান্তকেই প্রধানত নির্ভরযোগ্য সূত্র এবং ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। রামানন্দের সারদাচরিত বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার সময়ও তেমনই স্বামী সারদানন্দের মহাগ্রন্থই প্রধান অবলম্বন হয়েছিল। এছাড়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-সংখ্যা 'উদ্বোধন' পত্রের দুটি প্রবন্ধ থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশী তথ্য এবং সূত্র তখন পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি। এই পরিমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমায়ের জীবনীরচনার একটি দিকচিহ্ন রেখে গিয়েছেন।

জীবনকথা বর্ণনা ছাড়াও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের দাম্পত্য-সম্বন্ধ-বিষয়ে যে আলোকপাত করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেনঃ 'সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহারা হয় কখনও বিবাহই করেন নাই, কিংবা বিবাহ করিয়া থাকিলে পত্নীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বর্জন করিয়া এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে যখন তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না তখন, কিংবা তাঁহার অনভিমতে কেহ তাঁহার বিবাহ দেন নাই। তাঁহার বিবাহ তাঁহার সম্মতিক্রমে হইয়াছিল—তাঁহার জীবন-চরিতে লিখিত আছে যে, তাঁহারই নির্দেশ-অনুসারে পাত্রী-নির্বাচন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একদিকে যেমন পত্নীকে লইয়া সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ঘর করেন নাই, তাঁহার সহিত কখন কোন দৈহিক সম্বন্ধ হয় নাই, অন্য দিকে আবার তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই ; বরং তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া স্নেহ উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সহধর্মিণীর মতো করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব।

'কিন্তু বিশেষত্ব কেবল রামকৃষ্ণের নহে। তাঁহার পত্নী সারদামণি দেবীরও বিশেষত্ব

আছে। সত্য বটে, রামকৃষ্ণ সারদামণিকে শিক্ষাদি দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা উপকৃত ও উন্নত হইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকা চাই। একই সুযোগ্য গুরুর ছাত্র তো অনেক থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী ও সৎ হয় না। সোনা হইতে যেমন অলংকার হয়, মাটির তাল হইতে তেমন হয় না।'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমায়ের অন্তর্নিহিত প্রতিভার প্রতি এখানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই প্রতিভা তাঁর শিক্ষাগ্রহণ এবং গৃহীত শিক্ষাকে স্বাঙ্গীকরণের ক্ষমতার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। এই ক্ষমতা পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অনন্যনির্ভর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের দাম্পত্যসম্বন্ধের মূলেও ছিল শ্রীমায়ের চরিত্রের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। রামানন্দের অভিমতেঃ '...সারদামণি দেবীও যদি সম্পূর্ণ কামনা-শূন্যা না হইতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের "দেহবুদ্ধি আসিত কি-না, কে বলিতে পারে?" পৃথিবীর নানা কার্যক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের পত্নীদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তাঁহারা উঁহাদের সহায় হইয়া উঁহাদের জীবন-পথ সর্ববিধ সাংসারিক বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত না রাখিলে, উঁহারা এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন না। ...আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে সারদামণি দেবীর মূর্তি এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি-না, সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ আছে।'

উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষ অংশটি একদিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমা যেমন একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে তৈরী, তেমনই স্বামীর জীবনসাধনায়ও তাঁর অবদান প্রায় তুল্যমূল্য। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া এবং পতাকাবাহিকাই শুধু নন, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ হওয়ার দুশ্চর তপস্যার পথে প্রেরণা ও সহায়তা পেয়ে তাঁর কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী। এই ঋণস্বীকারে অবশ্য গ্রহীতার মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি; অপরদিকে দাত্রীহৃদয়ের অপার সমমর্মিতা উৎসারিত হয়েছে। এই হৃদয়োৎসারিত সমচেতনায় তিনি পতির যথার্থ সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু এই গুণের সুবলিত উপকরণের উপরই তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়, স্বতন্ত্র ও অনন্যনির্ভর ভিত্তিভূমিটি প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। শ্রীমায়ের চরিত্রের এই স্বকীয় মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনস্বী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চরিত্রবিচারের পথে বিরল অন্তর্দৃষ্টির অভিজ্ঞান রেখেছেন। এছাড়া, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমায়ের বুদ্ধিমত্তা, নির্লোভিতা, নিস্পৃহতা, সুবিবেচনা, লজ্জাশীলতা, স্থির মস্তিষ্ক, সেবাপরায়ণতা, সময়ানুবর্তিতা, অধ্যবসায় এবং 'পূজা-জপ-ধ্যানে' নিষ্ঠার কথা প্রধানত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' থেকে প্রমাণসহ উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। স্বামীর তিরোভাবের পর সারদাদেবী বিধবার বেশ ধারণ করেননি কেন—এই প্রশ্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে জেগেছিল এবং এই মর্মে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের এক ভক্তকে চিঠি দিয়ে যে উত্তর পেয়েছিলেন তা খুবই বিস্ময়কর। হাতের বালা খুলতে যাবেন এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে এয়োস্ত্রীর চিহ্ন ত্যাগ করতে নিষেধ করলেন এবং জানালেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। এই ঘটনার তাৎপর্য রামানন্দের কাছে এইভাবে প্রতিভাত

হয়েছেঃ 'আত্মার অমরত্বে এইরূপ বিশ্বাস সকলের থাকিলে সংসারে অনেক দুঃখ পাপ তাপ ও দুর্গতি দূর হয়।'[৪]

এই পর্যায়ে ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁর শ্রীমা-সম্পর্কে অভিমত উল্লেখ্য। রোমাঁ রোলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণচরিত গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই রচিত হয়ে যায়। ই. এফ. ম্যালকম-স্মিথ-কৃত ইংরেজী অনুবাদের প্রথম ভারতীয় সংস্করণ অদ্বৈত আশ্রম থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে প্রকাশিত হয়।

রোলাঁ তাঁর গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণির বিবাহ, পরবর্তী কয়েক বৎসর তাঁদের পৃথক জীবনযাপন, সারদামণির দক্ষিণেশ্বরে আগমন, শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের অন্যত্র আলোচিত অভিযোগ এবং তার উত্তর প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য-পূর্ণ বিচারমূলক বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থধৃত প্রাসঙ্গিক অংশগুলি আমরা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতিঃ 'বিবাহ দিলে তাঁহার ভগবৎ-উন্মাদনা কাটিয়া যাইবে, এই আশায় তাঁহার মা তাঁহাকে বিবাহ দিতেও চাহিলেন। রামকৃষ্ণ আপত্তি করিলেন না। বাস্তবিকপক্ষে, একথা ভাবিয়া তিনি একান্ত নির্দোষ আনন্দও লাভ করিলেন। কিন্তু কী অদ্ভুত সে বিবাহ। দেবীর সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক, তাহার অপেক্ষা এ-মিলন অধিকতর বাস্তব ছিল না। বরং ছিল অল্পতরই। কন্যার বয়স তখন (১৮৫৯ খ্রীঃ) মাত্র পাঁচ বৎসর। লেখার সময় আমি বেশ বুঝিতেছি, এই বিবাহ আমার পশ্চিমদেশীয় পাঠকদিগকে ব্যস্ত ও বিস্মিত করিবে। করুক। বাল্যবিবাহের ভারতীয় প্রথা ইউরোপে এবং আমেরিকায় প্রায়ই নিন্দিত হয়। ...অবশ্য, এই প্রথাকে বাস্তবিক বিবাহ বলার অপেক্ষা বৈবাহিক অনুষ্ঠান বলাই ভালো। পশ্চিমদেশীয় বাগ্দান প্রথার মতোই ইহা একান্ত সহজ এবং সরল ধর্মানুষ্ঠান মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে, উভয়ের যৌবন-লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই বিবাহ পূর্ণাঙ্গ হয় না। মিস্ মেয়োর চক্ষে রামকৃষ্ণের বিবাহটি দ্বিগুণ গর্হিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ বৎসর বয়স্কা বালিকার সহিত তেইশ বৎসর বয়স্ক যুবকের বিবাহ! যাঁহারা লজ্জিত উত্তেজিত হইয়াছেন, তাঁহারা শান্ত হউন! এই বিবাহ ছিল দুটি আত্মার বিবাহ। যৌনমিলনের দিক হইতে এই বিবাহ চিরদিনই ছিল অপূর্ণ। "আর্লি চার্চের" যুগে যাহাকে খ্রীষ্টান-বিবাহ বলা হইত, ইহা ছিল তাহাই। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণের এই বিবাহ সুন্দর একটি বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। ফলের দ্বারাই বৃক্ষকে চিনিতে হইবে। এ বিবাহের ফল ছিল বিধাতার ফল—নিকষিত নিষ্কাম ভালোবাসা। তাই শিশু সারদা-মণি এক বয়স্ক বন্ধুর শুদ্ধমতি শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনীতে পরিণত হইলেন—হইলেন

রামকৃষ্ণের বিশ্বাস ও পরীক্ষার নিষ্কলঙ্ক সহচরী। রামকৃষ্ণের শিষ্যরা, তাঁহাকে "মা" এই পবিত্র নামে রামকৃষ্ণের পুণ্য নামের সহিত জড়াইয়া রাখিয়াছেন।'[৩]

রোলাঁর বিচারপূর্ণ সমীক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণির দাম্পত্যজীবনে কোন অস্বাভাবিকতার লক্ষণ ধরা পড়েনি। তিনিও ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য তিনি প্রতাপচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেননি। তিনিও ম্যাক্সমূলারের মতোই বলেছেন যে সারদামণির নিজের এজন্য কোন ক্ষোভ ছিল না। বরং এক গভীর প্রশান্তিতে তিনি নিজে নিমগ্না ছিলেন এবং যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই তাঁর জীবনের সৌম্য প্রশান্তির আলোকস্নানে ধন্য হয়েছেন।

এছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সারদামণির অবদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতিও রোমাঁ রোলাঁ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ দিকটির প্রতি শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আগেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। আলোচ্য পর্বের প্রথমদিকে আমরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির পরিচয় দিয়েছি। তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে রোলাঁর অভিমত মিলিয়ে দেখলেই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য চোখে পড়বে। রোলাঁ লিখেছেন: 'রামকৃষ্ণ তাঁহার এই দায়িত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন এবং এ-জন্য তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, যদি তিনি [তাঁহার স্ত্রী] ইচ্ছা করেন, তবে তিনি নিজে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁহার আদর্শকেও ত্যাগ করিতে পারেন।

'রামকৃষ্ণ সারদামণিকে বলেন: "আমি সমস্ত নারীকে মার মতোই দেখিতে শিখিয়াছি। তাই, কেবলমাত্র তাহা ছাড়া অন্যরূপে তোমাকে আমি ভাবিতে পারি না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে এই [মায়ার] জগতে টানিয়া আনিতে চাও, তবে আমি তোমার বিবাহিত স্বামী হিসাবে তোমার সেবায় আসিতে পারি।"

'...রামকৃষ্ণের মধ্যে মানবিকতাটা অধিক পরিমাণেই ছিল; তাই তাঁহার উপর তাঁহার স্ত্রীর যে অনস্বীকার্য দাবী থাকিতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের সকল দাবী বা অধিকার ত্যাগ করিবার মতো উদারতা ও মহত্ত্ব সারদামণির ছিল। তাই সারদামণি স্বামীকে তাঁহার স্বকীয় আদর্শের অনুসরণ করিতেই উৎসাহ দিলেন। এবং বিবেকানন্দ ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্ত্রীর অনুমতি লইয়াই রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয় কাম্য জীবনের পথে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সারদামণির সারল্যে ও ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।'[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনায় শ্রীমায়ের ত্যাগ ও নিষ্কাম ভালবাসা যে কতবড় প্রেরণা ও সহায়কের কাজ করেছিল, তা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং রোলাঁ পৃথিবীর দুই মহাদেশের অধিবাসী হয়েও প্রায় একই রকম সহৃদয় দৃষ্টির আলোকে বুঝে নিতে পেরেছেন। শ্রীমায়ের সেই পরিমিত পরিচয়ের যুগে তাঁর সম্বন্ধে এইরকম

সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়ে এই দুজন চিন্তাবিদ্ অসাধারণ মনস্বিতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। অথচ এঁরা কিন্তু শ্রীমায়ের ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নন—বরং বিচার-বিশ্লেষণশীল চরিতালেখ্যই এঁরা পছন্দ করেন। সেই বিচারের তৌলদণ্ডেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় শ্রীমায়ের নীরব আত্মসংবৃতি-সমৃদ্ধ অবদানের নিহিতার্থ এঁরা নির্ণয় করেছেন।

॥ তৃতীয় পর্যায় : শতবার্ষিকী ও তার পরে ॥

বাংলা ১৩৬০ সালের ৮ পৌষ, ইংরেজী ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর শ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীর সূচনা। শতবার্ষিকী উপলক্ষে সভাসমিতিতে, উৎসবে যেমন তাঁকে স্মরণ করা হয়েছিল, তেমনই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, স্মারক এবং সংগ্রহ গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছিল। শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা 'উদ্বোধন' এবং ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্র দুটির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া দুটি মূল্যবান স্মারক সংগ্রহ গ্রন্থে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য মহীয়সী নারীদের জীবন ও কীর্তি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ হয়েছিল। এই সমস্ত নারীর জীবনসাধনার সঙ্গে শ্রীমায়ের জীবনসাধনার যে একটি দীর্ঘকালাগত সংযোগসূত্র বর্তমান, উক্ত গ্রন্থ দুটির মধ্যে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। গ্রন্থ দুটির নাম—'Great Women of India' এবং 'Women Saints of East and West'। প্রথম গ্রন্থটি অদ্বৈত আশ্রম থেকে (১৯৫৩) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি লন্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র থেকে (১৯৫৫) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম গ্রন্থের যুগ্মসম্পাদক ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ এবং ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। দ্বিতীয়টির সম্পাদকীয় পরামর্শদাতা ছিলেন স্বামী ঘনানন্দ এবং স্যার জন স্টুয়ার্ট ওয়ালেস। 'ভারতের মহীয়সী নারীবৃন্দ' শীর্ষক গ্রন্থের মুখবন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: যে-কেউ এই গ্রন্থশেষে সংযুক্ত শ্রীমায়ের জীবনীপ্রবন্ধটি পাঠ করলে একটি বিষয়ে সুনিশ্চিত হবেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘ এবং বাইরের লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীমাকে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী বলেই সম্মান করেন না। তাঁর এই ব্যাপক সম্মানলাভের প্রধান কারণ এই যে, তিনি তাঁর স্বামীর প্রকৃত শিষ্যা ছিলেন। তেরো বৎসর স্বামীর তত্ত্বাবধানে যে সাধনা তিনি করেন, তাতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উচ্চতম স্তরে উন্নীতা হয়েছিলেন। এই কারণে স্বামীর মহাপ্রয়াণের পর রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের পশ্চাতে অদৃশ্য চালিকা-শক্তি হিসাবে তাঁর অবস্থান। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর প্রায় চৌত্রিশ বৎসর সহস্র সহস্র ঈশ্বর-অনুসন্ধিৎসুর আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানোর কাজে আত্মনিমগ্না ছিলেন।

ডক্টর মজুমদার আরও লিখেছেন: শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন পর্বে অভূতপূর্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। একজন সহজ, সরলা গ্রাম্যবালিকা থেকে একটি বিরাট সন্ন্যাসিসঙ্ঘের অধ্যাত্মনেত্রীর গৌরবে তিনি সমাসীনা হন। কতকগুলি দিক থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বিশেষত ভারতীয় নারীর বন্দনীয় গুণগুলি তাঁর মধ্যে পরম পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। এজন্য ভারতীয় নারীদের জীবনধারার সঙ্গে তাঁর জীবন ও সাধনার ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক সংযোগ অনুসন্ধানে আলোচ্য স্মারক-

গ্রন্থের প্রয়াস খুবই প্রাসঙ্গিক। গ্রন্থটির ভূমিকায় ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন: নারীরা সহজাত গুণেই সভ্যতার বাণীবাহিকা। আত্মত্যাগের অসাধারণ ক্ষমতার জন্যই তাঁরা অহিংসার আদর্শে প্রশ্নাতীত নেতৃত্বের অধিকারিণী। বিশ্বশান্তির পথে শ্রীমায়ের জীবন একটি উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ দীপবর্তিকা। আজকের হিংসায় উন্মত্ত যুযুধান পৃথিবীর মানুষ তাঁর জীবন ও আদর্শ থেকে শান্তির শিল্পপ্রকরণ (arts of peace) আয়ত্ত করতে পারে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ অন্যত্রও শ্রীমা সম্পর্কে শ্রদ্ধাসম্পন্ন অথচ আধুনিক যুগানুসারী বিচারণা করেছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে কইম্বাটোর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মূল কথাগুলি সংকলিত হয়েছিল। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যার রচনাসমূহ সম্পর্কে আমরা পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার জন্য সেই সংখ্যায় প্রকাশিত ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য এখানেই সংক্ষেপে তুলে ধরছি। এখানে তিনি আধুনিক যুগের মানসিক প্রবণতার প্রেক্ষাপটে শ্রীমায়ের অধ্যাত্মজীবন এবং সংসার-জীবনের গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র বর্তমান যুগের প্রধান উপজীব্য। তাঁর মতে, বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রত্যক্ষ অনুভব এবং আমাদের দেশের ধর্মের ভিত্তিও প্রত্যক্ষমূলক। বর্তমান যুগের দ্বিতীয় বড় পরীক্ষা গণতন্ত্রকে অবলম্বন করে। এখানেও প্রাচীন 'তত্ত্বমসি' রূপ মহাবাক্য অপেক্ষা গণতন্ত্রের মহত্তর ভিত্তি আর হতে পারে না। এই মহাবাক্য যে উপলব্ধির দ্যোতক তার মূল কথা হল—জাতি-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানব সেই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশমাত্র। সুতরাং প্রত্যেকেই আপন ঐহিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্তির সমান অধিকারী।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর সারদাদেবী অনেক বৎসর জীবিত থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যের প্রেরণার উৎস হয়ে বিরাজ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, জাতি-কুল-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর নরনারীকে উদার সমদৃষ্টিতে তাঁর স্নেহাঞ্চলে আকর্ষণ করতে তিনি সমর্থ ছিলেন। এ কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি নির্বিশেষে ব্রহ্মকে নিজ জীবনে উপলব্ধি করে এক সর্বসংস্পর্শী হৃদয়সম্পদের অধিকারিণী হয়েছেন। আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ দার্শনিক ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ শ্রীমায়ের জীবনাদর্শের আলোকে এযুগের বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিজ্ঞানের জড় প্রত্যক্ষবাদ মানুষকে ঐহিক সমৃদ্ধি দান করে, কিন্তু চিত্তসম্পদের অধিকারী করে না। আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা কেবল শাসনক্ষমতা দখলের অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দেয়, মানুষকে ভালবাসতে প্রেরণা দেয় না। গণতন্ত্র এখন শুধু কথার কথায় পর্যবসিত। কিন্তু শ্রীমায়ের জীবনে যে সর্বচিত্তজয়ী ভালবাসার শক্তি ছিল, তাই বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের দুরারোগ্য ব্যাধি প্রশমনে অমৃতের কাজ করতে পারে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।[৭]

শ্রীমা যে স্বতন্ত্র একটি চরিত্রমহিমা অর্জন করেছেন, সেদিকে এখন থেকে মনীষি-

জনের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। এখন তিনি শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-বনিতারূপেই নন, সাধনলব্ধ নিজ ব্যক্তিত্বের আলোকেই উদ্ভাসিত। অহিংসা এবং শান্তির মন্ত্রোচ্চারণে এখন তাঁর স্বোপার্জিত অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারী সাধিকাবৃন্দ' গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন শ্রীমতী বিজয়-লক্ষ্মী পণ্ডিত। এই মুখবন্ধে শ্রীমতী পণ্ডিত বলেছেনঃ নারী সর্বযুগে এবং সর্ব-কালে তাঁর পরিবারের বিশ্বাসভূমির রক্ষয়িত্রী। সুপ্রাচীন কাল থেকে কত নাম-না-জানা নারী লোকলোচনের অন্তরালে থেকে স্বামী এবং সন্তানদের নীরব সেবা করে আসছেন। একইরকম ভাবে নিঃশব্দে ধর্মবিশ্বাসকে লালন করে তাঁরা সমস্ত জীবনে একটি সমন্বয়ের ক্ষেত্র রচনায় নিমগ্না থেকেছেন।

শ্রীমা ছিলেন এমনই একজন নারী। এজন্যই তাঁর জীবন ও আদর্শের একটি সর্বজনীন আবেদন আছে। স্বামীর নিঃস্বার্থ সেবা এবং তাঁর ঈশ্বরসাধনার পথে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করে তিনি আদর্শ ভারতীয় গৃহিণীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা হন। এই মহৎ ব্রতে নিবিষ্টচিত্তা থেকেও তিনি অত্যন্ত সাধারণ এবং দৈহিক শ্রম-সাধ্য কাজও অভিনিবেশের সঙ্গে সম্পন্ন করে যেতেন। স্বামীর সান্নিধ্যে তিনি কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সুউচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে উপনীতা হন। তবু বাস্তব দৈনন্দিন সংসারজীবনের দায়িত্বকে তিনি বিন্দুমাত্র অবহেলা করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি যেমন নিয়ত সজাগ ছিলেন, তেমনই তাঁর (শ্রীরাম-কৃষ্ণের) কাছে যে সমস্ত অনুরাগী ভক্তের সমাবেশ ঘটেছিল, তাঁদের তিনি নিজ সন্তানের মতো পরিচর্যা করতেন। তাঁর জীবন তাই ভারতীয় নারীত্বের যথার্থ আদর্শ-প্রকাশক। এই আদর্শের দুটি দিক তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সেগুলি হল—(১) কর্তব্যে জীবন উৎসর্জন ; (২) এই কর্তব্যনিষ্ঠারূপ কর্মযোগের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি অর্জন। নারী-সাধিকাবৃন্দের যে-জীবনবৃত্ত আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে তাতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে অন্যের সংগ্রাম ও বেদনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারলে আত্মোপলব্ধির পথে কিছু অগ্রসর হতে পারি। এই মহীয়সী সাধিকাগণ মুখের কথায় উপদেশ দেননি, তাঁদের জীবন ও সাধনার আলোতেই তাঁদের উপদেশ প্রকাশমান। শ্রীমা যেন এই সমস্ত সাধিকা-নারীর জীবনপথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণতার আহুতি দিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক কেনেথ ওয়াকার (Kenneth Walker) যে-মন্তব্য করেছেন তার সারার্থ তুলে ধরছি। তিনি বলেছেনঃ শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর শিষ্যগণের কাছে কখনও সরাসরি বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রচার করেননি ; কিন্তু তাঁর উপদেশের পিছনে বেদান্তের ভিত্তিই ক্রিয়াশীল। তিনি অত্যন্ত বাস্তব ব্যবহারিক জ্ঞানেরও অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তাঁর নিজ জীবনে মানবজাতি এবং মানুষের বিভিন্ন ধর্মের মূলগত ঐক্য প্রদর্শন করে গিয়েছেন। কেনেথ ওয়াকার ভক্ত অন্নপূর্ণার মাকে দেওয়া শ্রীমায়ের সেই অন্তিম উপদেশের কথা স্মরণ করেছেন। তাতে শ্রীমা বলেছিলেনঃ '...যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, মা ; জগৎ তোমার।' এই সংক্ষিপ্ত, সহজ, সরল উপদেশের যে সুগভীর তাৎপর্য বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান,

তার প্রতি এই বিদেশী চিন্তাবিদ্ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই কয়েকটি সরল শব্দের উপদেশ-কথায় শ্রীমা আমাদের সেই অগভীর স্বার্থকেন্দ্রিক অহমিকা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। এই স্বার্থকেন্দ্রিক অহমিকাই এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই উপদেশে তিনি মানবতার অন্তর্নিহিত ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। এই ঐক্যবোধে 'তোমার', 'আমার' প্রভৃতি শব্দের স্থান নেই, কেউ অনাত্মীয় নয়, সব আপনজন। শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর গুরুত্ব যে ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে বিশ্বের দুয়ারে আপন স্থান করে নিচ্ছে, শ্রীযুক্ত ওয়াকার সে-সম্পর্কে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জীবনের অন্তিম লগ্নে কোন ভক্তনারীকে অতি সাধারণ ভাষায় শ্রীমা যে-কথা কটি বলেছিলেন, তাতে বিশ্বমৈত্রী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির মন্ত্রসংহতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সাধারণ অতি নগণ্য কাজে নিষ্ঠা বিনিয়োগের দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের উপায়ও মায়ের জীবন থেকেই বিশ্ববাসী এখন পেয়ে যেতে পারেন। ভারতবাসীরও একথা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে যে, বাটনা বাটা, কুটনো কাটা, রান্না করার মতো অত্যন্ত তুচ্ছ অথচ অত্যাবশ্যক দিনযাত্রার কাজে নিষ্ঠার যেমন প্রয়োজন, তেমনই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভের জন্যও প্রয়োজন একাগ্রতা। এই নিষ্ঠা যেমন কর্মযোগের চাবিকাঠি, এই একাগ্রতাও তেমনই জ্ঞান ও ভক্তির প্রবেশপথ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই শ্রীমায়ের সরল অনাড়ম্বর জীবনচর্যার অন্তরালবর্তী মহিমাটুকু এখন দেশীবিদেশী চিন্তাবিদ্‌দের মনকে নাড়া দিচ্ছে।

ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং বাংলা 'উদ্বোধন' পত্রিকা দুটির শ্রীমায়ের শত-বার্ষিকী-স্মারকসংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এ দুটি পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যা দুটির লেখক ও রচনাপঞ্জীর দিকে তাকালে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষ শ্রীমা সম্পর্কে চিন্তনের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর জীবন ও সাধনার যুগোপযোগী এবং যুগোত্তীর্ণ মূল্য নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন। কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ্, ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, বিচারক ও আইনজীবী; রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক-অধ্যাপক, সমাজকর্মী, প্রভৃতি প্রায় সমস্ত স্তরের নারী ও পুরুষ চিন্তাবিদ্‌গণ মাতৃমননে অংশ নিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সারদাদেবীর জীবন শুধু ধর্মসাধিকার জীবন রূপেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, মনন এবং কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রেরণা মনীষিজন-সমর্থিত।

উক্ত পত্রিকা দুটিতে শ্রীমায়ের শতবার্ষিকী-সংখ্যায় ভক্তদের প্রত্যক্ষভাবে শ্রীমা সম্পর্কে যেমন স্মরণমনন আছে, তেমনই অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনাকালে ভক্তমণ্ডলী-বহির্ভূত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির শ্রীমা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোকপাত বা বিচারণা আছে।

অধ্যাপক সি. টি. কে. চারি (প্রবুদ্ধ ভারত) এবং ডঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি (ঐ) খুব আধুনিক ও যুগোপযোগী বিশ্লেষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের দাম্পত্যসম্পর্কের মূল্য-নির্ধারণ করেছেন। অধ্যাপক চারি শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের দেহসম্পর্কহীন দাম্পত্য-জীবনকে আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে যাচাই করেছেন। বিশেষত ফ্রয়েড-পন্থী পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মনোবিশ্লেষণ ও সমীক্ষণের সীমাবদ্ধতা লেখক দেখিয়ে দিয়েছেন। এই সমস্ত মনোবিজ্ঞানীর ধারণা—মানুষের সহজ কামস্পৃহাকে অবদমিত

করলে নানা অস্বাভাবিক চিত্তবিক্ষেপের সৃষ্টি হয়। এঁরা অবদমিত-কামের নির্জ্ঞানে আশ্রয়গ্রহণকে অনেক মানসিক ব্যাধির হেতু বলে মনে করেন। ধর্মকে এঁরা আবেশিক উন্বায়ুর (obsessional neurosis) প্রক্রিয়াপ্রসূত বলে নির্দেশ করেন। এঁদের এই ফ্রয়েডীয় বাতিক যে কত হাস্যকর ও ভ্রান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-বর্জিত সহজ স্বাভাবিক দাম্পত্যব্যবহারেই তা প্রমাণিত হয়। কামের ঊর্ধ্বায়ন (sublimation) যে মানুষকে কোন্ উচ্চতর ভূমিতে নিয়ে যায়, তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই দুজনের মিলিতজীবন। উচ্চতর সত্যবোধের তাগিদে ধীরে ধীরে কামস্পৃহা আপনা-আপনি প্রশমিত হতে থাকে এবং উচ্চতম সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় তা একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। এই সত্য-উপলব্ধির প্রেরণাতেই এই আদর্শ দম্পতির ভালবাসা বা প্রেম ছিল নিষ্কাম। ভালবাসার ব্যর্থতা নয়—পূর্ণতাতেই তা সম্ভব হয়েছিল। ঈশ্বরমুখী মন থেকে যে দেহবাসনা দূর হয়ে যায়, একথা আধুনিক পাশ্চাত্য দেহবাদী-মনস্তত্ত্ব এবং জড়বাদী-শিক্ষা স্বীকার করে না। কিন্তু জগতের সাধক ও ধর্মগুরুদের অনেকের জীবনই তো ইন্দ্রিয়বিজয়েরই গৌরবগাথা।[৮]

দক্ষিণ ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম ডিগ্রীপ্রাপ্তা মহিলা এবং সমাজসেবিকা শ্রীমতী রেড্ডি মনে করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের পবিত্র দাম্পত্যজীবনের আলোকে আধুনিক ভারতের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। পরিবার-পরিকল্পনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধিরোধ এবং সমজাতীয় অনেক সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দ ও সরকার আজকাল প্রচুর অর্থ ও উদ্বেগ-বিনিয়োগ করেও ঈপ্সিত ফল পাচ্ছেন না। কিন্তু সংযত পারিবারিক তথা দাম্পত্যজীবনের সহজ অথচ ব্যয়কুণ্ঠ পন্থায় এসব সমস্যা যে অনেকাংশে নিরাকরণ করা যায়, তা অনেকেই জানেন না বা ভেবে দেখেন না।[৯]

প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন যে, শ্রীমা তাঁর স্বামীর অধ্যাত্ম-জীবনের সহায় ও সঙ্গিনী ছিলেন, স্বামীর 'মানসপুত্র'দের জননীস্বরূপা ছিলেন। তিনি ছিলেন সেবার প্রতীক, স্নেহের উৎস, পবিত্রতার আদর্শ। এই সমস্ত গুণের সমন্বয়ে তাঁর মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়েছিল, তাতে তিনি শুধু স্বামীর লীলা-সহচরীর প্রয়োজন সিদ্ধ করেননি, অগণিত ভক্ত ও তাপিত নরনারীর স্নেহ ও ভালবাসার তৃষ্ণা তৃপ্ত করেছেন। তিনি মায়ের আসনে ভূষিতা হয়েছিলেন কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী হওয়ার জন্য নয়, নিজ হৃদয়ের মাতৃত্বগুণের অধিকারে। সেবা, স্নেহ, পবিত্রতা মাতৃচরিত্রের বন্দনীয় গুণ। এই সমস্ত গুণেই তিনি আজ সকলের বরণীয়া।[১০]

ওড়িয়া লেখক ডক্টর মায়াধর মানসিংহও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনিও বলেছেন যে, শ্রীমায়ের পরিচয় বা খ্যাতি শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-জায়ারূপেই নয়, আপন মহিমাগুণেই। বাইরের দিক থেকে দেখলে তাঁকে সামান্যদের মধ্যে অতি সামান্য মনে হত, কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যে তিনি ছিলেন রাজরাজেশ্বরী। অন্তরের ঐশ্বর্য-মহিমা

প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন তিনি সমস্ত বাহ্যাবরণ সংহরণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু শ্রীমা নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে, নারীমহিমা বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী, বসনভূষণ, পদগৌরব, আধিপত্য কিছুরই প্রয়োজন নেই। ডক্টর মানসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের ব্যাপক প্রভাবের আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, এই দুইজন বাংলা ও ভারতের পল্লীসংস্কৃতির ফলস্বরূপ। সেজন্যেই তাঁদের বাণীর এত প্রসার। দেশের মাটি এবং দেশের জীবন থেকে উদ্ভূত বলেই তাঁদের বাণী ও জীবন আমাদের এত টানে। শ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শে এই দেশীয় সংস্কৃতি আপন মহিমায় বিকশিত হয়ে বিশ্বমানুষকে স্পর্শ করেছে।[১১]

অধ্যাপক রেজাউল করীম 'শিক্ষা ও মুসলিম নারী' প্রবন্ধে বলেছেন যে, শ্রীমায়ের মধ্যে যে নারীত্বের মহৎ বিকাশ ঘটেছিল, তার জন্য লেখাপড়া ও উচ্চ ডিগ্রী অত্যাবশ্যক নয়। তাঁর মতে, 'মনুষ্যত্ব, ন্যায়, নীতি, সদাচরণ, বিনয়, নম্রতা, সেবা ও পরিচর্যার আদর্শ যেখানে নেই সেখানে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোন মানুষকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারে না। জননী সারদামণি ছিলেন মহৎ আদর্শের মূর্ত প্রতীক।'[১২] অধ্যাপক করীমের ধারণা, এই মহৎ আদর্শের ঐশ্বর্যগুণেই আজ শ্রীমা নারীসমাজের মধ্যে পূর্ণ মহিমায় বিরাজিতা। ডক্টর মানসিংহের মতো অধ্যাপক করীমও জানিয়েছেন যে, নারীকে সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করতে হলে এই সব আন্তর ঐশ্বর্যে মহিমান্বিতা হতে হবে। এ কালের নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির উত্তপ্ত আবহাওয়ায় আমরা উচ্চশিক্ষিতা কেতাদুরস্ত মহিলাদের দেখা হয়তো পাব, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা অন্তরে দীনা, হৃদয়ে ক্ষীণা। শ্রীমায়ের জীবন থেকে তাঁরা মনুষ্যত্ব তথা মহিমা অর্জনের শিক্ষা পেতে পারেন।

'জয়ন্তী প্রশস্তি' কবিতায় বেগম সুফিয়া কামাল শ্রীমায়ের এইসব গুণগ্রামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেনঃ

> তাপসীশ্রেষ্ঠা রাবেয়ার মত ত্যাগ সেবা আর ক্ষমা,—
> জীবন ভরিয়া দানিয়া হয়েছ তুমি গো মহত্তমা।[১৩]

ত্যাগ সেবা আর ক্ষমার মতো জীবনদায়ী মহিমা আর কি থাকতে পারে! এই মহিমার অধিকারিণী নারীর মধ্যে মাতৃত্বের যে বিকাশ ঘটে, তাতে অসংখ্য নারী-পুরুষ আশ্রয় খুঁজে পায়। এই আশ্রয়কে স্মরণ করেই আরেকজন শ্রীমাকে 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী' অভিধায় ভূষিত করে লিখেছেন—'সকল সন্তান তরে ক্ষমারূপা তুমি তপস্বিনী'।[১৪]

'ভারতীয় সমাজে নারী-ধর্ম' প্রবন্ধে ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'মানুষত্ব বা মনুষ্যত্ব' নারী এবং পুরুষ উভয়েরই সাধারণ ধর্ম। আত্মাকে আশ্রয় করে যে ধর্ম প্রকাশ পায়, তাই আমাদের ধ্রুব ধর্ম—অধ্যাত্মধর্ম। এই ধর্মের বিকাশেই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরিণাম। নারীর ক্ষেত্রে এই মনুষ্যত্ব 'পাতিব্রত্য, মাতৃত্ব ও অধ্যাত্মধর্মের পরিপূর্ণ মিলনে' সার্থক হয়। পাতিব্রত্য হচ্ছে পতিব্রতের অনুসরণ করা, নির্বিচারে পতির ইচ্ছা বা আদেশের অনুবর্তন নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পতির ইচ্ছানুযায়ী

কাজ না করেও পাতিব্রত্য পালন করতে হয়। পতির অন্যায় ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার না করলে নারীর পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ন হয় না।

পাতিব্রত্য, মাতৃত্ব এবং অধ্যাত্মধর্মের পরিপূর্ণ সংশ্লেষণ খুবই কঠিন এবং সাধনা-সাধ্য কর্ম। এই নিরিখে শ্রীমায়ের জীবন এক বিরল সংশ্লেষণের আদর্শ। কিন্তু এটি তাঁর জীবনে একদিনে সম্ভব হয়নি। স্তরে স্তরে এবং সাধনার কঠিন পথ অতিক্রমণের দুশ্চর অধ্যবসায়ে তা সম্ভব হয়েছিল। প্রবন্ধকার শ্রীমায়ের জীবনে তাই একটি ক্রমবিকাশের পরম্পরা নির্দেশ করেছেন। এই ক্রমবিকাশের তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় তিনি দেখিয়েছেনঃ– ১) জন্ম-বিবাহকাল থেকে অষ্টাদশ বৎসর। এই সময়ে মাতৃত্বের কিছু পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর চরিত্রে আধ্যাত্মিকতার তেমন উল্লেখ্য বিকাশ দেখা যায়নি। ২) তারপরে দক্ষিণেশ্বরে আগমন, ষোড়শী পূজার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনার সমাপ্তি এবং সারদাদেবীর গভীর তপস্যার আরম্ভ। এই সময় থেকে পনের বৎসর অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষাকাল পর্যন্ত একই সঙ্গে তাঁর পাতিব্রত্য ও অধ্যাত্ম-সাধনা চলেছে, শিষ্য ও ভক্তগণকে নিয়ে মাতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। ৩) শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর চৌত্রিশ বৎসর অর্থাৎ নিজ লীলাসংবরণের কাল পর্যন্ত চলেছে অপূর্ব মাতৃধর্মের স্ফুরণ; তিনি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী। এই পর্বে তাঁর মাতৃধর্ম ও গুরুধর্ম এক হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টপথে সহায়তা করার অঙ্গীকারে তাঁর যে নিষ্কাম পাতিব্রত্যের সূচনা, পতির অবর্তমানে তাঁর আদর্শের দীপবর্তিকা বহন করে তিনি সঙ্ঘজননী ও অধ্যাত্মগুরুর ভূমিকায় সেই পাতিব্রত্যের সঙ্গে মাতৃত্ব এবং অধ্যাত্মধর্মের পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। একটি পুষ্পকোরক যেন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হতে হতে এক প্রস্ফুটিত কুসুমের রূপ নিয়েছে। কিন্তু পরিণতি সহজে আয়ত্তে আসেনি। অনেকে মনে করেন, স্বামীর কৃপাতেই তাঁর সব সাধনা অনায়াসে সিদ্ধিতে পরিণত। এ ধারণা যে কত ভুল, ডক্টর দাশগুপ্ত শ্রীমায়ের জীবনসাধনায় এই ক্রমোত্তরণের স্তরগুলি নির্দেশ করে তা প্রতিপন্ন করেছেন। লেখক শ্রীমায়ের জীবন ও সাধনা পর্যালোচনায় একটি নতুন দিক্‌চিহ্ন উন্মোচন করেছেন।[১৫]

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তৎকালীন অধ্যক্ষ শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীমাকে ষোড়শীপূজার আসনে স্থাপন করার ঘটনাটিকে এ যুগের নারী-মর্যাদা ও অধিকারলাভের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।[১৬]

হিন্দু-নারীদের পক্ষে পতিপূজা ঈশ্বরলাভের সোপান বলে আবহমান কাল ধরে স্বীকৃত। কিন্তু স্বামীর পত্নীপূজা ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। ভারত ও ভারতের বাইরে বহু জায়গায় যখন নারী নানা অবিচার এবং অপমানে ক্লিষ্ট, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জায়াকে দেবীরূপে পূজা করে নারীকে এক অচিন্তিতপূর্ব সম্মান ও গৌরবে ভূষিত করেছেন। শ্রীমা এই সম্মানলাভে অভিভূত এবং আত্মবিস্মৃত হননি। বরং গৃহিণী, সন্ন্যাসিনী এবং জননীর সত্তাকে একসূত্রে গ্রথিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন

নারীর পক্ষে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব ; তার সমস্ত অভিযোগের প্রতিকার আন্দোলনে নয়, আত্মোপলব্ধিতে, সম-অধিকারলাভে নয়, সমবেদনার সংরাগে। তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় এযুগের বিবাহ এবং দাম্পত্য জীবনের ধারণার পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর যুগল-জীবনকে বিচার করেছেন। তাঁর মতে, আজকের যুগে বিবাহ বলতে জীবনচর্যা ও আকাঙ্ক্ষার সম্মিলন বোঝায় না। এযুগে দেশে এবং প্রধানত বিদেশে বিবাহ স্বাধীনতার ভ্রান্ত ধারণায় বিপথে চালিত হয়েছে। এ শুধু একটা ক্ষণস্থায়ী এবং সুবিধাজনক চুক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। এ মিলনও ক্ষণস্থায়ী হয়ে যায়। প্রবৃত্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে স্বামী এবং স্ত্রী পৃথক ভাবে নিজেদের পথে চলছে। গৃহ একটি অস্থায়ী মেস বা সরাই-খানায় পরিণত এবং শিশুসন্তানেরা সেখানে আবর্জনা বলে বিবেচিত। শ্রীমায়ের জীবন এই ভ্রান্তি নিরাকরণে উজ্জ্বল পথরেখার সন্ধান দেয়। স্বামী এবং স্ত্রীর জীবন যে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে তার দৃষ্টান্তস্থল এই দিব্যদম্পতির জীবন। স্ত্রী এখানে স্বাধীনতার মায়ামৃগের সন্ধানে ছুটে ক্লান্ত হয় না। শ্রীমা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের স্থূল প্রবৃত্তি এবং বাসনা জয়ের দ্বারাই প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভ সম্ভব এবং স্বামী-স্ত্রীর সম আদর্শ অনুসরণ এবং 'স্বার্থত্যাগের অর্থনীতি' (economics of donation) দ্বারাই এ স্বাধীনতা সত্যমূল্যে লাভ করে। দেনাপাওনার হিসাব বা ক্ষতিপূরণলাভের অতিস্থূল প্রয়াসে সংসার শুধু অশান্তির রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।[১৭]

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে শ্রীমায়ের মাতৃত্ব এবং নেতৃত্বশক্তির দিকেও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্তগণের উপর তাঁর ভালবাসা এবং তাঁদের কল্যাণের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা তুলনারহিত। নিদারুণ হতাশার মুহূর্তে তিনি তাঁদের আশার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যে-কোন সমস্যায় তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়ে এবং পথ দেখিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। প্রবন্ধকার মনে করেন, রামকৃষ্ণসংঘ আজ যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিবৃন্দের প্রেমের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তার মূলে শ্রীমায়ের নেতৃত্ব এবং মাতৃত্ব লোকলোচনের অন্তরালে চালিকাশক্তির কাজ করেছে। মঠ-মিশনের ভক্ত ও কর্মিবৃন্দ, সন্ন্যাসী ও শিষ্য সকলেই যে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ, তার মূলে শ্রীমায়ের জীবনব্যাপী ভক্তিনম্র সাধনা এবং দুঃখহর প্রেম প্রেরণা হিসাবে বিরাজিত।[১৮] ভারতের উচ্চতম আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এন. চন্দ্রশেখর আয়ারও অনেকটা বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের অভিমতের অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় নারীর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে তার সঙ্গে শ্রীমায়ের জীবন ও চরিত্রের সাযুজ্য দেখিয়েছেন। আধুনিক কালের নারী শিক্ষিতা, কিন্তু আত্মসম্বৃতা নয়, স্বার্থসন্ধানে তৎপর, কিন্তু গৃহকর্মে উদাসীন বা অপটু। কিন্তু আবহমান কাল ধরে ভারতীয় নারীদের বিশ্বাস, গৃহধর্মের দায়িত্বপালন করে তাঁরা যে আনন্দ পাবেন, অধিকার আদায়ে তৎপর হয়ে তার কণামাত্রও লাভ হবে না। ভারতীয় নারী আত্মত্যাগ এবং দায়িত্ববহনক্ষমতার আদর্শস্বরূপ। শ্রীমায়ের জীবনে এই

আদর্শ পরিপূর্ণরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা, অসাধারণ সাধারণ-জ্ঞান (uncommon common sense), বাস্তব-বুদ্ধির কিছুমাত্র অভাব ছিল না। অনেক সময় তাঁর উপদেশ সংকট-সময়ে চাওয়া হয়েছে এবং তার খুব ফলপ্রসূ ভূমিকা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই দিক থেকে তাঁর মনীষাও কোন অংশে কম ছিল না। তাঁকে এক কথায় 'মনস্বিনী' বিশেষণে ভূষিত করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং সমাজের নেতৃত্ব হাতে পেলেই যে মনস্বিতা লাভ করা যায় না, তার প্রমাণ তো আজ আমরা চারপাশে তাকালেই দেখতে পাই। লেখক মন্তব্য করেছেন যে, 'শ্রীমা অনেক বিদ্বান অধ্যাপকের চেয়েও প্রজ্ঞার অধিকারিণী ছিলেন (...she was more wise than many professors of learning)।' তাই আজকের যুগের নারীর সামনে বিরাট প্রশ্ন—তাঁরা ভারতীয় নারীর এই সুপ্রাচীন আদর্শকে দূরে নিক্ষেপ করে উন্নতি এবং সমৃদ্ধি পাবেন কিনা। আধুনিক উচ্চশিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন গৃহ-ধর্মের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করতে পারলেও হয়তো তাঁদের অভীষ্ট কিছুটা সিদ্ধ হতে পারে। কারণ বিচারপতি আয়ারের মতে, শ্রীমায়ের জীবন থেকে ভারতীয় নারী এ শিক্ষা পাবেন যে, তাঁরা কাঞ্চন ছেড়ে কাচখণ্ড খুঁজছেন, ছায়াকে কায়া বলে ভুল করছেন; তাঁরা আত্মানাত্ম বিবেকলাভ করে নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরাই ঠিক করে নেবার সুস্থিত বুদ্ধি ও অধিকার পাবেন।[১১]

এই সমস্ত আলোচকেরা একটা বিষয় অন্তত পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, মন ঈশ্বরমুখিন হলে বা সত্য-উপলব্ধির পথে চললে সংসারে অনাসক্তি আসতে পারে, কিন্তু সাংসারিক দায়িত্ববোধে অবহেলা বা ঔদাসীন্য আসে না। তখন আরও নিষ্ঠা এবং মনোবল নিয়ে অনাসক্তচিত্তে সংসারকর্মে নিরত হওয়া যায়। শতবার্ষিকীর সময়ই 'উদ্বোধন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' ছাড়া ইংরেজী 'দ্য মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর একটি রচনা বেরিয়েছিল। তাতে তিনি বলেছেন যে, শ্রীমায়ের জীবন ছিল নিরন্তর-নীরব একটি প্রার্থনার মতো। আবার অন্যদিকে তা ছিল অগণিত ভক্তের ইষ্টলাভের অভ্রান্ত দিশারি। শ্রীমায়ের হৃদয় ছিল প্রশস্ত, সেখানে হিন্দু-মুসলমান সবার জন্য সমান স্নেহ ছিল।

শ্রীমা ছিলেন যেন সংরক্ষিত শক্তির (energy conserved) মূর্ত প্রকাশ। এই শক্তি মানবীর আকৃতি অবলম্বন করে মানবপ্রেম ও জগৎকল্যাণের শিক্ষা দিয়ে গেছে। তাঁর জীবনের বাণী হল—পবিত্র জীবনযাপন এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হয়ে অবিরাম মানবকল্যাণের জন্য কর্মে আত্মনিয়োগ।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীমা সম্পর্কে মনস্কতার যে সূচনা ও প্রসার ঘটেছিল তার দূরবিস্তারী প্রভাব শতবার্ষিকী-উত্তর কাল পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ সপ্তম এবং অষ্টম দশকেও দেশী-বিদেশী মনস্বিগণ মাতৃচিন্তায় রত আছেন। বরং শতবার্ষিকীর দীর্ঘকাল-পরবর্তী এই সমস্ত রচনাসমূহে সময়ের দূরত্বের জন্যই শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর মূল্যায়নে আরও বেশী আবেগবর্জিত বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একটা জিনিস এইসময়কার লেখাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীমায়ের ব্যক্তিত্বের এমন একটি দিকের প্রতি এখন দেশী-বিদেশী লেখকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, যাকে আধুনিক যুগযন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। এ আর কিছুই নয়, তাঁর সীমাহীন করুণা এবং ভালবাসার সম্পদে ঋদ্ধ সুবিশাল জননী-হৃদয়। একজন বিদেশিনী সারা এন ডেভিডের মতেঃ 'আধুনিক মানুষ, বিশেষত পাশ্চাত্যদেশবাসী মানুষ বাহ্যসম্পদ সমস্ত আহরণ করেও এমন একটি সমন্বয়ী শক্তির অভাব বোধ করছে, যাকে ছাড়া তার জীবন অসুখী এবং অপূর্ণ।'[২০]

এই সংশ্লেষণী শক্তির সন্ধান শ্রীমায়ের মাতৃহৃদয়ের অহেতুকী ভালবাসার মধ্যে খুঁজে পেয়ে পশ্চিমের মানুষ তৃপ্তিলাভ করার আশ্বাস পেয়েছে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় 'শ্রীমায়ের জীবনের কোন্ দিক আমাকে সবচেয়ে উদ্বুদ্ধ করে' (What Inspires Me Most In Holy Mother's Life) শিরোনাম দিয়ে একটি ধারাবাহিক সমীক্ষায় অনেক লেখক-লেখিকার লেখাতেই অনুরূপ অভিমত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আনা নীলউন্ড (জানুয়ারি ১৯৬৯, পৃঃ ১৬), রেভারেন্ড এন্ড্রু বি. লেমকে (মার্চ ১৯৬৯, পৃঃ ১২১), মল্লিকা ক্লেয়ার গুপ্ত (এপ্রিল ১৯৬৯, পৃঃ ১৯৫-৯৬) প্রমুখ লেখক-লেখিকার নাম করা যায়। শ্রীমতী গুপ্ত জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের উপর উৎসারিত শ্রীমায়ের ভালবাসাকে 'পালিকাশক্তি' (protective love) বলে অভিহিত করেছেন। এই ভালবাসার শক্তিতেই এযুগের দ্বন্দ্বদীর্ণ মানুষ সঙ্কট-উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে পারে। অনুরূপ মনোভাবের স্বাক্ষর 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকাতেও শতবার্ষিকী-উত্তর কালের একাধিক লেখায় বর্তমান রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এন্টনী এলেঞ্জিমিত্তম্ (জানুয়ারি ১৯৫৬, পৃঃ ৩৮৫-৮৮), চেরিয়ান জারা (এপ্রিল ১৯৬৬, পৃঃ ৫০৯), এস. রামচন্দ্রন (ডিসেম্বর ১৯৫৬, পৃঃ ৩৪৪-৪৫), প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী খ্রীস্টোফার ঈশারউডের নাম করা যায়। তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ' শীর্ষক জীবনীগ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমায়ের সম্পর্কে যে-সমস্ত মন্তব্য করেছেন, সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের মাতৃসত্তা এবং অধ্যাত্ম-মূর্তির পরিণতি তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে অনুধাবন করেছেন। তাঁর মন্তব্যের একটু অনুবাদ করে দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তাঁর মতে 'যে লাজুক তরুণ-বয়স্কা শ্রীরামকৃষ্ণ-পত্নী এমনকি ভক্তদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতেন, তিনি এখন সকল কৃপাপ্রার্থীর কাছে সহজলভ্যা হয়ে উঠলেন। অথচ তাঁর আচরণে কোনও কর্তৃত্বের মনোভাব ছিল না, নিজের অভিমতকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল না। ...শ্রীমায়ের ভক্তরা তাঁর সহজ সারল্যে অভিভূত হয়ে যেতেন।'[২১] এরপর ঈশারউড তাঁর মাতৃসত্তা এবং অধ্যাত্মগুরুর ভূমিকার গুরুত্ব এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ত্যাগী-সন্তানদের ভালবাসার সূত্রে বেঁধে রেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম পর্বের ভিত্তিটি সুদৃঢ় রাখার মূল্য নির্দেশ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে শ্রীমা সম্পর্কে পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা গুণিজনের রচনার একটি প্রয়োজনীয় সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ করেছেন নন্দ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থটির ভূমিকাতে সংকলক বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ-শ্রীমায়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতিপূর্ণ দাম্পত্যজীবনের তাৎপর্য সংকলিত রচনাসমূহের আলোকেই বিচার করার চেষ্টা করেছেন এবং সর্বশেষে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সমাজের সত্যিকার সমৃদ্ধি নারী-পুরুষের সুষ্ঠু সমন্বিত সম্পর্কের উপরই নির্ভরশীল। কারণ নারীপুরুষ পরম ব্রহ্ম বা সত্যেরই দুই বিভিন্ন প্রকাশ।

সর্বশেষে যুক্ত করা যেতে পারে একালের বিশিষ্ট কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচনা থেকে একটি খণ্ডাংশ। অচিন্ত্যকুমার বলেছেনঃ 'ভগবানকে যাতে আমরা অহেতুক ভালোবাসতে পারি তারই জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ "মা"-মন্ত্র রচনা করেছেন। আর, তিনি শুধু মন্ত্রই দেননি, সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন তার বিগ্রহ। "মা"-মন্ত্রের ঘনীভূত মূর্তিই হচ্ছেন সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত বাক্যের ব্যাখ্যা, সমস্ত কর্মের মূলমর্ম।

'সংসারে সঙও আছে সারও আছে। মায়াও আছে বস্তুও আছে। সার যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা মাতৃত্ব ছাড়া আর কি। আর, এই সার যিনি দেন তিনিই সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার সারভূতা প্রতিমা।

'মা যখন সন্তানকে মারেন সন্তান তখনও মাকেই জড়িয়ে ধরে, তখনও মা-মা বলেই কাঁদে। কেননা সে জানে যে নয়ন তিনি অশ্রু দিয়ে ভরেছেন সেই নয়নই তিনি বারবার স্নেহচুম্বনে ভরে দেবেন।'[২২]

॥ উপসংহার ॥

শতবার্ষিকীর পরিমণ্ডলে প্রণীত ও সংকলিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধসমূহের দুটি সাধারণ লক্ষণ বর্তমানঃ (ক) একদিকে আছে অনুরাগ ও ভক্তিবিনম্র প্রশস্তিবাচন; (খ) অন্যদিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শের মূল্যায়ন। এই-সব মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে স্বভাবতই একাধিক লেখায় পুনরুক্তি থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ও ভারতের এমন এক প্রেক্ষাপটে যখন সদ্যস্বাধীন দেশ নানা সমস্যায় আকীর্ণ। একদিকে দেশবিভাগ এবং জাতিবৈরিতার অভিশাপে দগ্ধহৃদয় বাংলাদেশ, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের দুর্নীতি ও আদর্শভ্রষ্টতায় স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আনন্দোচ্ছ্বাস বিগতপ্রায়। এরকম লগ্নে একটি ইতিবাচক আদর্শ এবং অনুসরণযোগ্য জীবন শ্রীমায়ের মধ্যে বুদ্ধিজীবিগণ অনুসন্ধান করেছেন এবং তা তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছেন। সেই আশ্বাসের সানন্দ অভিজ্ঞতার কথা দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে জানিয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন। শতবার্ষিকী-প্রবন্ধা-

বলীর সবচেয়ে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যই হল—বুদ্ধিজীবী-মহলের একটি ইতিমূলক জীবনাদর্শ-সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষায় শ্রীমায়ের স্মরণ-অনুষ্ঠান-সমূহ যেমন মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে, তেমনই সাময়িক বিক্ষিপ্ত এবং বিক্ষতচিত্ত দেশবাসী বুদ্ধিজীবিবৃন্দের মাধ্যমে একটি সরল অনাড়ম্বর অথচ অনুসরণীয় জীবনে পরম আশ্বাস ও প্রাপ্তির ছবি দেখতে পেয়েছেন। শতবার্ষিকী-উত্তর কালের রচনাসমূহে এই মূল্যবোধই আরও দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সে প্রয়োজন কি জাতীয় জীবন, কি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট—উভয় ক্ষেত্রেই তীব্রভাবে অনুভব করছেন চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ।

মাতৃসমীপে

ভূমিকা

বর্তমান মানবসমাজে পারিবারিক জীবনে ভীষণ অশান্তি জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি বিশেষভাবে নির্ভর করে মাতৃজাতির উপর। বর্তমান জগতের মাতৃজাতিকে সেবার আদর্শ শিক্ষা দেবার জন্যে, গার্হস্থ্য জীবনে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আদর্শ-জীবনের অভিব্যক্তি। ভারতে তথা বিদেশে তাঁর মহতী জীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পবিত্রতম মধুরতম সুন্দরতম শব্দ 'মা'। অভয়প্রদ, আশাপ্রদ, শান্তিপ্রদ রূপ মাতৃমূর্তি। বর্তমান পৃথিবীর অশান্ত মানবহৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করতে ভগবৎ-করুণা মাতৃরূপে আবির্ভূতা। দেখাও যাচ্ছে, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেদ-বিসম্বাদ ভুলে পৃথিবীর সকল দেশের নরনারী মাতৃদর্শনে ছুটে আসছে, মাতৃচরণে লুটিয়ে পড়ছে, 'মা' 'মা' শব্দে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে তুলছে। আর জগজ্জননী মায়ের সেই কথাগুলি আমাদের কানে অনুরণিত হচ্ছেঃ 'ওরাও আমার ছেলে'[১]; 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা'[২]; 'আমার শরৎ [স্বামী সারদানন্দ] যেমন ছেলে, এই আমজদও [গরীব মুসলমান মজুর] তেমন ছেলে'।[৩]

* *

প্রথমবার যখন মাকে দর্শন করতে উদ্বোধনে যাই তখন মা দেশে। তাই মাকে দর্শনের সৌভাগ্য সেবার আর হল না। পূজনীয়া গোলাপ-মা তখন সেখানে। তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করলে তিনি আমরা এত দূরদেশ থেকে কষ্ট করে এসেছি শুনে বিশেষ স্নেহ ও সহানুভূতি দেখালেন এবং মায়ের দর্শন হল না বলে দুঃখ করতে লাগলেন। আমরা তাঁর দর্শনেই আনন্দ প্রকাশ করলে গোলাপ-মা হেসে বললেনঃ 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।' তখন মায়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না। শুনে-ছিলাম ঠাকুরের সহধর্মিণী বেঁচে আছেন, উদ্বোধনে থাকেন। ভক্তরা তাঁকে দর্শন করেন এবং তিনি কোন কোন ভক্তকে দীক্ষাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু উদ্বোধনেই গোলাপ-মার কথায় বুঝলাম, মা কিছু ভিন্ন প্রকৃতির এবং তাঁকে দর্শন করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে বলতে শুনিঃ 'মা আর ঠাকুর কি

আলাদা?' এই উক্তি শোনার পর মাকে দর্শন করার জন্য আমার মনে বিশেষ আগ্রহ হয়।

এরপর একবার মায়ের দর্শনে যাব বলে গাড়ি করে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাই, কিন্তু যে-বন্ধু গাড়িতে তুলে দিতে গিয়েছিল হঠাৎ পড়ে তার একটি হাত ভেঙে যায়। তখন তাকে নিয়েই আবার বাসায় ফিরে আসতে হয়। এর প্রায় দু-বছর পরে আমার জনৈক বন্ধু (পরে স্বামী জ্ঞানানন্দ), তিনি তখন নবাসন গ্রামে ছিলেন, পত্র লিখে জানান, জয়রামবাটীতে গিয়ে মাকে দর্শন ও তাঁর কৃপালাভের বিশেষ সুবিধা। ইতি-মধ্যে আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী দুজন সুহৃদ্ মায়ের কৃপালাভ করেছেন—একজন উদ্বোধনে, অপরজন জয়রামবাটীতে। তাঁদের মুখে মায়ের কথা শুনলাম। একদিন স্বপ্নে মায়ের দর্শন হল। আকস্মিকভাবে মায়ের তিনখানি ফটোও পেলাম। তখন মায়ের ফটো পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। জয়রামবাটীতে পূর্বোক্ত বন্ধুর সঙ্গে প্রথম যেদিন সকালবেলায় উপস্থিত হই, মা সেদিন কালীমামার বাড়িতে ছিলেন। মায়ের ঘরের দরজায় জিনিসপত্র রেখে ঠাকুর প্রণাম করে আমরা কালীমামার বাড়ির দরজার সামনে এসেছি, মা-ও তখন সেই বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন। আমাদের দেখেই দরজার সামনে যে বিরাট পাথরের টুকরো আছে তাতেই বসে পড়লেন—নীচে পা মেলে, কোলের উপর হাত দু-খানা রেখে। পরনে লাল নরুণপেড়ে সাদা কাপড়। মাথায় আধা ঘোমটা টানা, ডানদিক অনাবৃত। অল্প কোঁকড়ানো চুলের রাশি ডান কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে। হাতে বালা, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে লোহার আংটি, গলায় খুব সরু রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে, উন্নত দেহ। তখন তাঁকে বেশ সুস্থ সবল মনে হয়েছিল। প্রসন্নবদনে মৃদু হেসে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'এ ছেলেটি কে গো?' বন্ধু উত্তর দিলেনঃ 'মা, আপনারই ছেলে, আমার বাল্যবন্ধু।' দুজনে মাকে প্রণাম করলাম। মা আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে ডেকে ঘরে নিয়ে চললেন। মায়ের রূপ দেখলাম, কথা শুনলাম,—মা সত্যিই মা। মনে পড়ে গেল স্বপ্নে দেখা সেই মুখের কথা। অজানা অচেনা কোথাও এসেছি বলে মনে হল না। একমুহূর্তেই আপনার হয়ে গেলাম। ভয় ভাবনা সংকোচ সব কাটিয়ে দিলেন। প্রসাদ পাবার সময় মা নিজে হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। নানা কথা হল। আমার বন্ধুটি কথাপ্রসঙ্গে বললেনঃ 'ওর [প্রবন্ধকার] কাছেই আমি প্রথম ঠাকুরের কথা শুনেছিলাম।' আমিও বললামঃ 'আবার ওই আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।' মা শুনে খুব খুশী হয়ে বন্ধুকে ডেকে বললেনঃ 'ভালই হলো, ও তোমার উপকার করেছিল, তুমি আবার ওর উপকার করলে।'

মায়ের করতল ছিল রক্তাভ, অনেকেই তা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। পদতলও ছিল লাল—ঠিক স্থলপদ্মের আভা। মাথায় ছিল সুদীর্ঘ ঘন কালো একরাশ চুল। সূক্ষ্ম রেশম সুতোর মতো উজ্জ্বল, মসৃণ। সামনের দিকটা অল্প কোঁকড়ানো। সুগঠিত মুখে দীর্ঘ নাসা—অপূর্ব সুন্দর। দৃষ্টি প্রশান্ত, স্থির, কৃপামাখানো—যা সকলের অন্তরে সর্বদা করুণা-বর্ষণ করত। প্রশস্ত উজ্জ্বল কপাল, প্রসন্ন মুখ—দেখলেই চিত্ত শান্ত হয়। শ্যামগৌর রং প্রথমে ছিল উজ্জ্বল, শেষ বয়সে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। চেহারা ছিল লম্বা। হাত-পাও অপেক্ষাকৃত লম্বা। একটু বাঁদিকে কাৎ হয়ে চলতেন ধীরে ধীরে। পরে হাঁটুতে বাত ধরেছিল।

সন্ন্যাসী গৃহী সকল সন্তানের উপরই ছিল মায়ের সমান স্নেহ-ভালবাসা। গৃহস্থ সন্তানেরাও যখন মায়ের কাছে এসেছেন কখনও তাঁদের মনে হয়নি যে, তাঁদের প্রতি মায়ের কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ হচ্ছে বা স্নেহমমতার কিছু কমতি আছে। মায়ের সহানুভূতি ও সমবেদনা তাঁদের সুখদুঃখের সংসারযাত্রায় অন্তরের দুঃখবেদনা লাঘব করত ও আনন্দ-উৎসাহ বৃদ্ধি করত। মা অনেকেরই বাড়িঘর, পরিবার-পরিজন, চাকরি-রোজগার, সাংসারিক অবস্থার খোঁজ নিতেন। তাঁরা কোন সমস্যার কথা নিবেদন করলে মা তা মনোযোগ দিয়ে শুনে সঠিক কর্তব্য নির্দেশ করতেন ও উপদেশ দিতেন।

কী আশ্চর্য তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল মায়ের, ভেবে অবাক হয়ে যাই। জয়রামবাটীতে বিভিন্ন স্থানের ভক্ত সমাগত হলে মা রাঁধুনী মাসীকে ঠিক বলে দিতেন, কে কি খাবে, কতটা খাবে, এমনকি রুটির সংখ্যা পর্যন্ত! তাই মায়ের বাড়িতে, মায়ের কাছে খেয়ে ছেলেমেয়ের এত তৃপ্তি! ঠাকুরের কথায়ঃ 'মা ঠিক জানে, কোন্ ছেলের পেটে কি সয়!'

জয়রামবাটীতে দেখা যেত, সব পুরুষ-ভক্তকে খাইয়ে পরে স্ত্রীভক্তদের নিয়ে মা নিশ্চিন্তে আহার করতে বসতেন। দৈবাৎ কোন কাজের জন্য কোন ছেলে বাইরে গেলে, সে না ফেরা পর্যন্ত, যত বেলাই হোক, মা অপেক্ষা করতেন। রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতেন, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেন—'বাছা এত বেলা পর্যন্ত খায়নি, খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে'।

উদ্বোধনে কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার! ছেলেদের না খাইয়ে মা খাবেন না। আর গুরুগতপ্রাণ নিষ্ঠাবান ভক্ত সারদানন্দ ইষ্টদেবীর আহারের আগেই বা কিভাবে খাবেন! সেজন্য ব্যবস্থা হয়েছে, মা মেয়েদের নিয়ে একটা ঘরে আহারে বসবেন, আর শরৎ মহারাজ ছেলেদের সঙ্গে বসবেন অন্য একটি ঘরে, একই সময়ে। মা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দেরিতে খাওয়া অভ্যাস। সেজন্য শরৎ মহারাজেরও হাতের কাজ শেষ হতে হতে বেলা হয়ে যায়! শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ প্রথমে মায়ের পাতে পরিবেশন করা হল। মা তাড়াতাড়ি মুখে দিয়ে শরতের জন্য মহাপ্রসাদ করলেন। গোলাপ-মা সে প্রসাদ এনে দিলেন মহারাজকে। ভাগ্যবান সঙ্গীরাও সে প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হল না।

একবার জয়রামবাটীতে মায়ের জন্মদিনে ভক্তগণের ইচ্ছা হল মা প্রথমে খাবেন, সন্তানেরা পরে প্রসাদ পাবে। একজনের[৪] উৎসাহ বেশী। অগ্রণী হয়ে মাকে এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানাল। মা আজ আর কোন আপত্তি করলেন না, নীরবে সায় দিলেন। ঠাকুরের ভোগের পর থালায় সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য সাজিয়ে দিয়ে আসনের সম্মুখে রেখে তাঁকে ডাকলে তিনি ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতের মতো আসনে গিয়ে বসলেন। করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত দ্রব্য দেখলেন, এটা-ওটা একটু-আধটু মুখে দিলেন। তারপর সামনে যে সন্তানটি ছিল তার মুখের দিকে চেয়ে অতি কাতর-ভাবে বললেনঃ 'ছেলেদের খাওয়ার আগে গলার নীচে যায় না, তাড়াতাড়ি তোমাদের খাবার ব্যবস্থা কর।' এই বলেই হাতমুখ ধুয়ে উঠে পড়লেন এবং নিজের ঘরে এসে দরজার গোড়ায় ছেলেদের খাওয়া দেখতে বসলেন। সব ব্যবস্থাই ঠিক ছিল, মুহূর্তের

মধ্যেই ছেলেরা খেতে বসল। মায়ের প্রাণ ঠাণ্ডা হল। যে আহাম্মক-সন্তান অগ্রণী হয়ে মাকে আজ আগে খেতে রাজি করিয়েছিল এবং বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, এতক্ষণে তার হুঁস হল, তাইতো কি কাজ করলাম! আজ মায়ের খাওয়া নষ্ট করলাম! প্রতিদিনের মতো ছেলেদের খাওয়ার ব্যবস্থা আগে করে পরে মেয়েদের সঙ্গে তাঁকে বসালেই তো ভাল হত। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে সোয়াস্তিতে খেতে পারতেন। হায়! ঐশ্বর্যের দাস আমরা। এই মাধুর্যলীলার কথা কি করে বুঝবো? তাঁকে ঠাকুর-দেবতা সাজিয়ে পূজা-ভোগরাগের ব্যবস্থা করে নিজেদের ঐশ্বর্য-লিপ্সার রসাস্বাদন করি; কিন্তু তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের আবরণ ভেদ করে শুদ্ধ মাধুর্যময় মানুষ-শরীর ধারণ করেছেন, আমাদের মা হয়ে এসেছেন তাঁর স্নেহামৃত পান করাবার জন্য—একথা আমরা বিশ্বাস করতে ও বুঝতে পারলাম কই?

সন্তানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ছিল মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ছেলেদের শুকনো মুখ, দীন বেশ, ক্ষীণ শরীর মা দেখতে পারতেন না। তাই উদ্বোধনে ছিল সকলের জন্য প্রতিদিন মাছের ব্যবস্থা। কারণ বাঙালী ছেলেদের মাছ না হলে পেট ভরে না। আহারের পরে সকলেই পান খাবে, তাই মা নিজেই পান সেজে রাখতেন। আবার, যারা পান বেশী ভালবাসত তারা বেশী পেত। ছেলেরা মুখ ভরে পান চিবুচ্ছে দেখলে মা ভারী খুশী। ছেলেদের সাদা থান-ধুতি পরা মায়ের মোটেই পছন্দ ছিল না। ভক্তেরা তাঁকে অনেক সরু-পাড়ওয়ালা কাপড় দিতেন, তাঁর নিজের ছিল সামান্যই প্রয়োজন। সেইসব কাপড় অকাতরে বিলিয়ে দিতেন ছেলেদের। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ সৌখীন, মা জানতেন। তাকে মিহি সুন্দর-পাড় কাপড় দিতেন। যে মোটা ভালবাসে তাকে তাই দিতেন। কারও কারও কাপড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়—মা তাকে বেশী কাপড় দিতেন। খাওয়া, জল খাওয়া সব ব্যাপারেই যে যেমন চাইত, যার পেটে যেরূপ সহ্য হত, মা তাকে ঠিক সেইরকমই দিতেন।

উদ্বোধনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ বিভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু সকলেই মায়ের সন্তান, মায়ের স্নেহের সমান অধিকারী। তাঁদের সকলেরই খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধার জন্য মা বিশেষভাবে ভাবতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। উদ্বোধনের ডাক্তার মহারাজ স্বামী পূর্ণানন্দজী রাত্রে কোন কোন দিন ঠিক সময়ে খেতে আসতে পারতেন না এবং সেজন্য গঞ্জনাও ভোগ করতেন। একদিন খুব বেশী দেরি হওয়াতে গঞ্জনা খুব বেশী হল দেখে মা তাঁকে আড়ালে ডেকে সস্নেহে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামী পূর্ণানন্দ মায়ের স্নেহের স্পর্শে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন: 'রাজা মহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর] আদেশ, "নিত্য দশ হাজার জপ করবে, সংখ্যা ঠিক রেখে, এবং ভুল হলে প্রথম থেকে পুনরায় জপ করবে। সংখ্যা ভুল হলে জপের ফল রাক্ষসে খেয়ে ফেলে।"' মা রাক্ষসে খাওয়ার কথা শুনে হেসে উঠলেন এবং বললেন: 'বাবা! তোমরা ছেলেমানুষ, চঞ্চল মন, একাগ্রচিত্ত হয়ে জপ করার জন্যই রাখাল এরকম বলেছে। তা বাবা! আমি বলছি, খাবার ঘণ্টা বাজলেই তুমি ঠিক সময়ে চলে এসে খাবে, জপের সংখ্যা পূর্ণ না হলেও দোষ হবে না। পরে আবার সুবিধামত জপ করো।' মায়ের ভরসা পেয়ে সন্তান নির্ভয় হলেন এবং যথাসময়ে খেতে আসতে লাগলেন।

মা প্রতিদিন সকালের পুজোর পর প্রসাদী মিশ্রির সরবৎ একটু খেতেন। এ তাঁর

বরাবরের অভ্যাস। এই ছিল তাঁর সকালের প্রধান জলযোগ—পিত্তরক্ষা। এইটুকু মুখে দিয়ে মা সন্তানদের জলখাবার খাওয়াতেন। মনে পড়ে জয়রামবাটীতে সেই সুমধুর আহ্বানঃ 'বাবা! বেলা হয়েছে, জল খাবে এসো!' সেই ডাক এখনও যেন কানে বাজে, প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় 'পাখী হয়ে উড়ে যাই' সেখানে, সেই বারান্দায়, যেখানে আসন বিছিয়ে জলের গ্লাস ও কাঁসিতে গুড়-মুড়ি, পাতায় প্রসাদী ফলমিষ্টি রেখে দরজার দিকে মা চেয়ে আছেন সস্নেহ নয়নে, ব্যগ্র হয়ে 'বৎসের প্রতীক্ষায় গাভীর ন্যায়'। কিন্তু সে ভাগ্য তো আর হবে না। সারা বিশ্ব খুঁজলেও পাওয়া যাবে না সে মাতৃস্নেহ! ছেলেদের জল-খাওয়া হয়ে গেলে মেয়েদের খেতে দিয়ে মা নিজেও একটু গ্রহণ করেন। ভক্তরা যে ফলমিষ্টি আনে তা অপরেই পায়, তিনি সামান্য একটু মুখে দেন মাত্র। অল্প চারটি মুড়িই তাঁর জলখাবার! পরে দাঁত পড়ে যায়, চিবোতে পারেন না। তাই আঁচলে করে মুড়ি নিয়ে একটা নোড়া দিয়ে সেগুলি গুঁড়িয়ে নেন আর নবাসনের বৌকে ডেকে বলেনঃ 'বৌমা, দাও তো একটু নুন লঙ্কা।'

জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির খাওয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো—সকালে মুড়ি, দুপুরে সিদ্ধ মাঝারি চালের ভাত, কলায়ের ডাল, পোস্ত, একটা ঝাল তরকারী, একটু টক; কখনও শাক, ডালনা, ভাজা। অন্যকিছুও থাকে অনেক সময়। মাছ একটু প্রায়ই থাকে। যতদিন শরীর সুস্থ সবল ছিল মা নিজেই রান্না করে পরিবেশন করতেন। পরে আর পারতেন না। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খাওয়ার সামনে বসে থেকে দেখতেন। আসন, পাতা, জল সব যেন ঠিকমতো হয়—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গ্লাসে জল যেন কমবেশী না হয়। পাতা যেন ঠিক আসনের মাঝখানে থাকে। আসনগুলি ঘনও হবে না, দূরেও থাকবে না—সমান ফাঁক ফাঁক। পরিবেশন হচ্ছে, মায়ের সুমধুর আহ্বান ছেলেদের কানে গেলঃ 'বাবা, বেলা হয়েছে, দেরি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি এস, পাতে ভাত পড়েছে, খাবে এসো।' ছেলেদের একটু দেরি হচ্ছে, হাতের কাজ শেষ না করে আসতে পারছে না; মা পাতা আগলে বসে আঁচল দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। ছেলেরা খাচ্ছে—মায়ের চোখে মুখে কী গভীর আনন্দের প্রকাশ! সুমধুর স্বরে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করছেনঃ 'কেমন হয়েছে?' কারও পাতে ভাত নেই, কারও বা ডাল কম, কার কিসে রুচি দেখে শুনে বলে কয়ে পেটভরে খাওয়াচ্ছেন।

কোন নবাগত ভক্তছেলের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, মায়ের প্রসাদ পাবে। মা তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে প্রথমেই খাইয়ে দিলেন। বললেনঃ 'এখন বসে পেট ভরে খাও, আমার খেতে দেরি হবে। আমি প্রসাদ রাখব তোমার জন্য, পরে পাবে ঠিক।' দুপুরে মা একটু দুধভাতও খান। তরকারি একটু একটু সব মুখে দিয়ে বাটিতে দুধে চারটি ভাত মাখলেন। নিজে একটু মুখে দিলেন, তারপর প্রসাদপ্রার্থী ভক্তকে ডাকলেন। সে উপস্থিত হলে প্রসন্নমুখে বললেনঃ 'বাবা! এই ধর গো! প্রসাদ চেয়েছিলে, বসে বসে তৃপ্তি করে খাও।' সন্তানের প্রাণ জুড়াল, মায়েরও পরমানন্দ! আবার এরকমও হয়েছে যে, কোন ভক্তের মায়ের প্রসাদ পাবার জন্য খুব আগ্রহে মা একটা সন্দেশ হাতে নিলেন; ঠাকুরকে দৃষ্টিভোগ দিয়ে তারপর নিজের জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়ে পরম স্নেহের সাথে সহর্ষে দিলেন সন্তানকেঃ 'বাবা! খাও প্রসাদ।'

রাতে মায়ের বাড়িতে (জয়রামবাটীতে) খাওয়া রুটি-তরকারি, গুড়, একটু দুধ। রুটি খুব চমৎকার হয়। মা নিজে হাতে আটা মাখেন—অনেকক্ষণ সময় নিয়ে টিপে

টিপে, অতি মোলায়েম করে। সন্ধ্যার পর ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সেই খাবার ভালভাবে ঢাকা দিয়ে কাছে নিয়ে বসে থাকেন, যাতে ঠাণ্ডা না হয়ে যায়। ছেলেরা একটু রাত হলে খাবে,—সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরকে ডাকবে, তাঁর স্মরণ করবে; আবার একটু রাত্রি না হলে খিদে পায় না, পেট ভরে খেতে পারবে না; তাই মা প্রতীক্ষা করছেন। মিট্ মিট্ করে প্রদীপ জ্বলে। ঠাকুরকে ধূপ দিয়ে প্রণাম করে, আলো কমিয়ে দিয়ে মা পা মেলে বসে থাকেন। কোথায় কোন্ রাজ্যে তাঁর মন বিচরণ করে কে জানে! সব নিস্তব্ধ।

মায়ের প্রতিদিনের ঠাকুর-পূজার জন্য আমি ফুল, বেলপাতাদি চয়ন করে আনতাম। একদিন 'তুলসীপাতা' আনতে ভুল হওয়ায় মা অতিশয় দুঃখিত হন এবং বলেনঃ 'তুলসী আননি! তুলসী কত পবিত্র, যাতে দাও, শুদ্ধ করে।' আমি ব্যস্ত ও দুঃখিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তুলসীপাতা এনে দি এবং তখন থেকে সারাজীবন তুলসীর বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়ি। প্রতিদিনের পূজা শেষে মা মাটিতে মাথা স্পর্শ করে ঠাকুর প্রণাম করতেন। তারপর চরণামৃত পান করার সময় পূজার নির্মাল্য থেকে একটা প্রসাদী তুলসী ও একটুকরো বেলপাতা মুখে দিতেন।

এক ভক্তদম্পতি জয়রামবাটীতে এসেছেন মায়ের কাছে। পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ। সঙ্গে চারটি শিশুসন্তান। একজনের আবার ম্যালেরিয়া জ্বর। এসে দেখলেন অতি ছোট একটি খড়ের বাড়ি, তাও আবার লোকে ভর্তি। কোথায় থাকবেন কোথায় বসবেন, কে জানে? মা-ই বা কোথায়? মা সংবাদ পেলেন। ডেকে আনালেন ভেতরে। নিজে অগ্রসর হয়ে পরম স্নেহে সন্তানসহ কন্যাকে নিজের ঘরের বারান্দায় আনলেন। মায়ের মুখে আদরের 'মা এসো' ডাক শুনে কন্যার বিপন্ন ও বিষণ্ণ ভাব কেটে গেল, হৃদয় ভরে উঠলো, মুখের ভাব হল প্রফুল্ল। মায়ের স্নেহের ইন্দ্রজালে মুহূর্তে সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল। শিশুদের শোয়াবার, নিজেদের বসবার বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা হল তৎক্ষণাৎ। মা নিজের ঘরের দরজার একপাশে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, শিশুর দুধ এমনকি ওষুধ পর্যন্ত চলে এল। মায়ের ঘরে মেয়ের কি কোন অভাব থাকে? বা সঙ্কোচ? কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মায়ের বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বোনের মতো তিনি কলসী কাঁকে বাঁড়ুজ্জে-পুকুরে চলেছেন স্নান করে জল আনতে।

ভক্তদম্পতি ফিরে যাচ্ছেন। মা সদর দরজায় দু-চোখ ভরা জল নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন যতক্ষণ দেখা যায়। তাঁরা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে এসে, পা মেলে কোলের উপর হাত রেখে খুব বিমর্ষভাবে বসে পড়লেন নলিনীদিদির ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ভক্তদম্পতির একটি গামছা পড়ে আছে। মা দেখে খেদ করতে লাগলেন। সেবক সন্তান[৫] তখন সেই গামছা হাতে নিয়ে ছুটে চললেন তাঁদের দিয়ে আসতে। তাঁরা তখনও বেশী দূরে যাননি। গামছা দেখে তাঁরা লজ্জিত হলেন এবং সন্তানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গামছা নিয়ে আবার সহর্ষে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। সন্তান ফিরে এসে মাকে সংবাদ দিলেন, মায়ের মনও প্রসন্ন হল।

মা তখনও শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে বসে আছেন পূর্বোক্ত স্থানে। সন্তানটি বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে যাবেন, হঠাৎ শুনলেন মায়ের শোকার্ত কণ্ঠে কান্নার স্বরঃ 'আহা-হা

৫। প্রবন্ধকার স্বয়ং—সম্পাদক

বাছা আমার, কালকে সে স্নান করে পরতে পাবে না! যখনই শাড়ী খুঁজতে যাবে, তখনই মনে হবে ফেলে এসেছি মায়ের বাড়ি।' সন্তান ব্যগ্র হয়ে ছুটে মায়ের সামনে দাঁড়ালেন। ভক্তমহিলা স্নানান্তে ভিজে শাড়ীখানি পুণ্যপুকুরের পাড়ে শুকাতে দিয়েছিলেন, মনে নেই, যাবার সময় ভুলে ফেলে গিয়েছেন। এতক্ষণ যে শোকোচ্ছ্বাস হৃদয়ে চেপে রেখেছিলেন, এখন তা ফুটে বের হল, কান্নার স্বরে খেদ করতে লাগলেন। জনৈকা নিঃসন্তানা রূঢ়ভাবে বললেনঃ 'মাগী কোন্ দিক সামলায়, এতগুলো কাচ্চা-বাচ্চা!' তাঁর কর্কশ স্বর, কঠোর বাণী মায়ের শোকের মাত্রা বাড়িয়ে তুলল। অশ্রুবর্ষণ করতে করতে ভগ্নস্বরে বলতে লাগলেনঃ 'ভুল ত হবারই কথা। মন কি ছেড়ে যেতে চায়? একটি রাত কাছে থাকতে পেলে না, প্রাণ খুলে দুটি কথা বলতে পেলে না।' সন্তানটি কাপড়ের দিকে চাইতেই নলিনীদিদি মুরুব্বিয়ানার সুরে বললেনঃ 'এই একবার ছুটে এলো, আর যেতে হবে না, তারা এতক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে!' মায়ের দিকে চেয়ে সন্তান স্থির থাকতে পারলেন না। শাড়ীখানা হাতে নিয়ে মাকে বললেনঃ 'বেশিদূর যাননি, এক্ষুণি দিয়ে আসছি।' মায়ের মুখ প্রসন্ন হল, স্নেহ-স্বরে বললেনঃ 'বাবা! রোদ আছে, ছাতা নিয়ে যাও।' ভক্তেরা অনেক দূর গিয়েছিলেন। তাঁকে দৌড়ে আসতে দেখে অতীব বিস্মিত হলেন, এবং শাড়ী দেখে তখন ভক্তপরিবারের মনে পড়ল—শাড়ী রোদে শুকাতে দিয়েছিলেন, আনতে ভুলে গেছেন। ভক্তেরা লজ্জা ও বিনয় প্রকাশ এবং আফসোস করে বললেন যে, এত কষ্ট করে শাড়ী আনবার প্রয়োজন ছিল না। সন্তান যখন মায়ের দুঃখ ও উদ্বেগের কথা জানালেন, তখন প্রথমে তাঁদের মন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হল, পরে মাতৃস্নেহে দেহ পুলকিত ও হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল।

এ তো পাতানো মায়ের সন্তানের প্রতি স্নেহ নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন সম্পর্ক পাতানো সম্ভব নয়। ক্ষণিকের দেখা। কিন্তু যে স্নেহের স্পর্শ তাঁরা পেলেন তা চিরস্থায়ী। এ যেন দীর্ঘকাল পথে ঘোরা মা-হারা সন্তানের মাকে ফিরে পাওয়া।

মায়ের কাছে ভাল-মন্দ সবরকম সন্তানেরাই আসে। কৃতী ছেলের প্রশংসা শুনে মা খুশী হন, অপরের কাছে উৎফুল্ল হয়ে বলেনঃ 'আমার ছেলে।' মন্দ ছেলের নিন্দার কথাও মাকে শুনতে হয়, মা কষ্ট পান। কিন্তু মায়ের স্নেহ-ভালবাসা উভয় সন্তানের প্রতি সকল অবস্থাতেই সমান থাকে। ব্যবহারেও কোন তারতম্য হয় না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে নবাসনবাসী এক সন্তানের প্রতি মায়ের অপার স্নেহের কথা। মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত এই যুবক ভদ্রবংশজাত, শিক্ষিত, গুণবান। তার পদস্খলন হয়। মায়ের প্রতি তার ভক্তি ঠিকই আছে—আগের মতোই নিয়মিত আসা-যাওয়া করে। অন্য ভক্তদের কিন্তু এটা ভাল লাগে না। তাঁরা মাকে বলেন, তিনি যেন যুবকটিকে আসতে নিষেধ করে দেন। মা ছেলের জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন ঠিকই, কিন্তু বললেনঃ 'বাবা, আমি মা হয়ে তাকে "এসো না"—এ বলতে পারবো না।' সন্তানের আসা-যাওয়া বন্ধ হল না। মায়ের স্নেহাদরও কিছু কমল না। কিন্তু ছেলের মনে ক্রমে ক্রমে অনুশোচনা আসে। সে নিজের ভুল বুঝতে পারে।

নয় দশ বছরের বালক গোবিন্দ— জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির গরুর দেখাশোনা করে। একবার তার বেশ খোস-পাঁচড়া হয়। একদিন রাতে যন্ত্রণার তীব্রতা খুব বেড়ে

খাওয়ায় সে অধীর হয়ে কাঁদতে থাকে। ছেলের কান্নায় রাতে মায়ের চোখে ঘুম আসে না। পরদিন ভোরবেলায় দেখা যায়—মা গোবিন্দকে ডেকে নিয়েছেন বাড়ির ভেতরে, নিজের হাতে নিমপাতা হলুদ বাটছেন। বেটে একটু একটু তার হাতে দিচ্ছেন, কিভাবে লাগাতে হবে দেখাচ্ছেন। আর গোবিন্দ সেইভাবে লাগাচ্ছে। মায়ের স্নেহ-আদরে তার মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে প্রফুল্ল। দুজনের মুখ দেখে কথাবার্তা শুনে কে বুঝবে নিজের ছেলে নয়?

মায়ের বাড়িতে কুলি-মজুর, গাড়িওয়ালা, পালকি-বেহারা, ফেরিওয়ালা, মেছুনী-জেলে যেই আসুক সকলেই মায়ের ছেলে-মেয়ে। সকলেই ভক্তের মতো স্নেহ-আদর পায়। সেই সকরুণ স্নেহদৃষ্টি ইহ-পরকালে কেউই আর ভুলতে পারবে না। যদি বা কোনসময় বিস্মরণ হয়, দুঃখকষ্টে পড়লেই মনে ভেসে উঠবে সেই স্নেহকোমল কৃপাদৃষ্টি।

একবার এক নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মেয়ে কোন ভক্তপ্রদত্ত জিনিসপত্র নিয়ে দুপুর-বেলায় এসেছে মায়ের কাছে। মা তাকে স্নানাহার ও বিশ্রাম করে যেতে বললেন। বিশ্রামের পর বেলা গিয়েছে দেখে মা রাতেও তাকে থেকে যেতে বললেন। মায়ের ঘরের বারান্দায় দরজার পাশেই তার শোয়ার ব্যবস্থা হল। মেয়েটির বয়স হয়েছিল আর সে ছিল ম্যালেরিয়ার রুগী। অনেক দূর হেঁটে এসেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত। রাতে, সে অসাড়ে বিছানা নোংরা করে ফেলল। মা বরাবরের অভ্যাসমতো ভোররাতে উঠেছেন —দরজা খুলেই দেখেন এই অবস্থা। কি উপায়! অন্যেরা উঠে টের পেলেই মায়ের দুঃখিনী মেয়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শেষ থাকবে না। মায়ের চিত্ত ব্যাকুল হল। মেয়েটি তখনও ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। মা ধীরে ধীরে তাকে জাগালেন। মিষ্টি কথায় আশ্বস্ত করলেন, চুপি চুপি জলখাবারের জন্য মুড়িগুড় আঁচলে দিয়ে বললেনঃ 'মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে রোদে কষ্ট হবে না।' সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করে বিদায় নিল। মা স্বহস্তে সব পরিষ্কার করলেন। গোবরমাটি দিয়ে বারান্দা লেপলেন, চাটাইখানা ভাল করে ধুয়ে পুকুরের পাড়ে মেলে দিলেন। কেউ কিছু টের পেল না। পরে জনৈকা ভক্তমহিলা কে বারান্দায় 'ন্যাতা' দিল এবিষয়ে অনুসন্ধান করে সব ঘটনা জানতে পেরেছিলেন।

জয়রামবাটীতে এক বালবিধবা ছিল। খুব গরীব। অতি কষ্টে মজুর খেটে দিন গুজরান করত। কবে বিয়ে হয়েছিল, স্বামী কেমন ছিল, কবে বিধবা হয়েছে, কিছুই জ্ঞান নেই। যখন একটু বয়স হল তখন বুঝল যে, সে বিধবা, তার আর বিয়ে হবে না, সংসার-সুখ ভোগে তার অধিকার নেই। ভক্তদের জিনিসপত্রের বোঝা বইবার জন্য মায়ের বাড়িতে তার যাতায়াত আছে। মা তাকে স্নেহ করেন। ক্রমে সে পূর্ণযৌবনা হয়। একটি যুবকের সাথে অবৈধ মেলামেশার ফলে ব্যাপার বহুদূর গড়িয়ে জানাজানি হয়ে যায়। হৃদয়হীন সমাজপতিরা এতদিন এই অনাথার কোন খোঁজখবর রাখেননি। তাকে সৎশিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই করেননি। এখন এই দুঃখিনীর প্রতি তাঁদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি পড়ল। অভাগিনীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চলল। মা সব কথা শুনে সেই কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যন্ত দুঃখিতা ও চিন্তিতা হলেন। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া তিনি কি-ই বা করতে পারেন?

ভগবানের করুণা হল। মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত, সন্তানস্থানীয় একজন জমিদার হস্ত-

ক্ষেপ করে সামাজিক গোলমাল মিটিয়ে দিলেন। মা শুনে নিশ্চিন্তবোধ করলেন। কয়েকদিন পর তাঁর সেই জমিদার সন্তানটি প্রণাম করতে এলে মা প্রসন্নচিত্তে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেনঃ 'বাবা! দুঃখিনীকে বাঁচিয়ে দিয়েছ, রক্ষা করেছ, শুনে আমার প্রাণ ঠান্ডা হয়েছে। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।'

যাদের আমরা অতি অধম বলে ঘৃণা করি, তাদেরও ভালবেসে তাদের বিপদের সময় এই সমবেদনা, এই অপার স্নেহ জগজ্জননী ছাড়া, 'জন্ম-জন্মান্তরের মা', 'সতেরও মা, অসতেরও মা' ছাড়া আর কে দেখাতে পাবে!

গৃহস্থ ভক্তদের সংসারে অমনোযোগ ও বিশৃঙ্খলা মা পছন্দ করতেন না। ভগবানেরই সংসার, সেখানে আমাদের যে-কাজে তিনি রেখেছেন, তাঁর উপর নির্ভর করে তা যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা আমাদের সবসময়ই প্রয়োজন—তাঁর সকল সন্তানকে এই তাঁর শিক্ষা। নিজের কর্তব্যপালনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করে মা বলতেনঃ 'ঠাকুর, যাঁর পরনের কাপড় ঠিক থাকত না, তাঁরই আমার জন্য কত চিন্তা।'

একবার জনৈক ভক্তসন্তান বহুটাকা মূল্যে একখানা কাপড় মাকে দেবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলে মা তাতে অস্বীকৃত হয়ে বলেনঃ 'টাকা খরচ করতে নিতান্ত আগ্রহ করলে বরং একটুকরো ধানের জমি কিনে দিক—সাধুভক্তের সেবা হবে।' ভক্তটি টাকা দিলে একখন্ড জমি কেনার কথা হয় কিন্তু বিক্রেতা মত পরিবর্তন করায় জমি কেনা হয় না। মা এই ব্যাপারে একটি সন্তানকে জানালেনঃ 'বাবা, জমিতো এখন কেনা হলো না, টাকা হাতে থাকলেই খরচ হয়ে যায়, সেজন্য কোয়ালপাড়ায় কেদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, ধান কিনে রাখবার জন্য—এই সময় ধান খুব সস্তা। যখন প্রয়োজন হবে ধান বিক্রি করলেই টাকা পাওয়া যাবে।' জমি সুবিধামতো না পাওয়ায় কেনা হয়নি, কিন্তু কিছুকাল পরে যখন এই ধান খরচ করা হয় তখন তার দাম চারগুণ বেড়ে গেছে।

জয়রামবাটীতে নতুন বাড়ি তৈরী হলে গ্রাম পঞ্চায়েত তার উপর চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য করেছিল এবং মায়ের অনুপস্থিতিতে প্রথম বৎসর সেবক ব্রহ্মচারী জ্ঞানানন্দ, যিনি তখন সেখানে ছিলেন, বার্ষিক ট্যাক্স চার টাকা দিয়েছিলেন। পরবর্তী বৎসরে মা দেশে ছিলেন। ট্যাক্স নিতে আসলে চেষ্টা করে ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য উপস্থিত সেবককে[৬] আদেশ করলেন। মা তাঁকে বলেনঃ 'এখন আমি এখানে রয়েছি, না হয় ট্যাক্সের টাকা দিয়ে দিলুম, কিন্তু পরে যে সাধু-ব্রহ্মচারী থাকবে, তাকে হয়ত ভিক্ষে করেই খেতে হবে। সে কোথায় টাকা পাবে? চেষ্টা কর ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য।' এজন্য মা বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে নিজের নামে চিঠি[৭] লিখিয়ে সন্তানকে ইউনিয়ন বোর্ডের

৬। প্রবন্ধকার স্বয়ং—সম্পাদক

৭। এ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের একখানি পত্র।

জয়রামবাটী
১৩২৪।৫ই চৈত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব

আশীঃ পর সমাচার—

বাবাজীবন, তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমাদের বাড়ীর জন্য ৪৲ চারি টাকা চৌকি-দারী টেক্স ধার্য্য আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী বোধ হওয়ায় গতকল্য একখানা পত্রসহ শ্রীমান

প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং সেবার ট্যাক্স দিতে হলেও পরবর্তী বৎসরে ট্যাক্স বন্ধের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। পরবর্তী বৎসরে মা আবার যথাসময়ে একজন সন্তানকে পাঠিয়ে তদারক করেন এবং তা বন্ধ হয়।

জয়রামবাটীতে ডাকপিয়ন মনি-অর্ডারের টাকা নিয়ে আসে। মা টিপসই দেন। একজন লিখে দেয়ঃ 'শ্রীসারদাদেব্যার টিপসই...।' পিয়ন টাকা গুনে দিয়ে যায়। মা টাকা মুঠো করে নিয়ে ঘরে রেখে দেন। পিয়নকে প্রসাদ দেন, মিষ্ট কথা বলে বিদায় করেন। কেউ জানতে পারে না কত টাকা এসেছে, কে পাঠিয়েছে। পরে অবসরমতো কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার ও আশীর্বাদ জানান। সেবক কেউ উপস্থিত থেকে মনি-অর্ডার গ্রহণ করলেও টাকা বেশী নাড়াচাড়া ও গোনাবাছা করতে মা নিষেধ করে বলতেনঃ 'বাবা, টাকার শব্দ শুনলেও গরীবের মনে লোভ জন্মায়। টাকা এমন জিনিস, দেখলে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।'

স্বামীজী যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে সাধুদের জনসেবার কাজে লাগিয়েছেন, এটা ঠাকুরের ভাবানুগ কিনা, এ সংশয় প্রথমদিকে অনেকেরই মনে উঠেছে। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এ-বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জিজ্ঞাসাও করেছেন কেউ কেউ। মা কখনও বলেছেনঃ 'এ সবই ঠাকুরের কাজ।' আবার কখনও বলেছেনঃ 'বাবা, তোমরা কাজ করে খাও। কাজ না করলে কে খেতে দেবে? রোদে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে মাথা ঘুরে যাবে। ভাল করে খেতে না পেলে শরীরে অসুখ করবে। তোমরা ওসব কথা শুনো না। কাজ কর, ভাল করে খাও দাও, ভগবানের ভজন কর।'

মা জপধ্যান করবার জন্য যেমন উৎসাহিত করতেন, তেমনি আবার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে মাথা গরম না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনমতো সাবধান করেও দিতেন। অত্যধিক কঠোরতা করতে নিষেধ করতেন এবং আহারে পোশাকে অসংযম বিলাসিতাও পছন্দ করতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানগণের খাওয়া-থাকার কষ্ট, অভাব-অনটন ইত্যাদি মায়ের মনে ভীষণ দুঃখের কারণ হয়েছিল—বোধগয়া মঠের ঐশ্বর্য, সাধুদের সুখসুবিধা দেখে তাঁর নিঃসম্বল পরিব্রাজক সন্তানদের কথা মনে পড়ায় কেঁদে আকুল হয়েছিলেন আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর সন্তানদের জন্যে। তাই পূজনীয়া যোগেন-মা একদিন

গোপেশকে (প্রবন্ধকার) শ্রীযুক্ত শম্ভুবাবুর নিকট পাঠাইয়া ছিলাম, পত্রে লিখিয়াছিলাম, এই বাড়ীটি দেবোত্তর করিয়া দেওয়ায় আমার সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। আমি এখানের স্থায়ী অধিবাসী নই। বাড়ীর কিছুমাত্র আয় নাই। যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবক থাকিবে, তাহার ভরণপোষণ এই সংসার হইতে চলিবে না। এমতাবস্থায় স্থায়ী এই গুরুভার বহন করা অসম্ভব। আমার নিজের ও ভক্তেরা যখন যাহা দেয়, ভগবান-ইচ্ছায় তাহাতে কোন রকম চলিয়া যায় মাত্র। সংসারে কিছুমাত্র আয় নাই ইত্যাদি।

শম্ভুবাবু তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি এবিষয়ে পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছিলেন, ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একখানা দরখাস্ত করিবার জন্য। এ সম্বন্ধে তুমি কিছু করিয়াছ কিনা জানি না। আশা করি পত্রপাঠ মনোযোগী হইবে, এবং যাহা ভাল মনে কর তাহা করিবে। শম্ভু রায় বলিয়া দিয়াছেন, দরখাস্তে যেন উল্লেখ থাকে যে ইহা একটি Religious Institution—আয় কিছুমাত্র নাই। সহৃদয় জনগণের প্রদত্ত সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার কুশল সমাচার সহ আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আশীঃ তোমার মাতাঠাকুরানী

[উদ্বোধন, ৮৩-তম বর্ষ, পৃঃ ২২৮]

আমাকে বলেছিলেনঃ 'যা কিছু দেখ্‌ছ (মঠ-আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়! যেখানে যা দেখেছেন—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, "ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।" মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।'

জয়রামবাটীতে নিজের হাতে গেরুয়া দিয়ে মা অনেক ছেলেকে সন্ন্যাস দেন দেখে মেয়েদের হৃদয়ে আতঙ্ক, শোকের সঞ্চার হয়। মা হাসেন উৎফুল্ল হৃদয়ে—তাঁর একটি সন্তান সংসারের দারুণ জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেল। সংসারী ছেলেদের অর্থোপার্জন, বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন যাপনে নিরুৎসাহ না করলেও মা ত্যাগী-সন্তানকে ত্যাগের পথ দেখিয়ে দিতেন পরম উল্লাসে।

মায়ের একটি সন্তান একবার লিখেছেনঃ তিনি বিয়ে না করে ত্যাগের পথেই জীবনযাপন করতে চান। কিন্তু তাঁর পিতা এর ঘোর বিরোধী। নানা উপায়ে তাঁকে সংসারে টেনে ডুবাবার চেষ্টা করছেন। পুত্রের করুণ আর্তি শুনে মায়ের হৃদয় গলে যায়। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলতে থাকেনঃ 'দেখ দেখ, বাপ হয়ে ছেলের মাথায় কুড়ুল মারতে চায়, ছেলের সর্বনাশ করতে চায়—ছেলে দুঃখে লিখেছে!' মা ছেলেকে আশ্বাস দিয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে জবাব দিলেন। তাঁর কৃপায় ছেলের সকল বিপদ কেটে যায়। ধীরে ধীরে পিতার মতিগতি পরিবর্তিত হয়, তিনি ছেলের উপর প্রীত হয়ে তাঁর ধর্মপথের সহায়ক হন। ছেলেও প্রাণপণে বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করে শেষ সময়ে আন্তরিক প্রীতি ও শুভাশীর্বাদ লাভ করেন।

আর একবার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাকে লিখেছিলেন যে, তাঁর যে-ছেলেটিকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন—তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে রোজগার করে খাওয়াবে বলে ভরসা করেছিলেন, সে কিছুদিন আগে মায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিল এবং সম্প্রতি সে পিতামাতাকে ছেড়ে সাধু হবার জন্য এক আশ্রমে চলে গেছে। তার মা শোকে শয্যাশায়ী। তিনি বৃদ্ধ—নিরুপায়। চোখে অন্ধকার দেখছেন। চিঠিতে অতি করুণ ভাষায় তাঁদের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করেছেন ও ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। চিঠি শুনে মা খুবই আফসোস করলেন, বলতে লাগলেনঃ 'হায়! না জানি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে কত অভিসম্পাত করছেন! করবারই ত কথা। কত কষ্ট করে, কত আশা-ভরসায় ছেলেকে মানুষ করেছেন, এখন সে হঠাৎ পালিয়ে গেল!' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খুব সান্ত্বনা দিয়ে জবাব লেখা হল। মা জানালেন, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। ছেলে তাঁকে কিছুই জানায়নি। সে নিজের ইচ্ছাতেই সাধু হয়েছে —তিনি কি করবেন? এ-বিষয়ে তাঁর কোন হাত নেই। ভগবানের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে বললেন। বললেন, ভগবান অবশ্যই তাঁদের রক্ষা করবেন, তাঁরা যেন দুশ্চিন্তা ত্যাগ করেন। পরে মা পত্রলেখককে[৮] সম্বোধন করে বললেনঃ 'বাবা! এই বোকাগুলো কেন হঠাৎ এইরকম করে, আর বাপ-মাকে কষ্ট দেয়, নিজেও কষ্ট ভোগ করে! কিছুকাল ধরে আশ্রমে যাতায়াত, কিছুকাল সাধুসঙ্গে বাস করতে হয়, দেখে দেখে বাপ-মায়ের সহ্য হয়ে যায়, বুঝতে পারে ছেলের মতিগতি, তখন ছেড়ে গেলে আর মনে এত লাগে না।' মায়ের এই সন্তানটি তখন বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়ে-

৮। প্রবন্ধকার স্বয়ং—সম্পাদক

ছিলেন বটে, তবে কিছুকাল বাপ-মায়ের নিকটে থেকে ধীরে ধীরে তাঁদের মত করিয়ে সংসার ত্যাগ করেন এবং তাঁরা যতকাল জীবিত ছিলেন, পরস্পর খোঁজখবর রাখা, দেখাসাক্ষাতে ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

সংসারত্যাগী সাধুদের প্রতি মায়ের স্বাভাবিক এক প্রীতি ছিল। মায়ের খুড়তুতো বোনের ছেলে বাঁকু (বঙ্কিম) অল্প বয়সে সাধু হয়ে গৃহত্যাগ করে। মা শুনে বলেনঃ 'সাধু হয়েছে খুব ভাল কাজ করেছে! কি আছে এই হাড়মাসের খাঁচাটায়! এইত দেখ না—বাতে ভুগে মরছি! এই দেহটাতে আছে কি? কিসের জন্য এত মায়া! দু-দিন পরেই ত শেষ হয়ে যাবে। তখন পুড়ালে হবে দেড়সের ছাই! ঐ দেড়সের ছাই বইত নয়! বাঁকু সাধু হয়েছে, ভগবানের পথে গিয়েছে, বেশ করেছে, বেশ করেছে।'

মায়ের সাধুপ্রীতি সম্বন্ধে আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন সন্ধ্যার পরে জনৈক সন্তান[১] মাকে চিঠি পড়ে শুনাচ্ছেন। মা পা মেলে মেঝেতে আসনের উপর বসেছেন। সামনে হ্যারিকেন লণ্ঠন। ছেলেটি মায়ের পাশেই বসে মাথা নীচু করে চিঠি পড়ছেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল—মস্ত বড় একটা তেঁতুল-বিছা মায়ের দিকে এগিয়ে আসছে। দেখামাত্রই সন্তানের মনে হল মাকে কামড়াবে না তো? সঙ্গে সঙ্গে এক লাথি মেরে সেটাকে পিষে ফেললেন। তাঁর লাঠি বা অন্য কিছু নেবার সময় ছিল না। মা মৃত জীবটির দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেনঃ 'সাধুর পায়ের আঘাতে প্রাণ গেল।' এমনভাবে বললেন, যেন তার আত্মার সদ্গতি হল!

মায়ের সন্ন্যাসী-সন্তানগণ তাঁর ইচ্ছার তিলমাত্র বিরুদ্ধেও কখনও কিছু বলতেন না। তবে তাঁর পাদপদ্মে আকুল আবেদন ও প্রার্থনা জানাতেন। মা-ও তা পূর্ণ করতেন সময়বিশেষে। মায়ের ছেলেরা অবোধ, তাই তারা নিঃসঙ্কোচে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে ফেলেন. মা হাসেন! কখনও শোনেন, কখনও শোনেন না—ভুলিয়ে অন্যমনস্ক করে দেন। পূজনীয় কপিল মহারাজ মায়ের বিশেষ স্নেহের অধিকারী, উদ্বোধনে বহুদিন মায়ের পদচ্ছায়ায় বাস করেছেন। একবার জয়রামবাটীতে মায়ের অসুখের পর মা সারতে না সারতেই তাঁকে কলকাতা যাবার জন্য বার বার বলতে লাগলেন। মা কিন্তু সেসকল কথায় কান দিলেন না। অপরের কাছে বললেনঃ 'ওরা হল ন্যাংটা পোঁদা সন্ন্যাসী. উঠ্ বললে উঠল, বস্ বললে বসল, ভাবনা নাই. চিন্তা নাই, কম্বল কাঁধে ফেলে—চলল! আমার কি তা চলে? আমার কত দিক ভেবে কাজ করতে হয়। যাতে অপরের কোন অসুবিধা না হয়।'

সামান্য ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ হট্টগোল সৃষ্টি করা আমাদের স্বভাব এবং ফলে দুঃখ-অশান্তিও ভোগ করি। মা সব ব্যাপারেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে নীরবে সব সহ্য করার জন্য শিক্ষা দিতেনঃ 'শ, ষ, স—যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

নিজের দুঃখকষ্টের জন্য মাকে কখনও অপরকে দোষ দিতে দেখা যেত না। মা সকলকেই শিক্ষা দিতেনঃ 'মানুষ স্বীয় কর্মেরই ফল ভোগ করে, এজন্য অপরকে দোষী না করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে ধীরভাবে সকল অবস্থায় সহ্য করে যাওয়াই প্রয়োজন।'

১। প্রবন্ধকার স্বয়ং—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে যাঁদের কিছুদিনও বাস করবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, মা তাঁর সন্তানদের জীবনগঠনের জন্য চরিত্রবল, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, সংযম, ভগবৎ-ভজন এবং সর্বাবস্থায় ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাস, নিষ্ঠা-ভক্তি ও নির্ভরতা শেখাতেন। তাঁর নিজের যেমন, তেমনই তাঁর সন্তানগণের মধ্যেও ভাবুকতার আড়ম্বর কখনও দেখা যেত না। সকলেই ছিলেন সৌম্য, শান্ত, ধীর, স্থির।

* * *

উপসংহার

আমরা নারায়ণসেবার উদ্দেশ্যে আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান গঠন করি, অনেক সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করি, চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের জীবন এমনই ছিল যে, তাকে একাধারে ভগবদুপাসনার স্থান—মন্দির, সুশিক্ষার প্রতিষ্ঠান—বিদ্যা-লয়, দীন-আর্ত সেবার আশ্রম এবং নিরাশ্রয় রোগীর হাসপাতাল বলা চলে।

স্বার্থৈকদৃষ্টি পরস্পর দ্বন্দ্বপরায়ণ দুঃখী অশান্ত সন্তানগণকে সুখশান্তির পথ, পরস্পর মিলে মিশে থাকবার শিক্ষা দেবার জন্যে জগজ্জননীর দেহধারণ, কঠোর তপ-শ্চরণ এবং আত্মদান। লীলাসম্বরণের পূর্ব মুহূর্তে জনৈকা কন্যাকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর শেষ উপদেশ উচ্চারণ করেছিলেনঃ 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।' জগজ্জননীর এই উপদেশ শুধু সেই বিশেষ কন্যার উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়নি, বর্ষিত হয়েছিল তাঁর জগৎজোড়া অগণ্য, সন্তান-সন্ততির উদ্দেশ্যে জীবনের পরম-পাথেয় হিসেবে।

মাকে যেমন দেখেছি

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি যখন আমি স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। সেটা ইংরেজী ১৯১৫ সাল। সত্যি কথা বলতে কি একটু হতাশই হয়েছিলাম। আমার কল্পনায় মা বিরাজ করছিলেন এইভাবে—তিনি বসে আছেন একটি সুন্দর সাজানো সিংহাসনে, দুপাশে সেবিকারা চামর দোলাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম, তিনি থাকেন ছোট মাটির দেওয়ালদেওয়া খড়ের চালওয়ালা ঘরে। আরও দেখলাম, তিনি নিজে হাতে ঝাঁটা নিয়ে উঠান পরিষ্কার করছেন। তখন খুবই ক্ষুব্ধচিত্তে যাঁদের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম সেই পূজনীয় জ্ঞানদা (স্বামী জ্ঞানানন্দ) ও পূজনীয় গোপেশদাকে (স্বামী সারদেশানন্দ) গিয়ে বললামঃ 'এই সামান্য কাজটুকু করে মাকে সাহায্য করবার কি কেউ নেই?' তাঁরা উত্তর দিলেনঃ 'যাতায়াত করতে থাক—সবই জানতে পারবি।' আমাদের দেখে মা বললেনঃ 'বাবা, একটু দাঁড়াও। আমি এই কাজটুকু সেরে নিয়ে হাত ধুয়ে বসি, তখন আমাকে প্রণাম করবে।' আমরা অপেক্ষা করলাম। মা ঝাঁটা রেখে হাত ধুয়ে বিছানায় বসলেন। আমরা একে একে প্রণাম করলাম। প্রণাম করার সময় লক্ষ্য করলাম একটি মেয়ে মায়ের বিছানায় শুয়ে আছে। আমার ভাল লাগল না। সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলামঃ 'এই মেয়েটা কে? মায়ের বিছানায় শুয়েছে কেন? নীচে বিছানা পেতে শুতে পারে না?' পূজনীয় জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'চুপ কর, পরে বুঝবি সব।'—ঐ মেয়েটি মায়ের আদরের ভাইঝি রাধু।

ওঁরা দুজন প্রণাম করার পর আমি প্রণাম করতেই মা জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'এই ছেলেটি কে?' তাঁরা উত্তর দিলেনঃ 'ছেলেটি বদনগঞ্জ স্কুলে পড়ে।' মা শুনে বললেনঃ 'প্রবোধের ছাত্র?' আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নাম শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি মনে মনে ভাবলাম, মা আমার হেডমাস্টার মশায়কে কি করে চিনলেন! নিজের মনেই উত্তর পেলাম, তিনি এই দেশের মধ্যে বিদ্বান-বুদ্ধিমান লোক, তাই মা তাঁকে চেনেন। পরে জানলাম আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

মাকে দর্শন করার পর যখন বাড়ি ফিরব তখন মা সস্নেহে বললেনঃ 'বাবা, আবার এসো।' সেইদিন থেকে প্রতি শনিবার জয়রামবাটী আসবার জন্য এবং মাকে দর্শন করবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠত। প্রতি শনিবার স্কুলে যাবার সময় একখানা কাপড়, গামছা আর সোমবারের পড়ার বই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম এবং ছুটি হয়ে গেলেই চলে যেতাম জয়রামবাটী। কয়েকবার যেতেই আমি মায়ের খুব পরিচিত হয়ে গেলাম।

মায়ের লজ্জাশীলতা ছিল অসাধারণ। মা স্বামীজী, মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, প্রভৃতি সকলকেই 'ছেলে' বলতেন, কিন্তু তাঁদের সামনে ঘোমটা দিতেন আর ঘোমটার ভিতর থেকে আস্তে আস্তে কথা বলতেন। অনেক সময় যোগীন-

মা বা গোলাপ-মা আবার সেটা জোরে বলে দিতেন। শরৎ মহারাজ মাকে প্রণাম করে বারান্দায় এসে অনুযোগের সুরে বলতেনঃ 'আমি যেন শ্বশুর!' বয়সের তুলনায় বেঁটে ছিলাম বলে আমাকে আরও ছোট মনে হত। এই কারণে মা আমার সামনে আর ঘোমটা দিতেন না। এইজন্যই মাকে ভাল করে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এছাড়া মায়ের পায়ে বাত ছিল; এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মায়ের পায়ে বাতের তেল মালিশ করে দেবার। এই মালিশ করবার সময় দেখেছি মায়ের পায়ের তলা অদ্ভুতরকম কোমল এবং হাল্কা গোলাপী রঙের অথচ মা কামারপুকুর বা জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুর-জয়রামবাটী হেঁটেই যেতেন। আর জীবনে কখনও জুতা বা চটি পরতেন না। একদিন তেল মালিশ করার সময় আমার মনে হল মায়ের পায়ের বাত যদি আমার পায়ে আসে তো মা ভাল থাকেন, তবে খুব আনন্দ হবে। এই ভেবে মায়ের পায়ে হাত রেখে আমার ঐ হাতের কনুইটি আমার পায়ের হাঁটুতে ঠেকাতেই মা আমার দাড়িতে চুমো খেয়ে বললেনঃ 'ছিঃ, ছিঃ, এসব কি ভাবছ? তোমরা বেঁচে থাক। ঠাকুরের কত কাজ করবে। আমি বুড়ি হয়েছি, আর কতকাল বাঁচব!'

আমি মায়ের সঙ্গে বসে তরকারি কাটতাম। তাঁর উনানে আগুন ধরিয়ে দিতাম। আটা, ময়দা ঠেসে রুটি, লুচি বেলে দিতাম। মায়ের সঙ্গে বসে পান সাজতাম। ফুল, তুলসী, বেলপাতা, দূর্বা তুলে এনে, চন্দন পিষে তাঁর পুষ্পপাত্র সাজিয়ে দিতাম। ফল থাকলে কেটে দিতাম। তখন তো জয়রামবাটীতে ফলমূল কিনতে পাওয়া যেত না। ফলের মধ্যে কুমড়ো, মূলের মধ্যে আলুই ছিল। আর একটি ছোট দোকান ছিল। দোকান এতই ছোট যে, মা একবার আড়াই পোয়া পোস্ত কিনতে পাঠিয়েছিলেন। পোস্ত চাইতে দোকানদার বলেছিলঃ 'তোমাকেই আড়াই পো দেব তো আমি খুচরো কি বেচব? আমার দোকানে মাত্র আড়াই পো আছে।' এখন বড় বড় অনেক দোকান হয়েছে। মা আমাকে একসঙ্গে দু-খিলি পান খেতে দিতেন আর মেয়েদের কাছে বলতেনঃ 'রামময়কে পান খাইয়ে দেখতে বেশ লাগে; কালো ছেলেটি আর ঠোঁটদুটি বেশ লাল হয়—আমার মনে হয় যেন টিকেয় আগুন লেগেছে।'

বহু লোক মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে যান আর আমি দেখি। কিছুদিন পরে আমি ভাবলাম আমিও মায়ের কাছে দীক্ষা নেব। কিন্তু মনে সংশয়, কি জানি, আমি তো বেঁটে, ষোল সতেরো বছর বয়স, মা দীক্ষা দিতে রাজী হবেন কিনা! মায়েরই এক বৃদ্ধা শিষ্যা,—মায়ের সেবার জন্য জয়রামবাটীতে থাকতেন, তাঁর ছেলে তখন উকিল, তাঁর সাথে পরামর্শ করলাম। তাঁকে বললামঃ 'আমার তো দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা। আপনি তো এখানে সর্বদা মায়ের কাছে আছেন, আপনার কি মনে হয় মা দীক্ষা দেবেন?' তিনি বললেনঃ 'ভাই, তোমাকে দীক্ষা দেবেন বলেই তো মনে হয়। কারণ, তুমি যদি কোন কারণে একটা শনিবার বিকালে না আস তো মা বিশবার তোমার কথা বলেন। বলেন, "রামময় (আমার বাড়ির নাম ছিল 'রামময়') কেন এল না; তবে কি ছেলের জ্বর হল?" আবার কিছুক্ষণ বাদে বলছেন, "বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলে, হয়তো পড়াশোনায় বেশী মন দিয়েছে, বোধহয় সামনে কোন পরীক্ষা আছে, তাই মাকে ভুলে আছে"—ইত্যাদি। এরকম বারে বারে তোমার কথা চিন্তা করেন। তোমাকে যখন এত ভালবাসেন, তখন তোমাকে দীক্ষা দেবেন। তবে যদি বলেন, "আর একটু বড় হয়ে

নেবে", সেকথা আলাদা।' আমি তো বড় হয়েছিলাম। বেঁটে বলে আমাকে ছোট দেখাত। যাইহোক, মাকে বলতেই তিনি খুব খুশী। বললেনঃ 'আচ্ছা তুমি দীক্ষা নেবে তো আসনটা পেতে নিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বোসো।' মায়ের আসন ছাড়া আরও দুখানা গালিচার আসন ছিল। যদি স্বামী-স্ত্রী দীক্ষা নিতেন, তাহলে দুখানি আসন পেতে দিতাম। ঐ দুখানি আসন থেকে একখানি আসন মায়ের সামনে পেতে ঠাকুরকে ও মাকে প্রণাম করে বসলাম। মা কোশা থেকে কুশিতে করে জল নিয়ে আমার গায়ে ছিটাতে ছিটাতে বললেনঃ 'পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাক। ইহজন্মের জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত সব পাপ নষ্ট হয়ে যাক।' এই বলে মা আমার দেহ শুদ্ধ করে নিলেন। পরে একটি দেবতার নাম উচ্চারণ করে বললেনঃ 'ইনিই তো তোমার ইষ্ট?' আবার মানে বুঝতে যদি না পারি তাই বললেনঃ 'এঁকেই তো তুমি সবচেয়ে বেশী ভক্তিশ্রদ্ধা কর, ভালবাস? এঁর মন্ত্রই তো তোমাকে দেব।' তখন আমি বললামঃ 'মা, আপনি ঠিকই ধরেছেন যে আমি ওঁকেই সবচেয়ে বেশী ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু এখন ঠাকুরের বই পড়ে সব দেবদেবী এক মনে হয়। আচ্ছা, আমি যদি কোন মন্ত্র চাই, তা আমাকে দেবেন?' মা বললেনঃ 'বল।' আমি তখন বললাম। মা বললেনঃ 'এই মন্ত্র পেলে তুমি খুশী হবে?' আমি বললামঃ 'হ্যাঁ।' তখন তিনি সেই বীজমন্ত্রটি শুনিয়ে দিলেন এবং কি-ক'রে করে ১০৮ বার জপ করতে হয় দেখিয়ে দিলেন। দু-চারটি কথা ও উপদেশ দিয়ে বললেনঃ 'বাবা, গুরু আর ইষ্টকে এক জানবে, কোন ভেদ ভাবনা করবে না।' আমি তখন জানতাম না যে দীক্ষান্তে গুরু-দক্ষিণা দিতে হয়। তা ছাড়া আমার পকেটে সেদিন একটি পয়সাও ছিল না। বাড়ি থেকে খেয়ে ইস্কুল যাই, ইস্কুল থেকে জয়রামবাটী—সবই হেঁটে. সুতরাং পয়সার দরকার হত না। মা কিন্তু দক্ষিণা সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। দীক্ষার পর আমি যখন মাকে দুপায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছি (কারণ মা আমাকে পূর্বে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে গেলে বলেছিলেন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেই হবে) তখন মা বললেনঃ 'আজকে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে হয়। কারণ এতদিন যিনি "মা" ছিলেন, আজ তিনি "গুরু" হলেন।' তিনি নিজেই শিখিয়ে দিলেন আর আমিও তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। মা দুই হাত আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ও বললেনঃ 'চল বাবা চল, দুটি খাবে চল। বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েছে।' আমি যেই বাইরে বেরিয়েছি, অমনি জ্ঞানদা (স্বামী জ্ঞানানন্দ) আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'কিছু দক্ষিণা দিলি?' আমি বললামঃ 'না, কি করে দেব? আমার পকেটে একটি পয়সাও নেই।' জ্ঞানদা তখন পকেট থেকে রুমাল বের করে টাকা, আধুলি, সিকি, দু-আনি ইত্যাদি যা ছিল, সব আমার হাতে দিলেন। সব নিয়ে হয়তো আড়াই টাকা তিন টাকা হবে। সেই নিয়ে যেই দরজার কাছে এসেছি অমনি মা বললেনঃ 'কি বাবা?' আমি তখন সেই টাকাপয়সা মাকে দেখালাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কোথায় পেলে?' আমি বললামঃ 'জ্ঞানদা দিলেন।' তখন তিনি বললেনঃ 'আচ্ছা, দাও।'—বলে সেগুলি নিলেন। আমি আবার তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেনঃ 'চল, এখন দুটি খাবে চল।' এই বলে একটা ছোট থালায় করে মা মুড়ি নিলেন এবং আমাকেও দিলেন। মা ও আমি পাশাপাশি বসে খাচ্ছি। মা মাঝে ওঁর থালা থেকে মুড়ি তুলে আমার থালায় দিয়ে

বললেনঃ 'খাও বাবা খাও, বুড়ো হয়েছি, দাঁত নড়ছে, চিবুতে পারছি না।' অর্থাৎ আমি না চাইতেই মা আমাকে প্রসাদ দিচ্ছেন। এখন ভক্তরা দীক্ষা নিলে গুরুর প্রসাদ নিয়ে জল খায়। আর আমি না বললেও করুণাময়ী মা নিজেই আমায় প্রসাদ দিয়েছেন।

আমার ছোটবেলা থেকেই বাগান করার ঝোঁক ছিল। তবে এখন যেমন একই গোলাপগাছের বিভিন্ন ডালে লাল, সাদা, হলদে, গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙের ফুল ফুটোতে পারি, তখন এসব জানতাম না। কিন্তু তখন জয়রামবাটীতে এক একদিন মা একটি ফুলও পুজোর জন্য পেতেন না। শুধু তুলসীপাতা, দুর্বা, বেলপাতা ও চন্দন দিয়ে মা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলতেনঃ 'ঠাকুর আজ একটি ফুলও জোটেনি, এইসব নিয়েই সন্তুষ্ট হও।' আমি মায়ের বাড়ির পাশে 'পুণ্যিপুকুরের' পাড়ে কিছু যুঁই, পদ্মকরবী, গাঁদা, দোপাটি, জবা, টগর, প্রভৃতি ফুলের গাছ লাগিয়েছিলাম। ঐসব ফুল পেয়ে মা কত খুশী! একদিন দেখি, দুপুরে বিশ্রামের পর মা যুঁইগাছের গোড়া খুঁড়ছেন। 'আমি এসব করব, আপনাকে করতে হবে না'—বলে খুরপিটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলে তিনি বললেনঃ 'তুমিই তো সব কর। আমি যুঁই ফুল খুব ভালবাসি কিনা, তাই এখন ওদের ফুলের সময় আসছে দেখে একটু জল দেবার জায়গা করছিলাম।' যখন পদ্মকরবীর গাছে প্রথম ফুল ফোটে, মা কাউকে পুজোর জন্যও ফুল তুলতে দেননি। বলতেনঃ 'রামময় এসে দেখবে, তার গাছে কত ফুল ফুটেছে। সে নিজে হাতে ফুল তুলে দেবে, তবে ঠাকুরকে দেব।'—কী অপার স্নেহ! আমি শনিবার এসে মাকে প্রণাম করতেই মা আমার হাত ধরে ঐ গাছের কাছে নিয়ে গেলেন ও বললেনঃ 'দেখ, তোমার গাছে কত সুন্দর ফুল ফুটেছে। আবার কেমন মিষ্টি গন্ধ!' আমাকে ফুলের সাজি দিলেন। আমি ফুল তুলে দিতে ঐ ফুল দিয়ে মা ঠাকুরের পুজা করলেন।

একদিন একটা কাগজী লেবুর কলম নিজে তৈরী করে নিয়ে যাই। তাতে ৭/৮-টা ফল ছিল। মা দেখে খুব খুশী হলেন আর সকলকে বলতে লাগলেনঃ 'দেখেছ ছেলের কি বুদ্ধি! এমন কলম করে এনেছে যে এখনই তাতে ফল ধরতে আরম্ভ করেছে।' একদিন ফল সমেত একটা বড় আমলকী ডাল ভেঙে মাকে দিয়েছিলাম। মা তাতে অসন্তুষ্ট হন ও ফলবান গাছের ফল সমেত ডাল ভাঙতে নিষেধ করেন, বিশেষত আমলকী গাছের। এই আমলকী গাছটি আমোদরের তীরে ছিল। এই আমলকী গাছের তলায় পুজনীয় শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ধ্যান করতেন। পুজনীয় শরৎ মহারাজ গীতাপাঠও করতেন। মা আরও বলেনঃ 'আমলকী গাছের তলায় তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস। এর তলায় বসে ধ্যানজপ করলে বেশী ফল হয়।' পরে ঐ ডাল থেকে পাতাগুলি পুজোর জন্য রাখতে বলে বললেনঃ বেলপাতার মতো ঐ পাতাও পুজোর জন্য ব্যবহার হয়।'

আর একদিন পুণ্যিপুকুরের উত্তর পাড়ের বাগানে জ্ঞান মহারাজ ও আমি কতকগুলি কলাগাছ লাগাচ্ছিলাম। সকাল থেকেই কাজ আরম্ভ করি। অনেক বেলা হওয়ায় মা জল খাবার জন্য পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে ডাকতে লাগলেন। আমরা 'যাচ্ছি' বললাম। কিছুক্ষণ পরে মা আবার ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন। বললেনঃ 'খেয়ে গিয়ে কাজটুকু শেষ কর।' আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম,

কিন্তু জ্ঞানদা আসতে দিলেন না। তৃতীয়বারে মা জ্ঞানদাকে ছেড়ে কেবল আমাকে ডাকতেই আমি কোদাল ফেলে ছুটে গেলাম। জ্ঞানদা 'আর অল্পই বাকী আছে', একসঙ্গে যাবেন বললেও আমি তা শুনলাম না। মা খুব খুশী হলেন, বললেনঃ 'জ্ঞান বাঙাল। ওদের ভীষণ গোঁ। কারও কথা শুনবে না। তুমি হাতমুখ ধুয়ে খেতে বোসো।' আমি খেতে বসছি এমন সময় নলিনীদি ঐ বাগানের জায়গাটা নোংরা বলে আমাকে স্নান না করে খেতে বারণ করলেন ও বললেনঃ 'ছি! ছি! না নেয়ে খেতে রুচবে কি করে গো?' মা তাঁকে ধমক দিয়ে বললেনঃ 'তুই চুপ কর। ওরা ব্যাটা-ছেলে। সদা শুদ্ধ। ওদের কিছুতেই দোষ হয় না। তোর মন অশুদ্ধ। তাই ছুঁই ছুঁই করে মরিস।' মায়ের কথায় আমি খেলাম। মা-ও খুব খুশী হলেন।

তখন জয়রামবাটীতে লেখাপড়া-জানা লোক খুব কমই ছিলেন। মেয়েদের মধ্যে ২।৪ জন বাংলায় নাম লিখতে পারত। মা বলতেনঃ 'বাঁড়ুজ্জেদের একটি বৌমা এসেছে। সে কলকাতার মেয়ে। ঘড়িতে দম দিতে জানে।' ঘড়িতে দম দিতে জানা মায়ের কাছে একটা মস্ত বুদ্ধির কাজ। কারণ তিনি বি. এ.-এম. এ. পাশ মেয়ে দেখেননি এবং হাতে ঘড়িবাঁধা মেয়েও দেখেননি। হ্যারিকেন লণ্ঠন পরিষ্কার করতে পারতেন না। আমাকে বলতেনঃ 'বাবা, তুমি কর। ওর মধ্যে অনেক কলকব্জা—আমি পারব না।' এদিকে মা তো বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগটি শেষ করে দ্বিতীয় ভাগের প্রথম লাইনের 'ঐক্য, মাণিক্য ও কুবাক্য' পর্যন্ত শিখতেই ভাগ্নে হৃদয় হাত থেকে বই ছিনিয়ে নিয়ে বলেছিলেনঃ 'মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখা ভাল নয়। তাহলে চরিত্র ভাল থাকবে না, চুপি চুপি ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করবে ও নাটক নভেল পড়বে।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আক্ষরিক বিদ্যা না থাকলেও মায়ের আধ্যাত্মিক বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান ছিল। আমি তখন ছেলেমানুষ। ভক্তেরা এবং সাধু-ব্রহ্মচারীরা মাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। আমার ভয় হত—মায়ের তো 'কুবাক্য' পর্যন্ত শিক্ষা, তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কি? এঁরা বেলুড় মঠে গিয়ে পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতিদের কেন জিজ্ঞাসা করেন না? তাঁরা কত শাস্ত্র পাঠ করেছেন। কিন্তু মা কখনও বলতেন না—'এইসব প্রশ্নের উত্তর রাখালকে, তারককে বা শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে।' তিনি সকলের প্রশ্ন শুনতেন এবং এমন উত্তর দিতেন যাতে প্রশ্নকর্তাদের সব সংশয়ের সমাধান হয়ে যেত। আমি ঐ বয়সে প্রশ্নগুলির অর্থও বুঝতাম না এবং মা যা উত্তর দিতেন তাও বুঝতাম না। কিন্তু দেখতাম, যাঁর প্রশ্ন তিনি খুশী হয়ে যেতেন।

'উদ্বোধন', 'তত্ত্বমঞ্জরী' প্রভৃতি পত্রিকা এলে শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করতেনঃ 'উদ্বোধনে শরতের লেখা কিছু আছে?' কিছু থাকলে পড়তে বলতেন। একবার 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে সংস্কৃতে একটি স্তোত্র প্রকাশিত হয়। আমি তা পড়ে শোনালে মা বলেনঃ 'বাংলা করে বল।' 'দেশিকেন্দ্রং' প্রভৃতি শব্দের মানে না জানায় এবং ওখানে অভিধান না থাকায় আমি বললামঃ 'সব কথার মানে জানি না। স্কুলে গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের কাছে বুঝে এসে আপনাকে শোনাব।' তিনি ছাড়লেন না। বললেনঃ 'তুমি যেটুকু পার, তাই বল।'

খুঁটিনাটি বিষয়েও শ্রীশ্রীমায়ের বেশ নজর ছিল। একদিন আমি খাবার জন্য শালপাতায় একটু জল ছিটিয়ে ঝেড়ে পাতছি, এমন সময় মা বললেনঃ 'আহা! ছেলেরা

খাবে, ভাল করে ধুয়ে নাও। নইলে ধুলো থাকবে। আমার যখন শক্তি ছিল তখন আমি এক একটি পাতা ধুয়ে কাপড় দিয়ে মুছতাম।' আর একদিন যখন খাবার আসন পাতছি, তখন তিনি তাঁর ঘরের বারান্দা থেকে দেখে বললেনঃ 'সিধে হয়নি।' আমি একটু-আধটু পরিবর্তন করার পরেও বললেনঃ 'এখনও হয়নি।' আমি কোথায় ভুল হচ্ছে ধরতে না পারায় তিনি নিজে এসে ঠিক করে পেতে দিলেন। তখন দেখলাম সব আসনগুলো সমান্তরাল ও সামনের দিকটা এক সরলরেখায় হল।

একদিন এক স্বামীজী কাশী থেকে খুব বড় একটা বেল এনেছিলেন। মা ঐ বেলটা তাঁর খাটের তলায় রেখেছিলেন। তিনি নলিনীদির ঘরের বারান্দায় বসে তরকারি কুটছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে তরকারি কুটছিলাম, তা শেষ করে আমাকে বেলটি এনে দিতে বললেন। আমি অত বড় বেল কখনও দেখিনি। কাজেই কুমড়ো মনে করে বললামঃ 'আপনার খাটের তলায় তো বেল নেই, মা।' মা বললেনঃ 'আমি নিজে রেখেছি, কোথা যাবে? ভাল করে দেখ।' আমি আবার বললামঃ 'না মা, বেল নেই।' তখন তিনি বললেনঃ 'খাটের তলায় কি আছে?' আমি উত্তর দিলামঃ 'একটা কুমড়ো আছে।' তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেনঃ 'ঐ কুমড়োটাই নিয়ে এস।' আমি হাতে নিয়েই বুঝলাম—বেল! তখন মা আরও হাসতে লাগলেন।

একবার পাবনা থেকে এক দাদা-বৌদি এসেছিলেন মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে। মা অকাতরে সকলকে দীক্ষা দিতেন। তাঁদের দীক্ষা হল। দাদার নাম শ্রীকালীপদ রায়। তিনি স্কুলের শিক্ষক। বৌদির বয়স কম। আমার সামনে ঘোমটা দেওয়ায় মা বললেনঃ 'বৌমা, তুমি রামময়ের কাছেও লাজ কর? ওতো আমার মেয়ে গো।' তখন আর তিনি ঘোমটা দিতেন না। একদিন দেখলাম বৌদি একসঙ্গে তিনখানা রুটি বেলছেন। আমার সঙ্গে তখন বেশ ভাব হয়েছে। আমি তাঁর পাশে বসে পড়লাম ও বললামঃ 'বৌদি, আমাকে শিখিয়ে দিন।' তিনি দেখিয়ে দিলেন প্রথমে চাকিতে একটু আটা দিয়ে তার উপরে একটি লেচি দিয়ে একটু চেপে তার উপরে আটা দিয়ে আর একটি লেচি দিয়ে একটু চেপে তার উপরে একটু আটা ও তৃতীয় লেচি দিয়ে একটু চেপে, তার উপর আটা দিয়ে এবং চাকির উপরে ভাল করে আটা ছড়িয়ে গোল করে বেলুন চালালে একসঙ্গে তিনখানা রুটি ঘুরতে থাকবে। হাত দিয়ে ঘুরাতে হবে না। যখন ধার ও মাঝ বেশ সমান ও পাতলা হবে, তখন দুখানা নিয়ে উল্টে-পাল্টে ঝেড়ে নিলেই হবে। শিক্ষা তো হল। অভ্যাস করতে গিয়ে দেখলাম তিনখানার বদলে একখানা হয়ে গেছে। বুঝলাম মাঝখানে আটা কম দেওয়া হয়েছে। বেশী আটা দিয়ে করতে তিনখানা হল। কিন্তু ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো ট্যারাবাঁকা হল। গোল হল না। বারে বারে ভেঙে করতে করতে বেশ ভাল তিনখানা রুটি হল। একদিন পুরুষ-ভক্ত বেশী ছিলেন। মেয়ে-ভক্ত কেউ ছিলেন না। মা অনেক আটা মাখতে দিলেন। আমি মেখে ঠেসে রাখলাম। মা নলিনীদিদিকে বললেনঃ 'নলিনী তুই রুটি সেঁক। আমি ও রামময় তোকে বেলে যুগিয়ে দিই।' মা 'ছোট শ্বেত-পাথরের চাকিতে আবলুস কাঠের ছোট বেলুন দিয়ে একখানি করে রুটি বেলছেন আর আমি বড় কাঠের চাকিতে মোটা বেলুন দিয়ে একসঙ্গে তিনখানা করে বেলছি। বেশ কাজ এগিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ নলিনীদি বলে উঠলেনঃ 'পিসীমা, তোমার চেয়ে রামময়ের রুটি ভাল ফুলছে।' এই না বলা! — মা অভিমান করে বেলুন-চাকি

সরিয়ে দিয়ে বসে রইলেন, বললেনঃ 'আমি রুটি বেলতে বেলতে বুড়ি হয়ে গেলাম। আর রামময় দুধের ছেলে, গলা টিপলে মুখ দিয়ে দুধ বেরোবে—সে আমার চেয়ে ভাল রুটি বেলছে! আমি আর বেলব না। ও-ই বেলুক।' মা তো বেলুন-চাকি সরিয়ে বসে রইলেন। আমিও বেলুন-চাকি সরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং মাকে বললামঃ 'আপনি যদি না বেলেন, তবে আমিও বেলব না। আমিও চললাম।' মা দেখলেন একসঙ্গে দুজনে বেললে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে এবং ঠাকুরের ভোগ দিতে ও ছেলেদের প্রসাদ দিতে দেরী হবে না। তাই তিনি বেলতে বসলেন। নলিনীদিকে বকলামঃ 'দুজনে একসঙ্গে দিচ্ছি, তুমি কি করে চিনলে কোন্‌টি পিসীমার আর কোন্‌টি রামময়ের? আমি কখনও মা-র চেয়ে ভাল রুটি বেলতে পারি? তুমি কেন অনর্থক তুলনা করছ?'

এখন আমার বয়স ৮৮ বছর। যখন এইসব ভাবি—তখন মা কেন এরূপ অভিমান করলেন, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে শাস্ত্রে পাই, এঁদের বিচিত্র ব্যবহার হয়। কখনও ছেলেমানুষের মতো এবং কখনও প্রাজ্ঞের মতো। অকাতরে সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন; সকলের প্রশ্নের সমাধান করে দিচ্ছেন। আবার ছেলেমানুষীও করছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের খরচ কুলিয়ে যেত বটে, কিন্তু বেশী টাকা কোন সময়েই থাকত না। আমাকে বাক্স খুলে কত টাকা আছে বের করে আনতে বললেন। আমি বললামঃ 'এগার টাকা আছে।' ঐ টাকা সব দিয়ে বললেনঃ 'এই একটাকার তেল, একটাকার আটা, দুটাকার ঘি—ইত্যাদি কিনে আনবে।' আমি বলতামঃ 'না মা, আপনি যেমন বলছেন লিখে নিচ্ছি। শেষে পাঁচসের, আড়াই সের এইরকম হিসাবে কিনব। তাতে দরে সুবিধা হবে।' মা খুব খুশী হয়ে বলতেনঃ 'হ্যাঁ বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার যেমন খুশী হিসেব করে কিনে আনবে। আমি বাবা অত হিসাব করতে পারি না।' কখনও কখনও টাকা ফুরিয়ে গেলে বলতেনঃ 'আজ ইংরেজী মাসের কদিন?' আমি ২৭ দিন বললে বলতেনঃ 'আর কদিন বাকি আছে?' আমি চারদিন বাকি আছে বললে বলতেনঃ 'তবে আর কি? কদিন পরেই ইন্দুর টাকা আসবে, মাষ্টারের (শ্রীম-র) পাঁচ টাকা আসবে। তখন বেশি করে কিনলেই হবে।' রাঁচির ইন্দুবাবু ঠিক মাসের ১লা কি ২রা মাকে তখন ১৫৲ টাকা হিসাবে পাঠাতেন। মাস্টারমশায়ও (শ্রীম) ৫৲ টাকা পাঠাতেন। সে সময়ে ওদেশে চালের মণ দুটাকা ছিল।

ইন্দুবাবুর সঙ্গে একবার আমাদের হেডমাস্টারমশায় প্রবোধবাবুর জয়রামবাটীতে সাক্ষাৎ হয়। দুজনেই খুব গল্প জমাতেন। দু-তিনদিন পর প্রবোধবাবু কোয়ালপাড়ায় গিয়ে থাকতে চাইলেন। কেননা, বেশী লোক থাকলে মায়ের কষ্ট হবে। মা কিন্তু বললেনঃ 'কোয়ালপাড়ায় কেন? এখানেই থাক না। দুটি খাওয়া বৈ তো নয়। আমার কিছু কষ্ট হবে না। তোমাদের দুটিতে বেশ ভাব হয়েছে। যে কদিন ইন্দু আছে, এখানেই থাক।' আমি রান্নার জন্য সরু সরু কাঠ চেলা করছিলাম। প্রবোধবাবু 'আমাকে দে' বলে কিছু চিরতেই মা নিজে বৈঠকখানার কাছে এসে বললেনঃ 'না বাবা! তোমার করতে হবে না। রামময়ের অভ্যেস আছে, ও করুক। তোমরা বয়স্ক লোক, হাতে ব্যথা হবে।' মাস্টারমশাই বললেনঃ 'আমরা gentlemen! Disqualified! (ভদ্রলোক! বাতিল!) একটু খেটে মার সেবা করার অধিকার আমাদের নেই!'

একদিন মায়ের বাক্সের সব কাপড় রোদে দিচ্ছি—একখানি ছেঁড়া আসাম সিল্কের এণ্ডি বা মুগার কাপড় হবে—আমি ঠিক কিসের জানতাম না। কাপড়টি একটু ছেঁড়া দেখে বললামঃ 'মা, এই কাপড়টা ফেলে দিই, এটা ছিঁড়ে গেছে।' মা বললেনঃ 'না বাবা ফেল না, ওটি বড় আদর করে "খুকী" আমাকে দিয়েছিল। অনেক দিন পরেছি।' 'খুকী' হচ্ছেন সিস্টার নিবেদিতা। সিস্টার নিবেদিতাকে মা খুবই ভালবাসতেন। যেদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে মাকে দর্শন করতে পাঠান, তাঁর খুবই ভয় ছিল যে, মা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাকে না ম্লেচ্ছ বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। তারপর মা জানেন না ইংরেজী আর নিবেদিতা জানেন না বাংলা। এজন্য দোভাষীর কাজ করবার জন্য স্বামীজী তাঁর শিষ্য স্বরূপানন্দজীকে পাঠিয়েছিলেন। উনি নিজে গিয়ে সিস্টার নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দিতে মা খুব খুশী। যখন মা নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন নিবেদিতা ইংরেজীতে বললেনঃ 'আমার নাম মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্।' মা বললেনঃ 'বাছা, আমি অত বড় নাম মনে রাখতে পারব না, আমি তোমাকে "খুকী" বলে ডাকব।' স্বরূপানন্দজী তখন বুঝিয়ে নিবেদিতাকে তর্জমা করে বলে দিলেনঃ 'Mother will not be able to utter such a big name, she will call you "Baby".' নিবেদিতা ভারী খুশি হয়ে বলতে লাগলেনঃ 'Yes, yes, I am mother's baby.' স্বামীজীর কাছে গিয়ে ডগমগ হয়ে বললেনঃ 'মা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিয়েছেন, প্রসাদ দিয়েছেন এবং "খুকী" বলে ডাকবেন বলেছেন।' মায়ের সঙ্গে নিজে কথা বলবেন বলে নিবেদিতা স্বরূপানন্দজীর কাছে বাংলা শিখলেন। মা এইরকম সকলকেই ভালবাসতেন, সকলকেই আদর করতেন।

শ্রীশ্রীমা গান খুব ভালবাসতেন। একবার ইন্দ্রদয়ালবাবু (পরে স্বামী প্রেমেশানন্দ), মোক্ষদাবাবু প্রভৃতি কয়েকজন জয়রামবাটী এসেছিলেন। তাঁরা বহু গান গেয়ে মাকে শুনিয়েছিলেন। মা-ও খুব আনন্দ করে শুনতেন। শেষে মাকে ঘিরে কীর্তনও হয়েছিল। একবার পূজনীয় বিশুদা (স্বামী তপানন্দজী) জয়রামবাটীতে অনেক গান করেছিলেন। আমাদের হেডপণ্ডিত মশায় পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত গান হয়েছিল, মা খুব খুশী হয়েছিলেন। গ্রামের বহু লোক জমেছিল।

একটি ভক্ত-স্ত্রীলোকের মায়ের সেবা করার কথায় শ্রীশ্রীমা বলেনঃ 'না বাবা! এখানে ঠাকুরের সেবা আছে। চলবে না। আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। সতীরও মা, অসতীরও মা। কিন্তু ঠাকুরের সেবা চলবে না। হাড়শুদ্ধ মেয়ে কটা? আঙুলে গোনা যায়।'

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে জয়রামবাটীতে যেদিন প্রথম দর্শন করি, সেদিন দূরে থেকে তাঁর বিশাল বপুটি দেখে কাছে যেতে ভয় হয়। সেজন্য তাঁকে রাস্তা থেকে দেখে বরাবর মায়ের কাছে চলে যাই। মাকে প্রণাম করতেই মা খুব খুশী হয়ে বললেনঃ 'রামময়, শরৎ এসেছে, দেখেছ?' আমি বললামঃ 'হ্যাঁ মা, দেখেছি দূরে থেকে।' মা বললেনঃ 'কাছে যাওনি, শরৎকে পেন্নাম করনি?' আমি বললামঃ 'না মা, ভয় করছে।' মা বললেনঃ 'বোকা ছেলে! শরৎকে আবার ভয়? দেখবে তোমাকে কত ভালবাসবে, যাও।' আমি মায়ের বাড়ির ভিতর দিক থেকে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার নাম, বাড়ি কোথায়, কেন জয়রাম-

বাটীতে এসেছি, কোন আত্মীয় বা বন্ধু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ছোট বলে তিনি 'আমি যে মায়ের কাছেই আসি' তা ধারণা করেননি এইরূপ বুঝে আমি সোজা উত্তর দিলামঃ 'আমি প্রতি শনিবারেই মায়ের কাছে আসি ও সোমবারে স্কুলে ফিরে যাই।' তখন তিনি বুঝলেন। তাঁর কথাগুলো এত স্নেহমাখা যে আমারও খুব আনন্দ হল। কয়েক মিনিট পরেই মা আমাকে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন ও কিছু খাবার দিলেন। তখন পূজনীয় শরৎ মহারাজের বুঝতে বাকী থাকল না যে, মা আমাকে খুব স্নেহ করেন। আমি বাড়ির ভিতরের সকলেরই বিশেষ পরিচিত জেনে মহারাজ আমাকে বললেনঃ 'দেখ, মা কখন কি করছেন, দেখবি। যখন তাঁর হাতে কোন কাজ থাকবে না, তখন আমাকে এসে বলবি। আমি তাঁকে প্রণাম করতে যাব কিনা, তখন তোকে জিজ্ঞাসা করে আসতে বলব। দেখিস, যেমনটি বললাম তেমনটি করবি। নিজের বুদ্ধি খাটাবি না।' আমি বুঝে নিলাম, পাছে আমি মাকে তাঁর কাজের সময় প্রণামের কথা বলি এইজন্য সাবধান করলেন। আমি ঠিক আদেশ-মতো গিয়ে বলতামঃ 'মহারাজ, মা এখন তরকারি কেটে নিজের ঘরে বসে আছেন।' শুনেই মহারাজ বলতেনঃ 'মায়ের কাছে গিয়ে জোড়হাত করে জিজ্ঞাসা করে আয়, আমি এখন প্রণাম করতে যাব কিনা।' মাকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র বলতেনঃ 'হ্যাঁ বাবা, শরৎকে আসতে বল।' আমি মহারাজের পেছন পেছন গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব দেখতাম। মায়ের ঘরের দরজা ছোট। মহারাজ বেশ মোটা। সোজা ঢুকতে পারতেন না, কাত হয়ে ঢুকতেন। মা নিজের খাটে বসে পা দুখানি মাটিতে রাখতেন। মহারাজ নতজানু হয়ে বসে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করতেন। মা-ও তখন দুটি হাত তাঁর মাথায় রেখে আশীর্বাদ করতেন। পরে মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেনঃ 'মা, ভাল আছেন?' মা উত্তর দিতেনঃ 'হ্যাঁ, বাবা, আমি ভাল আছি। তুমি ভাল আছ?' তিনি উত্তর দিতেনঃ 'হ্যাঁ, মা, আমি ভাল আছি।' রোজ এই একই প্রশ্ন ও উত্তর শুনতাম। প্রণামের পর মহারাজ ধীরে ধীরে উঠে মায়ের দিকে পিছন না করে পিছিয়ে পিছিয়ে ঘরের বাইরে আসবার পর সোজা হয়ে বৈঠকখানা ঘরে যেতেন। মা ঘোমটা দিতেন বলে বলতেনঃ 'আমি যেন শ্বশুর! আমার সামনেও এতখানি ঘোমটা!'

আজকাল কত ভক্ত কত কিছু আজগুবি কথা বলেন। শুনে হাসি পায়। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'শ্রীশ্রীমা কি গলায় সোনার হার, ঘাড়ে সিন্দুর পরতেন?' আমি তাঁদের বলিঃ 'এসব বাজে কথা। মা কেবল হাতে সোনার বালা পরতেন। গলায় সরু সোনার তার দিয়ে গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন।' 'কেশবানন্দ স্বামীর ধর্মপত্নী মায়ের গায়ে তেল মাখিয়ে দিতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— তিনি বলেনঃ 'এসব আজগুবি কথা।' পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী, তিনি তখন মঠের প্রেসিডেন্ট—বলেছিলেনঃ '...মায়ের শিষ্য শিষ্যা দুই চারজনের কথা একটু নুন দিয়ে গিলতে হবে। তারা কিছু কিছু আজগুবি কথা বলে।' আমি মায়ের মাথা থেকে পাকা চুল বেছে দিতাম। কখনও ঘাড়ে সিন্দুর দেখিনি।

পুঁথিকার শ্রদ্ধেয় অক্ষয় মাস্টার মহাশয় বলতেনঃ 'দেখ ভাই! ঠাকুর আমার গুরু এবং যা কিছু সব। কিন্তু তবু মার এত স্নেহ যে, ঠাকুরকে যদি দিনে দুশো বার স্মরণ হয়, তো মাকে হাজার বার মনে পড়ে। ঠাকুর যেন প্রচণ্ড মার্তণ্ড, আর মা যেন সুস্নিগ্ধ-চন্দ্রমা। কিন্তু ভাই, এমন স্নেহময়ী জননীও প্রারব্ধের উপর হাত দেন

না। সেটি এই শরীরের উপর দিয়েই ভোগ হয়ে যাবে।' তারপর একটা ঘটনা বললেনঃ 'একদিন আমি ও উমেশ ডাক্তার মাকে দর্শন করতে যাই। মা নানাকথার মধ্যে এমন সহজ সরলভাবে নিজের আঙুলের ডগাটি দেখিয়ে বললেনঃ "শেষ বয়সে অক্ষয়ের একটু কষ্ট আছে।" তখন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরে ঘরে বসে যতই ভাবি, ততই পরাণটা আঁচড় পাঁচড় করতে থাকে। দুই/তিন দিন পরে উমেশ ডাক্তার মাকে দর্শন করতে গেল। আমি তার মারফত বলে পাঠালাম, "মাকে গিয়ে বলবি আমার শেষ বয়সে কষ্ট হবে শুনে বড়ই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মা যেন আশীর্বাদ করেন ঐটি যাতে কেটে যায়।" কিন্তু তা শুনেও মা বলেছিলেন, "সামান্য একটু কষ্ট হবে।" কই, "এটি হবে না" তো বললেন না। আর এটুকু কষ্ট কেমন তা তো বুঝতেই পারছ!' অক্ষয় মাস্টারমশায়ের শেষজীবনে খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সারা দিনরাতের মধ্যে কখনও ঠাকুর ও মায়ের কথা ছাড়া অন্য কথা বলতেন না। আমাকে অনেক কথা বলে বলতেনঃ 'এখন কেবল শুনে রাখ, মা যখন কৃপা করেছেন, তখন একদিন সব উপলব্ধি হবে। তখন মনে পড়বে—হ্যাঁ, বুড়ো এসব ঠিক ঠিক বলেছিল তো।'

সারদা ঃ রূপে রূপান্তরে

লীলাসঙ্গিনী

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আমরা ব্যাপকভাবে আলোচনা করতে আরম্ভ করেছি অল্প-দিন। আমরা যখন ছোট ছিলাম, অর্থাৎ মা যখন স্থূল দেহে বিরাজ করছিলেন, তখন তাঁর সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা একেবারেই হত না। তাঁর ছবিও বাজারে পাওয়া যেত না। নেহাৎ ঘনিষ্ঠ ভক্ত যারা, তারাই কোনরকমে মায়ের ছবি সংগ্রহ করে তাদের নিজেদের কাছে পরম সম্পদ হিসেবে রেখে দিত। ঠাকুর এবং স্বামীজীর ছবি বাইরে পাওয়া যেত, তাঁদের নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনাও হত। কিন্তু যুগাবতারের এই ভাব-আন্দোলনে তাঁর সহধর্মিণীরও যে কোন ভূমিকা আছে এ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।

এর কারণ প্রধানত দুটো। প্রথমত, অবতারপুরুষকে চিনতে সব সময়ই সাধারণ মানুষের একটু দেরি হয়। গীতায় ভগবান বলেছেনঃ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥[১]

—অজ্ঞান ব্যক্তিরা আমাকে মানবদেহ-আশ্রিত বলে, মানবদেহবিশিষ্ট বলে অবজ্ঞা করে। তারা আমাকে 'ভূতমহেশ্বর'রূপে, সমগ্র জগতের নিয়ন্তারূপে জানে না। ঠাকুরকেও আমরা জানতাম না। ঠাকুরের অন্য ঐশ্বর্য না থাকলেও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের ছড়া-ছড়ি ছিল। তিনি মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হচ্ছেন—লোকে বলতঃ 'সাতবার মরে, সাত-বার বাঁচে।'[২] আর তাঁর ভিতর দিয়ে কথামৃত-মন্দাকিনী বয়ে যাচ্ছে—যা পান করে পণ্ডিত মূর্খ সকলে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেও লোকে অবতার বলে চিনতে পারত না। আর, মা—যিনি বাইরের লোকের সঙ্গে কথা প্রায় বলতেনই না, যাঁর মধ্যে কোন ঐশ্বর্য নেই, আড়ম্বর নেই, বিদ্যার ঐশ্বর্য অর্থাৎ পরাবিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত যেখানে লুপ্ত—সেই মাকে লোকে কি করে চিনবে? মাকে চিনতে না পারার আর একটি কারণ মা নিজেও নিজেকে 'লজ্জাপটাবৃতা' করে লুকিয়ে রেখেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বাস করতেন ঐ নহবতখানার ছোট্ট ঘরটিতে। তাঁকে বাইরের কেউ দেখতে পেত না। নহবতের পিঞ্জরে নিজেকে মা এমনভাবে লুকিয়ে রাখতেন যে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির খাজাঞ্চী, যিনি সেখানে সর্বদা থাকতেন তিনি একদিন মায়ের সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ 'তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনও দেখতে পাইনি।'[৩] যিনি স্বয়ং মহামায়া, তিনি যদি ইচ্ছা করেন অন্তরালে থাকতে, তাহলে

জগতের কারও সাধ্য নেই তাঁকে দেখে। কারণ, জগৎ সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছাধীন। মা চাননি তাই মায়ের খবর তাঁর জগৎজোড়া সংসারে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে সময় লেগেছিল।

মনে হয় ঠাকুরেরও ইচ্ছা ছিল সহসা মাকে বাইরে প্রকাশ না করা। মহীশূরের এক শিল্পীর কথা জানি, তিনি তাঁর স্টুডিওতে যেখানে ছবি আঁকতেন সেখানে কাউকে যেতে দিতেন না। তাঁর ছবিগুলি প্রকাশ্যে দিতেন না। ছবি শেষ হলে খুব বাছা বাছা দু-চারজন লোককে নিমন্ত্রণ করতেন এবং তাদের ছবি দেখাতেন। বাইরে প্রকাশ্য-ভাবে তাঁর ছবি, যাকে আমরা প্রদর্শনী (Exhibition) বলি, কখনও দেখাতেন না। ঠাকুর সেই রকম বিরাট এক শিল্পী। তিনি মাকে ধীরে ধীরে তাঁর মনের মতো করে গড়ে তুলছেন—যেমন জগন্মাতা স্বয়ং তাঁকে গড়ে তুলেছেন। সহধর্মিণী যাতে তাঁর লোককল্যাণ-লীলায়, অহৈতুকী-প্রেম-বিতরণের লীলায় যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেন তার জন্য কোন প্রয়াসই ঠাকুর বাকি রাখেননি। অতি সাধারণ লৌকিক কাজ—প্রদীপের সলতে কি করে পাকাতে হয়—তা থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম তত্ত্ব সমাধি-রহস্য পর্যন্ত মাকে শিখিয়েছেন। কিন্তু এই অভূতপূর্ব শিল্পকর্মটি তিনি যখন রচনা করে চলেছেন তখন বাইরের কোলাহল, সংসারী মানুষের কৌতূহলী কটাক্ষ—এসব তিনি অবাঞ্ছিত মনে করেছিলেন। তাই মায়ের বিকাশ ঘটেছে লোক-চক্ষুর অন্তরালে। আজ ঠাকুরের এই শিল্পসৃষ্টিটি ঠাকুরেরই ইচ্ছায় সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মানুষ মুগ্ধ হয়ে মাকে দেখছে, মাতৃলীলা আস্বাদন করছে—যার যেমন সামর্থ্য সেইরকম। 'যার যেমন সামর্থ্য' এই কারণে বলছি যে, মাকে সম্পূর্ণ-ভাবে বুঝবার সামর্থ্য কারও নেই। স্বয়ং স্বামীজী তাঁর 'মহাপুরুষ' গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে একবার লিখেছিলেনঃ 'দাদা, রাগ করো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি।'[৪] কাজেই, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যে তাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে মায়ের অসীম মহিমা অসম্পূর্ণভাবেই শুধু বুঝবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মায়ের মহিমা কেউ যদি ঠিক ঠিক বুঝে থাকেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ, মাকে যাঁরা দেখেছেন বা মা যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে মায়ের সমপর্যায়ের মানুষ একমাত্র তিনিই। তাই মায়ের প্রতি তাঁর ব্যবহারে শুধু ভালবাসাই নয়—গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশ পেত। হয়তো ভুল করে মায়ের মনে কোন আঘাত দিয়ে ফেলেছেন কিংবা মা হয়তো মনে কোন আঘাত পাননি, কিন্তু ঠাকুর ভেবেছেন তিনি মাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছেন—তাহলে ঠাকুরের দুঃখ ও কুণ্ঠার শেষ থাকত না। মা-ও সেইজন্য বলতেনঃ 'ঠাকুর আমাকে কখনও ফুলের ঘা-টি পর্যন্ত দেননি।'[৫] ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় ঠাকুরের সেবা যেমন করেছেন, দুর্ব্যবহারও তেমনই করেছেন। হৃদয়ের কটূক্তি ঠাকুর নিঃশব্দে সহ্য করতেন। কিন্তু হৃদয় মাকেও একদিন কটূক্তি করলে ঠাকুর হৃদয়কে বলেছিলেনঃ 'ওরে, হৃদে, [নিজেকে দেখিয়ে] একে তুই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে [শ্রীশ্রীমাকে] আর কখনও এমন কথা বলিস

নি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস ; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।'[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে এত সম্মান দিলেও শ্রীমা কিন্তু নিজেকে তাঁর সেবিকা ছাড়া কিছু ভাবতেন না। কখনও মনে করতেন না যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর অন্য কারও চেয়ে বেশী দাবী আছে। সম্পূর্ণভাবে তিনি ছিলেন ঠাকুরের সুখে সুখী।

অদ্ভুতচরিত্র এই পতি-পত্নীর মধ্যে লৌকিক সম্পর্ক কিছুই ছিল না—ছিল এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। স্থূল দেহসুখের বাসনা তো দূরের কথা, সূক্ষ্মতম কোন জাগতিক বাসনাও তাঁদের মনে কখনও স্থান পায়নি। অদ্ভুত এই আদর্শটি বিশ্বের সকলের সামনে প্রতিষ্ঠা করবার মতো। হিন্দুশাস্ত্র বরাবরই বলে এসেছে যে বিবাহিত জীবন শুধু ভোগের জন্য নয়, ধীরে ধীরে সংযম অভ্যাসের জন্যই বিবাহিত জীবন এবং ঈশ্বরলাভ বিবাহিত জীবনেরও উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আসবার আগে ভারতবর্ষের মানুষ এই আদর্শটি ভুলতে বসেছিল। লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেনঃ 'তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] জীবনের সকল কার্যের ন্যায় বিবাহরূপ কার্যটাও লোককল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।'[৭] দাম্পত্যজীবনের সেই মহৎ আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই 'এ অপূর্ব যুগাবতারের বিবাহ করিয়া, একদিনের জন্যও শরীর-সম্বন্ধ না পাতাইয়া, স্ত্রীর সহিত এই অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব প্রেমলীলার বিস্তার'।[৮] শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে মায়ের সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ 'ও (শ্রীমা) যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে (আমার) সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহবুদ্ধি আসত কি না, কে বলতে পারে?'[৯] অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর ঐ 'অদৃষ্টপূর্ব প্রেমলীলা' হয়তো সম্ভবপর হত না, যদি শ্রীমা এক্ষেত্রে তাঁর উপযুক্ত লীলাসঙ্গিনীর ভূমিকাটি পালন না করতেন।

সীতাকে দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ সীতা 'রামময় জীবিতা'। আমাদের শ্রীশ্রীমাও ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণময় জীবিতা—'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা'। সীতার যেমন শুধু শরীর পড়ে ছিল, তার 'ভেতর মনপ্রাণ ছিল না মনপ্রাণ তিনি শ্রীরামচন্দ্রে সমর্পণ করেছিলেন, তেমনই শ্রীশ্রীমায়েরও মনপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণে চিরসমর্পিত ছিল। ঠাকুরের জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। ঠাকুরের অসুখ। ডাক্তার বলেছেন, গেঁড়ি-গুগলির ঝোল খেতে হবে। ঠাকুর মাকে সেকথা বললেন। মায়ের কোমল প্রাণ। বললেনঃ 'এগুলো জ্যান্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়। আমি এদের মাথা ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।' ঠাকুর বললেনঃ 'সেকি! আমি খাব, আমার জন্যে করবে।'[১০] মা তখনই রোখ করে ঐ কাজে প্রবৃত্ত হলেন। আবার ঠাকুর যখন অসুস্থ হয়ে শ্যামপুকুরে আছেন, তাঁর পথ্য-ইত্যাদি তৈরীর উপযুক্ত লোকের অভাব দেখা

দিল। ভক্তেরা প্রস্তাব করলঃ মাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামপুকুরে আনা হোক। মা অতি লজ্জাশীলা, কখনও বাইরে আসেননি। শ্যামপুকুরের বাড়ি খুব ছোট, তার ওপরে চারিদিকে পুরুষ। মায়ের লজ্জাশীলতার কথা ভেবে ঠাকুর বললেনঃ 'সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে? যাই হোক, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সব কথা জেনে-শুনে সে আসতে চায় তো আসুক।'[১১] মাকে জিজ্ঞাসা করা হলে মা নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে শ্যামপুকুরে এসে ঠাকুরের সেবার ভার সানন্দে গ্রহণ করলেন। 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' মা ঠাকুরের জন্য যে-কোন কষ্ট, যে-কোন অসুবিধা বরণ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ছিলেন 'তন্নামশ্রবণপ্রিয়া'। রামকৃষ্ণ-নাম শ্রবণেই ছিল তাঁর প্রীতি। আর ছিলেন 'তদ্ভাবরঞ্জিতাকারা'। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের দ্বারা তাঁর আকার রঞ্জিত—রামকৃষ্ণভাব শ্রীশ্রীমায়ে ওতপ্রোত। তাই ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে জগৎ যে অপূর্ব 'সারদালীলা' প্রত্যক্ষ করেছে, তার মধ্যে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবই সর্বদা প্রকাশিত হয়েছে।

যাঁরা পূর্ব পূর্ব অবতারদের লীলাসঙ্গিনীরূপে এসেছিলেন, যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি তাহলে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের জন্যে তাঁদের অবদানের স্বল্পতা দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু শ্রীশ্রীমা যেভাবে ঠাকুরের ভাবধারাকে চারিদিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছেন তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ঠাকুর নিজেও মাকে শরীরত্যাগের আগে বলেছিলেনঃ 'এ (শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে) আর কি করেছে, তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।' সেই 'অনেক বেশী' কাজ শ্রীমা করেছেন তাঁর মাতৃস্নেহের মাধ্যমে। ঠাকুরের সন্তানরা মাকে ঠাকুর থেকে পৃথকরূপে দেখতেন না। ঠাকুরেরই মাতৃরূপে আর একটি অভিব্যক্তি দেখতেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও বলেছেনঃ ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে আমাকে এবার রেখে গেছেন।[১২]

বস্তুত, মায়ের মাতৃভাব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারেরই একটা মাধ্যম হয়ে দেখা দিয়েছে। বলা যেতে পারে, সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। সন্তান মায়ের মাহাত্ম্য বোঝে না, কিন্তু তা বলে মাকে কম আস্বাদন করে না। অবোধ শিশু তার নির্বোধ মন দিয়ে আস্বাদন করে, তার অন্তর দিয়ে প্রাণ দিয়ে আস্বাদন করে। মাকে সে বোঝাতে পারে না, ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তাঁর মাধুর্য অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু নিজে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করে। তার ঐ ছোট্ট হৃদয়টি সেই আস্বাদনে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর মা সেই অবসরে—যদি তিনি চান—অতি সহজে সন্তানকে তাঁর যা শেখানোর শিখিয়ে দিতে পারেন। শ্রীশ্রীমা জগজ্জননীরূপে এই অতি মধুর কার্যকর পথটি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর গুরুভাব মাতৃত্বের আবরণে মণ্ডিত। তিনি প্রথমে স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে সন্তানের হৃদয়টি জয় করে নিতেন। তারপর অতি সহজে তার মধ্যে ঠাকুরের ভাবসম্পদ ঢেলে দিতেন। আজও আমরা যখন মায়ের জীবনী পড়ি, তাঁর কথা ভাবি, তখন তাঁর মাতৃরূপটাই প্রথমে আমাদের অভিভূত করে। এর পরে আমরা যখন তাঁর উপদেশের দিকে তাকাই তখন প্রায় বিনা প্রতিরোধে

সেগুলি মেনে নিই। কারণ, ইতিপূর্বেই মা তাঁর স্নেহ দিয়ে আমাদের মন জয় করে ফেলেছেন, আমরাও মাকে ভালবাসতে শুরু করেছি, আর যাঁকে ভালবাসা যায় তাঁর কথা মেনে নিতে আমরা সাধারণত দ্বিধা করি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম থেকেই জানতেন যে শ্রীমাকে 'জগতের মা'-রূপে দাঁড়াতে হবে এবং তাঁর সেই জগজ্জননী-রূপের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভাবধারার অলকানন্দা অক্ষুণ্নভাবে জগতে প্রবাহিত হবে। তাই যখন মায়ের মা বললেন, 'এমন পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম! আহা! ঘরসংসারও করলে না, ছেলে-পিলেও হল না, "মা"-বলাও শুনলে না।'—ঠাকুর তখন বলেছিলেনঃ 'শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না ; আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন, "মা"-ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।'[১৩] ঠাকুরের বাণী সত্য হয়েছে, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে হয়নি। কারণ বহুলোকে 'মা' বলে ডেকেছে সত্যি, কিন্তু মা কখনও অস্থির হয়ে ওঠেননি। মায়ের মাতৃহৃদয় এত প্রসারিত যে তাঁর অগণিত সন্তানের সকলের জন্য সেখানে স্থান ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মা তো লৌকিক মা নন যে, কেবল আমাদের দেহের ভরণপোষণ করবেন। এ মা শুধু ইহজগতের মা নন, পরজগতেরও মা—চিরকল্যাণকারিণী মা। মায়ের সেই জগন্মাতৃ-শক্তিকে ঠাকুর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধিত করেছিলেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন (১২৭৯ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ) ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে শ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পূজা করে। পূজার আগে শ্রীমাকে দেবীর আসনে বসিয়ে ঠাকুর আবাহনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেনঃ 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!' এই মাতৃভাব যতই আলোচনা করা যাবে, ততই আমরা উপলব্ধি করতে পারব, যুগাবতারের জগৎ-উদ্ধার কার্যে তাঁর লীলাসঙ্গিনীর ভূমিকা কতখানি।

মায়ের মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা কোন গণ্ডির ভিতরে সীমিত নয়। তাঁর আশেপাশে যারা তাঁকে মা বলে ডাকছে, তাদের যেমন তিনি মা, তেমনই দূরে যারা, ভিন্ন দেশের অধিবাসী, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ করতে পারে না, তাদেরও তিনি সমানভাবে সন্তানরূপে দেখতেন। তখন স্বদেশী যুগ। সেই সময়ে তাঁর কাছে কয়েকজন ছিলেন যাঁরা অত্যন্ত স্বদেশীভাবাপন্ন। মায়ের আত্মীয় মেয়েদের জন্য তাঁদেরই একজন কাপড় কিনতে গিয়েছেন। কিনেছেন তখনকার দিনের তাঁতে-বোনা কাপড়। কিন্তু মেয়েরা চায় মিলের কাপড়। সেই সন্তান বললেনঃ 'ওসব তো বিলিতী হবে, ও আবার কি আনব?' মা বললেনঃ 'বাবা, তারাও তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি একরোখা হলে চলে?'[১৪] আমাদের দৃষ্টিতে যারা বিদেশী বা যাদের উপর আমাদের একটা দ্বেষভাব আছে তাদের প্রতিও মায়ের মাতৃত্ব সমানভাবে প্রসারিত। তাঁর দৃষ্টিতে স্বামী সারদানন্দ যেমন তাঁর সন্তান, দস্যু আমজাদও তাঁর তেমনই সন্তান। স্বামী সারদানন্দ—মঠ-মিশনের যিনি

তৎকালীন সম্পাদক—Secretary, যিনি মায়ের একনিষ্ঠ সেবক, যাঁর সম্বন্ধে মা বলেছিলেন যে, একমাত্র শরৎই আমার ভার বইতে পারে—সেই শরৎ যেমন তাঁর সন্তান, দস্যু আমজাদও তাঁর তেমনই সন্তান। ভিন্ন দেশের লোকেরা যারা মায়ের সান্নিধ্যে আসত অনেকে তাঁর ভাষা জানত না, তাঁর সাথে সাক্ষাৎভাবে কোন ভাষার আদান-প্রদান হত না। কিন্তু মায়ের সান্নিধ্যে মায়ের স্নেহদৃষ্টিতে তাদের মন ভরে যেত। তারা সেই মাতৃত্বের আস্বাদ পেত। আমরা বিচার করে অনেক সময় কোন ব্যক্তিকে ত্যাজ্য-গ্রাহ্য করি। মায়ের কাছে কেউ ত্যাজ্য ছিল না। তাঁর স্নেহের প্রবাহ কোনভাবে কোথাও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে এই স্নেহ বর্ষিত হচ্ছে না। সর্বত্র সমভাবে এই মাতৃস্নেহ প্রসারিত। এইটি এক অদ্ভুত ব্যাপার। মায়ের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমরা তাঁর জীবনে অনেকগুলি ঘটনা দেখতে পাই। মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত একটি যুবক-ভক্তের পদস্খলন হয়েছে। অথচ মায়ের কাছে সে আগের মতোই যাতায়াত করে। অন্য ভক্তেরা মাকে বললেন, তিনি যেন ঐ যুবকটিকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করে দেন। মা ঐ যুবকটির জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন, কিন্তু ভক্তদের বললেনঃ 'আমি নিষেধ করতে পারি না, মা হয়ে ছেলেকে "এসো না" বলা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।'[১৫] মা বলতেনঃ 'ভাঙতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে কজনে?'[১৬] বলতেনঃ 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!'[১৭]

মাকে তাঁর মাতৃত্বের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঠাকুর অনেক আগে থেকেই সচেতনভাবে প্রয়াস করে এসেছিলেন। এইজন্য ধীরে ধীরে তাঁকে তৈরী করেছেন সর্বক্ষেত্রে সর্বভাবে সম্পূর্ণ করে। আধ্যাত্মিক জীবন থেকে আরম্ভ করে লৌকিক জীবন পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং যখন এই মাতৃত্ব ক্রমশ বিকাশ-লাভ করছে, তখন ঠাকুরের চেয়ে বেশী আনন্দিত আর কেউ হননি। যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পার্ষদেরা ধীরে ধীরে তাঁর পদপ্রান্তে সমাগত হচ্ছেন, সেই সময়কার কথা। ঠাকুর একদিন মাকে বলছেনঃ তুমি বাবুরামকে অত করে খেতে দাও, তার ফলে সে রাত্রে ঘুমুবে। তাহলে ভজন করবে, সাধন করবে কি করে? মা বললেনঃ 'ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।'[১৮] ঠাকুরের সব কথা মা নির্বিবাদে মেনে নিতেন। কিন্তু ঠাকুর এখানে যেন তাঁর মাতৃত্বের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তাই ঠাকুরের আদেশকে অগ্রাহ্য করতেও তিনি দ্বিধা করলেন না। ঠাকুর কিন্তু তাতে বিরক্ত হননি বরং আনন্দিত হয়েছেন। কারণ এইটাই তিনি চাইছেন—মাকে তাঁর মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত দেখতে। আর একটি ঘটনাঃ মা দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকেন। ঠাকুর আছেন তাঁর ঘরে, যেটি এখনও তাঁর ঘর বলে পরিচিত।

ঠাকুরের আহার্য তৈরী করে মা দুপুরে এবং রাত্রিতে ঠাকুরের কাছে নিবেদন করতেন। একদিন ঠাকুরের জন্য আহার্য নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় এক ভক্ত-মহিলা মাকে বললঃ 'দিন, মা, আমায় দিন।' মা কোন আপত্তি করলেন না। তাকে ঠাকুরের আহার্য দিলেন, সে ঠাকুরের কাছে থালাটি নামিয়ে রেখে চলে গেল। ঠাকুর খেতে বসলেন, মা-ও কাছে বসলেন। ঠাকুর কিন্তু চেষ্টা করেও সেই অন্ন স্পর্শ করতে পারলেন না। মা বুঝলেন, ঠাকুর ও অন্ন খেতে পারছেন না। ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন, সেদিনকার মতো কোনরকমে খেয়ে নিতে। ঠাকুর কিন্তু তখনও সেই অন্ন ছুঁতে পারলেন না। মায়ের মিনতির উত্তরে অবশেষে বললেনঃ 'আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল।' মা তখন হাত জোড় করে বললেনঃ 'তা তো আমি পারব না ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব ; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।'[১৯] ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও ঠাকুর কিন্তু অসন্তুষ্ট হলেন না। বুঝলেন, মায়ের ভিতরে যে মাতৃত্বের বিকাশ ঘটছে তার প্রভাব এখানে তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কথাকে পর্যন্ত উপেক্ষা করতে বাধ্য করছে। এইটি ঠাকুর চাইতেন—তাঁকে তাঁর মাতৃত্বের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে। কারণ মায়ের সেই মাতৃরূপের মাধ্যমেই জগতের মানুষের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা প্রবাহিত হবে। নিবেদিতা বলছেনঃ জগতের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভালবাসা ছিল, সেই ভালবাসা একটি পাত্রে ভরে তিনি যেন স্মারক হিসেবে পৃথিবীতে তাঁর যত সন্তান আছে তাদের জন্য রেখে গেছেন। মা সেই পাত্র—শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের অমৃতভাণ্ড।[২০]

মা তাঁর এই স্নেহ দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাকে পুষ্ট করেছেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর আমরা দেখেছি মা অকৃপণভাবে আধ্যাত্মিক সম্পদ বিতরণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু মায়ের মধ্যেকার এই গুরুশক্তির উদ্বোধনও ঠাকুরই করেছিলেন। স্থূলশরীরে থাকাকালীন ঠাকুর তাঁর ত্যাগী-সন্তানদের অন্যতম সারদাপ্রসন্নকে (পরবর্তীকালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) মায়ের কাছে মন্ত্র গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। মা সম্ভবত সেদিন সারদা মহারাজকে দীক্ষা দেননি। কারণ, মা নিজের মুখে বলেছেন যে স্বামী যোগানন্দই তাঁর প্রথম মন্ত্রশিষ্য। ঠাকুরের শরীর যাবার ঠিক পর মা যখন বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর মাকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন যোগীন মহারাজকে (স্বামী যোগানন্দকে) দীক্ষা দিতে। পর পর তিন দিন ঠাকুরের একই আদেশ পাওয়ার পর মা যোগীন মহারাজকে দীক্ষা দেন। এইভাবে নিজের অন্তরঙ্গ ত্যাগী-সন্তানদের একজনকে উপলক্ষ করে ঠাকুর নিজের জগৎ-উদ্ধার-লীলার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মাকে টেনে নিয়ে এলেন। পরবর্তীকালে মা অধিকারী-অনধিকারী নির্বিশেষে অকৃপণভাবে মানুষকে মন্ত্র দিয়েছেন। কিন্তু নিজেকে তিনি কখনও গুরু মনে করতেন না। তিনি মনে করতেনঃ তাঁর মধ্য দিয়ে ঠাকুরের গুরুশক্তিই কাজ করে চলেছে।

মায়ের শিক্ষা, স্নেহের ভিতর দিয়ে শিক্ষা। অদ্ভুত শিক্ষা এটি। কোন ভর্ৎসনা না করে, 'আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি' এই অভিমান না নিয়ে, কোন বড় বড় দার্শনিক কথা না বলে শুধু 'আমি তোমাদের মা' এই ভাব নিয়ে তিনি সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন—পদে পদে তাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। মাকে একজন বলছেনঃ 'মা, এত যে আসা-যাওয়া করছি, আপনার কৃপালাভও করলাম, তবু কেন কিছুই হচ্ছে না? আমার তো মনে হয়, আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি।'

মা উত্তরে বললেনঃ 'বাবা, তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ সেই খাটখানাসমেত তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙ্গতেই কি বুঝতে পারবে যে স্থানান্তর হয়েছ? না, যখন বেশ পরিষ্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে অন্যত্র এসেছ।'[২১] অর্থাৎ বলছেন যে, তোমরা জানতে পার বা না পার, তোমাদের এ বিষয়ে চেতনা থাকুক আর না থাকুক, আমি তোমাদের নিয়ে যাব গন্তব্যস্থানে। গীতাতে যেমন ভগবান বলেছেন যে, তিনি সকলকে উদ্ধার করবেন,[২২] মায়ের এই অভয়বাণী তার সঙ্গে তুলনীয়। এই অভয়বাণী মা তাঁর স্থূলশরীরে বহুবার দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্ত্যলীলার দিনগুলিতে তাঁর অসুখকে উপলক্ষ করে ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সূচনা করে গিয়েছিলেন। এই সঙ্ঘটি ছিল মায়ের সর্বাপেক্ষা স্নেহ-ভালবাসার পাত্র। ঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে, যখন সঙ্ঘ কোন সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়নি, তখনও তাঁর প্রার্থনা, শুভেচ্ছা এবং অভয়হস্ত সবসময় এই সঙ্ঘের পিছনে ছিল। এই সঙ্ঘের আদর্শ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য তাঁর আগ্রহ এবং সস্নেহ তত্ত্বাবধান সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা বরাবরই উপলব্ধি করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাবাহী এই সঙ্ঘের যথার্থই তিনি ছিলেন জননী। মঠ-মিশনের সঙ্ঘজননী-রূপে তিনি বহুক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত বলেছেন এবং সঙ্ঘ সর্বদা তা নতমস্তকে পালন করেছে। মা ছিলেন সঙ্ঘের 'হাইকোর্ট', তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। তাঁর বাণী বা নির্দেশ যেভাবেই আসুক না কেন, তা ছিল সঙ্ঘের সকলেরই শিরোধার্য। অথচ মা সাক্ষাৎভাবে এই সঙ্ঘের পরিচালনার কাজে কোন হস্তক্ষেপ করতেন না। সন্তানরাই তাঁদের নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে সঙ্ঘ চালাতেন। কিন্তু কোন্‌খানে কি দরকার মা ঠিক জানতেন এবং কোথাও ত্রুটি থাকলে সেই ত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। এমন ভাষায় কথা বলতেন যে, বুঝতে দিতেন না তিনিই সঙ্ঘের কাজ নিজে নিয়ন্ত্রিত করছেন। সঙ্ঘ সম্পর্কে মায়ের এই যে বিশেষ দায়িত্ববোধ তার একমাত্র কারণ, মা জানতেনঃ এই সঙ্ঘকে আশ্রয় করেই ঠাকুরের জগৎ-কল্যাণ-কার্য যুগ যুগ ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলবে। তাই ঠাকুরের অবর্তমানে তাঁরই প্রতিরূপ হিসেবে মা পরম মমতা ও স্নেহের বন্ধনে সঙ্ঘের সকলকে একসূত্রে ধরে রেখেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ তাই লিখেছিলেনঃ 'স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ম্।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের একটি বিশেষ অবদান হল নারীর মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। স্বামীজী বলেছেনঃ 'সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে "স্ত্রীগুরু"-গ্রহণ, সেইজন্যই

নারীভাব-সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার।'[২৩] বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হত। কিন্তু পৌরাণিক যুগ থেকে নারীকে আমরা অত্যন্ত হেয় করতে শুরু করেছি।' স্ত্রীজাতির মধ্যে যে মহৎ কিছু থাকতে পারে, এ লোকে কল্পনাও করতে পারত না। গত শতাব্দী পর্যন্ত নারীজাতি সম্বন্ধে আমাদের এই মনোভাব ছিল। ঠাকুরের আগমনের পর থেকে এই অবস্থাটির পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বামীজী বলছেনঃ 'ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো. আর "জাতি জাতি" করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা। He was the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low. [ঠাকুর ছিলেন নারীজাতির উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা।]'[২৪] শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের অন্তর্ধানের পরে এই দুটি কাজই করেছেন। লোকজননীরূপে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কিভাবে তিনি সব মানুষকে কোলে স্থান দিয়েছেন তা আমরা আলোচনা করেছি। নারী-জাগরণের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা তাঁর ভূমিকাটি পালন করেছেন দুভাবে। প্রথমত, নিজেকে তিনি আদর্শ নারী রূপে জগতের সামনে স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি স্বয়ং নারীদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন।

জগতের অন্যান্য দেশে নারীকে সম্মান দেওয়া হয়েছে পত্নীরূপে কিংবা সহকারিণী-রূপে। কিন্তু নারীর সবচেয়ে মহিমময় রূপ যে তার মাতৃরূপ, সেই মাতৃরূপে নারীকে সম্মান দিতে তারা শেখেনি। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে যে অদ্ভুত বিশ্বপ্লাবী মাতৃত্বের উন্মেষ ঠাকুর ঘটিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষে এই মাতৃত্বের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ভারতের বাইরে সমস্ত পৃথিবীর সামনে এই আদর্শকে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থাপন করা। নিবেদিতা বলেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমা হলেন নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।'[২৫] শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের ভবিষ্যৎ নারীর জীবন কিরকম হবে, কিরকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা বাণী ছিল। সেই বাণীর মূর্ত রূপটি হলেন শ্রীশ্রীমা। এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনই হয়ে উঠেছে ঠাকুরের বাণী। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের এই বাণী প্রচার করেছেন উপদেশের মাধ্যমে নয়, আচরণের মাধ্যমে। তাই স্বামীজী বলেছেনঃ মাকে আদর্শ করে নারী-জাগরণ হবে, আবার গার্গী-মৈত্রেয়ীরা জন্মগ্রহণ করবে।

নারীদের উন্নতির জন্য যে-কোন কাজে, বিশেষত তাদের শিক্ষার ব্যাপারে শ্রীমায়ের বিশেষ সমর্থন ও উৎসাহ ছিল। মেয়েরা আধুনিক কালের উপযোগী শিক্ষা ও কাজকর্ম শিখবে এটা মা চাইতেন। মাকু রাধু প্রভৃতি ভাইঝিদের তিনি স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাদের উৎসাহ দিয়ে বলতেনঃ 'লেখাপড়া শিখলে, কাজকর্ম শিখলে নিজেরাও সুখে থাকবে, অপরকেও সুখী রাখতে পারবে তাদের উপকার করে।'[২৬] নিবেদিতার স্কুলের প্রতি মায়ের স্নেহদৃষ্টি বরাবর ছিল। সেখানে মেয়েদের পড়ানোর জন্য অনেক ভক্তকে তিনি উৎসাহ দিতেন।

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিলঃ গঙ্গার পশ্চিম তীরে যেমন ত্যাগী-সন্তানদের জন্য ঠাকুরের নামে 'রামকৃষ্ণ মঠ' গড়ে উঠেছে, তেমনি গঙ্গার পূর্ব তীরে কোথাও ত্যাগী-মেয়েদের জন্য মায়ের নামে একটা স্ত্রীমঠ গড়ে উঠবে—যে মঠ হবে 'গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ।'[২৭] মায়ের জীবিতাবস্থায় এই স্বপ্নের রূপায়ণ না হলেও মা গৌরী-মা প্রতিষ্ঠিত 'সারদেশ্বরী আশ্রম' দেখে গিয়েছিলেন। গৌরী-মাকে ঠাকুর বলেছিলেনঃ 'এদেশের মায়েদের বড় দুঃখ, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।'[২৮] গৌরী-মা মেয়েদের নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেনঃ 'না গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধনভজন ঢের হয়েছে...।'[২৯] শ্রীশ্রীমাও গৌরী-মাকে জানিয়েছিলেনঃ 'ঠাকুর বলে গেছেন, "তোমার জীবন জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবায় লাগবে"।'[৩০] ঠাকুরের নির্দেশে এবং মায়ের উৎসাহে গৌরী-মা ১৩০১ সালে ব্যারাকপুরে সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম প্রথম কয়েকজন কুমারী, সধবা ও বিধবা মেয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য আশ্রমবাসী হয়। পরে এদের মধ্যে থেকে কয়েকজন কুমারীকে বেছে নিয়ে তিনি বিশেষ করে শিক্ষা দিতে লাগলেন যাতে তারা আজীবন ত্যাগের পথে থেকে আশ্রমসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে পারে। আশ্রম সংক্রান্ত যে-কোন ব্যাপারে গৌরী-মা মায়ের অভিমতকে বেদবাক্যের মতো অভ্রান্ত বলে মনে করতেন। মা এই আশ্রমটিকে কি চোখে দেখতেন তা তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়ঃ 'গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যন্ত যে উসকে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।'[৩১] স্বামীজীর স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ হিসেবে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর যাওয়ার বেশ কিছুকাল পরে গঙ্গার পূর্বতীরে মাকে আদর্শ করে সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের নিয়ে তাঁর নামাঙ্কিত 'সারদা মঠ' গড়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে নারীজাগরণ ঘটাতে এসেছিলেন, মাকে কেন্দ্র করে এই স্ত্রীমঠের মাধ্যমে সে-কাজ তিনি সূক্ষ্মদেহে করে যাচ্ছেন এবং আরও বহুকাল করে যাবেন।

দক্ষিণেশ্বরে মাকে ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?' মা বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'[৩২] এখানে 'ইষ্টপথ' বলতে—শুধু ঠাকুরের সাধনা বা সিদ্ধি নয়, যে-উদ্দেশ্যে তাঁর নরলীলা তাতে সর্বদা সর্বতোভাবে তাঁকে 'সাহায্য' করবেন, এই প্রতিশ্রুতিই শ্রীশ্রীমা দিয়েছিলেন। ঠাকুরের অপ্রকট হওয়ার পর সঙ্ঘজননী ও লোকজননীরূপে মা যে ভূমিকা পালন করেছেন এবং জগতের নারীজাতির সামনে মাতৃভাবের যে সর্বোচ্চ আদর্শ রেখে গেছেন—তা আসলে ঐ প্রতিশ্রুতিরই রূপায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবী—এই দুটি জীবনকে সর্বদা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধরূপে আমাদের

দেখতে হবে। অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তির মতো তাঁরা পরস্পর থেকে অভিন্ন। মাকে বাদ দিয়ে ঠাকুরের জীবন অসম্পূর্ণ আর ঠাকুরকে বাদ দিয়ে মায়ের জীবনের কোন অংশই নেই। ঠাকুর কত বেছে বেছে মানুষকে আশ্রয় দিতেন। কিন্তু মায়ের কাছে সবার অবারিতদ্বার। যার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না, তাকেও মা আশ্রয় দিয়েছেন। ঠাকুর 'কল্পতরু' হয়েছিলেন মাত্র একদিন—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। কিন্তু মা প্রতিদিন কল্পতরু ছিলেন, আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল। কিন্তু মা যদি চিরকালের জন্য কল্পতরু হয়ে থাকেন মায়ের মধ্য দিয়ে ঠাকুরও কল্পতরু আছেন চিরকাল। কারণ তাঁরা আলাদা নন। মায়ের মধ্য দিয়ে ঠাকুরেরই করুণাধারা জগতে আরও ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হয়েছে। মা তাঁর মাতৃস্নেহের দ্বারা ঠাকুরকে ভালবাসার পথই আরও সুগম করে দিয়েছেন। মাকে যদি আমরা ভালবাসি; তাঁর চরণে যদি আমরা প্রণাম নিবেদন করি, সেই ভালবাসা, সেই প্রণাম ঠাকুরের কাছেই গিয়ে পৌঁছায়। মায়ের মাতৃলীলা যদি অনুধ্যান করি, তার দ্বারা ঠাকুরের লীলাই আরও গভীরভাবে বোঝা হয়। কারণ, মা ঠাকুরেরই অপর রূপ। জগৎকল্যাণ-ব্রতের যতটুকু ঠাকুর স্থূলদেহে শেষ করে যেতে পারেননি, লীলাসঙ্গিনীর মাধ্যমে তা সম্পন্ন করেছেন। সারদালীলা রামকৃষ্ণ-লীলারই পরিপূরক।

আনন্দরূপিণী

॥ ১ ॥

'আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত' করেন শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই যেখানে তিনি সেখানেই আনন্দ। কামারপুকুরের পর্ণকুটির থেকে কাশীপুরের বাগানের অট্টালিকা—সেই আনন্দময়তার ইতিহাস। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারের ঘরখানিতে প্রত্যহ 'আনন্দের হাটবাজার' বসে যেত। গান, অভিনয়, রঙ্গরস, নৃত্য তাঁর নিত্যসঙ্গী। তিনি যেন আনন্দসাগরে ভেসে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের উত্তরদিকে নহবতের ছোট্ট ঘরখানি দরমার বেড়া দিয়ে ঢাকা। সেই বেড়ার একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সারদাদেবীর কৌতূহলী দৃষ্টি অদূরের আনন্দময় জগতের স্পর্শ পায়। তিনি দূর থেকেই সে জগতের বাসিন্দা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন আনন্দময় পুরুষ। শ্রীমায়ের ভাষায়ঃ 'কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি, কথা, গল্প, কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত। আমার জ্ঞানে তো আমি কখন তাঁর অশান্তি দেখিনি।'[১] আবার বলছেনঃ 'তাঁকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি, সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনও বাপু নিরানন্দ দেখিনি।'[২] এদিক থেকে সারদাদেবীও শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্যা সঙ্গিনী।*

বাল্যকালে আর পাঁচজন পল্লীবালিকার মতো যাত্রাগান, কথকতা, কীর্তন, বাউলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে উঠেছিল সারদাদেবীর। এক যাত্রার আসরেই তো শিশু-সারদার অপরিণত মন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল তার পরমবাঞ্ছিতকে। গ্রামের মেয়ে, কেতাবীশিক্ষার সুযোগ সেকালে আর কতটুকু ছিল? তাদের শিক্ষার প্রকৃত ভার গ্রহণ করেছিল ঐসব লোকসংস্কৃতির মাধ্যমগুলি। 'গ্রামশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া পৌরাণিক আখ্যানমূলক যাত্রা ও কথকতা শুনিয়া ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিত। শ্রীমতী সারদাও মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া শুনিতেন; একাগ্রমনে শুনিবার

ফলে অনেক শ্লোক (ছড়া) তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। পরিণত বয়সেও নৈতিক শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইলে তিনি ঐসকল শ্লোক অবিকল আবৃত্তি করিতেন।'[৩]

বিদ্যালয়ের অর্থকরী শিক্ষা আমাদের জীবিকার প্রয়োজন যতখানি মেটায় আমাদের জীবনকে ঠিক ততখানি স্পর্শ করে না। লোকশিক্ষার আপাততুচ্ছ উপাদানগুলি একই সঙ্গে মানুষের জানার চাহিদা মিটিয়ে আনন্দের স্বাদ সুদূরপ্রসারী করে। সারদাদেবীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরিণত জীবনে তাঁর চিত্তের বহুমুখী বিকাশে বাল্যের এই শিক্ষা কার্যকর হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে বাল্যশিক্ষার উপাদানগুলির তাৎপর্য আরও গভীরভাবে তাঁর অন্তরে দৃঢ়মূল হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—সর্বক্ষেত্রেই তা বিস্তৃত। সারদাদেবী বলেছেনঃ 'প্রদীপে সলতেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ি যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।'[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা সারদাদেবীর কাছে যে মহৎ আদর্শ উপস্থিত করেছিল তার পরিপূর্ণতা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও শিক্ষায়। সারদাদেবীও সন্ন্যাসের শুষ্ক কঠোরতাকে অতিক্রম করে সাধনার ক্ষেত্রকে সরস ও আনন্দময় করে তুলেছেন। শ্যামাসঙ্গীতে দেখেছি, যিনি শবাসনা, করালবদনা, ভয়ঙ্করী, ভক্তের কাছে তিনিই আবার আনন্দময়ী, নৃত্যচপলা, রঙ্গময়ী। কিন্তু সে তো কাব্য এবং তত্ত্বের কথা। বিচিত্র বাস্তব-পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ সন্তান ও ভক্তমণ্ডলী পেয়েছে সারদাদেবীকে-যিনি জগজ্জননীর সেই আনন্দময় রূপকেও উন্মোচন করেছেন।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও আদর্শের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন সারদাদেবী।

বাগবাজারের বাসাবাড়িতে কিংবা 'উদ্বোধনে' সারাদিনই ভক্তের ভিড়। কত রকমের সমস্যা তাঁদের—কত রকমের প্রার্থনা! সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিক ক্লেশ অপনোদনের আশ্রয় ঐ ঘরখানি—মায়ের মুখের সামান্য কয়েকটি কথা, কিছু উপদেশ তাঁদের অন্তর স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরিয়ে দেয়। ভক্তজননী ঘোমটায় মুখ ঢেকে অসীম ধৈর্য নিয়ে পুরুষভক্তদের প্রার্থনা শোনেন—প্রশ্নের উত্তর দেন অন্যের মাধ্যমে। মেয়েরা উন্মোচিত-অবগুণ্ঠন শ্রীমায়ের মুখেই শোনেন নানা ধর্মীয় কথা—নানা জটিল সাংসারিক সমস্যার সহজ সমাধান। সেই গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যেই আবার জমে উঠত বিচিত্র রহস্যালাপ, রঙ্গ-অভিনয়। এসব ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবীর। তাঁর ছিল অসাধারণ অনুকরণ-ক্ষমতা। স্বয়ং পিতৃব্যের

কণ্ঠও তিনি এমনভাবে নকল করতে পারতেন যে শুনে লোকে অবাক হত।[৫] নিত্য-নতুন খেয়াল তাঁর মাথায়।

বাগবাজারের বাড়ির বৈকালিক আনন্দবাজারের একটি রেখাচিত্র দিয়েছেন শংকরীপ্রসাদ বসু, স্বামী নির্লেপানন্দের 'দেবী অঘোরমণি' পুস্তিকা অবলম্বন করে। সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে সে আসরে উপস্থিত থাকতেন বাবুরাম মহারাজের মা, বলরামজায়া, শ্রীম-গৃহিণী, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা, গোপালের মা, নিবেদিতা এবং আরও অনেকে। একবার গোলাপ মা তাঁর জামাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন ঠাকুরের বাড়ি থেকে নানারকম পিতলের গয়না এনে শ্রীমতী লক্ষ্মীকে সাজালেন বৃন্দাদূতী। নতুন কাপড়ে আর পিতলের বালা, হার, অনন্ত, বাজু ও রূপোর পাঁয়জোরে সুন্দরী লক্ষ্মীদেবী আরও অপরূপা হয়ে উঠলেন। সেই সাজসজ্জা করে চলল বৃন্দার পালাকীর্তন।

একদিন তো স্বয়ং নিবেদিতা দুহাত-দুপায়ে ভর দিয়ে সিংহ সাজলেন আর তাঁর পিঠের উপর জগদ্ধাত্রী হয়ে বসলেন লক্ষ্মীদেবী। (সেই মুহূর্তে নিবেদিতার কি মনে পড়েছিল, একদা স্বামীজী তাঁকে ভারতে আহ্বান করে চিঠিতে লিখেছিলেন. '...ভারতের নারীসমাজের জন্য...একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন'?[৬]) সে এক অপূর্ব দৃশ্য! মাটির সিংহ তো নয়—সুতরাং অনুষ্ঠানের ত্রুটি থাকবে কেন? নিবেদিতা সিংহের ডাক নকল করে গর্জন শুরু করে দিলেন—উপস্থিত সকলের সঙ্গে সারদা-দেবীও হেসে লুটোপুটি।

নাচে গানে আসর মাতিয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল লক্ষ্মীদেবীর। সাধারণ নাচগানের সঙ্গে বিচিত্র পোষাক এবং চরিত্রাভিনয়ে তাঁর খেয়ালও ছিল বিচিত্র। একদিন পুরুষের ভঙ্গিতে মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরে তিনি সাজলেন বলরাম। সেই পোষাকে পরিবেশন করলেন বলরামের নৃত্য।[৭]

বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে কৌতুকরসসৃষ্টিতে সারদাদেবীরও উৎসাহ কম ছিল না। সেবার কাশীতে তাঁর অবস্থানকালে কয়েকজন মহিলা এসেছেন মাতৃসন্দর্শনে। তাঁরা সারদাদেবীর কথা শুনেছেন কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেননি। ঘরে ঢুকেই কয়েকজন মহিলাকে দেখে ইতস্তত করছেন, কে মা! সামনেই বসেছিলেন গোলাপ-মা—বর্ষীয়সী মহিলা, পরিপাটি ভব্য চেহারা। একটি মহিলা তাঁর দিকেই অগ্রসর হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন। সঙ্কুচিত গোলাপ-মা তাড়াতাড়ি শ্রীমাকে দেখিয়ে বললেনঃ 'ঐ উনিই মা-ঠাকরুন।' অপ্রস্তুত মহিলা শ্রীমায়ের দিকে অগ্রসর হতেই তিনি হাসতে হাসতে বললেনঃ 'না, না, ঐ উনিই মা-ঠাকরুন।' মহিলাটি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে একবার গোলাপ-মায়ের দিকে আর একবার সারদাদেবীর দিকে এগিয়ে যান—অবশেষে গোলাপ-মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভর্ৎসনায় বলে উঠলেনঃ 'তোমার কি বুদ্ধি-বিবেচনা নেই? দেখছ না, মানুষের মুখ, কি

দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?' হাসির ঐকতানে এতক্ষণে সন্দেহ-ভঞ্জন![৮]

অনুরূপ পরিস্থিতিতে পূর্বেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে একদিন এক মহিলা এসেছেন—তাঁর বিপথ-গামী স্বামীর উদ্ধার-প্রার্থনায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন নহবতে, বললেনঃ 'সেখানে এক স্ত্রীলোক আছেন; তাঁকে তুমি সব খুলে বললে তিনি ঠিক ঠিক ওষুধ দেবেন। তাঁর এসব মন্ত্রৌষধি জানা আছে ; এ বিষয়ে তাঁর শক্তি আমার চেয়ে বেশী।' মহিলা প্রার্থনা নিয়ে গেলেন সারদা-সকাশে। সারদাদেবী মুহূর্তে বুঝলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণের রসিকতা। কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেনঃ 'আমি আর কি জানি, বাছা, তিনিই ওষুধ জানেন—তুমি তাঁরই কাছে যাও।' রঙ্গপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, তিনি যোগ্য লোকের সঙ্গেই রসিকতা করেছেন। মহিলাটি কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা-দেবীর কাছে ছুটাছুটি করার পর শ্রীমা-ই পূর্ণ করলেন তাঁর প্রার্থনা। লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণের রসিকতার উপযুক্ত জবাবটুকু দিতে কিন্তু ছাড়েননি।[৯]

গৌরী-মাকে নিয়ে নহবতের দরজায় দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'ওগো ব্রহ্ম-ময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও, একজন সঙ্গিনী এলো।' সেই গৌরী-মা কালক্রমে হয়ে উঠেছেন 'ব্রহ্মময়ী'র আনন্দের রসদদার। গান, অভিনয়, রূপসজ্জা—সব কিছুতে গৌরী-মায়ের নৈপুণ্য ছিল যথেষ্ট—সেই নিপুণতা কাজে লাগিয়ে কত আনন্দমুহূর্ত তিনি গড়ে তুলেছেন। সারদাদেবীও কখনও কখনও আদেশ করতেন একটা নতুন কিছু করবার। গৌরী-মা তাঁর সাধনকালে পুরুষবেশে ভারত-বর্ষের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। সেসব গল্প শুনে সারদাদেবী একদিন বললেন, সেই রকম সাজপোশাক পরে তাঁকে একদিন আসতে হবে, যেন তাঁকে কেউ না চিনতে পারে। সম্মতি জানালেন গৌরী-মা।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল—সেকথা এর মধ্যে অনেকেই ভুলে গেছে। সেদিন সকাল থেকে গৌরী-মা অনুপস্থিত। নতুন কিছু নয়—কাউকে কিছু না জানিয়ে গৌরী-মা মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যান। সেইদিনই সন্ধ্যায় উদ্বোধনে এক পশ্চিমা সাধু এসে হাজির—পরনে আলখাল্লা, মাথায় ইয়া পাগড়ি—সবই আছে, হাতে শুধু একটি লাঠির অভাব। সাধু দেখে নীচে যে সেবক উপস্থিত ছিলেন তিনি তটস্থ হয়ে বেরিয়ে এলেন। সাধুজী তাঁকে দেখেই তম্বি শুরু করলেন, একেবারে চোস্ত ইংরেজীতেঃ 'Where is my stick? Where is my stick?' সেবকটি কিন্তু গলা শুনেই আগন্তুকের পরিচয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি একটা লাঠি আনার ছল করে উপরে গিয়ে শ্রীমাকেও চুপি চুপি জানিয়ে এলেন সাধুটির পরিচয়। লাঠি পেয়ে সাধুটি সারদাদেবীর কাছে উপস্থিত হতেই তিনি তারিফ করে বললেনঃ 'চমৎকার, চমৎকার হয়েছে!'

এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গৌরী-মা কিন্তু আদৌ খুশী হলেন না। রাগটা গিয়ে

পড়ল সেই সেবকটির উপর—ধমক দিয়ে বললেনঃ 'এই ছোঁড়া, তোরই এ কম্ম! তুই কেন এসে আগে থেকেই সব বলে দিলি?' সম্মিলিত আনন্দ-কোলাহলে দৃশ্যটি যে বেশ জমে উঠেছিল, তা অনুমান করতে পারি।

সেদিন ধরা পড়ে গৌরী-মা বলেছিলেনঃ 'আচ্ছা, আর একদিন হবেখন'[১০]—কথাও রেখেছিলেন।

সারদাদেবী তখন আছেন জয়রামবাটীতে (জুন ১৯১০)। এক অপরাহ্নবেলায় এক সাধুর আবির্ভাব হল—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে মোটা লাঠি। সঙ্গে অনুরূপ সাজে সজ্জিত এক চেলা। শ্রীমায়ের সহোদর তাঁদের অভ্যর্থনা করে দিদিকে গিয়ে সংবাদ দিলেনঃ 'দেখ গো, তোমার এক মাদ্রাজী ভক্ত এসেছে।' সাধু কিন্তু বহির্বাটীতে অপেক্ষা না করে সোজা ঢুকে পড়লেন অন্তঃপুরে। শ্রীমায়ের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন—ভিক্ষা! বাড়ির ভিতর অপরিচিত পুরুষ—তার উপর অসময়ে ভিক্ষাপ্রার্থনা! ভ্রাতৃজায়া বিলক্ষণ বিরক্ত হয়ে গালমন্দ শুরু করে দিলেন। সাধু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে এক-পা, দু-পা করে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ত্রস্ত মহিলাও পিছু হটতে হটতে একেবারে দেয়াল-লগ্ন হয়ে তারস্বরে চিৎকার করে শ্রীমাকে ডাকলেন। তাঁর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই ছুটে এলেন—এলেন সারদাদেবীও। তিনিও সাধুর আচরণে বিস্মিত। সাধুজী তখন সারদাদেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে একটানে পাগড়িটা খুলে ফেলে হো হো করে হাসতে শুরু করে দিলেন। গৌরী-মা! হাসির কলতানের মধ্যে সারদাদেবী এবার স্বীকার করলেনঃ 'আমি যে সত্যি চিনতে পারিনি। খুকীকেও [চেলাটি হলেন দুর্গাপুরী] চিনলুম না! ধন্যি মেয়ে বাপু, তোমরা!'[১১]

এরকম কৌতুকমুহূর্ত গৌরী-মা প্রায়ই গড়ে তুলতেন—মাঝে মাঝে অবশ্য ধরা পড়েই সেগুলির আনন্দোজ্জ্বল পরিসমাপ্তি ঘটত। সেবার স্বামী ঈশানানন্দকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন জয়রামবাটীতে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ঈশানানন্দকে একটু দূরে রেখে বাড়ির মধ্যে সামান্য প্রবেশ করে ভিখারী-দের অনুকরণে বলে উঠলেনঃ 'মা, দুটি ভিক্ষা পাই, মা।' ছোট মামী (রাধুর মা) বারান্দা থেকে বাইরে এসে বললেনঃ 'কে গো?' গৌরী-মা করুণতর স্বরে আবার বলে উঠলেনঃ 'দুটি ভিক্ষা পাই, মা।' সন্ধ্যাবেলায় ভিখারী—এ আবার কি অনা-সৃষ্টি! ভয় পেয়ে গেলেন ছোট মামী—হাঁউমাঁউ করে ডাকলেন শ্রীমাকে। সারদাদেবী ধীর পদক্ষেপে বাইরে এসে দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করলেনঃ 'কে র‍্যা!' গৌরী-মা আবার বললেনঃ 'দুটি ভিক্ষা পাই, মা। আমি রাত-ভিখারী।' সারদাদেবী সহজকণ্ঠে বললেনঃ 'ও গৌরদাসী, এসো, এসো। কখন এলে?'[১২]

এবার সম্মিলিত হাসি ও আনন্দে মুখর হয়ে উঠল জয়রামবাটীর পর্ণকুটির।

এমনি অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনাতেই সারদাদেবীর সরসচিত্তের পরিচয় মুদ্রিত হয়ে

আছে কিন্তু তার সামগ্রিক ইতিহাস দুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণ-তিরোভাবের পর যেসব ভক্ত-সন্তানেরা তাঁর কাছে গেছেন তাঁরা স্বভাবতই তাঁর আধ্যাত্মিক পরিচয়টুকুই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারের এই বিশেষ দিকটি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে।

কিন্তু শ্রীমায়ের তাস খেলার খবরটি সম্ভবত সবচেয়ে চমকপ্রদ। একবার পাগলী মামীর তাস খেলবার খেয়াল হলে শ্রীশ্রীমাকেও খেলার জন্য জেদাজেদি করতে থাকেন। এমনকি মায়ের পায়ে ধরতেও বাকি রাখেন না। মা অগত্যা রাজী হলেন। খেলায় চারজন চাই। একদিকে পাগলী মামী ও নলিনীদিদি; অন্যদিকে আশুতোষ মিত্র ও শ্রীশ্রীমা। খেলায় মায়ের পক্ষেরই জিৎ। পরাজিত পাগলী মামী রেগে চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেনঃ 'তোমরা খালিখালি জিতবে বুঝি, ঠাকুরঝি. আর আমরা হারব?—না?' শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'আমরা সৎপথে, সাত্ত্বিক—আমরা জিতব না ত কি তোরা জিতবি?' দূর থেকে মামীর গলা শোনা গেলঃ 'হেং—গো—হেং।'[১৩]

॥ ৩ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছেন সারদাদেবী। তাঁর উপস্থিতি, সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ শিল্পীমহলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। কারণ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা তখনও পর্যন্ত 'মানহারা' মানবে'র দলে। রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি যেমন তাদের মধ্যে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, মাতৃসান্নিধ্যও অনুরূপ অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। গিরিশ-চন্দ্র রহস্যচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেনঃ 'আপনার সব বে-আইনি!'[১৪] অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিচার চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন, পতিতা অভিনেত্রীদের স্পর্শ-প্রণাম গ্রহণ করেছেন—এ তাঁর প্রচলিত-নিয়ম-ভাঙারই উদাহরণ। কিন্তু সারদাদেবীর ক্ষেত্রে এই নিয়মের বাধ্য-বাধকতা স্বভাবতই বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও আদর্শ অন্তরের মধ্যে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলে শুচিবায়ু পথের অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই অপার দাক্ষিণ্যে ও রসবোধের প্রেরণায় গ্রহণ করেছিলেন বাংলার রঙ্গমঞ্চকে এবং তার অপাঙ্‌ক্তেয় শিল্পিকুলকে।[১৫]

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সারদাদেবী কতবার অভিনয় দেখেছেন, বলা কঠিন। বিভিন্ন সূত্র থেকে যতখানি জানা গেছে, তাতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে সারদাদেবী কোনও দিনই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যাননি এবং পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বা অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে অথবা মিশনের জন্য কোন সাহায্য-রজনীতে

তিনি থিয়েটারে উপস্থিত হয়েছেন। স্বামী শান্তানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-সঞ্চয়ন' প্রবন্ধে সারদাদেবীর 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক দেখার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'গিরিশবাবু একদিন এসেছেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। বুড়ো হয়েছেন। এসেই মাকে প্রণাম করলেন। যথারীতি কুশলপ্রশ্ন করার পর তিনি করজোড়ে তাঁর কাছে নিবেদন করলেন তাঁর প্রার্থনা—"মা, অনেকদিন হল থিয়েটারে আছি। আর ও সব ভাল লাগে না, ছেড়ে দেব মনে করছি। তবে আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে একদিন আপনাকে আমার অভিনয় দেখাই, আর ঐ হবে আমার শেষ অভিনয়"।'[১৬]

স্বামী শান্তানন্দের উল্লেখিত প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি, গিরিশের এই অনুরোধ রক্ষার জন্য ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর শ্রীমা 'পাণ্ডব-গৌরব' অভিনয় দেখতে যান। অবশ্য গিরিশের অভিনেতা-জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি; তিনি শেষ অভিনয় করেছিলেন 'বলিদান' নাটকে (৩০ আষাঢ় ১৩১৮)। তবে 'পাণ্ডব-গৌরবে' আর অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায় না।

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই সেদিন অভিনয় দেখেছিলেন সারদাদেবী। গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন সেদিন 'কঞ্চুকী'র ভূমিকা। মঞ্চে তাঁকে দেখে বলেছিলেনঃ 'ও, এই বুঝি গিরিশ, তা বেশ সেজেছে তো। মোটেই চেনা যাচ্ছে না কিন্তু।'

মঞ্চে কালীমূর্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন 'দেবতাদের সপ্ত বজ্র ও মহামায়ার শক্তি মিলে অষ্ট বজ্র একত্র' হল তখন দেবীসহচরী যোগিনীগণ গান ধরলেন, 'হের হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে'। শান্তানন্দ লিখেছেনঃ 'এতক্ষণ শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে দেখছিলেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক এই সময়টিতে তিনি গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে স্থির হয়ে গেলেন। এই ভাবে সমাধিতে শ্রীশ্রীমা অনেকক্ষণ ছিলেন।'[১৭]

এর আগে গিরিশচন্দ্রের অনুরোধেই মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি 'বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর' নাটক দেখতে গিয়েছিলেন ১৯০৪ কিংবা ১৯০৫ সালে। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'বিল্বমঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেমদর্শনে তিনি "আহা, আহা" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।'[১৮]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য সারদাদেবীর কতকগুলি অভিনয় দেখার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা-মতোঃ 'দক্ষযজ্ঞ অভিনয় দর্শনে মা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে একরাত্রে বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর ও জনা অভিনীত হয় কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাহায্যার্থে; গিরিশবাবু সাধক ও বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করেন।'[১৯]

'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকার ১৩১৮ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে দেখতে পাই মিনার্ভা থিয়েটারে কাশীর সেবাশ্রমের সাহায্যার্থে 'জনা' নাটক অভিনীত হয়েছিল।[২০] কিন্তু সারদাদেবী ঐ বছরের ৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৮ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ছিলেন জয়রামবাটীতে। সুতরাং অক্ষয়চৈতন্যের বর্ণনা-মতো ১৩১৮-র শ্রাবণ বা ভাদ্রে কোন সাহায্যাভিনয়ে নাটক দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্য কোন সময়ে একই

উদ্দেশ্যে দুটি নাটক অভিনয়ের সংবাদ পাইনি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সারদাদেবীর 'জনা' নাটক দেখার কথা উল্লেখ করেছেন ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—তবে তিনি কোন সাল-তারিখ উল্লেখ করেননি। সেদিন গিরিশ বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন। ডক্টর দাশগুপ্তের বিবরণঃ

'বিদূষক দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "মা হাসছেন যে, কেমন দেখছেন?"

'মা উত্তর করিলেন, "যা দেখছি, তাতো ওরই (গিরিশের) চরিত্র। আমি তো জানি, ওর ঐরকমই বিশ্বাস ঠাকুরকে ডাকলে ত্রাণ পাওয়া যাবে। আবার বকেও।"'[২১]

১৯১২ অক্টোবরে দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন বেলুড় মঠে আয়োজিত 'জনা' নাটকাভিনয় ও বিজয়াদশমীর রাত্রে 'রামাশ্বমেধ যজ্ঞ'ও সারদাদেবী দেখেছিলেন।[২২]

আশুতোষ মিত্র লিখেছেন, শ্রীমা 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখেছিলেন, কিন্তু সময়ের উল্লেখ করেননি। সেদিন শ্রীমায়ের জন্যই এই নাটক অভিনয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র এবং তিনি স্বয়ং 'মাধাই'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নিমাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ভূষণকুমারী ও অর্ধেন্দুশেখর 'জগাই'। ১৯০৮ সালের প্রথমার্ধে বা তারও আগে শ্রীমা নাটক দেখেছিলেন সন্দেহ নেই কারণ অর্ধেন্দু মারা যান ১৯০৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। সেদিন ভূষণকুমারী ও নিতাইয়ের ভূমিকাভিনেত্রী সুশীলা অভিনয়ের পূর্বে সারদাদেবীকে প্রণাম করে যান। পরদিন শ্রীমা এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছিলেনঃ 'মেয়েটীকে [ভূষণ] দেখলুম, ভক্তিমতী—ভক্তি না থাক্‌লে কি হয় গা?'[২৩]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের বিবরণীতে সারদাদেবীর 'মনোমোহন থিয়েটারে'র উদ্বোধন রজনীতে 'কালাপাহাড়' অভিনয় দর্শনের ইঙ্গিত আছে। 'মনোমোহন থিয়েটারে'র উদ্বোধনের তারিখ ৭ আগস্ট ১৯১৫[২৭]—নাটক 'কালাপাহাড়'। স্বামী গম্ভীরানন্দ ও ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রদত্ত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী সে সময় সারদাদেবী ছিলেন দেশে। মনে হয় আগে বা পরে কোন সময়ে তিনি 'কালাপাহাড়' সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে দেখেছিলেন—'মনোমোহনে'র উদ্বোধন রজনীতে নয়। 'কালাপাহাড়'-এর প্রথম উদ্বোধন হয় স্টার থিয়েটারে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬।

স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর 'রামকৃষ্ণ সারদামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের উৎসাহে সারদাদেবী 'কিন্নরী' নাটক দেখতে যান—সঙ্গে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ।[২৫]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য স্বামী সারদানন্দের ১৩২৫ সালের ২২ ভাদ্রের দিনলিপি থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে জানিয়েছেন, শ্রীমা ঐদিন থিয়েটারে গিয়েছিলেন 'কুমারী'

নাটক দেখতে। 'কুমারী'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল 'রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে' ১৩০৫ সালের ২৪ পৌষ। পরে পূর্বোক্ত দিবসে সম্ভবত নাটকটির পুনরভিনয়-রজনীতে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুরোধে শ্রীমা 'কুমারী' দেখেছিলেন।

নির্দিষ্ট তারিখ না পেলেও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রামানুজ' নাটক দেখার কিছু সংবাদ অপরেশচন্দ্রের রচনা ও নীরদাসুন্দরীর স্মৃতিচারণ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।[২৬] 'রামানুজ' প্রথম অভিনীত হয়েছিল 'মিনার্ভা থিয়েটারে' ১৫ জুলাই ১৯১৬। সারদাদেবী সে সময় কলকাতায়। উদ্বোধন-দিবস অথবা পরবর্তী কোন দিনে তিনি (১৯১৭, ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন) নাটকটির অভিনয় দেখেছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে অপরেশচন্দ্র 'রামানুজ' নাটক রচনা করেন। অপরেশ-চন্দ্র প্রতিটি অঙ্ক রচনা করে স্বামী সারদানন্দের কাছে পাঠ করে শোনাতেন এবং তাঁর নির্দেশমতো নাটক সংশোধন করতেন। নাটকে সুর-সংযোজনা করেছিলেন স্বামী অম্বিকানন্দ। স্বভাবতই সে নাটক দেখার জন্য অপরেশবাবু শ্রীমাকে অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। 'রামানুজ' নাটক দেখার দিনের একটি ঘটনা থিয়েটার-জগতে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল। সেদিন থিয়েটার শেষ হয়ে যাবার পর অপরেশবাবু অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরীকে ডেকে বললেনঃ 'ওপরে যা, সারদা-মা এসেছেন, তোকে ডাকছেন।' নীরদাসুন্দরী সেই পোশাকেই ছুটলেন মাতৃ-সকাশে। সারদাদেবী তাঁকে কোলে টেনে নিয়ে সস্নেহে চুম্বন করেছিলেন। থিয়েটারের পতিতা অভিনেত্রীর কাছে এ-সৌভাগ্য অকল্পনীয়। নীরদাসুন্দরী 'রামানুজ' নাটকে লক্ষ্মণের কলহপরায়ণা স্ত্রী চমম্বার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এটি কোন ধর্মীয় উদ্দীপনার সহায়ক চরিত্র নয়। সারদাদেবী নিছক শিল্পবোধের প্রেরণাতেই নীরদার চরিত্রাভিনয়কে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। সেদিনের ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেনঃ 'মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন, আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই নিজে দেখিয়াছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননী মা আমার, এই দেশের রঙ্গালয়ের কোনো পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন—ভগবানের দয়া কাঁটাগাছকে বাছে না -সে দয়ার পাত্রপাত্রী নাই, সে দয়া বিচার করে না, ব্যবহারিক জগতের কোনো বিধিনিষেধ মানে না ; সে কেবল জাতিনির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।'[২৭]

এই নাটকটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা। রামানুজ গুরুর কাছ থেকে সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণকালে গুরু সর্ত করেছিলেন, সে মন্ত্র রামানুজ অন্য কারও কাছে উচ্চারণ করতে পারবেন না। সর্ত ভঙ্গ হলে শ্রবণকারী মুক্তিলাভ করবে কিন্তু রামানুজের হবে অনন্ত নরক। মানুষের বেদনায় বিচলিত রামানুজ সর্ত ভঙ্গ করে অনন্ত নরকের বিধান মাথায় নিয়ে এক বিপুল জনতার কাছে শোনালেন সেই মন্ত্র। এই দৃশ্যে শ্রীমা দর্শকের আসনে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। থিয়েটার শেষ হবার পর যখন রামানুজের ভূমিকাভিনেত্রী তারাসুন্দরী প্রণাম করতে যান তখনও তিনি অর্ধসমাহিত। অবশেষে গোলাপ-মায়ের চেষ্টায় তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে

এবং তারাসুন্দরী প্রণাম করলে শ্রীমা দৃঢ়ভাবে তারাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তাকে আশীর্বাদ করেন। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা সেদিন মায়ের সঙ্গে ছিলেন।[২৮]

অভিনয়ের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ তাঁর অভিনয়শিল্পীর প্রতি আচরণে কখনও কখনও ধরা পড়েছে। অভিনেত্রী তারাসুন্দরী উদ্বোধনের বাড়িতে শ্রীমায়ের কাছে প্রায়ই যেতেন। একদিন তারাসুন্দরী এসেছেন এমনি মাতৃদর্শনে। সারদাদেবীর শরীর তখন অসুস্থ। 'তারাসুন্দরী মাকে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে দরজার নিকট বসিয়া খুব ভক্তি ও মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলিতেছেন। কিছুপরে মা বলিতেছেন, "থিয়েটারে তো বেশ বলো। এমন সেজেগুজে আসো, তখন তোমাকে চেনাই যায় না। এখানে এমনি একটু শোনাও দেখি।" তারাসুন্দরী অনেক সময় পুরুষের ভূমিকারও অভিনয় করিতেন। তারাসুন্দরী মায়ের আদেশে জোড়হাত করিয়া মাকে নমস্কার করিয়া বেশ বীররস-ব্যঞ্জক (প্রবীরার্জুন পালার) প্রবীরের অভিনয় করিয়া কিছু শুনাইলেন।'[২৯]

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের মহত্তম দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণ। বাংলার ছায়াছবিও অনুরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিল সম মাপের আর একটি ব্যক্তিত্বের গুণে। তিনি সারদাদেবী। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য জানিয়েছেনঃ ১৩২৫ সালের ১২ কার্তিক শ্রীমা কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে নির্বাক ছবি 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী' দেখেছেন। একই সঙ্গে আর একটি তথ্য দিয়েছেন অক্ষয়চৈতন্যঃ ভাইঝিদের আবদার রাখতে শ্রীমা গড়ের মাঠে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন ঐ বছরেরই বড়দিনের সময়।[৩০]

কোন বিশেষ সংস্কার সারদাদেবীর অভিনয়-রস-গ্রহণের পথে কখনও অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। একবার বেলুড় মঠে বিজয়াদশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জনের সময় নৌকাতে ডাক্তার কাঞ্জিলাল নানা অঙ্গভঙ্গি ও রঙ্গব্যঙ্গ করে সকলকে আনন্দদান করবার চেষ্টা করছিলেন। সারদাদেবী নিজের ঘরে বসে সেসব দেখছিলেন। কাঞ্জিলালের ঐ চপলতা এক ব্রহ্মচারীকে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত করে। সেদিকে শ্রীমায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি নির্দ্বিধায় রায় দিলেনঃ 'না, না, এসব ঠিক। গান-বাজনা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।'[৩১] 'বিল্বমঙ্গল' নাটক দেখার দিন গিরিশবাবু গ্রহণ করেছিলেন সাধকের ভূমিকা। নানারকম ভাবভঙ্গির মধ্য দিয়ে কপট সাধুর অভিনয় শ্রীমায়ের কাছে উপভোগ্য হতে পেরেছিল নাট্যবোধের প্রেরণাতেই।

বাল্যে যাত্রাগান শোনার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল—একথা আগেই বলেছি। নিজেই এক সময় বলেছেনঃ 'তখন, মা, যাত্রা কথকতা এই সব ছিল। আমরা কত শুনেছি, এখন আর তেমনটি শোনা যায় না।'[৩২]

কিন্তু যাত্রাগানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সমগ্র জীবনেই অব্যাহত—এমনকি ভাষার ব্যবধানও তাঁর রসোপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। কাশীতে বৃন্দাবন থেকে আগত একটি দল 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে' তিনদিন রাসলীলা অভিনয় করল। অভিনয়ে প্রীত সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন, 'আসল নকল এক দেখলুম'—রাধাকৃষ্ণ-বেশী বালকদুটিকে টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন।[৩৩] বলরাম-বাবুর জমিদারী উড়িষ্যার কোঠারে থাকাকালীন শ্রীমা একবার ঐদিককার যাত্রা দেখেন। সরস্বতী পূজার রাত্রে যাত্রা হয়। দুটি বালক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর ভূমিকায় অভিনয় করে। সেই যাত্রায় শুধু নাচ আর গান—একটিও কথা নেই। সারা রাত যাত্রা চলে। শ্রীমা এই যাত্রা দেখে এত মুগ্ধ হন যে, সরস্বতী পূজার চিরন্তন বিধি পালটে তিনি পর পর দুই দিন পূজার এবং তৃতীয় দিনে নিরঞ্জনের বিধান দেন—যাতে দ্বিতীয় রাতেও ঐ যাত্রার পুনরভিনয় সম্ভব হয়। ঐ যাত্রার একটি গান শ্রীমায়ের বিশেষ পছন্দ হয়। তার একটি কলি পরবর্তীকালে তাঁর গলায় মাঝে মাঝে শোনা যেতঃ কোঁড় করিলা রা নন্দর টীকা পিলাটী (অর্থাৎ, কি করিল রে নন্দের ছোট ছেলেটি)![৩৪]

যাত্রাগান, কথকতা, কীর্তনবাসর অনেক অনুষ্ঠানেই সাগ্রহে যোগদান করেছেন সারদাদেবী—সেগুলি দেখে আনন্দও পেয়েছেন সহজাত রসবোধের প্রেরণায়। কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ যাত্রাপালা শুনেছিলেন কামারপুকুরে। সে এক দুর্লভ সৌভাগ্যঃ 'একবার নিকটবর্তী কোন গ্রামে যাত্রাভিনয় হইতেছে শুনিয়া শ্রীমা পরিবারের অন্য এক মহিলার সহিত তথায় যাইতে চাহিলে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমতি দিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের মনঃকষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া তিনিও দুঃখিত হইলেন এবং সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] স্বয়ং সমস্ত অভিনয়টি তাঁহাদিগকে দেখাইবেন। ঐ অভিনয় তিনি একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু অপূর্ব স্মৃতিশক্তি ও নাট্যকৌশল-সহায়ে সুরতাল-সহকারে তিনি সমস্ত পালাটি এমন সুন্দরভাবে অভিনয় করিলেন যে, মহিলারা যাত্রা না দেখার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার অঙ্গভঙ্গি, বাক্যালাপ ও সঙ্গীত দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন।'[৩৫]

দুর্গাপুরী দেবী লিখেছেনঃ 'মাতাঠাকুরাণী সঙ্গীতানুরাগিণী ছিলেন, নিজেও গাহিতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠ ছিল অতি মধুর, কিন্তু পাছে কেহ শুনিতে পায় এইজন্য নিম্নকণ্ঠে গাহিতেন। ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া প্রীত হইতেন।'[৩৬]

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর গান শুনেছিলেন আকস্মিকভাবে। সেদিন রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে সারদাদেবী ও লক্ষ্মীদেবী মৃদুগলায় গান করছিলেন। ভজন গান—সুতরাং ভাবের গভীরতায় হয়তো কণ্ঠ কিছু উচ্চগ্রামে পেঁছেছিল। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে বললেনঃ 'কাল যে তোমাদের খুব গান হচ্ছিল। তা বেশ বেশ, ভাল।'[৩৭]

ভানুপিসী (মানগুরবিণী দেবী) বলেছিলেন সারদাদেবীকেঃ 'আমি যেন ঠাকুরের [শ্রীরামকৃষ্ণের] গান শুনতে পাই যখন তুমি গাও।'[৩৮]

কিন্তু সে গান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন খুব কম লোকই। সরলাদেবী শুনেছিলেন মাতৃকণ্ঠে নীলকণ্ঠের একটি গানঃ 'ও প্রেমরত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে।' তিনি লিখেছেনঃ 'কি মিষ্ট গলায় মা এই গানটি গাহিয়াছিলেন তাহা আজ পর্যন্ত যেন কানে লাগিয়া আছে।'[৩৯]

শ্রীমতী রাধুর নিত্যনতুন আবদার শ্রীমা হাসিমুখে রক্ষা করতেন। একদিনের কথা লিখেছেন দুর্গাপুরী দেবীঃ 'সন্ধ্যাবেলা রাধারাণী মাকে আবদার জানায়, তাহাকে গান শুনাইতে হইবে। মা সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে"...

—এটা শুনেছি, নতুন একটা বল।

—ঝিকিমিকি তারা, বনকে বাদুরা...

'রাধারাণী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল,—পিসিমা, তুমি একটা গান গাও। অগত্যা মা গান আরম্ভ করিলেন,—

"কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী॥...
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল মন আমার॥"'[৪০]

গিরিশের নাটকের গান! যে-গান গিরিশের কণ্ঠে শুনে ভাবাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে বসেছিলেন।[৪১] রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গেও এ-গানের প্রাণের যোগ।

দুর্গাপুরী দেবীর উপরোক্ত বিবরণী থেকে বোঝা গেল সাধারণ ছড়ায় সুরারোপ করে গান গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন সারদাদেবী।

দুর্গাপুরী দেবী শ্রীমায়ের কণ্ঠে আর একটি গান শুনেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। গানটি বাল্মীকি-আশ্রমে নির্বাসিতা সীতাদেবীর খেদোক্তিঃ

বহু সাধনার গুণে পেয়েছিলাম নবদূর্বাদল শ্যামে,
হারায়েছি বিনা যতনে, ধিক্ রে জীবনে।[৪২]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহিতা সারদাদেবীর হৃদয়নিঃসারিত বেদনা গানটিকে যে কতখানি মর্মস্পর্শী করে তুলেছিল তা অনুভব করেছিলেন দুর্গাপুরী—আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র।

গিরিশচন্দ্র যখন জয়রামবাটী গিয়েছিলেন তখন পল্লীবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বরচিত গান শোনাতে বাধ্য হতেন। সারদাদেবী দূর থেকে সে গান শুনে দু-একখানি শিখে নিয়েছিলেন, পরে একদিন এক সেবককে গিরিশের একটি গান শুনিয়েছিলেন। গানটি হলঃ

হামা দে পালায় পাছু ফিরে চায় রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতূহলে ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে॥[৪৩]

কখনও কখনও মন্ত্র-উচ্চারণের মতো স্তোত্র বা গান আবৃত্তির কথা বলেছেন সেবকদের মধ্যে কেউ কেউ। স্বামী ঈশানানন্দ লিখেছেন, প্রত্যূষকালে কোন কোন দিন গুন গুন করে আবৃত্তি করতেনঃ

প্রাতঃসময় রঘুবীর জাগাওয়ে কৌশল্যা মাহ্তারি।
উঠ লালজী ভোর ভঁয়ো সুরনর-মুনি-হিতকারী॥[৪৪]

স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, শ্রীমা গানটি গাইতেন রাধারাণীর শিশুপুত্র বনবিহারীর ঘুম ভাঙানোর জন্য।[৪৫]

স্বামী শান্তানন্দ জানিয়েছেন, শ্রীমা যখন ১৩১৯ সনে মাস দুয়েকের জন্য কাশীতে গিয়ে ছিলেন, তখন খুব ভোরে মৃদুস্বরে এই গানটি গাইতেনঃ

শিবের আনন্দ কানন কাশী।
যার মধ্যে বিরাজ করেন অন্নপূর্ণার কাশী॥[৪৬]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য কৃষ্ণময়ীদেবীর কাছে শুনেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের কনিষ্ঠা কন্যা রাধার বিবাহে বাসরঘরে সারদাদেবী গেয়েছিলেনঃ

রাধাশ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল।
রাই আমাদের হেমবরণী, শ্যাম চিকন কালো॥[৪৭]

সারদাদেবীর তিনটি বিশেষ প্রিয় সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করেছেন দুর্গাপুরী দেবীঃ

(১) গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।...
(২) বিপদবারণ তুমি নারায়ণ,
লোকে বলে তোমায় করুণানিধান।
(৩) বারে বারে যত দুখ দিয়েছ, দিতেছ তারা।
সে কেবলি দয়া তব, জেনেছি মা দুখহরা॥[৪৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে একটি গান শুনে শ্রীমা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শিখে নিয়েছিলেন বলে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য উল্লেখ করেছেনঃ

যদি কিশোরি, তোমার কালাচাঁদের—
গোকুলচাঁদের উদয় ঘুচল হৃদে।
দুঃখ কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে এখন থাকবি রাধে॥[৪৯]

কোন গান সারদাদেবীর অন্তর স্পর্শ করলে তিনি সেটি শেখার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠতেন। কখনও শুনে শুনেই সেটি কণ্ঠস্থ করে নিতেন, কখনও লিখিয়ে রাখতেন পাছে গানের কথাগুলি ভুলে যান। একবার স্বামী তপানন্দের কাছে রাধাভাবের একটি গান শুনে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লিখিয়ে নেনঃ

প্রত্যাবর্তনের পর; প্রথম অভিনয়, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩। জয়রামবাটীতে এই গান গাওয়া সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। শ্রীমা অন্ততপক্ষে দুবার 'জনা' দেখেছেন এবং কয়েকবার গিরিশের মুখে গান শুনেছেন। মনে হয়, অন্যত্র গিরিশের মুখে গান শুনে এবং/অথবা নাটকের গান শুনে তিনি সেটি আয়ত্ত করেন, পরে ভক্তের অনুরোধে গেয়ে শোনান।

হৃদি-বৃন্দাবনে আমারি কারণে, সর্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।
(তাঁরে) জানি না তবু যে, ভুলি লোকলাজে, পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর॥[৫০]

গান সারদাদেবীর নিত্যসঙ্গী কিন্তু সমস্ত গান ছাপিয়ে এক মধুময় সঙ্গীত-স্মৃতি তিনি আজীবন লালন করে গেছেনঃ 'আহা, গান গাইতেন তিনি (ঠাকুর) যেন মধুভরা, গানের উপর যেন ভাসতেন! সে গানে কান ভরে আছে। এখন যে গান শুনি, সে শুনতে হয় তাই শুনি।'[৫১] সঙ্গীতপ্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিরোমন্থনে সমালোচনার ও রসবিচারের পরিচয় পাই এই মন্তব্যেওঃ 'আর নরেনের কি পঞ্চমেই সুর ছিল! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ীর বাড়িতে।...আর গিরিশ বাবু এই সেদিনও গান শুনিয়ে গেলেন। সুন্দর গাইতেন।'[৫২]

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে সারদাদেবী বহু গানই শুনেছেন—এমনকি তাঁর জন্যই তিনি পুরো যাত্রাপালা গেয়ে শুনিয়েছেন কিন্তু একবার দেশে যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণের সহযাত্রিণীরূপে তাঁর সাহচর্য ও সঙ্গীত চিরস্মরণীয় হয়ে ছিল তাঁর মনের মণি-কোঠায়। শ্রীমা নিকুঞ্জদেবীকে বলেছিলেনঃ 'নৌকায় করে বালি হয়ে দেশে যাওয়া—একসঙ্গে খাওয়া, গান গাওয়া, পরস্পর প্রসাদ খাওয়া। বললেন, আমি জানি তুমি কে, কিন্তু এখন বলব না।'[৫৩]

এই নৌকাযাত্রায় সারদাদেবী এককভাবেও কি শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনিয়েছিলেন?

সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে বাগদি ডাকাত—সকলের কণ্ঠেই গান শুনেছেন সারদাদেবী কিন্তু ভক্তদের গানের মধ্যে যেন অন্য একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। দুর্গাপুরী দেবী লিখেছেনঃ 'মায়ের সঙ্গীতপ্রীতি ছিল বলিয়া সারদানন্দজী প্রায়শঃ মাতৃভবনের একতলায় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিতেন। সারদানন্দজী, পুলিনচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এবং আরও অনেকে ইহাতে যোগ দিতেন। কোন কোন দিন সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া মা উপরের বারান্দায় আসিয়া নিবিষ্টমনে গান শুনিতেন। আবার কখন কখনও উপরে মায়ের ঘরে মহিলাদিগেরও সঙ্গীতানুষ্ঠান হইত। ইঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মীদিদি, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, নর্ম্মদা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।'[৫৪]

'উদ্বোধনে' অবস্থানকালে সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দের কাছে আদেশ পৌঁছাতঃ 'শরৎকে বল দুটো গান করতে।' নীচে বৈঠকখানায় তানপুরা ও ডুগি তবলা থাকত। আদেশ পেলেই স্বামী সারদানন্দ গান ধরতেনঃ 'একবার এস মা, এস মা', 'শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে', 'নিবিড় আঁধারে মা তোর', 'নাচে বাহু তুলে ভোলা ভাবে ভুলে', 'দনুজ-দলনী নিজজনপ্রতিপালিনী শ্রীকালী'—এইরকম অনেক গান।[৫৫] অনুমান করতে কষ্ট হয় না, ভাবতন্ময় সারদানন্দের কণ্ঠনিঃসৃত সেই সুরলহরীতে সমস্ত পরিবেশ দিব্য-ভাবঘন হয়ে উঠত। দোতলার বারান্দায় শ্রীমাও সেই সুরতরঙ্গে ভেসে যেতেন।

একদিনের কথা—সারদাদেবী তখন কাশীর 'লক্ষ্মীনিবাসে' রয়েছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এসেছেন সকালে মায়ের সংবাদ নিতে। গোলাপ-মা দোতলার বারান্দা থেকে

প্রশ্ন করলেনঃ 'মা জিজ্ঞেস করেছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?' ব্রহ্মানন্দ উত্তর দিলেনঃ 'মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।' বলেই বাউলের সুরে গান ধরলেনঃ

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে॥

ভাবতন্ময় ব্রহ্মানন্দ গান গাইতে গাইতে শুরু করলেন নৃত্য। ব্রহ্মানন্দ গান শেষ করেই ভাবের আবেগে 'হো, হো, হো' বলে সবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।[৩৬]—ভাবোন্মত্ত সাধকের সংগীত ও নৃত্যে শ্রীমা তখন আনন্দে আপ্লুত।

'গানের তুল্য কি জিনিষ আছে? গানে ভগবানকে পাওয়া যায়' বলতেন সারদা-দেবী।[৩৭] গান তাঁকে পৌঁছে দিত সাধিকার অভীপ্সিত লক্ষ্যে। 'উদ্বোধনে'র বাড়িতে আছেন তখন। লক্ষ্মী দত্ত লেনের 'দত্ত বাড়ি'তে যতীন মিত্রের কীর্তনগানের ব্যবস্থা হয়েছে—শ্রীমা ভক্তসঙ্গে গেছেন আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'সেদিন মাথুর-কীর্তন হইতেছিল—উহা সবটাই বিরহে পূর্ণ। কীর্তনের ভাব ও সঙ্গীতের মাধুর্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিকের ভিতরে স্ত্রীভক্তদের মধ্যে উপবিষ্টা শ্রীমা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে যতীনবাবুর বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহাকে ট্রেনে অন্যত্র যাইতে হইবে, তাই তিনি বিরহের মধ্যেই গান সমাপ্ত করিতে যাইতেছেন দেখিয়া ভাবাবিষ্টা শ্রীমা গোলাপ-মার দ্বারা বলাইলেন যে, কীর্তনটি মিলনে শেষ করা উচিত। যতীনবাবু মিলন গাহিয়া গান সমাপ্ত করিলেন এবং উদ্দেশ্যে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এদিকে মিলন গানের ভাব, তানলয় ও স্বরমাধুর্যে এমন এক অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, শ্রীমা গানের শেষে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন। এইরূপ ভাবাবস্থার সহিত সুপরিচিতা বুদ্ধিমতী গোলাপ-মার বুঝিতে বাকী রহিল না; সুতরাং তিনি তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং নামমাত্র জলযোগান্তে গাড়িতে তুলিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, গাড়িতে উঠিবার সময়ও মায়ের দেহ স্ববশে নাই—পা এখানে পড়িতে ওখানে পড়িতেছে; সুতরাং তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে হইল। উদ্বোধনবাটীতে পৌঁছিলে তাঁহাকে দুইজনে ধরিয়া ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন। মা সেখানেও নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যায় না, চক্ষের পলকও পড়ে না। এই অবস্থা দেখিয়া গোলাপ-মা বলিলেন, "সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম, আর আজ এই দেখলুম।"'[৩৮]

দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী জয়রামবাটীতে শ্রীমাকে গান শোনাচ্ছেঃ

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)!
(ওমা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?[৩৯]

গৃহাভ্যন্তরে মায়ের চোখের জল দুকূল ছাপিয়ে ওঠে—এ যে তাঁরই জীবনালেখ্য! বহু দিন আগেকার কথা—সারদাজননী শ্যামাসুন্দরীর কাছে নানা লোক নানা

কথা বলে যেত শ্রীরামকৃষ্ণের নামে—জামাই বদ্ধ উন্মাদ, আহা অমন মেয়ে সারুর জীবনটাই নষ্ট হল! সারদাদেবীর কাছেও তারা জানাত সমবেদনা। অবশেষে সারদা দেখতে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে স্বামী কি সত্যই পাগল? কোথায় উন্মাদনা? শ্রেষ্ঠ সাধকই শ্রেষ্ঠ প্রেমিকরূপে সেদিন তাঁর অন্তরের সমস্ত সংশয় ঘুচিয়ে দিলেন। শিবের গৃহে অন্নপূর্ণার মতো তিনি হয়ে উঠেছেন লোকজননী। সেই আনন্দসংবাদই ফুটে উঠেছে হরিদাসের গানে।

কী প্রবল আকর্ষণই না সারদাদেবী অনুভব করেছেন সঙ্গীতে! মাতাল অভিনেতা বিনোদবিহারী সোম ('পদ্মবিনোদ') রাতদুপুরে এসেছেন মায়ের দেখা পাবেন বলে। অসুস্থ মায়ের যাতে ঘুম না ভাঙে তার জন্য সারদানন্দ সদাসতর্ক। কিন্তু সেই সতর্কতার বেড়া ডিঙিয়ে গান পেঁছেছে নিদ্রিত মাতৃকর্ণেঃ

ওঠ গো করুণাময়ি, খোল গো কুটির দ্বার।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমায়ের ঘরের খড়খড়ির একটি পাখী খুলে যায়। শঙ্কিত সারদানন্দ মহারাজ বলে ওঠেনঃ এই রে, মাকে তুলেছে! গান কিন্তু চলতে থাকেঃ

আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার॥
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে।
(আমি) ডাকিতেছি মা মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙে না তোমার?

এতদূর এসেই গান থেমে যায়। কারণ, মুক্ত বাতায়নে এসে দাঁড়িয়েছেন 'করুণাময়ী'। ধূলি-ধূসরিত পথে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে গান গাইতে গাইতে বিদায় নেয় বিনোদবিহারী।

পদ্মবিনোদের নৈশ সঙ্গীতের আকুতিতে শ্রীমাকে এইভাবে সাড়া দিতে হয় প্রায়ই। আর একবার গভীর রাতে পদ্মবিনোদ এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান ধরেছেনঃ

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে তাই শ্মশান করেছি এ হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, তুই নাচ্‌বি বলে নিরবধি॥

শ্রীমা যথারীতি ঘুম থেকে জেগে জানালায় এসে দাঁড়ালেন। পদ্মবিনোদ এবারও মায়ের দর্শন পেয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে প্রণাম নিবেদন করে তৃপ্ত মনে পথ ধরলেন। মুখে তখনও গানের সুর।[৩০]

কাশীতে দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একটি করুণকণ্ঠ ভেসে এল। সারদাদেবী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—সেই ঘুমের মধ্যেই গানটি কানে পেঁছেছে। সরলা-বালাকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। একটি ভিখারী মেয়ে গাইছেঃ

আমার মা কোথায় গেলে?
অনেকদিন দেখি নাই, মা, নে আমায় কোলে।
তুই গো কেমন জননী, সন্তানে হও এত পাষাণী,
দেখা দে মা, আর কাঁদাস নে তনয়া বলে।

গানের সঙ্গে সঙ্গে তার দুচোখে অশ্রুর প্রবাহ। শ্রীমাকে দেখে গান থামিয়ে প্রণাম করে বললঃ 'মা, আমার অনেকদিনের আশা আজ পূর্ণ হল। আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে বলতে পারছি না, মা।' আশীর্বাদ করে পরিচয় নিলেন শ্রীমা—দশাশ্বমেধ ঘাটে

বেহারীবাবার মন্দিরের কাছে বসে ভিক্ষা করে। মায়ের কথায় আবার গান ধরল মেয়েটিঃ

মা, আমারে দয়া করে
শিশুর মতো করে রাখ,
শৈশবের সৌন্দর্য ছেড়ে
বড় হতে দিও নাক।

'কি চমৎকার গানটি'—প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত সারদাদেবী। প্রসাদ পেয়ে মেয়েটি চলে গেল।[৬১]

একদিন একটি পেয়ারা নিয়ে সেই ভিখারিনীটি এসেছে মাতৃসন্দর্শনে। ভিক্ষার পেয়ারা—সাগ্রহে গ্রহণ করলেন শ্রীমা, 'ভিক্ষার জিনিস খুব পবিত্র, ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। বেশ পেয়ারাটি তো ; আমি খাব এখন।' বললেন, 'তোমার গান বড় মিষ্টি। তুমি একটি গান গাও।' মেয়েটি গান ধরলঃ

গোপাল, সাজিয়ে দিই বাপ তোরে।
একবার তেমনি, তেমনি, তেমনি করে
নাচরে ঘুরে ফিরে॥

—'গানটি বেশ। আর একটি বল না।'[৬২] গান শুনে কখনও ক্লান্তি নেই। গান গেয়ে ভিক্ষা করছে মেয়েটি কতদিন ধরে, কিন্তু এমন শ্রোতা পেয়েছে কজন?

এই কাশীতেই একদিন এল গেরুয়া-পরা একটি বিধবা মেয়ে—সারদাদেবীকে গান শুনিয়ে গেলঃ

থাকরে জবা, বনের শোভা,
বনের ফুল তুই বনে ফুটি,
তোরে হেরলে শিবের বক্ষে
মনে হয় মার চরণ দুটি।[৬৩]

এই কাশীতেই প্রখ্যাত গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী কয়েকদিন ধরে শ্রীমাকে রামপ্রসাদী ও কাশীমাহাত্ম্যসূচক গান শুনিয়েছিলেন।[৬৪]

সুর যখন মর্মে পৌঁছায় গানের ভাষা তখন পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। নিবেদিতার বাসাবাড়িতে গিয়ে সব দেখেশুনে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসলেন শ্রীমা—শুনতে চাইলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য। নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'তখন আমাদের ছোট ফরাসী অর্গানযোগে ইস্টারের গীতবাদ্য করা হল (নিবেদিতাও কি তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন?)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান-স্তোত্র শ্রীমার কাছে অজ্ঞাত ও বিদেশীয় হলেও যে-রকম দ্রুত তার মর্মানুভব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে উন্মোচিত হল—সারদাদেবীর ধর্মসংস্কৃতির মহিমা কি বিরাট! এই একই ক্ষমতা শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শপূত শ্রীমার

সঙ্গিনীদের মধ্যে অল্পাধিক দেখা যায়। কিন্তু সারদাদেবীর মধ্যে তার প্রত্যয় ও শক্তি অসীম—সে এক সমুচ্চ শিক্ষার অভ্রান্ত ফলশ্রুতি।' [৬৪]

নিবেদিতা-স্কুলের মেয়েরা এসেছে মায়ের কাছে—তার মধ্যে দুটি মেয়ে মাদ্রাজী। শ্রীমা সেই মেয়ে দুটিকে বললেন গান গাইতে। মেয়ে দুটি তাদের মাতৃভাষায় ও সুরে গান গেয়ে প্রশংসা অর্জন করল। [৬৫]

ভক্তের যেমন জাত নেই—ভক্তিসঙ্গীতেরও তেমনই জাত নেই। যখন থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে থিয়েটারের গানও ভদ্রসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সময় প্রথম তাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। সারদাদেবীও রক্ষা করেছেন সেই ট্র্যাডিশন। নিজে থিয়েটারের গান গেয়েছেন ('কেশব কুরু করুণা দীনে')—আবার থিয়েটারের অভিনেত্রীর কাছে শুনতে চেয়েছেন থিয়েটারের গান। সে কাহিনী শুনিয়েছেন আশুতোষ মিত্র তাঁর 'শ্রীমা' গ্রন্থেঃ প্রথিতযশা অভিনেত্রী তিনকড়ি একদিন মায়ের বাড়িতে এসেছেন। লক্ষ্মীদিদি তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁদের গান গেয়ে শোনাতে। কিন্তু তিনকড়ি সঙ্কুচিত হয়ে বললেনঃ 'আপনাদের কাছে আমি কি গাইতে পারি?' তখন শ্রীশ্রীমা বলেনঃ 'তাতে কি—গাওনা—তোমার সেই পাগলীর [বিল্বমঙ্গলের "পাগলিনীর"] গানটা গাও।' অভিনেত্রীর সমস্ত সঙ্কোচ এবার দূর হয়ে যায়। গান ধরেন তিনি। সকাল তখন সাড়ে নটা। তিনকড়ির কণ্ঠের জাদু মুহূর্তে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করে। 'শরৎ মহারাজ বসিয়া কি একটা লিখিতেছিলেন, লেখনী ত্যাগ করিয়া গম্ভীরাকার ধারণ করিলেন; যোগীন-মা কুটনা কুটিতেছিলেন, ফেলিয়া উপরে উপস্থিত হইলেন; পাচক রান্নার কড়া নামাইয়া এবং ভৃত্য বাট্‌নার শীল ছাড়িয়া উপরে হাজির! ...শ্রীমার পূজা হইয়া গিয়াছে—ঠাকুরঘরে পা ছড়াইয়া বসিয়া গান শুনিতেছেন।' তিনকড়ি গাইছেনঃ

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
আমি যেখানে যাই, সে যায় পাছে, বল্‌তে হয় না জোর করে॥

প্রত্যক্ষদর্শী লক্ষ্য করলেনঃ 'শ্রীমা একবার ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া চক্ষু বুজিলেন। কিছুক্ষণ বাদে চক্ষু চাহিলেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি আদৌ বাহ্যদৃষ্টি নহে বলিয়া আমাদের ধারণা হইল; চক্ষু উন্মুক্ত কিন্তু কিছুই দেখিতেছেন না।' ওদিকে গায়িকা গাইছেনঃ

মুখ খানি সে যতনে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়।
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কতই রাখে আদরে॥

সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ—যেন কেউ নেই। 'সকলে মুগ্ধ ও বিভোর—এ কি গায়িকার গানের প্রভাবে অথবা শ্রীমার শক্তিতে...?'

গান চলতে থাকেঃ

আমি জান্‌তে এলেম তাই, কে বলে রে আপন রতন নাই?
সত্যি মিছে দেখ্‌না এসে—কচ্ছে কথা সোহাগ স্বরে॥

গানের এই অংশ শুনে শ্রীমা ভাবাবেগে বলে উঠলেনঃ 'আহা! আহা!'

গান শেষ হল। শ্রীমা কিছুক্ষণ সেইভাবেই বসে রইলেন—সাড়া নেই, শব্দ নেই। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকবার পর আঁচলে চোখ মুছে গায়িকাকে বললেনঃ 'আজ কি গানই শোনালি, মা!'[৬৭]

সেকালের অনেক প্রখ্যাত গায়ক বা শিষ্যভক্তগণের গান শুনেছেন সারদাদেবী—এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু সঙ্গীতানুরাগ যেমন সুর খুঁজে ফেরে তেমনি সুরও খুঁজে ফেরে সঙ্গীতানুরাগী হৃদয়কে। একদা এক আকস্মিকতার মধ্যে তাঁর দুস্তর পথচলাও মাধুর্যময় হয়ে উঠেছিল সুরের স্পর্শে। সেদিন তেলো-ভেলোর মাঠে বাগদি ডাকাত আর তার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর মেঠো পথ অতিক্রম কর-ছিলেন সারদাদেবী। আনন্দময় পরমাত্মার উদ্দেশে তাঁর সেদিনের অভিসারযাত্রার আবহ রচনা করেছিল ডাকাতসর্দারের কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গীতলহরী। সুদূর অতীতে যাত্রার দলে শেখা গানগুলি সেদিন নিশ্চয়ই নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।[৬৮]

স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে বলেছেন 'আনন্দময়ী'।[৬৯] বাস্তবিক আনন্দের বিগ্রহই তিনি ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর নিত্যদিনের যে জীবনযাত্রা-কাহিনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত, সাধারণ বিচারে তাতে আনন্দের উপকরণ পাওয়া ভার। কিন্তু সারদাদেবী বলতেন, ঐসময় আনন্দে তাঁর অন্তর সব সময় পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। অপূর্ব ভাষায় তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন তিনিঃ 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে—ঐকাল থেকে সর্বদা এরূপ অনুভব করতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কত ভরে থাকত তা বলে বোঝাবার নয়।'[৭০] যা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হয় আনন্দের স্পর্শ বিহীন, তা থেকেও সারদা-দেবী সংগ্রহ করেছেন আনন্দ। আর সেই আনন্দ বিকিরণও করেছেন চারপাশে—অকাতরে। শুধু দক্ষিণেশ্বরেই নয়, সারাজীবন ধরেই তিনি তাই করেছেন। তার ফলে তাঁর গোটা জীবনটাই হয়ে উঠেছে একটি আনন্দের পূর্ণ পাত্র। শুধু আনন্দেরই নয়—শান্তি, সঙ্গীত এবং সুষমার। শ্রীমায়ের এক অধ্যাত্ম সন্তান তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, তিনি 'সুরে সঙ্গীতে নিত্য পূর্ণ'। নিবেদিতা এই বর্ণনাকে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত বলে মনে করেছেন। শুধু তাঁর সঙ্গে আরও একটু যোগ করে বর্ণনাটিকে পূর্ণ করে দিয়েছেনঃ 'আর পূর্ণ মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়।'[৭১]

তপস্বিনী

মহামানবের সাধনা মানবসাধারণের জীবনপরিক্রমার পথ রচনা করে। তাঁদের অলোকসামান্য জীবনের আলোকবিচ্ছুরণ যুগ থেকে যুগান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে মানুষের দৃষ্টির আবরণ উন্মোচিত করে দেয়। সারদাদেবীর জীবন অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত।

সারদাদেবীর সমগ্র জীবন অনুধ্যান করলে যে-রূপটি সর্বাধিক উজ্জ্বল হয়ে মনে ভেসে ওঠে, তা হচ্ছে তাঁর আজীবন নীরব তপস্যার রূপ। এককথায়, সারদাদেবীর জীবন সকলের অগোচরে অনুষ্ঠিত এক নিরবচ্ছিন্ন তপস্যা, আত্মনিগ্রহ।

প্রাচীন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে তপস্যার নানা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যুগে যুগে, প্রয়োজন অনুসারে তপস্যার নানা ব্যাখ্যা হয়েছে। 'তপস্যা' বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি—কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা অভীষ্ট লাভের চেষ্টা। 'তপস্যা'র প্রকৃত উদ্দেশ্য কামনার নিবৃত্তি। আচার্য শঙ্কর বলেছেনঃ 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা।'[১] আবার মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ১৫৬।৮) আছেঃ তপো নানশনাৎ পরম্—তপস্যার মধ্যে অনশনই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এখানে 'অনশন' শব্দের অর্থ কামনাসমূহের নিবৃত্তি। অনশন শব্দের আভিধানিক অর্থ 'উপবাস'। আদর্শ বা লক্ষ্যের সমীপে বাস—উপবাস। ঐকান্তিক ধ্যান, অনন্যস্মরণ, অবিচ্ছিন্ন মননের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রা, লক্ষ্যের নিকটে বাস—তপস্যা। এই 'যাত্রা' ও 'বাস'-এর মধ্য দিয়েই ঘটে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তি। তপস্বী নিজ তপস্যার বলে অভীষ্ট লাভে সক্ষম। প্রকৃত তপস্বী তাঁকেই বলা যায়, যিনি নিজ আদর্শে বা সত্যে অবিচল থেকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপকে সেই লক্ষ্য-অভিমুখী করে তুলতে সক্ষম।

কোন মানুষের তপস্যার ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নয়। তবু তপস্যার দীপ্তি স্বপ্রকাশ, তাকে ঢেকে রাখা যায় না। সারদা কিন্তু পেরেছিলেন। তাঁর দীপ্তি স্ব-আরোপিত অবগুণ্ঠনে ঢাকা। এখানেই তপস্বিনী সারদার বিশিষ্টতা। অসাধারণ ব্যক্তিত্বমাত্রই বিপুল বৈচিত্র্যসম্পন্ন। তথাপি সকল বৈচিত্র্যের মধ্যেই থাকে একটি সত্য-রূপ। সারদার ব্যক্তিত্বের সত্যরূপ তাঁর ত্যাগ-সেবা-ক্ষমায় মণ্ডিত তপস্বিনীরূপ। কন্যারূপে, সহধর্মিণীরূপে, জননীরূপে—জীবনের সকল স্তরে তাঁর এই তপস্যার রূপ চিরোজ্জ্বল। কিন্তু এই রূপ ধরা পড়ে ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে—সহসা নয়। সারদা সর্বদা 'অবগুণ্ঠিতা', আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ এক নারী।

সারদা নিজের সম্পর্কে স্বভাবত নির্বাক, মিতবাক্ বিশেষ ক্ষেত্রে। তথাপি সারদার স্বল্প কথার মধ্য দিয়ে যে রূপটি প্রকট, তা বুঝিয়ে দেয়—সারদা, 'বিধাতার আশ্চর্যতম সৃষ্টি'।[২] সারদার কথাতেই পাই—জহুরি ভিন্ন জহর চেনা সম্ভব নয়।

তাই এই আশ্চর্য সৃষ্টিকে চিহ্নিত করে দেবার জন্য পৃথিবীর আর একটি আশ্চর্য সৃষ্টিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ঃ 'ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।'[৩]—সারদার অবগুণ্ঠন সেই স্বরূপ-আবরণেরই প্রতীক। তপস্যাও তাই অগোচরে।

নগণ্য একটি গ্রামের দরিদ্র পিতামাতার গৃহে সারদার জন্ম। শৈশবেই কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে পরিচয়। শিশু সারদা দারিদ্রের পেষণে পিষ্ট, কিন্তু কাতর নয়। হাসিমুখে দারিদ্রকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে জয় করেছে। সারদা শিশু, কিন্তু দরিদ্র পিতামাতাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করা, ছোট ভাইদের স্নেহে লালন করা —সব কাজে সারদা তৎপর। কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁর কাছে অজেয় নয়। দারিদ্র তাঁর তপস্যার অঙ্গ। তাঁর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক। সব অবস্থাতেই সারদা কিন্তু নিজ লক্ষ্যে স্থিত।

শৈশবে বাবা-মা ও ছোট ভাইদের সেবার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর তপস্যা। সেই সেবার মধ্যে নম্রতা ও আত্মদানের মাধুর্য নিহিত। তাই বালিকা সারদার সেবা-পরায়ণা রূপ সকলকে মুগ্ধ করে। কিন্তু এই স্নিগ্ধ সেবার আড়ালে তাঁর ভবিষ্যতের কঠোর কঠিন তপস্যাময় জীবনের পূর্বাভাস লক্ষণীয়। নানাভাবে দরিদ্র পিতামাতার পরিশ্রম লাঘবের জন্য বালিকার সারাদিনমান আপ্রাণ চেষ্টা। কখনও তিনি ক্ষুধার্ত গরুর হাম্বারব শুনে পুকুরে নেমে দলঘাস কাটছেন, কখনও খেতে মজুরদের জন্য মুড়ি-গুড় দিতে ছুটছেন। অপরের ব্যথায় তাঁর প্রাণ কাঁদে। অপরের জন্য পরি-শ্রমে তাঁর ক্লান্তি নেই। দুর্ভিক্ষের সময় বসে থাকেন ক্ষুধার্তের পাশে। ছোট হাতে পাখা নিয়ে ক্ষুধার্তের অন্ন ঠাণ্ডা করেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, কারও নির্দেশে নয়। তাঁর এই নিরলস নিরভিমান সেবাতেই বুঝি পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সেবা-ধর্মের সূচনা। দারিদ্রের তিক্ততা ও কাঠিন্য এই বালিকার চরিত্রে মাধুর্য ও সুষমায় রূপান্তরিত। তপস্যা এই বালিকার জীবনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বভাবসিদ্ধ। তপস্বিনী এই তনয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে এক অনির্বাণ স্নিগ্ধ মধুর দীপশিখা। আপন মাধুর্যে, ভালবাসায়, সেবায় বালিকা সকলকে জয় করেন। তিনি যেন আর গোপন থাকতে পারেন না। কিন্তু বালিকার আপ্রাণ চেষ্টা নিজের স্বরূপ আবৃত রাখতে। তাই বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো তাঁর অসাধারণত্ব কখনও কখনও ধরা পড়লেও অধিকাংশের দৃষ্টিতেই সারদা ছিলেন গ্রামের এক সাধারণ বালিকা।

পাঁচ বৎসরের বালিকার বিবাহ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। বিবাহের রাত্রেই তপস্যার আর এক পর্যায় আরম্ভ। 'আমার এখানে এখানে যে গহনা ছিল, তা কোথা গেল?'[৪] —কাঁদছে পাঁচ বছরের নববধূ। সাধারণ এক বালিকার পক্ষেই গয়নার জন্য এই কান্না স্বাভাবিক। এই কান্না সাধারণত্বের অবগুণ্ঠন। এখানে এক অভিনব দৃশ্য! রামকৃষ্ণ পতি, গুরুও। বিবাহের রাত থেকেই ভবিষ্যতের লীলাসঙ্গিনীকে শিক্ষা দিচ্ছেন। সারদাকে বৃহতের আহ্বান জানালেন—ত্যাগের পথ দেখিয়ে দিলেন। তাই

অতি কৌশলে, সন্তর্পণে সারদার স্বর্ণ-অলঙ্কার হরণ করলেন। এই অলঙ্কার বাহুল্য। সারদার প্রকৃত অলঙ্কার—ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা। সারদার ভূষণ বৈরাগ্য, ক্ষমা, সেবাপরায়ণতা। তপস্বিনীকে বহিঃসম্পদের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন রামকৃষ্ণ, সারদাকে জানালেন, সারদার জীবন ভোগের নয়, ত্যাগের। গৃহস্থ হয়েও সন্ন্যাসিনী অথবা সন্ন্যাসিনী হয়েও গৃহস্থ—এই উভয় জীবনের সমন্বয় দেখাতে হবে সারদাকে। তাই পাঁচ বছর বয়স থেকেই সারদার এই দুশ্চর তপস্যার সূচনা। সূচনা করে দিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।

কামারপুকুরে এসেছেন রামকৃষ্ণ। একাধারে গৃহী এবং সন্ন্যাসী। সারদা এখন কিশোরী। রামকৃষ্ণের কাছে সারদার প্রত্যক্ষ শিক্ষার এই শুরু। যেমন গুরু, তেমন শিষ্যা। রামকৃষ্ণ যেমন সারদাকে আদর্শ জীবনসঙ্গিনী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী, সারদাও তেমনই দেবকল্প রামকৃষ্ণের যোগ্যা লীলাসঙ্গিনী হতে উন্মুখ। রামকৃষ্ণ কিশোরীর হৃদয় ভালবাসা দিয়ে জয় করে নিয়েছেন। এখন নিজের উপলব্ধি-প্রসূত জ্ঞান দিয়ে তাঁকে সমৃদ্ধ করতে ব্যস্ত। একদিকে সাংসারিক বিষয়, অপরদিকে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতির শিক্ষা। শিক্ষাদানে রামকৃষ্ণ অনলস, সারদাও শিক্ষাগ্রহণে অনন্যমনা। রামকৃষ্ণ শেখাচ্ছেন, জীবনের আদর্শ ত্যাগ। শেখাচ্ছেন পবিত্র সুন্দর চরিত্র কিভাবে গঠন করতে হয়, শেখাচ্ছেন দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ, শেখাচ্ছেন সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে ঈশ্বর-আরাধনায় নিমগ্ন থাকা যায়, শেখাচ্ছেন গুরুজন ও স্নেহভাজনদের প্রতি আচরণ, শেখাচ্ছেন সেবাপরায়ণতা। 'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন'[৫]—এই নীতিকে ভিত্তি করে শিক্ষা দিচ্ছেন লোকব্যবহার। এমনকি, প্রদীপের সলতেটি কেমন করে রাখতে হয়, তা পর্যন্ত শিক্ষাসূচী থেকে বাদ যায়নি।

রামকৃষ্ণের এই শিক্ষা পল্লীবালাকে আনন্দে বিভোর করে রেখেছিল। কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধানতা নেই—আছে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। ভোর রাত থেকে সমস্ত দিন ধরে চলত নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততা। রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ও শিক্ষাগুণে সারদার 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট...স্থাপিত'[৬]। আর সেই আনন্দের প্রেরণায় গুরুনির্দিষ্ট পথে চলে অবগুণ্ঠনবতীর কৃচ্ছ্রসাধন। কৃচ্ছ্রসাধন তাঁকে ম্লান করেনি—অন্তরের উল্লাস তাঁকে প্রগল্‌ভা করেনি। সারদা এখন আরও শান্ত, আরও সংযত, আরও কর্তব্যনিষ্ঠ, আরও আত্মমগ্ন। হৃদয়ে তাঁর 'আনন্দের পূর্ণঘট' সদা প্রতিষ্ঠিত। সারদা ফিরে এলেন জয়রামবাটীতে—পিতৃগৃহে। তাঁর বয়স তের-চোদ্দ বছর। আঠেরো বছর বয়স পর্যন্ত কাটে পিতৃগৃহে। আবার আরম্ভ তপস্যার নবতর এক পর্যায়। নবতর এবং কঠিনতর।

সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিখেছেন—সৎ চিন্তা, সৎ কথা এবং সৎ কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়। সেই থেকে এই সত্যই তাঁর পথ ও লক্ষ্য। দারিদ্র, গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশ, অনুদার সমাজ ও বিগত যুগের আবিলতাময় নানা সংস্কার—এসবের মধ্যে থেকেও তাঁর পথ ও লক্ষ্যে স্থির থেকে তাঁর দরিদ্র পিতামাতার

পরিবারে নির্দিষ্ট কর্তব্যপালনে আত্মনিমগ্না। আশ্চর্য এই যে, এই প্রতিকূল পরিবেশে এবং এই সাধারণ জীবনচর্যার মধ্যেও পরিস্ফুট হতে থাকে তাঁর অসামান্য নিরাসক্তি, অভিমানশূন্যতা, আর দোষদৃষ্টিরাহিত্য—তাঁর 'ক্ষমারূপ তপস্যা'র রূপ। পল্লীর কেউ তাঁর কাছে মন্দ নয়। যে তাঁকে কষ্ট দেয়, সেও নয়। তাই পরবর্তীকালে তাঁর মুখে শুনতে পাইঃ 'মানুষ নিজের মনটি আগে দোষী করে নিয়ে তবে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে তাদের কি হয়?—নিজেরই ক্ষতি। আমার এইটি ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব যে আমি কারও দোষ দেখতে পারতুম না। আমার জন্য যে এতটুকু করে আমি তাকে তাই দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি। তা আবার মানুষের দোষ দেখা? মানুষের কি দোষ দেখতে আছে! ওটি শিখিনি। ক্ষমারূপ তপস্যা।'[৭] জগতের প্রতি তাঁর অন্তিম বাণীও ছিল তাইঃ 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'[৮] অপরের দোষ না দেখার এই কৌশলটি শিশুকাল থেকেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন বলে সকল পরিস্থিতিতে সকলের অপরাধ তিনি ক্ষমা করে নিতে পারতেন। সারদার এই অসাধারণ ক্ষমাগুণের কথা মনে করেই বলরাম বসু বলতেনঃ 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী।'[৯] পিতৃগৃহের সাধারণ সংসারে সারদা কর্তব্য-দায়িত্ব পালন করছেন নীরবে, অথচ তার মধ্যে প্রকাশিত মনের অদ্ভুত অনাসক্তি। গীতার অনাসক্তি। এই অনাসক্তির জন্যেই তাঁর মধ্যে ক্ষমারূপ তপস্যার পরিপূর্ণ প্রকাশ। কিন্তু সর্বোপরি আশ্চর্য নীরবতা। কেউ জানে না, চেনে না সারদাকে। তাঁর ক্রমবিকাশ সকলের দৃষ্টির অন্তরালে। তাঁর অবগুণ্ঠন সকলকে অন্ধ করে রাখে। কেউ লক্ষ্য করে না—শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যের পর—সারদার কাজকর্ম, চলাফেরা, আচরণের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এ এক নতুন সারদা। তবু এ শুধু প্রস্তুতি। পরীক্ষা সামনে।

রামকৃষ্ণকে সারদা দেখেছেন সুস্থ, স্বাভাবিক, আনন্দময়, প্রেমময়। কিন্তু তাঁর কানে ভেসে আসে নানা কথা। তাঁর কানে আসে—রামকৃষ্ণ নাকি উন্মাদ! তিনি উলঙ্গ হয়ে বেড়ান। প্রতিবেশী-পরিজনেরা তাঁকে দেখিয়ে বলেন—'পাগলের স্ত্রী' অথবা '[illegible] শ্যামার মেয়ের ক্ষ্যাপা জামাই-এর সঙ্গে বে হয়েছে।'[১০] এসব উক্তি সারদার মনে গিয়ে আঘাত করে। সারদা আর স্থির থাকতে পারেন না। তাঁকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়ঃ 'আমি মনে ভাবলুম, সব্বাই এমন বলছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কি রকম আছেন।'[১১] গঙ্গাস্নান করবার ছলে প্রায় আশি মাইল পথ পায়ে হেঁটে স্বামীর সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন। এ তপস্যা শুধু সারদার পক্ষেই সম্ভব। এ তপস্যা শুধু কায়িক নয়, মানসিকও। 'কি অবস্থায় দেখব প্রাণদেবতাকে?'—এই চিন্তা সারদাকে দহন করছে। তাই ছুটে এসেছেন

দক্ষিণেশ্বরে। শান্ত, সংযত, আত্মসমাহিতা তপস্বিনী সারদার প্রাণ তখন আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান। প্রাণের মধ্যে শঙ্কা। অজানা ভয়। কিন্তু সব দূরীভূত হল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সম্ভাষণে। শ্রীরামকৃষ্ণই জানতেন কি মর্যাদা সারদা-দেবীর প্রাপ্য। সেই মর্যাদা দিয়েই রামকৃষ্ণ তাঁকে গ্রহণ করলেন, বললেনঃ 'তুমি এতদিনে এলে! এখন কি আর আমার সেজো বাবু আছে যে, তোমার যত্ন হবে?'[১২] মুহূর্তমধ্যে সারদার হৃদয় শান্ত। তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ, সেই আনন্দময়, প্রেমময় পুরুষই আছেন, তাঁর হৃদয়ের মাধুর্য তেমনই অন্তহীন। সারদার আর কিছু দরকার নেই। বছরের পর বছর পিত্রালয়ে লোকের কত কথা, কত অপবাদ তাঁকে শুনতে হয়েছে। সারদা দেখলেন সে সব মিথ্যা। পরম প্রতীক্ষার পরেই তো আসে শুভলগ্ন। সেই শুভলগ্ন উপস্থিত সারদার জীবনে। অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবু সত্য। সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ সারদাকে পরম সমাদরে তাঁর ঘরে স্থান দিলেন। সারদার আর কোনও প্রার্থনা নেই। বহু পথ অতিক্রমের পর তীর্থযাত্রীর যাত্রা শেষ। বহু আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ের ধনকে পেলেন—যিনি নরোত্তম, যাঁর সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সারদার। এখন থেকে সারদার প্রতি পদক্ষেপ সেই লক্ষ্য-অভিমুখী। সারদার তপস্যার আর এক অধ্যায় শুরু।

দক্ষিণেশ্বরে সারদার তপস্যা আরও কঠোর, আরও মহিমামণ্ডিত। এখানেই তাঁর ত্যাগ ও সেবার পূর্ণ পরিণতি। সকলের অলক্ষ্যে, নীরবে, নিভৃতে তাঁর চোদ্দ বছরের কঠোর তপস্যার কাহিনী স্বল্পজ্ঞাত, প্রায় অলিখিত। সারদা লোককল্যাণ-রূপ জীবনব্রত নিয়ে এসেছিলেন বলেই এইসময়কার অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী হতে পেরে-ছিলেন। অগ্নিপরীক্ষা বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। এ সময়ের কঠোর সাধনার কাছে অগ্নিপরীক্ষাও তুচ্ছ ব্যাপার। অথচ এই ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সেবাব্রতকে তিনি গোপন রেখেছিলেন এক স্বেচ্ছারোপিত আবরণে। নিরন্তর প্রয়াসে নিজের আচরণ, ত্যাগোজ্জ্বল জীবনচর্যার সমস্ত গৌরবকে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছিলেন। এমনকি নিজের উপস্থিতিকে পর্যন্ত কী যত্নে মুছে ফেলেছিলেন তিনি তা বোঝা যায় খাজাঞ্চীর এই উক্তিতেঃ 'তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনও দেখতে পাইনি।'[১৩] সারদা নিজেও বলেছেনঃ 'এত বছর ছিলুম, একদিনও কারও সামনে পড়িনি।'[১৪] এই আত্মবিলুপ্তি তপস্যারই শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। সেবার আড়ালে এই আত্মবিলুপ্ত অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে বিরল।

প্রথমবারে দক্ষিণেশ্বরে আসার পর সারদা স্বামীর এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হনঃ 'কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?' লক্ষ্যে স্থিত, সরলা পল্লীবালার সপ্রতিভ উত্তরঃ 'না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'[১৫] এ তপস্বিনী সারদারই যোগ্য উত্তর। আঠেরো বছর বয়সের সরলা পল্লীবালার এই উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সন্তুষ্টই হলেন না, হলেন পরম নিশ্চিন্তও। এ উত্তর ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একই ঘরে একই শয্যায় সারদার আট মাস কাটে। যিনি যতবড় শক্তির অধি-কারী হোন—দেহধারী মানুষরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে প্রত্যেককেই দেহের

ন্যূনতম দাবিকে স্বীকার করতে হয়। দেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণকেও তা স্বীকার করতে হয়েছে। তিনিও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আধিব্যাধির অধীন হয়েছেন। কিন্তু দেহের অন্যতম প্রধান দাবি কামকে যে তিনি জয় করতে সক্ষম হলেন পরিণীতা পত্নীর সান্নিধ্যসত্ত্বেও, তা জগতের ইতিহাসে তুলনারহিত ঘটনা—মনোবিজ্ঞানীর কাছে ব্যাখ্যাতীত। এই কামজয়ী পুরুষের সিদ্ধি সুবিদিত। কিন্তু এর মূল অন্বেষণ করতে গেলে দেখা যায় সেই অসামান্য জিতেন্দ্রিয় নারী সারদার ঐকান্তিক সহযোগিতা। এইসময় প্রতিরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর সমাধিস্থরূপ প্রত্যক্ষ করে সারদা মাঝে মাঝে ভীত হয়ে পড়তেন। অপূর্ব দিব্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও ভাবের ঘোরে ভবতারিণীর সঙ্গে নানা কথা, আবার কখনও বা তাঁর গভীর সমাধিমগ্ন রূপ দেখে সারদা ভয়ে ভয়ে ভাবতেন কখন রাত শেষ হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠবে। আবার কখনও সারদা নিজেই ভগবানের নাম শুনিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রকৃতিস্থ করতে সক্ষম হতেন। এভাবেই সাধক রামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব সাধনযজ্ঞের তিনি ছিলেন নেপথ্য-সহায়িকা। এই আত্মপরীক্ষার পর শ্রীরামকৃষ্ণকেও স্বীকার করতে হলঃ 'ও (সারদা) যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে (আমার) সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে?'[১৩] তথাকথিত অশিক্ষিত গ্রামের এই বধূটি যে দুশ্চর সাধনবলে আত্মসংযমের এই শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হতে পেরেছিলেন সে-সাধনার বিবরণ আমাদের জানা নেই। সারদার পূর্বোক্ত একটিমাত্র কথাতেই তাঁর এই তপশ্চর্যা এবং তপঃসিদ্ধির কথা ঘোষিতঃ 'তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।' ব্রতধারিণীর এই আত্মত্যাগের তুলনা মেলে না।

'দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন [ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে]।'[১৪]—রামকৃষ্ণের অন্তরে আজ অভিনব পূজার সংকল্প। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল, নির্জন নিঃশব্দ রাত্রিতে সারদাকে পূজার বেদীতে বসিয়ে রামকৃষ্ণ মাতৃভাবে ষোড়শীপূজা করেন। পূজক ও পূজিতা উভয়েই দিব্যভাবে আবিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে সারদা স্বয়ং মহামায়া, মূর্তিমতী জগজ্জননী। পূজক শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে উচ্চারিত হল প্রার্থনা-মন্ত্র। একাগ্রমনে করজোড়ে আহ্বান করলেন চিন্ময়ী অনাদি অনন্ত শক্তিকে সারদার দেহে। পূজ্যা সারদাও তদ্‌ভাবে ভাবিতা, তন্ময়, সমাধিস্থা। যথাবিহিত পূজাশেষে সারদার চরণে অর্ঘ নিবেদন করলেন রামকৃষ্ণ, ভূলুণ্ঠিত হলেন সেই আরাধ্যার চরণে। মানবী ও দেবীর ভেদ মুছে যায় সেই মুহূর্তটিতে। সারদা এখন জগন্মাতা, তাই অকুণ্ঠচিত্তে নিশ্চল প্রতিমার মতোই গ্রহণ করলেন যুগশ্রেষ্ঠ সাধকের পূজা ও প্রণাম। অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠনের আড়ালে যে-শক্তি সঞ্চিত ছিল আজ তা উন্মোচিত—তাই রামকৃষ্ণের এই পূজা তাঁর প্রাপ্য। মানুষের সাধনার ইতিহাসে এই সিদ্ধির মুহূর্তটি চিরন্তন হয়ে রইল, অতুলনীয় হয়ে থাকল এ ঘটনা।

সারদা অপরের আলোকে দীপ্তিমান নন, তাঁর দীপ্তি তাঁর নিজস্ব। তাই

রামকৃষ্ণের দ্বারা এভাবে পূজিতা হওয়ার পরেও আপন মহিমাকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পেরেছেন সাধারণত্বের আবরণে, লোকশিক্ষার তাগিদে। সারদার অসীম আত্মসংযম, অপরিমেয় মানবপ্রেম তাঁকে আত্মগোপনের আদর্শে অবিচলিত রেখেছিল। তাই বাইরের সাধারণ জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন নেই। আর সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর কঠিনতম তপশ্চর্যা। তার প্রয়োজন—লোকশিক্ষা। রামকৃষ্ণ-সারদার সাধনভূমি এক —দক্ষিণেশ্বর। অথচ সাধনার প্রকৃতি, পদ্ধতি পৃথক। সাধনার কালে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরময়। জগতকে ভুলেছেন, দেহকে ভুলেছেন, নিজেকে ভুলেছেন। রামকৃষ্ণের সাধনা স্পষ্ট, প্রচলিত অর্থেই কঠিন, দুশ্চর, দুঃসাধ্য। কিন্তু সারদার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্ন ছবি। তিনি জগজ্জননী, তাই যেন জগৎকে ভোলেননি। জগতের মধ্যেই তাই তাঁর সাধনা। সারদা নিপুণ নিখুঁত ভাবে সারাদিন জাগতিক কর্তব্য সম্পাদন করেন। সর্বদা কর্মব্যস্ত। এই নিরলস এবং নিরাসক্ত কর্তব্য-সম্পাদনের আড়ালে কিন্তু তাঁর মন নিরন্তর ঈশ্বর-অভিমুখী। এ অ-তুলনীয় তপস্যা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অবগুণ্ঠনে আবৃত, সকলেব অগোচর। একমাত্র সাক্ষী দক্ষিণেশ্বরের নহবতের এক-তলার ছোট ঘরটি—যেখানে দুশ্চর তপশ্চর্যার এক বিস্ময়কর অধ্যায় রচিত হয়। এই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে সারদা তাঁর তপস্যায় নিমগ্না। এই তপস্যায় কাটে তাঁর জীবনের চোদ্দ বছর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণের বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। বহু বিশিষ্ট জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন। আলোচনায়, তর্কে প্রবৃত্ত হন—অহরহ নানা ভাববিনিময় চলে। শ্রীরাম-কৃষ্ণের অলৌকিক অসামান্য প্রতিভার কাছে সকলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্ঘাত-বিরোধের দিনে দক্ষিণেশ্বর প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে সমকালের বহু মত ও পথের সঙ্গমস্থল। রামকৃষ্ণ যেখানে স্থিত হয়ে সব মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন, পথের নির্দেশ দিচ্ছেন, তার অন্তরালে আছেন চিরতপস্বিনী সারদা। কিরকম আড়ালে থেকে কত গোপনে সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের সেবারত থেকেছেন তা আমাদের ধারণা করা সম্ভব না। নহবতের একতলায় তাঁর ছোট্ট ঘরখানি দরমা দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যেই দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় জিনিসপত্র। তারই মধ্যে রান্না, খাওয়া, থাকা সব। কখনও একই ঘরে থাকেন গোলাপ, গৌরদাসী, কখনও বা অন্য মেয়ে-ভক্তেরা। দোতলার ঘরে আছেন শাশুড়ী। প্রতিদিনের রান্নাই অনেক। ঠাকুরের জন্য আলাদা রান্না, ভক্তদের জন্য আলাদা রান্না—আবার এক এক জন ভক্তের জন্য এক এক রকম রান্না। যে-কোন সময় যে-কোন রান্নার ফরমাশ আসে। দিনরাত রান্নাই কত হয়। তিন চার সের ময়দার রুটি হয়। সারদা অবিচল ধরিত্রীর মতো নিঃশব্দে সানন্দে সব কাজ করেন। এ সব কিছুর ওপর আছে শাশুড়ীর সেবা। সযত্নে পরম ভক্তিতে সারদা সে কাজ সম্পন্ন করেন। বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। তাই রাতের অন্ধকারে একবার বাইরে গিয়ে দৈনন্দিন আবশ্যিক কৃত্যাদি তাঁকে সম্পন্ন করতে হয়। এভাবে সারদার অলৌকিক শ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জগৎ সচল থাকে। কিন্তু সারদার অস্তিত্ব থাকে সবার অগোচর। এমনকি খাজাঞ্চীর কাছেও—কালীবাড়ির সব খবরই যার নখদর্পণে। সারদার নিজের কথায় এই সময়কার সুন্দর ছবি পাওয়া যায়ঃ 'রাত চারটেয় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু

রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকোতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। নীচের একটু-খানি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর হাঁড়ি কলকল করছে—ঠাকুরের জন্য শিঙ্গি মাছের ঝোল হত কিনা! তবু আর কোন কষ্ট জানিনি, কেবল যা শৌচে যাবার কষ্ট। দিনের বেলায় দরকার হলে রাত্রে যেতে পারতুম—গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম, "হরি হরি, একবার শৌচে যেতে পারতুম"!'[১৮] 'শৌচের আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হত। ...আর ঐ মেছুনীরা ছিল আমার সঙ্গী।'[১৯] কিন্তু এত কৃচ্ছ্রসাধনসত্ত্বেও সারদার প্রাণে আনন্দের অভাব নেই, অশান্তি কি জিনিস তা তিনি জানেন না। তাই আবার শুনিঃ 'চটের উপর পট্‌পটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনও তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হত, এখন এই সবে [খাট বিছানায়] শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাত বোধ হয় না।'[২০]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে বেড়াতে এসেছেন কলকাতার ভদ্রমহিলারা। নহবতের ঘরে সারদাকে দেখে তাঁদের কণ্ঠেও আক্ষেপের সুরঃ 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!'[২১] সীতার মতোই বনবাসের জীবন। দরমার বেড়ার ফুটো দিয়ে মাঝে-মধ্যে দিনান্তে হয়তো একটিবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পান। তাইতেই তিনি পরিতৃপ্ত। কোনও আক্ষেপ নেই, ক্ষোভ নেই। সারদার নিজের ভাষায় বর্ণনাঃ 'ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, হাতজোড় করে পেন্নাম করতুম। কি আনন্দই ছিল! দিনরাত লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে।'[২২] 'কখনও কখনও দু-মাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, "মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি!" দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল।'[২৩] মাঝে মাঝে কেবল ভাবতেনঃ 'আমি যদি ঐ ভক্তদের মতো একজন হতুম তো বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম।'[২৪] কিন্তু একথা তাঁর মনে কখনও স্থান পায়নি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর দাবি অন্য কোন ভক্তের চেয়ে একটুও বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণের দিন-রাতের খাবারটুকু সারদাই নিয়ে যান। ঐটুকু সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে একান্তে পান। সারদার কাছে ঐ সময়টুকু তাই বড়ই মূল্যবান। কিন্তু সেই খাবারের থালাও কেউ যদি সারদার হাত থেকে চেয়ে নেয়, সারদা তাতে আপত্তি জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন। কারণ, সারদা জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তাঁর একার 'ঠাকুর' নন—তিনি 'সকলের'। তাছাড়া 'মা' সম্বোধন করে কেউ যদি সারদার কাছে কিছু চায়—সারদা তাকে নিরাশ করতে পারেন না কিছুতেই : তার জন্য তাঁকে যদি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধিকার কিংবা দর্শন-সৌভাগ্য থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হতে হয়—তাহলেও না। স্বার্থত্যাগে সারদা সর্বদা বেহিসেবী। কর্মে সারদার আপত্তি নেই, আপত্তি নেই জীবনসংগ্রামের যে-কোন শারীরিক ও মানসিক কষ্টকে বরণ করতে—আপত্তি শুধু

এই সংসার থেকে নিজের জন্য কোন কিছু দাবি করতে। সারদার জীবন দেখিয়ে দেয়ঃ মানুষের তপস্যা কর্মত্যাগে নয়, আত্মত্যাগে। এই দেওয়ার মধ্যে কোন প্রতিদানের আশা নেই— যশ, সম্মান, মর্যাদা, এমনকি আত্মনিবেদনের স্বীকৃতি পর্যন্ত নয়। নিজের সুখ, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও অধিকারকে সবার শেষে সরিয়ে রাখবার মধ্যেই তাঁর আনন্দ। এই সাধনা অলৌকিক ত্যাগের সাধনা, দিব্যপ্রেমের সাধনা। প্রেম যখন অন্তর থেকে বাসনাকে ত্যাগ করতে পারে, অহং-এর শাসন পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারে, তখন যা লাভ করা যায়, তা এক অনির্বচনীয় আনন্দ। তাই দক্ষিণেশ্বরের ঐ দিনগুলির কথা স্মরণ করে পরে বলতেনঃ 'আমি তো, মা, তখন অশান্তি কেমন জানতুম না।'[২১] বলতেনঃ 'কি আনন্দেই ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত!'[২৬] বলতেনঃ '...তাঁর সেবার জন্য কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত।'[২৭]

দিনে যিনি সেবিকা, রাতের গভীরে তিনিই ইষ্ট-আরাধনায় মগ্ন তপস্বিনী। রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসেন। আর কোন হুঁশ থাকে না—জগৎ ভুল হয়ে যায়। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের এক ত্যাগী-সন্তানের চোখে পড়ে দুর্লভ দৃশ্য—জ্যোৎস্নালোকে নহবতের বারান্দায় সমাধিস্থা সারদা। সারদার নিজের ভাষাতেও পাওয়া যায় সেদিনের বর্ণনাঃ 'ঠাকুর যে সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারিনি—অন্যদিন জুতোর শব্দে টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে।... ছেলে যোগেন [স্বামী যোগানন্দ] সেদিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল।'[২৮] দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলির কথা স্মরণ করে সারদা পরবর্তীকালে বলেছেনঃ 'আহা! তখন কি মনই ছিল আমার! বৃন্দে (ঝি) একদিন আমার সামনে একটি কাঁসি গড়িয়ে (ঠেলা মেরে) দিলে, আমার বুকের মধ্যে যেন এসে লাগল।'[২৯] ধ্যান যখন খুব গভীর হয় তখন অনেক সময় অতি মৃদু শব্দও প্রচণ্ড বলে মনে হয়। সারদা তখন নহবতে ধ্যানস্থা ছিলেন, তাই শব্দটা তাঁর কাছে বজ্রের মতো মনে হয়েছিল—তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রাতে কে বাঁশী বাজাত, বাঁশীর শব্দে সারদার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। তাঁর 'মনে হত সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাচ্ছেন—অমনি সমাধি হয়ে যেত'।[৩০] শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যাবার পর বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে অথবা ঘুষুড়ির ভাড়াবাড়িতে সারদা অনেক বার থেকেছেন। এই বেলুড়-জীবন সম্বন্ধে সারদা বলেছেনঃ 'আহা! বেলুড়েও কেমন ছিলুম! কি শান্ত জায়গাটি, ধ্যান লেগেই থাকত!'[৩১] সহজাত ত্যাগ-বৈরাগ্য ও পবিত্রতার সঙ্গে নিয়মিত সাধনভজনের মণিকাঞ্চনযোগ হয়েছিল বলেই সারদা পরবর্তীকালে বলতে পারতেনঃ 'ইষ্টদর্শন, সে তো হাতের মুঠোর ভিতর—একবার বসলেই দেখতে পাই।'[৩২]

বস্তুত সর্বদাই সারদা তপস্বিনী। নহবতের ঐ ছোট্ট ঘরখানি নীরব সাধনার এক পুণ্যপীঠ। সেখানেই সারদার এক হাত সেবায় সদাব্যস্ত, অপর হাতে জ্বালিয়ে

রাখেন অন্তরের পূজার প্রদীপ। সমস্তদিনের সংসারের সব কাজের মধ্যে নিরাসক্ত থাকবার বাসনা তাঁর একান্ত আন্তরিক ছিল বলেই দিনান্তে রাতের নিভৃতে চাঁদের আলোর মতো নিজের অন্তরকে পবিত্র করবার প্রার্থনা জানাচ্ছেন ঈশ্বরের কাছে। এতেও মনের আকূতি মিটছে না, তৃপ্তি নেই। তাই আবার প্রার্থনা, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাঁর পবিত্র নির্মল মনে যেন কোন দাগ স্পর্শ না করে। এরই ফাঁকে আবার ভবতারিণীর জন্য মালা গাঁথায় ব্যস্ত। একদিন সারদার গাঁথা জুঁই আর রঙ্গন ফুলের সাত লহরের গড়ে মালা দিয়ে দেবী ভবতারিণীকে সাজাতে গিয়ে সমস্ত গয়না খুলে রাখতে হয়। সন্ধ্যাবেলা শুধু ফুলের মালায় শোভিত ভবতারিণীর মূর্তি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হন। এরকম ছোটবড় প্রতিটি কাজ ফুলের মতো শুচিসুন্দর, প্রতিটি কাজে তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি। কাজ মাত্রেই পূজা—একথা যখন অনুভূতিতে সত্য হয়ে ওঠে, তখন ঠাকুরপূজা ও কুটনোকাটা দুই-ই সমান হয়ে যায়। কাজ মাত্রেই পূজা—সারদা তা ঘটনায় পরিণত করেছেন। ছোটবড় সব কাজকে তিনি পূজায় পরিণত করেছেন। এই পূজাই সারদার সাধনা। সারদার তপস্যা এখানেই অভিনব, আর অভিনব আত্মগোপনের ক্ষমতা। পরবর্তীকালে সঙ্ঘজননী সারদা তাঁর সন্ন্যাসী-ছেলেকে বলছেনঃ 'কাজকর্ম করবে বই কি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্তত সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল।'[৩৩] আবার বলছেনঃ 'ঠাকুরের কাজ করছ, একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে?'[৩৪] এ যেন নিজের কথাই বলছেন। সারদার সমগ্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই নিরবচ্ছিন্ন নীরব কর্মতপস্যায় পরিণত। একসঙ্গে এক হাতে পূজা, অপর হাতে সেবার অপূর্ব সমন্বয়—দেহ কর্মে, মন ঈশ্বরচিন্তায়—এই আদর্শই পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আদর্শ হিসাবে রূপ নেয়। সঙ্ঘের এই আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই বোধহয় ভবিষ্যৎ সঙ্ঘজননীর এই কর্মসাধনার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'ত্যাগীশ্বর, ত্যাগসম্রাট'। আর সারদা? ছোট ছোট নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সারদার ত্যাগসর্বস্ব রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। এক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দশ-হাজার টাকা দিতে চাইলে তিনি সে টাকা গ্রহণে অক্ষমতা জানান। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে পরীক্ষা করবার সুযোগটি ছাড়লেন না। তিনি সারদাকে সে টাকা নিতে বলেন। সারদা এর যোগ্য উত্তর দেন। ধীর শান্তভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণ-সহধর্মিণী জানালেনঃ 'টাকা নেওয়া হবে না।'[৩৫] যে-ধনে ত্যাগিবর শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেবা চলবে না, সে-ধন নিয়ে তিনি কি করবেন? পাঁচ বছরের যে-সারদা একদিন বিয়ের রাতে গয়নার জন্য কেঁদেছিলেন, আজ তিনি সে ঘটনার যথার্থ প্রত্যুত্তর দিলেন। উত্তর দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাষায়—ত্যাগের ভাষায়। 'শিক্ষক' শ্রীরামকৃষ্ণের পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে সারদা দেখালেন ত্যাগকে তিনিও পেরে-ছেন স্বামীর মতো জীবনের 'ভূষণ' করে নিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধারণ দশজন মানুষের মতোই দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে সারদার যে-

জীবন, সে-ও নীরব তপস্যার আর এক অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সারদার মানসিক দৃঢ়তার প্রকাশ অতুলনীয়। শ্যামপুকুর এবং কাশীপুরের বাড়িতেও সারদাকে আত্ম-গোপন করে দিন কাটাতে হয়। শ্যামপুকুরে মাত্র তিনখানি ঘরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁর ভক্তদের স্থান-সংকুলান হত না। একটিমাত্র স্নানের জায়গা। তাই সারদা রাত তিনটেয় স্নানাদি সেরে ছাদের উপরে ছোট্ট একটুখানি চাতালে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের রান্না হয়, আর সারদার দিনমান কাটে। প্রয়োজন-মতো নীচে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেন, কিন্তু বাকি সময় ঐ চাতালে একা একা থাকেন। গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নীচের ঘরে শুতে আসেন। এখানেও নিজেকে আড়ালে রেখে, গোপনে রেখে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করে চলেছেন অতন্দ্র-অনলসভাবে। দক্ষিণেশ্বরের তপস্যার জীবন এখানে আরও বেশী কঠোর হয়ে ওঠে। নহবতখানার ঘরটি অতিশয় ক্ষুদ্র এবং নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিসে ঠাসা হলেও সেটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট একটি বাসস্থান, যা শ্যামপুকুরে নেই। প্রতিদিন যাঁরা শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করেন তাঁরা সারদার উপস্থিতির কথা জানতেও পারেন না। এইভাবে শ্যামপুকুরে আড়াইমাস অতিবাহিত হওয়ার পরে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে আনা হয়। বাসস্থানের অপেক্ষাকৃত সুবিধা হলেও এখানেও সারদা আড়ালে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় ব্যাপৃতা। শ্রীরাম-কৃষ্ণের অসুখ বেড়েই চলেছে। সারদার সেবারূপ-তপস্যাও অব্যাহত। কোন চিন্তা, ক্ষোভ, তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। অথচ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি সজাগ। সবসময় সত্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখে নীরবে, হাসিমুখে সব-সহ্য করে চলেছেন। সারদা বলতেনঃ 'সন্তোষের সমান ধন নেই, আর সহ্যের সমান গুণ নেই।'[৩৬] এই গুণ ও ধন সকল অবস্থায় তাঁকে স্থির রেখেছে। এমনকি শ্রীরাম-কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের মুহূর্তটিতেও তাঁর মধ্যে যে সহিষ্ণুতার প্রকাশ দেখা গেছে সেটিও তাঁর তপস্যালব্ধ আত্মসংযমের নিদর্শন।[৩৭]

দারিদ্রের সঙ্গে, অর্থাভাবের সঙ্গে সারদার পরিচয় আশৈশব। দারিদ্রজনিত তপস্যায় তিনি প্রতিষ্ঠিত। সহজাত ত্যাগ-বৈরাগ্যের গুণে সংসারের সকল অসুবিধাকে সর্বদা অগ্রাহ্য করতে অভ্যস্ত। রানী রাসমণির তহবিল থেকে সারদার জন্য প্রতি-মাসে সাত টাকা করে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে যখন সে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায়, সারদা তখন পরম নির্বিকার চিত্তে বলতে পারলেনঃ 'বন্ধ করেছে করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেছেন ; টাকা নিয়ে আর আমি কি করবো।'[৩৮] চির-জীবনের যে সম্পদকে তিনি অন্তরে সঞ্চিত করেছেন আপন তপস্যাবলে, বাইরের কোন আঘাতেই তা ক্ষয় হওয়ার নয়। সারদা কামারপুকুরে ফিরে এলেন, এবার তপস্যার আর এক অধ্যায় শুরু। তপস্বিনী সারদার সামনে এখন অনাহার বা অর্ধাহার

বাস্তব সত্য। তার ওপর নিঃসঙ্গতা। সারদা কিন্তু অবিচল, আগের মতোই নীরব। তাঁর এই তপস্যার কথাও তাই কারুর গোচরে আসেনি। পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ বলতেনঃ 'আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মার নুনটুকুও জোটে না।'[৩৯] শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাঃ 'কারও কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎহাত করো না।'[৪০] এই শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে রূপ দিতে পেরেছিলেন সারদা—তিনি তপস্বিনী বলে। উপদেশ তো প্রচুর আছে, কিন্তু সেগুলোকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারাকেই বলে তপস্যা। সারদার জীবনের প্রতিটি কাজ, কথা, ব্যবহারের মধ্যে দেখি ত্যাগ, সেবা, প্রেম, নিরভিমানতার প্রকাশ। এককথায়, তাঁর তপস্বিনী-রূপ। একাধারে তাঁর স্বামী, গুরু, ইষ্ট রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাঁর সকল তপস্যা। গভীর সতর্ক অনুধ্যান ছাড়া এই তপস্যার অসাধারণত্ব সাধারণের চোখে প্রতিভাত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে কামারপুকুরের এই একবছরের জীবন তাঁর কঠোরতম পরীক্ষা। কত শক্তি থাকলে মানুষ এই অবস্থায় নীরব, শান্ত, স্থির থাকতে পারে? সারদাদেবী যেন স্বয়ং ধরিত্রী। তাই তাঁর এই সহনশীলতা।

কামারপুকুরে একবছর থাকার পর তাঁর মা তাঁকে জয়রামবাটী নিয়ে যান। সারদার বাকি জীবনে তাঁকে সংসারের নানা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বাস করতে হয়েছে। কখনও থেকেছেন কলকাতায় কখনও জয়রামবাটীতে। যখন কলকাতায় থেকেছেন তখন তাঁর আশেপাশে যেসব সেবিকা অথবা সঙ্গিনী বয়স্কা মহিলা থাকতেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন উগ্রস্বভাবা। জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারে পরস্পরের মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিল। তাছাড়া ছিল তাঁর স্নেহকে কেন্দ্র করে ভাই, ভাইপো, ভাইঝিদের মধ্যে ঈর্ষা, ঝগড়াঝাঁটি। ছিল নীচতা ও কুটিলতা। কিন্তু এসবের মধ্যে থেকেও সারদা ছিলেন সব কিছুর ঊর্ধ্বে—স্থির অচঞ্চল। চারপাশের কোন সংকীর্ণতা সারদাকে স্পর্শ করতে পারত না। তাঁর অসাধারণ সহিষ্ণুতার গুণে তিনি পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও সকলকে নিয়ে সুন্দরভাবে মানিয়ে চলতেন। তাঁর এই সহ্যগুণের কথা মনে করে পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেনঃ 'আমাদের তো দেখছ—পান থেকে চুন খসলে আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভায়েরা কি কাণ্ডই করছেন; অথচ তিনি যেমন তেমনটিই আছেন—ধীরস্থির!'[৪১] শঙ্করাচার্য 'বিবেকচূড়ামণিতে' তিতিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মূর্তরূপ আমরা সারদার জীবনে প্রত্যক্ষ করিঃ

> সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্।
> চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥[৪২]

সমস্ত দুঃখকষ্ট অপ্রতিকারপূর্বক সহ্য করা—শুধু তাই নয়, মনে মনেও তা নিয়ে কোন উদ্বেগ বা দুঃখ প্রকাশ না করাই হল তিতিক্ষা। এই তিতিক্ষা সারদার জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে সারদা ভক্তদের সঙ্গে কিছুদিন তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। এসময় বৃন্দাবনে গভীর তপস্যায় তাঁর দিন কাটে। এ তথ্য আমরা সারদার নিজের ভাষায় পাইঃ 'ঠাকুরের দেহ রাখার পর বৃন্দাবন গিয়েছিলুম। তা

হেঁটে হেঁটেই সব দর্শন করতুম!'[৪৩] 'আহা, যোগেন ও আমরা বৃন্দাবনে কি আনন্দে কত জপ করতাম! চোখে মুখে মাছি বসে ঘা করে দিত—হুঁশ হত না।'[৪৪] 'আমি রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, "ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনও কারও দোষ না দেখি"।'[৪৫] এইভাবে নানা তীর্থ ঘুরে প্রয়াগে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের চুল গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে বিসর্জন দেন। পরে কলকাতায় ঘুষুড়ীর বাড়িতে গভীর তপস্যায় ডুবে যান। বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে সারদার গভীর সমাধি হত। বলছেনঃ 'এই সময় লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি, এই সব জ্যোতিতে মন লীন হত। আর দু-চারদিন এ ভাব থাকলে দেহ থাকত না।'[৪৬] একদিন বলরাম-বাবুর ছাদে ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দেখলেনঃ 'কোথায় চলে গেছি! সেখানে সকলে আমায় কত আদর যত্ন করছে! আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে! ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে। সে যে কি আনন্দ বলতে পারি নে! একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতর ঢুকবো। ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম এবং দেহে হুঁশ এলো।'[৪৭]

সাধারণ ব্রত-উপবাসও সারদা করেছেন লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময় তাঁর নিরাময় কামনায় তারকেশ্বরে গিয়ে শিবমন্দিরে হত্যা দিয়েছিলেন। দুদিন নিরম্বু উপবাস করে মন্দিরের চাতালে পড়ে ছিলেন। পরের রাতে তাঁর মনে একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। মনে হলঃ 'এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্য আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি?'[৪৮] বিধাতা তাঁর 'সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য' এনে দিলেন যে, সারদা সেই রাতেই উঠে এক গণ্ডূষ জল মুখে দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে এক সাধুর নির্দেশে তিনি পঞ্চতপা ব্রত করেন। চারদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড। মাথার উপরে সূর্যের প্রখর তেজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ চারটি অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে বসে নিরন্তর ভগবানের নাম জপ চলে। এভাবে পর পর সাতদিন করে ব্রত সমাপ্ত। আগুনে শরীর ঝলসে গেল, গায়ের রং পুড়ে কালো হল। তপস্যার অহঙ্কার-ত্যাগও তপস্যা। হয়তো সবচেয়ে কঠিন তপস্যা। সারদা সেই তপস্যাতেও সিদ্ধা। পরবর্তীকালে কখনও কেউ সারদার কাছে তাঁর পঞ্চতপা-ব্রত-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ তুললে সারদা সেই নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে সহজভাবেই বলতেনঃ 'পঞ্চতপা-টপা, এসব মেয়েলী—যেমন ব্রত সব করে না?'[৪৯] সারদার নিজের আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য এই ব্রত-অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও যে তিনি এই কঠোর ব্রতটি পালন করেছেন, তার কারণ সম্বন্ধে নিজেই পরবর্তী-কালে বলেছেনঃ 'তপস্যা দরকার...পার্বতীও শিবের জন্য করেছিলেন...তবে এসব করা লোকের জন্য। নইলে লোকে বলবে, "কই সাধারণের মতো খায় দায় আছে।"'[৫০]

এইভাবে প্রচলিত প্রথায় তপস্যার জীবন দেখাবার জন্যই আজন্ম-তপস্বিনী সারদা আনুষ্ঠানিকভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের তপস্যাও করলেন। তারকেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দেওয়া, পঞ্চতপা ব্রতপালন এসব ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই—সারদা লোক-প্রচলিত রীতি, প্রথা ও সংস্কারকে উপেক্ষা করছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনিও কোন কিছু ভাঙতে আসেননি, সবকিছুকেই মেনে নিয়ে, সবকিছুর মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—চেয়েওছিলেন—সারদা সকলকে জ্ঞান দেবে। সেইজন্যেই তো তাঁর আসা। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই সত্য হল। সারদার জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। এও এক নতুন তপস্যা। যিনি এতদিন অন্তরালে আত্ম-গোপন করেছিলেন এবারে তিনি জননী হয়ে সন্তানদের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন, তাদের জাগতিক পারত্রিক সমস্ত ভার গ্রহণ করলেন। এ তপস্যা সন্তানদের জন্য তপস্যা। ত্যাগী ছেলেদের কল্যাণকামনায় অহরহ তাঁর প্রার্থনা—যাতে তাদের মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই হয়, যেখানে তাঁরা প্রেমসূত্রে আবদ্ধ থাকবেন আর সংসারতপ্ত মানুষ তাঁদের সংস্পর্শে এসে শীতল হবে। সারদার সেই প্রার্থনার ফলে গড়ে ওঠে নবযুগের ধর্মসঙ্ঘ। নিজেই বলেছেন পরবর্তীকালেঃ 'আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-ঠঠ যা কিছু।'[৫১] কেন্দ্রমূলে থেকে সঙ্ঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত করতে তিনি সদাসতর্ক। ত্যাগের সাধনা, সেবার সাধনা, ক্ষমার সাধনা আর নিয়মনিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে—সেদিকে শ্রীশ্রীমার সজাগ দৃষ্টি। সঙ্ঘজননীরূপে সকল সন্তানের মঙ্গলকামনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাধনা চলে অব্যাহত। আবার একইসঙ্গে ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন প্রার্থনাঃ 'আমার "আমিত্ব" যেন না আসে।'[৫২]

কিন্তু তিনি তো শুধু সঙ্ঘজননীই নন, মুষ্টিমেয় ত্যাগী-সন্তান যাঁরা তাঁর ভাষায় 'দেবশিশু', 'দেবের আরাধ্য ধন', তাঁদেরই তো জননী নন শুধু ; যারা ত্যাগ করতে পারেনি বা ত্যাগ করতে শেখেনি, তাদেরও তো তিনি জননী। তাই বিশ্ব-জননী হয়ে তিনি সব শরণাগতের ভার গ্রহণ করেছেন। সন্তানের সুখের জন্য, পরিতৃপ্তির জন্য যে-কোন শারীরিক কষ্ট তাঁর কাছে তুচ্ছ। লোকদেখানো নয়, স্বার্থ-কলঙ্কিত নয়, নীরব স্নেহস্নিগ্ধ সেবা। কেবল লোককল্যাণের জন্য সেবা। তাই এখন গুরুরূপে সকল সন্তানের সেবা করে চলেছেন। তাইতো সেবককে বলছেনঃ 'দুঃখী মানুষের ব্যথা কত, বড় হলে বুঝবি। তুই তো মা নস্।'[৫৩] সন্তানের কল্যাণে, সন্তানের তৃপ্তিতে তাঁর তৃপ্তি। জাতি-ধর্ম-পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে মানুষকে তিনি তাঁর স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় দিচ্ছেন। 'কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে এসে বস।'[৫৪] আবার বলছেনঃ 'আমরা তো ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপীতাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে?'[৫৫] শরীর অসুস্থ হলেও রাত জেগে জপ করছেন ছেলেদের

ইহকাল-পরকালের জন্য। 'তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি [রাত জেগে]।'[৫৫] আবার 'ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।'[৫৭] সকল সেবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেবা জীবকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান। শ্রীশ্রীমা দীর্ঘ প্রায় চৌত্রিশ বৎসর এই সেবাময় তপস্যায় নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করেছেন। সন্তানরা জন্মজন্মান্তরের পাপ ঢেলে দেয় 'পবিত্রতাস্বরূপিণী'র পায়ে। পা জ্বলেপুড়ে যায়, কখনও বা 'মনে হয় যেন বোলতায় কামড়ে দিলে'।[৫৮] তবু করছেন, করেই চলেছেন সেবারূপ তপস্যা। এ তপস্যার বিরাম নেই, ফাঁক নেই।

* * *

কথায় নয়, উপদেশে নয়, নিজের জীবন দিয়ে সারদা দেখালেন তপস্যা কাকে বলে। দেখালেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তপস্যা। লক্ষ্যে স্থির থাকাই তপস্যা। সুখে দুঃখে সব অবস্থায়, সর্বক্ষণ। সংসারে, সংসারের বাইরে। আমাদের জীবনের চির-পথনির্দেশক তাঁর তপস্যার অনির্বাণ জ্যোতি। স্থির, অচঞ্চল ধ্রুবতারকা। আর সেই ধ্রুবতারকা নেমে এসেছিল, আমাদের পরম সৌভাগ্যে, আমাদেরই গৃহাঙ্গনে।

লোকজননী

ভারতবর্ষে মাতৃ-সাধনার ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও একটি মানবীয় শরীর-মন অবলম্বনে দেবীত্ব ও দিব্য মাতৃত্বের সমন্বিত পরিপূর্ণ প্রকাশের একটা অভাব এদেশের অধ্যাত্মজগতে ছিল। জাগতিক মাতার স্নেহমূর্তির সঙ্গে জগদীশ্বরীর মানস-কল্পনাকে মিলিয়ে নেওয়ার কোথায় ছিল একটু অস্বাচ্ছন্দ্য। অষ্টাদশ শতকে রাম-প্রসাদ-কমলাকান্ত প্রভৃতি শাক্ত-সাধকের গানে আদ্যাশক্তির সহজ বর্ণনা প্রকাশ পেলেও, দেবী কল্পনার দেবীই থেকে গিয়েছিলেন, হয়ে ওঠেননি মর্তের ধূলিধূসরিতা জননী। ভারতবর্ষ তথা জগতের ইতিহাসে সেই অভাব প্রথম পূর্ণ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদাদেবীর আবির্ভাবে। মাতৃভাবের সঙ্গে মিশে আছে মানুষের শৈশব-সংস্কার। নিষ্কলুষ, একান্ত স্বার্থগন্ধহীন, উচ্চমানবিক অতি শুদ্ধ এই সম্বন্ধ। জগতের বহু পরিবর্তনও পারেনি সেই ভাবকে কলুষিত করতে। পদে পদে স্বাদু এই মাতা-সন্তান সম্বন্ধ। এই ভাব আশ্রয় করে মানুষ সাধনপথেও অগ্রসর হতে চায়। সে পথে তাঁর সকলপ্রকার দৈহিক, মানসিক দুর্বলতা ও দোষরাশি উপেক্ষা করে জননী স্নেহে আদরে সন্তানকে গ্রহণ করবেন—এ ছিল এক বহুলালিত সাধকস্বপ্ন। ছোট শিশু জানতে চায় না তার মায়ের কত ঐশ্বর্য। তাই ঐশ্বর্যের লেশ পর্যন্ত লুপ্ত করে, রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে এযুগের দেবী অবতীর্ণা।

শ্রীরামকৃষ্ণের হিন্দুশাস্ত্র ঘোষিত তন্ত্র-বৈষ্ণব-বেদান্তাদি সকল মতের সাধনা এবং হিন্দুধর্মবহির্ভূত খ্রীষ্ট ও ইসলামধর্মে সাধনা যেমন উদার সমন্বয়বাদের পরিচায়ক, অপরদিকে নিজ জীবনে 'শুদ্ধ সন্তানভাব' নির্বাচনে ও সংরক্ষণে তাঁর আগ্রহ বিশেষ একটি ভাব-প্রাধান্যেরও সূচনা করে। তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নানা ভাব আশ্রয়ে সাধনা করেছেন, তবু প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তিনি ছিলেন জগদম্বার বালক। নিজেও বলেছেনঃ 'আমি তাঁর ছেলে, আমি চিরকাল বালক।'[১] 'দাস আমি', 'সন্তান আমি'—এর উপরেই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অদ্বৈতভাবে সাধনের অধিকারী মুষ্টিমেয়। ভক্তিযোগ যুগধর্ম, অপরপক্ষে বৈষ্ণবধর্মের কান্তাভাবে সাধনা অথবা তন্ত্রের বামাচার—উভয় পথই এযুগের দুর্বল মানবের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন। ঐসব ভাব একান্ত পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ভিন্ন অনুশীলনযোগ্যও নয়। শুধু সাধনার পথ নয়, সাধনের শুদ্ধভাব রক্ষারও একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে। এযুগের জন্য তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'শুদ্ধ সন্তানভাবে'র প্রতিষ্ঠা। তাঁর আপন শক্তির ভূমিকাও এবার তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যেক যুগে ভারতবর্ষে অবতারগণের বাস্তবজীবন যত সজীব হয়ে মানবকুল আকর্ষণ করেছে, মাতৃরূপে ঠিক তেমনই আকর্ষণকারিণী কোন

সজীব প্রতিমা আমরা পাইনি। এযুগে এক অতি উচ্চ প্রেমবন্ধে জননীর আসনে সমাসীনা শ্রীরামকৃষ্ণশক্তি।

শ্রীমায়ের মধ্যে এই মাতৃভাবের প্রথম উন্মেষ হয়েছিল সম্ভবত তাঁরও অগোচরে। অতি শৈশবেই তাঁকে দেখা যায় পরম ভালবাসায় ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করতে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের পাতে অন্ন পরিবেশিত হলে সেই বালিকা অবস্থাতেই তিনি পাখা করেছেন গরম খাবার ঠান্ডা করার জন্য—কারও নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি। জগজ্জননীর মানবীরূপের মধ্যে যে অভূতপূর্ব মাতৃস্নেহের প্রকাশ দেখে ভবিষ্যতে মানুষ বিস্মিত হবে, ক্ষুদ্র বালিকার ঐ সেবামূর্তির মধ্যে তারই স্ফুট-নোন্মুখ প্রকাশ। মাতৃত্বের আকূতি সারদাদেবীর জ্ঞাতসারে কবে তাঁর মধ্যে প্রথম দেখা দেয় বলা কঠিন। তবে আমরা দেখি, কামারপুকুরে ও দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরাম-কৃষ্ণের দিব্যসান্নিধ্যে থাকাকালীন সারদাদেবীর অন্তর 'মা ডাক' শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে, তাঁর এবারের লীলায় তাঁর 'শক্তি'র ভূমিকা হবে লোকজননী রূপে। তাই দক্ষিণেশ্বরে একদিন মাতৃহৃদয়ের সেই আর্তি স্বীয় অন্তর্যামিত্বের গুণে উপলব্ধি করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেনঃ 'তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব—মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষে পায় না। পরে দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলান ভার হয়ে উঠবে।'[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আগেই শ্রীমা 'মা-ডাকে'র আস্বাদ কিছু কিছু পেয়ে-ছিলেন। শুদ্ধসত্ত্ব বালক-ভক্ত লাটুকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একদিন নিয়ে গিয়ে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। রাখালকেও (পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ঠাকুরই নিজে মায়ের কাছে নিয়ে উপস্থিত করেছিলেন। রাখালের স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসে, ঠাকুর তাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, টাকা দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখতে। ঠাকুরেরই নির্দেশে গোপালদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) মায়ের বাজার করতেন এবং যোগেন (পরবর্তীকালে স্বামী যোগানন্দ) নানা কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। শুধু এঁদেরই নয়, ঠাকুরের কাছে অন্য যেসব ভক্ত আসতেন তাঁদেরকেও শ্রীমা নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন। তাঁদেরও অজ্ঞাতসারে শ্রীমার মাতৃস্নেহ তাঁদের উপর বর্ষিত হয়ে চলত। পরমতৃপ্তিতে তিনি নহবতের নেপথ্যে বসে সারাদিন রান্না করে চলেছেন তাঁদের জন্য। এক এক ভক্তের এক এক রুচি। মায়ের রান্নাও হয় সেই অনুযায়ী। নরেন্দ্র ভালবাসেন মোটা মোটা রুটি ও ছোলার ডাল। শ্রীমা নহবত থেকেই হয়তো শুনলেন, ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলছেন থেকে যেতে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছোলার ডাল চড়িয়ে ময়দা ঠাসতে বসে গেলেন। বালক সারদা অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। অনেক সময়ই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার পয়সা থাকত না। ঠাকুরের নির্দেশে সারদা বাড়ি ফেরার আগে নহবতের কাছে গিয়ে দেখতেন, তাঁর ফেরবার ভাড়া হিসেবে চারটি পয়সা নহবতের দরজার গোড়ায় রাখা আছে—ঠাকুর কিছু বলবার আগেই শ্রীমা ঐ পয়সা চারটি রেখে দিয়ে আড়ালে সরে গেছেন। ঠাকুরের কাছে স্ত্রীভক্তেরাও আসেন। যেসব মহিলা-

ভক্ত দিনের শেষে এসে পেঁছান, তাঁরা কোথায় রাত্রে থাকবেন, এই নিয়ে সমস্যা হয়। ঠাকুর জানেন, নহবতের ছোট্ট ঘরে তাঁদের স্থান সংকুলান সম্ভব না। তাই তাঁদের বলতেন তাঁর নিজের ঘরের রোয়াকে শুতে। কিন্তু শ্রীমা তাঁদের নহবতের ঘরেই নিয়ে যেতেন। নিজের সব অসুবিধা তুচ্ছ করে নহবতের ঐ ছোট্ট ঘরেই মেয়ে-ভক্তদের শোবার ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শে তাঁদের সমস্ত সঙ্কোচ দূর হয়ে যেত। তিনি জানতেনঃ এঁরা শুধু ঠাকুরের ভক্তই নয়—তাঁরও সন্তান-সন্ততি। তিনি এঁদের সবার মা। তাই ঠাকুরের ভক্তদের সেবার জন্য কখনও তাঁর কোন ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিল না—ছিল একটা পরম তৃপ্তিবোধ।

ঠাকুরের বালকভক্তদের অন্যতম পূর্ণচন্দ্র যখন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসছেন, তখন একদিন ঠাকুর তাঁকে নহবতে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তাঁকে মালা ও চন্দনে ভূষিত করে খাওয়াতে। শ্রীমা ঠিক তাই করলেন। পূর্ণ নিজে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বলেছেনঃ 'আমাকে নহবতখানার ভিতর নিয়ে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে বললেন, "এই পূর্ণ, একে খাওয়াবার কথা বলেছিলাম।" স্ত্রীলোকটি আমার ঠিক মায়ের মতো স্নেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। ঠাকুর একবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ডেকে বলছেন, "ওগো, এই তরকারিটা বেশী করে দিও।" ...আমি তখন ভেবেছিলাম, স্ত্রীলোকটি বোধহয় ঠাকুরের কোন মেয়ে-ভক্ত। পরে যখন মা-ঠাকরুনকে প্রণাম করতে যাই তখন দেখি—সেই তিনি, আমাদের মা!'[৩]

এইভাবে দেখা যায়, শ্রীমা ভবিষ্যতে যে ব্যাপক জননীত্বের আসনে উপস্থিত হবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালেই তার পটভূমি প্রস্তুত হতে থাকে—কখনও শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, কখনও বা তাঁকে উপলক্ষ করে তাঁর পরোক্ষ প্রভাবে। কিন্তু ঠাকুরের প্রকটলীলাকালে তাঁকে কেন্দ্র করে এই যে ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তার এক অংশের মুখে মাতৃ-সম্বোধন শুনেই শ্রীমা তৃপ্ত থাকতে পারেননি। নিখিল জগৎকেই তিনি সন্তানজ্ঞানে কোলে তুলে নেওয়ার জন্য ব্যাকুল। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর শ্রীমা তাই একা একা বসে ভাবতেনঃ 'ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে?' ভবিষ্যতের লোকজননীকে আশ্বস্ত করতে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজেই একদিন আবির্ভূত হতে হয় তাঁর সামনে, পুনরাবৃত্তি করতে হয় সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীঃ 'ভাবছ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এই সব রত্ন-ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে মা, মা বলে ডাকবে।'[৪] ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে দেখা যায় দুটো অংশ। 'রত্ন-ছেলে' বলতে ঠাকুর বুঝিয়েছেন নরেন্দ্র-রাখাল প্রমুখ ত্যাগী-সন্তানদের; আর মাস্টারমশাই, নাগমহাশয়, বলরাম বসু প্রমুখ গৃহী-ভক্তদের যাঁরা তাঁরই নির্দেশ মতো আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সংসারে থেকেও এক হাত তাঁর পাদপদ্মে সর্বদা রেখে দিতে। কিন্তু এই কয়েকটি 'রত্ন-ছেলে' নিয়েই চরিতার্থ হয়নি শ্রীমার জননীত্ব। এই ক্ষুদ্র সন্তানগোষ্ঠীর বাইরে যে বিরাট জন-

সাধারণ, যারা ত্যাগ করতে শেখেনি কিংবা ভালবাসতে জানেনি ভগবানকে—তাদের জন্যও ব্যাকুল হয়েছিল এই সর্বগ্রাসী মাতৃহৃদয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশে সেই ইঙ্গিতই ছিলঃ শুদ্ধসত্ত্ব ভগবদ্‌ভক্ত গুটিকয়েক রত্নতুল্য আধারকে নিয়ে যে মাতৃত্বের শুভসূচনা, ত্যাগী-গৃহী-পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দেশ নির্বিচারে জগতের সব মানুষকে অভয় আশ্রয় দিয়ে হবে সেই মাতৃত্বের পরিপূর্তি।

তাই ঠাকুরের লীলাবসানের বছর কয়েকের মধ্যেই দেখা যায় জননী কেন্দ্রস্থা হয়ে আকর্ষণ করছেন অগণিত ভক্তবর্গকে। এই অপূর্ব মাতৃলীলার পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়ে তোলা আমাদের সাধ্যাতীত। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চিত্রের মাধ্যমে এর আংশিক আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টাই আমরা শুধু করতে পারি।

*   *   *

গিরিশ ঘোষ গেছেন জয়রামবাটীতে। কলকাতায় যিনি দেশবরেণ্য নট এবং নাট্যকার, জয়রামবাটীতে মাতৃসান্নিধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ আলাদা রূপ—যেন ছোট্ট একটি ছেলে, মায়ের স্নেহের আস্বাদে সদা তৃপ্ত। গ্রামে দুধ পাওয়া যায় না, অথচ মা জানেন গিরিশবাবু ভোরে উঠেই চা খান। তাই শ্রীমা নিজে খোঁজ করে অন্যের কাছ থেকে 'ছেলের' চায়ের জন্য দুধ নিয়ে আসেন। গিরিশবাবু লক্ষ্য করেন তাঁর বিছানার চাদর প্রতিদিনই ধবধবে সাদা। কে প্রতিদিন তাঁর চাদর কেচে দেয়? একদিন দেখলেন, শ্রীমা নিজে পুকুরঘাটে বসে সাবান দিয়ে তাঁর চাদর কাচছেন।[৫] জয়রামবাটীতে গিরিশ একদিন মাকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'তুমি কি রকম মা?' মা কিছুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'আমি সত্যিকারের মা ; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।'[৬]

এই 'সত্যিকারের মা'কে অনেকে আক্ষরিকভাবেই চিনে নিত গর্ভধারিণী জননী বলে। এক ভক্ত ছেলেবেলায় মাকে দর্শন করতে যায়। প্রণাম করবার সময় মায়ের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ যে হুবহু তার ঘরের মা! পা দুখানি, কোলের উপর রাখা হোগলা-পাকের বালা পরা হাত দুটি—সবই যে তার নিজের মায়ের মতো। নিজেরও অজ্ঞাতসারে কেমন একটা বিহ্বল অবস্থায় এক পা এক পা করে সে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে—। আনন্দে উত্তেজনায় বালকভক্ত একেবারে মায়ের কোলের কাছে এগিয়ে যায়। মা সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলোতে থাকেন। সেই স্পর্শে বালকের সারা দেহে আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়। তার মনে হতে থাকে, বহু বছর পরে আবার যেন সে জননীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৭] আর এক ভক্ত শ্রীমাকে নিজের জননীরূপে চিনে বায়না ধরে বসলেন মাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আবদার পূরণ করতে ভাতের থালা নিয়ে ভক্তটির সামনে বসলেন। স্বভাবত লজ্জাশীলা মায়ের মাথা সর্বদা ঘোমটায় ঢাকা। ভক্ত বললেন ঘোমটা না খুললে তিনি খাবেন না। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে মা তা-ই করলেন

এবং তাঁকে খাওয়াতে খাওয়াতে সস্নেহে বাড়ির খবরাখবর নিতে লাগলেন।[৮] আর এক যুবক-ভক্তকে মা দীক্ষা দিয়ে বললেনঃ ঠাকুরই গুরু—আমি গুরু নই, আমি মা, সকলের মা। যুবক-ভক্তটি তা মানবেন না, বললেনঃ তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি, তুমিই আমার গুরু। আর তুমি আমার মা হলে কি করে? আমার মা তো বাড়িতে আছে। মা বললেনঃ না, আমিই তোমার সেই মা। চেয়ে দেখ ভাল করে। যুবক-ভক্তটি স্পষ্ট দেখলেনঃ মায়ের শ্রীমূর্তির জায়গায় তাঁরই গর্ভধারিণী![৯]

মায়ের স্থূলশরীর ত্যাগের বেশ কয়েকবছর পরের ঘটনা। মঠে মায়ের মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভক্তিমতী মহিলা। একদৃষ্টে তিনি মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। সঙ্গে তাঁর শিশুকন্যা—সেও দেখছে মায়ের চিত্রমূর্তি। একটু পরে শিশুটি তাকায় নিজের মায়ের মুখের দিকে। মিলিয়ে দেখে সামনের চিত্রপটের সঙ্গে। তারপর প্রশ্ন করেঃ 'মা, এ ফটো তোমার কিনা বলো, ঠিক করে বলো এ ফটো তোমার কি না?' বার বার একই প্রশ্ন তার। শিশুর এই প্রশ্নের উত্তরে মহিলাটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন শুধু—'হ্যাঁ না' কিছুই বলতে পারলেন না। ঘটনাটি বর্ণনা করে স্বামী সারদেশানন্দ মন্তব্য করেছেনঃ '...শিশুর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সত্যই সত্য উদ্ভাসিত—এই মা-ই তো সকল মায়ের অন্তরে। মায়ের স্নেহদৃষ্টিতে কি ছিল, কে জানে—যাহার দিকে চাহিয়াছেন, সেই বশীভূত হইয়াছে। সন্তানের মতো এখনও দেখিতেছি তাঁহার চিত্রপটের দিকে চাহিয়া, ঐ দৃষ্টির সম্মুখে মানুষ আত্মহারা হইয়া পড়ে যেমন নিজ জননীর প্রতিচ্ছবি দেখিয়া!'[১০]

কিন্তু গর্ভধারিণী জননীর স্নেহ সত্য শুধু বর্তমান জীবনটুকু ধরে। আর এই যে 'সত্য জননী', তাঁর ভালবাসা সত্য হয়ে আছে চিরকালের জন্য। অন্যান্য দৈবী-সম্পদের কথা হিসাবে না এনেও বলা যায় শুধুমাত্র স্নেহের শক্তিতেও এই মা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে গর্ভধারিণী জননীর চেয়েও বড় হয়ে উঠেছেন। বাস্তবিক, মায়ের স্নেহ আস্বাদ করার পর অনেকেরই মনে হয়েছে যে, জন্মদায়িনী জননীর স্নেহও তার কাছে তুচ্ছ। জয়রামবাটীতে গিয়ে মায়ের স্নেহের স্পর্শ প্রথম পেয়ে জনৈক সাধুভক্তের মনে হয়েছিলঃ '...এমন অভাবনীয় ভালবাসা কি নিজের মাও বাসিতে পারেন? বাড়ির মাকে তো খুব ভালবাসিতাম, তিনিও কত ভাল-বাসিতেন, কিন্তু এ যে জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা! ...মায়ের কথা যাহা সামান্য শুনিয়াছিলাম, তাহাতে কে জানিত যে মা এইরূপ মা—এ রকম করিয়া মন প্রাণ কাড়িয়া লইয়া আপনার হইতেও আপনার করিয়া নিবেন।'[১১]

সন্ন্যাসী-সন্তানদের জন্য মায়ের ভালবাসার অন্ত ছিল না। তাঁদের কখনও মা সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতেন না, পূর্বাশ্রমের নামে ডাকতেন। বলতেনঃ 'আমি মা কিনা, সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে।'[১২] মায়ের একজন সন্ন্যাসী-সেবক বর্ণনা

করেছেন মাতৃস্নেহের একটি অপরূপ চিত্রঃ জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির কাছেই বাঁড়ুজ্যে-পুকুর, কিছু দূরে আমোদর নদ। জয়রামবাটীর সবাই ঐ বাঁড়ুজ্যে-পুকুরের জলই স্নান এবং খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে। ঐ সন্ন্যাসী-সেবক রোজ আমোদরে স্নান করতে যান। নদীর ধারে বালির স্তূপ কিছুটা সরালেই বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ জল পাওয়া যায়। সেবক একদিন ভাবলেন মাকে ঐ জল এখন থেকে খাওয়াবেন। কারণ, বাঁড়ুজ্যে-পুকুরের জলের চেয়ে ঐ জল অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর। স্নানের সময় তিনি একটা কলসি নিয়ে এলেন এবং সেই কলসিতে জল নিয়ে মাকে দিলেন। সেবক ভেবেছিলেন, মা জল দেখে খুশী হবেন। মা কিন্তু উলটে সেবককে বকতে লাগলেনঃ 'কে তোমাকে জল আনতে বলেছে? আমি তোমাকে জল আনতে বলিনি। আমি বাঁড়ুজ্যে-পুকুরের জল খাই, বাঁড়ুজ্যে-পুকুরের মিষ্টি জল। তোমাকে জল আনতে হবে না।' কিন্তু সেবক লক্ষ্য করলেন মা বিরক্ত হলেও ঐ জলই ব্যবহার করছেন। তাই পরদিনও স্নান করতে গিয়ে মায়ের জন্য ঐ জল নিয়ে এলেন। মা সেদিন আরও রেগে গেলেন। বললেনঃ 'কেন তুমি জল আনলে? কে তোমাকে জল আনতে বলল? আমি তোমাকে নিষেধ করছি, তবুও তুমি জল আনছ? বাঁড়ুজ্যে-পুকুরের মিষ্টি জল আমি খাই। আমি বারণ করলেও তুমি শুনবে না? ...জল আনতে হবে না।' সেবক লক্ষ্য করলেন, মা সেদিনও তাঁর আনা জলই ব্যবহার করছেন। তৃতীয় দিন জল আনার পর মা সেবককে আরও বকলেন। সেবক এ দুদিন মায়ের তিরস্কারের উত্তরে কিছুই বলেননি। আজ কিন্তু তিনি অভিমানভরে বললেনঃ 'আমি নদীতে স্নান করতে যাই, আপনার জন্য জল আনব। আপনি ইচ্ছে হয় খাবেন, ইচ্ছে না হয় খাবেন না। আমি জল আনবোই।' শ্রীমার সব রাগ সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেল। সস্নেহে কোমল স্বরে বললেনঃ 'দেখ বাবা, জল আনছ, তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছি এবং জল ভালও। তবে অতদূর হতে জল আনতে তোমার কষ্ট হবে বলে তোমায় নিষেধ করেছিলাম।'[১০] মায়ের কথা শুনে সেবক অভিভূত। মায়ের আপাতকঠোরতার পিছনে তাঁর জন্য কতটা উদ্বেগ ও চিন্তা কাজ করেছে, তা তিনি ভাবতেও পারেননি। মায়ের সেবাগ্রহণে কুণ্ঠিত আর এক সন্ন্যাসী-সন্তানকে মা একবার বলেছিলেনঃ 'আমি তোমার আর কি করেছি? মার কোলে ছেলে বাহ্যে করে, কত কি করে! তোমরা দেবের দুর্লভ ধন।'[১৪] মা জানতেনঃ এই সন্ন্যাসী-সন্তানরা সেই 'রত্ন' শ্রেণীভুক্ত—যাঁদের কথা ঠাকুর বলে গিয়েছিলেন।

মায়ের কাছে যেসব ভক্ত আসতেন, তাঁরা গৃহীই হোন বা সন্ন্যাসীই হোন, তাঁদের খাওয়া হয়ে গেলে মা নিজেই তাঁদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতেন। বাড়ির স্ত্রীলোকেরা অনুযোগ করে বলতেনঃ 'তুমি বামুনের মেয়ে ; আবার গুরু—এরা তোমার শিষ্য। তুমি এদের এঁটো নাও কেন? এতে যে এদেরই অমঙ্গল হবে।' মা সহজভাবেই উত্তর দিতেনঃ 'আমি যে মা গো! মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?'[১৫] মাকে

এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে দেখে আর একদিন নলিনীদিদি বলেছিলেনঃ 'মাগো, ছত্রিশ জাতের এ'টো কুড়ুচ্ছে!' মা বলেছিলেনঃ 'সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?'[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ ভক্তের কোন জাত নেই। তারা সব এক গোষ্ঠীর মানুষ। শ্রীমার কাছে তাঁর 'ছেলেমেয়েদের'ও কোন জাত ছিল না—তারা ভক্ত হোক কিংবা অভক্তই হোক। তাই তিনি 'সতেরও মা, অসতেরও মা', 'সতীরও মা, অসতীরও মা'।[১৭] ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ তাঁর যতটা স্নেহের অধিকারী ঠিক ততটা স্নেহই পেয়ে থাকে সকলের ভয় ও ঘৃণার পাত্র ডাকাত আমজাদ। ঠাকুরের শরীর থাকাকালীন ঘটনা। শ্রীমা প্রতিদিনকার মতো ঠাকুরের ভাতের থালা নিয়ে নহবত থেকে ঠাকুরের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় একজন মহিলা মাকে বললেনঃ 'দিন মা, আমায় দিন।' মহিলাটি ঠাকুরের ভাতের থালা নিয়ে ঠাকুরের সামনে রেখে চলে গেলেন। ঠাকুর সেই ভাত স্পর্শ করতে পারলেন না—কারণ, সেই মহিলাটি শুদ্ধ স্বভাবের ছিলেন না। ঠাকুর মাকে বললেনঃ 'আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল?' শ্রীমা কিন্তু করজোড়ে যেকথা উচ্চারণ করলেন, তা অভাবনীয়ঃ 'তা তো আমি পারব না ঠাকুর! ...আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।'[১৮]

জনৈক যুবক-ভক্ত মায়ের কাছে এসে একদিন বলছেনঃ 'সত্যই আমি এত সব অন্যায় কাজ করেছি যে, লজ্জায় তোমার কাছেও বলতে পারি না।' মা স্নেহভরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেনঃ 'মায়ের কাছে ছেলে—ছেলে।'[১৯] সম্ভ্রান্ত বংশের এক মহিলা কোন এক সময়ে বিপথে গিয়ে পরে অনুতপ্ত হন। উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে এসে মায়ের কাছে নিজের সব অন্যায়ের কথা নিবেদন করে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেনঃ 'মা, আমার উপায় কি হবে? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্যা নই।' শ্রীমা মহিলাটির গলা জড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'এস, মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও—ভয় কি?'[২০] একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা এনে বললঃ 'মা, ঠাকুরের জন্য এইগুলি এনেছি, নেবেন কি?' মা বললেনঃ 'খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বই কি?' জনৈক স্ত্রীভক্ত বলে উঠলেনঃ 'ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?' মা সে কথায় কর্ণপাত না করে কলাগুলি নিলেন এবং মুসলমানটিকে জলখাবার দিলেন। সে চলে গেলে মা স্ত্রীভক্তটিকে গম্ভীরভাবে বললেনঃ 'কে ভাল, কে মন্দ আমি জানি।'[২১]

মায়ের মাতৃলীলার চিত্রটি সম্পূর্ণ করতে আমজাদের ভূমিকা বড় কম নয়। এই রোগা, কালো মুসলমান তুঁতে ডাকাতটি জেলফেরত সোজা মায়ের কাছে আসত—তাঁর কাছে বসে সুখদুঃখের গল্প করত। মায়ের জন্য নিয়ে আসত বাগানের আনাজ-

পাতি। শ্রীমা একবার জয়রামবাটীতে জ্বরে শয্যাগত। অনেকেই এসে মায়ের খোঁজ-খবর করছে। একদিন সকালবেলায় মায়ের সেবায় রত ব্রহ্মচারী দেখলেন একটি ছিন্নবসন শীর্ণকায় বিষণ্নবদন লোক নিঃসঙ্কোচে মায়ের বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। লোকটি ব্রহ্মচারীর অপরিচিত। কিন্তু বেশ বোঝা গেল যে, মায়ের কাছে তার যাতায়াত আছে। লোকটি উঠোন থেকে মায়ের ঘরের ভিতর উঁকি দিতেই মা সস্নেহে বললেনঃ 'কে বাবা, আমজাদ? এস।' আমজাদ খুশী মনে মায়ের ঘরের বারান্দায় উঠে এল এবং দরজার কাছে বসে মায়ের সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগল। সারাদিন মায়ের বাড়িতে থেকে যখন আমজাদ বাড়ি ফিরছে তখন তার সম্পূর্ণ অন্য চেহারা। সে স্নান করেছে, গায়ে মাথায় তেল মেখেছে, পেট ভরে খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে চলেছে। চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ। হাতে এক শিশি কবিরাজী তেল—মা তাকে দিয়েছেন, গরম ওষুধ খেয়ে রাতে তার ঘুম হয় না বলে।[২২]

একবার বেশ কিছুদিনের ব্যবধানে আমজাদ এসেছে মায়ের কাছে। সঙ্গে বাড়ির গাছের একঝুড়ি লাউ। মা বললেনঃ 'অনেক দিন ভাবছিলুম তুমি আস নি কেন? কোথায় ছিলে?' আমজাদ নিঃসঙ্কোচে জানালঃ সে গরু চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল, তাই এতদিন আসতে পারেনি। মা সহানুভূতির সুরে বললেনঃ 'তাই তো ভাবছিলুম, আমজাদ আসে না কেন!'[২৩]

মায়ের স্নেহ পেলেও আমজাদ চুরি-ডাকাতি কখনও ছাড়েনি। মা কিন্তু সব জেনেও তাকে বরাবরই স্নেহ করতেন। একদিন মা আমজাদকে তাঁর ঘরের বারান্দায় খেতে বসিয়েছেন। নলিনীদিদি উঠোন থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে পরিবেশন করছেন। মা দেখে বলে উঠলেনঃ 'অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস, আমি দিচ্ছি।' খাওয়া শেষ হলে মা এঁটো জায়গা নিজেই ধুয়ে দিলেন। নলিনীদিদি বললেনঃ 'তোমার জাত গেল।' সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সেই অপূর্ব উত্তরঃ 'আমার শরৎ [স্বামী সারদানন্দ] যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।'[২৪]

সমাজে যারা অবহেলিত কিংবা নিজকৃত অপরাধের জন্যই লোকের চোখে হেয়, মায়ের স্নেহ থেকে তারাও বঞ্চিত হত না। কারণ, মায়ের ভালবাসায় ভালবাসার পাত্রের দোষ-গুণের হিসাব কখনও স্থান পেত না। তাই মাতাল পদ্মবিনোদ যখন প্রতি রাতে এসে মায়ের জানালার নীচে দাঁড়িয়ে গান ধরেন 'ওঠ গো করুণাময়ি, খোল গো কুটির দ্বার'—মা তাঁকে দর্শন না দিয়ে পারেন না।[২৫] কিংবা গ্রামের এক বাল-বিধবা যখন ক্ষণিকের ভুলে গায়ে কলঙ্ক মেখে বসে, তখন সারা গ্রাম নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেও মা নীরবে প্রার্থনা জানিয়ে যান যাতে ভগবান 'দুঃখিনী'র দিকে মুখ তুলে চান। দৈবক্রমে মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত এক জমিদার-সন্তান ঘটনাটির মিটমাট করে দিলে মা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেনঃ 'বাবা! দুঃখিনীকে বাঁচিয়ে দিয়েছ, রক্ষা করেছ, শুনে আমার প্রাণ ঠান্ডা হয়েছে। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।' স্বামী সারদেশানন্দ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেনঃ 'যাহাদের আমরা অতি অধম বলিয়া ঘৃণা

করি, তাহাদেরও ভালবাসিয়া তাহাদের বিপদের সময় এই সমবেদনা, এই অপার স্নেহ জগজ্জননী ছাড়া, "জন্ম-জন্মান্তরের মা", "সতেরও মা, অসতেরও মা" ছাড়া আর কে দেখাইতে পারে!'[২৬] শ্রীমা সত্যিই পারতেন, পাপকে ঘৃণা করেও 'পাপী'কে কোলে টেনে নিতে।

শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসা যেমন পাত্র-অপাত্র নির্বিশেষে সমানভাবে প্রবাহিত হত, অপরদিকে মায়ের প্রতিটি সন্তানও অনুভব করতেন, মা যেন তাঁকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। জনৈক ভক্ত মায়ের বাড়িতে এসে প্রসাদ পাচ্ছেন। একই সঙ্গে খেতে বসেছেন আরও জনা পনেরো ভক্ত। মা নিজে পরিবেশন করছেন সবাইকে। ভক্তটির মনে হয়ঃ এত জন ভক্তের মধ্যে মা যেন তাঁকেই সবচেয়ে বেশী যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন। কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে অন্য ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে জানলেন যে, প্রত্যেকেরই মনে হয়েছে যে মা তাঁকেই বেশী যত্ন করেছেন।[২৭]

একদিন ঘাটাল থেকে একদল লোক পদব্রজে এসেছে উদ্বোধনে মাতৃদর্শনে। অতি দীনহীন বেশ, অমার্জিত রুক্ষকেশ। দেখে মনে হয়, তারা একেবারেই নিঃসম্বল। মায়ের কথা লোকমুখে শুনে বড় আশা করে তারা এসেছে মাতৃদর্শনে। কিন্তু এসে দেখে যে, মাতৃভবনের দরজা বন্ধ। এদিকে মা ঠিক সেই সময়ই কি প্রয়োজনে দোতলার বারান্দায় এসে দেখেন—সামনের খোলা মাঠে বহু লোক তাঁরই দিকে চেয়ে বসে আছে। মাকে দেখে তারা বলে উঠলঃ 'আজ্ঞে মা, আমরা বহুদূরদেশ থেকে এসেছি, জগজ্জননীর দর্শন কি মিলবে?' মা সেবককে বললেনঃ 'ওদের নিয়ে এসো। আহা, ওরা কতদূর থেকে এসে বসে আছে।' সেবকটি সঙ্কুচিত চিত্তে বললেনঃ 'মা, ওরা-যে এক পঙ্গপাল, আর ভারী নোংরা! আপনি ওদের ভেতরে আসতে বলছেন?' ব্যথিত হয়ে মা বললেনঃ 'পৃথিবীর সবাইকে আমি দেখা দিচ্ছি, আর কত কষ্ট করে ওরা এসেছে, ওদের দেখা দেবো না! নিয়ে এসো ওদের। বাইরে নোংরা হলে কি হবে বাবা, ওদের ভেতরটা পরিষ্কার।' লোকগুলি ভেতরে এল। মায়ের অনাস্বাদিত-পূর্ব স্নেহের মাধুর্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করে তাদের শ্রান্ত ধূলিমলিন মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেদিন ঠাকুরের ভোগের জন্য একজন ভক্ত প্রচুর পান্তুয়া ও সিঙাড়া পাঠিয়েছিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করে মা সেইসব তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। মায়ের স্নেহ-করুণার স্পর্শ পেয়ে সেই দরিদ্র নিঃস্ব সন্তানরা মর্মে মর্মে অনুভব করলঃ ইনি সত্যিই দীনদুঃখীর মা, তাদের করুণাময়ী জননী।[২৮]

আর একদিনের চিত্র। জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ি। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। তাই সময়টা সকালবেলা হলেও চারদিক প্রায় অন্ধকার। দেখা গেল, খিড়কি দিয়ে মা বাড়িতে ঢুকছেন—মাথায় একটা ঝুড়িতে কিছু শাকসবজি। কয়েকজন ভক্ত এসেছেন বাড়িতে—তাঁদের জন্য মা স্বয়ং গ্রাম থেকে শাকসবজি সংগ্রহ করে মাথায় করে বয়ে এনেছেন।[২৯]

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেনঃ ছোট ছোট ঘটনাতেই মানুষের চরিত্রমাহাত্ম্য বেশী ফুটে ওঠে। মায়ের মাতৃরূপটিও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে এইরকম অসংখ্য প্রাত্যহিক ঘটনায়। উদ্বোধনে মায়ের কাছে এসেছেন এক মহিলা-ভক্ত। সঙ্গে তাঁর শিশু-

কন্যা। কন্যাটি মায়ের কম্বলে মায়ের কাছে শুয়ে ছিল—একসময় কম্বলটি নোংরা করে ফেলে। মহিলা-ভক্ত স্বভাবতই অত্যন্ত অপ্রস্তুত। কিন্তু মা শুধু যে কিছু মনেই করলেন না, তা-ই নয়—নিজে সেই কম্বল ধুয়ে দিতে চললেন। মহিলাটি আপত্তি করে বললেনঃ 'মা, তুমি কেন ধোবে?' মা সংক্ষেপে প্রাণস্পর্শী ভাষায় উত্তর দিলেনঃ 'কেন ধোব না? ও কি আমার পর?'[৩০] জনৈক যুবক-সন্তান ডান হাতের আঙুল কেটে ফেলেছেন—বাঁ হাতে চামচ দিয়ে অতি কষ্টে খাচ্ছেন। মা দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না, নিজে হাতে তাঁকে খাইয়ে দিলেন। শুধু সেদিনই নয়, যতদিন না তাঁর হাত সম্পূর্ণ সারল সেই যুবক-সন্তানটি প্রতিদিন মায়ের কাছে বসে শিশুর আনন্দে মায়ের হাত থেকে খেতেন।[৩১]

জয়রামবাটীর কয়েক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ময়নাপুর গ্রাম। সেখান থেকে অক্ষয়-মাস্টার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন) ভাল ঘি পাঠিয়েছেন মায়ের জন্য। ঘি নিয়ে এসেছে ময়নাপুর গ্রামের একটি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী স্ত্রীলোক—বয়সে প্রায় বৃদ্ধা। বেলা পড়ে আসায় মা স্ত্রীলোকটিকে বললেন, সেদিনটা সেখানেই থেকে যেতে। রাতে তার শোবার ব্যবস্থা হল মায়ের ঘরের বারান্দায় দরজার পাশেই। স্ত্রীলোকটি ম্যালেরিয়া রোগী, তার ওপর আগের দিনের পরিশ্রমে রাতে জ্বরও এসেছিল। পরদিন রোজকার মতো খুব ভোরে উঠে মা দেখলেন, স্ত্রীলোকটি অসাড়ে বিছানা নোংরা করে ফেলেছে—অথচ তখনও সে ঘুমে আচ্ছন্ন। মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন—সকালে জানাজানি হলেই সবাই স্ত্রীলোকটিকে তিরস্কার করতে থাকবে, তার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকবে না। তাই মা ধীরে ধীরে মেয়েটিকে জাগালেন, তার হাতে জলখাবারের জন্য মুড়িগুড় বেঁধে দিয়ে বললেনঃ 'মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে রোদে কষ্ট হবে না।' স্ত্রীলোকটি চলে গেলে কেউ ঘুম থেকে ওঠবার আগেই মা নিজে সব পরিষ্কার করে ফেললেন।[৩২] কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

মায়ের জন্য ভক্তেরা যেসব জিনিস নিয়ে আসতেন তা যদি অতি সামান্য হয়, তাতেও মায়ের আনন্দ। কয়েকজন দরিদ্র চাষী দূরের গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে মাথায় করে বয়ে এনেছে নিজেদের হাতে ফলানো শাক-তরকারি। প্রাণের সাধ সেসব দিয়ে মায়ের সেবা করেন, কিন্তু মনে সঙ্কোচঃ মাকে কত লোকে কত ভাল ভাল জিনিস দেয়, এইসব সামান্য জিনিস মা কি নেবেন? মায়ের বাড়িতে পেঁৗছে তাদের সব ভয়-সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়। মা সাগ্রহে সব গ্রহণ করে নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।[৩৩] আর একবার এক দরিদ্র ভক্ত মোটা কাপড় এনেছে মায়ের জন্য। তারও মনে স্বাভাবিক সঙ্কোচ। মা কিন্তু পরম সমাদরে সেই কাপড় গ্রহণ করে বলছেনঃ 'বাবা, এই আমার গরদ, ক্ষীরোদ, নীরদ।'[৩৪] শ্রীমা বলতেনঃ 'জিনিসের কি আর দাম! যে দেয় তার প্রাণের টান, ভক্তিই তো দেখতে হয়।'[৩৫] তাই যে-মা বহু মূল্যবান জিনিসের দিকে লক্ষ্যও করতেন না, তিনিই আবার ভক্তের দেওয়া অতি তুচ্ছ জিনিস পেয়েও

এত আনন্দ প্রকাশ করতেন যে, 'মনে হত কোন শিশু যেন পুতুল কিংবা মোয়া' পেয়েছে।

এক ভক্ত অনেক কষ্ট করে দূরদেশ থেকে সরু সুগন্ধি চাল আনিয়েছেন মায়ের জন্য। পরে একজন ভক্তিমতী মহিলাকে দিয়ে সেই চালের ভাল পিঠে তৈরী করিয়েছেন মাকে খাওয়ানোর জন্য। সেই পিঠে নিয়ে যখন জয়রামবাটী রওনা হচ্ছেন, তখন বিকাল হয়েছে। রওনা হওয়ার মুখে জনৈক ব্রাহ্মণ ভক্ত তাঁকে মনে করিয়ে দিলেনঃ মা ব্রাহ্মণের বিধবা, রাতে চালের জিনিস তিনি মুখে দেবেন না। ভক্তটির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সত্যিই তো! একথা তো তাঁর আগে মনে হয়নি। এত পরিশ্রম, এত আশা সব বুঝি বৃথা গেল। যাইহোক, তিনি ঠিক করলেন—মায়ের উদ্দেশ্যে তৈরী জিনিস মায়ের পায়ে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করবেন। গ্রহণ করতে হয় তিনিই গ্রহণ করবেন, ফেলতে হয় তিনিই ফেলবেন। জয়রামবাটী যখন পেঁছিলেন তখন সন্ধ্যে। মা কিন্তু সব দেখে ও শুনে খুব প্রসন্নভাবে বললেনঃ 'বাবা! মুখে দেব বইকি! তুমি এতদূর থেকে বয়ে নিয়ে এসেছ, কত কষ্ট করে তৈরী করিয়েছ, আর একজন দূরদেশ থেকে কষ্ট করে পাঠিয়েছে। রাত্রে ঠাকুরকে দিয়ে মুখে দেব। তুমি এজন্য চিন্তা করো না।' উপস্থিত একজন সন্তানকে লক্ষ্য করে মা হাসিমুখে বললেনঃ 'ছেলেদের জন্য আমার কোন নিয়মকানুন ঠিক থাকে না।'[৩৬] অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে মা একবার বলেছিলেনঃ 'ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি।'[৩৭] নিরন্তর মায়ের অন্তরে তাঁর জগৎজোড়া ছেলেদের কল্যাণকামনা প্রবহমান ছিল বলেই জনৈক চিকিৎসকের স্ত্রী যখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন স্বামীর উপার্জনের উন্নতির জন্য, মা পারলেন না সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করতে। বললেনঃ 'বউমা, এমন আশীর্বাদ করব আমি—লোকের অসুখ হোক, কষ্ট পাক? তা তো আমি পারব না, মা! সব ভাল থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক।'[৩৮] নিত্য স্নানের পরও তাঁর মুখে উচ্চারিত হত ঐ প্রার্থনাঃ 'মা জগদম্বে, জগতের কল্যাণ কর।'[৩৯]

মায়ের এই 'জগতে'র বহির্ভূত নয় গৃহপালিত পশু পাখী জীবজন্তুও। পোষা চন্দনা 'গঙ্গারাম' সকলের মতো তাঁকে ডাকতঃ 'মা, ও মা।' মা-ও উত্তর দিতেনঃ 'যাই বাবা, যাই।'[৪০] এই বলে পাখীকে ছোলা-জল দিয়ে আসতেন। কারণ পাখীর মাতৃ-সম্বোধনের অর্থই হল, তার খিদে পেয়েছে! বেরাল মায়ের স্নেহযত্নে বংশবৃদ্ধি করত নির্ভয়ে। অন্যেরা বেরালের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত। তাদের খুশী করতে মা মাঝে মাঝে ছদ্ম কোপে লাঠি তুলে নিতেন হাতে। কিন্তু ভীত বেরাল আশ্রয় নিত মায়েরই পায়ে। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ফেলে দিতেন।[৪১] জয়রামবাটীতে দেখা যেত, গো-বৎসের হাম্বা হাম্বা ডাকে মা ছুটে গিয়ে তার বন্ধন মোচন করছেন,[৪২] কখনও বা যন্ত্রণাকাতর গো-বৎসকে দু-হাতে জড়িয়ে তার ব্যথার স্থান আরাম করছেন![৪৩] জনৈক সাধু যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'তুমি কি সকলেরই মা?...এই সব ইতর জীবজন্তুরও?' —মা উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'হ্যাঁ, ওদেরও।'[৪৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর লীলাবসানের আগে শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ 'কলকাতার লোক-গুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল্‌বিল্‌ করছে। তুমি তাদের দেখো।'[৩৫] ভক্ত-জননী তাই অধিকাংশ দিন কাটান কলকাতার উদ্বোধনে ও পল্লীগ্রাম জয়রামবাটীতে। কলকাতার মানুষ এই দুই স্থানেই এসেছে তাঁর কাছে নানান চাহিদা নিয়ে। প্রকৃত জ্ঞান-বৈরাগ্যের চেয়ে একটু শান্তি, স্নেহ ও ভালবাসার আশাতেই মানুষ ভিড় জমাত বেশী। অধিকাংশই আর্ত ও অর্থার্থী। মা তাদের সব বাসনা পূর্ণ করেও প্রকৃত-পক্ষে অপার্থিব স্নেহে তাদের বাসনামুক্ত করেছেন। কাচের সন্ধানী ধন্য হয়েছে বহুমূল্য রত্নলাভে। ভক্তদের নানারকম প্রকৃতি। কখনও কখনও তাদের ভক্তির উচ্ছ্বাস পাগলামিরই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। কেউ এসে হয়তো মায়ের পায়ে মাথা ঠুকে দিল খুব জোরে।[৪৬] কেউ বা মায়ের বুড়ো আঙুল কামড়ে দিল প্রণাম করবার সময়—উদ্দেশ্য, মা তাকে মনে রাখবেন।[৪৭] কেউ হয়তো প্রণাম করতে এসে দীর্ঘ প্রাণায়াম-ন্যাস করে পুজো শুরু করে দিল মায়ের![৪৮] খেয়ালই নেই যে সর্বাঙ্গ মোটা চাদরে আবৃতা মা গরমে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছেন। মা এইসব ভক্তির উপদ্রব সহ্য কর-তেন হাসিমুখে, প্রতিদিন প্রাণভরা আকুতি নিয়ে অপেক্ষা করতেন ভক্তদের জন্য। মাঝে মাঝে শোনা যেত মায়ের অনুচ্চস্বরে আন্তরিক আহ্বানঃ 'ছেলেরা তোরা আয়।'[৪৯] তাই কোন দিনটিই কৃপাবর্জিত হত না, কোন না কোন সন্তান জননীর আকর্ষণে এসে উপস্থিত হত। অনেক অশুদ্ধচিত্ত ভক্ত এসে মাকে প্রণাম করে, তাদের স্পর্শে মায়ের শরীরে অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণা হয়। কিন্তু পাছে এই ধরনের ভক্তদের তাঁকে প্রণাম করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, সেই আশঙ্কায় মা সেবকদের নিষেধ করে দেন তাঁর কষ্টের কথা স্বামী সারদানন্দকে বলতে।[৫০] ভক্তদের জন্য মায়ের এই কষ্ট দেখে গোলাপ-মা একবার অভিযোগ করেছিলেনঃ 'তোমার যেমন হয়েছে—যে আসবে মা বলে, অমনি পা বাড়িয়ে দেবে!' মায়ের উত্তরঃ 'কি করব, গোলাপ? মা বলে এলে আমি যে থাকতে পারি নে।'[৫১]

মা ও সন্তানের স্নেহবিনিময়ে ভাষার প্রয়োজন হয় না। তাই ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীরও তাঁর কৃপাগ্রহণে কোন বাধা হয়নি। দক্ষিণভারতে ঘরভর্তি লোক—মায়ের মৌনব্যাখ্যান। ভক্তেরা তৃপ্ত, তাদের অন্তর মাতৃস্নেহ-আস্বাদে ভরপুর। ব্যাঙ্গালোরে মা গবিপুরের 'কেভ্‌ টেম্পল' দর্শন করে এসে দেখলেন আশ্রমের বিরাট প্রাঙ্গণ লোকে ভর্তি—ভক্তেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। মায়ের গাড়ির শব্দ শুনেই সবাই উঠে দাঁড়াল, আবার পরক্ষণেই একযোগে সকলে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। এই দৃশ্য দর্শনে অভিভূতা মা সেখানেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন এবং অভয়মুদ্রায় চিত্রার্পিতের মতো স্থির হয়ে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাষার কোন প্রয়োজন রইল না। নৈঃশব্দ্যই বাঙ্ময় হয়ে উঠল শতগুণে। সন্তান চিনে নিল মাকে, অনুভব করল দিব্য মাতৃস্নেহের অনুপম স্পর্শ।[৫২] মায়ের এই অপার্থিব

স্নেহের প্রকৃতি কিছুটা অনুধাবন করেই ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও লিখেছিলেনঃ 'মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই; তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো।'[৫৩]

বস্তুত, সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির বিদেশী সন্তানরাও পলকে মাকে চিনে নিত আপন করে। বাগবাজারে একবার একটি অপরিচিতা বিদেশী মহিলা মাকে দর্শন করতে আসেন। মা প্রথমে পাশ্চাত্যরীতি অনুযায়ী হাত বাড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, পরে তাঁর মুখে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। মেমটি এসেছেন তাঁর অসুস্থা কন্যার জন্য মায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। মা বললেনঃ 'আমি প্রার্থনা করব তোমার মেয়ের জন্যে—ভাল হবে।' বিদেশিনী মায়ের একথায় খুব আশ্বস্ত হলেন, পরিষ্কার বাংলায় বললেনঃ 'তবে আর ভাবনা নাই। আপনি যখন বলিতেছেন, "ভাল হইবে" তখন ভাল হইবেই—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।' মা তাঁকে একটি পদ্মফুল দিয়ে বললেন তাঁর মেয়ের গায়ে বুলিয়ে দিতে। মহিলাটি সেই আশীর্বাদী ফুল অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। পরে তাঁর মেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। মা মেমটিকে কৃপা করে দীক্ষাও দিয়েছিলেন।[৫৪]

স্বামীজীর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও ধর্মভাবে আকৃষ্ট হয়ে, যাঁরা বিদেশী হলেও ভারতবর্ষকে ভালবেসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁদের মধ্যে নারীদের ভূমিকাই অধিক। বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, আভিজাত্যে, আত্মমর্যাদায় ও স্বাতন্ত্র্যবোধে তিনটি রত্ন—পাশ্চাত্যের তিন রমণী—এদেশে পদার্পণ করেন। স্বামীজীর উদ্বেগ ছিল—হিন্দুসমাজ এই মহিলাদের কিভাবে গ্রহণ করবে। জাতিভেদ, আচার ও সংকীর্ণতার বেড়াজালে ঘেরা এই রক্ষণশীল সমাজের প্রবেশপথ এঁদের সামনে রুদ্ধ হবে না তো? তখন নিশ্চয়ই তাঁর মানসপটে উদিত হয়েছিল—শ্রীশ্রীমার কথা। মা স্বয়ং সংস্কারমুক্ত চিত্তে, দ্বিধাহীনভাবে সন্তানকে বিদেশযাত্রায় উৎসাহিত করেন, পাঠান আশীর্বাণী। তাঁরই প্রসাদে বিজয়ী সন্তান প্রত্যাগত। জননীর প্রাঙ্গণের স্নেহদ্বার দিয়েই ছাড়পত্র পেতে পারে এই বিদেশিনীরা। সেখানের গ্রহণই সমাজের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করবে, সেইসঙ্গে হিন্দুনারীর জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভও ঘটবে তাঁদের। স্বামীজী স্বয়ং নিবেদিতা, মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে নিয়ে মায়ের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হন। প্রথম দর্শনেই সমস্ত সামাজিক বন্ধন ও সংস্কার দূরে ঠেলে দিয়ে আপন কন্যার মতো সাদরে তিনি তাঁদের গ্রহণ করেন। তাঁর এই স্নেহ, মাধুর্য ও উদারতায় পাশ্চাত্যবাসিনীগণ একান্ত মুগ্ধ ও অভিভূত হন। নিবেদিতা লিখছেনঃ 'আচারবিচারে বরাবরই রক্ষণশীল—সব কিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি বিদেশী মেয়ে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁর কাছে এলেন। এঁদের সঙ্গে তিনি খেলেন পর্যন্ত! ...এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত

না।'[৫৫] মায়ের এই উদারতা স্বামীজীকে কি পরিমাণ বিস্মিত ও উল্লসিত করে তার প্রমাণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা তাঁর পত্রঃ 'শ্রীমা এখানে আছেন। ইওরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন! ...ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?'[৫৬] সত্যই তৎকালীন সমাজের কথা চিন্তা করলে এটি অসীম দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু কোন অলৌকিক শক্তিবলে মানব-মনবুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে এ ঘটনা ঘটেনি। মায়ের অন্তরে যে সন্তানস্নেহের উৎসার অনুক্ষণ দুর্বার, তার কাছে অন্য যে-কোন সামাজিক বিচারই সব সময় কুটোর মতো ভেসে যেত—হয়তো মায়েরও অজ্ঞাতসারে। এক্ষেত্রেও তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল শুধু। মায়ের আত্মসন্তানবোধসম্ভূত এই অপার স্নেহ বিদেশিনীদের কি পরিমাণে উদ্বেল করত তা পরবর্তীকালে তাঁদের পত্রে ও আচরণেই মুদ্রিত হয়েছে। মায়ের এই 'তিন কন্যাই' তাঁর সাক্ষাৎকারের দিনটি পবিত্র স্মৃতির মতন রক্ষা করেছেন। আমেরিকার অতি সম্ভ্রান্ত বংশজাতা মিসেস বুল শ্রীমার সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে লিখছেনঃ 'আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদাদেবীকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছি। তিনি "আমার মেয়েরা" বলে আমাদের গ্রহণ করলেন। ...আমাদের একেবারেই অপরিচিতভাবে দেখলেন না। ...দারিদ্র ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ, কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।'[৫৭] সদাশয়া এই মহিলাকে স্বামীজী কখনও 'মা' কখনও 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ভাষাবিনিময় না ঘটলেও ভাবের বিনিময়ে তাঁর হৃদয় মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ হয়। তাই ফিরে যাবার আগে মায়ের একটি ফটো নিয়ে যেতে ব্যাকুল হন। তারই ফলশ্রুতি মায়ের জীবনের প্রথম তিনটি আলোকচিত্র যার একটি আজ ঘরে ঘরে পূজিতা। মা স্বয়ং সেইকথা উল্লেখ করে বলছেনঃ 'সারা মেম এসে এইটি উঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, "মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।" তাই শেষে এই ছবি উঠায়।'[৫৮] এই বিদেশিনীর আন্তরিক ভক্তির টানে মা অত্যন্ত লজ্জাশীলা হয়েও ইংরেজ ফটোগ্রাফারের সামনে বসে ফটো তোলেন। মার ঐ প্রতিকৃতির জন্য সকলেই আজ তাঁর (বুলের) কাছে কৃতজ্ঞ।

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ছিলেন নিউইয়র্ক সমাজের এক প্রতিপত্তি-সম্পন্না মহিলা এবং স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনিও যে প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীমাকে জগন্মাতারূপে অনুভব করেন, ভগিনী নিবেদিতার পত্রই তার প্রমাণ—'তুমিই এঁকে (সারদাদেবীকে) মা বলে ডাকতে শিখিয়েছ।'[৫৯] 'চিরমাতৃত্বের বিগ্রহরূপিণী'—এই মায়ের

দর্শন ম্যাকলাউডকে কি পরিমাণ আত্মহারা ও উদ্বেল করত তার একটি অপূর্ব চিত্র পাই স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থে। উদ্বোধনে শ্রীমাকে দর্শন করে ফিরছেন তিনি, অতিথিভবনের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন—সঙ্গী 'ব্রহ্মচারী আসিয়া শুনিলেন, তিনি আপনমনে থামিয়া থামিয়া অস্ফুটস্বরে ভাবের ঘোরে ইংরেজীতে বলিতেছেন, "আমি তাঁকে দেখেছি", "আমি তাঁকে দেখেছি"। অকস্মাৎ ব্রহ্মচারীকে নিকটে পাইয়া তিনি তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "পবিত্রতাস্বরূপিণী মা! আমি তাঁকে দেখেছি!" দুই শত গজ পথ তিনি ভাবের উল্লাসেই চলিলেন--কোথায় পা পড়িতেছে হুঁশ নাই, আর মাঝে মাঝে "মা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া দুই-একটি স্বগতোক্তি করিতেছেন।' [৬০]

এঁদের তিনজনের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতাই মায়ের অধিক সান্নিধ্যলাভ করেন। তাঁর বহু পত্রের মধ্যে শ্রীশ্রীমার স্নেহ ও ঐশী ভালবাসার যে-চিত্র তিনি অঙ্কন করেন, তা যেমন উচ্চ-ভাবময়, তেমনই অননুকরণীয় অনুভূতির গভীরতায়। মায়ের অনাড়ম্বর অথচ সহজ উদারতা, স্বচ্ছ বুদ্ধি, গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি চিনবার মতো দৃষ্টি তাঁর ছিল। তাই অনায়াসে লিখেছেনঃ '...তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।' [৬১] নেল হ্যামন্ডকে তিনি লিখছেনঃ 'শ্রীমাকে তোমার জন্য কিছু বলতে বললাম। তিনি তাঁর স্নেহ আর আশীর্বাদ জানালেন। তোমাকে নিজের মাতৃকারের মেয়ের মতো তিনি দেখেন।' [৬২] তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদেরও এই স্নেহের আস্বাদন করাতে ব্যাকুল। শ্রীমায়ের পূত সঙ্গের মূল্য কী গভীর ছিল তাঁর কাছে, তা ম্যাকলাউডকে লেখা পত্রের ছত্রে ছত্রে বিকীর্ণ। উভয়ের মধ্যে স্নেহনিবিড় সম্পর্কটি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মাতা-কন্যার যে-চিত্রখানি [৬৩] আজ আমরা দেখি তার দ্বারাই বোঝা যায়, মায়ের কাছে কী নমনীয়ভাবে বালিকার মতো বসে থাকতেন এই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা—স্বামীজী যাঁর সম্বন্ধে ভেবেছেন 'প্রকৃত সিংহিনী'। [৬৪] মায়ের দুই-একটি সেবা করতে তাঁর কী ব্যগ্রতাই না ছিল! মা-ও নিজের হাতে তাঁকে একটা পশমের পাখা করে দেন। মায়ের পবিত্র শান্ত জীবনযাত্রা, গভীর ধর্মভাব ও সর্বোপরি অনির্বচনীয় প্রশান্তি তাঁকে মুগ্ধ করত। মায়ের স্নেহের স্নিগ্ধসলিলে অবগাহনের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন তিনি। যখন পাশ্চাত্যে যেতেন তখনও মায়ের পবিত্র স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। লিখছেন বান্ধবীকেঃ 'শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মন-প্রাণ ব্যাকুল।' [৬৫] 'মা-ঠাকরুণ এসে গেছেন। তেমনি আছেন আমাদের মা। যখন তিনি এখানে থাকেন—আমাদের আশ্রয় থাকে।' [৬৬] মায়ের কাছে নিবেদিতা পেয়েছিলেন স্নেহ ও চিরন্তন আশ্রয়। মা-ও নিবেদিতাকে নিজের 'খুকি'র মতো দেখতেন। বিচারপ্রবণ এবং অসাধারণ বিদুষী নিবেদিতার অন্তর স্বামীজীকে গ্রহণ করতে গিয়ে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে,

মায়ের কাছে কিন্তু তিনি বালিকার মতো নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। মায়ের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সেই বিশ্বমাতৃত্ব যা গ্রহণে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচের উদয় পর্যন্ত হয়নি তাঁর মনে। ভারতে নিবেদিতার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতেও শ্রীশ্রীমা উপস্থিত হন ও আশীর্বাদ জানান। স্নেহধন্যা নিবেদিতা যেমন মাতৃ-অন্ত-প্রাণ ছিলেন, মায়ের হৃদয়েও এই কন্যার জন্য কী আন্তরিক টান ছিল তা নিবেদিতার দেহত্যাগের পর মায়ের অশ্রুসিক্ত উক্তিতেই স্পষ্ট। ক্রিস্টিনকেও মা খুবই স্নেহ করতেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের পর ক্রিস্টিন ও শ্রীমতী সুধীরাকে তিনি বলেনঃ 'আহা দুটিতে একসঙ্গে ছিল, এখন একলা থাকতে কত কষ্ট হবে! আমাদেরই তার জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার তো আরও বেশী হবে, মা। কি লোকই ছিল। তার জন্য আজ কত লোক কাঁদছে।'[৬৭] এই বলে মা নিজেও কাঁদতে থাকেন। নিবেদিতার প্রতিটি স্মৃতিই মায়ের কাছে প্রিয় ছিল। নিবেদিতাও 'যীশুমাতা সাক্ষাৎ মেরী'রূপেই তাঁকে ধারণা করেন। এই মাতৃ-মূর্তির চরণতলে নিবেদিতার বিদ্রোহী হৃদয়ও শান্ত ও নত হয়েছিল। অন্তরের সংশয় যুক্তিজাল—সকলই এই মাতৃস্নেহের প্লাবনে ভেসে গিয়ে শুধু ছিল অনাবিল নিষ্কলুষ স্নেহদৃষ্টি—যা নিবেদিতাকে সন্ধান দিয়েছে অনির্বচনীয় প্রশান্তির।

স্বদেশীযুগে পরাধীনতা ভারতে ইংরেজবিদ্বেষের সৃষ্টি করলেও স্বাধীন ভারত বিশ্বমৈত্রীস্থাপনায় অগ্রসর হয়েছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই মিলনের সূত্রও শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার সমাধিভঙ্গে মাকে বলেছিলেনঃ 'দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম —সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কি ভক্তি!'[৬৮] ঠাকুরের এই দর্শনের ভিত্তিতে মা আন্তরিকভাবেই '...তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে' বলে প্রতীক্ষা করতেন। মায়ের সর্বগ্রাসী মাতৃত্ব জাতিবর্ণের গন্ডি অতিক্রম করে ইংরেজ-দেরও সন্তান বলে গ্রহণে উন্মুখ ছিল। তাই স্বদেশীভাবাপন্ন কোন সন্তানকে তিনি অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেনঃ 'তারাও [অর্থাৎ ইংরেজরাও] তো আমার ছেলে।'[৬৯] ইংরেজ শাসনের কুফল সম্বন্ধে মা সচেতন ছিলেন, সে সম্পর্কে মা সক্রোধ উক্তিও করেছেন বিশেষ ঘটনার উপলক্ষে। কিন্তু স্বদেশ-বিদেশ, শত্রু-মিত্র প্রভৃতি যেসব 'বিশেষণ'-এর ভিত্তিতে জগতে ভেদ-বৈষম্য গড়ে ওঠে অনায়াসে, মা তাঁর 'সন্তানদের জগতে' সেই বিভেদের বিচারকে ঢুকতে দেননি কখনও।

শ্রীমায়ের উচ্ছ্বাসহীন বিশাল জননীত্ব, নীরব নিবিড় গভীর ঐশী বাৎসল্য আকর্ষণ করে এনেছিল দেশ-বিদেশের অগণিত সন্তানকে। শ্রীমায়ের মাতৃত্বের মধ্যে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখলাম, সেই স্নেহ প্রেম উদারতা অদোষদর্শিতা প্রভৃতির আংশিক বা বিচ্ছিন্ন প্রকাশ বিরল কোন মহীয়সী নারীচরিত্রে হয়তো দেখা যায়, কিন্তু এই সব বৈশিষ্ট্যগুলিই এমন সমষ্টিগতভাবে কোন একক চরিত্রে কখনই দেখা যায়নি, যেমনটি দেখা গেছে শ্রীমায়ের মধ্যে। স্বরূপত সারদাদেবী আদ্যাশক্তি। জগন্মাতার মানবীরূপ। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আদি জননীর

চরণে সমর্পণ করেছিলেন তাঁর জপের মালা, সাধনার সব ফল। তাই কোন লৌকিক মাতৃত্ব এই অপার্থিব ঈশ্বরীয় মাতৃত্বের তুলনা হতে পারে না। শ্রীমায়ের মাতৃত্ব একটি সমষ্টি-মাতৃরূপ—জাগতিক প্রতিটি মাতার মাতৃত্ব বস্তুত সেই অখণ্ড মাতৃত্বের আলোকেই আলোকিত। মানুষের সমস্ত কল্পনা ও ধারণাকে অতিক্রম করে জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় হয়ে আছে এই 'নিখিল-মাতৃহৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মূরতি।'

এই সজীব জগজ্জননীর অন্তরে সন্তানের মঙ্গলচিন্তা কী অকৃত্রিমভাবে সর্বদা জাগ্রত থাকত তা বোঝা যায় যখন পাগলীমামীর মুখে 'সর্বনাশী' অপবাদ শুনে 'পৃথিবীর মতো সহ্যশীলা' মা-ও প্রতিবাদ করে বলেছিলেনঃ 'আর যা বলিস, আমায় সর্বনাশী বলিসনে; জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে, তাদের অকল্যাণ হবে।'[৭০]

আমাদের বিশ্বাস, সন্তানের মঙ্গল-প্রচেষ্টায় আজও জননী রত সমভাবেই, সন্তানের অকল্যাণ-সম্ভাবনা আজও তাঁকে উদ্বিগ্ন করে ঠিক তেমনই, যেমন করত তাঁর স্থূলশরীরে। হয়তো বা আরও বেশী। তাই প্রকটলীলায় তিনি যত না ভক্ত আকর্ষণ করেছেন, লীলাসংবরণের পর আকর্ষণ করছেন তার চেয়েও আরও অনেক। 'মা' এই একাক্ষরা মন্ত্র স্বদেশ-বিদেশের অগণিত সন্তানের প্রাণে স্নেহবারি সিঞ্চন করছে। আজ তিনি সত্যিই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার মা। 'গণ্ডিভাঙা' মা। যথার্থই লোকজননী।

সহধর্মিণী

'সহধর্মিণী' শব্দটির অর্থ একত্র-ধর্মিণী। অর্থাৎ যিনি স্বামীর সঙ্গে একত্রে একই ধর্মে ব্যাপৃতা—সহধর্মচারিণী। সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব পূর্ব যুগে ভগবানের অবতাররূপে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদেরই উত্তরপ্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছেনঃ 'অবতারবরিষ্ঠ'। সহধর্মিণীরূপে রামচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণী-সত্যভামা, বুদ্ধদেবের সঙ্গে যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা। যুগাবতারের সাধনকাল পরিসমাপ্তির পর থেকেই রামকৃষ্ণকায়ার ছায়ারূপে সর্বদা উপস্থিত 'যুগ-ধর্মপাত্রী' সারদা। এমন সার্থক সহধর্মিণী আর কোন অবতারেই দেখা যায়নি। অন্যান্য অবতারে তাঁদের সহধর্মিণীদের পতির সাধনক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় সহ-যোগিতা করতে দেখা যায় না—যেমন দেখা যায় রামকৃষ্ণ-অবতারে। যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণীরূপে বরণ করেছিলেন 'মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্তং তেঽস্তু' বলে, সেই সারদা যথার্থই তাঁর অবতারবরিষ্ঠ স্বামীর 'সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধার-য্যামি' এই জীবোদ্ধারের ব্রতকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত চিত্তটিই ছিল স্বামীর চিত্তের অনুসারী। যদিও রামাবতারে সীতা বনবাসে রামের অনু-গামিনী হয়েছিলেন 'অহং রামমনুব্রতা' বলে, তাঁর স্বামীর দুঃখব্রতের অংশীদারও হয়েছিলেন ; কিন্তু 'রামকৃষ্ণমনুব্রতা' সারদা যেভাবে তাঁর স্বামীর জীবনব্রতকে পরি-পূর্ণ করে তার সার্থক রূপ দান করে সহধর্মিণীর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, এমনটি কোথাও দেখা যায় না।

শ্রীমাকে একবার একজন প্রশ্ন করেছিলঃ 'ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে?' মা এর উত্তরে বলেছেনঃ 'আমি আর কে, আমিও ভগবতী।'[১] শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছে একথা বহুবার বহুভাবে প্রকাশ করেছেন। 'ও জ্ঞান-দায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!'[২] এই শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি অন্তর্ধানের বহুকাল পর পর্যন্ত ভক্তহৃদয়ে লীলা করেছেন এবং লোককল্যাণ-সাধনে ব্যাপৃত থেকেছেন। শ্রীমা বলছেনঃ 'ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন, "আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব"।'[৩] ঠাকুরের লীলাসংবরণের পরে 'রাধারানী'-রূপী যোগমায়াশক্তিকে অবলম্বন করে শ্রীমায়ের যে স্থূলশরীরে অবস্থান—এ-ও শ্রীরাম-কৃষ্ণেরই নির্দেশে; তাঁরই আয়োজিত কর্মযজ্ঞের পূর্ণতাসাধনের সহায়তা করবার জন্য। সে কর্মটি কি? জীবের চৈতন্যবিধান। এই যৌথপ্রচেষ্টাকে তাঁরা সফল করে

তুলেছিলেন নিজেদের জীবনে আচরণের দ্বারা। শ্রীমা বহুবারই তাঁর ভক্তদের কাছে একথা জোর করে বলেছেনঃ 'ঠাকুর ও আমাকে অভেদ-ভাবে দেখবে...।'[৪] আবার শ্রীরামকৃষ্ণও অপ্রকট হবার পর সূক্ষ্মশরীরে আবির্ভূত হয়ে যোগেন-মার সন্দেহ ভঞ্জন করে বলেছেনঃ 'ওর উপর সন্দেহ এনো না, ওকে একে (নিজেকে দেখিয়ে) অভেদ জানবে।'[৫] এই রকম অভেদবুদ্ধি দিয়ে যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা-দেবীকে দেখবার চেষ্টা করি, তবেই তাঁদের পরস্পরের লীলা বোঝা সহজ হবে।

রামকৃষ্ণ ও সারদার বিবাহপ্রসঙ্গ আলোচনা করলেই বোঝা যায় বিবাহ নামক সংস্কারের দ্বারা লৌকিক জীবনে মিলিত হওয়ার পিছনে কতবড় আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা নিহিত ছিল। এ যেন পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি পবিত্র আত্মার মিলনকাহিনীঃ

ঠাকুরে শ্রীমায়ে বিয়ে, ছার জৈব বুদ্ধি দিয়ে,
দেখিলে পড়িবে মহাদায়।
শুন কহি পরিচয়, দেহে দেহে বিয়ে নয়,
পরিণয় আত্মায় আত্মায়॥[৬]

১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগে পাঁচ বছরের বালিকা সারদার সঙ্গে চব্বিশ বছরের যুবক গদাধরের বিবাহ হয়। গদাধরের মনের অবস্থা তখন কেমন ছিল? দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে তিনি তখন এক দিব্যোন্মাদ অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। মনের মধ্যে তখন তাঁর তীব্র বৈরাগ্য, জগজ্জননীর দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি সর্বদা ব্যাকুল। তাঁর চেহারা, হাবভাব, এমনকি বাহ্যিক আচরণের মধ্যেও তখন এমনই উন্মাদনা প্রকাশ পেত যে, সাধারণ মানুষের জাগতিক দৃষ্টিতে তাকে পাগলামি বা বায়ুরোগ বলে মনে হত। নানা চিকিৎসার দ্বারা তাঁকে 'আরোগ্য' করে তুলবার চেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায়, জননী চন্দ্রাদেবীর আগ্রহে তাঁকে দেশে নিয়ে যাওয়া হল। কামারপুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং জননীর সেবাযত্নে গদাধরের 'বায়ুরোগ' কিছুটা কমল বটে, কিন্তু ভগবদ্‌ভাবে উন্মত্ত মন সর্বদা এক অন্য ভাবরাজ্যে বিচরণ করতে লাগল। এমনই যখন গদাধরের মানসিক অবস্থা—তখন তাঁর জননী ও অগ্রজ এই ভাবের উপশমের উপায় হিসাবে তাঁর বিবাহ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আশ্চর্যের বিষয়, গদাধর যখন তা জানতে পারলেন, তখন কোন আপত্তি করা তো দূরের কথা, খুব আনন্দের সঙ্গেই সব মেনে নিলেন। শুধু তাই নয়, পাত্রীর সন্ধানও তিনি নিজেই বলে দিলেনঃ 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা আছে।'[৭] সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, প্রজাপতির এই নির্বন্ধের সঙ্গে যে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটা মহাপ্রস্তুতির সূচনা হচ্ছে—একথা ঠাকুর পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন।

খুব একটা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান না হলেও, সাধারণ নরনারীর বিবাহে যেমন আচার-অনুষ্ঠান এবং আনন্দোৎসব হয়ে থাকে—গদাধর এবং সারদার বিবাহেও তেমন হয়েছিল। রসিকচূড়ামণি গদাধরের বিবাহযাত্রার চিত্র এঁকেছেন 'পুঁথি'-রচয়িতা শিবের বিবাহযাত্রার সঙ্গে তুলনা করেঃ

শুনা কথা শিবের বিবাহ মনে পড়ে।
উমা সহ যেইবার অচল-আগারে॥
বিয়া দিতে যত ভূতে মহা মেতে চলে।
যেতে পথে নানা মতে জাতি-খেলা খেলে॥

… … …

সেই মত বরযাত্রী শ্রীপ্রভুর সাথে।
খোলা পায় খোলা গায় ঠেঙ্গা লাঠি হাতে॥
গামছা কাঁধেতে বাঁধা কোমরে চাদর।
কৌতুক রহস্য মুখে হাজার রগড়॥[৮]

তারপর নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিবস্বরূপ সেই সদানন্দময় পুরুষের হাতে পঞ্চবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরীদান করলেন সারদার পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্ত্রী-আচারের সময় দৈবক্রমে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। রমণীরা যখন সাতাশটি কাঠি জেবলে প্রথানুযায়ী বরের চারপাশে ঘুরাচ্ছিলেন, তখনঃ

জবালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা॥

… … …

চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা বন্ধন॥[৯]

সত্যই অবিদ্যার মায়াপাশে নিজেকে আবন্ধ করবার জন্য তাঁর বিবাহ নয়। অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করবার জন্যই তিনি নির্বাচন করেছিলেন সারদানাম্নী এই আপাত-ক্ষুদ্র পাত্রীটিকে।

একটি প্রশ্ন এখানে স্বাভাবিকভাবেই জাগে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ করলেন কেন? এই প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচয়িতা স্বামী সারদানন্দ কয়েকটি যুক্তি দিয়ে আলোচনা করেছেনঃ 'প্রথম—চব্বিশ বৎসর বয়সে [যখন] ঠাকুরের বিবাহ হয়, তখন বৈরাগ্যের ঝড় তাঁহার প্রাণে তুমুল বহিতেছে। আর, আজীবন যিনি নিজের জন্য কাহাকেও এতটুকু কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হইতেন, তিনি যে কিছুমাত্র না ভাবিয়া একজন পরের মেয়ের চিরকাল দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা বুঝিয়াও ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন, ইহা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়—ঠাকুরের জীবনের কোন ঘটনাই যে নিরর্থক হয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি। তৃতীয়—তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত; কারণ বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধানকালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বলিয়া দেন যে,

তাঁহার বিবাহ জয়রামবাটীনিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইবে —ইহা পূর্ব হইতে স্থির আছে।'[১০]

অতএব দেখা যাচ্ছে, অন্তরে-বাইরে সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে বিবাহবন্ধন, এ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান একটি উদ্দেশ্য হল, প্রকৃত দাম্পত্যজীবনের আদর্শ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সাধারণ গৃহস্থের কাছে উদাহরণ স্থাপন করা। সংসারজীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হবে, পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার এবং বোঝাপড়ার দ্বারা জীবনটাকে কতদূর মধুময় করে তোলা সম্ভব—সেগুলি নিজেদের জীবনে অনুষ্ঠান করে তাঁরা যেন দেখিয়ে গেলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' ঠাকুর বলতেনঃ 'এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি ষোল টাং করলে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্!'[১১] সেইজন্য, নিজের জীবনে তিনি পরিপূর্ণ সংযম সাধন করলেন। কিন্তু গৃহস্থকে উপদেশ দিলেন একটি-দুটি সন্তানের জন্মের পর ভাইবোনের মতো থাকতে। অর্থাৎ জীবন থেকে ভোগবাসনাকে একেবারে বর্জন করতে বললেন না, কেননা অধিকাংশের পক্ষেই তা সম্ভব না। তবে ক্রমশ তার মোড় ফিরিয়ে দিতে বললেন ঈশ্বরাভিমুখে। লীলাপ্রসঙ্গকার বলছেনঃ 'এই জন্যই ঠাকুরের বিবাহিত জীবনের কর্তব্য ঘাড়ে লইয়া মহোচ্চ আদর্শ সকলের চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া দেখান।'[১২] এবং এই আদর্শ-স্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমার ভূমিকা অতুলনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনাকে তিনি হাসি-মুখে নিজের সাধনা হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর দিক থেকে কোন সময়ের জন্য এতটুকু প্রতিবাদ নেই, নেই কোন আপত্তি কিংবা অসন্তোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর বিবাহোত্তর জীবন কেমন পরিণতি লাভ করল এবং কিভাবে সারদাদেবী চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকেই আদর্শ করে 'তদ্ভাবরঞ্জিতা' হয়ে উঠলেন, সেই অপূর্ব কাহিনীই আমরা এখন আলোচনা করব।

১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিরাগমন উপলক্ষে ঠাকুর জয়রামবাটীতে যান এবং সারদামণিকে কামারপুকুরে নিয়ে এসে কিছুকাল একসঙ্গে বাস করেন। শ্রীমা তখন সাত বছরের বালিকামাত্র। কিন্তু এইসময় বয়স্কা বধূর মতো তিনি কোথা থেকে জল এনে স্বামীর পা ধুইয়ে পাখার বাতাস করে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। স্বামী নির্বেদানন্দ লিখেছেনঃ 'প্রাপ্ত বয়সে তাঁহার দেবতুল্য স্বামীর যে সেবায় সারদা তন্ময় হইয়া নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, বোধ হয় কোন দৈবী প্রেরণায় তিনি এদিন সে সেবাব্রতের উদ্বোধন করেন।'[১৩]

এরপর বেশ কিছুকাল শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করেন। তখন মা ভবতারিণীর দর্শন লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে বিভিন্নপ্রকার সাধনে তিনি লিপ্ত থাকেন ও আধ্যাত্মিক জগতের বহুপ্রকার অনুভূতি লাভ করেন। এইভাবে সুদীর্ঘ সাত বছর কেটে যায়। তারপর ১২৭৪ সালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং

হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে আবার কামারপুকুরে আসেন। সারদাদেবী সেসময় পিত্রালয়ে ছিলেন—তাঁকে কামারপুকুরে আনা হয়। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর। বলা যায় তিনি কিশোরী। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণেরও তখন আধ্যাত্মিক জীবন এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অদ্বৈতসাধনার শেষে জগজ্জননীর নির্দেশে তিনি এখন 'ভাবমুখে' অবস্থান করছেন। এমনই সময় সারদা আবার তাঁর সান্নিধ্যে এলেন। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর দেবোপম স্বামীর সঙ্গ লাভ করে তিনি ধন্য এবং তাঁর কিশোরীহৃদয় আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ। পতি তথা গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও তখন এক অপার্থিব করুণা ও প্রেমের ধারা প্রবহমান। লীলা-প্রসঙ্গকার বলছেনঃ 'পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্নলাভে ঐকালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন।'[১৪] শ্রীমা নিজমুখে বলছেনঃ 'হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে; এই সময় থেকে সর্বদা এমন মনে হত। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতখানি যে পূর্ণ হয়ে থাকত তা বলে বোঝাবার নয়।'[১৫] আদর্শ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণও সারদাদেবীকে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করতে লাগলেন। ঠাকুর কত রকম ভাবে শিক্ষা দিতেন, সে সম্বন্ধে সারদাদেবী বলছেনঃ 'প্রদীপের সলতেটি কিভাবে রাখতে হবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি সংসারের খুঁটিনাটি কথা থেকে, ভজন কীর্তন ধ্যান সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয়ই তিনি আমাকে শেখাতেন।'[১৬]

কামারপুকুরে কয়েকমাস কাটিয়ে ঠাকুর আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন, এবং নিজস্ব সাধন, ভজন, ধ্যান, সমাধি ও লোকসংগ্রহের কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এদিকে সারদাদেবীও স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে লাগলেন। মনে মনে আশা, নিশ্চয়ই ঠাকুর কোনদিন তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নেবেন। সুদীর্ঘ চার বছরের এই প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা নয়, যেন তপস্যা। দেবমানবের সুযোগ্যা সহধর্মিণী হয়ে ওঠার জন্য তপস্যা। অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ-চিন্তা, বাইরে দরিদ্র পরিবারের জীবনসংগ্রামের অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজ। ত্যাগ, ধৈর্য ও সেবাপরায়ণতা দিয়ে মণ্ডিত ছিল তাঁর জীবন।

এদিকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবোন্মাদ অবস্থা। সাধারণ লোকে মনে করে তিনি পাগল, বিকৃতমস্তিষ্ক। চারিদিকে এই নিয়ে গুঞ্জন। ক্রমে সুদূর পল্লীগ্রাম জয়রামবাটীতেও নানা কানাকানি ও গুজব রটনা শুরু হয়ে গেল। মা বলছেনঃ 'নানা লোকের কাছে শুনতুম তিনি পাগল, উন্মাদ হয়েছেন, উলঙ্গ হয়ে বেড়ান। কেউ তো আর তখন তাঁর ভাব বুঝত না।'[১৭] 'আমি যখন আগে জয়রামবাটী ছিলুম, দিনরাত কাজ করতুম। কোথাও কারো বাড়ি যেতুম না। গেলেই লোকে বলত, "ও মা, শ্যামার মেয়ের ক্ষ্যাপা জামাই-এর সঙ্গে বে হয়েছে।" ঐ কথা শুনতে হবে বলে কোনখানে যেতুম না।'[১৮] নীরবে এইসকল কথা সহ্য করলেও মনে মনে তিনি খুবই ব্যাকুল হতে

লাগলেন আসল ঘটনা স্বচক্ষে দেখবার জন্য এবং প্রয়োজন হলে স্বামীর সেবার জন্যে। 'পুঁথি'তে বলা হয়েছেঃ

> জননী বয়স্কা এবে বিচিন্তিতমনা।
> মনে মনে আপনার করেন ভাবনা॥
> আগে তাঁরে দেখিয়াছি মনের মতন।
> সত্য কি এখন তিনি নাহিক তেমন॥
> যদ্যপি তাহাই হয় ইচ্ছায় ধাতার।
> এখানে বসতি নহে কর্তব্য আমার॥[১৯]

বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। এই যাত্রাপথে তাঁর জ্বর হয়েছিল এবং ভবতারিণীর দিব্যদর্শন লাভ হয়েছিল—সেসব কাহিনী সকলেরই জানা আছে। আশানিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে শ্রীমা উপস্থিত হলেন স্বামীর কাছে। তখন রামকৃষ্ণের সে কী প্রেমপূর্ণ অভ্যর্থনা! 'তুমি এসেছ? বেশ করেছ!... এখন কি আর আমার সেজো বাবু (মথুরবাবু) আছে যে, তোমার যত্ন হবে?'[২০] তিনিও যেন এতদিন এই আগমন-প্রতীক্ষাতেই পথ চেয়ে বসেছিলেন।

এইসময় থেকে ঠাকুরের অন্ত্যলীলা পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ সময়ই শ্রীমা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন এবং অতন্দ্র প্রহরীর মতো ঠাকুরের দেবতনুর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। এখানে যে দাম্পত্যলীলার কাহিনী আমরা শুনতে পাই, তাকে এককথায় বলা যায় স্বর্গীয়। যুবতী স্ত্রীকে পাশে নিদ্রিতাবস্থায় লক্ষ্য করে ঠাকুর আত্মবিচার করতেনঃ 'মন, এরই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে একে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলে জানে এবং ভোগ করবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু একে গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি কোর না, পেটে একখানা মুখে একখানা রেখো না, সত্য বল তুমি একে গ্রহণ করতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি একেই চাও তো এই তোমার সম্মুখে রয়েছে, গ্রহণ কর।'[২১] এইরকম বিচার করে স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করতে উদ্যত হওয়া মাত্র মন সমাধিতে বিলীন হয়ে গেল। সে রাত্রে আর বাহ্যচেতনা এল না। এই সময়কার ঠাকুরের ভাব সম্বন্ধে মা বলছেনঃ 'সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাক্‌তেন, তা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম, সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপ্‌ত, আর ভাব্‌তুম কখন রাতটা পোহাবে! ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না।'[২২] লীলাপ্রসঙ্গকার মন্তব্য করছেনঃ 'পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল

অতীত হইল—কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরানীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না।'[২৩] এই 'দিব্যলীলাবিলাসে' ঠাকুরেরও যা ভূমিকা, শ্রীমারও তাই। যেমন স্বামী ঈশ্বর-পরায়ণ, তেমন স্ত্রীও ঈশ্বরপরায়ণা না হলে এমনটি সম্ভব হত না। ঠাকুর একথা নিজ মুখেই স্বীকার করেছেনঃ 'ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কি না, কে বলতে পারে?'[২৪] দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুর একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সম্ভবত পরীক্ষা করবার জন্যঃ '...তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?' উপযুক্তা সহধর্মিণীর মতো তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'[২৫] এই প্রতিশ্রুতি শ্রীশ্রীমা সর্বদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। যুগাবতার এবং তাঁর সহধর্মিণীর এই কথোপকথন আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের আর এক আদর্শ দম্পতির কথা মনে করিয়ে দেয়—যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী।

যুগধর্মসংবহনের মাধ্যম হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাচন করেছিলেন দুটি শ্রেষ্ঠ আধারকে। একজন হলেন সারদারূপী তাঁর সহধর্মিণী, অন্যজন হলেন—নরেন্দ্ররূপী তাঁদের দিব্যসন্তান। একজনের মধ্য দিয়ে প্রচার করলেন মাতৃভাব, আর একজনের মধ্য দিয়ে বেদান্তের অমৃতবার্তা। তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মে, কর্মে, আচারে, ব্যবহারে সারদাদেবীকে একদিকে যেমন আদর্শ নারী রূপে, অন্যদিকে অবতারের যোগ্য সহধর্মিণীরূপে গড়ে তোলার জন্যও সর্বদা তৎপর। অষ্টাদশী ভার্যাকে ঠাকুর তাঁর স্বভাবসুলভ মধুর ভাষায় কত শিক্ষাই না দিতেন! আর শ্রীমাও ছিলেন সেসবের উপযুক্ত গ্রহীত্রী—'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'। সহজ উপমা প্রয়োগ করে ঠাকুর বলতেনঃ 'চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকবে তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন, তুমি ডাক তো তুমিও তাঁর দেখা পাবে।'[২৬] শ্রীমা ভক্তদের কাছে বলেছেনঃ 'ঠাকুর ভগবানের বিষয় ছাড়া কোন কথাই বলতেন না। আমাকে বলতেন, "দেখছ তো মানুষের দেহ কি!—এই আছে, এই নাই, আবার সংসারে এসে কত দুঃখ, কত জ্বালা পায়! ...এক ভগবান্ই নিত্যসত্য, তাঁকে ডাকতে পারলেই ভাল। দেহ ধরলেই নানা উপসর্গ।'[২৭]

দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এক বছরকাল স্ত্রীকে নিজের ঘরে নিজের পাশে রেখে পরস্পরের মনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নিশ্চিতভাবে জেনে নিলেন সেখানে কোন ভাবের ঘরে চুরি নেই, তখনই তিনি সারদাদেবীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী-জ্ঞানে দেবীর আসনে বসিয়ে বিবিধ উপচারে ষোড়শীপূজা করলেন এবং সারা-জীবনের সাধনার ফল ও জপের মালা সেই দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করলেন। ১২৮০ সালের ফলহারিণী কালিকাপূজার দিনে (মায়ের বয়স তখন আঠার বছর) এই পূজা হয়। স্বামী সারদানন্দ পূজ্যা ও পূজকের সেসময়কার অপরূপ ভাবতন্ময়তার বর্ণনা

দিয়েছেন লীলাপ্রসঙ্গেঃ 'বাহ্যজ্ঞান-তিরোহিতা হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন। কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে [শ্রীমাকে] প্রণাম করিলেন—"হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।" পূজা শেষ হইল—মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার [শ্রীমার] দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।'[২৮] উপযুক্ত আধার না হলে কারও পক্ষে এই পূজা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক শক্তির পরিমাপেও ঠাকুরের যোগ্য সহ-ধর্মিণী ছিলেন বলেই তাঁর এই পূজা শ্রীমা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করতে পেরে-ছিলেন। 'পুঁথি'-রচয়িতা তাই বলছেনঃ

মা না হোলে মহাশক্তি, কার হেন গায়ে শক্তি,
লইবেন শ্রীপ্রভুর পূজা।
প্রভু যে পরমেশ্বর, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর,
সর্বেশ্বর সকলের রাজা॥[২৯]

তাইতো শ্রীমা 'যোগীন্দ্রপূজ্যা'—যোগীশ্রেষ্ঠ এই শক্তিময়ীকে স্বয়ং দেবীজ্ঞানে পূজা করে 'যুগধর্মপাত্রী'রূপে উদ্বোধিত করেছিলেন। এই ষোড়শীপূজার মাধ্যমে শ্রীরাম-কৃষ্ণের অভূতপূর্ব সাধনাই যে শুধু পূর্ণ হল তাই নয়, সূচনা হল আর একটি অধ্যায়ের—যে অধ্যায়ে যুগাবতারের জীবনব্রতে সহধর্মিণীরূপে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন শ্রীশ্রীমা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছেনঃ '[ষোড়শীপূজার পর] রামকৃষ্ণ-চন্দ্রে ষোড়শ-কল-চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে। ঐ শোভা ইতিহাসে অতি দুর্লভ। অনেক অনেক সাধু-মহাজন সহধর্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা।—চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমতি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শীপূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।'[৩০]

অন্য আর একদিক থেকেও এই ষোড়শীপূজা বিশেষ অর্থব্যঞ্জক ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন প্রচলিত রীতিকে ভাঙতে আসেননি। ভারতের সনাতন ভাবধারা এবং ধর্ম-চেতনার নবমূল্যায়ন করতেই তাঁর এবারে আগমন। এই পূজার দ্বারা ভারতের তথা

বিশ্বের নারীজাতিকে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করে গেলেন। নারীজাতির সমাদর সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বলা হয়েছেঃ

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ [৩১]

'যেখানে নারীরা পূজিত অর্থাৎ সমাদৃত হন, সেখানে দেবতারা আনন্দে বিহার করেন। আর যেখানে এঁরা পূজিত হন না, সেখানে সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল।' এই পূজার সম্মান দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর মধ্যে সুপ্ত দেবীসত্তার উদ্বোধন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সংসারী মানুষকে বুঝিয়ে দিলেন প্রকৃত সহধর্মিণী কি বস্তু, পুরুষের জীবনে তাঁর স্থান কত উচ্চে। তিনি নিজ জীবনে স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে এই মর্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে কতদূর সচেতন ছিলেন, মায়ের কথা থেকেই তা বোঝা যায়ঃ 'আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মতো কিছু বলেন নি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি। ...কখনো আমাকে "তুমি" ছাড়া "তুই" বলেন নি। কিসে ভাল থাকবো তাই করেছেন।' [৩২]

শাস্ত্র বলেনঃ 'পতি পরম গুরু।' এই শাস্ত্রবাক্য শ্রীমায়ের জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠেছিল। এমনই এক পুরুষকে তিনি পতিত্বে বরণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন—একাধারে তাঁর গুরু, ইষ্ট, স্বামী, ইহকাল, পরকাল সর্বকিছু। মা বলছেনঃ 'উনিই [ঠাকুরই] সব। উনিই প্রকৃতি, উনিই পুরুষ। ওঁ (ঠাকুর) হতেই সব হবে।' [৩৩] একজন ত্যাগী-ভক্ত মাকে প্রশ্ন করছেনঃ 'এই যে ঠাকুরকে সকলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে, তুমি কি বল?' একথার উত্তরে মা দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছেনঃ 'হাঁ, তিনি আমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।' 'আমার' এই কথাটি বলার জন্য আবার ব্যাখ্যা করে বলছেনঃ 'হাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামিভাবেও, এমনি ভাবেও।' [৩৪] পরমগুরুর মতোই তিনি পত্নীকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পথনির্দেশ করেছেন; এবং যে মূলমন্ত্রটি দান করেছেন সেটি হল প্রেম বা ভালবাসার মন্ত্র। শ্রীমায়ের অন্তর-বাহির ছিল রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগে রঞ্জিত—তদাকারাকারিত। ঠাকুরের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি সর্বকিছুরই প্রতিফলন দেখা যায় মায়ের মনের মুকুরে। স্বামী অভেদানন্দ তাই এই রামকৃষ্ণময় মাতৃদেবীর স্তুতি রচনা করেছেনঃ

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পরে শ্রীমায়ের মনে যখন তীব্র বৈরাগ্য জাগে, অনিত্য শরীরটাকে ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে চিরমিলনের জন্য যখন তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, সেই সময়ে ঠাকুর দেখা দিয়ে মাকে বললেনঃ 'না তুমি থাক; অনেক কাজ বাকি আছে।' মা পরে বলছেনঃ 'শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।' [৩৫] স্থূলশরীরে অবস্থানকালেও যেমন আবার তিরোভাবের পরেও তেমন—ঠাকুর বারে বারে শ্রীমাকে তাঁর এই কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছেন। তাঁরই আরব্ধকর্মের পূর্ণতা সাধনের জন্য আরও কিছুকাল শ্রীমাকে দেহধারণ করে থাকতেই হবে। ঈশ্বরকে

ভুলে, সত্য ও সংযমের পথ ছেড়ে সংসারের লোক কষ্ট পাচ্ছে– এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই দায়। কিন্তু এ কি শুধু তাঁরই দায়? দায় যে শ্রীমায়েরও। ঠাকুর তাই শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ 'শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।'[৩৬] আবার বলেছিলেনঃ 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল বিল করছে। তুমি তাদের দেখো।'[৩৭] জীবের দুঃখে কাতর প্রেমাবতারের ঐ 'দায়' বহন করবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর অর্ধাঙ্গিনীর মধ্যেই থাকা সম্ভব। এবং সেই 'দায়' তাঁকে বহন করতে হবে আরও ব্যাপকভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই মাকে বলেছিলেনঃ 'এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।'[৩৮] তাই আরও বলেছিলেনঃ 'আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।'[৩৯] বলেছিলেনঃ 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।'[৪০]

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর তাঁর সেই দায় পালন করতে শ্রীমায়ের বিশ্বজননীরূপে আত্মপ্রকাশ। শাস্ত্র বলেন, বিবাহের পরিপূর্ণ সার্থকতা সন্তানলাভে। পত্নীর মধ্য দিয়ে পতি পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন বলেই পত্নীকে বলা হয় জায়া। শক্তিমানের সঙ্গে মহাশক্তির এই 'অ-লৌকিক বিবাহ' সার্থকতা লাভ করল এই অর্থেও। যিনি স্বয়ং ব্রহ্মের মায়াশক্তি —আপন 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া'র দ্বারা এই জগৎ প্রসব করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন, বিশ্বজোড়াই তো তাঁর সংসার এবং অগণিত তাঁর সন্তানসন্ততি। তাই গিরিশবাবুর সংশয় মোচন করে শ্রীমা দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছিলেনঃ 'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।'[৪১] অর্থাৎ কেবল ইহজীবনের মা নয়, জন্মজন্মান্তরের মা। সারদাদেবীর এই বিশ্বমাতৃত্ব সম্বন্ধে বহু পূর্বে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন। শ্যামাসুন্দরী দেবীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেনঃ 'আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।'[৪২] আবার শ্রীমায়ের মনে অল্পবয়সে যখন এই রকম মা হওয়ার বাসনা জাগে, তখনও ঠাকুর নিজ হতেই এইভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেনঃ 'তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব—মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষে পায় না। পরে দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে।'[৪৩] ঠাকুরের এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেখি, শ্রীমা একদিন বলছেনঃ 'বাবা, সারাদিন যেন কুন্তিত করছি, এই ভক্ত আসছে তো এই ভক্ত আসছে। এ শরীরে আর বয় না। ঠাকুরকে বলে "রাধু, রাধু" করে মনটা রেখেছি।'[৪৪] বাস্তবিক, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, ত্যাগী-গৃহী নানা ভাবের নরনারী দিনরাত 'মা' বলে তাঁর পদতলে আশ্রয়ভিক্ষা করেছে, মায়ের অবারিত দ্বার থেকে কাউকে কখনও ফিরে যেতে হয়নি। এর জন্য মাকে অশেষ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবুও অম্লানবদনে বলছেনঃ 'আমরা

তো ঐ জন্যই এসেছি।'[৪৫] তাই তিনি 'সতেরও মা, অসতেরও মা।'[৪৬] 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!'[৪৭] মাতৃক্রোড় ছাড়া আর কোথায় মিলবে এমন নিশ্চিন্ত আশ্রয়? শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়ঃ 'মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব।'[৪৮] তাঁর সাধনার শুরু মাতৃভাবে, তিনি 'চিরকাল মায়ের বালক'। যে মাতৃ-উপাসনার উপদেশ তিনি বার বার দিয়েছেন, যে মাতৃ-উপাসনার দৃষ্টান্ত নিজে অনুষ্ঠান করে দেখিয়েছেন, সেই মাতৃ-উপাসনার মাধুর্য মানুষকে আরও স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য এবার তিনি এই জীবন্ত মাতৃমূর্তি জগতের সামনে রেখে গেলেন। মায়ের কথায়ঃ 'মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য [ঠাকুর] আমাকে এবার রেখে গেছেন।'[৪৯] তাই দেখি, যুগাবতারের মর্তলীলা অবসানের পর সহধর্মিণী সারদাদেবী তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন সমস্ত জগৎকে সন্তানজ্ঞানে কোলে টেনে নিয়ে।

এই পর্বে মায়ের যে লীলা, তার কোন তুলনা হয় না। উপনিষদে বলা হয়েছেঃ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'[৫০] অনিত্য বস্তুকে ত্যাগ করে রসস্বরূপ সেই নিত্যবস্তুকে উপভোগ কর। ত্যাগের দ্বারা আত্মজ্ঞানকে পুষ্ট কর। আত্মজ্ঞান পুষ্ট হলে দেখতে পাবে এই জগৎসংসার ব্রহ্মের দ্বারা আবৃত। ব্রহ্মকে বা বৃহৎকে লাভ করবার জন্য অনিত্য বস্তুকে ত্যাগ কর এবং সেই ত্যাগের দ্বারাই দিব্যভাবে জগৎকে ভোগ কর। শ্রীরামকৃষ্ণ এবারে এসেছিলেন সেই রসস্বরূপকে উপভোগ করবার এই অভিনব উপায়টি নতুন করে জীবকে শেখাতে। শ্রীশ্রীমায়ের কথায়ঃ 'এবার দেখালেন ত্যাগ।'[৫১] শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেও ত্যাগ ছিল স্বভাবসিদ্ধ। দক্ষিণেশ্বরে মাড়োয়ারী ভক্ত লছমী-নারায়ণ নিবেদিত দশ হাজার টাকার প্রলোভন ঠাকুরেরই মতো তাঁকেও তিলেকের জন্যও বিচলিত করতে পারেনি। কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন—ঠাকুরের ত্যাগের মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে বলে। স্বামীকে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেছেনঃ 'আমি নিলে ও টাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না করে থাকতে পারব না; ফলে ওটা তোমারই নেওয়া হবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য; কাজেই টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।'[৫২] শ্রীমায়ের 'মন বুঝবার' জন্যই ঠাকুর এই পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়েরও ত্যাগের মহিমা আমাদের মুগ্ধ করে। বস্তুত, ঠাকুরের মতো শ্রীশ্রীমার জীবনেও ত্যাগই ছিল 'ভূষণ', তিনি 'ত্যাগসম্রাট' শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ সহধর্মিণী—ত্যাগসম্রাজ্ঞী। পরবর্তী জীবনে আত্মীয়স্বজন পরিবৃত সাংসারিক জীবনে সেই ত্যাগের বাহ্যপ্রকাশ হয়তো ছিল না, কিন্তু মনে মনে তিনি সর্বদাই ত্যাগী, অনাসক্ত, নির্লিপ্ত, দ্রষ্টা। তিনি সংসারে ছিলেন, কিন্তু সংসার কখনই তাঁর মধ্যে প্রবেশাধিকার পায়নি। সংসারী জীবদের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরও এই 'মনে ত্যাগ' করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাদের

ইহজীবনের ভোগবাসনাকে একেবারে বর্জন করতে বললেন না। কারণ, তাদের অধিকাংশের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। বললেন, বাসনার মোড় ফিরিয়ে তাকে ভগবদ্-মুখী করে দিতে—কামিনীকাঞ্চনের দাস 'আমি'টিকে ঈশ্বরের দাসে রূপান্তরিত করতে। বললেন, সংসারে বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো থাকতে। অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য হয়ে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনটি রেখে সংসার করতে। ঠাকুরের এই উপদেশগুলি প্রাত্যহিক জীবনে কিভাবে আচরণ করা যায়, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত হয়ে কি করে সংসারে থাকতে হয়—তাই শেখাতে শ্রীমা এবারে গ্রহণ করলেন আদর্শ সংসারীর ভূমিকা। সেই ভগবদ্‌ভক্তিরূপ সারবস্তুটি দান করতে এসেছিলেন—তাই তিনি সারদা।

ঠাকুরের অপ্রকট হওয়ার পর প্রায় চৌত্রিশবৎসর কাল শ্রীমা মর্তধামে ছিলেন। জীবোদ্ধারের যৌথ দায়িত্ব পালন করবার উদ্দেশ্যেই তাঁদের যুগল লীলাবিগ্রহধারণ। তাই স্বামীর অর্পিত এই মহাদায় উদ্ধার করে তবেই শ্রীমায়ের ছুটি। লীলাবসানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মায়ের মুখে আশ্বাসপূর্ণ অভয়বাণীঃ 'ভয় কি, বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?...যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষ-কালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে।'[৩৩]—'এইরূপে তিনি অন্তরে বাহিরে শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলা পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। বহু নরনারীর হৃদয়মন্দিরে শ্রীভগবানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় সরলতা ও স্বভাবশক্তিদ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তির বারি সিঞ্চন করিয়া ভক্তিপুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া...জীবকল্যাণরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্রত পালন করিতে করিতে ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসে "সকলের মা" শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে মিলিতা হইলেন।'[৩৪]

শ্রীশ্রীসারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী—বিবাহ-সূত্রে তো বটেই, আরও বেশী করে এই অর্থে যে, তাঁদের উভয়ের জীবনাদর্শ এক, একই উদ্দেশ্যে তাঁদের আগমন। ধর্ম মানে যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সত্য, সংযম, পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুরাগ, ধর্মের অনুশীলনই যে সচ্চিদানন্দলাভের উপায় এবং সচ্চিদানন্দলাভই যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই সত্য তাঁরা উভয়েই তাঁদের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন এবং উপদেশ দিয়ে ভোগ-লিপ্সু জীবকে তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি হন কল্পতরু, শ্রীমা তার প্রসারিত শাখা। সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়ে যেমন বংশের ধারা বয়ে চলে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে, ঠাকুর ও শ্রীমায়ের যুগ্ম কল্যাণ-এষণাও তেমনই তাঁদের দিব্যসন্তানদের মধ্য দিয়ে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। স্বরূপত তাঁদের দুজনের মধ্যে কোন ভেদ নেই। যুগধর্মস্থাপনের নিগূঢ় উদ্দেশ্যেই তাঁদের এই দ্বৈতলীলার অভিনয়। ঠাকুরেরই উপমা দিয়ে বলা যায়—একই জলকে লাঠি দিয়ে দুভাগ করলে যেমন পৃথক দেখায়, তাঁরাও তেমনি দুটি আপাতভিন্ন আধারে একই সত্তার প্রকাশ। ঠাকুর যদি ব্রহ্ম হন তবে শ্রীমা তাঁর শক্তি ; তিনি নিত্য, ইনি তাঁর

লীলা। স্বামী সারদানন্দের ভাষায়ঃ 'যথাগ্নের্দাহিকা শক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।'[৫৫] বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ জীবনের সকল অবস্থাতেই সশক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-ভিখারী ছিলেন—'দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।'[৫৬] ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানরাও শ্রীমাকে ঠাকুরের সঙ্গে অভেদজ্ঞান করতেন। পুঁথি-রচয়িতা এই অভিন্ন-তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন অপূর্ব ভাষায়ঃ

শ্রীপ্রভু লীলার স্বামী, সঙ্গে মাতাঠাকুরানী,
সনাতনী সৃষ্টির আধার।
বিভিন্ন মাত্র ভৌতিকে, এক আত্মা আধ্যাত্মিকে,
অভ্যন্তরে দোঁহে একাকার॥[৫৭]

এই চিরন্তন প্রকৃতিপুরুষ রামকৃষ্ণ-সারদারূপে জীবকে শিবজ্ঞান দান করবার জন্য দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে লীলাবিগ্রহ ধারণ করেছিলেন। নবযুগের এই 'হরগৌরীর' অর্ধনারীশ্বর উপস্থিতি সকল ভক্তহৃদয়েই চিরভাস্বর। উপলব্ধির আলোকেই তা দেখা যায়।

জ্ঞানদায়িনী

॥ ১ ॥

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদার জীবনচরিত্র মহিমময় ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিত্যে ও লীলায় -নির্গুণে ও সগুণে, আবার নির্গুণ ও সগুণের অতীত অবস্থায় যুগপৎ অবস্থান করে ধর্মসাধনা ও ধর্মানুভূতির জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব ও শ্রীমা সারদাদেবী অনন্যসাধারণ এক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে এক গৌরবময় ও বিস্ময়কর ঘটনা। ভাবমুখে ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রহ্মস্বরূপতায় অধিষ্ঠিত থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমগ্র বিশ্ববাসীকে অভিনব জীবনসিদ্ধির মন্ত্রে অভিষিক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকল্যাণকর্মে সাহায্য করার জন্য ঐ একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও গঠিত করেছিলেন তাঁর দিব্যসহচারিণী বিশ্বরূপিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে। অসাধারণ চরিত্রময়ী ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা। তাই স্বর্গের দেবীপ্রতিমা হয়েও মর্তে এসেছিলেন তিনি লীলার জন্য নিজের দিব্যরূপকে সাধারণ লোকলোচনের অন্তরালে রেখে। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ এ-প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ 'শ্রীমায়ের জীবনে আমরা দেবীর এই অবতরণ-ধারারই চরম পরিণতি দেখিতে পাই। দেবী এখানে সাক্ষাৎ, সচলা, রক্তমাংসের দেহবিশিষ্টা—শ্রীরামকৃষ্ণের পূজিতা 'ভবতারিণী ও স্বীয় গর্ভধারিণীর সহিত অভিন্না—শ্রীমা।'[১]

তাই শ্রীমার জীবনচরিত্র লক্ষ্য করলে স্বীকার করতে হয় যে, মানবীয় স্নেহমমতা ও সন্তান-বাৎসল্যের ভাবকে গ্রহণ করে তাঁর মর্তে আবির্ভাব যেমন অপরূপ ও সার্থক, তেমনি জ্ঞানদায়িনী দেবীরূপে তাঁর প্রকাশও গভীরভাবে অনুশীলন ও উপলব্ধি করার বিষয়। স্বর্গ ও মর্তের, ভূমা ও ভূমির ব্যবধানকে দূর করে চির-আনন্দময়ী শ্রীশ্রীমা বিশ্বের সকল মানুষেরই জীবনভাবনার ও শান্তিকামনার পথকে উদার ও স্বচ্ছন্দ করেছিলেন। তাই তিনি একাধারে জ্ঞানদায়িনী দেবী ও স্নেহময়ী জননী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমাকে ঠিক সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন, তাই শ্রীশ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ এক সৃষ্টি।

শ্রীশ্রীমার মধ্যে মহামহিমময়ী ভগবতীভাবের পূর্ণপ্রকাশ লক্ষ্য করেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোলাপ-মাকে একদিন বলেছিলেনঃ 'ও সারদা সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে, রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।'[২] শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দও তাঁর 'শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রে' লিখেছেনঃ 'লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।'

লীলাময়ী শ্রীশ্রীমার মাধুর্যময়ী মহিমা, অপার্থিব চরিত্র সাধারণ মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। তবে ভক্ত ও জ্ঞানসেবীর দৃষ্টিতে তা একেবারে অজ্ঞাত নয়। ভক্তকবি গিরিশচন্দ্রের কথাই এখানে উল্লেখ করি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রাণে বলেছিলেনঃ 'ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়া সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও আর সব রকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।'[৩] স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আরও অনেক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে এ-ধরনের মন্তব্য করেছিলেন—যা থেকে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, অমরার মুক্তিময়ী দেবী বিশ্বের সকলের মুক্তি ও শান্তি বিধানের জন্য পৃথিবীতে নররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা সারদা শুধুই জ্ঞানের প্রতিমূর্তি ছিলেন না, তাঁর মধ্যে একাধারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের রসোজ্জ্বল রূপের পূর্ণ প্রকাশ ছিল। তিনি স্বরূপে অখন্ড ও অদ্বিতীয়, কিন্তু লীলার জন্য বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পরিবেশে বিচিত্র রূপে ও ভাবে নিজেকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাই দেখি যে, কখনও স্নেহময়ী জননীরূপে, কখনও জ্ঞানদায়িনী আচার্যরূপে, কখনও সন্তাপহারিণী শান্তিদায়িনীরূপে, আবার কখনও বা অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুদ্রাণী ও সংহারিণী মূর্তিতে শ্রীশ্রীমা নিজেকে প্রকাশ করতেন। তাই সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে এবং বিভিন্ন সময়ে ও ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা সারদার প্রকৃতিতে ও কর্মে রূপভেদ ও ভাবভেদের প্রকাশ দেখা যেত। স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীশ্রীমার চরিত্রের অপরূপতা ও জ্ঞানশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিচিত্র বিকাশের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেনঃ 'এই অখন্ড শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ করা চলে না ;... [কারণ] আমাদের সসীম বুদ্ধি অসীমকে ধরিতে পারে না। আমাদের ধারণাশক্তির অক্ষমতাবশতঃ আমরা শ্রীমাকে জননী, গুরু, দেবী ইত্যাদির অন্যতমরূপে ভাবিতে চেষ্টা করি ; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, এই লোকাতীত জীবনে গুরু, দেবী ও মাতা—এই ত্রিবিধ রূপই অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। যখনই আমরা তাঁহাকে জননীরূপে পাই, তখনই আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে তাঁহার অমোঘ জ্ঞানদায়িনী শক্তি ; যখনই তাঁহাকে দেখিতে চাই গুরুরূপে, তখনই তিনি মাতৃরূপে আমাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লন ; আবার গুরু ও জননীরূপে তাঁহাকে ধরিতে গিয়া দেখি তিনি সমস্তের ঊর্ধ্বে দেবীরূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।'[৪] জ্ঞানদায়িনী সারদার অনুধ্যানকালে তাঁর এই আপাত বিভিন্ন অথচ স্বরূপত অভিন্ন ত্রিবিধ রূপের কথাই আমাদের মনে রাখতে হবে।

॥ ২ ॥

দ্বন্দ্বাত্মক এই জগৎ। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই দুই নিয়ে জগৎ। মানুষ যে এই জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাবার চেষ্টা করে—সেটা

তার ভ্রান্তি। সুখের সঙ্গে দুঃখও এসে যায়, আনন্দের পরে বেদনা এসে থাকে পর্যায়ক্রমে, জন্মের মাধ্যমে যে জীবনের শুরু, তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুতে। তাই যুগে যুগে ধর্মাচার্য মহাপুরুষরা মানুষকে বিশ্বসংসারের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে দিয়ে জীবনের লক্ষ্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেন। শ্রীশ্রীমাও বলেছেনঃ 'সৃষ্টিই সুখ-দুঃখময়। দুঃখ না থাকলে সুখ কি বোঝা যায়? আর সকলের সুখ হওয়া সম্ভব কি করে? ...চিরদিন কেউ সুখী থাকবে না, সব জন্ম কারও দুঃখে যাবে না। যেমন কর্ম তেমন ফল, তেমন যোগাযোগ হয়।'[৫] আমাদের পূর্বকৃত শুভ ও অশুভ কর্মগুলি যেমন যেমন ফল প্রসব করে তার উপরে নির্ভর করে আমাদের জীবনও যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই সুখদুঃখাত্মক সংসারকে মা তুলনা করেছেন 'দ'ক' বা পাঁকের সঙ্গে। বলছেনঃ 'বাবা, সংসার মহা দ'ক (পাঁক), দ'কে পড়লে ওঠা মুশকিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু খাবি খান, মানুষ কোন্ ছার!'[৬] সংসারের বন্ধনাত্মক রূপ ততদিনই থাকে যতদিন মানুষের দেহবুদ্ধি থাকে। শরীর নামক গৃহের মধ্যে যিনি বাস করেন তিনিই সংসারী। অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি যার আছে সে-ই সংসারী। শ্রীমা তাই বলেছেনঃ 'দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বই তো নয়—তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে, ঐ দেড় সের ছাই।'[৭]

সংসারের তাপ থেকে রক্ষা পাবার উপায় হিসেবে ধর্মাচার্য এবং শাস্ত্রকাররা যে ভগবৎনির্ভরতার কথা বলে গেছেন, শ্রীমা সেই কথাও বলেছেন সরল ভাষায়ঃ 'দেখ মা, মানুষকে ভালবাসলে দুঃখকষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে যে ভালবাসতে পারে সেই ধন্য হয়, তার দুঃখকষ্ট থাকে না।'[৮] বলছেনঃ 'কত সৌভাগ্যে, মা এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও।'[৯] শঙ্করাচার্যও মনুষ্যজন্মকে দুর্লভ বলেছেন, কারণ মনুষ্যদেহধারী জীবই একমাত্র পারে কর্মবন্ধন ছিন্ন করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বাইরে যেতে। জীবনের উদ্দেশ্যই হল, মায়ের ভাষায়ঃ 'ভগবানলাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্বদা মগ্ন হয়ে থাকা।'[১০]

আধ্যাত্মিক পথে একজন পথনির্দেশক গুরু একান্ত প্রয়োজন যিনি কৃপা করে সাধককে মন্ত্রদীক্ষা দেন। হিন্দু মতে স্বয়ং সচ্চিদানন্দই গুরু। কিন্তু সচ্চিদানন্দের শক্তি সাধকের জীবনে এসে পৌঁছনোর জন্য একটি শুদ্ধ, পবিত্র, উপযুক্ত মানুষী-মাধ্যম দরকার। তিনিই গুরু। গুরুর মধ্যে দিয়ে ভগবানের শক্তিই শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শিষ্যের জীবনে গুরুর স্থান তাই অতি উচ্চে। গুরুস্তোত্রে গুরুকেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং পরব্রহ্ম বলা হয়েছে। গুরুকে কখনও সাধারণ মানুষ ভাবতে নেই। শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুভক্তি একান্তভাবে আবশ্যক। শ্রীমা বলছেনঃ 'গুরুভক্তি থাকা চাই। গুরু যেমনই হোক, তাঁর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি।'[১১] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উল্লেখিত আছেঃ

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥[১২]

যাঁর দেবতার প্রতি পরাভক্তি আছে এবং দেবতার প্রতি যেমন গুরুর প্রতিও তেমনি ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার কাছেই পূর্বোক্ত বিষয়গুলি (অর্থাৎ উক্ত উপনিষদে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলি) প্রতিভাত হয়। সিদ্ধগুরু মন্ত্রের মাধ্যমে শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করেন। শ্রীমা বলছেনঃ 'মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের পাপ নিতে হয়। শিষ্য পাপ করলে গুরুরও লাগে। ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়।'[১৩] মন্ত্র সংহত আধ্যাত্মিক শক্তি। এ যেন বটগাছের বীজ যা দেখতে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু একদিন যা পরিণত হয় বিরাট বৃক্ষে। মাকে একজন একদিন বটগাছের একটি বীজ দেখিয়ে বলেছেনঃ 'মা, দেখছ, লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট। এ থেকে অত প্রকাণ্ড গাছ!' মা তখন বলেছিলেনঃ 'তা হবে না? এই দেখ না, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম, এসব কত কি হয়!'[১৪] আপাত-সামান্য বীজমন্ত্র থেকেই সাধকের জীবনে ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক মহীরুহ। শ্রীশ্রীমা জানতেন, মন্ত্র বর্ণময়ী মহাশক্তি এবং মন্ত্র শক্তিরূপে শরণাগত শিষ্যের অন্তরে পুঞ্জীকৃত অজ্ঞান-সংস্কার দূর করে ও তাকে আলোকস্নাত করে। আর এই আলোককেই জ্ঞানসাধক রামপ্রসাদ বলেছেনঃ 'কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।' অর্থাৎ বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণের মধ্যে বারোটি স্বরবর্ণ শক্তিরূপা ও বাকি ব্যঞ্জনবর্ণগুলি শিবস্বরূপ, সুতরাং মন্ত্র বা মন্ত্রময় শব্দ শিবশক্তির মিথুনরূপ মহাকাল ও মহাকালীর জীবন্ত চিন্ময়মূর্তি। মায়ের দৃষ্টিতে মন্ত্র এবং মন্ত্রজপের স্থান ছিল তাই অতি উঁচুতে। বলতেনঃ 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'[১৫]—জপের মাধ্যমেই সিদ্ধি সম্ভব। সিদ্ধির আবশ্যিক পূর্ব-অঙ্গ পবিত্রতা, কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা। সেই পবিত্রতাও আসে, মায়ের মতে, মন্ত্রজপের মাধ্যমে—'মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়। ভগবানের মন্ত্র জপ করে মানুষ পবিত্র হয়।'[১৬] সেইজন্য মন্ত্র নেওয়া একান্ত দরকার। মা বলছেনঃ 'অন্তত দেহশুদ্ধির জন্যও মন্ত্র দরকার।'[১৭]

জীবের মধ্যেই পরমতত্ত্ব। জীব না জেনে বাইরে তাকে খুঁজে মরে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে মুক্তির জন্য চেষ্টা।[১৮] মুক্তির অর্থই হচ্ছে সেই পরমতত্ত্বের সন্ধান যা রয়েছে জীবের নিজেরই মধ্যে। শ্রীমা ঠাকুরের কথা উদ্ধৃত করে বলছেনঃ 'ঠাকুর বলতেন, "হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথা হতে গন্ধটি আসছে।" তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ

তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা।'[১৯] সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনের লক্ষ্য দেহের মধ্যকার সেই পরমতত্ত্ব—যাকে ঠাকুর (বা মা) প্রচলিত অর্থে 'ভগবান' বলেছেন—তাকে জানা। জানা যে, ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা।

ঠাকুরের মতো শ্রীশ্রীমাও নির্জনে সাধনের উপরে জোর দিয়েছেন। জনৈক সন্ন্যাসী-সন্তানকে বলছেনঃ 'নির্জনে হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধনভজন করে মন পাকলে তারপর মনকে যেখানেই রাখ, যে-লোকের সঙ্গেই মেশো একরূপই থাকবে। যখন গাছ চারা থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হলে ছাগল গরুতেও কিছু করতে পারে না। নির্জনে সাধন করা খুব দরকার।'[২০]

মায়ের মতে 'সাধন মানে তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা।'[২১] মায়ের কাছে জনৈক সন্তান কুণ্ডলিনী জাগ্রত করে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালে মা বলেছিলেনঃ ধ্যান-জপের মাধ্যমেই কুণ্ডলিনী জাগে।[২২] মনের নিগ্রহকে গীতায় বাতাসকে আয়ত্তে আনার মতো কষ্টসাধ্য বলা হয়েছে। (বায়োরিব সুদুষ্করম্[২৩]) মা-ও বলছেন প্রায় একই কথাঃ 'মন না মত্ত হস্তী, মা! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে।'[২৪] মন স্থির করবার উপায় হিসেবে মা ধ্যান-জপের উপর জোর দিয়েছেন। বলছেনঃ 'নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি-না! ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে।'[২৫] সঙ্গে সঙ্গে মা বলেছেন 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক'-এর কথা। বলছেনঃ 'সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে।'[২৬] মনের ভোগমুখী বৃত্তি দূর করবার প্রধান উপায় এই নিত্য-অনিত্য বিচার।

আধ্যাত্মিক জীবনে এটা একটা বড় প্রশ্নঃ কোন্‌টি প্রধান—কৃপা, না পুরুষকার? শ্রীশ্রীমা বলছেনঃ ঈশ্বরলাভ ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয় না। মাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'কি করে ভগবান লাভ হয়? পূজা, জপ, ধ্যান—এসবে হয়?' মা উত্তর দিলেনঃ 'কিছুতেই না।' ভক্ত নিশ্চিত হবার জন্য আরও দুবার একই প্রশ্ন করলেন। কারণ, তাঁর সম্ভবত দৃঢ় ধারণা ছিল শুধু জপ-ধ্যান-সাধন-ভজনের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু মায়ের সেই এক উত্তরঃ 'কিছুতেই না।' 'তবে কিসে হয়?'—ভক্তের প্রশ্ন। মা বললেনঃ 'শুধু তাঁর কৃপাতে হয়।'[২৭] তাহলে জপধ্যানের স্থান কোথায়? মায়ের কথায়ঃ 'জপ-টপ'-এর দ্বারা 'ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়'।[২৮] ঈশ্বরলাভ ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করলেও 'ধ্যান-জপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপ, ধ্যান—এসব করতে হয়।'[২৯] বস্তুত, সাধকের পুরুষকার বা নিজের চেষ্টার সব সময়ই দরকার। যদিও সেই পুরুষকারই সব নয়—ঈশ্বরকৃপার ফলেই শেষ কাজটি অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ সম্পন্ন হয়। গুরুকৃপা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। গুরু মন্ত্র দিলেও, গুরু শিষ্যের ভার নিলেও শিষ্যের দিক

থেকে সাধনভজনের একান্ত প্রয়োজন। মায়ের জনৈক দীক্ষিত সন্তান মাকে বলেছিলেনঃ 'যদি [আমি] ইষ্টমন্ত্র জপ না করতে পারি?' মা বলেছিলেনঃ 'সে কি ইষ্টমন্ত্র জপ করবে না—ইষ্টমন্ত্র জপ না কর তোমারই যাবে আমার কি হবে?'[৩০] মা বহুবার সুস্পষ্টভাবে কিংবা পরোক্ষ ইঙ্গিতে বলেছেন যে, তিনি যাঁদের কৃপা করেছেন, তাঁদের শেষ জন্ম, তাঁদের ঠাকুর নিজে এসে হাতে ধরে নিয়ে যাবেন। তবুও যে মা দীক্ষিত সন্তানকে সাধনভজনের জন্য জোর করছেন, তার কারণ সম্ভবত মায়ের এই উক্তিতে আছেঃ 'আমার যা করে দেবার, আমি সেই এক সময়ে (দীক্ষাকালে) করে দিয়েছি। তবে যদি সদ্য শান্তি চাও, সাধনভজন কর, নতুবা দেহান্তে হবে।'[৩১] যাঁকে উদ্দেশ্য করে এদেশের মাতৃসাধক গেয়েছিলেন 'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি...কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে কর অধোগামী,' শ্রীশ্রীমা সেই সাক্ষাৎ জগজ্জননী, মহামায়া স্বয়ং। তিনি যাঁদের কৃপা করেছেন, তাঁদেরও যখন সাধনভজনের প্রয়োজন আছে তখন অন্যান্য সিদ্ধগুরুর কাছে যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক-চর্চার যে বিশেষ প্রয়োজন, এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ গুরুকৃপা, ঈশ্বর-কৃপা—সব ফলপ্রসূ হয় যখন 'আত্মকৃপা' অর্থাৎ সাধকের নিজের প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ও থাকে। সেইজন্য মা বলছেনঃ 'খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও [ভগবানকে ডাকার] একটি সময় করে নিতে হয়।'[৩২] বলছেনঃ 'সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কভু না মিলে।—চন্দন না ঘষলে কি গন্ধ বের হয় বাবা?'[৩৩] তবে নিষ্ঠাভরে সাধনভজন করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের এটাও মনে রাখা দরকার যে, নিজের চেষ্টায় কেউ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। সিদ্ধি আসে ঈশ্বরের কৃপায়। কারণ দেহধারণ করলেই ঈশ্বরের মায়ার এলাকায় এসে পড়তে হয়। মহামায়ার প্রসন্নতা ভিন্ন সিদ্ধি সম্ভব নয়। তাই শ্রীশ্রীমা বলতেনঃ 'এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।'[৩৪] তবুও জপধ্যানের উপযোগিতা থেকেই যায়। কারণ, তার দ্বারা 'কর্মপাশ কেটে যায়,'[৩৫] এবং যে প্রারব্ধকর্ম-ভোগকে আমরা অবশ্যম্ভাবী বলে জানি, মায়ের মতে, সেই ভোগও জপধ্যানের ফলে অনেকটা কমে যায়। মা বলছেনঃ 'প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।'[৩৬] বলছেনঃ 'কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। জপতপ করলে কর্ম অনেকটা খণ্ডন হয়। যেমন সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়ে দেবীর আরাধনা করেছিল বলে লক্ষ পাঁঠায় মিলে তাকে এক কোপে

কাটলে। তার আর পৃথক্ লক্ষ বার জন্ম নিতে হল না। দেবীর আরাধনা করেছিল কিনা। ভগবানের নামে কমে যায়।'[৩৭]

মানুষ যে বার বার সংসারচক্রে যাওয়া-আসা করে, তার কারণ বাসনা-কামনা। মা বলছেনঃ 'বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়।'[৩৮] এই 'যাতায়াত' বা 'দেহ হতে দেহান্তর'ই হচ্ছে সংসার। শঙ্করাচার্য বিবেকচূড়ামণিতে বলেছেনঃ

> বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং কার্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
> বর্দ্ধতে সর্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ততে॥[৩৯]

—বাসনার বৃদ্ধিতে কর্মবৃদ্ধি, আবার কর্মের বৃদ্ধিতে বাসনার বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এবং এর ফলে মানুষের সংসারগতি আর নিবর্তিত হয় না। তার 'যাতায়াত ফুরায় না'। মা তাই বলছেনঃ 'একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়।... বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ—যেমন বিন্দুপরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই। বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর এক খোলে ঢুকিয়ে দিলে।'[৪০] 'বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।'[৪১] সেইজন্য মা বলতেনঃ ভগবানের কাছে 'এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়'।[৪২] সাধনভজন সব কিছুরই উদ্দেশ্য বাসনা-কামনার পারে গিয়ে নির্বাসনা হওয়া, কেননা বাসনা-কামনাই সংসার অথবা বলা যায় সংসারের কারণ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে চিত্তশুদ্ধি হলেই জ্ঞানের উদয় হয়। চিত্তশুদ্ধির অর্থই হল বাসনাশূন্য হওয়া। সাধক রামপ্রসাদ বাসনাতে (বাস্নায়) আগুন জ্বেলে দিতে বলেছেনঃ 'বাস্নায় দে আগুন জ্বেলে ক্ষার হবে তায় পরিপাটী।' এই ক্ষারের নামই চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধ হয় বলতে চিত্ত বা মন চৈতন্যে রূপায়িত হয়। শঙ্করাচার্য বলছেনঃ 'বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ'[৪৩]—বাসনার বিনাশই মুক্তি। বাসনার জন্যই স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান যেন আবৃত হয়ে থাকে। বাসনাশূন্য হলেই জ্ঞান হয় এবং 'জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ' (জ্ঞানেই মুক্তি)। মা-ও সেইকথাই বলছেনঃ নির্বাসনা হলেই 'তত্ত্বজ্ঞান'-এর উদয় হয়—'নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।'[৪৪] অর্থাৎ এক্ষুণি পরমার্থ বা মোক্ষ লাভ হয়। নির্বাসনার অর্থই তো জন্মমৃত্যু-প্রবাহের পার। জন্মমৃত্যুর প্রবাহের নামই সংসার। সুতরাং বাসনার পারে গেলেই শান্তি, মুক্তি এবং সংসার-নিবৃত্তি।

জ্ঞান হলে কি হয়? শ্রীমা বলছেনঃ 'জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠুকুর সবই মায়া।'[৪৫] ঈশ্বরের সাকার দর্শন যতক্ষণ পর্যন্ত হয় কিংবা সবিকল্প সমাধি হওয়া পর্যন্তও বলা যায় না যে জ্ঞান হয়েছে। কারণ তখনও পর্যন্ত জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতার ত্রিপুটী থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় নির্বিকল্প সমাধিতে, যখন

এই ত্রিপুটীর লয় হয়। তখন 'একরস' 'অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ'ই শুধু অবস্থিত থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ 'যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।'[৪৬] ভক্তি-পথে সাকার ইষ্টবিগ্রহ অবলম্বন করে সাধনা শুরু করে ভক্তের প্রথমে ইষ্টদর্শন হয়, তারপরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার নির্বিকল্প সমাধিও হতে পারে। নির্বিকল্প সমাধি হলে ভক্তিপথের সাধকের কাছে তার ইষ্টের সাকাররূপ ও সগুণ সত্তা এবং এই জীবজগৎ, যাকে সে তার ইষ্টের লীলাবিলাস বলে জেনেছিল—সব মায়া বলে প্রতিভাত হয়। মায়ের উপরোক্ত কথার তাৎপর্য এইটিই। শ্রীমা আরও বলেছেনঃ 'শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো, সোজা কথাটা!'[৪৭] শ্রীরামকৃষ্ণ যে 'বিজ্ঞান'-এর কথা বলেছেন, এখানে শ্রীমাও তা-ই বললেন। ঠাকুরের মতে জ্ঞানের পরে বিজ্ঞান আসে। জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু বিজ্ঞান-অবস্থায় ব্রহ্ম সত্য জগৎও সত্য—কারণ, 'ব্রহ্মময়ং জগৎ', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। জগৎ ব্রহ্মই, সর্ববস্তু ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমার অনুসরণ করে বলা যায়, ছাদে ওঠার সময় ছাদকেই একমাত্র লক্ষ্য করে যে সিঁড়িগুলিকে গৌণ করা হয়েছিল, ছাদে ওঠার পর দেখা যায় ছাদ এবং সিঁড়ি স্বরূপত এক -দুই-ই এক চুন-সুরকি দিয়ে তৈরী। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্রহ্ম-'বিজ্ঞানী' দেখেন, যে-জীবজগৎকে তিনি 'নেতি নেতি' বিচার করে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এসেছিলেন, সেই জীবজগৎও সত্য—কারণ জীবজগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বভূতে এক ব্রহ্মকে তিনি তখন প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ কিন্তু ব্রহ্মোপলব্ধিরূপ ব্রহ্মভাবেরই ফলশ্রুতি। তার কাছে তখন ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বলে আর কিছু থাকে না। কারণ, এই বৈচিত্রময় 'দ্বন্দ্বাত্মক' জগতের পেছনের একক 'অধিষ্ঠানটিকে' দেখতে তিনি কখনও ভুল করেন না। এই একত্ব-দর্শনই সর্বোচ্চ অবস্থা। তাই নরেন্দ্রনাথ যখন নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকতে চেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেনঃ তার চেয়েও উঁচু অবস্থা আছে! তুই যে গানু করিস যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।[৪৮] অর্থাৎ এই বিজ্ঞানীর অবস্থার কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন। এই বিজ্ঞানীর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই স্বামী তুরীয়ানন্দ দেহত্যাগের সময় বলেছিলেনঃ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সব সত্য—সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।'[৪৯] শ্রীমা এই একত্ব-দর্শনের অবস্থাটিকে বর্ণনা করেছেন এই ভাষায়ঃ 'সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি।'[৫০] একই তত্ত্ব স্বামীজীর ভাষায় রূপ পেয়েছেঃ 'ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।'[৫১] এই একত্ব-দর্শনকে শ্রীমাও সাধকজীবনের শেষ বা সর্বোচ্চ অবস্থা মনে করেছেন। তাই বলেছেনঃ শেষে দেখে

মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এইতো সোজা কথাটা। এই 'সোজা কথাটা'ই বস্তুত 'শেষ কথা'।

সব ধর্মমতই পরমতত্ত্ব উপলব্ধির এক একটি পথ বা উপায়। ঈশ্বরের যে-কোন নাম, যে-কোন রূপ অবলম্বন করে, আবার তাঁকে সব নাম-রূপের পার নিরাকার-নির্গুণ সত্তারূপে চিন্তা করেও মানুষ সেই চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারে। উপমার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ নানান উপমার সাহায্যে সহজ-সরলভাবে এই তত্ত্বটিকে উপস্থিত করেছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' সেগুলি আছে। তাঁর লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবীও এই ধর্মসমন্বয়ের কথা বলেছেন নিজস্ব উপমায়ঃ 'ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখীর বোল বলি—একটাই পাখীর বোল আর অন্যগুলো পাখীর বোল নয় এরূপ বলি না।'[৩২] বিভিন্ন শাস্ত্র এবং বিভিন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশের মধ্যে কোন বিভিন্নতা যদি থেকেও থাকে তাহলেও সেসব উপদেশ সত্য। কারণ, সেগুলি একই সত্যে পৌঁছনোর বিভিন্ন পথনির্দেশ শুধু। বিভিন্নতার কারণ—যাদের উদ্দেশে সেই উপদেশগুলি, তাদের রুচি, প্রকৃতি ও যোগ্যতার বিভিন্নতা।

চরম লক্ষ্যকে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন সাধক বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে থাকলেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারলে সবাই একই রকম অনুভব করে থাকেন। 'সেখানে সব শেয়ালের এক রা।' সব ধর্মমত সব সাধনপথ যে একই লক্ষ্যের কথা বলে এ তত্ত্ব সব দেশের ধর্মশাস্ত্রেই থাকলেও কালক্রমে মানুষ তা ভুলে যাওয়ায় ধর্মে ধর্মে বিরোধের সৃষ্টি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের বৈশিষ্ট্য হল এই 'যত মত তত পথ'-তত্ত্বে নতুন প্রাণসঞ্চার। বিভিন্ন ধর্মমতে সাধন করে নিজের উপলব্ধির ভিত্তিতে এই সনাতন 'সর্বধর্মসমন্বয়'-তত্ত্বকে তিনি জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী ও সাধন সম্পর্কে শ্রীমা একটি অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার উল্লেখ করে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেছেনঃ 'আমাদের মা জ্ঞানময়ী এবং জ্ঞানদাত্রী। ঠাকুর বলেছেন, "ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" "সমন্বয় ভাল বটে, তবে ঠাকুর এসে-ছিলেন ত্যাগের ভাব দেখাতে"—মায়ের এই কথাটাই ধরুন না—এতেই দেখতে পাবেন কতখানি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, কেমন করে সব বুঝতে পারতেন। স্বামীজী বার বার বলে গেছেন, "সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ"। হঠাৎ মা কেন বলতে গেলেন, "তিনি যে মতলব করে সমন্বয় প্রচার করেছেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় না। তিনি ত্যাগের ভাবই দেখিয়েছেন, প্রচার করেছেন।" ঠাকুর স্বয়ং বলে গেছেন, "আমি নিজে থেকে কিছু করিনি। মা আমাকে যেমন করিয়েছেন, বলিয়েছেন, তেমনি করেছি, বলেছি।" সমন্বয় যদি তাঁর জীবনের ভেতর দিয়ে প্রচারিত হয়ে থাকে, সে সমন্বয় তিনি করেননি, সে সমন্বয় করিয়েছেন মা-কালী, জগদম্বা। মতলব করে তিনি কিছু করেননি। মতলব করে, বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা দর্শন লিখতে পারি, বই লিখতে পারি।

ঠাকুর যেসব ভাব প্রচার করেছেন তা বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্ট হয়নি, সেসব এসেছে, উৎসারিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে, মায়েরই শক্তিতে। মা-ই তাঁকে সেসব ভাব যুগিয়ে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা এইদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, "ঠাকুর মতলব করে কিছু করেননি।" এ অন্তর্দৃষ্টি।'[৩৩]

॥ ৩ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই অংশে বিশেষভাবে আলোচিত হবে জ্ঞানদায়িনী মায়ের করুণাবিগলিত গুরুমূর্তি।

জ্ঞানদায়িনী সারদা গুরু বা আচার্য রূপে কৃপা করেছেন অগণিত মানুষকে। তাঁর সেই কৃপাবিতরণের ইতিহাস বিচিত্র, বিস্ময়কর এবং অপার্থিব সুষমায় মণ্ডিত।

শ্রীমা অনেককেই সাক্ষাতে দীক্ষা দেওয়ার আগেই স্বপ্নে কৃপা করেছেন। এবং সেই অলৌকিক কৃপাদানের ফলে সেসব ক্ষেত্রে শ্রীমার ঐশী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও সন্তানরা অবহিত হয়েছেন। রাঁচি-নিবাসী জনৈক যুবক-ভক্ত দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তার উত্তর আসতে দেরি হওয়ায় তিনি পাগলের মতো অস্থির হয়ে ওঠেন। সেই অবস্থায় এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, কালীঘাটের মা-কালী তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বলছেনঃ ভয় কি বাবা, আমি তো রয়েছি।' এই-কথা বলেই সেই চতুর্ভুজামূর্তি দ্বিভুজা নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হলেন—তাঁর পরনে লালপেড়ে কাপড়, হাতে বালা। সেই মাতৃমূর্তি সেই যুবককে বীজসহ একটি নাম দিয়ে রোজ একশ আট বার জপ করতে নির্দেশ দিলেন ও বললেনঃ 'তুমি এটি করে যাও, আর যা করতে হয় আমি করব।' যুবকটি এই স্বপ্নের কথা কারও কাছে প্রকাশ না করে ঐ মাতৃমূর্তির দর্শন কোথায় পাবেন তাই চিন্তা করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পরে মায়ের আশ্রিত জনৈক ভক্তের কাছ থেকে শ্রীমার কথা প্রথম শুনে যুবকটির মনে হলঃ এই মা-ই কি আমার স্বপ্নদৃষ্ট সেই মা? তিনি আর দেরি না করে ঐ ভক্তটির কাছ থেকে পথ জেনে নিয়ে জয়রামবাটী রওনা হলেন। জয়রামবাটীতে পৌঁছে নির্ধারিত সময়ে মায়ের দর্শনের জন্য মায়ের বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করেই যুবকটি দেখলেনঃ বারান্দায় কয়েকটি স্ত্রীলোক বসে আছেন, এবং তাঁদের একজন বঁটিতে তরকারি কুটছেন। যুবকটিকে দেখেই অন্য স্ত্রীলোকেরা উঠে গেলেন, কিন্তু যিনি তরকারি কুটছিলেন তিনি বসে রইলেন। তাঁর দিকে চেয়েই যুবকটি হতবাকঃ তাঁর স্বপ্নে দেখা মা! সেই চোখ, সেই মুখ—সেই ভাব। তাঁর অন্তর থেকে কে যেন বলে উঠলঃ 'ইনিই জগজ্জননী, বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বেশ্বরী মা।' যুবকটি একরকম আবিষ্ট অবস্থায় নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীমা তখন বঁটিখানা কাত করে রেখে ঘরের ভেতরে গিয়ে হাতছানি দিয়ে যুবককে ডাকলেন। যুবক ঘরের ভেতরে গিয়েও নীরবে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মা-ও রয়েছেন

তাঁর দিকে চেয়ে। কিছুক্ষণ পর মা-ই নীরবতা ভঙ্গ করে বললেনঃ 'হ্যাঁগা, আমায় কি করে চিনলে?' যুবকের চোখে জল, বাষ্পরুদ্ধ অস্ফুটস্বরে কি যেন বললেন। শুনে মা হাসলেন। সেই হাসি দেখে যুবক সম্বিৎ ফিরে পেলেন, মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। দুদিন পরে যুবকের দীক্ষা হল। যুবকের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইল না যখন দেখলেন মা তাঁকে সে-ই মন্ত্রই দিয়েছেন যে মন্ত্র তিনি স্বপ্নে পেয়েছিলেন।[৫৪]

অনেক ক্ষেত্রে শ্রীমা স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রের সঙ্গে আরও একটি অংশ বা বীজ যুক্ত করে মন্ত্রটি পূর্ণাঙ্গ করে দিয়ে দীক্ষার্থীকে কৃপা করতেন।

হিন্দুস্থানী কুলির ঘটনাটি মায়ের জীবনীপাঠক মাত্রেই জানেন। মা একবার জয়রামবাটী থেকে কলকাতা আসবার পথে বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে গাড়ির জন্য যখন অপেক্ষা করছিলেন তখন কোথা থেকে একটি হিন্দুস্থানী কুলি মাকে দেখে ছুটে এসে বলেঃ 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায়নে কিৎনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইৎনে রোজ তু কাঁহা থী?' (তুমি আমার জানকী মা। আমি তোমায় কতদিন ধরে খুঁজছি। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?) এই বলে সে অঝোরে কাঁদতে থাকে। মাযের নির্দেশে কুলিটি একটি ফুল এনে মায়ের পায়ে দিলে মা তাকে সেখানে বসেই দীক্ষা দিলেন।[৫৫] কুলিটি সম্ভবত মায়ের সাক্ষাৎ দর্শনের আগেই স্বপ্নে কিংবা অন্যভাবে মাকে সীতারূপে দেখেছিল।

• মায়ের দীক্ষাদানে স্থান-কাল, সময়-অসময়, আয়োজন-উপচারের আড়ম্বর বিশেষ ছিল না। হিন্দুস্থানী কুলিকে রেল-স্টেশনে দীক্ষা দিলেন। পুলিসের নজরবন্দী একটি ছেলেকে মা মাঠের মধ্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মা কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রম থেকে রাধুর বাড়িতে যাচ্ছেন। সঙ্গে সেবক। এমন সময় মাঠের মধ্যে ছেলেটির সঙ্গে দেখা। ছেলেটি আগেই দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছিল। মা সেবককে দিয়ে 'দুটি' খড় এবং একটা গ্লাসে করে কাছের পুকুর থেকে একটু জল আনিয়ে ঐ মাঠের মধ্যেই খড় পেতে বসে ছেলেটিকে দীক্ষা দিলেন।[৫৬] জয়রামবাটীতে মা একবার পাশাপাশি শায়িত-অবস্থায় তাঁর এক বাল্যসখীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[৫৭]

শ্রীমা অনেক অল্পবয়স্ক বালককেও দীক্ষা দিয়েছেন। একটি বারো বৎসরের ছেলে একদিন উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করে কাঁদতে লাগলঃ 'মায়ের কৃপা চাই।' সবাই ছেলে-মানুষী মনে করে ছেলেটির কথা উড়িয়ে দিল। পরদিন ছেলেটি আবার এসে উদ্বোধনের রোয়াকে বসে আছে। মা রাধুকে বললেনঃ 'দেখবি রোয়াকে একটি ছেলে বসে আছে, তাকে নিয়ে আয়।' ছেলেটিকে উপরে নিয়ে আসা হলে মা তাকে দীক্ষা দিলেন। অতটুকু ছেলেকে দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সেবক অনুযোগ করলে মা উত্তর দিলেনঃ 'তা যা হোক, বাপু: ছেলেমানুষ—কাল তো অমন করে পায়ে ধরে কাঁদলে। কে ভগবানের জন্য কাঁদছে বল দেখি? এ মতি কজনের হয়?'[৫৮] রামেশ্বর থেকে কলকাতায় ফিরবার পর শ্রীমা তেরো বছরের একটি দীক্ষাপ্রার্থী বালককে গোলাপ-মার প্রবল বাধা সত্ত্বেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। আর একবার জয়রামবাটীতে

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে রাঁচি থেকে একটি বালক এসেছিল। বালকটির দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পূজার ভিড়ে মাকে সেকথা বলতে পারেনি। বিদায় নেওয়ার দিন সে মায়ের পায়ে মাথা রেখে এমন কাঁদতে থাকে যে চোখের জলে মায়ের পা ভিজে গেল। মা তাকে হাত ধরে তুলে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কাঁদছ কেন, বাবা? কি চাও—মন্ত্র নেবে?' মায়ের শরীর সেদিন সুস্থ ছিল না। তবুও তক্ষুণি ঐ অবস্থাতেই দরজা বন্ধ করে মা ছেলেটিকে দীক্ষা দিলেন।[৫৯]

গুরুরূপী শ্রীমায়ের কৃপা অন্যান্য সব জাগতিক বাধার মতো ভাষা ও দেশের ব্যবধানও অতিক্রম করে গেছিল। মা যখন দক্ষিণভারতে গেছিলেন, তখন সেখানকার অনেক আশ্রয়প্রার্থীকে কৃপা করেছেন। ভিন্ন ভাষাভাষী কোন ব্যক্তিকে দীক্ষাদানের সময় মা তাঁর সব উপদেশ বাংলাতেই বলতেন—কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোন অনুবাদকের সাহায্য ছাড়াই দীক্ষার্থীরা তাঁর উপদেশের মর্ম সব বুঝতে পারত।

একবার বোম্বাই থেকে এক পার্শী যুবক উদ্বোধনে মায়ের দর্শনপ্রার্থী হয়ে আসেন। মা তখন সদ্য ম্যালেরিয়ায় ভুগে অতি দুর্বল অবস্থায় জয়রামবাটী থেকে কলকাতা এসেছেন। ভক্তদের মাকে দর্শন করার অনুমতি পর্যন্ত নেই। তবে সম্ভবত অতদূর থেকে এসেছেন বলেই সারদানন্দজী পার্শী যুবকটিকে মায়ের কাছে যেতে দিলেন। মায়ের কাছে গিয়ে যুবকটি কিন্তু দীক্ষা চেয়ে বসলেন। বললেনঃ 'মাঈজী, কুছ মূলমন্ত্র দীজিয়ে জিসসে খুদা পহচানা জায়।' সেবক রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) প্রমাদ গুনলেন। মাকে বললেনঃ 'সে কি! কাউকে দর্শন পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না, সবে অসুখ হতে উঠেছ, শরৎ মহারাজ শুনলে কি বলবেন। এখন নয়, এর পরে হবে।' মা কিন্তু সেদিনই পার্শী যুবকটিকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[৬০]

একবার একটি মেম মায়ের কাছে তাঁর মেয়ের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে এলে মা মেমটির সঙ্গে কথা বলে এত খুশী হয়েছিলেন যে, মা শুধু তাঁর প্রার্থনাই পূরণ করেননি, পরে তাঁকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন।[৬১] মেমটি বাংলা জানতেন। মাদ্রাজে অমৃতানন্দ নামে একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী (আগের নাম মিঃ জনসন) মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন।[৬২] ডাঃ হ্যালক ও মিস গ্রে (পরে মিসেস হ্যালক) নামে মায়ের আরও দুজন আমেরিকান শিষ্য ছিল।[৬৩]

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মায়ের কাছে আগত ভক্তের মনে দীক্ষালাভের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাই জাগেনি—তবুও মা অযাচিতভাবে তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। ময়মনসিংহের সুরেশচন্দ্র ঘোষকে স্বামী প্রেমানন্দ বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে পাঠিয়েছেন মাকে দর্শন করতে। সঙ্গে ময়মনসিংহের আরও কয়েকজন ভক্ত। একজন সাধু এসে এক এক করে ভক্তদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন প্রণামের জন্য। সুরেশ ঘোষের পালা এলে তিনি গিয়ে মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেই মা তাঁকে বসতে বললেন এবং সেখানেই দীক্ষা দিলেন। অথচ সুরেশ ঘোষ দীক্ষার জন্য যাননি, দীক্ষার কথা ভাবেননি পর্যন্ত।[৬৪]

অনুকূল চন্দ্র সান্যাল যখন মাকে দর্শন করতে যান তখন তাঁর খুব অল্প বয়স। সঙ্গে তাঁর দু-বন্ধু। তিনজনের মধ্যে তিনিই বয়ঃকনিষ্ঠ বলে প্রথম দিনই মায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় দিনে ভোরে উঠেই তিনি মায়ের বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। ভেতরে গিয়ে মায়ের কাছে যেতেই মা বললেনঃ 'বাবা, তোমাকে এই নাম দিলাম।' অনুকূলবাবু তখনও বুঝতে পারেননি যে, মা তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি বাইরের ঘরে এসে বন্ধুদের একজনকে ঘটনাটি বলতে গেলে বন্ধুটি একটু শুনেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, মা তাঁকে ঐভাবে মন্ত্র-দীক্ষা দিয়েছেন এবং ঐ মন্ত্র কারও কাছে প্রকাশ করতে নেই।[৬৫]

শ্রীশ্রীমার কাছে মূল বিষয় ছিল ঈশ্বরলাভ এবং তার জন্য আন্তরিক ভক্তি ও নিষ্ঠা। অন্যান্য সব আনুষঙ্গিক তাঁর কাছে গৌণ। তাই দীক্ষার্থীদের উপর তিনি আচার-অনুষ্ঠানের বোঝা না চাপিয়ে তাদের বলতেন, জপধ্যান করতে ও ভক্তি-বিশ্বাস, প্রার্থনা, শরণাগতি প্রভৃতি অন্তরের গুণগুলির অনুশীলন করতে। জপধ্যান সম্পর্কিত তিনি যে নির্দেশ দিতেন সেগুলিকেও কোন নির্দিষ্ট ছকে ফেলা যায় না। কারণ, দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্তানের রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর নির্দেশ ভিন্ন ভিন্ন হত। মা তাঁর দীক্ষিত-সন্তানদের দৃষ্টি গুরু-শিষ্য সম্পর্কের থেকে বার বার করে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতেন মা-ছেলে সম্পর্কের দিকে। সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুর প্রতি ভক্তি, নির্ভরতা ও ভালবাসা একান্ত প্রয়োজন। সেই ভালবাসা, ভক্তি ও নির্ভরতা সাধকজীবনে অতি স্বাভাবিকভাবে আসে যদি জননীস্থানীয়া কেউ গুরু হন। শ্রীমা জগজ্জননী স্বয়ং। দীক্ষিত সাধকদের কল্যাণার্থে তিনি কিন্তু তাদের মনে নিজের আটপৌরে মাতৃমূর্তির ছাপটিই গভীরভাবে এঁকে দিতেন এবং এইভাবে সুযোগ করে দিতেন যাতে তারা সরল বিশ্বাসে তাঁর অতি নিকটে চলে আসতে পারে ও একান্ত নির্ভরতায় জীবনের সব ক্ষেত্রে এই মাতৃরূপা আচার্যকে আঁকড়ে ধরতে পারে। তাই তিনি বলতেনঃ আমি গুরু নই—ঠাকুরই গুরু। আমি মা, সকলের মা।[৬৬] শিষ্যদের বলতেনঃ সব সময় মনে রেখো তোমাদের একজন মা আছেন।[৬৭] তাদের আশ্বাস দিয়ে বলতেনঃ যারা তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে তাদের শেষ জন্ম।[৬৮] বলতেনঃ 'এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।...আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখ যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।'[৬৯]

শ্রীমা দীক্ষা দিতেন দীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সংস্কার এবং পারিবারিক উপাসনার ধারা অনুযায়ী। জনৈক ভক্ত শ্রীমার কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হলে শ্রীমা তাঁর বংশের মন্ত্র জানতে চাইলেন। ভক্তটি তা বলতে না পারলে শ্রীমা একটু চিন্তা করে নিজেই তাঁর বংশের মন্ত্র বলে দিলেন ও সেই মন্ত্রেই তাঁকে দীক্ষা দিলেন। আর একজন ভক্ত শক্তিমন্ত্রের প্রার্থী হলে শ্রীমা তাঁকে বলেনঃ 'তোমার ভেতর তো রামকে দেখছি।

তোমাদের বংশের সকলে কি রামমন্ত্রের উপাসক? রাম আর শক্তি তো অভিন্ন ; তবে আর রামমন্ত্র নিতে ক্ষতি কি?'[৭০] সত্যিই ঐ বংশের সকলে রামচন্দ্রের উপাসক ছিল।

আর একজন দীক্ষাপ্রার্থী শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণের আগে বলেছিলেন যে, শিবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট কালীমূর্তি তাঁর খুব ভাল লাগে। দীক্ষার্থীর অন্তরে হয়তো বাসনা ছিল যে, শ্রীমা তাঁর কথা শুনে শিব ও শক্তি উভয়েরই বীজমন্ত্র দেবেন। কিন্তু জ্ঞানদায়িনী শ্রীমা জানতেন যে, সূর্যরশ্মিকে ছেড়ে সূর্য যেমন থাকে না, মণির জ্যোতিকে ছেড়ে যেমন মণি থাকতে পারে না, তেমনি শিবকে ছেড়ে শক্তি কিংবা শক্তিকে ছেড়ে শিব কখনও থাকতে পারেন না—দুয়ের মধ্যে অভেদসম্বন্ধ। শ্রীমা ঐ দীক্ষাপ্রার্থীকে বললেনঃ 'শক্তি কি, বাবা, কখনও শিবকে ছেড়ে থাকেন? তোমার শক্তিমন্ত্র।' এই বলে শক্তিমন্ত্রে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। মন্ত্রলাভের সংগে সংগে ভক্তটির মনে হল তাঁর শরীরের ভেতর দিয়ে যেন তড়িৎপ্রবাহ বয়ে চলেছে। সারা শরীর তাঁর কাঁপতে থাকে। মন্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না।[৭১]

দীক্ষাপ্রার্থীর ব্যক্তিগত সংস্কার এবং বংশের সংস্কার ভিন্ন হলে মায়ের 'স্ফটিক-স্বচ্ছ চিত্তে যে সত্য উদ্ভাসিত' হত তাকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন।[৭২]

শ্রীমা দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্য যেভাবে ইষ্ট-নির্বাচন করে দিতেন, তা পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তিনি সর্বদাই জানতেন যে, একই ভগবৎসত্তা বিভিন্ন সাধকের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন দেবদেবীমূর্তিতে প্রকাশিত। যে-কোন নাম ও রূপ ধরেই সাধক শেষ লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারে। শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে অনেক ভক্তই বুঝতে পেরেছিলেনঃ শ্রীমা ও ঠাকুর স্বরূপত অভেদ, পূর্ব পূর্ব অবতারে অবতারের শক্তিরূপে যাঁরা এসেছিলেন, সেই শক্তিই এবার শ্রীরাম-কৃষ্ণলীলায় জ্ঞানদায়িনী সারদা ; শুধু তাই নয়, তিনিই স্বয়ং মহামায়া। কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপ বস্তুত তাঁরই এক একটা দিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধির পূর্বে জগতের মানুষের দায়িত্ব শ্রীমায়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেনঃ 'এ [অর্থাৎ তিনি নিজে] আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।'[৭৩] শ্রীমা পরবর্তীকালে ঠাকুরের নির্দেশমতো সেই 'অনেক বেশী' কাজ করেছেন পরম যত্নে, নিপুণভাবে। সেই অলৌকিক কৃপাবিতরণের কালে মা একবার বলেছিলেনঃ 'তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] নিয়েছেন সব বাছা বাছা ছেলে কটি—তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে সব পিঁপড়ের সার!'[৭৪] মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত লিখেছেনঃ 'এই পিঁপড়ের সারের জন্যই মার দয়ার শেষ বা চিন্তার অবধি ছিল না। ইহারা কেহ ঈশ্বরকোটিও না, বা অন্য কোন দিব্য গুণেও বিভূষিত নয়। অতি সাধারণ মানুষ—সাধারণ দোষ-গুণ পাপ-পুণ্যের অধীন। কিন্তু তাহারা যখন আসিয়াছে মা দুহাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যদি একটু ভাল দেখিয়াছেন, তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছেন। অনেক সময়েই পরিচয় লওয়া বা একটি কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। এমন কি, যখন অতি অযোগ্য লোক সকল তাঁহার নিকট আসিয়াছে,

তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু দয়ার বশবর্তী হইয়া তাহাদেরও দীক্ষা দিয়াছেন। অতি অল্প ক্ষেত্রেই কাহাকেও ফিরাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারও অধিকাংশ স্থলে একটু কাঁদাকাটিতেই তিনিই হার মানিয়া দীক্ষা দিয়াছেন।'[৭৫]

একদিন জয়রামবাটীতে তিনজন ভক্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দের চিঠি নিয়ে দীক্ষার জন্য মায়ের কাছে উপস্থিত হয়। মা সাধারণত বাতের জন্য পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু ভক্ত তিনটি প্রণামের জন্য মায়ের কাছে যাওয়া মাত্র অন্তর্যামিনী মা তাদের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিয়ে পা গুটিয়ে বসলেন। মায়ের অনুচ্চ খেদোক্তি শোনা গেলঃ 'শেষে কিনা রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) আমার জন্যে এই পাঠালে? ছেলে বিদেশে গিয়ে কত ভাল জিনিস পাঠায়, আর রাখাল কিনা আমার জন্যে এই পাঠালে?' মা তাদের দীক্ষা দিতে সম্মত হলেন না। ভক্তদের প্রাণ শান্ত হল না। মাকে আবার অনুরোধ করল, মা আবার অসম্মতি জানালেন। ঠাকুরের উদ্দেশে মা বললেনঃ 'ঠাকুর, কালও তোমার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, দিন যেন বৃথা না যায়। শেষে তুমিও কিনা এই আনলে?' অনেকক্ষণ চিন্তা করে মা কিন্তু শেষে দীক্ষাদানে সম্মত হলেন এবং বললেনঃ 'যতক্ষণ শরীর থাকে, ঠাকুর, তোমার কাজ করে যাই।' দীক্ষা হয়ে গেল। কিছুদিন বাদে মঠে যখন এই খবর গেল, ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ শুনে ব্রহ্মানন্দজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আর প্রেমানন্দজী একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে আবেগে বলে উঠলেনঃ 'কৃপা, কৃপা! এই মহিমময় কৃপাদ্বারাই মা আমাদের রক্ষা করছেন সর্বক্ষণ! কি বিষ তিনি নিজে গ্রহণ করলেন, তা আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। যদি এ বিষ আমরা গ্রহণ করতুম তো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম।'[৭৬]

বিরল কোনদিন যদি মায়ের কাছে একটিও ভক্ত না আসত তাহলে দেখা যেত এক অদ্ভুত দৃশ্য। মা অস্থিরভাবে ঘর-বার করছেন আর আকুলভাবে ঠাকুরকে বলছেনঃ 'আজও দিনটা বৃথাই গেল। একজনও তো এল না! তুমি না বলেছিলে. "তোমাকে নিত্যই কিছু না কিছু করতে হবে?"...কই, ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাবে?'[৭৭] দেখা যেত, জ্ঞানদায়িনী জননীর লোককল্যাণের আর্তি পূরণ করতে ঠাকুর কোন-না-কোন কৃপাপ্রার্থীকে শিগ্‌গিরই এনে হাজির করতেন তাঁর কাছে। তাই প্রায় কোনদিনই কৃপাবর্জিত যেত না। অশুদ্ধচিত্ত ভক্তেরা এসে প্রণাম করলে মায়ের দেবশরীরে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা হত, রোগ দেখা দিত। তবুও মায়ের কৃপা-বিতরণের বিরাম ছিল না। কেউ নিষেধ করলে বলতেনঃ 'কেন গো. ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন?'[৭৮] পাপী-তাপী সবারই জন্য ঠাকুর—'পতিতপাবন' শ্রীরামকৃষ্ণ। মা জানতেন, তিনি ঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী, তাঁর জীবনব্রতও সে-ই—পতিতোদ্ধারিণী তিনি। মা তাই বলতেনঃ 'ভাল ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, মন্দটি কে নেয়?'[৭৯] বলতেনঃ 'আমরা তো ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপীতাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে?'[৮০] তাই

মন্ত্রদানের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবেই শিষ্যের পাপ গ্রহণ করতে হয় জেনেও করুণা-ময়ী মা 'দয়ায়' মন্ত্র দিতেন, 'কৃপায়' মন্ত্র দিতেন; আর ভাবতেন, 'শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।'[৮১]

অসুস্থ শরীরেও এই কৃপা-বিতরণ ছিল অব্যাহত। ম্যালেরিয়ায় ভুগে মা দুর্বল। তাই শরৎ মহারাজের নির্দেশে দর্শনাদি সাময়িকভাবে বন্ধ। এরকম পরিস্থিতিতে একদিন সুদূর বরিশাল থেকে এক ভক্তের আবির্ভাব দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে। একদিকে ভক্তের আকুলতা, অন্যদিকে সেবকের কর্তব্যনিষ্ঠা—দুয়ের সংঘর্ষে বাদানুবাদের সূত্রপাত। হঠাৎ দেখা যায় অসুস্থ মা আলুথালুভাবে দরজায় উপস্থিত। সেবককে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'কেন তুমি আসা বন্ধ করছ?' সেবক জানালেনঃ শরৎ মহারাজের নিষেধ। মা তীব্রস্বরে বলে উঠলেনঃ 'শরৎ কী বলবে? আমাদের ঐ জন্যেই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।'[৮২] পরদিন মা ভক্তটিকে দীক্ষা দিলেন।

শ্রীমাকে দেখা যেত সর্বদাই জপ করতে। শেষ বয়সে শরীর যখন দুর্বল, অধিকাংশ সময়ই যখন বিছানায় শুয়ে কাটাতেন, তখনও জপের বিরাম ছিল না। রাতেও ঘুমোতেন খুব কম—জপ করেই কাটাতেন। কেউ ঘুমোতে বললে বলতেনঃ 'ঘুম কি আর আছে, না আসে? মনে হয়, যতক্ষণ ঘুমুব, ততক্ষণ জপ করলে জীবের কল্যাণ হবে।'[৮৩] বলতেনঃ 'কি করি, বাবা, ছেলেরা ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত—নিয়মিত কেন, কেউ বা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি। আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, "হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও। এই সংসারে বড় দুঃখকষ্ট। আর যেন তাদের না আসতে হয়।"'[৮৪]

মায়ের স্বমুখে কথিত তাঁর দুটি 'অনুভূতি'র বিবরণ দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করা যেতে পারে। মা বলছেন একদিনের কথাঃ 'একটা ডেয়ো পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি তাকে মারবে। দেখলুম কি তা জান? দেখলুম, সেটা পিঁপড়ে তো নয়—ঠাকুর, ঠাকুরের সেই হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই।—রাধিকে আটকালুম। ভাবলুম, তাই তো, সব জীব যে ঠাকুরের! আমি আর কি করতে পাচ্ছি—কজনকে দেখতে পাচ্ছি? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন! সকলকে দেখতে পাত্তুম, তবে তো হত।'[৮৫] আর একদিনের দর্শন সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ 'একবার দেখি কি, তা জান? দেখি না, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই সৃষ্টি, তিনি সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না—তিনিই পাচ্ছেন। তাইতো যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিসে তাঁকেই করি।'[৮৬]

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কোন্ সু-উচ্চ দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীমা গুরু বা আচার্যের ভূমিকা পালন করতেন। জীবের যন্ত্রণা শ্রীরামকৃষ্ণেরই যন্ত্রণা। শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্রণা 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' সারদারও যন্ত্রণা। জ্ঞানদায়িনী মা তাই 'দয়ায় আত্মহারা'

হয়ে আচার্যরূপে আশ্রয় দিয়েছেন অসংখ্য মানুষকে—যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্বিচারে। শুধু তাই নয়, যেটুকু শিষ্যের অবশ্য-পালনীয় দায়িত্ব, শিষ্য যখন সেটুকুও করতে অক্ষম হয়েছে কিংবা অযত্ন করেছে, মা স্বেচ্ছায় বিনা অনুযোগে সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে শিষ্যের লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ নির্বিঘ্ন করে দিয়েছেন। রাত জেগে জপ করার তাৎপর্য সেখানেই। নইলে পবিত্রতাস্বরূপিণী জগজ্জননীর নিজের জন্য সেসবের কি প্রয়োজন! এবং শিষ্যদের কল্যাণার্থে সূক্ষ্মশরীরে আজও তিনি সেই কাজ করে যাচ্ছেন অব্যাহতভাবে। মা নিজেই বলে গেছেনঃ 'তোমরা কি মনে কর, যদি ঠাকুর এ শরীরটা না রাখেন, তা হলেও যাদের ভার নিয়েছি তাদের একজনও বাকি থাকতে আমার ছুটি আছে? তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তাদের ভাল-মন্দের ভার যে নিতে হয়েছে।...যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের তো আর ফেলতে পারিনে।'[৮৭]

*   *   *

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ শ্রীমা মহাজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, সংসারে জ্ঞান দেবার জন্য এসেছেন. নিজের রূপ ঢেকে—ছদ্মবেশে। বস্তুত, অজ্ঞানের তমসায় জ্ঞানের প্রদীপ জেবলে দেবার অধিকারী তিনিই, যিনি বিদ্যারূপিণী মহাশক্তি, যিনি চিরমুক্ত ও বিজ্ঞানের অনির্বাণ আলোয় চিরস্নাত। শ্রীশ্রীমা সারদা প্রজ্ঞা ও বিদ্যারূপিণী সরস্বতী। তাই একমাত্র তিনিই পারেন অপরকে জ্ঞান ও অভয় দিতে। অপর লৌকিক আচার্যরা তাঁরই জ্ঞানের আলোকে আলোকিত।

তাই অজ্ঞান-অন্ধ মানুষের চোখে জ্ঞানের অঞ্জন পরিয়ে দিতে যুগে যুগে অনেক আচার্য জগতে এলেও সারদাদেবী তাঁদের মধ্যে একক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে রইলেন নানা কারণে। আচার্যের এমন বিশ্বপ্লাবী মাতৃমূর্তি জগৎ এর আগে কখনও দেখেনি। এ এক অভিনব আচার্য। সাধক এখানে সন্তান, গুরু হয়েছেন জননী। গুরু গ্রহণ করেন শিষ্যসেবার দায়িত্ব, আর শিষ্য পরম তৃপ্তিতে নিঃসঙ্কোচে সেই সেবা গ্রহণ করেন। জ্ঞান এখানে পরিবেশিত মাতৃস্নেহের আবরণে, তাই কখনই তা নীরস নয়। তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রতাও মধুর প্রতি পদক্ষেপে। জ্ঞানদায়িনী জননী সারদাদেবী জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

শ্রীরূপিণী

শ্রী ও সারদা একই অঙ্গে একটি যুগল-রূপের অপূর্ব চিত্রপট।

আসলে শ্রী ও সারদা অভিন্না অথবা বলা যায়, 'শ্রী' সারদারই আর এক রূপ। অর্থাৎ 'শ্রী' সারদার কোন সম্মান-বিশেষণ নয়।

আভিধানিক পরিক্রমায় শ্রীকে নানান রূপে নানান ভাবে পাচ্ছি—শোভা, লাবণ্য, সিদ্ধি, ঐশ্বর্য, অভ্যুদয় প্রভৃতি। বেদে শ্রী—সৌন্দর্য। পৌরাণিক ঐতিহ্যে 'শ্রী' নারায়ণী—লক্ষ্মী, কমলা—ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী-সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন নারায়ণ, সারদা লক্ষ্মী।[১] সারদার লক্ষ্মী-রূপ তাঁর লীলাসহচরীদের কাছেও প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর অন্যতমা লীলাপার্ষদ গৌরী-মা যে শুধু তা উপলব্ধি করেছেন তাই নয়, অনেক সময় তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণাও করেছেন। কামারপুকুরে জনৈক বৃদ্ধ সাধুকে শ্রীমায়ের স্বরূপের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছিলেনঃ 'ইনি মা কমলা, এঁর হাতের প্রসাদ পাওয়া মহাভাগ্যের কথা!'[২] একবার শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর থাকা-কালীন জনৈকার বিরূপ মন্তব্যে সারদা গায়ের সব অলঙ্কার খুলে ফেলেন। তখন গৌরদাসী তাঁকে বলেনঃ 'তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তোমায় কি এমন বেশ ধরতে আছে! তোমার গায়ে সোনা থাকলে তাতে জগতেরই কল্যাণ।'[৩] গৌরী-মা বিশ্বাস করতেন স্বয়ং নারায়ণ এবং লক্ষ্মীই নরলীলার জন্য শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছেন। সেই ভাবই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর আর একটি উক্তিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সারদা সামাজিক রীতি অনুসারে বিধবার বেশ ধারণ করতে গিয়েছিলেন একাধিক-বার। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবারই তাঁকে দর্শন দিয়ে তা থেকে নিরস্ত করেছিলেন। সারদা সেকথা গৌরী-মাকে বললে তিনি বলেছিলেনঃ 'ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী; তুমি সধবার বেশ ত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।'[৪] সারদা নিজেও একবার অসতর্কে বলে ফেলেছিলেন, তিনি সাধারণ নারীর মতো কাজকর্ম করলেও আসলে 'বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী'রূপে তাঁর স্থান।[৫]

আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সম্পর্কে বলছেনঃ 'ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।'[৬] কিন্তু যা বলা হয়নি—সারদার সেই নিত্যসঙ্গী-রূপটি—'শ্রী'।

অর্থাৎ সারদা হলেন শ্রী ও সারদার যুগল মূর্তি। শ্রীরূপিণী সারদা সর্বক্ষণ আমাদের বিশৃঙ্খলা থেকে ছন্দের গতিপথে, বিষমা থেকে সুষমার চর্যায়, অসুন্দর থেকে সুন্দরের মননে, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের নিত্য প্রেরণা। সারদার প্রতিটি কাজ ও আচরণের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে জ্ঞানদায়িনীর সঙ্গে শ্রীরূপিণীর মিলিত রূপের প্রকাশ দেখি আমরা। এই শ্রীরূপিণী ঐশ্বর্যে ও লাবণ্যে পূর্ণা কিন্তু কখনই বহির্বৈভবে অতিরঞ্জিতা নন। এখানে শ্রী কখনও স্নেহ-করুণায় কমলা হয়েছেন, কখনও হয়েছেন কঠোরতায় ভৈরবী, আবার কখনও শিল্পশ্রীতে সুন্দরী। নিত্য-জীবনের যাত্রাপথে সর্বক্ষণ যে চেতনা পূর্ণতার জীবন গড়ে—এই রূপশ্রী সেই ঐশ্বর্য-সুষমারই নিষ্কম্প দীপশিখা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কিছু পাট এনে সারদাকে বললেনঃ 'এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখবো, লুচি রাখবো ছেলেদের জন্য।' শিকে তৈরী হল। কিন্তু শিকে তৈরী করার পর সারদা দেখলেন অনেকখানি পাটের ফেঁসো পড়ে রয়েছে। সেগুলি ফেলে দিলেন না সারদা। সেগুলি দিয়ে বালিশ তৈরী করলেন তিনি আর তা ব্যবহার করলেন স্বয়ং।[৭] এর মধ্যেই নিহিত আছে কারুশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত ও প্রেরণা। কারুশিল্প অন্যতম আদি লোকশিল্প। এই কারু-শিল্পের মধ্যেই ভারতের শিল্প-আত্মার পরিচয় ও বেঁচে থাকা। আজ কারুশিল্পের যে ভাবনা, যে উদ্যম, যে আয়োজন দেশ জুড়ে হচ্ছে, তুচ্ছ ফেলে-দেওয়া পাটের ফেঁসোর শিল্পসম্মত সুন্দর ব্যবহারের মধ্যেই সেই ভাবনার সত্য সমাধান। বাস্তবিক, এদেশের মাটিতে কারুশিল্পের জন্ম কেবলই প্রয়োজনে নয়। তার সৃষ্টির মূলে একটি রুচিসম্মত সুন্দর মনও কাজ করেছে। রুচিসুন্দর মন আর প্রয়োজন, এই দুইয়ের সম্মিলনের অনবদ্যতাই ছড়িয়ে আছে সারা দেশের শিল্পসম্ভারে। আমাদের দেশে কারুশিল্প কিংবা চারুশিল্পের মধ্যে গুণগত ঐশ্বর্যের কোন সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়নি। কারুশিল্পে এমন ভাবনা কখনই আসেনি যা কেবলই ব্যবহারের পর শেষ হয়ে যায়। নিরন্তর ভাবা হয়েছে, প্রয়োজনসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তা রুচি ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযুক্ত ও দৃষ্টিনন্দন মহিমায় উত্তীর্ণ হল কিনা। স্বামীজী সেই সত্যের কথাই আমাদের মনে করিয়ে বলেছেনঃ 'ওরে, আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর!'[৮]

পরম যত্নে নিজের হাতে সারদা তৈরী করেছেন একটি পশমের ছোট পাখা। নিবেদিতার হাতে পাখাটি দিয়ে সারদা বলছেনঃ 'আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।' পাখাটি নিয়ে আনন্দ-বিহ্বল নিবেদিতা একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, আর বলেনঃ 'কী সুন্দর, কী চমৎকার!' সারদা নিবেদিতার সেই ভাব দেখে বলছেনঃ 'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ!'[৯] সামান্য জিনিস হলেও নিবেদিতার কাছে পাখাটি একটি অমূল্য রত্ন, কারণ ওটি শ্রীমায়ের আশীর্বাদ আর ভালবাসার স্মারক। মায়ের হাতের স্পর্শ ওর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ঐ যে

বলছেনঃ 'কী সুন্দর, কী চমৎকার!'—ওটি হচ্ছে সারদার তৈরী পাখাটির কারুকাজের চমৎকারিত্ব, সুষমা, পরিপাটিত্ব এবং সর্বোপরি তার পেছনে সারদার যত্নশ্রীর সপ্রশংস উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি। নিবেদিতার গভীর শিল্পবোধ ও পরিশীলিত শিল্পদৃষ্টির কথা আমাদের জানা।

একটি ভক্ত মেয়ে কার্পেটের তৈরী বালগোপালের ছবি সারদাকে দিয়েছে। দেখে সারদা বলছেনঃ 'আহা, বেশ হয়েছে! কী সুন্দর মুখের ভাব!' এখানে লক্ষণীয়—শিল্পীর ফুটিয়ে তোলা 'সুন্দর মুখের ভাব'-এর উপর সারদার দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমাদের ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য হ —বাহ্যিক রূপ নয়, অন্তরের ঐশ্বর্যের অনুধ্যান এবং তার আদর্শায়িত অভিব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই কারণে গ্রীক-প্রভাবিত গান্ধার শিল্পের সঙ্গে সনাতন ভারতশিল্পের ভাবপ্রকাশের মূলগত তফাৎ ঘটেছিল। গ্রীক শিল্পীরা ধ্যানী বুদ্ধের লাবণ্যময় আন্তররূপটি দেখতে অপারগ হয়েছিলেন বলেই তাঁদের ভাবানুসরণে কঙ্কালসার তথাগতের সৃষ্টি। যে পরমলাভের জন্য সিদ্ধার্থ শরীরপাত করলেন, ভারতশিল্পীরা তার প্রকৃত রূপটি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই যথার্থ বুদ্ধমূর্তি আমরা পেয়েছি। স্বামীজী তাঁর এক শিল্পী-বন্ধুকে বলেছিলেনঃ 'গ্রীকরা কখনই যীশুর অন্তর্জীবনের রহস্য অনুধাবন করেনি। তা যদি করত তাহলে কখনই তাঁকে অমন পেশীযুক্ত করে দেখাতে পারত না। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষের শরীর কখনই পেশল হয় না।• এ ক্ষেত্রে বুদ্ধমূর্তির বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। কোন জাতির শিল্প পরীক্ষা করলেই তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।'[১০] এই ভাবনার প্রবাহই সারা দেশের শিল্প-সংস্কৃতির গভীরে প্রবাহিত। আর তার প্রকাশ হয়েছে সারদার দৃষ্টিতেও। ছবিতে গোপালের দেহগত সৌকর্য নয়, মুখের ভাবটিই তাঁকে আকর্ষণ করেছে, তাই উপস্থিত সকলকে সোল্লাসে তিনি ছবিটি দেখাতে লাগলেনঃ 'কেমন করেছে দেখ।' আর বার বার বলছেনঃ 'বেশ হয়েছে, না?' সকলে তাতে সায় দিলেন। গোলাপ-মা এলে তাঁকেও ছবিটি দেখিয়ে বললেনঃ 'কেমন সুন্দর হয়েছে দেখ!' মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেনঃ 'এই•বউমা করেছে।' গোলাপ-মা ছবিটির খুঁত বের করলেন। বললেনঃ 'বাঁ হাতটা একটু মোটা হয়েছে।' সবাই হেসে উঠল। সারদাও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। বললেনঃ 'গোলাপ অনেক দেখেছে শুনেছে কি-না, তাই পছন্দ হয় না। গোলাপের কাজ বড় পরিষ্কার; আবার অনেক রকম কাজ জানে। ঠাকুরের যত সব জিনিস, সব গোলাপের তৈরী। আবার ভক্তদের মশারি, বালিশ, তার ওয়াড়, সব গোলাপ করে। শরীরে একটুও আলস্য নেই।' লক্ষ্য করার বিষয়, গোলাপ-মার জ্ঞান, কাজের নিষ্ঠা প্রভৃতির প্রশংসা করলেও তাঁর ভাবমুখী দৃষ্টির অভাবের বিষয়েও সারদা সচেতন ছিলেন। তাই গোলাপ-মার কথায় তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিন্দুমাত্র সরে গেলেন না সারদা। ছবিতে প্রকাশিত ভাবটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং তা চেনাবার জন্য এর পরে যোগেন-মা এলে সারদা একই ছবি তাঁকেও দেখিয়ে বললেনঃ 'কেমন করেছে দেখ! কী সুন্দর মুখের ভাব!' যোগেন-মা বললেনঃ

'বেশ তো করেছে!...বড় চমৎকার হয়েছে তো!' সারদা বললেনঃ 'গোলাপ বলেছে বাঁ হাতটা মোটা হয়েছে।' যোগেন-মা বললেনঃ 'ওর কথা ছেড়ে দাও।'[১১] এখানে যোগেন-মা সারদার ভাবনার অংশীদার।

সারদার এই যথার্থ শিল্পদৃষ্টির প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা মনে পড়েঃ 'মানুষ যে জিনিসটি তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea [ভাব] express (প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea [ভাব]-র expression (প্রকাশ) নেই, রং-বেরং-এর চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না।'[১২] ছবিটিতে বালগোপালের মুখে যে সুন্দর ভাব ফুটেছে তা সারদাকে প্রকৃত বালগোপালের রূপটিকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। তাই ছবিটির কোন ত্রুটি তাঁর চোখে বড় হয়ে দাঁড়ায়নি।

অতি সাধারণ বিষয়েও সুষমা ও যত্নের অভাবটুকু সারদার চোখ এড়াত না। ভক্তরা প্রসাদ পাবেন, আসন পাতা হয়েছে সারি সারি, পাতাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাতা ভালো করে ধোওয়া-মোছা হয়নি। আবার সেগুলিকে ধুতে বললেন সারদা। বললেনঃ 'আমার যখন শক্তি ছিল তখন আমি এক একটি পাতা ধুয়ে কাপড় দিয়ে মুছতাম।' পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করে আসন পাতা হয়নি একদিন। তাই পছন্দ হল না সারদার। নিজে সংশোধন করে দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন।[১৩]

শ্রী ও শোভনতার বিগ্রহ ছিলেন সারদা। তাঁর প্রত্যেক আচরণ ও কর্ম ছিল শ্রী ও শোভনতার পরম উপমা। উদ্বোধনে সারদার খুব অসুখ। জনৈক সন্ন্যাসী-সন্তান তাঁকে দেখতে এসেছেন। সারদার মাথায় কাপড় দেওয়া ছিল না। সাধুটি চলে যাবার পর সারদা সেবিকাকে বললেনঃ 'আমার মাথায় কাপড় দেওয়া নেই, কাপড়টা দিয়ে দাওনি কেন? আমি কি মরে গেছি? এখনই এই করছ!'[১৪] এটি লোকশিক্ষারও একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। শুধু নিজের আচরণ ও কর্মে নয়, তাঁর আশেপাশে যেসব মেয়েরা থাকতেন তাঁরাও যাতে শ্রী ও শোভনতার সীমা লঙ্ঘন না করেন সে-বিষয়েও তাঁদের সচেতন করে দিতেন সারদা। একদিন উদ্বোধনের বাড়িতে রাধু খুব জোরে মল বাজিয়ে ওপর থেকে নীচে নামছিল। বিরক্ত হলেন সারদা। বললেনঃ 'রাধী তোর লজ্জা নেই? নীচে সব সন্ন্যাসী-ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পরে দৌড়ে নাবছিস। ছেলেরা কি ভাববে বল তো? তুই মল এখনই খুলে ফেল।'[১৫]

শ্রীরূপিণী সারদার শ্রী সর্বত্র—কি বৃহৎ কর্মকাণ্ডে কি তুচ্ছতম আটপৌরে ঘটনায়। যা সাধারণের গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না, এমনকি ভাবনায় উঁকি পর্যন্ত দেয় না, আপাতদৃষ্টিতে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ সেইসব ঘটনার প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে তাদের মর্যাদা দেবার নাম নিত্যশিল্প। সারদা সেই শিল্পশিক্ষারও আদর্শ স্থাপন করেছেন। একজন ঝাঁট দেবার পর ঝাঁটাটি অবহেলাভরে ছুঁড়ে একদিকে ফেলে দিলেন। সারদার দৃষ্টিতে তা এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেনঃ 'ও কি গো, কাজটি হয়ে

গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে? তা ছাড়া, এ সংসারে ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়।...সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।'[১৬]

সারদা যখন যে-কাজটি করেন তাতেই ফুটে ওঠে নিষ্ঠা ও রুচিশ্রীর স্বাক্ষর। একদিন রঙ্গন আর যুঁই ফুলের সাত লহরের মালা গেঁথে ভবতারিণীর মন্দিরে পাঠিয়েছেন তিনি। সেই মালা মাকে পরানোর পর বিগ্রহের রূপ দেখে ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই রূপে-রসে মগ্ন রূপ সুন্দর হয়ে ফুটেছে সারদার বর্ণনায়ঃ 'একদিন আমি রঙ্গনফুল আর যুঁইফুল দিয়ে সাত লহর গড়ে মালা গেঁথেছি! বিকেলবেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি সব ফুটে উঠল। মাকে পরাতে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না খুলে মাকে ফুলের মালা পরানো হয়েছে। এমন সময় ঠাকুর মাকে দেখতে গিয়েছেন, দেখে একেবারে ভাবে বিভোর। বার বার বলতে লাগলেন, "আহা, কালো রঙে কী সুন্দরই মানিয়েছে!" জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এমন মালা গেঁথেছে?" আমি গেঁথে পাঠিয়েছি একজন বলাতে তিনি বললেন, "আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো, মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক!"'[১৭] শুধু কি মায়ের রূপ, সারদার শিল্পদৃষ্টির রূপও কি আমাদের কাছে ফুটে উঠল না?

সারদার হাতের ছোঁয়ায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠত সব কিছুই। মহাকবি গিরিশচন্দ্র এসেছেন জয়রামবাটীতে। সৌখীন মানুষ তিনি। রোজই দেখেন তাঁর বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সাদা ধব্ ধব্ করছে। কলকাতার মানুষ গিরিশচন্দ্র ভেবে পান না অজ পাড়াগাঁ জয়রামবাটীতে রোজ এরকম পরিষ্কার পরিপাটি বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর কি করে সম্ভব হয়! একদিন তাঁর চোখে পড়ে, তাঁদের পরম পূজনীয়া 'মা' পুকুরঘাটে বসে নিজে তাঁর বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর সাবান দিয়ে কাচছেন। গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারেন কোন্ স্নেহ, যত্ন ও শ্রীবোধের স্পর্শে এমনটি সম্ভব হয়েছে।[১৮] এরকম অনুচ্চারিত সৌম্য আচরণ ও ঘটনা একটি নয়, অসংখ্য।

জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির উঠোনে ইঁটের টুকরো, খোলামকুচি ইত্যাদি অনেক সময় পড়ে থাকে। ভক্তরা চলাফেরা করে তার ওপর দিয়ে, খালি পায়ে। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সারদা লণ্ঠনের আলোতে ইঁটের টুকরো, খোলামকুচি তুলে উঠোন পরিষ্কার করে রাখেন। তাঁর এই সুগোপন সেবাশ্রী সকলের অগোচরেই থেকে যেত। দৈবক্রমে জনৈক সন্তান একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠে দেখেন, বাড়ির উঠোনে লণ্ঠনের আলো জেবলে কে একজন খন্তা দিয়ে মাটিতে কিছু করছে। কৌতূহলবশে কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং তাঁদের 'মা' সারদা। অবাক হয়ে সন্তানটি জিজ্ঞাসা করেনঃ 'এসব কি করছো মা, তুমি এত রাত্তিরে?' ধরা পড়ে যাওয়াতে লজ্জা পেয়ে মা বললেনঃ 'ও কিছু না। ছেলেমেয়েরা সব খালি পায়ে চলাফেরা করে,

ইঁটের টুকরো খোলামকুচি কখন কার পায়ে ফুটে যায় কে জানে। তাই এসব পরিষ্কার করে রাখছি।'[১৯] সারদার এইসব মৌন সেবাশ্রীর কথা আমরা কতটুকুই বা জানি!

যেমন তাঁর হাতের ছোঁয়ায় তুচ্ছ কাজেও ফুটে উঠত এক আশ্চর্য শ্রী ও সুষমা, তেমনই তাঁর মুখের কথায়ও অসামান্য লাবণ্য ঝরে পড়ত। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকে 'কথামৃত' বলি। কারণ, তাঁর সহজ সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে আমরা যেন অমৃতের স্পর্শ, অমৃতের আস্বাদ পাই। সারদার কথাতেও অপরূপ শ্রী! মাধুর্যে এবং প্রসাদগুণে সারদাকথামৃতও অনবদ্য। কয়েকটি দৃষ্টান্তঃ

আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস্ করে কি যায়? এও [ঈশ্বরদর্শন] তো তেমনি।[২০]

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পারে, এক্ষুণি হয়।[২১]

দেখ, বাবা, সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে নীচুতে। জলকে কি ডেকে বলতে হয়—ওগো সূর্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও? সূর্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প করে উপরে তুলে নেয়।[২২]

বাবা, ওটা [মনের দুর্বলতা] প্রকৃতির নিয়ম, যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা আছে না? তেমনি মনও কখন ভাল, কখন মন্দ হয়।[২৩]

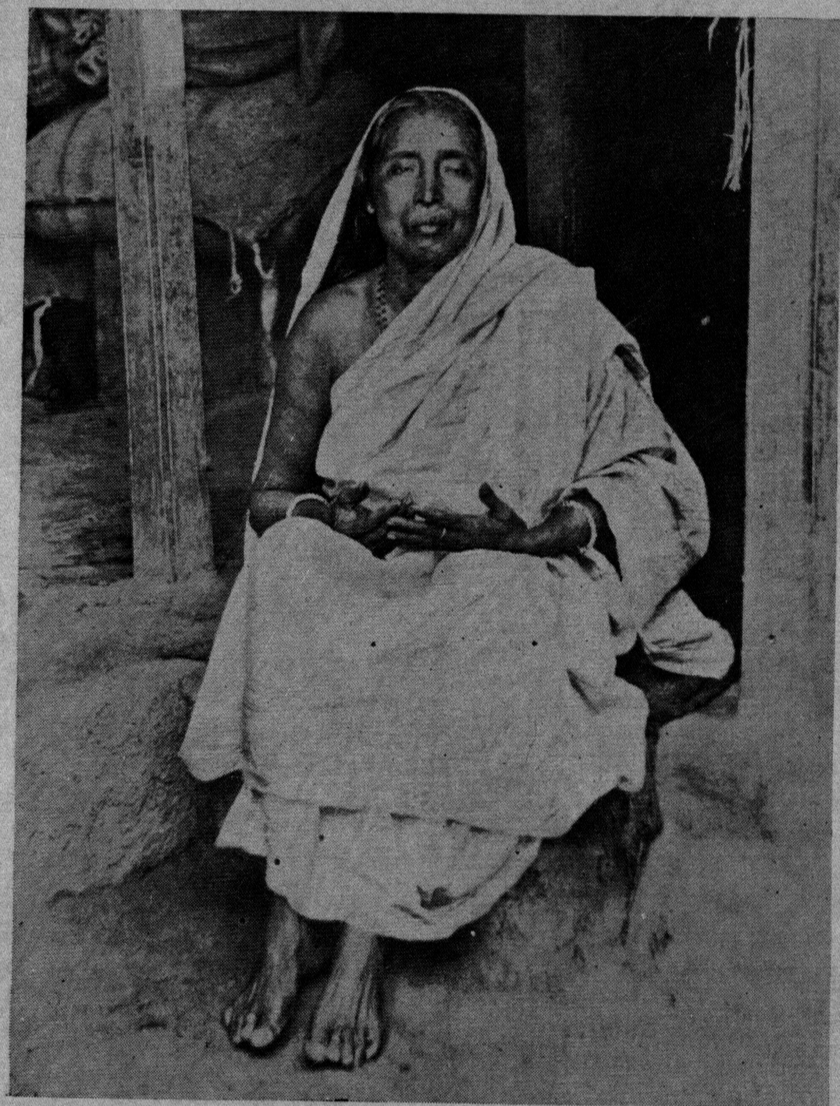
প্রঃ—চৈতন্যদেবও কি এই ঠাকুর (রামকৃষ্ণ)? সারদা—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই ঠাকুর বার বার—একই চাঁদ রোজ রোজ।[২৪]

প্রঃ—ছবিতে কি ঠাকুর আছেন? সারদা—আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁর ছায়া।[২৫]

ছোট ছোট কথা, কিন্তু নিটোল সুষমায় মণ্ডিত, গভীরতাও অসাধারণ।

সারদার প্রকৃতির সুষমা তাঁর নানা কথায় ও কাজে যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই তাঁর আকৃতিতেও এই সরল শান্তশ্রী যেন মূর্তিমতী। শুধু কমনীয় মাধুর্য নয়। অসাধারণ গাম্ভীর্যের সংযমও রয়েছে সারদার কথায়। সকল মানুষের মর্যাদা রক্ষায় তিনি সচেষ্ট। তেলোভেলোর মাঠে নিঃসঙ্গ সারদাকে পরিত্যাগ করে সংগীদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ঘটনা পুনরাবৃত্তির অনুরোধকে নিবৃত্ত করে সারদা গম্ভীরভাবে বলেনঃ 'আমি সকলের কাছে ঐ কথা বার বার বললে তাদের অপমান হয়।'[২৬] কটু কথার বাদান্তরে না গিয়ে কত সহজে অথচ সংযমের দৃঢ়তায় বললেনঃ 'দুটো শব্দ বই তো নয়।'[২৭]

সারদার পট-প্রতিকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাউলের একতারার সরল,



শ্রীশ্রীমা

১৩১৯ সাল : ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ

স্থান : জয়রামবাটী ফটো : ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ



শ্রীশ্রীমা
১৩১৬ সাল : ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ
স্থান : উদ্বোধন ফটো : ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

নিরাভরণ রূপকে এবং তার সঙ্গে একতারার বৈরাগ্যের সহজ লোকায়ত সুরচ্ছন্দকে। সারদা এ দুইয়ের মিলিত এক অনাড়ম্বর শুদ্ধ বিগ্রহ। তাঁর ঐ রূপের সঙ্গে আমরা পল্লীমাটির নির্ভেজাল ঘ্রাণ ও স্পর্শ অনুভব করি। একতারার কোন আভরণ নেই। আভরণ যুক্ত করলে তাতে আর লোকায়ত জীবনের ঘ্রাণ ও স্পর্শ পাওয়া যায় না। নিরাভরণ একতারা সৃষ্ট হয়েছিল মানুষের অন্তরে গভীর তত্ত্বকে সহজ সুরে গেঁথে দেওয়ার জন্য। সারদার রূপও তাই। মানুষের অন্তরে পরমের ভাবটিকে পৌঁছে দেবার সরল সুরের কাঁপন তা। পাঠকের মনে স্বতই ভেসে ওঠে জয়রামবাটীতে তাঁর মাটির ঘরের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকা অপরূপ ছবিটি। পিছনে থরে থরে সাজানো বস্তাভর্তি ধান—লক্ষ্মীর সম্ভার। স্বয়ং লক্ষ্মী যে আবির্ভূতা বাংলার পর্ণকুটিরে। কিন্তু লক্ষ্মী এখানে তাঁর প্রচলিত অলংকৃত রূপ নিয়ে উপস্থিত হননি। তাঁর বাইরের রূপকে 'ঢেকে' বসে আছেন তিনি এখানে গ্রামবাংলার শ্যামল শান্ত রূপের বিগ্রহ হয়ে।

মায়ের জনৈক সেবকের স্মৃতিচিত্রে দুটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যা সারদার পল্লীলক্ষ্মী রূপটিকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেঃ একদিন জয়রামবাটীতে সকালে সারদা এসেছেন সতীশ বিশ্বাসের বাড়িতে। সতীশের পিসী উল্লাসভরে চিৎকার করে বললেনঃ 'সতীশ, ওরে সতীশ! আজ তোর সৌভাগ্যের দিন, মা নিজে এসেছেন তোর ঘরে! শীগ্গির আসন দে, শীগ্গির আসন দে, প্রণাম করে বসা।' মায়ের সেবক লিখছেনঃ 'সতীশের স্ত্রী ঘরের দুয়ারে লাতা (ন্যাতা) দিতেছিলেন, উঁচু বারান্দা সবে লেপা হইয়াছে। সুদক্ষ গৃহিণীদের পাকা হাতে মাটি গোবর দিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে পদ্মদলের মতো একটির পর একটি সুবিন্যস্ত পোঁছ সুলেপিত কাঁচা ভিটা-বাড়ির প্রাতঃকালের শোভা, শুচিশুদ্ধতা অন্তরে কি নির্মল পবিত্র ভাবের উদয় করে, তাহা পাড়াগাঁয়ে যাঁহারা বাস করিয়াছেন, ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বিশ্বাসের স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া হাত ধুইয়া অতি সুন্দর একখানি গালিচা আনিয়া বিছাইয়া দিলেন বারান্দায়। [বিশ্বাস] দম্পতি প্রসন্ন-হৃদয়ে জোড়হস্তে আবাহন করিয়া মাকে আসনে বসাইয়া দিয়া ভক্তিভরে পদতলে প্রণত হইয়া শুভাশীর্বাদ লাভ করিলেন। মা গোময়লিপ্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঁচু বারান্দায় পূর্বমুখী হইয়া বসিয়াছেন। বারান্দার কিনারায় বসিয়াছেন, নীচে পা ঝুলিতেছে। কোলের ওপর হাত-দুখানি, পরিধানে লাল সরুপাড় শুভ্রবস্ত্র, ঈষৎ ঘোমটা টানা, প্রসন্ন মুখমণ্ডল, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশরাশি বক্ষের দক্ষিণ পাশ হইয়া নীচে ঝুলিতেছে। মা বসিয়াছেন এমনই ভাবে, দেখিলে মনে হয় যেন মা লক্ষ্মী স্বয়ং ভাগ্যবান্ গৃহস্থের দরজায় উপবিষ্টা, পাশেই ধান্যপূর্ণ মরাই (ভাণ্ডার) শোভা বিস্তার করিয়া তাঁহার শুভাগমন সূচনা করিতেছে।' এই প্রসঙ্গে সেবকের স্মৃতিতে হঠাৎ ঝলসে উঠল আর একদিনের একটি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যঃ 'হেমন্তকাল, মা ভোরে বাহিরে গিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া শিশিরার্দ্র চরণে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, শুষ্ক ধূলিকণা পদতলে লিপ্ত হইয়া আছে। ক্ষণিক পূর্বে মায়ের বাড়ির প্রাচীন ঝি, আমাদের শশী মাসী, আসিয়া লাচ (নাচ—নাচদুয়ার) অর্থাৎ বাড়ির ভিতরের প্রবেশদ্বার নিত্যকার নিয়মে পরিপাটিরূপে লেপিয়া দিয়া গিয়াছে মাত্র। মা দরজায় আসিয়া যুগলপদ একত্র করিয়া দাঁড়াইয়াছেন দরজা খুলিবার জন্য। ঠেলিলেন, দরজা খুলিল, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঈষৎ আর্দ্র,

সদ্যলিপ্ত সেই দ্বারতলভূমিতে তাঁহার ধূসর-ধূলিরঞ্জিত শ্রীচরণযুগলের এমন সুন্দর ছাপ পড়িয়াছে যে, সে অতুলনীয় শোভা দেখিয়া মনে হয়, স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী এইমাত্র গৃহাভ্যন্তরে শুভ প্রবেশ করিয়াছেন।'

সেবকের মনে হলঃ 'বাল্যকালে লক্ষ্মীপূজা দিবসে গৃহদ্বারে পিষ্ট তরল তণ্ডুল-চূর্ণযোগে আলিম্পন ও পাশে পাশে দেবীর গৃহপ্রবেশের পরিচায়ক শুভ পদচিহ্ন-অঙ্কন দেখিয়াছিলাম, অদ্যকার এই শ্রীপদচিহ্ন তো ঠিক তাহারই ন্যায়! তবে সে-সকল ভক্তহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার কল্পনাচিত্র, আর ইহা তো সত্যবস্তু।'[২৮]

উপরিলিখিত বিবরণগুলিতে যে বস্তুটি আমাদের বার বার মনে আসে তা হল বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে সারদার স্বাভাবিক সম্পর্ক। লোকচিত্রের জন্ম একেবারে আঞ্চলিক প্রকৃতির অকৃপণ ঐশ্বর্যের বাতাবরণের ভূমিতে। সেই পরিবেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন পল্লীলক্ষ্মী সারদা যেখানে—'অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে/ চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে/ভোরের দোয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ/জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের— অশথের করে আছে চুপ; ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে'; 'নরম ধানের গন্ধ —কলমীর ঘ্রাণ,/হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল চাঁদা সরপুঁটিদের/মৃদু ঘ্রাণ'।[২৯]

প্রকৃতির এই সহজ, অনাড়ম্বর পরিমণ্ডলের পটভূমিতে মানুষ নিজেকে দেখতে পায়। সেই দেখতে পাওয়ার অর্থ মানুষের হৃদয়ে স্ববোধের উৎস আবিষ্কার। সেই পটভূমিকে স্মরণে রেখে আমাদের দেখতে হবে শ্রীরূপিণী সারদাকে—যাঁর মাধুর্য, দিব্য সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তাঁর সেই বিখ্যাত প্রতিকৃতিতে যেটি আজ ঘরে ঘরে শোভা পায়। ক্যামেরায় তোলা এটিই সারদার প্রথম প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতিতে যা প্রথমে আমাদের আকর্ষণ করে তা সারদার স্নিগ্ধ নয়ন। মমতায় ভরা তাঁর দৃষ্টিতে যে আবেদন সবচেয়ে স্পষ্ট তা হল মাতৃত্ব, যার অপর নাম সন্তানের নিশ্চিন্ত নীড়, পরম আশ্রয়। মহাবলীপুরম্ এবং ইলোরার শিল্পশাস্ত্রসম্মত মাতৃমূর্তির ভাস্কর্যে আছে বিরাটত্বের বিস্ময় এবং এক বিশেষ কারিগরি নিপুণতা। কিন্তু সারদার আলেখ্যে যে নিরাভরণ অনুচ্চারিত সৌম্য লাবণ্য এবং দিব্য সৌন্দর্যের আবেদন আছে তার আকর্ষণ আমাদের অন্তরের গভীরতম তন্ত্রীকে পরম স্নেহে স্পর্শ করে যায়। আড়ম্বরশূন্যতাও একটি বিশেষ শ্রী। সারদার এই মাতৃ-আলেখ্য সেই শ্রীর শান্ত, ছায়াশীতল ঐশ্বর্যে পূর্ণ। আর পূর্ণ নিত্যশ্রীর মহিমায়, নিত্যমঙ্গলের স্পর্শে। সারদার সান্নিধ্যে যাঁরা থেকেছেন তাঁরা সবাই তাঁর স্নিগ্ধ পেলব স্নেহসিক্ত রূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন সেই ভাগ্যবানদের অন্যতমা। আমেরিকায় গিয়ে সারদার কথা যখন তাঁর মনে পড়েছে তখন তাঁর মনে ভেসে উঠেছে সারদার যে-রূপ, তার বর্ণনায় চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নিবেদিতা লিখছেনঃ 'মা, মাগো - ভালবাসায় ভরা তুমি। তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই; তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারও। সোনার আলোয়

ভরা তা, খেলায় ভরা। ...প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে...সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজ্ঞানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।'[৩০] নিবেদিতার দৃষ্টির স্বচ্ছতায় সারদার রূপের যথাযথ বর্ণনাটি ফুটে উঠেছে। নিবেদিতা এই বর্ণনায় প্রকৃতির এমন পেলব অনুভবগুলিকে গ্রহণ করেছেন যা একান্তভাবে সারদার চিত্রপটের সঙ্গেও সংযুক্ত। আর সারদাও যথার্থই ঐ অনুভবের, ঐ পরিমন্ডলের মূর্ত বিগ্রহ। নিবেদিতা লিখছেনঃ 'তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা; সব কিছু সামনে ভেসে উঠল।'[৩১] সারদার মুখে কোন দৈবী কাঠিন্য নেই, দৃষ্টিতে নেই অলৌকিকতা, আবরণে কোন জৌলুস নেই, নেই অঙ্গাভরণে কোন বাহুল্য। সারদার এই রূপ তো আমাদের চোখের সামনেও ভাসে। সারদার চিত্রপটেও তা প্রতিবিম্বিত। সারদার চিত্র পরিমিতির ঐশ্বর্যে ভূষিত। কোন আবরণ বা আভরণ দিয়ে সাজালেই তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে হবে। যে সহজাত শ্রী ও সুষমায় তিনি পূর্ণ হয়ে এসেছেন তাকে অহেতুক আবরণ বা আভরণে ভরে তুললে তার ছন্দপতন ঘটবে। সারদা-আলেখ্য আমাদের যে অনুভবের পরশ দেয় তা তাৎক্ষণিক নয়—চিরন্তন। তা মানুষকে নিত্যবোধে পরিচালিত করার পরম প্রেরণাস্বরূপ। এক অখন্ড পূর্ণকে তা প্রকাশ করছে বলে তাকে ছেয়ে আছে একটি স্বর্গীয় সুষমার পবিত্র আবেশ।

আমাদের প্রসঙ্গ ছিল লোকলক্ষ্মী সারদার ক্যামেরায়-তোলা প্রথম প্রতিকৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক, সারদার এই আলেখ্যটি লৌকিক চিত্রশিল্পের উৎকৃষ্ট সম্পদ। লৌকিক চিত্রকলা যেসব গুণাবলীতে সুসংবদ্ধ হয়ে পূর্ণ হয় সারদার প্রতিকৃতি সেই সমস্ত গুণ এবং ঐশ্বর্যের সমন্বয়ে পূর্ণ। লোকচিত্রের আসল গুণ ও উৎকর্ষের দিক হল তার সাবলীল সু-ছন্দ প্রবাহ এবং তার সঙ্গে সরল ভাব-ভাবনা অনুযায়ী রেখার ব্যবহার। রেখাই সেখানে আঙ্গিকের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। বর্ণের ব্যবহার যেখানে ঘটেছে সেখানে তা রেখার বাঁধনকে ছাড়িয়ে নয়। সারদার আলেখ্যে সরল সাবলীল ছন্দের যে অনাবিল প্রবাহ আমাদের আকৃষ্ট করে তা হলঃ সারদার চিত্র-আলেখ্যের আকারের সীমা ধরে একটি রেখার গতিকে ঘুরিয়ে আনলে রূপ নেবে একটি অপূর্ব লোকচিত্র। চারুশিল্প হিসেবেও সেটি হবে একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। সারদার অপর উল্লিখিত চিত্র-আলেখ্য সম্পর্কেও একইভাবে একথা প্রযোজ্য। প্রত্যেকটিই লাবণ্যে সুষমায় পূর্ণ, কিন্তু কখনই মাত্রাতিরিক্ত কারুকাজে ভারাক্রান্ত নয়। যথার্থ শিল্পের প্রধান গুণ হল আঙ্গিক কখনও ভাবকে ছাপিয়ে যাবে না। অনেক সময় দেখা যায় করণ-কৌশল ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে গিয়ে অনেক উচ্চমানের শিল্প প্রাণ হারিয়ে কেবলই শিল্পকুশলতার নমুনা হিসাবে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পের আসল দিকচিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। আসল কথা হল

আঙ্গিকের কুশলতা নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু তা কখনই প্রধান হয়ে উঠবে না। আঙ্গিকের সার্থকতা সেখানেই, যখন তা শুধুমাত্র শিল্পের মুখ্য ভাবপ্রকাশের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। শিল্পীর দৃষ্টিতে এই যথার্থ শিল্পভাবনার সার্থক দৃষ্টান্ত সারদার আলেখ্য।

লোকশিল্পের প্রধান কথা হল, 'যত্র লগ্নং হি হৃৎ'—হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে। শিল্পগুরু শুক্রাচার্যের মতে তা-ই হল লোকশিল্পের প্রাণ, লোকশিল্পের 'ভাষার রূপ'।[৩২] লোকচিত্রকলার সেই প্রাণের পূর্ণতার পরম উপমা সারদা-আলেখ্য। সারদার জীবন-আলেখ্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত ভারতবর্ষের মাতৃভাবনার সত্যরূপটি। আর সারদা-আলেখ্যেও অধিষ্ঠিতা ইলোরা-মহাবলীপুরমের ভাস্করায়িত সুপ্রাচীন মাতৃ-মূর্তিই—তবে ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্নতর সুষমায়।

ভারতের প্রকৃতিসমা রূপটি নিয়ে জয়রামবাটীর মাটির ঐশ্বর্যের শান্ত পরিবেশে যাঁর জন্ম সেই শান্তশ্রী-লাবণ্যে ভরা সারদার রূপটির কোন পরিবর্তনই ঘটেনি দক্ষিণেশ্বর অথবা কলকাতার নগরজীবনের কোলাহলের মধ্যে। সারদার সুখাসনে-বসা প্রতিকৃতিটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সারদার অন্য যে প্রতিকৃতির কথা উল্লেখিত হয়েছে সেটি তাঁর বেশী বয়সের। কিন্তু ভাব এবং সুষমার 'শ্রী'র দিক থেকে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সারদার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোলা নানা প্রতিকৃতি আমরা দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিকৃতিতেই সেই একই চেতনা, একই ভাবনা ও একই অনুভূতির দিব্য-দ্যুতি বিদ্যমান। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করারঃ সারদাকে যখনই কোন প্রতিকৃতিতে ধরা হয়েছে তখনই তার মধ্যে একটি জাগতিক অনুপস্থিতির ভাব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি চারিপাশের দৃশ্যমান জগতের পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত থেকেও যেন নেই।

এসব তো গেল সারদার প্রত্যেক আলেখ্যের মধ্যে মূলগত ঐক্যের কথা। কিন্তু সারদার প্রত্যেক মূর্তিলক্ষণের অভিনবত্বও কম নেই এবং সেই বৈচিত্র এবং অভি-নবত্বেরও একটি স্পষ্ট লক্ষণ আছে যা সব সময় সব কিছু নিয়ম-লক্ষণকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয় না। বস্তুত সারদার যে-দুটি আলেখ্যের কথা এখানে আলোচনায় এসেছে দুটিই শিল্প-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণ, কৌশল ও গুণকে অতিক্রম করে নবতর শিল্পব্যঞ্জনার বিগ্রহ। সেই বৈচিত্র ও অভিনবত্ব চোখে যতখানি ধরা পড়ে, হৃদয়ে পড়ে তার অনেক বেশী। এ-দুটি আলেখ্য ছাড়া আরও অনেক আলেখ্য আছে সারদার। প্রত্যেকটি সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। যতবার তাঁর আলেখ্য দেখা যায় তত-বার যেন তাঁকে নতুন মনে হয়। শুধু আলেখ্যেই নয়, তাঁর জীবন-আলেখ্যের প্রত্যেক অংশেও সেই বৈচিত্র ও অভিনবত্ব ফুটে উঠত। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠত তাঁর অনুপম দিব্য সুষমা ও সৌন্দর্য। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গ করেছেন, তাঁরা সেকথা অনুভব করেছেন।

'সৌন্দর্যকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য যেদিন শাস্ত্রোক্ত মান-পরিমাণ দিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেদিন হয়তো সৌন্দর্যলক্ষ্মী কোন এক অজ্ঞাত শিল্পীর রচিত শাস্ত্রছাড়া সৃষ্টিছাড়া মূর্তিতে ধরা দিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছিলেনঃ

আমার দিকে চাহিয়া দেখ! আচার্য দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন ও বুঝিয়াই বলিয়াছিলেনঃ সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্—লক্ষ্মী, আমার শাস্ত্র ও প্রতিমালক্ষণ তোমার জন্য নয়, কিন্তু সেই-সকল মূর্তির জন্য যেগুলি লোকে পূজা করিতে মূল্য দিয়া গড়াইয়া লয়। তুমি বিচিত্রলক্ষণা! শাস্ত্র দিয়া তোমায় ধরা যায় না, মূল্য দিয়া তোমায় কেনা যায় না!'[৩৩]

সেই বিচিত্রলক্ষণা লক্ষ্মীই আমাদের সারদা। শ্রীমাঘ বলছেনঃ ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ॥[৩৮] ক্ষণে ক্ষণে যা নতুন হয়ে ফুটে ওঠে, তাই হল রমণীয়তা অর্থাৎ সৌন্দর্যের আসল রূপ। প্রতিক্ষণে নব নব রূপের বর্ণ-চ্ছটায় নিত্যনতুনভাবে উন্মোচিত শ্রীরূপিণী সারদা।

সঙ্ঘজননী

॥ ১ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ একা আসেননি, চিহ্নিত ব্যক্তিদের সঙ্গে এনেছিলেন। তিনি নিজে যেমন অসাধারণ, এঁরাও তেমনই অসাধারণ। সবাই এক ছাঁচে ঢালা। আপাতদৃষ্টিতে অনেক অমিল, কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এক। সবারই এক লক্ষ্য, এক পথ। সবাই যেন শ্রীরামকৃষ্ণকেই খুঁজছিলেন, শেষে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের ফলে তাঁর সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হলেন সামান্য সময়ের ব্যবধানে। আর শ্রীরামকৃষ্ণও যেন তাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ বলে যা আজ বিশ্ববিখ্যাত, তা বীজাকারে রূপ গ্রহণ করে এসব অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের ভাবী জীবনের জন্যে তৈরী করতে থাকেন। ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—একথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন। ঈশ্বরলাভের চেষ্টায় তাঁদের কেউ আত্মহত্যা করেছেন বা উন্মাদ হয়েছেন, এ শুনলেও শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হবেন, বলেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবার শিক্ষা দেন। বেদান্তের শিক্ষা, যা নিজের জীবনে দেখিয়েছিলেন। বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সকল কাজে লাগানো যায়। জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়, মুক্তি বড়, কিন্তু তার চেয়ে বড় মুক্তি পেয়েও লোকহিতব্রতে রত থাকা—এই সব শিক্ষা দেন। এসব তরুণদের কয়েকজনকে গৈরিক বস্ত্র দেন, ভিক্ষা করতে পাঠান, ভিক্ষা করে আনা অন্ন 'ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র'[১] বলে পরম তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করেন। তৃপ্তির সাথে বোধহয় একটু গর্বও ছিল। গর্ব এই কারণে যে, তাঁর শিক্ষাদান সার্থক হয়েছে—ভারতের সনাতন আদর্শ যে ত্যাগ এবং সেবা, তা অম্লান থাকবে তাঁর এই সব অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে তার প্রতিশ্রুতি দেখে। তিনি 'প্রেমপাথার' ছিলেন সত্য, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে নির্মম। তিনি চাইতেন তাঁর সন্তানরা লক্ষ্যে স্থির থেকে চলবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অপূর্ব এক প্রেমের সূত্রে তাঁদের গেঁথে রেখেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কয় বৎসর তাঁকে লোকগুরুরূপে দেখি। ধর্মপিপাসু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষ ছুটে আসে তাঁর কাছে তাঁর অমৃতবাণী শোনার জন্যে। অনেকে তাঁকে পরমোৎসাহে অবতার বলে পূজাও করেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগ হল, এতে তাঁদের অনেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা অবতারপুরুষের কখনও অসুখ হয় না, শ্রীরামকৃষ্ণের যখন অসুখ করেছে তখন তিনি অবতারপুরুষ নন, অতএব তাঁর কাছে ঘোরাফেরা করে লাভ কি? এভাবে কে খাঁটি ভক্ত, কে খাঁটি ভক্ত নয়, যাচাই হয়ে গেল। যাঁরা খাঁটি ভক্ত, তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে সুস্থ করে তোলার জন্যে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। যাঁরা তরুণ ভক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় যাঁরা 'সূর্যোদয়ের পূর্বে তোলা মাখন'[২] অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত বালযোগী,

তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই দিনরাত থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মর্তলীলার অবসান আসন্ন বুঝতে পেরে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদের যাঁকে যা দেবার দিয়ে তাঁদের পূর্ণকাম করতে লাগলেন। এসময়ে দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথকে প্রায়ই আলাদা ডেকে উপদেশ দিচ্ছেন। কি বলছেন জানা যায় না, তবে এটা জানা যায় যে, ছেলেরা যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে ত্যাগের আদর্শে অবিচল থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন। এ-সম্পর্কে স্বামীজীর ২৬ মে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এক পত্রে দেখতে পাই তিনি বলছেনঃ 'আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগী-মণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবক-মণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।'[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ যা চেয়েছিলেন তাই পরে হল। এই সব ছেলেরাই সন্ন্যাস নিয়ে রামকৃষ্ণসঙ্ঘ গড়লেন। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখটা যেন একটা উপলক্ষ। এ সুবাদেই অন্তরঙ্গ ভক্তেরা একত্র হলেন, পরস্পরকে চিনলেন, তাঁদের মধ্যে সমপ্রাণতা জন্মাল। সঙ্ঘের শক্তি সমপ্রাণতায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রেমই তাঁদের সমপ্রাণতা এনে দিয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পদের খনি তিনি। তাঁর প্রতি প্রেম মানে মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতি প্রেম। এই প্রেমই তাঁদের মিলনভূমি। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এই সর্বোত্তম আদর্শের প্রতি তাঁদের প্রেম দিন দিন বর্ধিত হয়েছিল। তাঁরা জীবনের উদ্দেশ্য বুঝেছিলেন এবং তার জন্যে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। তাঁদের লক্ষ্য এক, পথ এক এবং দৃঢ়তাও এক। সঙ্ঘের বীজ একতার মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণই এই একতার মূলে। তিনিই এই সঙ্ঘের দেহ ও আত্মা। সত্য—এ সঙ্ঘের প্রাণকেন্দ্র, কোন সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না এ সঙ্ঘে।

॥ ২ ॥

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে লীন হলেন। তাঁর অনেক সেবা ভক্তেরা করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা আর একজনের সেবাও লক্ষ্য করেছিলেন—সারদাদেবীর। সেই সেবা শুধু সেবা নয়, আত্মনিবেদন। সেবার মাধ্যমে আত্মবিলুপ্তি। ভক্তেরা মায়ের সেবা দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেই সেবার পেছনের মানুষটিকে দেখেননি। সেই অদৃশ্য মানুষটির উপস্থিতি অনুভব করেছেন, অনেক কর্মকাণ্ডের উৎস তিনি তা অনুমান করেছেন। আবার অনেক সময় আড়াল থেকে তাঁর কাছ থেকে উৎসাহও পেয়েছেন। লাটু মহারাজ বলেনঃ '(শ্রীশ্রী) মায়ের মতো এমন বুদ্ধিমান মেইয়া লোক হামুনে দেখলুম না। তাঁর সেবা করতে করতে হামাদের মধ্যে কেউ হতাশ হোয়ে পড়লে তিনি (শ্রীশ্রীমা) তা বুঝতে পারতেন। যোগীন ভাইকে দিয়ে বলে পাঠাতেন—"ওকে হতাশ হোতে মানা কোরো। তাঁর শরীর তো আজকাল একটু ভালো রয়েছে, এখন তো ঘায়ের মুখ

বাহিরের দিকে হয়েছে।" এমনি কোরে (শ্রীশ্রী) মা হামাদের সব সাহস দিতেন।'[৪] অথচ তিনি নিজে অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অবলুপ্ত। নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিকে তাঁরা মনে মনে শ্রদ্ধা করেছেন, সম্ভ্রম করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজমুখের উক্তিঃ 'ও [সারদাদেবী] আমার শক্তি!'[৫] শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী অভিন্ন। দুই দেহ, এক আত্মা। সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণেরই আর এক রূপ। ষোড়শীপূজার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজেরই পূজা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সন্তানেরাও তাঁরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁরই খণ্ডরূপ। কিন্তু সারদাদেবী তাঁর অখণ্ডরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত বিভূতি সারদাদেবীর মধ্যে, কিন্তু মাতৃত্বের কোমলতায় আবৃত। মাতৃমূর্তি অদৃশ্য হলেও মাতৃস্নেহ অপ্রকাশিত নয়। নরেন, রাখাল, লাটু প্রমুখ প্রত্যেক ত্যাগী-সন্তান মাতৃ-স্নেহের অভিব্যক্তি বিভিন্নভাবে আস্বাদ করেছেন।[৬] সারদাদেবীকে তাঁরা তখন কতটা চিনতে পেরেছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর স্নেহের আকর্ষণ নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন। তিনি যে অসাধারণ, তাও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর অসাধারণত্ব শুধু মাতৃত্বে নয়, চরিত্রেও। ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত সেই চরিত্র। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনীয় সেই চরিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগসম্রাট, সারদাদেবী ত্যাগ-সম্রাজ্ঞী। তাই ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনিও প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছে সুবিদিত ছিল। তাই তাঁরা ভিক্ষায় বেরিয়ে প্রথমেই গেলেন সারদাদেবীর কাছে। কি ভেবে গেলেন, সেইটাই প্রশ্ন। ত্যাগীই ত্যাগীর মর্যাদা দিতে জানে। তাই বোধহয় তাঁরা সারদাদেবীর কাছেই প্রথম গেলেন। সারদাদেবীও তাঁদের হতাশ করেননি। তিনি একটা টাকা দিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। এক টাকা, ষোল আনা, ষোল কলা অর্থাৎ পূর্ণ। তাঁদের ত্যাগ-সাধনা সার্থক হোক, তাঁরা পূর্ণকাম হোন—এই আশীর্বাদ। ত্যাগসিদ্ধ জননীর ত্যাগব্রতে উদ্যোগী সন্তানদের উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের জন্যে তাঁদের এই যে যাত্রা, তা ষোল আনা সার্থক হোক—অন্তরালে থেকে ভবিষ্যৎ সঙ্ঘজননী[৭] সঙ্ঘের সূচনাতে সঙ্ঘকে এই আশীর্বাদ জানালেন।

যখন সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে মাত্র কুলবধূ, তখন থেকেই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সম্ভ্রমের চোখে দেখছেন। না জেনে একবার 'তুই' বলে ফেলেছিলেন, সেজন্য কী দুঃখ তাঁর! হৃদয় অপমানসূচক কি কথা বলেছিলেন সারদাদেবীকে। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাবধান করে দিলেন। বললেন, তাঁর (সারদাদেবীর) মধ্যে যিনি আছেন, তিনি যদি একবার ফোঁস করে ওঠেন, তাহলে তাঁকে (হৃদয়কে) ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না। গোলাপ-মার কথায় সারদাদেবী একবার কেঁদে ফেলেছিলেন। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'সে জানে না তুমি কে?' পরে তাঁরই নির্দেশে দক্ষিণেশ্বরে এসে গোলাপ-মা মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে যান; কলকাতা থেকে সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে এসেছিলেন কাঁদতে কাঁদতে।[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ 'ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।'[৯] সারদাপ্রসন্নকে পাঠাচ্ছেন সারদাদেবীর কাছে দীক্ষা নিতে।[১০] কোন এক গৃহস্থ বধূ স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অতিষ্ঠ হলে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সারদাদেবীর কাছে পাঠান। সারদাদেবীর আশীর্বাদে মহিলার স্বামীর পরিবর্তন ঘটে।[১১]

সারদাদেবী নিজের মহিমায় মহিমান্বিতা। নিজেকে 'অবগুণ্ঠিতা' রাখতে তিনি বরাবরই চেষ্টা করেছেন, তবু মাঝে মাঝে তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অতর্কিত প্রকাশ আমাদের চমকিত করে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বামী, গুরু ও ইষ্ট, সাধারণত সব সময়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত কিন্তু তাঁর মাতৃত্বের এলাকার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রবেশও তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণের, এমনকি নিজেরও অজ্ঞাতসারে তিনি ভবিষ্যৎ ত্যাগী-সন্তানদের অভিভাবিকা, পালয়িত্রী। ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের জননী। ঠিক কোন্ মুহূর্ত থেকে এটা ঘটেছিল, তা বলা শক্ত। সঙ্ঘজননী হিসেবে তাঁর দায়িত্বসচেতনতার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ত্যাগী-সন্তানদের নৈশভোজনের পরিমাণ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যে বিতর্ক হয় তার মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন তাঁর ত্যাগী-সন্তানেরা রাত্রের নিস্তব্ধতায় অনেকক্ষণ ধ্যান-জপ করবে। এর জন্যে দরকার লঘু আহার। তাই তিনি প্রত্যেকের জন্যে রুটির সংখ্যা বেঁধে দিয়েছিলেন। একদিন জানতে পারলেন সারদাদেবীর স্নেহের প্রাবল্যে সেই সংখ্যা অতিক্রম করে যাচ্ছে। ছেলেদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে সারদাদেবীর কাছে প্রতিবাদ জানাতে গেলে তিনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিলেনঃ 'তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।'[১২] খুবই আশ্চর্যের বিষয়! এই আত্মপ্রত্যয়সমন্বিত উক্তির পর শ্রীরামকৃষ্ণ সেখান থেকে সরে গেলেন। হয়তো সারদাদেবীর এই উত্তরে তিনি নিশ্চিন্তও বোধ করেছিলেন, কেননা মাঝে মাঝে সারদাদেবীকে বলতেনঃ 'তুমি কি কিছু করবে না? (নিজদেহ দেখিয়ে) এই সব করবে?' সারদাদেবী নিজের অক্ষমতা জানিয়ে" বলেছিলেনঃ 'আমি মেয়ে-

মানুষ, আমি কি করতে পারি?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।'[১১] সারদাদেবী সত্যি-সত্যিই তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের নিশ্চয়ই আনন্দ ও স্বস্তি হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে বলেছিলেন—তাঁর জন্যে এমন সব রত্ন-ছেলে রেখে গেলেন যা বহু জন্ম তপস্যা করেও লোকে পায় না।[১১] কথাটা আদৌ অতি-রঞ্জিত নয়। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম প্রমুখ এ'রা যে-কোন দেশের, যে-কোন সমাজের, যে-কোন জননীর গৌরব। সারদাদেবী একথা জানতেন। তাঁদের সম্বন্ধে তাই তাঁর গর্ববোধও ছিল প্রচুর। কথাচ্ছলে প্রায়ই তা প্রকাশ পেয়ে যেত। তাঁদের সর্ববিধ কল্যাণের উপর ছিল তাঁর মাতৃসুলভ সতত সজাগ দৃষ্টি।

॥ ৩ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করে গিয়েছিলেন তিনি ও সারদাদেবী অভেদ। পরে সারদা-দেবীর মুখেও আমরা একথা শুনি। বিশেষ-বিশেষ ভক্তের কাছে স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছিলেন তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথক নন। তাঁরা উভয়েই যেন এসেছিলেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। কি সেই উদ্দেশ্য? ধর্মের মর্ম কি তা বোঝানো। ধর্ম মানে আচার-অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম মানে ধর্মমত নয়। ধর্ম মানে জীবন ও চরিত্র। ঈশ্বরানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম-পবিত্রতা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থপরতা। তাঁরা উভয়েই জীবন দিয়ে ধর্মের এই সত্য রূপটি দেখিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন আদর্শ সন্ন্যাসী হিসেবে। সারদাদেবী আদর্শ সন্ন্যাসিনী হয়েও সেই আদর্শ দেখিয়েছেন স্বেচ্ছা-স্বীকৃত শত বন্ধনের মধ্যে থেকে অর্থাৎ আদর্শ গৃহী হিসেবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘও ধর্মের এই রূপ জগতে প্রচার করবে, তাই তাঁরা চেয়েছিলেন। কিন্তু জীবনই প্রচারের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই তাঁরা উভয়েই চেয়েছিলেন, যেসব তরুণ সন্ন্যাসী নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ গড়ে উঠতে যাচ্ছে, তাঁদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। এককথায় শ্রীরামকৃষ্ণের 'মুষায়' যেন তাঁরা 'দুত' হন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর কে তাঁদের পথ দেখাবে? এমন দরদী অথচ সঠিক পথপ্রদর্শক কোথায় পাবেন তাঁরা? তাঁরা কয়েকজন তরুণ সম্পূর্ণ অসহায় তখন। কোন বন্ধু নেই তাঁদের, সহানুভূতি জানানোর কেউ নেই। একটা বিরাট আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর—যে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের উপর দায়স্বরূপ অর্পণ করে গেছেন। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চাইত না তাঁদের কথা। সবাই উপহাস করত। নানাভাবে নির্যাতন করত তাঁদের উপর। এই সময় সারদাদেবী ছাড়া আর কেউ তাঁদের পাশে ছিলেন না। পরবর্তীকালে স্বামীজীর একটি বক্তৃতায় আমরা এর সাক্ষ্য পাই। ত্যাগী-সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ছিল তাঁরই সামনে। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ভাবী সঙ্ঘের নায়ক হিসেবে তিনি নির্দিষ্ট। আবার পিতৃবিয়োগ হওয়ার ফলে সংসারের সমস্ত দায়িত্বও সেই সময় তাঁর উপরেই ছিল। চরম দারিদ্রের মধ্যে তখন তাঁর দিন কাটছিল। চোখের সামনে প্রিয়জনদের দেখছিলেন

অনশন করতে। এই সময়কার স্মৃতিচারণ করে স্বামীজী ঐ বক্তৃতায় বলছেনঃ 'আমি যেন তখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। ...অথচ এমন কেউ ছিল না, যে একটু সহানুভূতি জানাবে আমাকে। শুধু একজন ছাড়া। সেই একজনেরই আশীর্বাদ আমরা পেয়েছিলাম। আর তাঁর সহানুভূতিই আমাদের মনে আশা জাগিয়েছিল। তিনি একজন নারী। ...একমাত্র তিনিই আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। যদিও তিনি নিজে ছিলেন অসহায়, আমাদের চেয়েও দরিদ্র।'[১৫] এই নারী আর কেউ নন, স্বয়ং সঙ্ঘজননী—সারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণহীন নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে তাঁর সন্তানদের কাছে যিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতীক।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সারদাদেবীও চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বাদ সাধলেন। কারণ, তাঁর যে অনেক কাজ বাকি আছে। সম্ভবত তাঁর প্রধান কাজ হল ভাবী সঙ্ঘকে রক্ষা ও পরিচালনা করার—সঙ্ঘজননীর ভূমিকা পালন করার। ভাইঝি রাধুর প্রতি মায়া স্বীকার করিয়ে সারদাদেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাই অনুরোধ করেছিলেন পৃথিবীতে আরও কিছুকাল থাকতে। দেখা দিয়ে বলেছিলেনঃ 'একে আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।'[১৬] তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে দেখি সঙ্ঘজননীরূপে। লোকগুরুরূপে। কিন্তু কি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি?

জীবন দিয়ে জীবন গড়ে ওঠে। সারদাদেবী শাস্ত্রব্যাখ্যা করেননি, কিন্তু তিনি জীবন্ত শাস্ত্র। তাঁর দৈনন্দিন জীবন শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাঁর সান্নিধ্যলাভ মানে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ। যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলদেহে ছিলেন, ততদিন তাঁর ব্যক্তিত্বের আড়ালে সারদাদেবী নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তিনি যেন নিজেকে আরও আড়ালে গুটিয়ে রাখতে চাইলেন। প্রথমে কিছুদিন থাকলেন বৃন্দাবনে। পরে কামারপুকুরে ও জয়রামবাটীতে। তখন তিনি নিরাশ্রয়, নিঃস্ব, অসহায়। সুদূর পল্লীতে অনশনে, অর্ধাশনে জীবন কাটে তাঁর। আর তাঁর তরুণ সন্ন্যাসী-সন্তানরা? তাঁরাও দরিদ্র, নিরাশ্রয়। কেউ কেউ বৈরাগ্যের প্রবল প্রেরণায় পরিব্রাজক হয়ে তপস্যায় বিভিন্ন স্থানে বেরিয়ে গিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে যে-সঙ্ঘ গড়ে উঠতে যাচ্ছিল তা যেন তখন অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায়। এই সংকট সবচেয়ে পীড়া দেয় সঙ্ঘজননীকে। সঙ্ঘের এসব ত্যাগী-সন্তানদের রক্ষা করার দায়িত্ব যেন তাঁর। পথে পথে ঘুরে বেড়ালে কৃচ্ছ্রসাধন হয়, কিন্তু ধর্ম হয় এমন কোন কথা নেই। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলেরা একত্র থাকবে, যে প্রেম-প্রীতি তাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল কাশীপুরে, তা দিন দিন বাড়তে থাকবে, তা তাদের একত্র ধরে রাখবে, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব অনুসারে তারা তাদের জীবন গড়ে তুলবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনায় তারা ডুবে থাকবে এবং লোককল্যাণমূলক কাজ করবে। তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণও স্বপ্নে তাঁর প্রিয় শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলছেনঃ 'আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।' সুরেন গিয়ে নরেন্দ্র-নাথকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। আর বললেনঃ ভাই, তোমরা একটা বাড়ি দেখ

যেখানে তোমরা ত্যাগীরা একত্র থাকতে পারবে, আর আমরা গৃহীরা মাঝে মাঝে যেয়ে তোমাদের সঙ্গ লাভ করে তৃপ্ত হয়ে আসতে পারব। এর জন্যে শ্রীশ্রীঠাকুর থাকতে তাঁর সেবার জন্যে আমি মাসে মাসে যে টাকা দিয়ে এসেছি, তাই দেব।[১৭] এর পরেই বরানগরের মঠ হল দেখতে পাই। কিছুদিন পরে সে-মঠ স্থানান্তরিত হল আলমবাজারে। কিন্তু এ মঠ স্থায়ী মঠ নয়। স্থায়ী মঠের জন্যে চাই নিজস্ব জায়গা। কোথায় অর্থ যে নিজস্ব জায়গায় স্থায়ী মঠ হবে? ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা গেলেন বুদ্ধগয়ায়। দেখলেন সেখানকার মঠ এবং সেই মঠের সাধুদের সঙ্ঘবন্ধ জীবন এবং সচ্ছলতা। দেখে সঙ্ঘজননীর নিজের ছেলেদের কথা মনে পড়ল। কী কষ্ট তাদের! আশ্রয় নেই! দুটি অন্নের কোন স্থায়ী সংস্থান নেই! কে কোথায় রয়েছে ঠিক নেই! ব্যথায় বুক ভরে উঠল তাঁর। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, তাঁর ছেলেদের জন্যেও যেন অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেনঃ 'আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসারত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, "ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা * তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।" তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।'[১৮] পরবর্তীকালে স্বামী সারদেশানন্দকে যোগেন-মা বলেছিলেনঃ 'যা কিছু দেখছ (মঠ-আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়! যেখানে যা দেখেছেন—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, "ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।" মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।'[১৯]

এর আগে উল্লেখ করেছি মঠ যখন বরানগরে এবং পরে আলমবাজারে তখনও

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সন্তানেরা মাঝে মাঝে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতেন। সাধারণ সাধুরা যেমন বেড়ায়। এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে। 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ'। তীব্র বৈরাগ্য অন্তরে। 'মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন'—এই সঙ্কল্প। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, দুর্গম গিরিগুহায়, দূরে, অতি দূরে। ভারতের সন্ন্যাসীর চিরন্তন যে রূপ। দেশ, সমাজ, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু—সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। এমনকি অতি প্রিয় গুরুভাইদের কাছ থেকেও। অনেকে একেবারে নিরুদ্দেশ। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। মৃত কি জীবিত তাও জানা নেই। নরেন্দ্রনাথের প্রবল আকর্ষণ এই জীবনের প্রতি। বহু আকাঙ্ক্ষিত এই জীবন শুরু করবেন বলে শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে একদিন উপস্থিত হলেন তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী হয়ে। বললেনঃ 'মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।' শ্রীশ্রীমা তখন বেলুড় থেকে অনতিদূরে ঘুষুড়ির একটা ভাড়াবাড়িতে। তিনি বললেনঃ 'সে কি!' স্বামীজী সামলিয়ে নিয়ে বললেনঃ 'না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।' সঙ্গে ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। মা তাঁকে বলে দিলেনঃ 'তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলাম।..দেখো, যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।'[২০] সঙ্ঘের চিহ্নিত নায়ক স্বামীজী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণীঃ 'নরেন [লোক] শিক্ষে দিবে।'[২১] শ্রীশ্রীমাও জানতেন সেকথা। জানতেন ভবিষ্যতের লোকগুরু তাঁর এই প্রিয় সন্তান। তাই তাঁর জন্যে এত চিন্তা। বিশেষত সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এঁর ওপর। মা অফুরন্ত আশীর্বাদ করলেন তাঁর এই প্রিয় সন্তানটিকে। তৃপ্ত মনে স্বামীজী বিদায় নিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগের পর থেকেই স্বামীজীর মনে অনুক্ষণ চিন্তা, গঙ্গাতীরে এমন একটা জায়গা তাঁরা কিনবেন যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ রক্ষিত হবে এবং তার ওপর একটা মন্দির হবে। এই সংকল্পের উল্লেখ দেখতে পাই পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজীর প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে। তাঁদের সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ-চিন্তাও হয়তো এই সংকল্পের পশ্চাতে ছিল। ভাবী সঙ্ঘনায়ক হিসেবে এ চিন্তা তাঁর স্বাভাবিক। কিন্তু এ চিন্তা বাস্তব রূপ নিতে সময় লেগেছিল অনেক। সুযোগও এসেছিল অন্যভাবে। সে-প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে স্বামীজীর বিদেশযাত্রার কাহিনী একটু পর্যালোচনা করা দরকার। তিনি যখন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসেবে দক্ষিণভারতে ঘুরছিলেন, তখন আমেরিকার শিকাগো শহরে এক ধর্ম-মহাসম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। স্বামীজীর গুণমুগ্ধ একদল ছাত্র তাঁকে ধরলেন তিনি যেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে ঐ মহা-সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। প্রয়োজনীয় অর্থও যোগাড় হয়ে গেল। কিন্তু স্বামীজী তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। কি করবেন স্থির করতে পারছিলেন না। শেষে ভাবলেনঃ 'আচ্ছা, শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই অংশস্বরূপিণী ; তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয় না? তিনি যেরূপ বলবেন, সেরূপই করব।' মাকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন কি তাঁর কর্তব্য। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আর কাউকে জিজ্ঞাসা না করে স্বামীজী এই পল্লী-

বাসিনী অশিক্ষিতা নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন যিনি হয়তো আমেরিকা কোথায় বা আমেরিকা বলে যে একটা দেশ আছে, তা-ও জানতেন কিনা সন্দেহ। প্রামাণ্য সূত্রে জানা যায়, স্বামীজীর চিঠি পাওয়ার পর 'মাতৃস্নেহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে' দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। মা হয়ে কি করে ছেলেকে অজানা দেশে যেতে বলবেন? শেষে রাতে স্বপ্ন দেখলেনঃ ঠাকুর সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর নরেন্দ্রকে বলছেন তাঁকে অনুসরণ করতে। তখন মা অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে স্বামীজী উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেনঃ 'আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল : মারও ইচ্ছা আমি যাই!'[২২] এতক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিন্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রার মুহূর্তটি অনেক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। স্বামীজী বিদেশযাত্রা করেন ৩১ মে ১৮৯৩। তাঁর বিদেশযাত্রার কিছু পরে এই বছরই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে শ্রীমায়ের একটা অদ্ভুত দর্শন হয়। ঘাটের সিঁড়িতে বসে শ্রীমা একদিন গঙ্গা দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পিছন থেকে এসে গঙ্গায় মিশে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে স্বামী বিবেকানন্দ এসে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলতে বলতে দু-হাতে সেই জল চারদিকে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। শ্রীমা দেখতে পেলেন, সেই জলের স্পর্শে অগণিত নরনারী সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।[২৩] এই অলৌকিক দর্শন থেকে মা বুঝলেন যুগাবতারের লীলার তাৎপর্য কি, আরও বুঝলেন স্বামীজীর বিদেশযাত্রা সেই লীলার প্রথম পদক্ষেপ।

॥ ৪ ॥

পাশ্চাত্য দেশে স্বামীজীর সাফল্য কোন ব্যক্তির সাফল্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সাফল্য। ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টির সাফল্য। বহুদিন থেকে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ভারত অন্ধকারের দেশ। যেসব ভারতবাসী পাশ্চাত্য দেশে যেতেন, তাঁরাও এ ধারণার বরং সমর্থন করেছেন, প্রতিবাদ করেননি। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার 'সুসভ্য' ইংরেজের শাসন তথা শোষণকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই গণ্য করেছেন। এই পটভূমিকায় অখ্যাতনামা তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনের সম্মুখে ঘোষণা করলেন যে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টি বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশ থেকে কিছু নেবার নেই, বরং দেবার আছে অনেক, তখন সবাই চমকিত হলেন। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা দেখলেন, এ শূন্য আত্মম্ভরিতা নয়, এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তি ও তত্ত্ব আছে। তাঁদের অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছেন, তাঁরা ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছেন। পাশ্চাত্যের এই স্বীকৃতি ভারতের জনমানসে এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া এনে দিল। ভারত যেন আত্মসংবিৎ ফিরে পেল, যে হীনম্মন্যতা তাকে এতদিন পঙ্গু করে রেখেছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে সে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতের প্রকৃত জাতীয় জাগরণ বস্তুত এই পুণ্যক্ষণ থেকেই শুরু হল বলা চলতে পারে। ভারত দেখল সে দরিদ্র হতে পারে, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই সত্য, কিন্তু সে এমন

সব আধ্যাত্মিক সম্পদ উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছে যার কাছে অন্য যে-কোন সম্পদ তুচ্ছ। ভারত যেন নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করল। এই আবিষ্কার সম্ভব হল স্বামীজীর জন্যে। তাই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে এলেন, তখন সমস্ত দেশ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে মেতে উঠল।

কলকাতায় যখন মায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হল মা তখন বাগবাজারে। পুত্র-গর্বে মা-ও গৌরবান্বিতা। বললেনঃ 'তুমি যা করেচ এমনটি আর কেউ করেনি।' স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেনঃ এ মহিমা সম্পূর্ণ তাঁরই (শ্রীমায়ের)। তিনি যদি কিছু করতে পেরে থাকেন, তা তাঁরই (শ্রীমায়ের) কৃপাতে সম্ভব হয়েছে।[২৪] স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম। দেখলাম, সেখানকার মানুষ আমার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে, আমাকে বিপুল সংবর্ধনা জানাচ্ছে, তখন বুঝলাম, মা-র আশীর্বাদের জোরেই এই অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে।'[২৫] শ্রীমা জানতেন যে, স্বামীজীর 'পাশ্চাত্য বিজয়ের' মধ্য দিয়ে ঠাকুরের কাজই সাধিত হয়েছে। তাই তিনি স্বামীজীকে বললেন যে, ঠাকুরই তাঁর ভিতর দিয়ে এসব করছেন ; স্বামীজী তাঁর (ঠাকুরের) চিহ্নিত শিষ্য এবং সন্তান। জানা যায়, স্বামীজী সেদিন মায়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন যাতে রামকৃষ্ণসঙ্ঘকে তিনি একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারেন। মা স্বামীজীকে সেই আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, ঠাকুর অচিরেই তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।[২৬] সঙ্ঘজননীর আশীর্বাদ অচিরেই ফলপ্রসূ হয়েছিল।

স্বামীজী যখন বিদেশে ছিলেন তখনও এক মুহূর্তের জন্যে সঙ্ঘের প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত হননি। সেখানেও এই চিন্তা তাঁর মাথায় সব সময়ই ছিল কি করে এক খণ্ড জমি গঙ্গার ধারে হবে যেখানে তাঁর গুরুদেবের দেহাবশেষ রক্ষিত হবে এবং তাঁরা সবাই একত্র থেকে তাঁর ভাব প্রচার করবেন। একটা ভাব বা আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে দরকার একটা সঙ্ঘের। পাশ্চাত্য দেশে থাকতে স্বামীজী লক্ষ্য করেছেন সঙ্ঘশক্তির মহিমা। পাশ্চাত্যের সমস্ত সাফল্যের পেছনে এই সঙ্ঘশক্তি। তাই তিনি চান তাঁদের সঙ্ঘও দৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে উঠুক। এজন্যে চাই একটুকরো জমি। এতদিন জমির অর্থ তাঁদের ছিল না। সুখের বিষয় পাশ্চাত্য দেশ থেকেই সে অর্থ তিনি পেয়ে গেছেন। তাই দেশে ফিরেই জমির সন্ধানে লেগে গেলেন। 'গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল।' তা-ই হল। বেলুড় গ্রামে গঙ্গার পশ্চিম কূলে জমি পেলেন। কিন্তু সে জমি মাকে না দেখালে তাঁর তৃপ্তি নেই। স্বয়ং স্বামীজী তাঁকে সমস্ত জমি ঘুরিয়ে দেখালেন। নতুন কাপড় পরিয়ে চেয়ারে বসালেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে করজোড়ে বললেনঃ 'মা, এতদিনে আজ আমার মাথায় যে বোঝা ছিল তা নেমে গেল—তোমাকে তোমার নিজের জমিতে এনে। এখন তুমি হাঁফ ছেড়ে চারিদিকে বেড়াও, ঘুরে ফিরে দেখ।'[২৭] এখানে 'নিজের জমি' কথাটা লক্ষণীয়। মা সঙ্ঘজননী, তাই মায়ের নিজের জমি। জমি শ্রীশ্রীমার

পছন্দ হল। জমিপ্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বলেছিলেনঃ 'আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপার ঐ জায়গাটিতে—যেখানে এখন [বেলুড়] মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন।'[২৮] সঙ্ঘের জমি হওয়াতে শ্রীশ্রীমায়ের কী আনন্দ! বললেনঃ 'এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।'[২৯] সঙ্ঘের সূচনায় কাজের পন্থা নিয়ে মতপার্থক্য হলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন। যে-কোন সমস্যার সমাধান মা সঙ্গে সঙ্গেই করে দিতেন এবং সকলেই তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজো করতে চাইলে অনেকের তাতে আপত্তি হয়। স্বামীজী মাকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। মা মত দেন তবে বলি দিতে নিষেধ করেন। বলেনঃ 'হ্যাঁ বাবা. মঠে দুর্গাপূজা করে শক্তির আরাধনা করবে বইকি। শক্তির আরাধনা না করলে জগতে কোন কাজ কি সিদ্ধ হয়? তবে বাবা, বলি দিও না, প্রাণী হত্যা কোরো না। তোমরা হলে সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।'[৩০] স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল নবমীর দিন বলি দেবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শিষ্য শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেনঃ '...মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব! রঘুনন্দন বলেছেন, "নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দমম্"—এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্ন হন। মার ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।'[৩১] —কিন্তু তিনি নির্বিকার চিত্তে মায়ের এ আদেশ মেনে নেন। দ্বিরুক্তি করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিষেধ করলে হয়তো অনেক শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে তর্ক করতেন, কিন্তু এ সঙ্ঘজননীর আদেশ, এখানে প্রতিবাদের অবকাশ নেই। ঐ দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীমায়ের নামে সঙ্কল্প করা হয়। কারণ স্বামীজী বলেনঃ 'মার নামে সঙ্কল্প হবে। আমরা তো কপ্নিধারী—আমাদের নামে হবে না।'[৩২] সেই থেকে স্বামীজীর নির্দেশে আজ অবধি সব ক্রিয়া-কর্মে শ্রীশ্রীমায়ের নামেই সঙ্কল্প হয়ে আসছে।

স্বামী সারদানন্দ বলেছেনঃ শ্রীশ্রীমা স্বামীজীর কাজের উদ্দাম আবেগ যেন অনেক সময় রাশ টেনে ধরে নিয়ন্ত্রণ করতেন। কলকাতায় একবার প্লেগ-মহামারীর সময় স্বামীজী সেবাকাজ শুরু করেন। কিন্তু কাজের ব্যাপকতা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় ও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান না থাকায় স্বামীজী বিচলিত হয়ে মঠ বিক্রি করে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ 'আমরা ফকির; মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গাজমি বিক্রি করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?'[৩৩] কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের নিষেধে জমি বিক্রি করা হয়নি। তিনি স্বামীজীকে বললেনঃ 'সে কি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সঙ্কল্প

করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ. তোমার ওসব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায় ?' মা বুঝেছিলেন, সঙ্ঘ থাকার দরকার। সঙ্ঘ থাকলেই তবে অনেক জনহিতকর কাজ হবে। আর অনেকদিন ধরে চলবে। সঙ্ঘ না থাকলে তা হবে না। সেবা মহৎ কাজ নিশ্চয়ই. কিন্তু সে কাজ আরও মহৎ হয় যদি তা স্থায়ী হয়। তাই সঙ্ঘের দরকার। স্বামীজীকে মা বললেনঃ 'বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এই ভাব চলবে।' স্বামীজী তখন নিজের ভুল স্বীকার করে লজ্জিতভাবে বলেনঃ 'তাইতো. আবেগভরে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম. সত্যি তো মঠ বিক্রি আমি করতে পারি না. সে অধিকার আমার নেই। রাজাকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মঠের অধ্যক্ষ এবং শরৎকে (স্বামী সারদানন্দ) সেক্রেটারি করা হয়েছে। এদেরই সব অধিকার। আমার অধিকার কোথায় ? সে কথা যে আমার খেয়ালই ছিল না!'[৩৪]

মা প্রত্যক্ষভাবে সঙ্ঘের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না কখনও। কিন্তু যাঁরা পরিচালক. তাঁরা সর্বদা মায়ের আশীর্বাদ ও নির্দেশ কামনা করতেন। কারণ তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে মাকে অভিন্ন বলেই জানতেন। তাঁর সামান্যতম ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। বলরামবাবুকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে স্বামীজী লিখছেনঃ 'মাতাঠাকুরানীর যে-প্রকার ইচ্ছা হইবে. সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম. তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি ?'[৩৫] সত্যিই মায়ের ওপর কোন কথা তিনি কখনও বলেননি। মঠের এক বেতনভুক কর্মীকে চুরি করার অপরাধে স্বামীজী বরখাস্ত করেন। সে মায়ের কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করে। বলে. কাজ না থাকলে সে ও তার বাড়ির লোকেরা না খেয়ে মরবে। মঠ থেকে এই সময়ে বাবুরাম মহারাজ মায়ের কাছে আসেন। মা বাবুরাম মহারাজকে আদেশ করেন লোকটিকে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এবং পুনরায় কাজে লাগাতে। স্বামীজী রাগ করতে পারেন বলায় মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেনঃ 'আমি বলছি, নিয়ে যাও।'[৩৬] মায়ের আদেশ অনুসারে বাবুরাম মহারাজ ঐ লোকটিকে মঠে ফিরিয়ে আনেন। স্বামীজী যখন জানলেন মা লোকটিকে মঠে ফেরত পাঠিয়েছেন, তখন নাকি শুধু সহাস্যে বলেছিলেনঃ 'ব্যাটা হাইকোর্ট চিনেছে!' হাই-কোর্ট--অর্থাৎ যার পরে আর কোন কথা চলে না। শুধু স্বামীজীই নন. স্বয়ং শ্রীরাম-কৃষ্ণও শ্রীমায়ের উপদেশ ও পরামর্শকে সব সময় বিনাবাক্যব্যয়ে শিরোধার্য করে চলতেন। নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করবার আগে তাঁর (শ্রীমায়ের) পরামর্শ সর্বদা নিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা তাঁর উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন।'[৩৭]

কত লোকের জীবন স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে. দেশে বিদেশে কত ভাগ্যবান ব্যক্তিকে তিনি কৃপা করেছেন। কিন্তু তিনিই আবার দীক্ষার আসনে বসে কোন কোন দীক্ষার্থীকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন. বলছেনঃ তোমার যিনি গুরু তিনি আমার চেয়েও বড়।[৩৮] সেই গুরু শ্রীমা। মাকে প্রণাম করতেন সাষ্টাঙ্গ হয়ে।

মায়ের সামনে যাবার আগে অনেকবার গঙ্গাজল খেয়ে ও গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিতেন।[৩৯] ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্থায়ী পত্তনের পরিকল্পনার যে সভা বলরাম বসুর বাড়িতে হয়েছিল, তাতে উপস্থিত ত্যাগী-গুরুভাই ও গৃহী-ভক্তদের সম্বোধন করে আবেগময় ভাষায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'শ্রীশ্রীমাকে কি রাম-কৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে কর? তিনি শুধু তা নয় ভাই, আমাদের এই যে সংঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সংঘজননী।'[৪০]

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ। এক পত্রে বলছেনঃ শ্রীশ্রীমার আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম কর্ম। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; যাকে যা বলবেন সে তাই করতে বাধ্য।[৪১] তিনি যে মায়ের আদেশের কত বাধ্য ছিলেন, কেমন নির্বিচারে তাঁর প্রতিটি কথা শিরোধার্য করতেন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই নিম্নের ঘটনায়। একবার মালদার দুই ভক্ত ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে আসেন। কিন্তু মায়ের অনুমতি না নিয়ে তিনি কোথাও যেতেন না। মায়ের অনুমতির জন্য তিনি উদ্বোধনের বাড়িতে গেলেন। মা মালদার নাম শুনে বললেনঃ 'সে তো অনেক দূর। তোমার না এর মধ্যে অসুখ হয়েছিল? ...এ গরমের মধ্যে, একবার অসুখও হয়ে গেছে, এতদূর নাই গেলে।' স্বামী প্রেমানন্দের মালদায় যেতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হল মা যে আদেশ করলেন তাই যেন তাঁর অভীপ্সিত ছিল। তিনি আনন্দিত হয়ে 'আচ্ছা মা, বেশ, বেশ' বলে নীচে নেমে আসলেন। কিন্তু একথা শুনে মালদার ভক্ত দুটি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের একজন তখনই মায়ের কাছে গিয়ে তাঁদের বক্তব্য বুঝিয়ে বললেনঃ প্রায় দুমাস ধরে উৎসবের আয়োজন হচ্ছে, বিরাট আয়োজন এবং সকলে আশা করে আছেন বাবুরাম মহারাজ সেখানে যাবেন। আর মালদা বেশী দূরও নয় এবং ওঁকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। বেশী দিন না হোক, অন্তত অল্প কয়েকদিনের জন্য ওঁকে সেখানে যাবার অনুমতি না দিলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।—ভক্তটির কথা শুনে মা তাঁকে প্রশ্ন করে বুঝে নিলেন যে মালদা খুব দূরের জায়গা নয়। তখন ভক্তটিকে একটু ভেবে দেখবেন বলে নীচে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে মা স্বামী প্রেমানন্দকে আবার ডাকিয়ে এনে বললেনঃ 'এরা এত করে বলছে। তবে কি তুমি যাবে?' স্বামী প্রেমানন্দ উত্তর দিলেনঃ 'আমি কি জানি, মা? আমি কি জানি? আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করব। জলে ঝাঁপ দিতে বলেন, জলে ঝাঁপ দিব; আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আগুনে ঝাঁপ দিব; পাতালে প্রবেশ করতে বলেন তো পাতালে প্রবেশ করব। আমি কি জানি? আপনার যা আদেশ।' কথাকটি স্বামী প্রেমানন্দ এমন ভাবাবেগের সাথে বললেন যে তাঁর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল।[৪২] শ্রীশ্রীমা আর আপত্তি করলেন না। আনুমানিক ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এক ঘটনা। আমেরিকায় আছেন এক সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব

প্রচার করছেন। তাঁকে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে একটু সাবধান করা দরকার। কিন্তু কে করবেন মা ছাড়া? এক চিঠি মুসাবিদা করলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ মিলে। মাকে পড়ে শোনানো হল। মা বললেনঃ 'রাখাল, যোগেনকে বলো, চিঠি সুন্দর হয়েছে; আমার মত এতে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে।'[৪৩] মার নামে তখন ঐ চিঠি গেল। মা যে সকলের ওপরে তাই তাঁর নামে চিঠি গেল। এ সাবধানবাণী সঙ্ঘজননীর সাবধানবাণী। কে তাকে অগ্রাহ্য করবে? আবার এক ডাক্তার মাকে দেখতে আসেন রোজ। মায়ের শরীর খারাপ। ডাক্তার কিন্তু জানেন না মাকে। একদিন কৌতূহল হল, শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন। শরৎ মহারাজ বললেনঃ 'আমাদের সঙ্ঘজননী।'[৪৪]

স্বামী শিবানন্দ তখন বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধান করেন। এক ব্রহ্মচারী কিছু একটা অন্যায় করে মহাপুরুষ মহারাজের ভয়ে মঠ থেকে পালিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মা মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি লিখে তাঁকে মঠে পাঠিয়ে দেন। ব্রহ্মচারী মঠে ফিরলে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেনঃ 'ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি?'[৪৫]

॥ ৫ ॥

জননীর স্নেহ দিয়েছেন বলেই শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘজননী নন। সঙ্ঘকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিয়েছেন বলে তিনি সঙ্ঘজননী, মা যেমন অবোধ শিশুর হাত ধরে চালান। নিজের জীবন দেখিয়ে তিনি সঙ্ঘকে চালিয়েছেন—প্রতিকূল পরিবেশে কি করে লক্ষ্যে স্থির থেকে চলা যায় তাই দেখিয়ে, তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য, ঈশ্বর-নির্ভরতা, সত্যনিষ্ঠা, নিঃস্পৃহতা, আপামর জনসাধারণের প্রতি সন্তানবাৎসল্য দেখিয়ে। গৃহী-ভক্তকে গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ দেখিয়েছেন, ত্যাগী-ভক্তকে সন্ন্যাসের আদর্শ। সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস, তাই সঙ্ঘজননী।

রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যেরা প্রত্যেকেই অবতারকল্প পুরুষ। প্রত্যেকেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। প্রত্যেকেই তেজস্বী ও যুক্তিবাদী। স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভর। শাস্ত্রজ্ঞ ও অনুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু শ্রীশ্রীমার কাছে তাঁরা প্রত্যেকেই যেন শিশু। তিনি গুরুপত্নী বলে? শুধু গুরুপত্নী হলে মায়ের সামনে এই আত্মবিলুপ্তি তাঁদের পক্ষে কখনও সম্ভব হত না। মায়ের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার থেকেই আমরা বুঝতে পারি কি চোখে তাঁরা মাকে দেখতেন। ভক্তি, ভালবাসা, বিস্ময়, সম্ভ্রম মিলিয়ে অদ্ভুত এক অপ্রাকৃত সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে তাঁদের গড়ে উঠেছিল। নিবেদিতা লিখছেনঃ 'তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের বীরোচিত সম্ভ্রম দেখবার মতো। তাঁকে সব সময় তাঁরা মা বলে ডাকেন। তাঁর বিষয়ে উল্লেখের সময়ে বলা হয় "মাতাঠাকুরানী", প্রতি ব্যাপারে তাঁকে স্মরণ করা হয়; সব সময়ে তাঁর দেখাশুনার জন্যে দু-একজন নিযুক্ত থাকেন। তাঁর ইচ্ছাকেই চূড়ান্ত আদেশ বলে মনে করা হয়। এ এক দর্শনীয়

অপরূপ সম্পর্ক'।'[৬৬] এ-সম্পর্ক শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে তুলনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন—তা করেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জীবন গড়ে দিয়ে। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন শক্তিধর পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাকে বলে গিয়েছিলেনঃ 'সব রত্ন ছেলে।' রত্ন ঠিকই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁদের রত্নহারে গেঁথে রেখেছিলেন শ্রীশ্রীমা। ক্ষুদ্র অথচ প্রচন্ড শক্তিশালী এক সঙ্ঘ এঁদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তিনিই। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের একত্রিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ধরে রেখেছিলেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা ছড়িয়ে পড়বে এবং বহু যুগ ধরে মানুষকে শান্তি ও আনন্দ দেবে, গোড়া থেকেই এই ছিল তাঁর আকূতি। শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন শুধু কয়েকজনের জন্যে নয়, বহুর জন্যে, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে—এ ইঙ্গিত শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দিয়ে গিয়েছিলেন। এজন্যে দরকার মঠ, দরকার সঙ্ঘ। বেলুড়ে জমি হল, মঠ স্থাপিত হল, কিন্তু তাতেই মা সন্তুষ্ট নন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের স্বাভাবিক আকর্ষণেই দিকে দিকে ছোট বড় মঠ-আশ্রম গড়ে উঠতে লাগল। লক্ষণীয়, যাঁরা এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও পরিচালক, তাঁদের অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে দীক্ষা নিচ্ছেন, কেউ কেউ ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাসও নিচ্ছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এসে এভাবে অনেকে সংসারবিমুখ জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন দেখে কেউ কেউ তাঁকে দোষারোপও করেছেন, কিন্তু মা যা শ্রেয়, সেদিকে তাঁর আশ্রিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা থেকে কখনও বিরত হননি। তিনি তো শুধু স্নেহময়ী জননী নন, তিনি গুরুও। তাঁর সন্তানেরা পরম পুরুষার্থ লাভ করবে, এই তিনি চান। যাঁরা সংসারী, তাঁরা কিভাবে সংসারধর্ম পালন করবেন, সে শিক্ষা দিচ্ছেন নিজের আচরণ দিয়ে এবং ছোট-খাট ইঙ্গিতপূর্ণ কথা দিয়ে। কিন্তু যাঁরা সংসারত্যাগী, তাঁদের প্রতিই যেন তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। তাঁদের বলতেন 'দেবশিশু'। তাঁরা ত্যাগের পথে এসেছেন দেখে তিনি যেমন আনন্দিত, তেমনই তাঁরা যাতে সুস্থ দেহে থেকে নিজেদের আদর্শকে অনুসরণ করে যেতে পারেন, সেদিকেও সর্বদা ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

সন্ন্যাসীরা অনাবশ্যক কঠোরতা করবেন, মা চাইতেন না। কোয়ালপাড়া আশ্রমে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে ছিল। ত্যাগী-সন্তানদের স্বাস্থ্যের কথা মনে রেখে মা সেখানে মাছ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী শান্তানন্দ এবং স্বামী গিরিজানন্দের ইচ্ছে হয়েছিল শ্রীমার কাছে সন্ন্যাস নিয়ে অবশিষ্ট জীবন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী-রূপে কাটিয়ে দেবেন। মা তাঁদের সন্ন্যাস দিলেন, তবে পরিব্রাজক-জীবনের কঠোরতায় মায়ের মন সায় দিল না। তাঁদের সংকল্পের মর্যাদা রক্ষা করে মা তাঁদের কাশী পর্যন্ত পদব্রজে যাওয়ার অনুমতি দিলেন শুধু। স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ তপস্যা করবার জন্য মায়ের কাছে অনুমতি নিতে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল হাঁটতে হাঁটতে কাশী পর্যন্ত যাবেন। মা সব শুনে বললেনঃ 'কার্তিক মাস, লোকে বলে যমের চার দোর খোলা। আমি মা; আমি কি করে বলি, বাবা, তুমি যাও? আবার বলছ, হাতে পয়সা নেই, খিদে পেলে কে খেতে দেবে, বাবা?'[৬৭]

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দের আর যাওয়া হল না। ত্যাগী-সন্তানদের কারও স্বাস্থ্যহানি হলে যেমন চিন্তিতা হতেন, ততোধিক চিন্তিতা হতেন যদি কারও আচরণে ত্রুটি দেখতেন। এইসব ত্যাগী-সন্তানদের সার্বিক কল্যাণের দায়িত্ব যে তাঁর, সে-বিষয়ে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। পক্ষী-জননী যেমন নিজের পক্ষপুট দিয়ে শাবককে রক্ষা করে, তেমনই রক্ষা করতেন। একবার স্বামী বিরজানন্দ মস্তিষ্কের দুর্বলতা ও শরীরের অবসাদে কষ্ট পাচ্ছিলেন। সুচিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পথ্য সত্ত্বেও এই রোগ সারছিল না। তিনি জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করতে আসেন। মা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারলেন, এ শরীরের রোগ নয়। জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'ধ্যান কোথায় কর? হৃদয়ে না সহস্রারে?' স্বামী বিরজানন্দ উত্তর দিলেনঃ 'সহস্রারে।' শুনে মা বললেনঃ 'বাবা করেছ কি? ও যে শেষ অবস্থার কথা—পরমহংস অবস্থার কথা। একেবারেই কি অত উঁচুতে মনকে রাখতে পারা যায়? প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে নামিয়ে এনে সেখানে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়।' এত চিকিৎসা, নিয়ম-পালন, পথ্যাদি যা করতে পারেনি শ্রীশ্রীমায়ের সামান্য বিধানে তা সম্ভব হল। কয়েকদিন ধ্যানের প্রণালী বদলে স্বামী বিরজানন্দ অদ্ভুত উপকার বোধ করতে লাগলেন। জীবনের অপরাহ্ণে এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি গভীর আবেগের সাথে বলেছিলেনঃ 'সিদ্ধগুরুর দরকার এই জন্যেই। মায়ের এই উপদেশ যদি না পেতুম তা হলে হয়তো জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতো, চিররুগ্ন থাকতুম অথবা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটতো।'[৩৮] যেমন আগ্রহী সন্তানকে গৈরিক দিয়ে মা আনন্দ পেতেন, তেমনই যাতে সেই সন্তান গৈরিকের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে, সেজন্যে তাকে যথাযথ উপদেশও দিতেন। একবার ঠাকুরের সময়ের কোন গৃহী-ভক্তের সাথে স্বামী শান্তানন্দের কাশী যাবার কথা হয়। তাতে স্বামী শান্তানন্দের পাথেয় তাঁরাই বহন করতেন। মা শুনে তাঁকে বললেনঃ 'তুমি সাধু, তোমার কি আর যাওয়ার ভাড়া জুটবে না? ওরা গৃহস্থ, ওদের সঙ্গে কেন যাবে? এক গাড়িতে যাচ্ছ; হয়ত বললে, "এটা কর, ওটা কর।" তুমি সন্ন্যাসী, তুমি কেন সেসব করতে যাবে?'[৩৯]

সাধুর কারও প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকতে পারে। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি হবে আদর্শভিত্তিক। সাধুর পক্ষে ব্যক্তিপূজা সমর্থনযোগ্য নয়। মা তাই বলতেনঃ 'সাধু সব মায়া কাটাবে। সোনার শিকলও বন্ধন, লোহার শিকলও বন্ধন। সাধুর মায়ায় জড়াতে নেই।'[৪০] যে ভুল করেছে, মাতৃসুলভ স্নেহ দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন, ভুল সংশোধন করে নিতে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু ভুল ভুল নয়, একথা কখনও বলেননি। দুর্বলকে ক্ষমা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, সে দুর্বলতা জয় করুক চেয়েছেন এবং তার পথও বলে দিয়েছেন, কিন্তু স্নেহান্ধ হয়ে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি। সন্ন্যাসীর আদর্শ মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শের অবমাননাকে কখনও ক্ষমা করেননি। এই প্রসঙ্গে একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেনঃ 'তিনি স্নেহময়ী ছিলেন, কিন্তু স্নেহদুর্বলা ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ওপর তাঁর

একটা অদৃশ্য প্রভাব অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। সঙ্ঘের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ 'অবনত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।'[৫১] একবার তাঁর এক ত্যাগী-সন্তান সন্ন্যাসের পবিত্র ব্রত ভঙ্গ করে অনুতপ্ত হন। মা তাঁকে বলেছিলেনঃ 'তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি, তুমি আমার সন্তানই থাকবে, কিন্তু ব্রতভঙ্গকারীর কোন প্রায়শ্চিত্তেই সন্ন্যাসিসঙ্ঘে স্থান হতে পারে না।'[৫২] মাতৃহৃদয়ও ক্ষেত্রবিশেষে কত 'কঠিন' হতে পারে, এ ঘটনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিবেদিতাও লিখেছেনঃ 'যখন কঠোরতার প্রয়োজন হত তখন মা কোনোরকম যুক্তিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হতেন না। কোন ব্রহ্মচারীকে হয়তো আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শাস্তি দিয়েছেন, তাকে সেই মুহূর্তেই সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। কারণ এ তাঁর আদেশ। সন্ন্যাসের ব্রত যে লঙ্ঘন করেছে, সে কখনই তাঁর সাক্ষাতে আসতে অনুমতি পাবে না।'[৫৩] কেউ যদি উৎসাহের আধিক্যে কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়তেন, তাহলে তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ক্ষান্ত করতে চেষ্টা করতেন। তপস্যা ভালো, কিন্তু যে তপস্যা শুধু অর্থহীন আত্মনিগ্রহ, তাকে মা কখনও সমর্থন করেননি। শ্রীশ্রীমা বিশেষভাবে বিচলিত হতেন যখন দেখতেন তাঁর কোন সাধু-সন্তান ভিক্ষা করে খেয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি চাইতেন সাধুরা সব একসঙ্গে থাকুন, আর সাধনভজন ও আর্ত-নারায়ণের সেবা করে জীবন কাটান।

॥ ৬ ॥

রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের জন্য স্বামীজী নিষ্কাম কর্মযজ্ঞের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীরা কাজ করবে এটা প্রথম দিকে তাঁর গুরুভাইদেরও কেউ কেউ পছন্দ করতেন না। আশ্চর্যের বিষয়, মায়ের তাতে বরাবরই সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। মা মনে করতেনঃ নিষ্কাম কর্ম পূজারই সমান। এক সন্ন্যাসী-সন্তান কাজ ছেড়ে কিছু-দিনের জন্য বাইরে তপস্যায় যেতে চাইলে মা তাঁকে বলেছিলেনঃ 'সে কি গো, আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, এ কি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে? হাওয়া গুণতে কোথায় যাবে?'[৫৪] স্বামী অরূপানন্দ একবার মায়ের কাছে এই সন্দেহের কথা (অর্থাৎ সন্ন্যাসীর কাজ করা উচিত কিনা) তুললে মা বলেছিলেনঃ 'কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? ...মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।'[৫৫] সর্বদা সাধনভজন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মা সন্ন্যাসী-সন্তানদের 'ঠাকুরের কাজ' ভেবে কাজ করতে বলতেন।[৫৬] আশ্রমের কাজে জপধ্যানে বিঘ্ন ঘটতে পারে এই কথা একজন বলায় মা বলেছিলেনঃ 'কাজ আর কার? কাজ তো তাঁরই।'[৫৭] স্বামী ঈশানানন্দকে বলেছিলেনঃ 'কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ

দরকার। অন্তত সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। ...[কিন্তু] সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে কজন? প্রথমটা একটু করে। শেষে...বসে থেকে থেকে নীচের গরম মাথায় ওঠে (অহঙ্কারী হয়)। গাছ পাথর ভেবে নানা অশান্তি। মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।'[৮৮]

সন্ন্যাসীদের জন্য স্বামীজী যে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কথা বললেন, সে সম্বন্ধেও তাঁর গুরুভাইরা অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। অথচ স্বামীজী জোর দিয়ে বললেনঃ সন্ন্যাসীর আদর্শ হবে—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ দুয়ের জন্যই একযোগে চেষ্টা করে যেতে হবে সন্ন্যাসীকে। স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় দিকে দিকে তাই সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল। কোথাও কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে আর্ত মানবের সেবায় রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীরা সেবার জন্যে ছুটে যেতে লাগলেন। অনেকে মনে করতে লাগলেন এ সেবাকাজ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববিরুদ্ধ। এই দলে অন্যদের সঙ্গে স্বয়ং মাস্টারমশায়ও (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম) ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝে বিরূপ মন্তব্যও করে ফেলতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ এঁরা সবাই একথা জানতেন। একবার তাঁরা শ্রীশ্রীমা-সহ সবাই কাশীতে আছেন। কাশীতে সঙ্ঘের যে সেবাশ্রম গড়ে উঠেছিল সেখানে রোগীদের সেবার কাজ প্রায় সবটা সাধুরাই করতেন। এখনও তাই করেন। শ্রীশ্রীমা একদিন এই সেবাশ্রম দেখতে আসেন। সব দেখেশুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। বলেনঃ 'এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন।'[৮৯] কর্মীদের উৎসাহ দেবার জন্যে একখানি দশ টাকার নোটও[৯০] সেবাশ্রমের অর্থভাণ্ডারে দান করেন। ঐদিন জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা আরও বলেছিলেনঃ 'দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।'[৯১] এসব শুনে মাস্টারমশায় স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, এ-ভাবের সেবাকাজের বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তি টিকতে পারে না। সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষে সেবাকাজ বিধেয় কিনা, এ বিতর্কের চির অবসান ঘটে গেছে এ ঘটনার পর। স্বামীজীর শিক্ষিত গুরুভাইরা, যাঁরা ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরাও স্বামীজীর এই আদর্শকে সমর্থন করতে প্রথমে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে অশিক্ষিতা হলেও শ্রীশ্রীমা প্রথম থেকেই তাঁকে কুণ্ঠাহীন সমর্থন জানিয়েছেন।

মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম হয়েছে। স্বামীজীর ইচ্ছা, এই আশ্রমে অদ্বৈত ধ্যান-চিন্তা হবে, কোন পূজা-উপাসনা হবে না। কিন্তু স্বামীজী মায়াবতীতে এসে দেখলেন (জানুয়ারি ১৯০১) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির পূজা হচ্ছে, যদিও খুব সাদা-সিধেভাবে। দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। যাঁরা ঐ আশ্রমের পরিচালক, তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন। তিনি অবশ্য বললেন না ঐ পূজা বন্ধ করতে, তবু যাঁরা পূজার উদ্যোগী ছিলেন, তাঁরা স্বামীজীর মনোভাব বুঝে পূজা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তাঁদের মনে সংশয়— স্বামীজীর এই মূর্তিপূজা তথা দ্বৈতভাবে উপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি কি সমর্থন-

যোগ্য? এঁদের একজন স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য এবং সকলেরই সন্ন্যাসগুরু স্বামীজীই। তবুও কিছুতেই সংশয় দূর করতে না পেরে একজন শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখে সব ঘটনা জানালেন এবং তাঁর মত জানতে চাইলেন। ১৫ ভাদ্র ১৩০৯ তারিখে (৩১ আগস্ট ১৯০২ অর্থাৎ স্বামীজীর দেহরক্ষার পরে) লেখা একটি চিঠিতে মা জানালেনঃ 'আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য—তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।' তখন অনেকেরই ধারণা ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈতবাদী কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—অদ্বৈত-বাদী নন। মায়ের এই চিঠিতেই সেই বিতর্কের চির যবনিকাপাত। এরপরে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী কিনা এ সন্দেহ আর ওঠেনি। মায়ের ঐ চিঠি অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু অদ্বৈতবাদীই নন, আরও বেশী। অদ্বৈততত্ত্বের সাকার বিগ্রহ তিনি—স্বয়ং 'অদ্বৈত'। তাঁর অনুগামীরা তাই 'অবশ্য অদ্বৈতবাদী'। যেটা আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে এখানে লক্ষ্য করি, সেটা হচ্ছেঃ স্বামীজীর অভিমতও চূড়ান্ত বলে গৃহীত হচ্ছে না, যতক্ষণ না তা শ্রীশ্রীমায়ের সমর্থন লাভ করছে।

॥ ৭ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন তাঁর অবর্তমানে শ্রীশ্রীমা তাঁর স্থান গ্রহণ করবেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর অক্ষমতা জানিয়েছিলেন, কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব সম্প্রসারণের কাজ তাঁকেই করতে হল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গিয়েছিলেনঃ 'আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।'[৬২] শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান ঘটে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। তার পর থেকে সার্ধ তিন দশক শ্রীরামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীর লালন-পালন আর তাঁর চিন্তা ও আদর্শের পুষ্টিসাধন করে এসেছেন শ্রীশ্রীমা। তা করেছেন তাঁর নিজের জীবন দেখিয়ে, নিজের ত্যাগ-তপস্যা ও ঈশ্বরানুরাগের ভেতর দিয়ে। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। দূর-দূরান্তর থেকে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিরা এসেছেন তাঁর কাছে, অগণিত নরনারী, আসার বিরাম নেই। নানা ভাষাভাষী, নানা চরিত্রের। বস্তুত যেটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এই যে, নানা ধরনের মানুষকে একত্র এনে একটা উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে তাদের রূপান্তর ঘটাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে যাদের সাধারণ বা নগণ্য মনে হয়েছে, তাদের তিনি উপেক্ষা করেননি। তাদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনাকে তিনি বাস্তবায়িত করেছেন, এইটিই তাঁর বিশেষ কীর্তি। যেন তাঁর কোন যাদুস্পর্শে সেই সব সাধারণ মানুষ মহৎ মানুষে পরিণত হয়েছে। এক সময়ে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগ দিতেন, তাঁদের অনেকে ছিলেন এমন সব ব্যক্তি যাঁরা অতীতে সহিংস রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু), স্বামী চিন্ময়ানন্দ (শচীন্দ্রনাথ সেন), স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দের (প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা রাজনীতি বর্জন করে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তখনকার ব্রিটিশ সরকার কিন্তু এটাকে

নিছক চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা বলে মনে করতেন। তাঁরা ঐসব সন্ন্যাসীদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতেন এবং সমস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল কলকাতায় দরবার ভাষণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এমন কিছু মন্তব্য করেন যার মর্মার্থ দাঁড়ায় এরকমঃ দেশের সন্ত্রাসবাদী তরুণ ও যুবকরা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশ্রয়পুষ্ট এবং তারা মিশনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের আনুকূল্যে এবং মিশনের অধীনে ত্রাণকার্য করার ছলে প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপই চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরলমতি আদর্শবান অনভিজ্ঞ তরুণদের প্রভাবিত করে দল বাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশবাসী যেন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের ছেলেদের যোগাযোগ এবং সম্পর্কের ব্যাপারে—যা কিনা রাষ্ট্রদ্রোহিতারই নামান্তর—সাবধান হন।[৬৩] গভর্নরের এই মন্তব্যের পর মঠ-মিশনের ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ মঠ-মিশনের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিলেন পুলিসের সন্দেহভাজন ঐসব ব্যক্তিদের বহিষ্কার করে দিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষও এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন দাক্ষিণাত্যে। অবশেষে মঠ-মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ মায়ের কাছে সব জানালেন। মা সব কথা ধীরভাবে শুনে দৃঢ়তার সাথে বললেনঃ 'ওমা! এসব কি কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে, তারা মিথ্যা-ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।'[৬৪] অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে, সব কথা শুনে মা বলেছিলেনঃ 'ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ মিশন হয়েছে; রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে, নয় তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।'[৬৫] এ সঙ্ঘজননীরই উপযুক্ত কথা! মায়ের সাহস ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক এই কথায় সবাই আশ্বস্ত হলেন। মায়ের পরামর্শ অনুসারে স্বামী সারদানন্দ লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং রামকৃষ্ণসঙ্ঘের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেন। সুখের বিষয়, ঐ আলোচনার পরে কারমাইকেল তাঁর পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং ঐ বক্তব্য প্রকাশের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।[৬৬] ফলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও

বদলে যায়। সুতরাং কাকেও বহিষ্কার করার প্রশ্ন আর ওঠে না। এইভাবে আপদে-বিপদে মা সঙ্ঘকে পালন ও রক্ষা করে চলতেন।

॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীমায়ের অবদান আদর্শের রূপায়ণে। নিজের চরিত্র ও জীবন দিয়ে এই রূপায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই বলেছিলেন তিনি যা করেছেন, তার চেয়ে বেশী করবেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীশ্রীমা সাধারণ মানুষকে বুঝতেন এবং জানতেন। তারা হয়তো তত্ত্ব বোঝে না, কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণকে বোঝে। তারা দয়া, ক্ষমা, সহনশীলতা ইত্যাদির দার্শনিক কারণ অত বোঝে না, কিন্তু কারও আচরণে প্রতিফলিত দেখলে বোঝে, তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তারা হয়তো ঈশ্বরপ্রেম বোঝে না, কিন্তু ঈশ্বর-বুদ্ধিতে মানবসেবা বুঝতে পারে। অদ্বৈত-দ্বৈতের সূক্ষ্ম বিচার তাদের বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু সহজ প্রেম-প্রীতি মিশ্রিত লোকাচার ও শিষ্টাচার অনায়াসে বুঝতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে তাঁর ভাব ছড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয়। আর একদল ছিলেন যাঁরা তরুণ কিন্তু প্রতিভাবান। সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে কিন্তু তাঁর বার্তা পৌঁছায়নি। শ্রীশ্রীমা-ই সেই কাজ করেছেন—সর্বসাধারণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন। সাধুরা মাঝে মাঝে মায়ের জন্যে তরকারির বোঝা মাথায় করে নিয়ে আসতেন। তখন মায়ের আশেপাশের মেয়েরা বলতঃ 'ভক্ত হলেই কি যত কষ্ট! বোঝা বয়ে ছেলেদের মাথা গেল।' উত্তরে মা বলতেনঃ 'ওদের মাথা কি আর আছে? যাঁর মাথা তাঁকে দিয়ে দিয়েছে।'[৬৭] এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই কণ্ঠধ্বনি—ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ। চিরকাল শ্রীশ্রীমা নিজেকে আড়ালে রাখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তবু দেখি একটা অবস্থায় অকাতরে সবাইকে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন। যাঁরা তাঁর কৃপাধন্য, তাঁদের মধ্যে যেমন গণ্যমান্য, ধনী, শিক্ষিত ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ আছেন, তেমন দুর্বল, অক্ষম, অবজ্ঞাত শ্রেণীর মানুষও আছেন। 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা' বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। মাতৃস্নেহে সবাইকে কাছে টেনে নিচ্ছেন—জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। বলতেনঃ 'ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'[৬৮] সন্ধিপুজোর সময় একবার যেচে পুজো নিচ্ছেন। যেসব সন্তান অনুপস্থিত, তাদের হয়ে পুজো করুক অপরে। বলছেনঃ 'আরও ফুল আন; রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন, গোলাপ—এদের সব নাম করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলের হয়ে ফুল দাও।'[৬৯] সঙ্ঘগুরুরূপে, সঙ্ঘজননীরূপে এই পুজো। সন্তানদের মঙ্গল হোক—এই কামনায় পুজো চেয়ে নেওয়া। যে-কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবানুরাগী, তার প্রতি মাতৃস্নেহ। এই অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ বিশ্বব্যাপী। এই সঙ্ঘের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃস্নেহ নিত্য বিদ্যমান। এ সঙ্ঘ তাঁর সন্তান। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবানুরাগী, তাঁরা

সবাই তাঁর সন্তান। যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন তিনি এই সঙ্ঘকে পরিচালনা করেছেন, পথ দেখিয়েছেন সঙ্ঘের প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে। সব সময় তাঁদের সঙ্ঘের জীবনদর্শনটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থা, প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যায় কিভাবে তাঁরা চলবেন, কোন্ নীতিকে অবলম্বন করে থাকবেন তার সূত্রটি বলেছেনঃ 'আমাদের যা কিছু, সবের মূল ঠাকুর—তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।'[৭০]

স্বামীজী বলেছেনঃ 'ভারতে পরিবারের কেন্দ্র হলেন মা।'[৭১] 'ভারতীয় গৃহে কর্ত্রী—জননী।'[৭২] রামকৃষ্ণসঙ্ঘও একটি বিরাট পরিবার। এই পরিবারের জননী শ্রীশ্রীমা। এই বৃহৎ গৃহের কর্ত্রীও তাই তিনি। তাঁর স্নেহ অতীতে এই সঙ্ঘের পুষ্টিসাধন করেছে, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি একে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছে। অদৃশ্য থেকে এখনও তিনি তা-ই করে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এ দায় তাঁর, কারণ তিনি যে 'সঙ্ঘজননী'।

সারদা ঃ মননে ও বিশ্লেষণে

শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের তাৎপর্য

॥ ১ ॥

নারীর প্রতি ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছে। এই দেশে কত নারী কতভাবে জ্ঞানমহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদিক যুগে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ দেবীসূক্ত উচ্চারণ করিয়াছেন—যাহা এখনও বহু কণ্ঠে সশ্রদ্ধ হৃদয়ে নিত্য ধ্বনিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী বলিয়াছেনঃ 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।'[১]—যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তাহা লইয়া আমার কি হইবে? এইসব নারীর দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ ভগবানের প্রতি—যাঁহাকে অবলম্বন করিলে জীবন সার্থক হয়, না করিলে জীবন বৃথা যায়। শুধু বৈদিক যুগেই নয়, তাহার পরবর্তীকালেও প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ অনেক মহীয়সী নারী আবির্ভূত হইয়াছেন। মধ্যযুগেও আমরা এইরূপ বহু নারীকে দেখিতে পাই, যেমন বিষ্ণুপ্রিয়া, মীরাবাঈ প্রমুখ।

এই ধারাই আবার দেখি পরিপূর্তি লাভ করিয়াছে আধুনিক যুগে—দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রানী রাসমণি; শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুরূপে আসিয়াছেন যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী। সেখানে আরও এক আশ্চর্য ইতিহাস রচিত হইয়াছে যাহার তুল্য কিছু অতীতে নাই। স্বয়ং যুগাবতার এই দক্ষিণেশ্বরেই নিজ সহধর্মিণী সারদা-দেবীকে, আমাদের মাতাঠাকুরানীকে, ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে আনুষ্ঠানিক-ভাবে পূজা করিয়াছেন—জগন্মাতারূপে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উদ্বোধিত করিয়াছেন তাঁহার অন্তরস্থ শক্তিকে, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন শ্রীশ্রীমাকে। মা অনেক রহিয়াছেন, জগতের অনেক প্রকার উপকারে তাঁহারা ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দেবীত্বের প্রকাশ হইলে মাতৃত্বকে যে নূতন রূপ দেয়, নূতন ভাবধারা জগতে আনয়ন করে, তাহা অনুপ্রেরণা জাগায় শুধু জগতের উপকার করিবার জন্য নহে, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার জন্যও। শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা ইহাই সম্ভবপর হইয়াছিল—দেবীশক্তি যেখানে মাতৃশক্তির সঙ্গে সম্মিলিত হয় সেখানেই তাহা সম্ভবপর হয়। তিনি দেবী হইলেও তাঁহার লীলার এই অংশে জগদ্বাসী তাঁহাকে পাইয়াছিল জননী-রূপে। ভারতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

শ্রীরামপূর্বতাপনী উপনিষদে উক্ত হইয়াছেঃ 'উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'[২]—উপাসকদিগের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম রূপ-পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে আছে, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব

ভজাম্যহম্'[৩]—যে ভক্ত যেরূপে আমার শরণ লইয়া থাকে, আমি সেরূপ ভাব-অবলম্বনেই তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও ঋষি বলিতেছেনঃ

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥[৪]

—'হে রাজন্, সেই ভগবতী জন্মাদিশূন্য হইলেও পুনঃ পুনঃ এইরূপে আবির্ভূত হইয়া জগতের পরিপালন করেন।' তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে দেবীর বিবিধ বিগ্রহ বা প্রতীক প্রচলিত আছে ও পূজিত হইতেছে। দেবীর স্তবস্তুতিও অসংখ্য। দেবীকে আমরা পাইয়াছি বিবিধ রূপে, বিবিধ ভাবে। তিনি ধনদাত্রী, বিদ্যা-দাত্রী, নিরাময়কর্ত্রী, ত্রাণকারিণী, অসুরসংহারিণী। চণ্ডীতে তাঁহাকে সমস্ত বিদ্যা-রূপিণী ও সমস্ত নারীরূপিণী বলা হইয়াছে। তুষ্ট হইয়া তিনি ভক্তি-মুক্তি প্রদান করেন, আবার রুষ্ট হইয়া তিনি অধার্মিক, অনাচারীর দণ্ডবিধান করেন। নারীরূপে, শক্তিরূপে, দেবীরূপে, মাতৃরূপে আমরা অনাদিকাল হইতে তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছি। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ভক্তিতে মুগ্ধ তিনিই আবার স্বর্গের ঐশ্বর্য ছাড়িয়া মর্তের কুটিরে পদার্পণ করেন; এমনকি, তিনি ভক্তের ভাঙা বেড়া বাঁধিয়া দিয়া যান। কন্যাবেশে, জননীবেশে তিনি শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করেন। স্বর্গের দেবীর সহিত বাঙালী এমনই করিয়া আত্মীয়তা পাতাইয়াছে। কিন্তু দেবী তবু দেবীই থাকিয়া গেলেন। মানুষের মতো মানুষের শরীরে তখনও বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন না। শ্রীমায়ের জীবনে আমরা দেবীর এই অবতরণ-ধারারই চরম পরিণতি দেখিতে পাই। দেবী এখানে সাক্ষাৎ, সচলা, রক্তমাংসের দেহবিশিষ্টা— শ্রীরাম-কৃষ্ণের পূজিতা ভবতারিণী ও স্বীয় গর্ভধারিণীর সহিত অভিন্না—শ্রীমা।

মানুষ দেবীকে এইভাবে চাহিল কেন, আর ভগবতীই বা সে অভিলাষ পূর্ণ করিলেন কেন? আমরা বলিয়াছি, এই মাতৃমূর্তিতে আবির্ভাব না হইলে অধ্যাত্মজগতে একটা অপূরণীয় অভাব থাকিয়া যাইত। পূর্বজ্ঞাত বস্তু, ভাষা ও ভাবের সাহায্যে মানুষ উচ্চতর সত্যের পরিচয় পায়। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রসবান্তে ক্রোড়ে তুলিয়া স্তন্যপান করান, শিশু চক্ষু মেলিয়াই মাকে পায় স্নেহ, পুষ্টি, তুষ্টি, সৌন্দর্য, পালন প্রভৃতি গুণরাশির একমাত্র আকররূপে। সাধনক্ষেত্রে সাধক তাই জগদম্বাকে দেখিতে চায় ইহারই পরাকাষ্ঠারূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ মাতৃভাব সাধনার শেষ কথা।[৫] স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেনঃ 'জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে; কারণ কেবল এই অবস্থায়ই মানুষ চরম নিঃস্বার্থপরতা আয়ত্ত করিতে ও কার্যে প্রকাশ করিতে পারে।'[৬] 'আমি, আমার' বুদ্ধিকে ইষ্টে বিলয়পূর্বক একান্ত বিশ্বাস ও তদাশ্রয়তা সহায়ে মাধুর্যময় চিদ্‌রস আস্বাদন করা যদি সাধকের কাম্য হয়, তবে ঈশ্বরীয় মাতৃত্বে সেই অভীষ্ট প্রদানের অমোঘ শক্তি নিহিত রহিয়াছে। দাস্য, সখ্য প্রভৃতিতে আত্মীয়তাবোধের বিকাশ হয় সত্য কিন্তু মাতৃ-

বক্ষাশ্রিত একান্তনির্ভর শিশুর তন্ময়ত্ব এই সমস্তকে অতিক্রম করিয়া যায়। অধিকন্তু ভোগলোলুপ ও ইহলোকসর্বস্ব মানবসমাজকে উচ্চতর অনুভূতিরাজ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীভগবতীর এই যুগে মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। ভারত তাই আজ এই অপূর্ব চেতনবিগ্রহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য।

॥ ২ ॥

সর্বানুস্যূতা ব্রহ্মরূপিণী সেই অদৃশ্যা আদ্যাশক্তি এই কালে আবার যুগাবতারের সহধর্মিণীরূপে অবতীর্ণা হইয়া একদিকে যেমন পরমপুরুষের লীলার পূর্তিবিধান করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বমহিমা বিস্তার এবং মানবসমাজ হইতে অকল্যাণ বিদূরণপূর্বক ভাবী ভারতকে, তথা সমগ্র বিশ্বকে এক নব অভ্যুদয়ের রাজমার্গে তুলিয়া দিয়াছেন।

অন্তর্জগতে সুবৃত্তি ও কুবৃত্তির মধ্যে যে অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে, উপনিষদে তাহাকেও দেবাসুর-সংগ্রাম নামে নির্দেশ করা হইয়াছে। আস্তিক্যবুদ্ধি, পরলোক-চিন্তা, ধ্যাননিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশিকে নির্মূল করিবার জন্য বর্তমান যুগে অশ্রদ্ধা, জড়বাদপ্রিয়তা, ভোগপরায়ণতা প্রভৃতি আসুরিক গুণাবলী যে-সমর ঘোষণা করিয়াছে, এবং যাহার ফলে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের বৃদ্ধি এবং ঈর্ষা, দ্বেষ, কাম প্রভৃতির আধিক্যবশতঃ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধবিগ্রহ সঙ্ঘটিত হইতেছে, উহাই একালের দেবাসুর-সংগ্রাম।

আধুনিক এই মনোরাজ্যের সংগ্রাম পৌরাণিক দেবদানবের যুদ্ধ অপেক্ষাও ঘোরতর। অতীতের সংঘর্ষ সাধারণতঃ স্থূলজগতের গণ্ডি অতিক্রম করিত না; কিন্তু আধুনিক দ্বন্দ্ব অন্তর্জগতে উদ্ভূত ও দৈনন্দিন জীবনে প্রসারিত হইয়া মানবের মনুষ্যত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে শক্তির ক্রিয়া এবং অসুরসংহার প্রধানতঃ মানসিক ক্ষেত্রে হওয়া আবশ্যক। আধুনিক জগতে সর্বাধিক প্রয়োজন নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির। অন্তরে একবার ভক্তি, বিশ্বাস ও পবিত্রতা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাহিরের অবস্থা স্বতঃই তদনুযায়ী পরিবর্তিত হইবে। এই যুগে শক্তির অবতার তাই অন্তঃশত্রুর বিজয়ে ব্যাপৃত। তাই বর্তমান অবতারে অস্ত্রবাহুল্য, সিংহগর্জন বা সমরকোলাহল নাই—আছে শুধু লজ্জা, বিনয়, সদাচার, পবিত্রতা, কল্যাণস্পৃহা ও ঈশানুভূতি। আবার শুধু বিঘ্ন অপসারণই দেবীর কর্তব্য নহে; তাঁহাকে নবীন আদর্শ স্থাপন করিতে এবং নূতন উদ্দীপনাও জাগাইতে হইবে।

মাতৃজাতির প্রগতির পথেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরাজ-বিজিত ভারত তখন পাশ্চাত্যের ভাবধারায় প্লাবিত। প্রতীচ্যের বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও সম্পদের দুর্নিবার মোহে পরাধীন ভারত তখন ইউরোপীয় ভাবগুলিকে গ্রহণ করিতে লালায়িত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই স্যার চার্লস উড্‌ ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই লালসার পরিণতি কোথায় তাহার একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। এই

বৈদেশিক পদ্ধতি ও প্রভাবকে স্বীকার করিয়া ভারত নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ভুল করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির বরং ইহাই রীতি যে, সে আত্মসংস্থ থাকিয়া অপরের ভাব-রাশিকে গ্রহণপূর্বক নিজের চিন্তারাজ্যের সমৃদ্ধি সাধন করে। বর্তমান যুগে আমাদের নারীসমাজকে পাশ্চাত্যের নারীসমাজের আদর্শ দ্বারা কিছু সতেজ করিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। তেমনি আবার পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও বাঁচিতে হইলে আমাদের মাতৃ-ভক্তির খানিকটা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে উভয় দেশেরই দাতব্য অনেক কিছু থাকিলেও মৌলিক দৃষ্টিভেদ না মানিয়া একে অপরের অনুকরণ করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। উভয় দেশে নারী সম্মানিতা হইলেও প্রতীচ্যে সেই সম্মান পূজার স্তরে উন্নীত হয় নাই, উহা প্রধানতঃ রমণীর সৌন্দর্য বা রমণীকুলোচিত গুণরাশির প্রশংসায় পর্যবসিত। নারীজীবনের একটা প্রধান অংশ সেখানে ইচ্ছা-পূর্বক পুরুষের মনোহরণে নিয়োজিত। আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ ; সংযম ব্যতিরেকে তাহা সম্ভব নহে। তাই এখানে সতীত্বের ও মাতৃত্বের এত আদর। আমাদের আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। এই উভয় আদর্শের সংঘর্ষস্থলে ভাবী বিশ্বসভ্যতা কোন্ পথ বাছিয়া লইবে? প্রশ্নটি এই যুগে যেমন প্রবল ও সুস্পষ্টাকারে উপস্থাপিত হইয়াছে, একশত বৎসর পূর্বে ঠিক সেইভাবে উত্থিত হয় নাই। তবু ভারতের ভাগ্য-বিধাত্রী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই যুগের বৈদেশিক ভাবের মহাপ্লাবন হইতে যদি ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা না করা হয় তবে এমন কোন অটুট ভিত্তিই থাকিবে না যাহার উপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সৌধ পুনঃ-সংস্থাপিত হইতে পারে। তাই দেবী-গুরু-মাতৃশক্তি-সমন্বিত এক অত্যুচ্চ আশ্রয়স্থল দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল, যাহার সহায়ে আধুনিক ভারতসমাজ আপনাকে ঐ মহাবিপর্যয়ের ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে পারে এবং পাশ্চাত্য সমাজকেও সে রক্ষাস্থলে আকর্ষণ করিতে পারে।

গুরুতর যুগসমস্যায় শ্রীমা এই ভূমিকা গ্রহণের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা অবগত ছিলেন এবং শ্রীমাকেও উহা বলিয়া গিয়াছিলেন। উত্তরকালে জনৈক উৎসুক ভক্ত একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন ; কিন্তু এবার আপনাকে রেখে ঠাকুর পূর্বে চলে গেলেন কেন?' তদুত্তরে শ্রীমা বলিলেনঃ 'বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।' অন্য এক সময়ে শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ 'যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমার ইচ্ছা হল, আমিও যাই। কিন্তু তিনি দেখা দিয়ে বললেন, "না তুমি থাক ; অনেক কাজ বাকি আছে।" শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।'

॥ ৩ ॥

যুগসঙ্কটের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মাতাঠাকুরানীকে নানাভাবে শিক্ষা দিয়া তাঁহার দেবীশক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা পূরণের উপযোগী করিয়া জাগরিতা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একদিকে যেমন স্বীয় ত্যাগোজ্জ্বল জীবনাদর্শ শ্রীমায়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন এবং উচ্চ ধর্মজীবন লাভের জন্য কিরূপে চরিত্র গঠন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিলেন, অপরদিকে তেমনি দৈনন্দিন গৃহস্থালির কর্ম,

দেব-দ্বিজ-অতিথিসেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতে থাকিলেন। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন —এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া লোকব্যবহার, পরিবারের প্রত্যেকের রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার সহিত আদান-প্রদান, নৌকায় বা গাড়িতে যাইবার সময় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা, এমনকি, প্রদীপে পলিতাটি কেমন করিয়া রাখিতে হয়, ইত্যাদি কিছুই সে অপূর্ব শিক্ষা হইতে বাদ পড়িল না। এই কামগন্ধহীন, স্বার্থ-শূন্য, আনন্দমিশ্রিত, সাগ্রহ উপদেশলাভে সরলা, পূতচরিত্রা, ধর্মপ্রাণা, পতিব্রতা পল্লীবালা কিরূপ আনন্দবিভোর হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পরে স্বয়ং স্ত্রীভক্তদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেনঃ 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ-কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর, স্থির, দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।'

সরলা, আধুনিক-শিক্ষাবিহীনা ও আভিজাত্যাদিশূন্যা শ্রীমাকে চিনিতে পারা সহজ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন যে, ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ বর্তমান যুগে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রতায় পরিপূর্ণ এই চরিত্রখানি সম্যক্ উপলব্ধি করা আমাদের শক্তির বাহিরে। তাই তিনি স্বয়ং তাঁহার স্বরূপ প্রকটিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিক্ষা, দীক্ষা, উদ্দীপনা ইত্যাদি অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রমেই স্বীয় ভাবধারার পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত আধার করিয়া তুলিতেছিলেন। ষোড়শীরূপে পূজা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মধ্যে দেবীর আবাহন করিয়াছিলেন। শ্রীমা সেদিন আরাধিত ও স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হইলেও আপনার শক্তিকে যুগোপযোগী সক্রিয় করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন নাই। আর সে পূজা হইয়াছিল নিভৃতে নিশীথে—লোকে উহা শুনিয়া থাকিলেও উহার মর্ম সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইহার পর শ্রীমাকে স্বকার্য সাধনের জন্য স্পষ্ট আহবান জানাইবার সময় আগত এবং ভক্তদিগকেও সে-বিষয়ে অবহিত করা আবশ্যক। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পূর্ববর্তী কয়েকটি বৎসর ধরিয়া তাঁহার এই বিষয়ের চেষ্টা একটা সুপরিকল্পিত ধারায় পরি-চালিত হইতে দেখা যায়। শ্রীমাকে তিনি পূজা করিয়া, অন্যভাবে সম্মান দিয়া এবং নানা কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার দেবীত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহার অবচেতনাকে ঐবিষয়ে জাগরূক রাখিতেছিলেন। স্বীয় সাধনার দ্বারা উজ্জীবিত ও অনন্তশক্তিপূর্ণ বহু মন্ত্র শ্রীমাকে শিখাইয়া এবং কিরূপ অধিকারীকে কীদৃশ মন্ত্র দিতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার গুরুশক্তিকে কার্যোন্মুখী করিতেছিলেন। অধিকন্তু বালক ও মহিলা ভক্তদিগকে শ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়া এবং এইসঙ্গে নানা উপদেশ দিয়া তাঁহার মাতৃভাব প্রসারের ক্ষেত্র রচনা করিতেছিলেন, ইহারই সঙ্গে তিনি আবার তাঁহাকে স্পষ্টই ভারগ্রহণে আহবান করিতেন এবং ভক্তগণকেও ঐ ভাবী পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতে থাকিতেন।

এইখানে একটি বিষয়ে আমাদিগকে খেয়াল রাখিতে হইবে। আমরা যেন এই মহাভ্রমে পতিত না হই যে, শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণেই শ্রীমা আজ জগদ্বরেণ্যা হইয়াছেন। অধ্যাপনা-শাস্ত্রের ইহা এক মৌলিক কথা যে, শিষ্যের শুভ সংস্কার না থাকিলে গুরুর শুভ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত ও কার্যক্ষম হয়

না। আবার সেই শুভ সংস্কারের সহিত প্রয়োজন হয় শিষ্যের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহ-যোগিতা। শ্রীমায়ের জীবন আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, ঠাকুরের যুগধর্ম-প্রবর্তন-চেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্য শ্রীমা সেই দক্ষিণেশ্বরের জীবনকালেই আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার বিকাশোন্মুখ অসীম শক্তির সহিত পরিচিত থাকায় নিজ কার্যভার সেই শক্তিরূপিণীর হস্তে তুলিয়া দিতে অতীব ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান বা তাঁহার শক্তিবিশেষ যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহারা প্রচলিত রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ যুদ্ধঘোষণা না করিয়া ঐগুলিকেই নবভাবে রূপায়িত করেন, কিংবা তাহাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করেন, অথবা ঐসকল আপাতবিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যেও স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া জনগণকে এক উচ্চ-তর আদর্শের দিকে টানিয়া লন। বর্তমানকালে যাঁহারা যুগপ্রবর্তনার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর আচরণ বা লীলাবিলাস কেবল প্রাচীনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে আমরা এই সকল জীবনবেদের তাৎপর্য গ্রহণে সম্পূর্ণ সমর্থ হইব না। এই সকল চরিত্রে বৈরাগ্যের চরম উৎকর্ষ যেমন ছিল তেমনি ছিল দশের প্রতি অনিন্দ্য কল্যাণস্পৃহা। এখানে তিতিক্ষাদি গুণরাজি পর্বতকন্দরে অনুসৃত না হইয়া নগরের জনকোলাহলের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগের মূর্ত বিগ্রহ হইয়াও নিজ জননীর সেবা পরিত্যাগ করেন নাই—ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে তিনি অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন, সমীপাগতা সহধর্মিণীকে সাদরে গ্রহণপূর্বক শিক্ষাদীক্ষায় স্বীয় উত্তরাধিকারিণী করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং জীব-কল্যাণে জীবনপাত করিয়াছিলেন। শ্রীমায়ের মন সাধারণ অর্থে কখনও সংসারে লিপ্ত হয় নাই; অথচ তাঁহারও জীবনে পারিবারিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে এমন এক মাতৃসুলভ অতুলনীয় সহানুভূতি, ধৈর্যশীলতা, অনুকম্পা ও স্নেহমধুর ক্ষমা উৎসারিত হইয়াছিল, যাহার প্রয়োজন আমাদের নিকট সম্পূর্ণ বোধগম্য না হইলেও নবযুগের জন্য উহা নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেনঃ 'আদর্শ হিসাবে যা করতে হয় তার ঢের বাড়া করেছি।'[৭] শ্রীমায়ের দিন-গুলি পারিবারিক ঘটনার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; আর সে ঘটনাসমূহের অধিকাংশ সাংসারিক দৃষ্টিতে উদ্বেগজনক, বিরক্তিকর অথবা ক্লেশদায়ক। অথচ তাঁহার আচার-ব্যবহার সর্বদা সর্বক্ষেত্রে দৈবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এই দেবমানবতার অপূর্ব সংমিশ্রণে তাঁহার লীলাবলী বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই মধুর।

শ্রীমায়ের জীবনের আলোচনায় অগ্রসর হইয়া প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হয় তাঁহার অনাসক্তি। কার্য তিনি করিতেছেন, এমনকি, মনে হইতেছে তিনি যেন সাধারণ মানবেরই ন্যায় শোকতাপে জর্জরিত; কিন্তু পরমুহূর্তেরই আচরণে তাঁহার নির্লিপ্ত

৭। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, অষ্টম সংস্করণ (১৩৮৫), পৃঃ ১৪

স্বরূপ মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে! তাহার একটি উদাহরণ এই স্থলে দেওয়া যাইতে পারে।

১৩২৫ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিকে বেলা দশটা-এগারোটার সময় জয়রামবাটীতে শ্রীমা সদরদরজায় রোয়াকে বসিয়া আছেন; সাধু-ব্রহ্মচারীরা বৈঠকখানার বারান্দায় রহিয়াছেন; সম্মুখে কালীমামা ও বরদামামার খামারের ধান আসিতেছে। খামারের পথের দিকে কালীমামা একটু রাস্তা চাপিয়া বেড়া দিয়াছেন—বরদামামার ধানের বস্তা আনিতে অসুবিধা হইতেছে। ইহা লইয়া দুই ভ্রাতায় প্রথমে বচসা এবং পরে হাতাহাতির উপক্রম হইতেই শ্রীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহাদের নিকটে গিয়া কখনও একজনকে বলিতেছেন, 'তোর অন্যায়', আবার কখনও অপরকে ধরিয়া টানিতেছেন। তিনি বয়সে ইঁহাদের অপেক্ষা অনেক বড়, উভয়কে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। সুতরাং দিদির মধ্যস্থতায় হাতাহাতিটা হইল না, কিন্তু ঝগড়া আর থামিতে চায় না, শ্রীমাও ভ্রাতাদিগকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া সরিতে পারেন না। এমন সময় সাধুরা আসিয়া পড়ায় দুই ভাই গর্জন করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীমাও সক্রোধে স্বগৃহে আসিয়া বারান্দার উপর পা ঝুলাইয়া বসিলেন। মুহূর্তেই রাগ কোথায় মিলাইয়া গেল; ক্রীড়াভূমিতুল্য এই সংসারের স্বার্থ-সংঘর্ষের পশ্চাতে যে-শাশ্বত শান্তি রহিয়াছে, উহা তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হওয়ায় তিনি হাসিতেছেন আর বলিতেছেনঃ 'মহামায়ার কি মায়া গো!... জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না?'[৮] এই পর্যন্ত বলিয়াই মা হাসিয়া কুটিকুটি—সে হাসি আর থামিতে চায় না।

আগত ভক্তদের সহিত সম্বন্ধেও তাঁহার এই অনাসক্তি সর্বদা পরিস্ফুট হইত। তাহাতে সংসার-সুলভ আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা থাকিলেও মায়িক বন্ধন ও আকর্ষণ ছিল না। উহাতে যেমন অশ্রু ও হাসির তরঙ্গ ছিল তেমনি ছিল বিক্ষেপহীন প্রশান্তি।

॥ ৫ ॥

ভগবদ্‌রচিত এই সংসারযন্ত্রের একটি নিজস্ব ধারা আছে, যাহা দেহধারী সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়। অবতারপুরুষও তাহার ব্যতিক্রম নন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিতেনঃ 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'[৯] শ্রীমাও সংসারকে স্বীকার করিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন তাহার দংশনকেও। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। মাকুর শিশুপুত্র ন্যাড়ার মৃত্যুতে শ্রীমাকে কোয়ালপাড়ায় আকুলভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া উপস্থিত ভক্তদের মনে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। তাই পরদিন সকালে প্রণাম করিতে গিয়া মহীশূরের ভক্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রশ্ন করিলেনঃ 'মা, আপনি আবার ন্যাড়ার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের মতো এরকম কাঁদলেন কেন?' শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'আমি সংসারে আছি—সংসারবৃক্ষের ফল ভোগ করতে হবে। তাই আমার কান্না।' শ্রীরামকৃষ্ণ সেইজন্য বলিয়াছেনঃ 'নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মতো আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, কখনও বা ভয়—ঠিক মানুষের মতো।'[১০]

তবুও কথা থাকিয়া যায়। অবতারলীলা মানবসদৃশ হইলেও উহা ঠিক মানবের দৈনন্দিন কার্যাবলীর সহিত তুলিত হইতে পারে না; কেননা অনেকাংশেই উহা অন্যরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও তিনি মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইতেন, তথাপি ব্যুত্থিতাবস্থায় তাঁহার প্রতি কার্যে একটা সৌষ্ঠব ও সুশৃঙ্খলা ছিল। জনকল্যাণ ও লোকশিক্ষার্থে ধৃতবিগ্রহ পুরুষোত্তমের জীবনের সর্বক্ষেত্রই অপরের পক্ষে আদর্শস্থানীয় ছিল—বর্তমানকালে যুগাবতারের ইহা এক মহা অবদান। শ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করিলেও আমাদের মনে পুনঃ পুনঃ এই কথাই উদিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে যেমন দৈনন্দিন জীবনের উপযুক্ত অসাধারণ আদর্শের অভাব না থাকিলেও আধ্যাত্মিক ভাব, মহাভাব ইত্যাদি অবিরাম প্রকটিত হইয়া আধুনিক জড়বাদসর্বস্ব মানবকে সবলে ভগবৎ-অভিমুখ করিয়াছে, শ্রীমায়ের জীবনে তেমনি চরম সমাধি, ত্যাগবৈরাগ্য ও ভাবগাম্ভীর্যের বিন্দুমাত্র ন্যূনতা না থাকিলেও তাঁহার চরিত্রে স্নেহ, সেবা, ঔদার্য, লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি গুণরাজি অপূর্বভাবে প্রকাশ পাইয়া ভোগলোলুপ ব্যক্তিতন্ত্র লোকসমাজে এক নবীন প্রেরণা আনয়ন করিয়াছে। ফলতঃ একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণ মানব আপনাকে লইয়াই বিব্রত; কিন্তু দেবমানবের সবটুকু জীবন পরার্থে।

॥ ৬ ॥

জীবনালোচনার সুবিধার জন্য আমরা সচরাচর শ্রীমায়ের চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিবিধভাবে বিভক্ত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেও সেগুলি তাঁহার দেহমন অবলম্বনে প্রকাশিত একই অখণ্ড মহাশক্তির বিচিত্র রূপ। এই অখণ্ড শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ করা চলে না, কারণ, আমাদের সসীম বুদ্ধি অসীমকে ধরিতে পারে না। আমাদের ধারণাশক্তির অক্ষমতাবশতঃ আমরা শ্রীমাকে জননী, গুরু, দেবী ইত্যাদির অন্যতমরূপে ভাবিতে চেষ্টা করি; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, এই লোকাতীত জীবনে গুরু, দেবী ও মাতা এই ত্রিবিধ রূপই অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। যখনই আমরা তাঁহাকে জননীরূপে পাই, তখনই আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে তাঁহার অমোঘ জ্ঞানদায়িনী শক্তি, যখনই তাঁহাকে দেখিতে চাই জ্ঞানদায়িনী গুরুরূপে, তখনই তিনি মাতৃরূপে আমাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লন; আবার গুরু ও জননীরূপে তাঁহাকে ধরিতে গিয়া দেখি তিনি সমস্তের ঊর্ধ্বে দেবীরূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। বস্তুতঃ শ্রীমায়ের পরস্পর-অপেক্ষ এই ত্রিবিধ বিকাশের মধ্যে কোন্‌টির কোথায় শেষ এবং কোন্‌টির কোথায় আরম্ভ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাই শ্রীমা সম্পর্কে তদ্‌গতচিত্তে আলোচনা করা অধ্যাত্মসাধনা ছাড়া কিছু নয়। এই সাধনরাজ্যের কোন সীমা নাই। আমাদের পক্ষে ভরসা এই, মা কোন নিগূঢ় দর্শন বা জটিল মতবাদের দ্বারা তাঁহার সন্তানদের বিব্রত করেন নাই; তিনি আসিয়াছিলেন জীবমাত্রের কল্যাণবিধায়িনী জননীরূপে। এবং জননীর স্নেহ সন্তানের নিকট ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না।

লোকশিক্ষায় শ্রীমা

তাঁর জীবনই তাঁর বাণী!

লোকশিক্ষায় শ্রীশ্রীমার অবদানের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয় মায়ের আশ্চর্যসুন্দর জীবনখানিই তো একটি সর্বজন-শিক্ষণীয় অনবদ্য পাঠগ্রন্থ। এ গ্রন্থের ভাষা সরল, শব্দবিন্যাস অনাড়ম্বর, প্রকাশভঙ্গি আকর্ষণীয়, আর বিষয়বস্তু গভীর ব্যঞ্জনাময়।

বহু অধ্যায়ে বিভক্ত, সহজের আবরণে আবৃত এই বিস্ময়কর জীবনগ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে বিধৃত রয়েছে সত্যের শিক্ষা, অধ্যাত্মপথের শিক্ষা, মানবিকতার শিক্ষা, ভালবাসবার শিক্ষা, উদারতার শিক্ষা; ধৈর্যের, সহ্যের, ত্যাগের, ক্ষমার, করুণার, মমতার, আত্মপ্রত্যয়ের, সর্বোপরি সকল অবস্থায় অবিচল থাকার শিক্ষা। দুঃখে অবিচল, সুখে অবিচল, প্রাপ্তিতে অবিচল, অপ্রাপ্তিতে অবিচল।

শ্রীমা সারদাদেবীর সমগ্র জীবনখানিতেই অবিচলতার এই আশ্চর্য প্রকাশ। যদিও মনে হয় যিনি 'গুণাতীতা পরমাপ্রকৃতি' বলেই গৃহীত, তাঁর চরিত্রগুণের বর্ণনা করতে যাওয়ার চেষ্টা বাহুল্য-চেষ্টা নয় কি? সাধ্যই বা কতটুকু? তবু—সাধ্য না থাকলেও প্রয়োজন আছে। মাতৃনাম আলোচনায় আমরা ধন্য হই, পবিত্র হই। আর তা থেকে যদি এতটুকুও শুভপ্রেরণা আসে—পরম লাভ।

যুগ বদলায়, সেই বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের চেহারারও বদল ঘটে, চলতি যুগ বিগত যুগের রীতিনীতি, আচার-আচরণ আঁকড়ে বসে থাকতে পারে না, নতুন ভাবধারার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। যার ফলে প্রায়শই পুরনো আদর্শ, পুরনো চিন্তা-চেতনা, চিরসঞ্চিত সংস্কার ও মূল্যবোধগুলি মূল্য হারায়। কিন্তু মানবিকধর্মের যে মৌল গুণগুলি মানবচরিত্রের চিরন্তন আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে, তার কোন পরিবর্তন হয় কি?

তা তো হয় না। ত্যাগ, ক্ষমা, সততা, সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, মমতা, সাম্যবোধ, মানবপ্রেম, এইসব গুণগুলি চিরন্তন মর্যাদার ভূমিকায় স্থির থাকে।

শ্রীমা সারদাদেবীর অনন্য চরিত্রে এই গুণগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত ছিল, তাই লোকজীবনে শ্রীমার আদর্শ একান্ত প্রয়োজনীয়ের ভূমিকায় চির-অবিচল থাকবে। সে আদর্শ দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে যুগে যুগে বিভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখাবে, হতাশ জীবনে আশ্বাসের বাণী বহন করে আনবে।

পৃথিবীর একটি পরম প্রয়োজনের মুহূর্তে যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁর লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দিব্য আবির্ভাব।

ঠাকুরের ইচ্ছায় মা-সারদা তাঁর দিব্যসত্তাটিকে লোকচক্ষে আবৃত রাখতে যে-জীবনটি গ্রহণ করেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে সেটি যেন সাধারণ এক মানবীমূর্তি। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আত্মীয়স্বজন, পারিবারিক জীবনের দায়দায়িত্ব, সবকিছু নিয়ে

সেই জীবনের প্রকাশ। তার মধ্যে আবার অভাব-অনটনের জ্বালাও প্রবল। মায়ের আমাদের এমনও দিন গেছে, যখন ভাতের উপর লবণ জোটেনি।

তবু কী শান্ত, সংহত, প্রশান্ত! কিছুতেই কিছু এসে যায় না। কারও প্রতি কোন অভিযোগ নেই, কাউকে জানান না কোন অসুবিধা। মানবী হয়েও দেবী। যেন জীবনটিই তাঁর এক গভীর তপস্যা। মা সারদাদেবী স্নেহের আধার, করুণার পারাবার, অনুপম এক মাতৃমূর্তি। একটি শান্ত মাতৃত্বের ভাব তাঁর বাল্যকাল থেকেই। জয়রামবাটীতে একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। সেই সময়—বিত্তে দরিদ্র কিন্তু চিত্তে পরম ঐশ্বর্যবান সারদা-জনক রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সংসারের জন্য রক্ষিত সম্বৎসরের চাল গোলা উজাড় করে ঢেলে দিলেন ক্ষুধার্তের জন্য। দলে দলে লোক আসে, ফুরিয়ে যায় খিচুড়ি, আবার চাপে উনানে, খিদের সময় গরম খিচুড়ি লোকেদের খেতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বালিকা সারদা দুহাতে পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকেন তাদের: আহা, এত গরম খাবে কি করে! জুড়োক।

যে যেখানে তাপদগ্ধ আছে, এসে জুড়োক। তাঁর কাছে আছে 'মলয়' বাতাসের পাখা—যার বাতাসে 'বাঁশ' আর 'ঘাস' ছাড়া সব কাঠ চন্দন হয়ে যায়। আহা, বাঁশ আর ঘাসের তাহলে উদ্ধার হবে না?

তা-ও হবে।

মূর্তিমতী সেবা, মূর্তিমতী করুণা এসে দাঁড়িয়েছেন যে মানুষের ঘরের মধ্যে, দেবেন তাদের চন্দন করে।

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। মায়ের নিকট-আত্মীয়জনেরা তাঁর স্বরূপ চিনতে পারে না। ভক্তদের সঙ্গে তাই 'আত্মীয়'দের সব সময় মতের মিল থাকে না। মনান্তর ঘটে।

জয়রামবাটীতে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে কালীমামার তুমুল তর্ক—'মা "দেবী" কি না' এই নিয়ে।

কালীমামা চিরদিনই তাঁকে 'দিদি' বলেই জানেন। দিদির কাছে কত আবদার, কত জাগতিক প্রত্যাশা। হঠাৎ সেই 'দিদি'টি 'দেবী' হয়ে উঠলে তাঁর সহ্য হবে কেন? বলেই বা কি করে? তাই তর্ক তুমুল পর্যায়ে ওঠে।

কিন্তু অবশেষে গিরিশবাবুরই জিত! ভীত সন্ত্রস্ত পরাস্ত কালীমামা শরণ নিতে এলেন 'মা মহাশক্তির' কাছে।

শ্রীমা তাড়াতাড়ি নিরস্ত করে বলেন: 'ওরে কালী, আমি তোর সেই দিদি। আজ তুই এ কি করছিস?'[১]

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ভাই। আঃ কী শান্তি!

যে যে-ভাবে শান্তি পায়। কেউ 'দেবী'ভাবে পেয়ে, কেউ দিদি, পিসী, খুড়ী ভাবে পেয়ে। তবু জানে এখানেই পরম শান্তি, পরম স্বস্তি, অগাধ স্নিগ্ধচ্ছায়া।

লোকশিক্ষার্থেই শ্রীমার এই দুইসত্তার ভূমিকায় প্রকাশ। দেবীসত্তা আর মানবী-সত্তার এক অনায়াস সমন্বয়। সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি ধারাকে কী অসীম শক্তিতে

এমন শান্ত গতিতে সমান্তরালধারায় প্রবাহিত করা যায়, তা ভাবতে গেলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয়।

আরও স্তব্ধ হতে হয়, আরও ভয়ঙ্কর বিপরীত দুটি ধারাকে এমনই অবলীলায় বহন করার শক্তি দেখে। সাধক-সন্ন্যাসী-স্বামী স্ত্রীকে 'মা' বলে 'ত্যাগ' করেছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু স্ত্রীকে 'মা' বলে 'গ্রহণ' করেছেন, এমন নজির ইতিহাসে আছে?

মা বলে গ্রহণ করলেন, 'মা কালী' বলে ফুল-চন্দনে পূজা করলেন। অথচ চিরকালীন সংস্কারের উপর এই বিপর্যয়, এই আঘাত মা-সারদা অবিচলিত চিত্তে সইলেন, বইলেন।

তারপরও গুণ্ঠনবতী! লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিতা সে গুণ্ঠন উন্মোচিত হয়েছে, যখন শতসহস্র ভক্তসন্তান 'মা' 'মা' বলে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঠাকুর তাঁর আরব্ধ কর্মভার দিয়ে গিয়েছিলেন লীলাসঙ্গিনী সারদার হাতে। সেই বিপুল কর্ম কী অসাধারণ মহিমায় সমাধা করে গেলেন মা জীবনের বাকি চৌত্রিশটি বছর ধরে। কত শত বিনষ্ট জীবনকে উদ্ধার করলেন, কত শত হাহাকার-পীড়িত হৃদয়কে মাতৃহৃদয়ের আশ্রয় দিলেন, কত শত মেয়েকে দিলেন নারীজীবনের সত্য-আদর্শের শিক্ষা।

আর কত ব্যাকুল দীক্ষার্থীকে দিলেন বৈরাগ্যের দীক্ষা, কত ঈশ্বরপিপাসু মনকে দিলেন ঈশ্বর-সান্নিধ্যের অনির্বচনীয় স্বাদ। মায়ের নিজের ভাঁড়ারেই তো সে জিনিস মজুত!

ঠাকুরের আবির্ভাব যদি সর্বধর্মসমন্বয়-সাধনে, তো শ্রীমার আবির্ভাব সর্বকর্মের সমন্বয়সাধনে। মায়ের জীবনদর্শনে যেমন মানুষের ছোটবড় ভেদ নেই, তেমনই কাজেরও ছোটবড় ভেদ নেই। সবেতেই তাঁর প্রসন্ন প্রশান্তি। ভক্তের পূজার প্রতিমারূপেও তাঁর যেমন অকুণ্ঠ আত্মস্থতা, সংসারের সেবিকারূপেও তেমনই অকুণ্ঠ আত্মস্থতা। যে মুহূর্তে চরণে ভক্তজন-নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলি নিচ্ছেন, তার পরমুহূর্তেই ছুটছেন সেই ভক্তদেরই আহার-আয়োজনের তদ্বিরে। তাই কি অর্থের সচ্ছলতাই আছে? নেই বলেই পরিশ্রম শতগুণ!

জয়রামবাটীর সেই সংসারটিকে ভাবলে যেন মনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সে সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিতা মধ্যমণিটি দশভুজা হয়ে সংসারটিকে সামলাচ্ছেন। কুটনো কুটছেন, রান্না করছেন, পূজার গোছ করছেন। পূজান্তে প্রসাদ ভাগ করছেন, পান সাজছেন, সুপুরি কাটছেন, আটা-ময়দা মাখছেন, রুটি-লুচি তৈরী করছেন, কলসিতে জল আনছেন, ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন, বর্ষার দিনে বাড়ির সকলের ভিজে কাপড় শুকোবার চেষ্টা করছেন, সলতে পাকাচ্ছেন, প্রদীপ সাজাচ্ছেন, লণ্ঠন-গুলি পরিষ্কার করছেন, ভক্তদের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছেন, এমনকি পাড়ায় পাড়ায় বেতো পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন—ছেলেদের চায়ের জন্য দুধ যোগাড় করতে।

বাড়িতে যে 'কাজের লোকে'র এমনই অভাব ছিল তা নয়, তবুও যে-কোন কাজই হোক শ্রীমা সে-কাজ আর কারও অপেক্ষায় ফেলে রাখতেন না। চোখের সামনের কাজগুলি আর কারও অপেক্ষায় ফেলে না রেখে নিজে করে ফেলা, এই যে শিক্ষাটুকু (শ্রীমার অপার গুণসমুদ্রের এক আঁজলা জল), এইটুকুই যদি আপন অভ্যাসের মধ্যে

গ্রহণ করে নিতে পারা যায়, তাহলে—সংসারের মানুষ আর মানুষের সংসার ধন্য হয়ে যেতে পারে।

কাজ তুচ্ছই হোক, অথবা বৃহৎই হোক, তার সম্বন্ধে মূল্যবোধ, আর তাতে নিষ্ঠা, এই তো কর্মশিক্ষার গোড়ার কথা। ঠাকুর শ্রীমাকে বাল্যে প্রদীপের সলতেটি পর্যন্ত কি করে ভালভাবে পাকাতে হয় তা শিখিয়েছিলেন।

শ্রীমার পটভূমিকাটি হচ্ছে শতাধিক বছর আগের বাংলাদেশ। যখন সেখানে জাতপাত আর ছুঁৎমার্গের অপ্রতিহত প্রতাপ। এমনকি শহর কলকাতাতেও তার যথেষ্ট দাপট।

নিষ্ঠাবান শিক্ষিত হিন্দু ব্যক্তিরাও অনেকেই 'সাহেবের অফিসে' চাকরি করায়, সারাদিন জলস্পর্শ না করে থাকতেন, বাড়ি ফিরে স্নান করে তবে জল খেতেন। 'বালিকাবিদ্যালয়' কর্তৃপক্ষের সাধ্যসাধনায় মেয়েদের স্কুলে পড়তে দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু 'মেমের ইস্কুলে' পড়ার অপরাধে বেচারীদের স্নান করে অথবা গঙ্গাজলে শুদ্ধ হয়ে তবে ঘরে ওঠবার অনুমতি জুটত। অথচ তখন সমাজমানসে ভিতরে ভিতরে উঠেছে এক অস্থির আলোড়ন।

অন্তঃপুরের আড়ালে জাগছে যেন অবরোধমুক্তির পিপাসা, আর বাইরে থেকে চিন্তানায়কদের মধ্যে জাগছে অনড় সমাজের সংস্কারের চিন্তা, তাঁরা ভাবছেন, স্ত্রী-শিক্ষার ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রয়োজন এসেছে, কিন্তু কোন্‌খানে টানা হবে তার সীমারেখা?

ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য তো নষ্ট করা চলে না! সেই চিরন্তন ধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবধারা যুক্ত করে অন্ধসংস্কারমুক্ত ভবিষ্যৎ সমাজে মেয়েদের যথার্থ রূপটি কি হওয়া উচিত, এই প্রশ্ন সেই যুগকে বিক্ষত করছে। কোন কোন 'অতি আলোকপ্রাপ্ত জন' আলোকপ্রাপ্তির পরিচয় দিতে মেয়েদের গাউন পরিয়ে খোলা গাড়িতে হাওয়া খাওয়াতে পাঠাচ্ছেন, আর বাকি 'আলোকহীনের দল সেই অভাবিত হাস্যকর দৃশ্যে চকিত হয়ে বেশী করে পুরনো খুঁটি আঁকড়াতে চাইছেন। এমন একটি দিশেহারা সময়ে মা-সারদার আবির্ভাব।

মা-সারদা বহুবিধ মতানৈক্যের সমাধানে একটি ঐক্যের রূপ: সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসানের জন্য একটি দ্বন্দ্বাতীত মাতৃমূর্তি!—যে-মূর্তিটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমাজের নারীর প্রকৃত রূপের আদর্শ; যে-দ্বন্দ্বাতীত রূপটি দেখে মুগ্ধ হয়ে বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতার মনে হয়েছে, মা-সারদা যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী।

আবার এই প্রশ্নটিও তাঁর মনে জেগেছিল, তিনি পুরনো আদর্শের শেষ প্রতিনিধি না নতুন কোন আদর্শের অগ্রদূত?

দেখা যায়, শ্রীমা একাধারে এই দুই আদর্শেরই ধারক। তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন কর্মে, ধর্মে, আচারে-আচরণে, জীবনদর্শনের ভঙ্গিতে, ভারতীয় নারীর শাশ্বত ভাব-ধারাটি পরিস্ফুট, অপরদিকে তেমনই সংস্কারমুক্ত চিত্তের উদার আলোকের স্ফুরণ।

এই সংস্কারমুক্ত চেতনার প্রতিবিম্বটি বিশেষ করে স্পষ্ট ধরা পড়েছে নিবেদিতার ক্ষেত্রে। বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতা মায়ের পরমপ্রিয় 'খুকি'। প্রথম দর্শনেই মা তাঁকে

কোলে টেনে নিয়েছেন। কাছে বসিয়ে আদর করেছেন, নিজের বিছানায় বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছেন, হাতে করে খাইয়েছেন, এমনকি একসঙ্গে খেয়েওছেন।

নিবেদিতার যে কর্মজগৎ, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, সমাজে মেয়েদের অবস্থার উন্নতিসাধন, এগুলিতে যে মায়ের পরম উৎসাহ! তাই নিবেদিতা তাঁর একান্ত আপনজন।

আজকের দিনের কথা ছাড়তে হবে, সেকালের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বোঝা যায়, কী প্রচন্ড একটি বিপ্লবী-কাজ করেছেন মা নিঃশব্দে, নিরাড়ম্বরে। তাঁর কাছে কেউ 'বিদেশী' নয়, কেউ দূরের নয়, কারণ তিনি 'মা'! সবাইয়ের মা! তিনি পতিতেরও মা।

কখনও কোন বহিরাগত ভক্তের কোন অসঙ্গত আচরণ দেখে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের কেউ যদি মাকে অনুরোধ করেছেন সেই লোককে কাছে আসতে না দিতে, মা বলে উঠেছেনঃ 'অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।'[২] 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!'[৩]

জয়রামবাটীতে এক তুঁতে মুসলমান কিছু কলা নিয়ে এসেছে ঠাকুরের জন্য। বলছেঃ 'মা...নেবেন কি?'

মা হাত পেতে বলেছেনঃ 'খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বই কি?'

কেউ যখন বললেনঃ 'ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?' সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় না মায়ের। মুসলমানটি মুড়ি-মিষ্টি নিয়ে বিদায় নিলে মা গম্ভীরভাবে বলে ওঠেনঃ 'কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।' তিনি বলতেনঃ 'দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে কজনে।'[৪]

কেমন করে মন্দকে ভাল করতে হয়, এই জানাটিই তো আসল জানা। মা কত অপরাধীকে, কত পতিতকে ক্ষমার মন্ত্রে আর বিশ্বাসের মন্ত্রে শুদ্ধ করে তুলেছেন, মায়ের জীবনগ্রন্থে ছত্রে ছত্রে তার দৃষ্টান্ত বিধৃত।

মায়ের 'ডাকাতবাবা'র কাহিনীটি কার না জানা?

সন্ধ্যার অন্ধকারে একা সারদা মুখোমুখি হলেন সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতের সঙ্গে। যে-লোক নাকি অনায়াসে মানুষ খুন করতে পারে।

মা-সারদা ভয়ে সংজ্ঞা হারালেন না, আর্তনাদ করে উঠলেন না, একান্ত বিশ্বাসের নম্রতা নিয়ে তার কাছেই শরণ চাইলেন। বললেনঃ 'বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধহয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাদের কাছে পোঁছে দাও!' ডাকাতপত্নীর হাত ধরে বললেনঃ 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে...।'

হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেল সেই দস্যুদম্পতির হৃদয়। পরবর্তী ঘটনায় এই দেখা যায় যে, আশ্রয়প্রার্থিনীকে তারা যে শুধু আশ্রয়ই দিল, তা নয়, দিল সেবা, যত্ন, শ্রদ্ধা, স্নেহ।[৫]

কেমন করে এমন হল? শুধুমাত্র প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির ফলে? তা হয় না। এত সহজ নয়। একান্ত বিশ্বাসের সততাই এমন ঘটনা ঘটাতে পারল। পিতৃ-সম্বোধনের মধ্য দিয়ে

মা করাঘাত করলেন তার ঘুমন্ত বিবেকের দরজায়, শরণ চাইলেন তার হৃত মনুষ্যত্বের কাছে।

এ আবেদন ব্যর্থ হল না। দস্যু ফিরে পেল তার হারানো মনুষ্যত্ব, জেগে উঠল তার ঘুমন্ত বিবেক। বিশ্বাসের কাছে পরাজিত হল হিংসা। এই সর্বজন-পরিচিত কাহিনীটির মধ্যে এই শিক্ষাটি রয়েছে—অকপট বিশ্বাসে হিংসাকে জয় করা যায়।

শ্রীমার জীবনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কথার মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য সমন্বয়ের শিক্ষা। তা নইলে বলতে পারেন, 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে'![৬]

কী অকুতোভয় মহিমান্বিত এই সতেজ উক্তি! কোথায় শরৎ, আর কোথায় দাগী ডাকাত আমজাদ! শরৎ তাঁর একান্ত নির্ভরস্থল, শরৎ তাঁর 'ভারী'। শরৎ সহস্রফণা বাসুকি, যেদিকে জল পড়ে, সেদিকে ছাতি ধরে। শরৎ ছাড়া মায়ের ঝক্কি এমন করে সামলাতে আর কে পারে?

অথচ সাম্যের আদালতে রায় হয়ে গেলঃ 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।' এমন শঙ্কাও মনে এল না, শরৎ একথা শুনলে কি মনে করবে?

না শঙ্কা নেই। যেখানে বিশ্বাস সেখানে শঙ্কার স্থান নেই। আত্মবিশ্বাস থেকেই তো অপরকে বিশ্বাস। তাঁর সন্তানরা কেউ তাঁর উপর বিরক্ত হতে পারে বা রাগ করতে পারে, মা এমন কথা ভাবতেই পারতেন না।

মঠের সেই চোর-ভৃত্যটির কাহিনীই ভাবা যাক।

চুরির অপরাধে স্বামীজী তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে এসে কেঁদে পড়ল মায়ের কাছে। সহানুভূতি-ভরা মাতৃহৃদয় স্থির থাকতে পারল না। বাবুরাম মহারাজকে ডেকে বললেনঃ 'দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জ্বালা: তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'[৭]

এখানেও মায়ের মনে এল না, নরেন রাগ করবে কিনা, অথবা নরেন আমার কথা রাখবে কিনা?

এমন সহজ নিশ্চিন্ততা আসে শুধু ভালবাসবার অসীম ক্ষমতা থেকে।

আজকের যুগ ভালবাসার সঞ্চয়ে ক্রমশই যেন দেউলে হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে ফেলছে ভালবাসবার ক্ষমতা। আজকে যেন কেউ কারও অন্তরঙ্গ নয়, সবাই নিঃসঙ্গ।

এযুগের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে এইটিই বোধহয় সবথেকে বড় সমস্যা, এই ভালবাসাহীনতা! এ সমস্যা যুগকে রুক্ষ শুষ্ক করে ফেলছে। ধ্বংস করে ফেলতে চাইছে মানুষের মধ্যেকার মানবিকতা-বোধ পর্যন্ত। মনে হয়—এখনই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষণ এসেছে অগাধ ভালবাসার সঞ্চয়ে ভরা শ্রীমার জীবন ও বাণীর অনুধ্যানের।

এমন সহজ সাধনা আর কোথায় মিলবে? কোথায় মিলবে এমন আটপৌরে ঈশ্বরী?

ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে দূরত্ব ঘোচাবার বড় সহজ কৌশলটি আবিষ্কার করেছিলেন মা-সারদা। কোথাও কোন ব্যবধান নেই, জগতে শুধু মা আছেন আর সন্তান আছে। জাগতিক সম্পর্কগুলিও ক্রমশ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে, সবাই ডাকছে 'মা'! সবাই বলছে 'মা'!

মায়ের কাছে জাতিভেদের বিন্যাস আলাদা। তাঁর কাছে 'ভক্ত' একটি বিশেষ জাত। আর সেটি খুব উঁচু জাত। ভক্তরা আসবে, ভক্তরা খাবে, ভক্তদের কষ্ট হচ্ছে, এ নিয়ে তাঁর ব্যস্ততার শেষ নেই। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ভক্তদের এঁটো পরিষ্কার করতেও দ্বিধা ছিল না তাঁর। সে যেন ভক্তদের প্রতি ভক্তিরই প্রকাশ। কিন্তু আচার-পরায়ণা নলিনীদি বলতেনঃ 'মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!'

মায়ের অনায়াস উত্তরঃ 'সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?'[৮]

হ্যাঁ সবই তাঁর। ভক্ত তো বটেই, অবোধ-অজ্ঞানও।

মাঝে মাঝে মা খবরের কাগজ পাঠ শুনতেন। তখন স্বাধীনতা-আন্দোলনের কাল। রাজনৈতিক নির্যাতন, বিশেষ করে মেয়েদের ওপর অত্যাচার শুনলে ঠাকুরের ছবির কাছে গিয়ে ক্ষুব্ধভাবে বলতেনঃ 'এসব কি হচ্ছে!'[৯]

অথচ কেউ ইংরেজের সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করলে বলতেনঃ 'তারাও তো আমার ছেলে।'[১০]

তাঁর বাণীই তাঁর জীবন।

মালাছেঁড়া মুক্তোর মতো অজস্র অমূল্য বাণী ছড়ানো রয়েছে শ্রীমার নিত্যদিনের প্রতিটি সহজ কথার মধ্যে—যে-বাণীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব তাঁর আপন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে মূর্ত হয়ে প্রকাশিত।

নারী-পুরুষ, গৃহস্থ-সন্ন্যাসী, সকলের জন্যই ছিল তাঁর পথনির্দেশের শিক্ষা-বাণী। সহজ সাধারণ ঘরোয়া কথার মধ্যে জীবননীতির কী অসাধারণ মন্ত্রগুলিই রেখে দিয়েছেন তিনি! গ্রহণেচ্ছু মন নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়।

মায়ের হিসাবেঃ জ্ঞানী সন্ন্যাসী যেন হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু সন্ন্যাসীর রাগ-অভিমান? সে যেন বেতের রেক চামড়া দিয়ে বাঁধা।[১১]

অনেক সন্ন্যাসী-সন্তানের রাগ-অভিমানের ধাক্কা মাকে সইতে হয়েছে সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে তুলনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। তবে মা সেই রাগ-অভিমানের সম্মানও রাখতেন বৈকি! মা সকলেরই সম্মান রাখতেন, রাখতে শেখাতেন।

কেউ উঠোন পরিষ্কার করে ঝাঁটাটা ছুড়ে ফেলে রাখছে দেখে বলে উঠলেনঃ 'ও কি গো...যার যা মান্যি, তাকে সেটি দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্যি করে রাখতে হয়...।'[১২]

বলতেনঃ 'সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়।'[১৩]

বলতেনঃ স্ত্রীলোকের লজ্জাই হল ভূষণ। যার আছে ভয়, তারই হয় জয়। যে সয় সেই রয়।[১৪]

আমাদের জীবনে আর কর্মে এই ছোট্ট ছোট্ট উপদেশগুলি যদি গ্রহণ করতে পারা যেত অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যেত।

পৃথিবীর মতো সহ্যশীলা মা-সারদা, পৃথিবীর মানুষকেও উপদেশ দিয়ে রেখেছেনঃ 'পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে।'[১৫] 'সন্তোষের সমান ধন নেই, আর সহ্যের সমান গুণ নেই।'[১৬]

মানুষ 'শান্তি শান্তি' করে পাগল হয়, কিন্তু নিজেই অশান্তি সৃষ্টি করে। মা এই অবস্থা থেকে উদ্ধার হবার একটি সহজ পথ বাতলে দিয়েছেনঃ 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের।'[১৭]

'সকলের ওপর সমান ভালবাসা হয় কি করে জানো? যাকে ভালবাসবে তার কাছে প্রতিদান কিছু চাইবে না। তবেই সকলের ওপর সমান ভালবাসা হয়।'[১৮]

অধিকারী-অনধিকারী নির্বিশেষে সব ভক্তদের সর্বদা একই আক্ষেপঃ 'ভগবান পেলাম না, ভগবান পেলাম না।' তার উত্তরে মা বলেছেনঃ 'ভগবানলাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে জ্ঞানচৈতন্যলাভ হয়।'[১৯]

নির্বাসনা মা বলেছেনঃ বাসনাই সকল দুঃখের মূল। ঠাকুরের কাছে যদি কিছু চাইতেই হয়, তো—নির্বাসনা চেয়ে নেবে।[২০]

অথচ নিজেই রাধুর অসুখে দেবতার উদ্দেশে পয়সা তুলে রাখছেন। দেখে কোন ভক্ত-মহিলা বলছেনঃ 'মা, আপনি কেন এরূপ করছেন?' মায়ের তৎক্ষণাৎ মীমাংসাঃ 'অসুখ হলে ঠাকুরদের মানত করলে বিপদ কেটে যায়; আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।'[২১]

গৃহদেবতা, কুলদেবতা, গ্রামদেবতা সকলেরই যে কিছু প্রাপ্য থাকে, এইটিই উল্লেখ করে বোঝালেন।

সকল সমস্যা আর সকল সংশয়ের মীমাংসা তাঁর কাছে।

'যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন।'[২২]

'জলে ইচ্ছে করেই পড় আর কেউ ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই।'[২৩] জোর করে জপের অভ্যাস করলেও, জপমন্ত্রের কাজটি হবেই কিছু।

এমন কত কথাই অহরহ বলে গেছেন মা উঠতে, বসতে, চলতে. ফিরতে।

জগতে মহৎ আদর্শের অভাব নেই, নেই মহৎ বাণীর অভাব। অভাব শুধু গ্রহণেচ্ছু চিত্তের!

অনিচ্ছুক শিশুকে মা যেমন তার পুষ্টির জন্য লেগে পড়ে থেকে. ভুলিয়ে-ভালিয়ে, ধরে-বেঁধে দুধটুকু না খাইয়ে ছাড়েন না, শ্রীমাও তেমনই তাঁর সন্তানদের মুক্তির জন্য লেগে পড়ে থেকে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, ধরে-বেঁধে, আনন্দলোকের অমৃতস্বাদটি পাইয়ে তবে ছেড়েছেন।

যুগে যুগে, কালে কালে লোক-উদ্ধার করতে ঈশ্বরের অবতরণ ঘটে। সমাজ যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে বিভ্রান্তির পথে ছোটে, কল্যাণ-অকল্যাণ, শ্রেয়-অশ্রেয়ের পার্থক্য হারায়, 'মানুষ' শব্দটার অর্থ ভোলে, তখনই ঈশ্বরকে নেমে আসতে হয় আলোর মশাল ধরে অন্ধকার যুগকে পথ দেখাতে।

সময়সীমা পার হলেই লোকলোচন থেকে অন্তর্হিত হতে হয় তাঁকে, কিন্তু লোক-মানসে যে শুভশক্তির বীজ বপন করে যান, তা সমকাল এবং দূরবর্তীকাল পর্যন্ত অন্ন যোগায়।

এমনই এক যুগসন্ধিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য-আবির্ভাব—অন্ধকারে পথ দেখাতে। দীপশিখা জ্বলতে থাকে গৃহকোণে বা দেহলীতে, তার আলোকরেখা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র গ্রাম কামারপুকুর-জয়রামবাটী থেকে বিচ্ছুরিত আলোকধারা পৃথিবী প্লাবিত করে।

আশ্চর্য এক সমন্বয়মন্ত্র দিলেন তাঁরা যুগকে, কালকে, পৃথিবীকে। আর দিলেন ভালবাসা।

অগাধ অফুরন্ত ভালবাসা।

জ্ঞানী-পণ্ডিত, ত্যাগী-বৈরাগী, ভক্ত-শরণাগত, আবার মূর্খ-অজ্ঞানী, পাপী-তাপী, সকলের জন্যই রয়েছে তাঁর ভালবাসার ভাঁড়ার—দুহাট করে খোলা। ভালবাসাই তাঁর শিক্ষামন্ত্র।

সেই অফুরন্ত ভালবাসার সুনিবিড় স্নিগ্ধচ্ছায়ায় এসে বসতে পারলে, শান্তি আসে, সান্ত্বনা আসে, আর ভরসা আসে—আমরা গৃহহীন নই। আমাদের একটি 'আশ্রয়' আছে।

নববেদান্তের রূপায়ণে শ্রীমা

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পাদ। শ্রীমা কামারপুকুরে স্বামীর ভিটায় আছেন। একদিন ঘটে একটি তাৎপর্যবহ দিব্যদর্শন। তিনি স্বমুখে বলেছেন সে-কাহিনীঃ 'একদিন দেখি কি সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে (ভূতির খালের দিক থেকে), পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল, সব যত ভক্তেরা—কত লোক! দেখি কি ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে—এই জলের স্রোত! আমি ভাবলুম, দেখছি ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুটো মুটো ফুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলুম।'[১] অনুমান করতে পারি শ্রীমায়ের মানস-আকাশে ভেসে উঠেছিল কয়েকটি বিচিত্রসুন্দর স্মৃতিখণ্ড। স্বামী-সোহাগিনী শ্রীমার করায়ত্ত ছিল ইচ্ছামৃত্যু। স্বামীর মহাপ্রয়াণের পর তিনি দেহত্যাগের সংকল্প করছিলেন, সেসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেনঃ 'না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকি আছে।' নরকলেবর বিমোচনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে শ্রীমাকে নিশ্চিন্ত করে বলেছিলেনঃ আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর! তাছাড়াও কাশীপুরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ আবেগের সঙ্গে বলেছিলেনঃ 'না, না, তোমায় অনেক কিছু করতে হবে।' মনে পড়ে, অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধির প্রায়ান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেনঃ 'যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ তাঁহার শরীরমনের দ্বারা জগতে উদিত হইবে, তাহা সর্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে।'[২] এই আধ্যাত্মিক তরঙ্গই নববেদান্তের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। তাছাড়াও একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে ভাবের ঘোরে বলেছিলেনঃ 'দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল্‌বিল্‌ করছে। তুমি তাদের দেখো।' অবতারপুরুষ তাঁর লোকসংগ্রহের বিরাট দায়দায়িত্বের অংশীদার করেছিলেন জীবনসঙ্গিনী স্বয়ংপ্রভা সারদামণিকে। এসকল স্মৃতির উজ্জ্বল আলোকে শ্রীমায়ের সংবিত্তি দৃঢ় হয়। তাঁর স্থির প্রত্যয় জন্মে, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে বহুজনহিতায় কল্যাণ-এষণা প্রবহমান হচ্ছে। তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ গুরুদায়িত্ব। আনন্দপুরিতচিত্তে তিনি ক্রমশ ধারণা করেন—রামকৃষ্ণবিগ্রহ থেকে উৎসারিত প্রবলশক্তি ভাব-আন্দোলনের তিনি শুধুমাত্র দ্রষ্টা নন, তিনি তার অংশভাক্।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।' শ্রীমা সারদামণি 'দয়াময়ী', 'আনন্দময়ী', 'সরস্বতী' ; তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পূজিতা প্রজ্ঞারূপিণী জ্ঞান-

দাত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়নে মন্দিরের চৈতন্যময়ী ভবতারিণী, তাঁর গর্ভধারিণী জননী, ও তাঁর পদসংবাহনকারী সারদামণি, একই সত্তার তিন প্রকাশ। এদিকে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কালীময়, তাঁর সাধনকালে জগজ্জননী মা-কালীর সঙ্গে নিত্য বোঝাপড়া, সাধনোত্তরকালে মা-কালীর সঙ্গে নিত্য লীলাবিলাস।'[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীর অবতার। শ্রীমায়ের ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণই মা-কালী, জগজ্জননী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য 'মা-কালী গো' বলে কেঁদেছেন। তাঁর সম্বন্ধে বলেছেনঃ 'তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামিভাবেও, এমনি ভাবেও।' শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের বিভিন্ন উক্তি ও আচরণ থেকে পরিস্ফুট যে, তাঁরা দুজনে অভেদাত্মা। রামকৃষ্ণ-কল্পতরুর সম্প্রসারিত শাখা শ্রীমা। উভয়ের সমকেন্দ্রিক জীবন এবং একই-উদ্দেশ্য-অভিমুখীন্ আচরণ থেকে স্বতই মনে হয়, তাঁরা একই ভাবাগ্নির দুটি শিখা, একই শক্তিতরঙ্গের দুটি ধারা, একই সত্যের দুটি অবয়ব। আবার যেমন ব্রহ্ম ও তার শক্তি, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শক্তি শ্রীমা।

সহধর্মিণী সারদামণিকে লৌকিক ও অলৌকিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্যদিকে শ্রীমা তাঁর জীবনকে সর্বাত্মকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-অনুসারী ধ্যানধারণা ও কর্ম-বিচারণার সার্থক চর্চা করে হয়েছিলেন 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা', রামকৃষ্ণ-ভাববৈভবে বিভূষিতা। ধর্মসংস্থাপক শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীপূজা করে সারদামণির মধ্যে সর্বকল্যাণ-ময়ী শক্তি সংপ্রতিষ্ঠা ও সক্রিয় করেছিলেন। পরিণামে, 'শ্রীমা ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের...সাধনলব্ধ সমস্ত ফল গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ তিনি বিনা সাধনায় সমস্ত সিদ্ধির অধিকারিণী হইলেন ; অধিকন্তু ব্যুত্থিতাবস্থায়ও তিনি সর্বজীবে ব্রহ্মবুদ্ধি রাখিতে শিখিলেন।'[৪] এসকলের ফলশ্রুতি, শ্রীমা সারদামণি প্রকটিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ জীবন ও আদর্শের শ্রেষ্ঠ স্ফুরিত প্রতিচ্ছায়ারূপে। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর আপন সত্তারই ভিন্ন একটি অভিব্যক্তিমাত্র-জ্ঞানে শ্রীমাকে আপন দায়দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সামগ্রিক বিচারে শ্রীমা বেদান্ত-সিদ্ধান্ত শ্রীরামকৃষ্ণেরই উত্তরসাধিকা। আবার ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর মহৎ উদার লোকৈষণা ও অনন্যসাধারণ ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামী নির্বেদানন্দের অভিমত লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেনঃ সামাজিক বন্ধন হতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত এবং অধ্যাত্ম-অনুভূতির শিখরে সমারূঢ়া শ্রীমায়ের জীবনে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ছিল প্রাণস্পন্দনস্বরূপ। তিনি যেন পূর্ণাঙ্গ আদর্শরূপে দণ্ডায়মানা।[৫]

অদ্বৈতবেদান্ত নিয়ে বিপুল বিভ্রান্তি ঘটেছিল উনিশ শতকে। প্রতিভাসূর্য রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' মূলত শঙ্করানুগ হলেও 'সম্ভবত শক্তিবাদ ও তন্ত্রের প্রভাবে তিনি মায়াকে ঈশ্বরের সৃজনী শক্তিরূপে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।' তাঁর উত্তরাধিকারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্মী উপনিষদে'র স্রষ্টা, কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত বিষয়ে আতঙ্কিত, সদাসন্ত্রস্ত। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের পর-

বর্তী নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ভীতিপ্রদ অদ্বৈতবাদকে বিদায় দিলেও পরবর্তী জীবনে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তত্ত্বের গভীরে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কিনা সন্দেহ! তীক্ষ্ণধী অক্ষয়কুমার দত্ত বিভিন্ন বেদান্তবিদের ন্যূনতা দেখে তাঁদের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন বেকনের মতো একজন পথপ্রদর্শক। বিদ্যার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তের ব্যর্থতা ও অপ্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করলেন। মননশীল বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেনঃ 'ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইজন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক্ ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না।' বেদজ্ঞ দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে শঙ্করাচার্য জৈনমত খণ্ডনের জন্যই অদ্বৈততত্ত্ব খাড়া করেছিলেন; ঐ তত্ত্বে শঙ্করাচার্যের আস্থার অভাব অথবা তত্ত্বসিদ্ধান্তের ভ্রান্তি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সুনিশ্চিত।

মননশীল ভারতবাসীর মানসদিগন্ত সেসময়ে অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয় ও বিভ্রান্তির জালে সমাচ্ছন্ন। অবতীর্ণ হলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। জগদম্বার জগৎজোড়া জমিদারির সরকারী লোক। ভারতীয় আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তম্'—এই বেদান্ততত্ত্বকে জীবনবেদীমূলে সংস্থাপিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু কথাবার্তার মধ্যে নয়, মতস্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়, অপরোক্ষানুভূতির আলোকে বেদান্তসত্যকে সর্বাত্মকভাবে আয়ত্ত করে তিনি হয়েছিলেন 'অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্ত'। রামকৃষ্ণজীবন-ভাষ্যকার লিখেছেনঃ 'সাধারণ মানব ঐ উচ্চতম অদ্বৈত-ভাবভূমিতে বহুকাল আরোহণ না করিয়া উহার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়াদি-সহায়েই কেবলমাত্র জ্ঞানলাভ করা যায়, এই কথাটায় একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সংসারে একপ্রকার নোঙ্গর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। নিজ জীবনে তদ্বিপরীত করিয়া দেখাইয়া তাহার ঐ ভ্রম দূর করিতেই ঠাকুরের ন্যায় অবতারপ্রথিত জগদ্‌গুরুর...উদয়।'[৬] তাঁর বেদান্তভাবনারই একটি কর্মপরিণত প্রণালী দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্ত এই প্রণালীকে অনেকেই বলেছেন নববেদান্ত। স্বামীজীর দৃষ্টিতেঃ 'কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত, সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই।' এবং এই তত্ত্বাদর্শের শ্রেষ্ঠ অথচ সহজবোধ্য অভিব্যক্তি শ্রীমায়ের জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি। নববেদান্তের পরিস্ফুটতম অভিপ্রকাশ শ্রীমায়ের জীবনচর্যা।

নতুন যুগে ভারতীয় শাশ্বত আদর্শ বেদান্ততত্ত্বের প্রতিপাদয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মননালোকে এক আত্মা সর্বত্র বিরাজিত। এই অখণ্ড তত্ত্বের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে কাল্পনিক প্রাচীর গড়ে উঠেছে তাকে উড়িয়ে দিতে হবে। বাহ্যভেদ প্রাতিভাসিক। গভীরে অনুপ্রবেশ করলে দেখা যাবে মানুষে মানুষে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চ-নীচে একত্ব, ধনী-দরিদ্রে একত্ব, দেবতা-মনুষ্যে একত্ব। সকলেই মূলত এক। আরও অগ্রসর হলে দেখা যায়, ইতর

জীবজন্তু পর্যন্ত সবই তত্ত্বত এক। সাধকের সত্য-অন্বেষা তাঁকে ক্রমে পেঁছে দেয় জগতের ভরকেন্দ্র ঈশ্বরে। তিনি অনুভব করেন, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরই সকল বস্তুর একত্ব-স্বরূপ; তিনিই অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ। সেখানে মৃত্যু নেই, রোগ নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই, অশান্তি নেই। আছে কেবল পূর্ণ একত্ব, পূর্ণ আনন্দ। বর্তমানের যুগ-সমস্যা সমাধানে সমর্থ এই আদর্শের প্রবর্তয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণ, ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রকৃষ্ট ব্যবহারাদর্শ শ্রীমা সারদা। পরিণামে দেখা যায় রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে শ্রীমায়ের রয়েছে একটি সাধারণ ভূমিকা, তেমনই রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা। বেদান্তের ব্যবহারিক আদর্শটি বুঝতে তাঁর এই স্বতন্ত্র ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেনঃ 'কর্মপরিণত বেদান্ত (Practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব-জনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।'[৭] তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমাদের ধর্মে মহাসাম্যবাদ, অথচ সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে মহাভেদবুদ্ধি। সে কারণে তিনি চেয়েছিলেন খাঁটি বেদান্তকে ঘরে ঘরে পেঁছে দিতে, বেদান্তের কার্যকারিতা সম্বন্ধে জন-সাধারণকে অবহিত করতে, বেদান্তের অভয়-দ্যুতি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে দিতে। শ্রীমা যেন তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বেদান্তকেন্দ্রিক সমাজ-উদ্বোধনের উদ্দেশ্যেই যেন তিনি নিজের জীবনকে নজিরস্বরূপ প্রতিস্থাপিত করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের নববেদান্তের চিন্তাধারার দুটি দিক। একটি নেতি-বাচক ও নিষেধাত্মক, অপরটি ইতিবাচক ও বিধানাত্মক। উপনিষৎ একদিকে বলেছে, 'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন', আবার অপরদিকে তার দৃপ্ত ঘোষণাঃ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই বেদান্তের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবজগৎকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান বা নিরাকরণ করতে হবে না, তাকে ব্রহ্মভাবে—একমাত্র ব্রহ্মরূপেই দর্শন করতে হবে।[৮] সকল বস্তুতে

ঈশ্বরবুদ্ধি করতে হবে, সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধারণা করতে হবে। মানুষের জীবনকে ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত করা, এমনকি জীবমাত্রকেই ঈশ্বরস্বরূপ চিন্তা করাই মননশীল মানুষমাত্রের কর্তব্য। এই বেদান্তবাদে পূর্ববর্তী বেদান্তাচার্যদের সকল মৌলচিন্তার অতিরিক্ত স্থান পেয়েছে একটি সর্বাবগাহী সহিষ্ণুতা ও উদারতা। 'বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ "জগতের ব্রহ্মভাব"—জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখ... এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর।'[৯] অদ্বৈতবিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমা তাঁর সমীপবর্তীদের বলেছিলেনঃ 'সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি।'[১০]

বেদান্তবিজ্ঞান থেকে সহজেই অনুসৃত হয় যে, ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ, আবার তিনি সগুণ ও নির্গুণের অতীত, অনির্বাচ্য ও অনির্দেশ্য। সগুণ ও নির্গুণ একই তত্ত্বের অবস্থান্তর মাত্র।[১১] শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রমুখ জ্ঞানী পুরুষদের উপলব্ধিতে অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতো ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ 'যিনি জগৎরূপে আছেন—সর্বব্যাপী হয়ে তিনিই মা।' শ্রীমাও বলতেনঃ 'জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। মা—মা—শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে। সব এক হয়ে দাঁড়ায়—এই তো সোজা কথাটা।'[১২]

এই সিদ্ধান্তানুগ পরিশীলনে পরিস্ফুট হয় যে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত —দার্শনিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি-অনুসারী বই তো নয়, স্থান-কাল-ভেদে বিভিন্ন জ্ঞানভূমি থেকে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন বর্ণনা মাত্র এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে সত্য।

আবার এই তত্ত্বানুষঙ্গ থেকেই প্রতিভাত হয় যে, সবিকল্প জ্ঞানের স্তরে ও ভক্তের দৃষ্টিতে যিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান, তিনিই যোগীর দৃষ্টিতে নিত্যশুদ্ধ আত্মা। এবং নির্বিকল্প জ্ঞানের পর্যায়ে তিনিই সর্বভেদবর্জিত নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। বিভিন্ন দেবতার আরাধনা সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা। নারায়ণ স্বমূর্তিতে

দর্শন দিয়ে শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ 'ঈশ্বরতত্ত্ব না করলে কি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়?'[১৩] প্রকৃত-প্রস্তাবে, সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনার মধ্য দিয়েই অধিকাংশ মানুষ অর্জন করে নির্গুণ উপাসনার যোগ্যতা। বুঝতে হবে কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি একই মহা-সাধনের এক একটি অঙ্গমাত্র। এই মহাসাধনের মহৎ একটি পরিণতি ঘটেছে রামকৃষ্ণ-রূপ সমন্বয়-সমুদ্রে। মৃদুতা, পবিত্রতা ও মাধুর্যের মূর্তবিগ্রহ শ্রীমা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে আয়ত্ত করেছিলেন এই সমন্বয়-অনুভূতি এবং জগদ্‌বাসীর সম্মুখে প্রদর্শন করেছিলেন এর কার্যকারিতা।

দার্শনিক বিচার ও ধর্মানুভূতিতে সমন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করেছিলেন 'বিজ্ঞানের' তত্ত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ 'বিজ্ঞান—কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা। ... ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান ; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা...এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।' তিনি 'বিজ্ঞান' শব্দে বোঝাতেন নির্বিকল্প সমাধির পর জগতের সব কিছুকে ব্রহ্মময় জেনে জগতের সঙ্গে সক্রিয় ব্যবহার, জগদ্‌বাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ। বলা যেতে পারে বিজ্ঞান হচ্ছে সংসারে ব্রহ্মজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। বিজ্ঞানী ত্রিগুণাতীত, তাঁর স্বভাব পাঁচ বছরের বালকের মতো। তিনি সর্বভূতে দেখেন সেই সমরস ব্রহ্মকে। ধর্মজগতে উপলব্ধি করেন যত মত তত পথ।[১৪] ত্রিতাপতপ্ত মানুষের কাছে সংসার 'ধোঁকার টাটি', আনন্দ-স্নাত বিজ্ঞানীর কাছে 'মজার কুটি'। বিজ্ঞানী শ্রীমায়ের কাছে সাংসারিক অশান্তি ছিল অজ্ঞাত। তাঁর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত শান্তিঘট থেকে অবিরাম উৎসারিত হত শান্তি ও কল্যাণের সহস্রধারা। তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে চমৎকারভাবে বিস্ফুরিত হয়েছিল এই জ্ঞানোত্তীর্ণ বিজ্ঞান।

শুধু কি তাই? তাঁর অবস্থা ছিল ত্রিগুণাতীত পরমহংসের মতো। বিজ্ঞানী শ্রীমা নিজের সম্বন্ধে বলেছেনঃ 'আমার বালকস্বভাব। আমার কি অত আগ-পাছ হিসাব থাকে? যে চাইলে দিলুম।'[১৫] ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমা জগদম্বাজ্ঞানে সম্পূজিতা, কিন্তু তাঁর মধ্যে অনেকেই 'মা-রূপী ছোট খুকীর' সরল মধুর আচরণ লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছেন। সেবক স্বামী সারদেশানন্দের স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে কয়েকটি মনোজ্ঞ ঘটনা। একবার কোয়ালপাড়ার 'জগদম্বা আশ্রমে' শ্রীমা আছেন। একদিন এক-ঘড়া দুধের মধ্যে দেখা গেল একটি মৌরলা মাছ। এ-খবর শুনে পরিবারের লোকজন উত্তেজিত। শ্রীমাও চিন্তিত। তিনি বাড়ির লোকজনের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। মুরুব্বী নলিনীদি বলেনঃ 'কলকাতার গয়লারা দুধে কত কি মিশায়, কে তার খোঁজ রাখে? সেই দুধেই তো সব মিষ্টি হয়, পায়েস হয়, ঠাকুর-দেবতাকে ভোগ দেয় সবাই!' শ্রীমা তৎক্ষণাৎ আশ্বস্ত—ঐ দুধেই পায়েস রান্না করে ঠাকুরের ভোগের

ব্যবস্থা করলেন।[১৬] জ্ঞানদার সংশয়, অভয়ার ভীতি, বরদার বালিকার মতো উল্লাস শ্রীমাকে করেছে ভক্তহৃদয়ের নিকটতম, প্রিয়তম।

সারদামণি যে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি, অপরামূর্তি, জীবন্ত বাণীমূর্তি,[১৭] তাঁর জীবনদর্পণে যে প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়িত নববেদান্ত, সে-বিষয়ে জনৈক দার্শনিক লিখেছেনঃ 'রামকৃষ্ণ শুধুমাত্র তুরীয়বাদের মধ্যে সীমিত ছিলেন না; সত্যের অন্তরে নিহিত আধ্যাত্মিকতার অধ্যায়টি মানুষের কাছে উন্মোচিত করার জন্য তিনি আগ্রহী ছিলেন। যে তুরীয়বাদ ছিল শঙ্করের ঐকান্তিক উদ্বেগ এবং যে লীলাবাদ ছিল বৈষ্ণবদের ঐকান্তিক অভিনিবেশ, এ-দুটিই তাঁর কাছে পেয়েছিল সমান মর্যাদা। কারণ তিনি তুরীয় উপলব্ধি করেছিলেন, লীলার অন্তর্মাধুর্য অনুভব করেছিলেন; আবার মানুষের নিখিল বিষয়ে দৈবের ব্যভিচার এবং ঈশ্বরের গভীর প্রীতি যা মানবসমাজকে অজ্ঞান থেকে মুক্ত করতে নিয়োজিত তাও তিনি অনুভব করেছিলেন।'[১৮] স্বামী বিবেকানন্দ চাষীর কুটিরে, বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে, শ্রমিকের কারখানায় যে-নববেদান্তের সম্প্রয়োগ পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই তত্ত্বের উজ্জ্বলতম বিগ্রহরূপে শ্রীমা একটি পারিবারিক আবেষ্টনীতে বিরাজমানা। 'কাঁচা আমি'র ঢিপিটাকে শরণাগতির বারিতে অভিসিঞ্চিত করতে উপদেশ দিতেন; তিনি বলতেনঃ 'মনে করবে এ ঠাকুরের সংসার, তুমিও ঠাকুরের; ঠাকুরের সংসারে ঠাকুরের কাজ কচ্চ।'[১৯]

নববেদান্তের মুখ্য আবেদন তার কার্যকারিতায়। অদ্বৈতভূমি থেকেই সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আন্তরিক প্রীতির চক্ষে দেখা সম্ভবপর। অদ্বৈততত্ত্বই 'ভাবী সুশিক্ষিত মানবসাধারণের ধর্ম'। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই তত্ত্বের ব্যাপক ও গভীর প্রয়োগ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের লক্ষ্য। এই তত্ত্বাদর্শের প্রেষণাস্বরূপা শ্রীমা আদর্শটিকে জনপ্রিয় করার দায়িত্ব নিজস্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি সংসার ত্যাগ করে আবৃতচক্ষু হয়ে ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হননি। তিনি পরিপাটিরূপে সংসার করেছিলেন। প্রবল সাংসারিক বৈরিতার মধ্যেও তিনি পুণ্যব্রতা সহধর্মিণীর কর্তব্য পালন করে গেছেন, জপধ্যান করেছেন, তীর্থ করেছেন, পুজা করেছেন, ভক্তদের প্রসাদ বেঁটে দিয়েছেন, আত্মীয়স্বজন ও অতিথিদের সেবা-যত্ন করেছেন, তরকারি কুটেছেন, রান্না করেছেন, পরিবেশন করেছেন, এঁটো তুলেছেন, ঘর নিকিয়েছেন, বাসন মেজেছেন, কাপড় কেচেছেন, পান সেজেছেন। আবার সাংসারিক মনোমালিন্য মিটিয়েছেন, রাধু ও মাকুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠিয়েছেন, রাঁধুনী-ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করেছেন, সন্ন্যাসীর ব্যবহৃত আসনটি নমস্কার করেছেন। কিন্তু এই বিচিত্র সংসারে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, জরা-যৌবনের মধ্যে তাঁর চেতনা অধিষ্ঠিত ছিল তাঁরই উপলব্ধ সংসারোত্তীর্ণ এক শাশ্বত সত্তাতে। সর্বাবস্থায় ও সর্বজীবের প্রাণে প্রাণে

ছন্দায়িত একই বিশ্বাত্মার উপলব্ধি করে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে বিজ্ঞানীর ভাব-পর্যায়ে সম্প্রতিষ্ঠ হয়ে তিনি প্রশান্তচিত্তে ঘোষণা করেছিলেনঃ 'ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।'[২০] এই বৈদান্তিক বোধসঞ্জাত তাঁর কৃপা-প্রস্রবণ ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানবের কল্যাণে প্রধাবিত হয়েছিল এবং এক অশ্রুতপূর্ব অ-মায়িক মাতৃত্বের স্নেহ-মমতা-করুণায় জগতের সকলকে আপন থেকে আপনতর করে নিয়েছিল। তাঁর নিজের অনুসৃত ফলিত-বেদান্তের মাহাত্ম্য খ্যাপন করবার জন্যই যেন তিনি জনৈক তপস্যাকাঙ্ক্ষী সাধুকে বলেছিলেনঃ 'সেকি গো, আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে? হাওয়া গুনতে কোথায় যাবে?'[২১] তিনি তাঁর ভ্রাতৃবধূ সুবাসিনী দেবীকে বলেছিলেনঃ 'তুই এই যে কাজ করছিস, এতেই সাধন হচ্ছে—এর চেয়ে আর কি সাধনভজন?'[২২] স্বামী প্রেমানন্দজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথার্থই বলেছিলেনঃ 'পূজনীয় শ্রীশ্রীমা এই (নববেদান্তান্তর্গত) কর্মযোগের জীবন্ত জ্বলন্ত পূর্ণ আদর্শ।'[২৩]

কিন্তু বিজ্ঞানী শ্রীমাকে সাধারণের চেনা ছিল দুঃসাধ্য। স্বরূপের দৈবভাবকে মানবীয় ভাবাবরণে আবৃত করে এক সহজ, সরল, নিরাড়ম্বর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নিজেকে সংস্থাপিত করেছিলেন শ্রীমা। তাঁর স্নেহ-করুণা-ধন্য এক সন্তান লিখেছেনঃ 'মাকে দেখে "মা" বলেই মনে হত, আলাদা কোন বিশেষত্ব, কি কোন অলৌকিক কিছু তাঁর মধ্যে যে আছে বা থাকতে পারে, তা মনে হয়নি। আমরা মায়ের কাছে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির মার মতোই তিনি হয়তো তরকারি কুটছেন বা সংসারের কোন কাজ করছেন।'[২৪] নিভৃত কুটিরে প্রদীপের স্থির শিখার মতো তিনি স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু তিনি কি, তা যাঁরা জেনেছেন তাঁদের অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ 'শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।...মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন...।'[২৫] স্বামী সারদানন্দ লিখেছেনঃ 'নবযুগে নবোদ্যমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা ও নিরন্তর সপ্রেমাহ্বানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন...।'[২৬] আত্মগোপনকারী জগৎ-বিধাত্রী সম্বন্ধে স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছেনঃ 'তিনি জগতের কল্যাণ চিন্তা সতত করিতেছেন।'[২৭] কিন্তু তাঁর অনাড়ম্বর জীবনে তাঁর স্বভাবগত কৃপা, ভক্তি, ঈশপ্রাণতার তাৎপর্য ছিল সাধারণের বোধ-সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে।

অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে শ্রীমা ভাবরাজ্যের সকল স্তর উপলব্ধি করেছিলেন, আবার ভাবাতীত রাজ্যেরও সাক্ষাৎ-জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তদুপরি শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত বহু তত্ত্বও তিনি সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করে তাঁর

অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার পুষ্টিবিধান করেছিলেন। এসকল দুস্তর সাধনোত্তীর্ণ চেতন-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই শ্রীমা উপদেশ করেছেনঃ 'জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।' তাঁর সাধা নববেদান্তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকল ভাববিরোধের মধ্যে সমাহরণ এবং স্বাভাবিকভাবে সর্বাবগাহী সামঞ্জস্যসাধন। ভাব-তন্ময় অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে ত্রিতাপে তাপিত বাস্তবজীবনের সেতুবন্ধনরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন শ্রীমা। শ্রীমার বৈশিষ্ট্য ছিল সহজাত সারল্য ও নিরভিমানতার আবরণে স্বরূপকে আচ্ছাদন করে রাখা। পরিণামে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট হয়ে-ছিলেন সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁর সকল আচরণ-বিচরণই ছিল নববেদান্তের স্নিগ্ধালোকে মাধুর্যমণ্ডিত। অদ্বৈতবেদান্তের প্রশান্ত আলোকে প্রাত্যহিক জীবন হবে প্রাণবন্ত কাব্যময় সুষমামণ্ডিত, স্বামী বিবেকানন্দের এই আকাঙ্ক্ষা শ্রীমায়ের জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। ছন্দোময় ও সুষমামণ্ডিত শ্রীমায়ের প্রাত্যহিক জীবনধারা ভারতীয় শাশ্বত আদর্শের একটি সঙ্গীতরূপ এবং ভারতীয় নারীর ভবিষ্যতের আদর্শদীপ বই তো নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা উভয়েই দেব ও মানব ভাবের মধুর সামঞ্জস্যে গঠিত। দুজনের মধ্যে সম্বন্ধ নিগূঢ় এক আধ্যাত্মিক ভাবস্তরে প্রবাহিত। শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তাদর্শের অনুপূরক শ্রীমা। সেই আদর্শের প্রয়োগ ও সম্প্রসারণাই শ্রীমায়ের বিশেষ জীবন-ভূমিকা। বাক্‌কুণ্ঠ শ্রীমা নীরবে নিভৃতে প্রধানত আচরণ ও অভ্যাস দিয়ে পালন করেছেন তাঁর মহৎ ভূমিকা। প্রকৃতিস্থ ও সমাধিস্থ দুই স্তরেই ছিল তাঁর সাবলীল গতায়াত। পবিত্র তাঁর মানবিক ভূমিকা পালন করতে জগজ্জননী এসেছিলেন আমাদের জীবন-অঙ্গনে আত্মীয়ের পরিচিত বেশে—হাসিকান্না-মাখা সংসারের মধ্যে অপরূপ শান্তি ও শ্রী মণ্ডিত এক মমতাময়ী মাতৃমূর্তিতে। যুগপৎ আসক্তি ও বিবিক্তির স্ফুরণে অনন্যসুন্দর তাঁর ঈশ্বরমনা জীবনধারা। দুরবগাহ শ্রীমার চরিত্রে বিশ্বাসের নোঙর যেমন ছিল দৃঢ়বদ্ধ, তেমনই ব্যবহারিক জীবনে ছিল স্বচ্ছ যুক্তি-নিষ্ঠা ও বিচারশীলতার সম্যক্ অনুসৃতি। ভালমন্দ, নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্বের অতীত শ্রীমায়ের সাংসারিক কর্ম শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে কর্মাভাস মাত্র। আত্মস্থা শ্রীমা চির অসক্ত নির্লিপ্ত, শুধুমাত্র লোককল্যাণের জন্য তাঁর এইসব প্রাত্যহিক জীবনচর্যা। বিদ্যামায়ায় আশ্রিত তাঁর জীবনে ভক্তি, দয়া, তিতিক্ষা, ক্ষমা, বৈরাগ্যাদির নিত্য উৎপ্লব। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বরাভয়দাত্রী। তিনি অসংসক্ত কৃৎস্নকর্মকৃৎ। তিনিই একাধারে একান্ত শরণাগত ভক্ত এবং সকল ভক্তের একক শরণাগতি।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট আধ্যাত্মিক সূর্যের আড়ালে নিজেকে আবৃত করলেও শ্রীমার স্ফুরিত স্বরূপ হচ্ছে অদ্বৈতভাব। সে উচ্চপর্যায়ে 'সব শেয়ালের এক রা'—জগৎ-কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলের উপলব্ধির মধ্যে সাদৃশ্য। শ্রীমা সর্বোচ্চ অদ্বৈতানুভব হতে কিঞ্চিৎ অবতরণ করে নিত্য বোধ করেছেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই তত্ত্ব শুধু তাঁর মননের প্রাচীরে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় সর্বত্রই ছিল তার বিশেষ বিকাশ। এই বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর কর্মজীবনের ভিত্তি, চারিত্র-শক্তির উৎস ও মহত্তম ভাবাদর্শের সুদৃঢ় শিকড়-সন্নিধি। 'সব ভাল থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক'—এ-ধরনের সর্বভূতহিতে-রতি পরিব্যাপ্ত ছিল তাঁর সকল আয়াস-প্রয়াসের মধ্যে। বলাবাহুল্য যে, এ-সকলের পশ্চাতে ছিল সর্বাবস্থায় সর্বজীবে এক

বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে শ্রীমায়ের তাদাত্ম্য-অনুভব ও তদনুযায়ী ব্যবহার। শ্রীরামকৃষ্ণের সুপরীক্ষিত বেদান্ত-ভাবধারার বিধাত্রী ও তার সুনিপুণ রূপদাত্রী শ্রীমা। একত্বদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনিঃ 'এখন দেখছি, তিনিই এক একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও ছলরূপে—কোথাও বা খলরূপে।' অনুরূপ অনুভাব পরিস্ফুট শ্রীমায়ের বাণীতে ও আচরণে। অনন্তের মধ্যে সেই একের লীলাদর্শনে পারদর্শী শ্রীমা বলেনঃ 'একবার দেখি কি, তা জান? দেখি না, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না, তিনিই পাচ্ছেন। তাইতো যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিসে তাঁকেই করি।'[২৮] সর্বদেবতাময় শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বভূতে নিত্য প্রত্যক্ষ অনুভব ও দর্শন ছিল তাঁর সকল আচরণের নিয়ামক। একদিন নিত্য-কার ঠাকুরপূজার পূর্বেই শ্রীমা লোলুপদৃষ্টি তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলের হাতে নৈবেদ্য তুলে দিয়েছিলেন। সেবক বাধা দিলে শ্রীমা স্নেহসুধাসিক্ত কণ্ঠে বলেনঃ 'আঃ বাছাকে খেতে দাও। প্রভু এর মধ্যেও আছেন।' আবার একদিন ঠাকুরের রাত্রি-ভোগের জন্য নির্দিষ্ট একবাটি দুধ শ্রীমা তুলে দেন তাঁর সেবকের হাতে। সেবক আঁতকে ওঠেন। প্রতিবাদ করেন। করুণাসিক্ত কণ্ঠে শ্রীমা বলেনঃ 'খাও বাছা, তোমার ভিতরেও ঠাকুর রয়েছেন।' শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, গৃহপালিত টিয়া গঙ্গারামের মধ্যেও ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করে শ্রীমা ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট নৈবেদ্য তাকে খাইয়েছেন।[২৯] তাঁর এ-সকল আচরণ প্রমাণ করে মহাজনবাক্যঃ যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে! এই দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর দীনতা, সহিষ্ণুতা ও প্রেম, এই ত্রিতন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হয়েছিল শ্রীমায়ের জীবন-বীণা।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় অব-তীর্ণ হতে হবে। অদ্বৈতজ্ঞান শুধুমাত্র শ্রীমায়ের আঁচলখণ্ডেই বাঁধা ছিল না, অদ্বৈতানুভূতি ছিল তাঁর সমগ্র সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত এবং ব্যবহারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল 'বিরাট আমি'-র সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য।[৩০] ফলে, শ্রীমায়ের চিন্তায়, ভাবনায়, ব্যবহারে, বাক্যে সমত্ব-আচরণ ছিল সহজ স্বাভাবিক। পরাশক্তির আধারভূতা শ্রীমায়ের ভাবসমাধি ইত্যাদি ভাবৈশ্বর্যের প্রকাশ, সব কিছুই ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তাঁর স্বরূপ-নির্দেশক একটি বাণীঃ আমার যে মন রাতদিন উঁচুতে উঠে থাকতে চায়, জোর করে তা আমি নীচে নামিয়ে রাখি দয়ায়, এদের জন্য। কিন্তু সেই সঙ্গে বেদান্তসিদ্ধান্তের একত্বানুভূতি তাঁকে সকল রকমের সঙ্কীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে সংস্থাপিত করেছিল। বিশ্ববেদান্তের পরমসত্য ধ্যানলোক থেকে সঞ্চালিত হয়ে শ্রীমায়ের জ্ঞান-

ইচ্ছা-ক্রিয়ার সকল প্রকাশকে উদ্ভাসিত করেছিল, নববেদান্তের প্রয়োগের পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল। বেদান্তের ঐক্যানুভূতিই শ্রীমায়ের মানসলোকে অভিনব অথচ সহজ এক ভাবাদর্শ—বিশুদ্ধ মাতৃভাবের সামগ্রিক আত্মপ্রকাশে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই সর্বগ্রাসী পবিত্র মাতৃভাবের বিকাশে শ্রীমা সকলকে সর্বতোভাবে আপনার করে নিয়েছিলেন, কোনরকম বাছবিচার না করে আশ্রয়প্রার্থী সকলকে আপন-সন্তান-জ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন, কল্যাণী জননীর মতো প্রত্যেক সন্তানের জন্য 'যার পেটে যা সয়' তদনুযায়ী বিবিধ ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের 'সন্তানভাব' ও 'মাতৃভাব' একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ। স্মরণযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীঃ 'আমার সন্তান ভাব। এ-ভাব দেখলে মায়াদেবী পথ ছেড়ে দেন।' 'মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব।...আমি মাতৃভাবে ষোড়শীর পূজা করেছিলাম।...এই মাতৃভাব—সাধনের শেষ কথা...।' বর্তমানের ভোগসর্বস্ব, জটিলতাময় পারিবারিক তথা সমাজজীবন যেন মাতৃহারা, ছন্নছাড়া। পার্থিব বৈভবের সমৃদ্ধিতে এ-অভাবের পূরণ অসম্ভব। এ-সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সকল মানুষের মধ্যে অকৃত্রিম বাৎসল্যরতি-সম্পন্না মাতৃশক্তির প্রতিষ্ঠা। শক্তিরূপিণী শ্রীমার সকল ভাববৈভব অতিক্রম করে লোকসমক্ষে প্রকটিত হয়েছে তাঁর মাতৃভাব। তাঁর জীবন ও বাণীতে প্রমাণিত হয়েছে, মা-সন্তান প্রত্যয়ের প্রকৃত অপরোক্ষ অনুভবই যথার্থ তত্ত্ববোধ। বেদান্তানুগ তত্ত্ব-বোধ অনুসারে তিনি সকলের মধ্যে দেখেছেন সন্তানের রূপ। তিনি সকলের মা, স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ জননী, এক অ-মায়িক বিশ্বমাতৃত্বের অধিকারিণী। সর্বভূতে মাতৃ-রূপে সংস্থিতা শ্রীমা বলেনঃ 'ওদের (বেরালদের) ভেতরেও তো আমি আছি।' 'আমি সকলের মা। ইতর জীবজন্তুরও মা।' তিনি চন্দনা-ময়নাটির মা, তিনি গরু-বাছুরেরও মা। এই শুদ্ধ মাতৃভাব বুদ্ধিসৃষ্ট নয়, এ-ভাব উৎসারিত হয়েছে সর্ব-জীবের প্রতি সমজ্ঞানানুভূতি থেকে, সকলের প্রতি অহেতুক প্রীতিবোধ থেকে। শ্রীমায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা হচ্ছে 'একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ; ও যেন বিলাস-বিচিত্র একটি স্বর্ণদীপ্তি!'[৩১] সমুন্নত মহিমায় দীপ্ত শ্রীমায়ের স্নেহ-ভালবাসা। ছোট্ট একটি ঘটনা : জনৈক ভক্ত দুটি বাছাই করা আম মাকে দিয়েছিলেন : মা আম ভালবাসতেন। তাছাড়া আমের সময় গতপ্রায়। সমীপোবিষ্টা ভগিনী দেব-মাতাকে শ্রীমা আম দুটি দেন। দেবমাতার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মা নিজে ফল দুটি খান। বিদেশিনী মহিলা পীড়াপীড়ি করেন! শ্রীমা স্নেহ-মধুর কণ্ঠে বলেনঃ বাছা, তোমার কি ধারণা তুমি না খেয়ে আমি নিজে খেলে তৃপ্তি পাব? শ্রীমায়ের স্নেহ-শিশিরে আর্দ্র অনুজ্ঞা দেবমাতা সশ্রদ্ধচিত্তে মেনে নেন।[৩২] শ্রীমায়ের এ-সকল মমতা-মেদুর আচরণ অ-মায়িক অনন্তরূপিণী শ্রীমায়ের কৃপাপূরিতশক্তির পরিস্ফুরণমাত্র।

সর্বাবস্থায় সব জীবে পরিব্যাপ্ত এই মাতৃভাব গভীর ও মহান্। 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। সতীরও মা, অসতীরও মা।'[৩৩] শ্রীমায়ের একথা শুনে সন্তানের মনে উঁকিঝুঁকি দেয় নানা সংশয়। শ্রীমা তাঁর আচরণ দিয়ে এ-সংশয় ভঞ্জন করেন,

আবার স্বমুখে বলেনঃ 'আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়--সত্য জননী।' শুদ্ধসত্ত্ব-মাতৃভাব ও বেদান্ত-বিঘোষিত ঐক্যভাব সমকেন্দ্রিক, এ-বিষয়ে শ্রীমা স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানদের তিনি নারায়ণভাবেও দেখেন আবার সন্তান-ভাবেও দেখেন।[৩৪] শ্রীমায়ের মাতৃভাবরূপ স্ব-ভাব দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি-উত্তীর্ণ স্নেহ-প্রেম-করুণার বিগলিত ধারায় প্রবাহিত। বিজ্ঞানী শ্রীমায়ের সর্বভূত-হিতে-রতিও মাতৃভাবের প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত। ভক্ত-সন্তানদের কাছে তিনি নিজ নিজ পার্থিব জননীর মতো, আবার সকল জননীর সমষ্টিরূপা ধ্যানলোকের জগজ্জননীরূপেও প্রতিভাত। ছোট একটি ঘটনা। উদ্বোধন-বাড়িতে বাস করছিলেন শ্রীমা। ভক্তদের কেউ কেউ বড়ই উৎপাত করত। প্রৌঢ়পুরুষ ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, মাথা কুটছে, কেউ বা প্রতীক্ষারত অন্যান্যদের কথা ভুলে গিয়ে সাত-কাহন নিজের কথা বলে যেত, কেউ বা পায়ে মাথা রেখে নিশ্চল হয়ে থাকত! একদিন একজন শুয়ে আবদার ধরলেন—তাঁর বুকে শ্রীপাদপদ্ম রেখে তখনই চৈতন্য করে দিতে হবে। এঁদের বোঝানো বা ঠেকানো কঠিন। এসব দেখেশুনে কিশোর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করায় শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'দুঃখী মানুষের ব্যথা কত, বড় হলে বুঝবি। তুই তো মা নস্।'[৩৫] তাঁর সন্তানদের কল্যাণের জন্য তাঁর কী গভীর আকুলতাই না প্রকাশ পেত। জগৎ-জোড়া তাঁর সন্তান। তিনি নিত্য স্নানের পর করজোড়ে প্রার্থনা করতেনঃ 'মা জগদম্বে, জগতের কল্যাণ কর।' তাঁর দীক্ষিত-সন্তানদের জন্য ব্যাকুল-ভাবে নিত্য প্রার্থনা করতেনঃ প্রভু, এদের চৈতন্য করে দাও। মুক্তি দাও। এই সংসারে বেজায় দুঃখকষ্ট। এদের যেন আর সংসারে আসতে না হয়।[৩৬]

বিশ্বমাতৃত্ব ও বিশ্বাত্মৈক্যবোধের মধুর সামঞ্জস্যে গঠিত শ্রীমায়ের ভাবপ্রতিমা। তিনি ঘোর সংসারের মধ্যে থেকেও সাংসারিক গ্লানির ঊর্ধ্বে, তিনি ধ্যানমন্থনে সংগৃহীত অখণ্ডানন্দে পরিপূর্ণ, তাঁর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত অখণ্ডানন্দের পূর্ণঘট। তাঁর জীবনদর্শনে ধর্মসাধন ও সাংসারিক জীবন, ভূমা ও ভূমি, ত্যাগ ও সেবা এক অবিভাজ্য সত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। তাঁর প্রশান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনে ঘটেছে পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের এক অনায়াস সহজ সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাত্যাগী সন্ন্যাসী। অপর-দিকে শ্রীমা সাংসারিক বৃত্তের মধ্যে যেন বদ্ধ; সেখানে ভাইদের স্বার্থবুদ্ধি, ভাইঝি-দের পরস্পর-হিংসা, ছোটমামীর পাগলামি, ইত্যাদি সব নিয়েই তাঁর জীবনযাপন। তিনি অসীম ধৈর্য ধরে সর্বংসহা ধাত্রী-ধরিত্রীর মতো জগৎ-জোড়া তাঁর সন্তানদের মধ্যে বিমূর্ত 'ঠাকুরের' সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সকল সন্তানকে প্রাণ-ঢালা সেবাযত্ন করে তিনি হয়েছিলেন বিশ্বাত্মিকা। 'পরমা মুক্তেহেতুঃ' মহাশক্তি শ্রীমা মাধুর্যরূপী, মমতাময়ী জননীরূপে সন্তানদের মধ্যে বিরাজমানা। শ্রীমায়ের জীবন, তাঁর বিচারবিবেচনা ও দূরদর্শিতা, ক্ষমাশীলতা ও অদোষদর্শিতা, কর্মনিপুণতা ও বিবিক্তি ব্যবহারিকে পটুকে করেছে মুগ্ধ, পারমার্থিকের অনুসন্ধিৎসুকে করেছে প্রলুব্ধ। সাংসারিক ঝড়ঝাপটার বিষমছন্দের দৌরাত্ম্যকে দূর করে সংসারসেবীদের

সৌষ্ঠব-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কৌশল শিখিয়েছিলেন তিনি। এর পিছনেও রয়েছে নববেদান্তের নীতি ও তার সার্থক প্রযুক্তি। নববেদান্তের দাবিঃ ব্রহ্মানুভব সীমিত থাকবে না শুধু সমাধিতে, তাকে প্রযুক্ত করতে হবে সর্বাবস্থায় সর্বকালে।

নববেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন দার্শনিক মত ও ধর্মীয় পথের সমন্বয় সম্ভবপর। শ্রীমায়ের মননালোকেঃ 'ঠাকুর পূর্ণ অদ্বৈত ছিলেন এবং অদ্বৈত প্রচার করতেন।'[৩৭] তাঁর অদ্বৈতানুভূতির বেদীমূলে সংহত ও সমন্বিত হয়েছিল যাবতীয় বিরোধ ও সংশয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি 'জানিবি সকল মতেরই উহা [অদ্বৈতভাব] শেষকথা এবং যত মত তত পথ'[৩৮] প্রমাণ করে যে, দেশভেদে কালভেদে আচারভেদে ও সংস্কারভেদে ধর্মে ধর্মে যে বিবাদ বা বৈষম্য তা ব্যবহারিক মাত্র, পরমার্থত এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অদ্বৈতব্রহ্মবাদেই সর্ববিরোধের অবসান সম্ভব। রামকৃষ্ণানুসারী সমন্বয়ের আলোকে শ্রীমায়ের সহজ স্বাভাবিক শালীনতাপূর্ণ জীবন সমুদ্ভাসিত। বিশেষত, দ্বৈতভাবপুঞ্জের পরিধির মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বের সুষ্ঠু প্রয়োগের কুশলতায় শ্রীমায়ের অতুলনীয় অবদান অনন্যস্বতন্ত্র। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক ভৈরবী, বৈষ্ণব, শৈব, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের প্রতি শ্রীমায়ের ছিল উদার সমদৃষ্টি। সমন্বয়ানুভূতিতে অনুরঞ্জিত শ্রীমা বলতেনঃ 'ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখীর বোল বলি—একটাই পাখীর বোল আর অন্যগুলো পাখীর বোল নয় এরূপ বলি না।'[৩৯] বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব, আচার-অনুষ্ঠান ও পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে মানুষের ঈশ্বরলাভের আকুতিই প্রধান। এই মুখ্য ভাবটিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে শ্রীমা তাঁর নিত্যচর্যা এমনভাবে পরিচালিত করেছিলেন যে, বেদান্তের ভাববিন্যাসের ভারসাম্য কোন অবস্থাতেই বিপর্যস্ত হয়নি। উপরন্তু তাঁর মধ্যে যে-কোন নতুন ধর্মভাব বা ধর্মানুভূতির মর্মমূলে অব্যর্থভাবে প্রবেশ করবার অসাধারণ সামর্থ্য লক্ষ্য করে বিস্ময়-নিবদ্ধ হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

প্রাজ্ঞ রামমোহন রায় অদ্বৈততত্ত্বে নীতিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি খুঁজে পাননি। যীশুখ্রীষ্টের উপদেশের আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। এদিকে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ অদ্বৈতের অবিমিশ্র একত্বের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন নীতিবিজ্ঞানের দৃঢ়তম ভিত্তিভূমি।[৪০] অনাত্মদৃষ্টিতেই রয়েছে আপন-পর ভেদ, আত্মদৃষ্টিতে রয়েছে সর্বব্যাপী

একত্ব অখণ্ডত্ব। এই মহান্ তত্ত্বে অটলভাবে আস্থাশীল ছিলেন বলেই শ্রীমায়ের আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত অটুট স্নেহপ্রীতি-সহানুভূতি কল্যাণস্রোতের ন্যায় অজস্রধারায় প্রবাহিত। জগতের হিতার্থে তাঁর সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনায় পর্যবসিত। বেদান্তবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়ের নীতিজ্ঞানের একটি উদাহরণ উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। লর্ড কারমাইকেলের আক্রমণাত্মক ভাষণের পর সরকার-ঘেঁষা হিতৈষীরা রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয় প্রাক্তন বৈপ্লবিক সমিতির সদস্য যাঁরা সঙ্ঘে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সরিয়ে দিতে। শুনে শ্রীমা বললেনঃ 'ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ মিশন হয়েছে; রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যাঁরা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে, নয়তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।'[৪১]

সন্তান আবদার করে যাই চাক না কেন, নীতিবিজ্ঞানী কল্যাণময়ী শ্রীমা সন্তানের চাওয়াকে ঊর্ধ্বায়িত করে দিতেন লৌকিক বা অলৌকিক উপায়ে। শ্রীমা বলতেনঃ 'সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে।'[৪২] তিনি ভগবানের নিকট নির্বাসনা প্রার্থনা করতে উপদেশ দিতেন। তিনি আরও বলতেনঃ 'মায়া কাটিয়ে কাটিয়ে নির্বাণ হবে—ভগবানে মিশে যাবে। বাসনা হতেই তো দেহ।...একেবারে নির্বাসনা হল তো সব ফুরাল।'[৪৩]

বেদান্তমতে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। উপাধিমুক্ত জীবই শিব। শ্রীমায়ের জীবন শিব-জ্ঞানে জীবসেবার ভাবে সংশুদ্ধ। তাঁর সেবাকাজে যেমন দুর্লভ সংযম, অপার সহিষ্ণুতা ও সর্বস্ব-ত্যাগের ত্রিবেণীসঙ্গম, তেমনই ভগবদ্ভাবের অন্তহীন ঐশ্বর্য। কন্যা, ভগিনী, জায়া, জননী ও গুরু রূপে তিনি তাঁর অ-মায়িক সেবাযত্নের দ্বারা সকল মানুষ তথা প্রাণিবর্গকে আপনার করে নিয়েছিলেন। শ্রীমা বলেছিলেন তাঁর স্বসংবেদ্য অনুভবঃ '"সকলেই যে ঠাকুরের" এটা মনে থাকলে সকলকেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। আমার একবার এমন অবস্থা হল যে, নৈবেদ্য থেকে পিঁপড়েটাকে পর্যন্ত তাড়াতে পারিনে, বোধ হল যেন ঠাকুর আছেন।'[৪৪] যে-ই শ্রীমায়ের নিকটে আসত সে-ই তাঁর মিষ্টবাক্য, সস্নেহ-ব্যবহার, অফুরন্ত সহানুভূতিতে মুগ্ধ হত। শ্রীমা সারদামণি তত্ত্বত সর্বভূতান্তরাত্মা, আবার ব্যবহারিকে তিনিই প্রত্যেকের স্নেহশীলা জননী। সামগ্রিকভাবে তিনি বিশ্ব-হিতার্থে সদা-জাগ্রত মাতৃমূর্তি। বৃদ্ধা, বিশীর্ণ-দেহ মাঝি-বউ তার রোজগেরে ছেলের মৃত্যুতে কাঁদতে থাকে। শ্রীমায়ের প্রাণ উদ্বেল হয়ে ওঠে। তিনি দরদরিতধারে অশ্রু বিসর্জন করেন। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন। পুত্রহারার শোক কিছুটা প্রশমিত হলে শ্রীমা নিজেকে সংবরণ করেন। মাঝি-বউকে মিষ্টকথায় প্রবোধ দেন। তাকে একখানি কাপড় দেন। আর একটি ঘটনা। শ্রীমা জয়রামবাটীতে। বাঁড়ুজ্যেবাড়ির এক অনাথা বিধবা কানের যন্ত্রণায় মৃত্যুর দ্বারে উপনীত। ক্ষতের দুর্গন্ধে রোগীর নিকটে যাওয়াও দুঃসাধ্য। খবর পেয়েই শ্রীমা রোগীর কাছে যান। নিমপাতা ও গরম জল দিয়ে ঘা ধুয়ে দিয়ে আসেন। তাঁর আদেশে অসহায় মহিলাকে কোয়ালপাড়া আশ্রমে

আনা হয়, চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করা হয়। কিন্তু রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না· শ্রীমা সেবকদের বলেছিলেনঃ 'আহা! তোমরাই তার ছেলের কাজ করলে, বাবা।' মানবসাধারণের জন্য তাঁর সমবেদনা যেমন পরিব্যাপ্ত তেমনই গভীর। তাঁর কণ্ঠে নিত্য শোনা যেত প্রার্থনাঃ 'সব ভাল থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক।' তিনি কর্মী-সন্তানদের বলতেনঃ 'বাবা, জগতের হিত কর।' জীবকল্যাণের জন্য তাঁর আকৃতি সুপরিস্ফুট তাঁর একটি বাণীতেঃ 'মনে হয় যতক্ষণ ঘুমুব, ততক্ষণ জপ করলে জীবের কল্যাণ হবে।'[৪৫]

বর্তমান যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বেদান্তের আদর্শে জীবনের সর্বপাদে অভ্যুদয়। যাবতীয় প্রগতিমূলক শুভকর্মে শ্রীমা প্রেরণা দিতেন, সে-সকলের সাফল্যে হর্ষপ্রকাশ করতেন, ব্যর্থতায় দুঃখিত হতেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য ছিল তাঁর অফুরন্ত দরদ ও সহানুভূতি। গৌরী-মার আশ্রম, নিবেদিতার স্কুল ইত্যাদিতে লেখাপড়া, চারুশিল্প, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি সব কিছুই শ্রীমায়ের বরাভয়স্পর্শে সঞ্জীবিত। আলোচ্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য স্বামী শিবানন্দের মন্তব্যঃ 'দেখ না, মার আগমনের পর থেকেই সব দেশের নারীজাতির মধ্যে কি অভিনব জাগরণ শুরু হয়েছে। ...মেয়েদের ভিতর আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়ে অতি আশ্চর্যজনক জাগরণ এসেছে, আরও আসবে। এসব ঐশী শক্তির খেলা।'[৪৬]

রাজরাজেশ্বরী শ্রীমা সাধ করে কাঙালিনী সেজে কিভাবে সংসারধর্ম পালন করছেন তার একটি মনোজ্ঞ রূপরেখা এঁকেছেন স্বামী প্রেমানন্দ। দীনবেশে শ্রীমা অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, অতুলনীয় অভিমানরাহিত্য আশ্রয় করে পাঁকাল মাছের মতো, বড়লোকের বাড়ির ঝিয়ের মতো সংসার করেছেন। তিনি একাধারে আদর্শ ভাববাদী ও তত্ত্বপ্রয়োগকুশলী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কল্পনার অতীত, বুদ্ধির অগোচর যোগসূত্রে শ্রীমায়ের চতুর্দিকের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু মননশীল ব্যক্তিমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, শ্রীমা স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি যুক্তিনিষ্ঠাভিত্তিক নীতির অনুসরণ করেছেন। তিনি বলতেনঃ 'আমাদের যা কিছু, সবের মূল ঠাকুর—তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।' দ্বিতীয়ত, তাঁর অনুসৃত নীতি প্রসঙ্গে বলতেনঃ 'দেখ, সব বনিয়ে-বানিয়ে চলতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "শ, ষ, স"—সব সয়ে যাও, তিনি আছেন।' তৃতীয়ত, তিনি স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে অনুসরণ করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নীতিঃ 'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন।' এখানে মন্ত্রদীক্ষাদান সম্পর্কে শ্রীমায়ের বিভিন্ন আচরণ উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। কলকাতায় শ্রীমা অধিকাংশ সময় উদ্বোধনের ঠাকুরঘরে বসে দীক্ষা দিয়েছেন। আবার দিয়েছেন সেই বাড়ির বারান্দায়, গ্রামের বাড়িতে ছাউনির আড়ালে। গ্রামের প্রান্তরে আসনের অভাবে দুগাছা খড় বিছিয়ে, এমনকি রেলস্টেশনে পর্যন্ত মন্ত্র দিয়েছেন। তিনি দীক্ষা দিয়েছেন বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে—অবস্থানুসারে দিনের যে-কোন সময়ে।

প্রার্থীর জাতপাত অগ্রাহ্য করেছেন। দীক্ষার্থী স্নান বা উপোস করেছে কিনা এসব ছিল গৌণ। প্রার্থীর আন্তরিকতা, ব্যাকুলতাই ছিল প্রধান বিবেচ্য।

বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুসারে শ্রীমা অপরের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। কর্মী-সন্তানকে মিষ্টস্বরে বলতেনঃ 'বাবা, এটা করলে ভাল হয় না?' কর্মকৌশল হিসাবে তিনি বলতেনঃ 'দেখ, সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।' তিনি নিজে কাউকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না, এমনকি ঝাড়ুটিকে গুছিয়ে রাখতেন, পরিত্যক্ত ফলের ঝুড়িটি কুড়িয়ে এনে রাখতেন। শ্রীমায়ের শিক্ষা ছিলঃ 'অপচয় করতে নেই, অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিত হন।' তিনি কখনই কঠোর ছিলেন না, যদিও ছিলেন দৃঢ়চিত্তা। তাঁর অনুসৃত কর্মপন্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মৃদুতা। কঠোরে-কোমলে সংমিশ্রণের চাইতে স্বভাব-মধুর মৃদুতাই ছিল তাঁর জীবনের চালচিত্রের মাধুর্য। মৃদুতার শক্তি অসীম। মহাভারতকার বলেনঃ

মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্তি দারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিত্তস্মাত্তীক্ষ্ণতরো মৃদুঃ॥

—মৃদুতা দিয়ে কঠোর বা অকঠোরকে জয় করা যায়। মৃদুতা দিয়ে অভিভূত হয় না এমন কিছুই নাই : সুতরাং মৃদুতাই তীক্ষ্ণ অস্ত্র। শ্রীমায়ের জীবনচর্যায় শরতের শিশিরকণার মতো মৃদুতাই শক্তি, কার্যকারিতাই সুষমা। তাঁর কর্মপন্থার অপর একটি বিশেষত্ব, তিনি উদ্দেশ্যের উপর যেমন গুরুত্ব দিতেন তেমনি দিতেন উপায়ের উপর। বরঞ্চ সময়ে সময়ে তিনি উপায়ের শুদ্ধতার উপর মূল্য দিতেন বেশী। সামগ্রিক বিচারে উপায় ও উপেয়ের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য তাঁর জীবনবৃত্তকে করেছিল মহিমামণ্ডিত।

স্বরূপে পূর্ণতার অধিকারী হয়েও মানুষ বিচিত্র বিভ্রান্তি-বিপাকে নিজেকে ক্ষুদ্র সীমিত করেছে, ভোগাধিকার-তারতম্যে মত্ত হয়ে উঠেছে, নির্মম নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা পশুত্বে অবরোহণ করেছে। এই দুর্বল সীমিত মানুষের প্রতি শ্রীমায়ের ঐক্যানুভূতি-ভিত্তিক সমত্ববোধ পর্যবসিত হয়েছে অফুরন্ত মমত্বে, সর্বজীবে-প্রসারিণী মাতৃত্বে। ভোগাসাম্য ও বিশেষাধিকারের দাবি নিরাকৃত হয়েছে সহজভাবেই। শ্রীমায়ের সাম্যচেতনা বেদান্তভিত্তিক এবং গণজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সমদর্শী শ্রীমা বলছেনঃ 'ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে।'[৮১] তিনি বিনয়াবনতচিত্তে নিজের সম্বন্ধে বলেছেনঃ 'আমি ভিখারি রমণী।' তিনি ভিখারিনী মেয়ের উপহার পেয়ারা ও ভুঁতে মুসলমানের দেওয়া কলা সাদরে গ্রহণ করেন, পশ্চিমা কুলীকে রেলস্টেশনেই সিদ্ধমন্ত্রে অভিষিক্ত করেন, আবার রুগ্ন স্বামীর মঙ্গলপ্রার্থী ধনী-গৃহিণীর বিলাসিতায় বিরক্তিবোধ করেন। চৌকিদার অম্বিকা বাগদিকে নিঃসংকোচে বলেনঃ 'তুমি আমার অম্বিকা-দাদা, আমি তোমার সারদা-বোন।' জনৈক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভক্ত পতিতের প্রতি শ্রীমায়ের দরদপূর্ণ আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ করলে শ্রীমা স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি যেমন সতের মা তেমনি অসতেরও মা।

সেসময়ে জাতপাত ও ছুঁৎমার্গের দোর্দণ্ডপ্রতাপ! কিন্তু বেদান্তবিজ্ঞান শ্রীমায়ের মানসিকতাকে করেছিল সংকীর্ণতামুক্ত। গোঁড়া বামুনের মেয়ে হয়ে তিনি অজ পাড়াগাঁয়ে 'ছত্রিশ জাতের এঁটো' কুড়িয়েছেন, বিদেশিনী ম্যাকলাউড ও নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে আহার করেছেন। আবার দেশপ্রথাকে মান্য করেও জয়রামবাটীতে সকল কর্মী-সন্তানকে একপাতে মুড়ি ও জিলিপি খাইয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীমায়ের দৃষ্টিতেও ভক্তের কোন জাত নেই, অথবা সকল ভক্ত মিলে গড়ে ওঠে একটি বিশেষ জাত। তিনি বলেছিলেনঃ 'শুদ্দুর কে, গোলাপ ? ভক্তের জাত আছে কি ?' তিনি বৈদ্য,[৪৮] শূদ্র[৪৯] বা বারুজীবী-বংশীয়[৫০] লোকের ছোঁয়া বা তৈরী খাবার খেতে দ্বিধা করেননি। জাতিভেদপ্রথার সূক্ষ্ম বিধিনিষেধ না মানাতে শ্রীমা অর্থদণ্ড দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দৃঢ় নরনারায়ণ-প্রত্যয় হতে বিচ্যুত হননি। ছুঁৎমার্গের মতো শুচিবায়ুকে একরকমের ব্যাধি বলেই মনে করতেন। তিনি বলতেনঃ 'শুচিবাই যত বাড়াবে ততই বাড়বে।...মনেতেই সব—মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।' তেমনিভাবে অন্ধবিশ্বাসের কুহেলিকা, যুক্তিহীন দেশাচার, প্রচলিত ধর্ম-ধারণার রোমান্স ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে শ্রীমা নীরব ও দৃঢ় প্রতিবাদস্বরূপ —স্বচ্ছ স্বানুভূতি ও নির্মোহ যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁর জীবন-প্রাঙ্গণ সু-আলোকিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানালোকে উদ্ভাসিতা চৈতন্যময়ী জগন্মাতা জগতের কল্যাণের জন্য রক্তমাংসে গড়া সারদাপ্রতিমার রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনার সিদ্ধিবিগ্রহ। এই বিগ্রহই শ্রীমা-রূপে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের কল্যাণযজ্ঞে আত্ম-সমর্পিত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা সর্বনিয়ন্ত্রী।

শ্রীমা নববেদান্তের পরিপূর্ণ আদর্শকে নিজের জীবনে তিলে তিলে বিকশিত করেছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অমিয় জীবন-তীর্থ। সেই তীর্থের অনেক ঘাট। কোন ঘাটে তিনি দেবী, কোন ঘাটে মানবী, আবার কোন ঘাটে অবতারসঙ্গিনী, কিন্তু সর্বত্রই তিনি অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা মুমুক্ষু যে-ঘাটে অবতরণ করেই তীর্থোদক গ্রহণ করুক, সে জানতে-অজানতে নববেদান্ত-সম্পৃক্ত যুগোপযোগী ভাবামৃতই গ্রহণ করছে। শ্রীমায়ের ছোটখাট কথা ও কাজ, ধ্যান ও ধারণা সব কিছুর মধ্য দিয়েই নিঃসৃত হয়েছে বেদান্তসুধা, তাঁর সকল সাধারণ আচরণের মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিয়েছে বিজ্ঞানীর প্রত্যয়ের বিচ্ছুরণ।' তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের আচ্ছাদক আবরণটি তাঁর অকৃত্রিম মাতৃত্ব, যার স্নিগ্ধ যাদুস্পর্শে মানুষ পেয়েছে মনঃকষ্টে সান্ত্বনা, শঙ্কায় অভয়, নির্ভরসায় বিশ্বাস। করুণাপাথার শ্রীমা অঙ্গীকার করেছেনঃ 'ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি।'[৫১] জীবনলীলার প্রত্যন্তে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ 'আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।' কল্যাণশক্তিভূ, সদাজাগ্রত চিন্ময়ী শ্রীমায়ের জীবনতীর্থে ক্রমেই বাড়ছে তৃষিত-তাপিত মানুষের ভিড়—সেই তীর্থোদক পান করে মানুষের জীবন হচ্ছে অমৃতায়িত, মানুষ হচ্ছে অভয়, মানুষ লাভ করছে পরম শান্তি ও পরিতৃপ্তি।

নবজাগরণ, সমাজ-বিবর্তন ও শ্রীমা সারদাদেবী

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের নবজাগরণ বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতেঃ 'এটি ছিল প্রকৃতই এক নবজাগরণ, যা ব্যাপকতায়, গভীরতায় এবং বৈপ্লবিকতায় কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতনের পরবর্তী ইউরোপীয় নবজাগরণকেও অতিক্রম করেছে।'[১] ইউরোপীয় 'রেনেসাঁসের' সঙ্গে তুলনা না করেও স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, আমাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে এই নবজাগরণের ফলেই। প্রথম দিকে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে এর প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকলেও কালক্রমে তা 'বহতা' নদীর মতোই গতিপথে প্রসারতা লাভ করেছে, এবং এক হিসাবে আজও তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। একথা সম্ভবত অস্বীকার করা চলে না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসারই এই নবজাগরণের প্রাণশক্তি জুগিয়েছিল। পশ্চিমের উদার-মতাবলম্বী ধ্যান-ধারণা ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ফলে আমাদের চিরাচরিত সমাজব্যবস্থা এবং প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে বাঙালীর মনে সংশয় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়, এবং ধীরে ধীরে সমাজে এক নতুন মূল্যবোধ জেগে ওঠে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ হতেই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের বাসনা জাগে, ভাষার সংস্কার ও নতুন সাহিত্য রচনা শুরু হয়ে যায়, এবং পরিণামে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ও স্বাধীনতালাভের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এক আমূল পরিবর্তন দেখা যায় এই নবজাগরণের ফলে। এককথায়, বিগত দুই শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস বহুলাংশে আমাদের নবজাগরণ-আন্দোলনের কাহিনী।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হলেও এই নবজাগরণ-আন্দোলন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশ ভারতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় ভাবধারার দ্বারা পুষ্ট হতে থাকে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তরে যে মোহজাল বিস্তার করেছিল, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তা অনেকটা ছিন্ন হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে তারা ক্রমশ আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, এবং দেশের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চার দ্বারা নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয়ের ভিত্তিতে এক নতুন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলবার

চেষ্টা আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে স্বামী বিবেকানন্দ যে এই সমন্বয়-আন্দোলনের একজন প্রধান হোতা ছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখেছেনঃ 'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ...গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'[২] প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়-প্রচেষ্টার এই মূল প্রেরণা শুধু স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে নয়, সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মধ্যে, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী ও প্রেরণাদাত্রী সারদাদেবীর জীবনচর্যায়ও আমরা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি। শ্রীরামকৃষ্ণের 'সমন্বয়ে'র আদর্শ শুধু ধর্মজীবনে নয়, সমাজজীবনেও তাঁরা রূপায়িত করেন।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই শ্রীমা সারদাদেবীর বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রাম্য পরিবেশে, যেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব তখনও বিশেষ অনুভূত হয়নি। সেকালের আরও পাঁচটি দরিদ্র গ্রাম্য বালিকার মতোই সাংসারিক কাজে পিতামাতাকে সাহায্য করে ও ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন যাতায়াত করলেও বিদ্যাভ্যাসের বিশেষ সুযোগ তিনি তাঁর বিবাহের পূর্বে বা পরে কখনও পাননি। প্রাপ্তবয়সে দক্ষিণেশ্বরে ও শ্যামপুকুরে (উত্তর কলকাতা) বাংলা বই পড়তে ভালোরকম শিখলেও তিনি কখনও নিজ হাতে চিঠিপত্র লিখেছেন বলে জানা যায় না।[৩] অথচ, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন তাঁর আধ্যাত্মিক ভাব সারা বিশ্বে প্রচারের দায়িত্ব নেন, অপরদিকে সারদাদেবী তেমনি এই ভাবপ্রচারের কেন্দ্রে অবস্থান করে শ্রীরামকৃষ্ণের অগণিত শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীদের চিত্তে ঐ ভাবের গভীরতা সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের উভয়ের কার্যপ্রণালীকে পরস্পরের পরিপূরক বলে গণ্য করা যেতে পারে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের গঠন ও বিস্তারের পশ্চাতে এঁদের উভয়ের প্রেরণাই সমান বলবতী ছিল বলা চলে।

বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবনে একটি পার্থক্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। আক্ষরিক অর্থে সন্ন্যাসী না হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিনই সাংসারিক দায়-দায়িত্ব বিশেষ গ্রহণ করেননি, সংসারকে তিনি যেন বাইরে থেকে স্পর্শ করে ছিলেন। সারদাদেবীর জীবন কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে ঘোর সংসারীর জীবন, যদিও লোককল্যাণে তাঁর তপস্যার কোনদিনও নিবৃত্তি হয়নি, এবং সংসারের মধ্যে বাস করেও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। জীবনের প্রায় শেষ অধ্যায়

পর্যন্ত সাংসারিক দায়-দায়িত্ব বহন করার ফলে সারদাদেবী সংসারী, সমাজবদ্ধ জীবের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন এবং প্রচলিত অর্থে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ না করলেও তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে আমাদের নানাবিধ সামাজিক সমস্যার সমাধান সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

॥ ৩ ॥

সারদাদেবীর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল তাঁর উদার, প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, যা বিশ্বের সকল মানুষকে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সহজেই আপনার করে নিতে পারত। তাঁর কাছে বিদেশী-স্বদেশী, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান, অথবা ব্রাহ্মণ-শূদ্র-চণ্ডালের কোন ভেদ ছিল না। যে-ই তাঁর কাছে সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবনের জ্বালা জুড়োতে আসত, অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করত, তাকেই তিনি আপন সন্তানের মতো গ্রহণ করতেন, এবং তার ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী পথ চলার নির্দেশ দিতেন। এই উদারতার কারণ তাঁর দেশ-কাল-সমাজের পরিবেশের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এটি তাঁর অন্তর্নিহিত মহত্ত্বেরই প্রতিফলন। স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে যখন ইংরাজ-বিদ্বেষ ও বিলাতি দ্রব্য বর্জনের প্রবণতা বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেই সময় সারদাদেবী জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলেছিলেন যে, বিলাতের লোকেরাও তাঁর সন্তানস্থানীয়, অর্থাৎ তাদের তিনি কখনও পরিত্যাগ করতে পারেন না। অথচ, ইংরাজ-শাসন যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেদের দুর্গতির জন্য বহুলাংশে দায়ী, একথা তাঁর অজানা ছিল না। ভক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার তাঁর সম্মুখে ইংরাজ-শাসনে ভারতের বৈষয়িক উন্নতির কথা উল্লেখ করলে তিনি সব কথা শুনে মন্তব্য করেন: 'কিন্তু বাবা, ঐ সব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিলোনি।'[৪] বিবেকানন্দের আইরিশ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি সম্পূর্ণ আপনজনের মতোই গ্রহণ করেছিলেন, এবং কলকাতায় নিজের কাছে (১০।২ নং বোসপাড়া লেন) কিছুদিন তাঁকে বসবাস করবার অনুমতিও দিয়েছিলেন। এক 'ইস্টার' দিবসে নিবেদিতার মুখে ইংরেজীতে খ্রীষ্টান ধর্মসঙ্গীত শুনে তিনি 'সুগভীর ভাবাত্মীয়তা' প্রকাশ করেন। আবার একদিন তাঁর আগ্রহে নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন তাঁর কাছে ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতির বর্ণনা করেন। সমস্ত ব্যাপারটি তিনি আগাগোড়া উপভোগ করেন। তাঁদের বিবাহ-প্রতিজ্ঞাটি শুনে তিনি অভিভূত হয়ে যান। নিবেদিতা লিখেছেন: 'কিন্তু বিবাহ-প্রতিজ্ঞাটি শুনে তাঁর মনে যে ভাবোদয় হল, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। "সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শক্তিতে অশক্তিতে যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে,"—কথাগুলি শোনা-মাত্র সকলেই "আহা-হা!" করে উঠলেন আনন্দে, কিন্তু শ্রীমার পরিতৃপ্তিই সর্বাধিক। বার বার কথাগুলি তিনি শুনতে চাইলেন; বার বার বললেন, "কী অপূর্ব ধর্মকথা!

কী অপূর্ব ধর্মকথা!"'[৫] বিবেকানন্দের অপর এক শিষ্যা ওলি বুলের অনুরোধে তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলা হওয়া সত্ত্বেও বিদেশী 'ফটোগ্রাফারের' সম্মুখে বসে নিঃসঙ্কোচে তাঁর আলোকচিত্র তোলান। স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্রে জানা যায় (মার্চ ১৮৯৮) যে, সারদাদেবী একদিন কলকাতায় স্বামীজীর কিছু ইউরোপীয় ও মার্কিন শিষ্যাদের সঙ্গে একত্রে আহারও করেছিলেন।[৬] সেকালের একজন অল্প-শিক্ষিতা, গ্রাম্য পরিবেশে লালিতা, ব্রাহ্মণ-বিধবার পক্ষে এ ধরনের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি বিভিন্ন প্রয়োজনে শ্রীমার শরণাপন্ন হয়ে তাঁর কৃপা লাভ করেছে, এমন নিদর্শন অজস্র রয়েছে। দরিদ্র মুসলমান শ্রমিক আমজাদকে আপন গৃহমধ্যে খাবার পরিবেশন করে তার উচ্ছিষ্ট স্থান স্বহস্তে পরিষ্কার করতে তাঁর কোনও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়নি। জনৈকা আত্মীয়া এই ব্যাপারে অনুযোগ করলে সারদাদেবী তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেনঃ 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।'[৭] জনৈকা অ-ভারতীয়া খৃীষ্টান মহিলার কন্যা মায়ের আশীর্বাদে রোগমুক্তা হলে মহিলাটি মায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও বহুদিন তাঁর কাছে যাতায়াত করতে থাকেন।[৮] বোম্বাই হতে আগত এক অপরিচিত পারসী যুবকও মায়ের শরণার্থী হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা লাভ করেন।[৯] এইসব ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভক্তেরা অনেকে এবং স্বধর্মীয় ভক্তেরাও কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষাভাষী ছিলেন, কিন্তু দীক্ষাদানের সময় ভাষার ব্যবধান সারদাদেবীর কাছে কোনদিনও প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি। দীক্ষার সময় তিনি তাঁর বক্তব্য সরল বাংলা ভাষাতেই প্রকাশ করতেন, এবং দীক্ষার্থীরাও তার মর্ম গ্রহণ করতে সক্ষম হত। এটি তাঁর ভাবপ্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতারই পরিচায়ক।[১০]

অসাধারণ উদারতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সারদাদেবীর প্রখর বিচারবুদ্ধি, যা তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য বহন করছে। বিবেকানন্দ-শিষ্যা শ্রীমতী ওলি বুল সারদাদেবীর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন—গুরুর প্রতি আনুগত্য বলতে কি বোঝায়? উত্তরে সারদাদেবী বলেনঃ 'কাউকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক বিষয়ে নিজের সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কাজ করলেই—সে কাজ যদি কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুর অননুমোদিত হয় তবুও—গুরুকে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।'[১১] আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশ লৌকিক ব্যাপারে অলঙ্ঘনীয় নয়, এরকম কথা সারদাদেবীর মতো স্বচ্ছচিন্তাশীলা ও চারিত্র-শক্তিযুক্তা মহিলাই অম্লানবদনে বলতে পারতেন। এই প্রখর বিচারবুদ্ধির জন্যই মায়াবতী

অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজার বিরোধিতাকে সমর্থন করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি।[১২]

॥ ৪ ॥

জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক ছিল। ভক্তদের মধ্যে জাতিবিচার কখনই না করার উপদেশ প্রায়ই সারদা-দেবীর মুখে শোনা যেত। স্বামী ঈশানানন্দের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, একবার তিনি স্বগ্রাম জয়রামবাটীতে তাঁর রক্ষণশীল আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টি এড়িয়ে এক অস্পৃশ্য বাগদি যুবককে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[১৩] আর একবার, ঐ গ্রামের বাড়িতেই, জগদ্ধাত্রী পূজার পর, তাঁর বিভিন্ন জাতের ভক্তকে, সাধু-ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ নির্বিচারে, একই পাত্র হতে মুড়ি ও জিলিপি খেতে দেন। মায়ের আচার-আচরণ দেখে তাঁর গ্রামবাসীর মনেও এই ধারণা জন্মেছিল যে, ভক্তেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, তাদের মধ্যে কোন সামাজিক ব্যবধান রাখা চলে না।[১৪] আপন পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ শ্মশানে বহন করে নিয়ে যাবার সময় তিনজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক শূদ্র ভক্তও ছিলেন। এই ব্যাপারে সঙ্গিনী গোলাপ-মা অনুযোগ করলে সারদাদেবী বলেছিলেনঃ 'শূদ্দুর কে, গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?'[১৫] অন্তত দুটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের বয়স্ক কায়স্থ ভক্তের পদধূলি নিতে বলেছিলেন বলে জানা যায়।[১৬] যেযুগে সমুদ্রযাত্রা করলে হিন্দুর জাতিনাশ হত, এবং নিয়মমাফিক প্রায়শ্চিত্ত করে আবার জাতে উঠতে হত, সেইযুগে সারদাদেবী স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্মপ্রচারের জন্য পাশ্চাত্য দেশে যেতে উৎসাহ দিয়েছিলেন, একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

প্রচলিত অর্থে শ্রীমা অবশ্যই সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। সময় সময় লোকাচার বা দেশাচারকে তিনি মেনে নিয়েছেন। কোন দীর্ঘকাল-প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত না করে ধীরে ধীরে তার বিরোধী নতুন ভাব বা নতুন প্রথাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। জাতিভেদপ্রথার বিধিনিষেধও এইভাবে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রথমে লঙ্ঘন করে সারদাদেবী এক নতুন ভেদবিহীন সমাজের আদর্শ ধীরে ধীরে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-সংস্কারের আদর্শও অনুরূপ ছিল। 'আমার সমরনীতি'-শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন যে, আধুনিক ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ ছিল কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। 'তাঁদের প্রণালী—ভেঙে-চুরে ফেলা, আমার পদ্ধতি—সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।'[১৭] প্রাচীন ঐতিহ্যকে সরাসরি আক্রমণ না করে তার মধ্যে নতুন ভাব

সঞ্চারের দ্বারা তাকে যুগোপযোগী করে তোলাই ছিল এঁদের কাম্য। ধ্বংসে নয়, সৃষ্টিতেই ছিল এঁদের আগ্রহ।

॥ ৫ ॥

জাতিভেদপ্রথার মতোই স্ত্রীশিক্ষা বা নারীপ্রগতির সম্বন্ধে সারদাদেবীর দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও উদার ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, সারদাদেবী নিজের জীবনে লৌকিক শিক্ষালাভের সুযোগ বিশেষ পাননি। ব্যক্তিগত আচরণে তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলা ছিলেন, এবং সেযুগের অধিকাংশ ভদ্র, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মহিলার মতো তাঁরও চলাফেরার অবাধ স্বাধীনতা ছিল না। তা সত্ত্বেও ভগিনী নিবেদিতার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে তাঁর আন্তরিক সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'নিবেদিতার কর্মশক্তির তিনি প্রশংসা করিতেন এবং সুধীরা দেবী প্রভৃতি নিবেদিতার আদর্শে স্বাধীনভাবে নারীশিক্ষায় ব্রতী রহিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এক স্ত্রীভক্তের অবিবাহিতা পাঁচটি কন্যার জন্য দুশ্চিন্তার কথা শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে"।'[১৮] বস্তুত, উত্তর কলকাতার বোসপাড়া লেনে এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় সারদাদেবী স্বহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার্চনা করেন, এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করা হয়।[১৯] তিনি যে মধ্যে মধ্যে এই বিদ্যালয়ে গিয়ে এখানকার ছাত্রীদের উৎসাহিত করতেন, তা-ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়।[২০] আপন দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, এবং এঁদের একজন, রাধু, বিবাহের পরে চোদ্দ বছর বয়সেও মিশনারী-পরিচালিত বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন। সঙ্গিনী গোলাপ-মা এই ব্যাপারে আপত্তি জানালে সারদাদেবী তাঁকে নিরস্ত করে বলেন যে, এতে দোষের কিছু নেই, বরং লেখাপড়া ও হাতের কাজ শেখার ফলে রাধুর শ্বশুরালয়ের মহিলাদের ও তাঁদের প্রতিবেশিনীদেরও উপকার হওয়া সম্ভব।[২১] স্বগ্রাম জয়রামবাটী যাওয়ার পথে কোয়ালপাড়া গ্রামে সারদাদেবী মধ্যে মধ্যে কয়েকদিন বিশ্রাম করে যেতেন এবং সেখানে তিনি একটি আশ্রমেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কোয়ালপাড়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও সারদাদেবী আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী না পাওয়া যাওয়ায় তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি। শ্রীমা তাঁর জনৈক শিক্ষাব্রতী সন্তানকে জয়রামবাটী অঞ্চলেও মেয়েদের লেখাপড়া এবং কাজকর্ম শেখাবার বন্দোবস্ত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মেয়েরা সূচীশিল্প, ধাত্রীবিদ্যা এসবও শিখুক

—মায়ের এইরকম অভিপ্রায় ছিল।[২৩] তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে গৌরী-মার 'সারদেশ্বরী আশ্রমে'র একটি বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ বালিকার ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়, যদিও গৌরী-মা নিজে ইংরেজীর চেয়ে সংস্কৃত শিক্ষার বেশী পক্ষপাতী ছিলেন।[২৪] আধুনিক সমাজে নেতৃত্ব করতে হলে ইংরেজী শেখা প্রয়োজন, মা একথা বুঝেছিলেন।

শুধু শিক্ষার অধিকার নয়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণের এবং শাস্ত্রপাঠ ও পূজার্চনার অধিকারও সারদাদেবী স্বীকার করতেন। গৌরী-মার আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী মহিলারা তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। মাতৃভবনে তিনি স্বহস্তে ঠাকুরের নিত্যপূজো করতেন, এবং নিজে অক্ষম হলে অন্য কোন মহিলাকে দিয়ে পূজো করাতেন।[২৫] কোয়ালপাড়া আশ্রমেও তিনি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবীকে ঠাকুরের পূজা স্বহস্তে করবার নির্দেশ দেন।[২৬] গৌরী-মার বিদ্যাবত্তা বাগ্মিতা ও তেজস্বিতার তিনি বিশেষ প্রশংসা করতেন। আধুনিক যুগের মেয়েরা গৌরী-মা বা নিবেদিতার আদর্শে গড়ে উঠুক—এই ছিল মায়ের অভিলাষ।

সেযুগে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক ছিল মেয়েদের বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা। ভদ্রঘরের হিন্দু মেয়েদের আট থেকে বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম। বিবাহের পর সন্তানধারণ এবং একান্নবর্তী পরিবারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় মেয়েরা খুব কম ক্ষেত্রেই লেখাপড়া করার সুযোগ পেতেন। ছেলেদেরও অনেকের কুড়ি বছর বয়সের পূর্বেই ছাত্রাবস্থায় বিবাহ সম্পন্ন হত। সারদাদেবী কিন্তু পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। সেসময় দুজন মাদ্রাজী তরুণী কুড়ি-বাইশ বছর বয়সেও নিবেদিতার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। শ্রীমা তাদের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেনঃ 'আহা, তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে! আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছরের হতে না হতেই বলে, "পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও!" আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হত, তাহলে কি এত দুঃখ-দুর্দশা হত?' মায়ের এক সহোদর ভক্তদের কালীমামা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের মাত্র এগারো বছর বয়সে বিবাহের আয়োজন করে মাকে কলকাতায় পত্রযোগে সেই সংবাদ জানালে, শ্রীমা কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিলেনঃ 'ছোট ছোট ছেলের বিয়ে দিচ্ছে—আমার কাছে [মত] আদায় করে নিচ্ছে। আখেরে যে কষ্ট পাবে তা জানে না।'[২৭] হিন্দুদের প্রায় সমস্ত প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে মেয়েদের বাল্যবিবাহ আবশ্যিক বলে নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সারদাদেবীর উদার মুক্তিনিষ্ঠ মন এই প্রাচীন সামাজিক অনুশাসনকে সমর্থন করতে পারেনি।

॥ ৬ ॥

আত্মসংযমে বিশ্বাসী ও বিলাসিতার ঘোরতর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সারদাদেবী

অকারণ কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং এই ব্যাপারে আমাদের হিন্দুসমাজ যে নারীজাতির প্রতি সুবিচার করেনি, একথাও তিনি জানতেন। বালবিধবা শবাসনা দেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখে সারদাদেবী তাঁকে বলেনঃ 'আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি, তুই জল খা।' অপর এক মহিলা, সুরবালা দেবী, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে বাকি জীবন কাটাবার প্রস্তাব করলে তিনি তাঁকে বলেনঃ 'আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়...।' সারদাদেবী আপন বৈধব্যদশায়, একাদশীর দিন দেশাচার অনুযায়ী অন্নগ্রহণ না করলেও সামান্য লুচি খেতেন। তাঁর সহচরী যোগীন-মা এবং গোলাপ-মাও কখনও ঐ তিথিতে নির্জলা উপবাস করতেন না।[২৮] বালবিধবা ক্ষীরোদবালা রায়কে অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন করতে দেখে সারদাদেবী তাঁকে সাবধান করে বলেনঃ 'দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা?'[২৯] বাহ্য পরিচ্ছন্নতা রক্ষার আধিক্য সেযুগের বহু মহিলাকে শুচিবায়ুগ্রস্তা করে তুলত। এই শুচিবায়ুর সঙ্গে যে মানসিক পবিত্রতার কোন সম্পর্ক নেই, এবং এক হিসাবে এই শুচিবায়ু যে মানসিক মালিন্যের বহিঃপ্রকাশ, একথাও সারদাদেবী তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর এক নিকট আত্মীয়াকে তিনি একবার বলেছিলেনঃ 'বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? শুচিবাই! মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।...আর শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে।' আর একবার ঐ আত্মীয়াকেই তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেনঃ 'আমি তো দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার "গোবিন্দ, গোবিন্দ" বললুম, বস্, সব শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব—মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।'

আরও নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে, ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহারে সারদাদেবীর দেশাচার লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এইসব দেশাচার, লোকাচারের সঙ্গে প্রকৃত ধর্মজীবন যাপনের যে কোনও যোগ নেই, বরং এগুলি মানুষের মনকে অনেক সময় সংকীর্ণ করে তোলে এবং কখনও কখনও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যচ্যুত করে, এই কথাই শ্রীমা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতেন।[৩১] সামান্য দেশাচার দূরে থাক, মায়ের এক কায়স্থ ভক্ত রাজেন্দ্রকুমার দত্ত উপবীত ধারণের বিষয়ে মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে (নভেম্বর ১৯১৬) মা তাতেও কোন আপত্তি করেননি। তবে উপবীত ধারণ করলে যাতে তার সদ্ব্যবহার ও মর্যাদা রক্ষা করা হয়, তার প্রতি তাঁকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলেন।[৩২] ধার্মিক ব্যক্তিমাত্রেই সামাজিক রক্ষণশীলতার ধ্বজাধারী, এরকম ধারণা বর্তমান কালে যুবসমাজের মধ্যে অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, সারদাদেবীর জীবন আলোচনা করলে তা বোঝা যায়। স্বামী বিবেকানন্দও দেশাচার-লোকাচারকে আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের সঙ্গে সংযোগহীন বলে বিবেচনা করতেন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক প্রগতির প্রতিবন্ধক এইসব আচার-

পালনকে পাগলামি বলে অভিহিত করতেন।[৩৩] উচ্চশিক্ষিত, ইউরোপ-আমেরিকা-প্রত্যাগত বিবেকানন্দের সঙ্গে স্বল্পশিক্ষিতা, রক্ষণশীল পরিবেশে লালিতা, পল্লী-বালা সারদাদেবীর দৃষ্টিভঙ্গির এক মৌলিক সাদৃশ্য এখানে লক্ষিত হয়। শ্রীমার অসাধারণত্বের এটি আর একটি নিদর্শন।

॥ ৭ ॥

সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে, একথাও সারদাদেবীর অজানা ছিল না। তাই বংশ-কৌলীন্য, বিত্ত-কৌলীন্য, বা বিদ্যা-কৌলীন্য না থাকলেও তিনি প্রতিটি মানুষকে তার মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করতেন না। একবার কলকাতায় মায়ের বাড়িতে অসময়ে আগত এক ভিখারিকে ভিক্ষা না দিয়ে বিদায় করা হলে মা দুঃখ করে বলেনঃ 'যার যা প্রাপ্য, তা হতে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত? এই যে তরকারির খোসাটা, এও গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।'[৩৪] মায়ের এক ভক্ত জাতিতে যুগী ছিলেন বলে মায়ের কাছে যাতায়াতে তাঁর খুব সংকোচ ছিল। মা নিজেই একদিন তাঁকে ডেকে বলেনঃ 'তুমি যুগী বলে সঙ্কোচ করছ? তাতে কি, বাবা? তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।' তিনি ঐ ভক্তকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি দীক্ষাদানের সময় তাঁকে জাতের কথা কখনই জিজ্ঞাসা করেননি।[৩৫] মনে রাখতে হবে, সেই সময় হিন্দুসমাজে যুগীদের স্থান খুব নীচে ছিল। আপন পরিবারে তিনি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ এবং আশ্রিত ব্যক্তিদেরও যথাযথ সম্মান দিয়ে বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[৩৬] কথাপ্রসঙ্গে তিনি একবার এক ভক্তকে বলেছিলেনঃ 'যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়।'[৩৭] সংসারে অপরের দোষত্রুটি বড় করে দেখা বা কারও ব্যর্থতার জন্য কঠোর সমালোচনা করাও তাঁর মনঃপূত ছিল না। এ-বিষয়ে সারদা-দেবীর একটি বিখ্যাত উক্তি—'ভাঙতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে কজনে?'[৩৮]—আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত। •

॥ ৮ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের মতো সারদাদেবীও বিশ্বাস করতেন যে, সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও সমাজের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। তাছাড়া, খুব কম সন্ন্যাসীর পক্ষেই নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকা সম্ভব। যে-সময় সন্ন্যাসী ঈশ্বরচিন্তা, বা আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করছেন না, সেই সময়টুকু তিনি সেবামূলক

কাজ নিয়ে থাকলে সংসারের প্রভূত কল্যাণ, এবং সন্ন্যাসীরও নিষ্কাম কর্ম অভ্যাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি-সাধন সহজ হয়। সেবক স্বামী ঈশানানন্দকে সারদাদেবী একদিন স্পষ্টই বলেনঃ 'সব সময় জপধ্যান করতে পারে কজন? প্রথমটা একটু সাধনভজন করে, শেষে...অহংকার হয়। ...মনটাকে শুধু বসিয়ে না রেখে, আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভালো। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার এসব দেখেই তো এইসব কাজের পত্তন করলে।'[৩৯] ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্যের বিশদ বিবরণ শুনে সারদাদেবী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।[৪০] কাশীতে সেবাশ্রমের সেবাব্রত দেখেও (১৯১২) তিনি প্রীত হয়ে মন্তব্য করেনঃ 'এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।' শুধু মৌখিক সমর্থন নয়, ঐ সেবাকার্যের আনুকূল্যের জন্য তিনি অর্থদানও করেন।[৪১] স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত সন্ন্যাসীদের সমাজসেবা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের ঠিক অনুকূল নয় বলে ঠাকুরের কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শিষ্যের ধারণা ছিল। 'কথামৃত'-প্রণেতা মাস্টারমশায় স্বয়ং এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কাশীতে 'সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ' মায়ের এই উক্তি শুনে তিনি তাঁর ধারণা পরিবর্তন করেন।[৪২] সারদা-দেবী নিজেও সব সময় কাজ নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, দেশে যখন খুব বস্ত্রাভাব, তখন জয়রামবাটীর কাছে, কোয়ালপাড়া আশ্রমে, চরকা ও তাঁতের কাজ চলছে দেখে তিনি তাতে বিশেষ উৎসাহ দেন এবং বলেনঃ 'আমাকেও একখানা চরকা এনে দাও, আমিও সুতা কাটব।'[৪৩]

॥ ৯ ॥

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মূলত সংসারে অনাসক্তা এবং নিরন্তর ঈশ্বরভাবে ভাবিতা হলেও রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভক্তজননী তথা সঙ্ঘজননী শ্রীমা সামাজিক মানুষের সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিতা ছিলেন, এবং আমাদের সামাজিক বিবর্তনের যে-বিশেষ পর্যায়ে তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন সেই পর্যায়ের মানুষদের সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে মূল্যবান দৃষ্টান্ত ও নির্দেশ তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যখন ভারতবাসীর, বিশেষত শিক্ষিত ভারতীয় হিন্দুর, জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধেই সংশয় জেগেছিল, সেই সময় সারদা-দেবী এমন এক পথের নির্দেশ দেন যেখানে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও নতুন যুগের উপযোগী মূল্যবোধ গড়ে তোলা সম্ভব। ধর্ম যে সামাজিক প্রগতির অন্তরায় নয়, সংযম ও চিত্তশুদ্ধির অর্থ যে প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়, এবং মত-পথ নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসার ও প্রাপ্য মর্যাদা দানের ভিত্তিতেই যে বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব ভাবীকালে গড়ে উঠতে পারে—শ্রীমা সারদা-দেবীর জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দেয়।

জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে মা সারদা

॥ ১ ॥

সমাজ বদলায়; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি সাংস্কৃতিক পরিবেশও বদলায়; কিন্তু সে অনুপাতে মৌল জীবনজিজ্ঞাসা বদলায় না। তার কারণ হল এই যে, জীবনের যে সীমিত অংশটুকু আমরা জানি, সেই সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের জীবনজিজ্ঞাসা পরিবর্তনশীল, আর যে অংশটুকু আমরা জানি না, বৃহত্তর সেই অংশটি সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসা অপরিবর্তনীয়। যুগযুগান্ত ধরে 'সত্তার নূতন আবির্ভাব'[১] ঘটছে, ঘটছে তিরোভাবও। আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তিরোভাবের পর আবির্ভাব—এ ধারার বিরাম নেই। আর 'আমি কে?', 'কোথা থেকে এসেছি?', 'কোথায় যাবো?' —এসব জিজ্ঞাসারও অন্ত নেই। উদয়াচলে যে-জিজ্ঞাসা, 'পশ্চিমসাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়'[২] সেই একই জিজ্ঞাসা। সেই মূল জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে জীবনের আর সব জিজ্ঞাসা। আমরা জানি আর না জানি, এই হল চিরন্তন বস্তুস্থিতি।

হাজার হাজার বছর আগে ঋষি অঙ্গিরাকে গৃহস্থাগ্রণী শৌনক প্রশ্ন করেছিলেনঃ কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি?[৩]—হে পূজ্য ঋষি, কি জানলে এ সমস্তই জানা যায়? শৌনকের সে-প্রশ্ন আজকের মানুষেরও প্রশ্ন।

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী থেকে আমরা শৌনকের ঐ চিরকালের প্রশ্নের উত্তর পাই। উত্তর পাই, ঐ মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তনশীল অন্য সব প্রশ্নের, যুগে যুগে দেশে দেশে যাদের রং-রূপ বদলায়।

॥ ২ ॥

মূল প্রশ্নটি নিয়ে আমরা সবশেষে আলোচনা করব। জীবনবৃত্তের যে অংশটুকু আমাদের চোখের নাগালের ভিতর রয়েছে, প্রথমে সেই-বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনা শুরু করছি।

আজ বিশ্বমনস্কতার দিন। মননশীল ব্যক্তিমাত্রেই নিজ নিজ দেশ ও জাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। তাঁরা দেখছেন, গোড়ায় গলদ! আজকের আন্তর্জাতিকতা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেক্ষেত্রে সব জাতীয়তাবাদেরই প্রতিষ্ঠাভূমি হওয়া উচিত আন্তর্জাতিকতা। তাই বিশ্ব-ঐক্য সম্মেলন হচ্ছে বেশ কিছুকাল থেকেই। কয়েক বছর আগে দিল্লিতে

ত্রৈবার্ষিক ষষ্ঠ বিশ্ব-ঐক্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন (Triennial World Union International Convention) অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৪] চারদিনের এই সম্মেলনের চারটি আলোচনা-চক্রে রাষ্ট্রসংঘকে রাষ্ট্রাতিগ (Supra-national) সংস্থায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-সরকার, বিশ্ব-আইন, বিশ্ব-আদালত, বিশ্ব-ভাষা, বিশ্ব-ধর্ম-দর্শন-নীতি, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। আনন্দের বিষয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত পাঁচশতাধিক প্রতিনিধির মধ্যে ভারতের এক বিদুষী নারী[৫] 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-মন্ত্রের রূপায়ণে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের অনুপম দানের বিষয় উল্লেখ করে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।

আজকের পৃথিবীর প্রথম মৌল জিজ্ঞাসা এই যে, এইসব মহৎ সম্মেলনের সাধু উদ্দেশ্য কিভাবে সফল হতে পারে?—কি উপায়ে বিশ্ব-ঐক্য সাধিত হতে পারে? এর উত্তর রয়েছে সারদা-মার শেষ উপদেশে। তিনি বলেছিলেনঃ 'জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'[৬] শ্রীশ্রীমায়ের এই উপদেশটি যদি ব্যষ্টিজীবনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্প্রচারিত করে রূপায়িত করা যায়, তবেই বিশ্ব-ঐক্যের পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে।

॥ ৩ ॥

আজকের ভারতীয় জনজীবনের আর একটি বড় জিজ্ঞাসা হলঃ ভারতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম হতে চলেছে কিনা। ১ নভেম্বর ১৮৯৬, কুমারী মেরী হেলকে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিতে[৭] এবং অন্যত্রও[৮] স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, বৈশ্য বা বণিকের রাজত্বের পর শূদ্র অর্থাৎ শ্রমিকদের রাজত্ব আসবেই আসবে—কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। ভগিনী ক্রিস্টিনও তাঁর লেখা স্বামীজীর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে, স্বামীজী বলেছিলেন, পরবর্তী বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা একটা নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটাবে, তা আসবে রাশিয়া বা চীন থেকে। স্বামীজীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে ক্রিস্টিন মন্তব্য করেছেন যে, স্বামীজী যে-কালে ঐকথা বলেছিলেন, তখন চীন বা রাশিয়ার অবস্থা যা ছিল, তাতে দুনিয়ার মধ্যে এ দুটি জাত যে একটা নতুন যুগের সূচনা করতে পারে তা সাধারণ চিন্তাশীল মানুষের কাছে অসম্ভাব্য বলেই মনে হয়েছিল।[৯] ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, স্বামীজী

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিন-উল্লেখিত উক্তিটি করেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় বা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারই ভবিষ্যদ্বাণী স্বামীজী করেছিলেন।[১০]

ক্রিস্টিন-লিখিত স্বামীজীর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে, এবং কোন সন্দেহ নেই, মেরী হেলকে লেখা ১ নভেম্বর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য হবে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমজীবীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষও বাদ যাবে না। এ-সম্পর্কেও স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।[১১] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এদেশে রাশিয়া বা চীনের ধাঁচের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র হবে কি? ভারতবর্ষের ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দীর্ঘ ইতিহাস এবং স্বামীজীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায়ঃ না—একেবারেই না। আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের মর্ম সম্পর্কে এদেশের চাষাভুষোরা পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত দার্শনিকদের চেয়ে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল[১২] একথা স্বামীজীর সময় পর্যন্ত যেমন সত্য ছিল, আজও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। ভারতের সাধারণ মানুষ আজ অবশ্য জানে না কোন্ দার্শনিক ভিত্তির উপর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেদিন তারা সে-বিষয়ে অবহিত হবে, সেদিন নিঃসন্দেহে তারা কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) জড়বাদী দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে আর তখনই হবে খাঁটি ভারতীয় সমন্বয়ী সাম্য-বাদের প্রতিষ্ঠা। মার্কসের দর্শনের মূল কথা হল চৈতন্য জড়ের ধর্ম। মার্কসের মতে এই চৈতন্যই মন। মন আর আত্মা একই বস্তু—এই ধারণা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ছিল উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত।[১৩] সে যাই হোক, চৈতন্য যে জড়ের ধর্ম—একথা এদেশের চার্বাকরাও বলত। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মার্কস একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, যাঁর চিন্তা ও কর্ম পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছে। তিনি সারাজীবন অধ্যয়ন করেছিলেন। তবে তাঁর পঁয়ষট্টি বছরের জীবনের শেষ চল্লিশ বছরই কাটে অর্থনীতির অধ্যয়নে ও চর্চায়। প্রথম জীবনে তাঁর অধ্যয়নের

মূল বিষয় ছিল দর্শন এবং তিনি এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বস্তুজগতের বাইরে বা ভিতরে কোনও অলৌকিক বা ঐশ্বরিক সত্তা নেই। এও চার্বাকদেরই কথা। মার্কস নিশ্চয়ই পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এদেশের চার্বাকরাও পাণ্ডিত্যে বা প্রতিভায় কম ছিলেন না। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, হিন্দুদর্শনে চৈতন্য ও জড় পৃথক্ নয়। হিন্দুদর্শন মতে জড়ও চৈতন্য, কেবল সেখানে চৈতন্য আবৃত। চৈতন্য সর্বত্র বিরাজিত, কোথাও প্রকট কোথাও অপ্রকট। বিশেষ অবস্থায় তার প্রকাশ, কিন্তু তার মানে নতুন সৃষ্টি নয়। যা অব্যক্ত ছিল, অবস্থাভেদে তা ব্যক্ত হয়। তার মানে এই নয় যে, তার নতুন সৃষ্টি ঘটল। জড় ক্রমবিকাশের পথে চৈতন্যে পরিণত হয়নি, অনুকূল অবস্থার গুণে তার অন্তর্নিহিত চৈতন্যের প্রকাশ ঘটেছে এই মাত্র। ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা এই মত মেনে নিতে চলেছেন। তার লক্ষণ দেখছি। বিভিন্ন জড়পদার্থ কোন সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সংমিশ্রিত বা সম্মিলিত হলে তাদের মধ্যে যে নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটে তা-ই চৈতন্য, আর সেই সংগঠনটি ভেঙে গেলে চৈতন্যেরও ঘটে বিলুপ্তি—এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে চার্বাকরা যে-শাণিত যুক্তি দেখিয়েছেন হিন্দুর ষড়্দর্শন তার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এই কারণে যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে ষড়্দর্শন বেদ-নির্ভর। তার মধ্যে বিশেষ করে মীমাংসক আর বেদান্তীদের কাছে বেদ অপৌরুষেয় ও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ—বেদবিরুদ্ধ কোন যুক্তি তাঁরা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। সুতরাং, বেদ-নিরপেক্ষ কোনও যুক্তি দিয়ে চার্বাক-মত খণ্ডন করার মাথাব্যথা তাঁদের ছিল না। অপরদিকে বৌদ্ধরাও বেদ মানতেন না। কিন্তু পাণ্ডিত্যে বৌদ্ধ দার্শনিকরা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। আর তাঁরাই চার্বাকদের শাণিত যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছিলেন তাঁদের ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে। নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি, শান্তরক্ষিত প্রমুখ বিরাট বৌদ্ধ দার্শনিকদের পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। এইসব বৌদ্ধ দার্শনিকদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারধারা পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তাধারাকেও প্রভাবিত করেছে বিগত পাঁচশ বছর যাবৎ।[১৩] সুতরাং যা হিন্দুদের দ্বারা বেদের সাহায্যে এবং বৌদ্ধদের দ্বারা যুক্তির সাহায্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সেই জড়বাদী চার্বাক দর্শনের ভিত্তির উপর গড়া কোন মতবাদের সৌধই এদেশের মাটিতে টিকবে না। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, ধর্মই এদেশের প্রাণ—একথা স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলীতে অসংখ্যবার বলেছেন। এদেশের ধর্ম প্রচার করে—চৈতন্যই আমাদের প্রকৃত সত্তা। সবার মধ্যে এক চৈতন্য, কেবল প্রকাশের তারতম্য। এই আদর্শকে ভিত্তি করেই ভারতীয় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস লিখেছিলেনঃ 'ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিং।' আর তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়সের এই উক্তিটিই ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মোক্ষম কথা[১৪] হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ কোন্ ধর্ম? ক্ষমতালিপ্সু পুরোহিত-প্রভাবিত

আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্ম। যীশুর উদার প্রেমের ধর্ম নয়, মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ যা ধর্ম বলে অভিহিত সেই অভীঃ ও প্রেরণাবর্ষী ধর্ম নয়, ধনী ও রাষ্ট্রের প্রসাদপুষ্ট এবং পাপ-পুণ্যের ধাঁধায় নিমজ্জিত যুক্তিবিহীন সংকীর্ণতার ধর্ম। মার্কসের উপরোক্ত মত যতই প্রচারিত হোক, মনে-প্রাণে ভারতবাসী তা কখনই নেবে না। কেননা, ধর্মবিযুক্ত কোন মত ভারতবর্ষে চলতে পারে না।[১৬] তবে মার্কসের সাম্যবাদে অনেক ভাল কথাও আছে। সেগুলি অবশ্য যে একেবারেই নতুন, এমন কথা বলা চলে না। বুদ্ধ, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রমুখ ধর্মাত্মারা সাম্যবাদের সেইসব তত্ত্ব তাঁদের জীবন ও বাণীর মাধ্যমে প্রচার করে গেছেন এই ভারতের পুণ্যভূমিতে। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীমা সারদাদেবীও তা-ই করেছেন। তবে, বলাই বাহুল্য, এঁদের সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূল উৎস অতীন্দ্রিয় অনুভূতি - যা মার্কসীয় মতবাদের নাগালের বাইরে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের একটা খুব ভাল কথা হল - যার যা ক্ষমতা, তদনুযায়ী কাজ নাও ; যার যা অভাব, তা মেটাও। কিন্তু মানুষের অভাবটা কি শুধু থাকা, খাওয়া-পরা, আর চিকিৎসার? মানুষটা কি শুধুই স্থূলদেহ? যা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন অভাবও অনেক আছে এবং তা মেটাতে হবে অপরা ও পরা বিদ্যার সাহায্যে। কিন্তু তা বলে স্থূল অভাবকে অস্বীকার করা চলে না। শ্রীমা সারদাদেবী কিভাবে অপরের স্থূল অভাবও মেটাতে এবং যার যা প্রয়োজন, তাকে ঠিক তা-ই দিতে সর্বদা আগ্রহী ছিলেন, ভারতীয় সাম্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সে-প্রসঙ্গ এখানে উপস্থাপিত করছি।

স্বামী সারদেশানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা'য় লিখেছেনঃ '[মা] নিজে যে সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরই উপযোগী এবং যতদিন ব্যবহার করা চলিত তাহা ত্যাগ করিতেন না ; এমনকি ব্যবহৃত বস্ত্রাদি সেলাই করিয়াও পরিতেন, যতদিন চলিত। নূতন মূল্যবান বস্ত্রাদি অকাতরে বিলাইয়া দিতেন।'[১৭]

'ভক্তেরা অনেক সরু পাড়ওয়ালা কাপড় দেন তাঁহাকে [শ্রীশ্রীমাকে], তাঁহার নিজের সামান্যই প্রয়োজন, সেইসব অকাতরে বিতরণ করেন ছেলেমেয়েদের।...কাহারও কাহারও কাপড় শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়, —মা তাহাকে বেশী কাপড় দেন। খাওয়া, জল খাওয়া সব ব্যাপারেই সর্বদা যে যেমন চায়, যার পেটে যেরূপ সয়, মা তাহাকে ঠিক সেরকমই দেন। কী আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল মার, ভাবিয়া অবাক হই! জয়রামবাটীতে বিভিন্ন স্থানের ভক্ত সমাগত হইলে মা রাঁধুনী মাসীকে ঠিক বলিয়া দিবেন, কে কি খাইবে, কত পরিমাণ ; এমনকি রুটির সংখ্যা পর্যন্ত! তাই, মায়ের বাড়িতে মায়ের কাছে খাইয়া সন্তানদের এত তৃপ্তি! ঠাকুরের কথায় "মা ঠিক জানে, কোন্ ছেলের পেটে কি সয়!"'[১৮]

'উদ্বোধনে'র এক কর্মচারীর দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। তাঁর বাড়িঘর কীর্তিনাশা পদ্মার জলে ভেসে যায়। তাঁর বিপদের কথা শুনে মা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে গোপনে তাঁকে তিনশ টাকা দেন। মায়ের সেই অর্থসাহায্যে তিনি দেশে গিয়ে নতুন জমি কিনে আত্মীয়স্বজনদের থাকার ব্যবস্থা করে 'উদ্বোধনে' ফিরে আসেন। ষাট-সত্তর বছর আগে তিনশ টাকার মূল্য কম ছিল না আর শ্রীশ্রীমার নিজের কী-ই বা সঙ্গতি ছিল! তবু তিনি এতটা করেছিলেন! 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা'য় স্বামী সারদেশানন্দ এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেনঃ 'এইরূপ কত বিচিত্র ঘটনা যে উদ্বোধনে ঘটিত, তাহার ইয়ত্তা নাই।'[১৯]

তেমনই যার যা ক্ষমতা, যে যতটুকু পারে, মা তাকে ততটুকুই কাজ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য রামচন্দ্র দত্তের গৃহভৃত্য লাটু চলে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমাকে বলেনঃ 'এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ত্ব।...তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বলো, এ করে দেবে।'[২০] লাটু মাকে গৃহস্থালির কাজকর্মে সাহায্য করতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়ঃ 'নোটো (লাটু) চড়েই রয়েছে (সর্বদাই ভাবেতে রয়েছে)। ক্রমে লীন হবার যো!'[২১]

অনেক পরের ঘটনা। কিন্তু যে-ভাবতন্ময়তা লাটুকে পেয়ে বসেছিল, তার বিরাম ছিল না। তাই একদিন যখন শ্রীশ্রীমা লাটুকে বাজার করে আনতে বললেন, লাটু উত্তর দিলেনঃ 'এখন হামি যেতে পারবো না...হামার এখন ওসব হাঙ্গামা পোয়াতে মন যায় না।' মা বললেনঃ 'তোর গিয়ে কাজ নেই, থাক তুই যোগীনকে ডেকে দে।'[২২] শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁর মানসপুত্রের (রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আধ্যাত্মিক অবস্থা লক্ষ্য করে বলছেনঃ 'রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়! (আমার) সেবা করতে বড় পারে না।'[২৩] লাটু কিংবা রাখালের এই যে 'অক্ষমতা',

এটা প্রচলিত কোন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ দিয়ে বোঝা যাবে না। মানুষ তো শুধু রক্তমাংসের শরীর নয়। তার বাইরেও আছে তার মন এবং বুদ্ধি. এবং এসবেরও ঊর্ধ্বে আছে আর একটি সত্তা। এই সবগুলি নিয়েই একটি মানুষ। তাই মানুষের ক্ষমতা-অক্ষমতা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার করতে গেলে এর প্রতিটিকেই হিসেবে আনতে হবে। সুতরাং 'ফ্রম ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ ক্যাপাসিটি, টু ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ নীড'—এই নীতির পরিপূর্ণ ও সার্থক রূপায়ণ ভারতীয় সাম্যবাদই করতে পারে—আধ্যাত্মিকতাবর্জিত অন্য কোন সাম্যবাদ নয়। আধ্যাত্মিক মানুষেরই দৃষ্টি সর্বতোভাবে স্বচ্ছ হয়—তাঁর পক্ষেই অপরের সর্ববিধ অভাবের স্বভাবও অনুপুঙ্খ জানা সম্ভব।

আগামী দিনে ভারতে কি ধরনের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে, তার হদিস আমরা পাই শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচর্যায়। নানা দিক থেকে তাঁর জীবন ও বাণী পর্যালোচনা করলে সেই সাম্যবাদের যথার্থ রূপটি পরিস্ফুট হবে। আমরা এখানে দু-একটি দিক নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করেছি।

॥ ৪ ॥

আজকের দিনে ভারতীয় জনজীবনের একটি প্রধান জিজ্ঞাসা হলঃ পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি-আন্দোলন ভারতীয় নারীদের কতদূর প্রভাবিত করবে এবং তার পরিণাম কি হবে?

এর উত্তর স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রে সূত্রাকারে আছে। স্বামীজী লিখেছিলেন যে, মা-ঠাকুরানী ভারতে মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন এবং তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব ঘটবে।[২৮] স্বামীজীর এই উক্তি-সূত্রকে উপজীব্য করে বিষয়টির আলোচনা করা যেতে পারে। তার আগে পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি-আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। পাশ্চাত্যের নারীদের মধ্যে যাঁরা এই আন্দোলনের পুরোধা বা সমর্থক, তাঁরা চান ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসা, রাজনীতি, প্রশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষদেরই মতো সমান তালে চলতে এবং সমান পারিশ্রমিকে, সমান সুযোগ-সুবিধায়, সমান শর্তে ও সমান সম্মানে চাকুরীতে বহাল হতে। তাঁরা চান না, পুরুষরা তাঁদের উপর আধিপত্য করবেন—যে-আধিপত্য পুরুষরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এতকাল ধরে করে এসেছেন। এমনকি তাঁরা চান না, পুরুষরা নারীদের অবলা মনে করে বীর সেজে সাহায্যের হাত এগিয়ে দেবেন।

নারীমুক্তি-আন্দোলনের শরিকরা চান, পুরুষরা সমাজজীবনে যে-পদমর্যাদা পান, তাঁদেরও তা দিতে হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না, যদি অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে। তাই অর্থনৈতিক পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়ে তাঁরা থাকতে চান না। এ-প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন মহাসচিব কুর্ট ভালডহাইমের এক রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে।

তিনি বলেছেন, পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটে নারীদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে এবং আইন প্রণয়ন করে তার প্রতিকার করা দরকার।[২৫]

নারীমুক্তি-আন্দোলনের সমর্থকদের আরও বক্তব্য এই যে, মান্ধাতার আমল থেকে পুরুষরা নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করে আসছেন স্বাধীনভাবে কিন্তু নারীদের তা করতে দেওয়া হয়নি কোনকালেই। এ অবস্থা চলতে পারে না। নারীদেরও এ-ব্যাপারে সমান স্বাধীনতা থাকা চাই।[২৬]

পাশ্চাত্যে নারীমুক্তি-আন্দোলনের সমর্থকদের বক্তব্যসমূহে ন্যায্য কথা যে কিছুই নেই, তা নয়, যথেষ্টই আছে। নারীরা যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকবেন, এটা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তাঁদের সব বক্তব্যই এদেশের নারীদের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রায় আশি বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেনঃ 'সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে ; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে।'[২৭] এই ধরনের আরও বহু বিপরীত দৃশ্যের অবতারণা করে স্বামীজী দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য আদর্শের সংস্পর্শে এসে ভারতবাসীর মনে কি প্রতি-ক্রিয়া হতে শুরু করেছিল এবং তখনই তিনি 'পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ'রূপ 'প্রবল বিভীষিকা' সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়ে ভারতের নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং যাতে আমরা সেই আদর্শ বিস্মৃত না হই তার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।[২৮] সমাজে পরিবর্তন ঘটবেই। আমাদের দেশের নারীও আর শুধু অন্তঃপুরচারিণী থাকতে পারেন না। জীবনযুদ্ধে তাঁরা পুরুষের সমান অংশীদার। কিন্তু এই জীবনসংগ্রামেও ভারতীয়

পুরুষের আদর্শ হবেন সর্বত্যাগী 'উমানাথ শঙ্কর' এবং ভারতীয় নারীর আদর্শ হবেন সেবা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী। এ আদর্শ সামনে রেখে আধুনিক ভারতের পুরুষ ও নারী উভয়েই অগ্রসর হবে এই স্বামীজী চেয়েছিলেন।

স্বামীজী যে-সময়ে ঐ সাবধানবাণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তখন পাশ্চাত্য নারী-মুক্তি-আন্দোলন এত তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি। এই আন্দোলনের বর্তমান উগ্র গতি-প্রকৃতি দেখেশুনে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, এর ফলে নারীদের নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়ানুগ জীবনযাপনের পথই সম্ভবত সুগম হচ্ছে। কারণ, বিবাহ ও দাম্পত্য-জীবনের সুস্থ ও পবিত্র দিকটিকে অনেক নারীই আজকাল অস্বীকার করছেন।

কিন্তু শ্রীশ্রীমাকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র জগতে গার্গী, মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব ঘটবে, স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের নিশ্চিন্ত করে। মা বিবাহকে একটি অচ্ছেদ্য পবিত্র মিলন বলে মনে করতেন। নিবেদিতা লিখেছেন, মা একদিন তাঁকে আর তাঁর গুরুভগিনীকে ইউরোপের বিবাহপদ্ধতির বর্ণনা করতে বলেন। মায়ের কথামতো তাঁরা পুরোহিত, বর ও কনের ভূমিকা অভিনয় করে দেখালেন। তারপর যখন তাঁরা বিবাহের শপথবাক্যটি বললেন—'সম্পদে-বিপদে, ঐশ্বর্যে-দারিদ্রে, রোগে-স্বাস্থ্যে—যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে...'—তখন উপস্থিত সকলেই ঐ কথাগুলি শুনে আনন্দপ্রকাশ করলেও মা যেমন প্রশংসা করলেন, এমন আর কেউ-ই না। মা বারংবার ঐ কথাগুলি আবৃত্তি করালেন এবং বললেনঃ 'আহা, কী অপূর্ব ধর্মভাবপূর্ণ কথা!'[২৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ বলেছিলেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের পর থেকেই নারীদের ভিতর আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়ে অতি আশ্চর্যজনক জাগরণ এসেছে, আরও আসবে। এসব ঐশী শক্তির খেলা। সাধারণ মানুষ এসবের গূঢ় মর্ম কিছুই বুঝতে পারে না।[৩০]

সুতরাং বর্তমান নারীমুক্তি-আন্দোলন ভাবীকালে ভারতে তথা বিশ্বে কি রূপ নেবে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কি পাশ্চাত্যে, কি এদেশে, যেসব নারীরা ইন্দ্রিয়ানুগ জীবনের জন্য আন্দোলন করছেন, তাঁদের শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য দাম্পত্যজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। ব্যাপক-ভাবে মায়ের জীবন ও বাণী বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হওয়া দরকার। তবেই এই নারী-মুক্তি-আন্দোলনের মোড় ফিরে যাবে এবং এর ভিতরে ভাল যা-কিছু আছে, তার সার্থক প্রকাশ ঘটবে।

॥ ৫ ॥

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী একটি পত্রে লিখেছিলেনঃ 'হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য

তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো? তোমরা তাদের ছোঁও না, "দূর দূর" কর। আমরা কি মানুষ? ...এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।'[৩১] আরও একাধিক পত্রে স্বামীজী ভারতীয় সমাজজীবনের এই দুঃসহ চিত্রটি তুলে ধরেছেন। ষাট বছর পরে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বক্তৃতায় ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেনঃ 'আমরা আমাদের শাসনতন্ত্রে সাম্য ও সৌভ্রাত্রবিষয়ক ধারা সংযোজিত করেছি। আমরা এদেশের মুখমণ্ডল থেকে অস্পৃশ্যতার কালিমা মুছে ফেলতে চাই। এসব এখনও স্বপ্ন, এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।'[৩২] তারপর আরও ত্রিশ বছর হয়ে গেছে, এখনও হরিজন-নিগ্রহ অবাধে চলেছে। তাই আজও আমাদের সমাজজীবনের এই আকুল জিজ্ঞাসাঃ জাতির এ কলংকমোচন এতদিনেও হল না কেন এবং কিভাবে হবে?—হল না এইজন্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী, গান্ধীজীর বাণী যতটা ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি। শ্রীশ্রীমায়ের কথা আমরা আলোচনা করছি। হিন্দু বিধবা ব্রাহ্মণী হয়েও মা তথাকথিত ম্লেচ্ছ নিবেদিতা-প্রমুখ বিদেশিনীদের সংগে একত্রে ভোজন করতে সঙ্কুচিত হননি। ১৮৯৮ খৃীষ্টাব্দে স্বামীজী বেলুড় মঠ থেকে একটি চিঠিতে তাঁর এক গুরুভাইকে লিখেছিলেনঃ 'শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ভাবতে পারো, মা তাঁদের সাথে একসঙ্গে খেয়েছিলেন! ...এটা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?'[৩৩]

'ভক্তের জাত নেই'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বাণী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বহু ঘটনায় বাস্তবায়িত দেখা যায়। কিন্তু যারা ভক্ত নয় তারাও মায়ের স্নেহের স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছে, চোর-ডাকাতও জেনেছে তারা মায়েরই সন্তান। অন্ত্যজদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। মা অবশ্য পাশ্চাত্যপন্থায় সমাজবিপ্লবের সূচনা করে জাতবিচারের বিরুদ্ধে প্রচারকাজ শুরু করেননি। তিনি চেয়েছেন, পরিবর্তন আসুক ভেতর থেকে। শ্রীচৈতন্য-প্রমুখ মহান্ ধর্মনেতারাও তা-ই করেছেন। প্রতি জীবের হৃদয়শায়ী শ্রীভগবানকে যিনি দেখতেন, সেই মায়ের কাছে 'দুলে-বাগদি-ডোম', হিন্দু-মুসলমান-খৃীষ্টান সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাই যে-কোন জাতের, যে-কোন ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে এসেছে, তারা শান্তি পেয়েছে, তাঁর সুগভীর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছে। মা বলেছিলেনঃ 'সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি—তবে তো মনে দীনভাব আসবে।'[৩৪] মায়ের এই দিব্যবাণী এবং তাঁর পবিত্র জীবনের সশ্রদ্ধ অনুধ্যান যদি আমরা করি, তাহলে সমাজজীবন থেকে অস্পৃশ্যতার কালিমা দূর করার পথে নিঃসন্দেহে আমরা অনেকদূর এগিয়ে যাব।

॥ ৬ ॥

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির জীবনে বহু জিজ্ঞাসা রয়েছে। সেগুলির উত্তর আমরা পেতে পারি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীতে। কথাটা অতিশয়োক্তি শোনাবে, কিন্তু তবু সত্য। নমুনা হিসেবে কয়েকটির উল্লেখ ও আলোচনা আমরা করেছি। এগুলি চিরন্তন জীবনজিজ্ঞাসা নয়—যেকথা আমরা এই নিবন্ধের শুরুতেই বলেছি। এখন উপসংহারে সব দেশের, সব কালের, সব মানুষের জীবনজিজ্ঞাসায় আসছি।

বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানুষের সমস্ত কর্মের মূলে আছে দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু হাজারে একজনও জানে না আসল সুখ কোথায় এবং কিভাবেই বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হতে পারে। তাই বিষয়ের মধ্যেই মানুষ সুখ খোঁজে। কিন্তু বিষয়ভোগে যে-সুখ আছে, তা ক্ষণিক এবং বিষয়লালসার ফলে মানুষ যেপথ ধরে, তাতে অনিবার্যভাবেই পায় আঘাত। আঘাতের পর আঘাত। এ আঘাত ঈপ্সিত যদি তার দ্বারা মানুষের প্রকৃত জীবনজিজ্ঞাসা শুরু হয়। যেপথে যুগে যুগে অধ্যাত্মপথিকরা অগ্রসর হয়ে পরিশেষে চিরশান্তির অধিকারী হয়েছেন, সেই পথের সন্ধান করে দুঃখ-পরিক্লিষ্ট মানুষ; ক্রমে শাস্ত্র ও মহাজনদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে জানতে পারেঃ ত্যাগ-তপস্যা-বিচার কি এবং কেন, প্রার্থনা-জপ-ধ্যান কি, কি তার সার্থকতা, পথ কি, পথের শেষ কোথায়?

মানুষের এইসব চিরন্তন জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর আমরা নিশ্চয়ই পাই অতীতের অবতার তথা কৃতকৃত্য মহামানবদের জীবন ও বাণীতে। কিন্তু এযুগে আমরা শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণীতে যে সহজ সরল উত্তর পাই, তারই কিছু সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথমেই উল্লেখ্য যে, মায়ের উপদেশে অদ্বৈতবেদান্তের সর্বোচ্চ তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সুতরাং মা যে 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' এতে কোনও সন্দেহ নেই, এবং সেই অদ্বৈত-তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই মায়ের সমস্ত উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। মা বলেছিলেনঃ 'জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়।'[৩৩] 'টীশ্বর' এই শব্দটির অর্থ করা যায় 'জীব-জগৎ'; ফলে মায়ের কথাটি দাঁড়ায়ঃ 'জ্ঞান হলে ঈশ্বর-জীব-জগৎ সব উড়ে যায়।'[৩৩] এটি অদ্বৈতবেদান্তের একটি মূলীভূত সিদ্ধান্ত। যখন সাধকের 'অহং' বিলুপ্ত হয়, তখন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় নির্বিকল্প সমাধিতে ঈশ্বর, জীব ও জগতের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না—নির্গুণ ব্রহ্ম মাত্রই প্রকাশিত থাকেন। নির্গুণ ব্রহ্মই মায়াতে ঈশ্বর-জীব-জগৎ হয়েছেন। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ মায়িক—পারমার্থিক সত্য নয়। নির্গুণ

ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য। সুতরাং আলোচ্যমান মায়ের বাক্যটিতে 'জ্ঞানে'র অর্থ নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান। এই জ্ঞানই জীবের চরম লক্ষ্য— **এখানেই পথের শেষ।** বিচারপথে এই জ্ঞান হয়, কিন্তু সেপথ অতি কঠিন। তাই মা তাঁর জনৈক শিষ্যকে বলেছিলেনঃ 'ঐ পথ বড় কঠিন, তোমরা ঠাকুরকে ডাক, তিনি সময় হলে জানিয়ে দেবেন।'[৩৭] মায়ের এই উক্তিটি কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির জন্যও নয়—এটি একটি সর্বজনীন সত্য। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ঐকথাই বলেছেন।

'ঠাকুরকে ডাকা' মানে অবতারের শরণ নেওয়া। অবতারের শরণ নেওয়া মানে ঈশ্বরের শরণ নেওয়া। কারণ, অবতার নররূপী ঈশ্বর।

মা বলেছিলেনঃ 'ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।'[৩৮] কাশীতে শ্রীভগবান মাকে নারায়ণমূর্তিতে দর্শন দিয়ে বলেছিলেনঃ 'ঈশ্বরতত্ত্ব না করলে কি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়?'[৩৯] শ্রীভগবানের এই কথা এবং মায়ের ঐকথা--দুটির অর্থ একই। অর্থটি হল এই যে, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করতে হলে সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসনা একান্ত প্রয়োজন। গীতাদি শাস্ত্রেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়।[৪০] বস্তুত, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হতেই পারে না। এটিও অদ্বৈতবেদান্তের একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত।[৪১]

তাই ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য ত্যাগ, তপস্যা, বিচার, জপ, ধ্যান ইত্যাদির ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রয়েছে। শ্রীশ্রীমাও এগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে গেছেন। ত্যাগের প্রসঙ্গে মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুপম দৃষ্টান্তটি তুলে ধরে বলতেনঃ 'তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] ত্যাগই হল বিশেষত্ব।'[৪২] তপস্যার প্রসঙ্গে বলতেনঃ 'তপস্যা দরকার। এই যোগেন এখনও কত উপবাস করে'[৪৩], 'যোগীন কতবার চাতুর্মাস্য করেছে —একবার শুধু কাঁচা দুধ ও ফল খেয়ে ছিল!'[৪৪] বিচারের কথায় মা বলেছেনঃ 'সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে।'[৪৫] 'মন না মত্ত হস্তী, মা! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্যে।'[৪৬] জপের প্রসঙ্গে মা 'জপাৎ সিদ্ধিঃ' কথাটি বারংবার বলতেনঃ 'ধ্যান না হয় জপ করবে, "জপাৎ সিদ্ধিঃ"। জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে।'[৪৭] 'জপ অভ্যাস করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—

জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ।'[৪৮] 'সব সময় ঘড়ির কাঁটার মতো ইষ্ট-মন্ত্র জপ করবে।'[৪৯] 'মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না...নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে—বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মতো।'[৫০] ধ্যানের প্রসঙ্গে মা বলেছিলেনঃ 'ধ্যান হল তো সবই হল।'[৫১] এটি মোক্ষম কথা। 'ধ্যানের শক্তিতে আমরা আমাদের নিজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হই; তখন আত্মা আপনার সেই জন্মহীন মৃত্যুহীন স্বরূপকে জানিতে পারে।'[৫২]

ধ্যানই সমাধিতে পর্যবসিত হয়। গভীর ধ্যানই সমাধি। নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি নির্গুণ ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞান ধ্বংস করলে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন![৫৩] তখনই 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'[৫৪]—হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়।

সংশয় থেকেই যাবতীয় জিজ্ঞাসা। সমস্ত সংশয় দূর হলে সর্ববিধ জীবন-জিজ্ঞাসারও অবসান হয়। 'ন তেন কিঞ্চিদাপ্তব্যং জ্ঞাতব্যং বাবশিষ্যতে'[৫৫]—সেই ব্যক্তির আর কিছু পাবার বা জানবার বাকি থাকে না।

এসব অতি পরিচিত কথা, কিন্তু নিত্য সত্য। এই সত্যের প্রয়োগ কিভাবে বর্তমান সমস্যা-সঙ্কুল জীবনে সম্ভব, তা শ্রীশ্রীসারদাদেবী দেখিয়ে গেছেন। আমাদের মৌল জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর তাঁর সহজ, সরল ভঙ্গিতে তিনি দিয়েছেন, যা যুক্তি-সিদ্ধ, কালোপযোগী এবং বাস্তবধর্মী। তিনি তত্ত্বদর্শিনী, তাই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম : শ্রীমায়ের দৃষ্টিভঙ্গি

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরী সারদাদেবী ছিলেন জ্ঞান, প্রেম, করুণা, সরলতা, অসাধারণ বাস্তববোধ এবং উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন এক ঊর্ধ্বস্তরের মানুষ। ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি আদ্যাশক্তিরূপে প্রতিভাত। ইতিহাস-সচেতন মানুষের কাছে তিনি জাতীয়-জাগরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নবভারতের 'আনন্দমঠ' রামকৃষ্ণ মিশনের 'সঙ্ঘ-জননী'। শ্রীশ্রীমা জন্মেছিলেন এবং জীবনধারণ করেছিলেন এমন একটি যুগে, যেযুগ ভারত-ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। ভারত-ইতিহাসের এই অধ্যায়ে দেখা গেছে সিপাহী বিদ্রোহ, যুগন্ধর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, অভূতপূর্ব জনজাগরণ, নারীসমাজের বন্ধনমুক্তি এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ব্রিটিশ-অক্টোপাসের স্বৈরাচারী বন্ধন থেকে মুক্তির অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সারা দেশ—বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিল ইতিহাসখ্যাত স্বদেশী-আন্দোলন ও বিপ্লববাদী কার্যকলাপ। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল ব্যাপকতর নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা নিয়ে গান্ধীজীর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীমায়ের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই ভারত-ইতিহাসে শুরু হয়েছিল অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন। দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা ও স্বাদেশিকতাবোধে সেদিন উদ্বেলিত সারা দেশ। তৎকালীন জাতীয় মানসিকতা ও নেতৃবৃন্দের চেতনায় একটি মানুষ গভীর শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন ছিলেন—তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের চিরনমস্য, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান নায়ক—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর জীবন, কর্ম ও আদর্শের পশ্চাতে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও আর একটি মানুষের অনুপ্রেরণা ও অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। তিনি হলেন 'রামকৃষ্ণসঙ্ঘ-জননী'—সাধারণ শিক্ষাদীক্ষাহীনা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-পত্নী এক গ্রাম্য মহিলা—শ্রীশ্রীসারদাদেবী।[১] শ্রীমায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে 'খাপখোলা তরোয়াল' নরেন্দ্রনাথ মার্কিন মুল্লুকে যাত্রা করেছিলেন। বস্তুত, ভারতের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর চিকাগো শহরের বুকে, যেদিন আমেরিকার বিদগ্ধ মানুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিকে ভারতবর্ষের উপর স্থাপন করেছিলেন তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পর সেই বিজয়ী বীর—(মায়ের ভ্রাতৃবধূর কথায়) 'রাজার মতো চেহারা, ঠাকুরঝির পায়ে লম্বা হয়ে পড়ল ; জোড়হাতে বলল—"মা, সাহেবের ছেলেকে ঘোড়া করেছি, তোমার কৃপায়"!'[২] এ শুধু সঙ্ঘজননীর প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের প্রণতি নয়—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কাছে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সমগ্র নবভারতের আত্মসমর্পণ।

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার কথার সূত্র ধরে বলা যায়, তিনি ভারতীয় নারীর পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নতুন আদর্শের অগ্রদূত।[৩] বস্তুত, শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ ও আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের একটি অপূর্ব সমন্বয় ও সুষম সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। রক্ষণশীল গ্রাম্য-পরিবেশে মানুষ হয়েও প্রাত্যহিক জীবনচর্যার ক্ষেত্রে তিনি এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচয় রেখে গেছেন, যা বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনাকেই শক্তিশালী করেছে।

দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহা ছিল শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জয়রামবাটীর মাটি তাঁর কাছে চিরপবিত্র। জয়রামবাটীর পবিত্র ভূমিকে প্রণাম করে তাই তিনি বলেনঃ 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'[৪] দেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র-দুর্দশা, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষে তিনি মর্মাহত হন—কখনও বা হৃদয়বিদারক ও মর্মভেদী ক্রন্দনে ফেটে পড়ে হতশ্রী দেশবাসীর দুঃখ নিবারণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানান।

স্বামী বিবেকানন্দের মতোই স্বাধীনতা ছিল তাঁর আত্মার সঙ্গীত। তাঁর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে অতিরিক্ত যত্ন নিতে আগ্রহী এক সেবক-সন্তানকে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে কিন্তু দৃঢ়ভাবে তিনি বলছেনঃ 'এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া হল আমার বৈঠকখানা। ...আমি এদেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ। আমাকে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। এখানেও যদি তোমাদের কথামতো পা-টি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না। শরৎকে লিখে দাও।'[৫] জনৈক আশ্রম-অধ্যক্ষ একবার শ্রীমায়ের কাছে কয়েকজন আশ্রমকর্মীর বিরুদ্ধে অবাধ্যতার অভিযোগ আনলে মা তাঁকে বলেনঃ 'ছেলেরা সাধু হয়েছে, ভগবানকে ডাকবে, নিজের জীবন সার্থক করবে। আশ্রমের কাজকর্ম তো যথাসাধ্য করছেই, করবেও। তাদের বয়স হয়েছে, বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, নিজের ভাল-মন্দ সুখ-সুবিধা বুঝে তারা স্বাধীনভাবে চলতে চাইলে তাতে তুমি বাধা দিয়ে কিছু বলতে পারবে না। আর বাধা দিলেও নিজের কষ্ট-অসুবিধা বরণ করে কেউ চিরকাল পরের অধীন হয়ে থাকতে পারে না। তোমার কাজের অসুবিধা হলে তোমাকেই তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। তারা বরাবর তোমার কথা শুনে আসছে, এখনও শুনবে। ভালবাসায় সব কিছু হয়, জোর করে কায়দায় ফেলে কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না।'[৬]

শ্রীশ্রীমা যে কেবলমাত্র স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তা-ই নয়, স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একদিন 'মায়ের বাড়ি'র (উদ্বোধন) দোতলা

থেকে দেখা গেল যে, নিকটবর্তী একটি বস্তিতে একজন পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে নির্দয়ভাবে প্রহার করছে। এই অবস্থা দেখে আমেরিকার নাগরিক ভগিনী দেবমাতা উত্তেজিত হয়ে সেই স্ত্রীলোকটির উদ্ধার এবং পুরুষটির কাপুরুষোচিত কাজের প্রতিবাদ করার জন্য ঘটনাস্থলের দিকে ধাবিত হওয়ার উদ্যোগ করলে মায়ের সেবকেরা বহু চেষ্টায় তাঁকে নিবৃত্ত করেন। ক্ষুণ্ণমনে দেবমাতা তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন: শ্রীশ্রীমার মন্তব্য: 'স্বাধীন দেশের মেয়ে কি-না, তাই এমন তেজস্বিনী।'[৭]

ইংরাজ-শাসনকে কখনই মা সুনজরে দেখেননি। তাঁর মতে ভারতের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটনের মূলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ-শাসন।[৮]

শ্রীশ্রীমা তখন কোয়ালপাড়ায় আছেন। বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমা আধুনিক ইউরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতা এবং টেলিগ্রাফ ও রেলপথ প্রভৃতির কথা বলছিলেন: 'এই দেখ না, রাসবিহারী কাল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ এখানে পৌঁছে গেল। আমরা তখন কত হেঁটে, কত কষ্ট করে তবে দক্ষিণেশ্বরে গেছি।' মায়ের কথায় উৎসাহিত হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক প্রশংসা করে প্রবোধবাবু বললেন: 'ইংরেজ সরকার আমাদের দেশের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে।' সব শোনার পর মা মন্তব্য করলেন: 'কিন্তু বাবা, ঐসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।'[৯]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দ) সারা দেশজুড়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্রতর হয়ে ওঠে। খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, সীমাহীন বেকারত্ব মানুষকে চরমতম দারিদ্রের দিকে ঠেলে দেয়। দেশে বস্ত্রাভাব তখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, বস্ত্রের জন্য হাট লুঠ হচ্ছিল, ডাকাতি হচ্ছিল, দরিদ্র কুলবধূরা লজ্জানিবারণে অসমর্থ হয়ে আত্মহত্যা করছিলেন। মাসিক 'মোহাম্মাদী' লিখছে: 'পথে ঘাটে অসহায়া স্ত্রীলোকদের বীভৎস বস্ত্রহরণ আরম্ভ হইয়াছে।'[১০] 'মফস্বলে অমূল্য সতীত্বরত্ন বিসর্জন দিয়া রমণীরা বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে। বয়স্থা কন্যাগণ ও বালকেরা বস্ত্রাভাবে লোকের সম্মুখে বাহির হইতে পারে না।'[১১] বস্ত্রাভাবে নারীদের আত্মহত্যা ও অপরাপর কাহিনী শুনে শ্রীমা অবোধ বালিকার মতো উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন শুরু করেন এবং ক্রমাগত বলতে থাকেন: 'পরনের কাপড় না পেলে মেয়েরা কি করবে! লজ্জা-সরম বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় কি!'[১২] সেদিন সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সামনে অধীরভাবে মা বার বার বলতে থাকেন: 'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো।'[১৩] এরপর কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মা সখেদে বলতে লাগলেন: 'তখন ঘরে ঘরে চরকা ছিল, ক্ষেতে কাপাস চাষ হত, সকলেই সুতো

কাটত, নিজেদের কাপড় নিজেরাই করিয়ে নিত, কাপড়ের অভাব ছিল না। কোম্পানি এসে সব নষ্ট করে দিলে। কোম্পানি সুখ দেখিয়ে দিলে—টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাও। সব বাবু হয়ে গেল—চরকা উঠে গেল। এখন বাবু সব কাবু হয়েছে।'[১৪] এসময় কোয়ালপাড়া আশ্রমে জোর তাঁত ও চরকার কাজ চলছিল। আশ্রমকর্মীদের উৎসাহিত করে মা সেদিন বলেছিলেনঃ 'আমাকেও একখানা চরকা এনে দাও, আমিও সুতা কাটব।'[১৫] স্বদেশী-আন্দোলনের কালে বিলাতি দ্রব্য বর্জন, বিলাতি দ্রব্যে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি নানা কাজে কোয়ালপাড়া আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। স্বামী পরমেশ্বরানন্দের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, মা একদিন তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বলেনঃ ' "বাবা, তোমরা এ-রকম করে বেড়িও না, ...তাঁত কর, চরকা কর, আগে তো তাঁতের কাপড়ই সবাই পরত; চরকা পেলে আমিও সুতো কাটি।" মা ঐকথা বলিয়া আমাদের খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁতে একখানি কাপড় বুনিয়া শ্রীশ্রীমাকে পরিধান করিতে দিলাম, বয়ন ভাল না হইলেও তিনি উহা পরিয়া খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন।'[১৬] বলাবাহুল্য, বস্ত্রসমস্যা নিবারণের জন্য বাংলার নারীসমাজ সত্যই সেদিন চরকায় সুতোকাটা শুরু করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনও সেদিন বস্ত্রবিতরণের কাজে নেমেছিল।[১৭]

১৩২৬ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ (১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ) কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমা বলছেনঃ 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। হিংসা, খলতা, ব্রহ্মহত্যা—এই সব পাপ; রাজার পাপে প্রজার কষ্ট ও দৈব-উৎপাত—যেমন যুদ্ধ, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ। ...একটি পাঁচ বছরের ছেলে—সেও দুঃখের কথা বোঝে, বলে আমার পরবার কাপড় নেই!'[১৮]

শ্রীমা কেবলমাত্র স্বৈরাচারী ইংরাজ-শাসনের অবসান কামনাই করতেন না, সরকারী অনাচারের 'প্রতিবিধান ও প্রতিরোধ করিতে দেশবাসীর উদ্যম প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়' বলে অভিমত ব্যক্ত করতেন।[১৯] ইংরাজ-রাজত্বের অবসান সম্পর্কেও তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। মায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীশচন্দ্র ঘটকের স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেনঃ 'আগে ওদের ধ্বংস হবে—নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।'[২০]

বিশ শতকের সূচনায় লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী নীতি ও প্রবল হঠকারিতার ফলে বাংলার বুকে এক অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন দেখা দেয়—যার নাম স্বদেশী-

আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের ঘৃণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হাতে ব্রিটিশবিরোধী অস্ত্র এবং কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' নিয়ে দীর্ঘদিনের স্থবিরত্বের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্যে রুখে দাঁড়াল বাংলা। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে শুরু হল এক নব-যুগের। বিদেশী বস্তু ও ভাবধারা 'বয়কট' ও স্বদেশীয়ানার মন্ত্র বাংলার রুদ্ধ যৌবনকে গতি-প্রকৃতি দিয়ে সেদিন নতুন এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। চরকা কাটা, তাঁত বোনা এবং স্বদেশী-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের কাজ সেদিন শুরু হয়েছিল বাংলার দিকে দিকে ঘরে ঘরে। বিপ্লবী বাংলার নারীসমাজ এই আন্দোলনে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—পাঁচ বছরের বালিকা থেকে শুরু করে অশীতিপর বৃদ্ধাও প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই আন্দোলনে।[২১]

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে (যাঁর সম্পর্কে প্রায়ই বলা হয় যে, জীবিত থাকলে হয়তো তিনি জাতীয়-আন্দোলনে সামিল হতেন) স্বদেশী-আন্দোলন সম্পর্কে সঙ্ঘজননী শ্রীমায়ের কি ধারণা ছিল?

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী-আন্দোলনকালে জয়রামবাটীর কাছে কোয়ালপাড়া গ্রামে কিছু ছাত্র ও যুবক দেশসেবার উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। অচিরেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়, যদিও তখনও এই আশ্রম রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আশ্রমটি এবং সেখানকার কর্মীদের প্রতি শ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। কলকাতা আসা-যাওয়ার পথে তিনি প্রায় প্রত্যেকবার এই আশ্রমে বিশ্রাম করে যেতেন। এখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তাঁর নিজের ছবিও বসিয়েছিলেন। আশ্রমে সেই ছবির নিত্য পূজা হত। কোয়ালপাড়া আশ্রম সম্বন্ধে তিনি বলতেন, এটি আমার বৈঠকখানা। স্বদেশী-আন্দোলনে কোয়ালপাড়া আশ্রম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিলাতি দ্রব্য বর্জন, বিলাতি দ্রব্যে অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি স্বদেশী-প্রচারের কাজে আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রবল উৎসাহে অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। সুতরাং আশ্রমের উপরে তখন পুলিসের কড়া নজর এবং নতুন কোন আগন্তুক সেখানে এলে পুলিস তার নামধাম সব লিখে নিয়ে যেত। মা একদিন তাঁদের বলেনঃ 'দেখ, তোমরা "বন্দেমাতরম্" করে হুজুগ করে বেড়িও না, তাঁত কর, কাপড় তৈরী কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতা কাটি। তোমরা কাজ কর।'[২২] মায়ের উৎসাহে আশ্রমের কর্মীরা তাঁত ও চরকা কাটায় মন দিলেন। একদিন তাঁরা তাঁদের তাঁতে বোনা একখানি কাপড় শ্রীমাকে পরতে দেন। বোনা ভাল না হলেও মা তা পেয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সাগ্রহে পরেন।[২৩] বলাবাহুল্য, মায়ের এই উপদেশ ও আচরণের মধ্যে চিন্তাশীল ও পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশী-আন্দোলনের 'স্বদেশী' অংশের দুটি দিক ছিল—একটি বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত দেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি গড়ে তোলা, অপরটি বিদেশী দ্রব্য বর্জন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের নামে সেদিন বহুক্ষেত্রেই হল্লাবাজী, দরিদ্রের উপর অর্থনৈতিক চাপ এবং অনিচ্ছুক স্বদেশীয়দের উপর তথাকথিত আন্দোলনকারীদের

অত্যাচার শুরু হয়েছিল। 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা'র বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।[২৪] 'দেশের একপক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত-শৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না—ভয় দেখাইয়া, এমনকি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্যসাধন বলে না।'[২৫] জাতীয়-আন্দোলনে নানা অনাচার দেখে বিশ্বকবি সেদিন প্রকাশ্য আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়ে গঠনমূলক কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীমায়ের কণ্ঠেও সেই সাবধানবাণী—স্বদেশীর নামে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি নয়, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে প্রকারান্তরে হল্লাবাজীকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়—স্বদেশীর লক্ষ্য গঠনমূলক কর্মে নিয়োজিত হয়ে দেশের কল্যাণ সাধন করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কার্জন থিয়েটারে এক দীর্ঘ ভাষণে সেই 'কাজ' করার কথাই বলছেন ঃ 'স্বদেশী-আন্দোলন যেন শুধু কথায় আবদ্ধ না থাকে, আমাদিগকে আমাদের শিল্পের উন্নতি করিতেই হইবে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমাদের শিল্প উপেক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদের চক্ষু খুলিয়াছে—আমরা বুঝিয়াছি, শিল্পে উন্নতি ব্যতিরেকে আমাদের জাতির পতন অনিবার্য।'[২৬]

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ—কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ কেদারবাবু (পরবর্তীকালে স্বামী কেশবানন্দ) আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পট প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে জয়রামবাটীতে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেছেন। মা বলছেনঃ 'এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাবো। ...পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করতে থাকবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ। যা কিছু করো না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে, কোন বেচাল হবে না।' এর উত্তরে কেদারবাবু বললেনঃ 'মা, স্বামীজী তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে নিষ্কাম কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না দেশের হত!' একথা শুনে মা তাড়াতাড়ি বললেনঃ 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি* (ইংরাজ সরকার) কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।'[২৭]

স্বদেশী-আন্দোলনের কালে স্বামী বিবেকানন্দকে কারারুদ্ধ করে রাখার আশঙ্কাও অমূলক নয়। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা, জাতীয়-জাগরণে তাঁর সুমহান ভূমিকা, অনুশীলন সমিতির নেতা এবং কর্মী এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বামীজীর কাছে যাতায়াত সম্ভবত সংঘজননীর অজানা ছিল না।

উপরের সমস্ত কথোপকথনটি লক্ষণীয়। মা বলছেনঃ 'শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ'—অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন ও গঠনমূলক কর্মের মূলে রাখতে হবে আধ্যাত্মিকতা। ভারতীয় চরমপন্থী (Extremists) নেতৃবৃন্দের কাছে আধ্যাত্মিকতাই ছিল ভারতীয় জাতীয়-আন্দোলনের মূলভিত্তি এবং জাতীয়-মুক্তিসংগ্রাম ছিল স্পষ্টতই একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, গীতা, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি ছিল চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের অনুপ্রেরণার উৎস। বিপিনচন্দ্র পালের মতেঃ 'The new nationalist movement in India is essentially a spiritual movement.'[২৮] অরবিন্দ ঘোষ বলছেনঃ 'জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র নিছক একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়। জাতীয়তাবাদ হল ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি ধর্ম। ...তোমরা যদি জাতীয়তাবাদী হতে চাও, তোমরা যদি জাতীয়তাবাদের ধর্ম গ্রহণ করতে চাও, তাহলে সেই ধর্মীয় ভক্তি নিয়ে অগ্রসর হও। মনে রেখো তোমরা হলে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র।'[২৯] আর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি? ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীদের হৃদয়ে যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন ছিলেন। বিপ্লবী সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পূজা পেত এবং বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথে আত্মগঠনে প্রয়াসী হতেন।[৩০] স্বদেশী-আন্দোলনের কালে বয়কট, স্বদেশী, পুলিসী অত্যাচার ও চরম উত্তেজনাভরা সেই দিনগুলিতে (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) জনৈক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'মা, এদেশের দুঃখ-দুর্দশা কি দূর হবে না?' মায়ের উত্তরঃ 'ঠাকুর তো এসেছিলেনই তার জন্যে।'[৩১] অর্থাৎ এ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঠাকুরই কাজ করছেন।

মায়ের কয়েকজন সন্তান সংকল্প করেছিলেন যে, তাঁরা অবিবাহিত থেকে আজীবন সমাজসংস্কার ও দেশসেবা করবেন। এ-ব্যাপারে মায়ের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে মা তাঁদের বলেছিলেনঃ 'শুধু সমাজসেবা আর দেশসেবা নিয়ে সারাজীবন দেহমন শুদ্ধ রাখা কঠিন। গুরুকে ভালবেসে, ইষ্টকে ভজনা করে কুমার থাকা সহজ। মেয়েপুরুষ যে-ই অবিবাহিত থাকবে, ঈশ্বরকে ধরে পথ চলতে হবে, তাঁকে ভুলে গেলেই নানান গোলযোগ আসে। আর একটা কথা সর্বক্ষণ মনে রাখবে—মেয়েমানুষ থেকে ফারাক, ...সোনার মেয়েমানুষ হলেও সেদিকে ফিরে চাইবে না। তবে ব্রহ্মচর্য রক্ষা হবে।'[৩২] এখানেও সেই আধ্যাত্মিকতার সুর স্পষ্ট। বিপ্লব-আন্দোলনের

আদিপর্বে গুপ্তসমিতিতে নিকটাত্মীয় ভিন্ন কোন মহিলার প্রবেশাধিকার ছিল না এবং সেখানে ব্রহ্মচর্যের উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হত।[৩৩]

এবারে প্রশ্নঃ স্বদেশী-আন্দোলন ও তৎপরবর্তী আমলে মা দেশী না বিদেশী—কোন্ কাপড় পরতেন? 'মা দেশী বিলাতি যে কাপড় পেতেন তাই পরতেন।'[৩৪] এ-ব্যাপারে মায়ের বিশেষ কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিল না—এমনকি মনেপ্রাণে ইংরাজ-শাসনের অবসান কামনা করলেও, মা কিন্তু তাঁদের নিজ সন্তান বলেই মনে করতেন। ইংরাজ-জাতি সম্পর্কে কখনই তাঁর কোন বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গা-পুজোর সময় স্বামী ঈশানানন্দের উপর শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের কাপড় কিনবার ভার পড়ে। তরুণ দেশপ্রেমিক তাঁদের জন্য দেশী কাপড় কিনে আনলে তাঁরা সেগুলির পরিবর্তে বিলাতি কাপড় আনবার ফরমাশ করেন। এতে উত্তেজিত হয়ে স্বামী ঈশানানন্দ বলেনঃ 'ওসব তো বিলিতি হবে, ও আবার কি আনবো?' মা পাশেই ছিলেন, তিনি হাসতে হাসতে বললেনঃ 'বাবা, তারাও (বিলাতের লোকেরাও) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি আর একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন যেমন বলছে তাই সব এনে দাও।' এ-সম্পর্কে স্বামী ঈশানা-নন্দের মন্তব্যঃ 'পরে দেখিতাম কাহারও জন্য কোন বিলিতি দ্রব্য আনিতে হইলে আমাকে না বলিয়া মা অপরকে দিয়া আনাইতেন। কাহারও ভাবে আঘাত দেওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।'[৩৫] এখানে শ্রীশ্রীমায়ের অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবু ভাব এবং বিশ্বজনীন মাতৃরূপটি স্পষ্ট।

একবার কয়েকজন বিপ্লবী-সন্তান মাকে ইংরাজের অনাচার-অত্যাচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে কাতরভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলেনঃ 'মা, তুমি একবারটি মুখ দিয়ে বলো, "ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক"।' সন্তানদের মর্মজ্বালা অন্তরে অনুভব করেও মা বলেছিলেনঃ 'আমি মা হয়ে মানুষকে উচ্ছন্নে যেতে কি করে বলবো, ইংরেজ কি আমার সন্তান নয়? আমি বলি, সকলেরই কল্যাণ হোক।'[৩৬] বলাবাহুল্য, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কখনই স্বদেশপ্রেমের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বরং দেশপ্রেমকে আন্তর্জাতিকতাবোধে রূপান্তরিত করাই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী-দের লক্ষ্য।[৩৭]

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, স্বদেশী-আন্দোলনের নেতা এবং কর্মীরা অধিকাংশই প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাই স্বামীজীর রচনাবলী সম্পর্কে পুলিসের একটা প্রকাণ্ড ভীতি ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে শ্রীমা ছিলেন বহু দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণার উৎস, তাঁদের তাপদগ্ধ, নির্যাতিত ও অন্তরীণ জীবনে শান্ত স্নিগ্ধ মরূদ্যান। সঙ্ঘজননীকে প্রাণের ভক্তি জানিয়ে তাঁরা যোগ দিতেন দেশমাতৃকার মুক্তি-

যজ্ঞে বা হতাশাময় জীবনে শান্তিলাভের আশায় ছুটে আসতেন মায়ের কাছে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সূচনায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১০ চৈত্র জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'স্বরাজ' পত্রিকায় লেখেনঃ 'যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণ-প্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।'[৩৮] স্বদেশী-আন্দোলনের কালে (১৯০৫-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ) বহু তরুণ বিপ্লবীই বেলুড় মঠে যাওয়া-আসা করতেন, মঠের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং মঠ-কর্তৃপক্ষও তাঁদের মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণসঙ্ঘে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী সহজানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), রাধিকা গোস্বামী (স্বামী সুন্দরানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ—'ভরত মহারাজ') এবং নিতাই দাস (স্বামী বলদেবানন্দ) উল্লেখযোগ্য ছিলেন।[৩৯] এঁরা সকলেই অনুশীলন সমিতির উল্লেখযোগ্য কর্মী এবং পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদানের পূর্বে কারাবাস বা অন্তরীণ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেই অর্জন করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, এঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র-দীক্ষিত।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ মে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে বঙ্গীয় বিপ্লববাদের প্রধান পুরোহিত অরবিন্দ ঘোষ[৪০] ও তাঁর অনুচরেরা বন্দী হন এবং শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। অরবিন্দ-পত্নী মৃণালিনী দেবী বলছেনঃ 'তখন স্পষ্ট আমার প্রতীয়মান হইল যে, তাঁহার সঙ্গছিন্ন আমার জীবনে মৃত্যুই একমাত্র পথ। কিন্তু তবুও আমার মৃত্যুবরণ হইল না।'[৪১] এসময় অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বিপ্লবী দেবব্রত বসুর ভগ্নী সুধীরা মৃণালিনীদেবীকে বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যান এবং তাঁর মানসিক শান্তির জন্য প্রার্থনা জানান। সব শুনে মা বলেনঃ 'চঞ্চল হইও না মা, চাঞ্চল্যে কিছুই লাভ নাই; তোমার স্বামী শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রিত পুরুষ, ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি অতি সত্বর নিষ্পাপ প্রমাণে মুক্ত হইয়া আসিবেন...।'[৪২] মানসিক শান্তির জন্য তিনি মৃণালিনীকে 'সব সময় ঠাকুরের বই' অর্থাৎ 'কথামৃত' পড়তে বলেন।[৪৩] বলাবাহুল্য, মৃণালিনী মধ্যাহ্নে 'কথামৃত' বা অন্য কোন ধর্মপুস্তক পাঠ করতেন।[৪৪] শ্রীমা মৃণালিনীকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁকে 'বৌমা' বলে ডাকতেন। মৃণালিনী-ভগ্নী শৈবলিনী মিত্র লিখছেনঃ 'বৌমা

বলবার কারণ আমার সঠিক জানা নেই তবে যতদূর মনে হয় শ্রীঅরবিন্দকে সন্তান-তুল্য মনে করতেন বলে বড়দিকে বৌমা বলতেন।'[৮৫]

নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায় যে, স্বদেশী-আন্দোলনের কালে দেশপ্রেমিকেরা শ্রীমাকে প্রণাম করে যেতেন—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আলিপুর বোমার মামলার অবসানে যেন তার জোয়ার এল। নিবেদিতা লিখছেনঃ 'সকল মহান্ জাতীয়তাবাদীই এই কাজ [তাঁর চরণস্পর্শের কাজ] এখন করে থাকেন।' 'তাঁরা শ্রীমা সারদাদেবীর চরণস্পর্শ করতে আসেন। আর স্বামী সারদানন্দ কোন কারণেই [অর্থাৎ ব্যাপারটা রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও] কাউকে ফিরিয়ে দেন না।'[৮৬] ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুলাই ও ১১ আগস্ট লেখা দুটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেনঃ 'সব দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলছে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কাছ থেকে নতুন প্রেরণা আসছে। কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে দলে দলে সকলে শ্রীমাকে প্রণাম করে যাচ্ছে। শ্রীমা বলছেন, "ছেলেরা কী নির্ভীক"!' 'দেশের মধ্যে কী পরিবর্তন এসেছে! সকলেই বলছে তারা স্বামীজীর শিষ্য।'[৮৭] এসময় নিবেদিতা একদিন মাকে বললেনঃ 'মা, ঠাকুর যে বলেছিলেন, কালে আপনি বহু সন্তান লাভ করবেন, বোধ হয় তার সময় অতি নিকট। সমগ্র ভারতবর্ষই আপনার।' মা উত্তর দিলেনঃ 'তাই তো দেখছি।'[৮৮]

বিপ্লবী ও মায়ের শিষ্য রামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে মাকে দেখতে এলেন মানিকতলা বোমার মামলার অন্যতম আসামী ষোল-সতেরো বছরের তরুণ খুলনার বিজয়কুমার নাগ। মা ঘোমটা দিয়ে আছেন দেখে বিপ্লবী বিজয়কুমার বললেনঃ আমি তোমাকে দেখতে এলুম, তুমি যে মুখ ঢাকা দিয়ে রইলে! মা মুখের কাপড় সরিয়ে দিয়ে দু-হাতে তাঁর চিবুক ধরে আদর করলেন।[৮৯] রামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সস্ত্রীক অরবিন্দ ঘোষ মাকে দর্শন করে গেলেন। অরবিন্দকে দেখে শ্রীমা বললেনঃ 'এইটুকু মানুষ, এঁকেই গবর্ণমেন্টের এত ভয়!' অরবিন্দকে লক্ষ্য করে মা বলেছিলেনঃ 'আমার বীর ছেলে।'[৯০] অরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমনের পর মৃণালিনী গভীরভাবে মাকে আঁকড়ে

ধরেন। মা তাঁকে 'অত্যন্ত স্নেহ করতেন'[৫১] এবং প্রশংসা করে বলতেন: 'অরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনী বেশ মেয়েটি—সরল। তাঁর বোন সরোজিনী একটু চালাক।'[৫২] বিপ্লবকর্মে অগ্রজ-অরবিন্দকে সরোজিনী নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং আলিপুর বোমার মামলা শুরু হলে মামলা চালানোর জন্য সরোজিনী সংবাদপত্র মারফৎ দেশবাসীর কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানান। তাঁর আবেদন তৎকালীন প্রায় সকল পত্রপত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৩] যাই হোক, শ্রীমায়ের কাছে মৃণালিনীর দীক্ষা সম্পর্কে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: 'I was glad to know that she had found so great a spiritual refuge....'[৫৪]

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মানিকতলা বোমার মামলায় মুক্তিপ্রাপ্ত দুই বিপ্লবী—দেবব্রত বসু ও শচীন্দ্রনাথ সেন রামকৃষ্ণ মঠে আশ্রয় লাভ করেন শ্রীমায়ের অনুমোদনে। বৈদেশিক শাসনের ঐযুগে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লববাদী কার্যকলাপে ভরপুর ঐ দিনগুলিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে সদ্যমুক্ত দুই বিপ্লবীকে মঠে স্থান দেওয়া কি ধরনের বিপজ্জনক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য মঠ-কর্তৃপক্ষকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[৫৫] একমাত্র মায়ের স্নেহ ও সহানুভূতির

ফলেই নিজ অস্তিত্ব বিপন্ন করে মঠ-কর্তৃপক্ষ আদিযুগের দুই বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।[৫৬] কিন্তু আজীবন তাঁদের উপর পুলিসের দৃষ্টি ছিল। পুলিসের কড়া নজরে উত্ত্যক্ত হয়ে স্বামী চিন্ময়ানন্দ এ-ব্যাপারে মায়ের কাছে প্রতিকারপ্রার্থী হলে মা বলেনঃ 'ঝড়ের এঁটোপাত হয়ে থাক—তোমার অস্তিত্ব থাকবে, ব্যক্তিত্ব থাকবে না, তা হলে তোমার সব জ্বালা যাবে।' এ-সম্পর্কে স্বামী চিন্ময়ানন্দ পরে বলতেনঃ 'পুলিস পূর্ববৎ পীড়া দিতে থাকলেও একেবারে উদাসীন ভাব এসে গেল, তাদের কোন ব্যবহারই মনে রেখাপাত করত না—তাদের সব কথা সব কাজ দেখছি শুনছি বটে, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নাই!'[৫৭] একবার সরকারের নির্দেশে রাজনৈতিক কারণে দেবব্রত বসু ও শচীন্দ্রনাথ সেনকে কিছুদিন অন্যত্র থাকতে হয়েছিল। এ-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের কাছে মা বলেনঃ 'আহা! মা, দেবব্রতটি আজ চলে গেল। কোম্পানি...ওরা থাকাতে আপত্তি তুলেছে, সেইজন্য রাখাল [সাময়িকভাবে তাদের] সরে যেতে বললে। জানিস তো বাপু, তার কোন দোষ নেই, তবু একটা ফেউ লেগে থাকবে। আহা, বাছারা খেয়ে গেল না।'[৫৮] এসময় দেবব্রত-ভগিনী সুধীরা জানালেন যে, দেবব্রত মহারাজ যেখানে যান, সেখানেই পুলিস তাঁর খোঁজ নেয়। এজন্য তিনি বলেনঃ 'আমার শ্বশুরবাড়ির লোক এসেছে, যাই দেখা করে আসি।' মায়ের মন্তব্যঃ 'শ্বশুরবাড়ির লোকই বটে, মা। কবে স্বদেশীর হাঙ্গামে ধরেছিল, এখনও তার খোঁজ রাখে!'[৫৯]

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর সরকারী ঘোষণা-বলে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হল এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বিরাট শোভাযাত্রা করে যখন সস্ত্রীক রাজধানীতে প্রবেশ করছেন, তখন বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর নির্দেশে বসন্ত বিশ্বাস তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়েন। প্রাণে বেঁচে গেলেও বড়লাট সাঙ্ঘাতিকভাবে জখম হন। শ্রীমা তখন কাশীতে ছিলেন—সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিপ্লবী দেবব্রত মহারাজ। খবর এল, পূর্বে বোমার মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পুলিস খুঁজছে—দেবব্রত মহারাজেরও অনুসন্ধান চলছে। উপস্থিত সন্ন্যাসীরা তাঁকে অন্যত্র সরে যেতে বললে নির্ভীক মা বললেনঃ 'কী হয়েছে? ওতো এখন কিছু করে না। এরা সব ভয় পাচ্ছে কেন?'[৬০]

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেহত্যাগ করলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। মা সেদিন অঝোরে কেঁদেছিলেন—তিনি মায়ের দৃষ্টিতে ছিলেন 'যোগিপুরুষ'।[৬১] নির্যাতিত কারাজীবনের ফলশ্রুতিস্বরূপ অকালে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ঐ বছর ১৯ জুলাই বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে দেহত্যাগ করলেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ—মৃত্যুকালে গর্ভধারিণী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘজননী, ধর্মজননীর রাতুল চরণ স্পর্শের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ করার পর রোগপাণ্ডুর মুখে

দিব্য-হাসি নিয়ে তিনি নিত্যধামে যাত্রা করেন।[৬২] শ্রীশ্রীমায়ের মতে তিনি ছিলেন 'ভাগ্যবান'।[৬৩]

স্বামী প্রজ্ঞানন্দের ভগিনী, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, ভগিনী সুধীরাও ছিলেন মায়ের বিশেষ স্নেহধন্যা[৬৪] ও মন্ত্রশিষ্যা।[৬৫] ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবব্রত বসু বিপ্লববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে কটক ও পুরী ভ্রমণ করলে সুধীরাও তাঁর সঙ্গে যান। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতেঃ 'সুধীরাও বৈপ্লবিক কার্যে অনুরাগী ছিলেন। অনেক সময়েই তিনি আমাদের সাহায্য করিতেন।'[৬৬]

অনুশীলন সমিতির প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালে স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'উদ্বোধনে' আশ্রয় লাভ করেন। হঠাৎ পুলিসের নজরে পড়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে দেড় বছর উদ্বোধন ছেড়ে অন্যত্র থাকতে হয়। তিনি লিখছেন যে, বিদায়কালে মা 'যেন আমার দুঃখে অভিভূতা হইয়া গেলেন এবং অসীম স্নেহকরুণা দিয়া আমাকেও অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। আমাকে বার বার অভয়বাণী শুনাইতে লাগিলেন, "ভয় করো না, ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন"।'[৬৭] স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ মায়ের দীক্ষিত ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করলেন স্বদেশী-আন্দোলনে যোগদানকারী বিভূতিভূষণ ঘোষ,[৬৮] স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিজয়কৃষ্ণ বসু[৬৯] এবং স্বদেশী-যুগে রাজনৈতিক কারণে স্কুল থেকে বিতাড়িত ছাত্র এবং পরবর্তীকালের বিখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।[৭০] এই সময়েই মাকে দর্শন করে গেলেন অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য রাধিকামোহন গোস্বামী (স্বামী সুন্দরানন্দ)।[৭১] দীক্ষা নিলেন অনুশীলন সমিতির ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ),[৭২] নগেন সরকার (স্বামী সহজানন্দ),[৭৩] কর্ণাটকুমার চৌধুরী,[৭৪] তমলুকের বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা রজনীকান্ত প্রামাণিক,[৭৫]

বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তপানন্দ),[৭৬] অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন বিপ্লবী ঈশ্বর মহারাজ (স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ),[৭৭] শ্রীহট্টের সুপাতলা গ্রামের যতীন্দ্র দত্ত,[৭৮] বরিশালের দুর্গাপুর গ্রামের মতিলাল বিশ্বাস,[৭৯] অনুশীলন সমিতির নিতাই দাস (স্বামী বলদেবানন্দ),[৮০] খ্যাতনামা বিপ্লবী নায়ক মাখনলাল সেন[৮১] ও তাঁর পত্নী মৃন্ময়ী দেবী,[৮২] এবং আরও অনেকে। পূর্বে উল্লেখিত স্বামী চিন্ময়ানন্দ বা শচীন্দ্র-নাথ সেন ছিলেন মাখনলাল সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।[৮৩] তেরো বছর বয়সে বিবাহের মাত্র আটাশ দিন পরে বিধবা হয়ে, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতার কন্যা প্রফুল্লমুখী বসু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বছর বয়সে ছুটে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী প্রেমানন্দের কাছে। শ্রীমা তাঁকে দেখেই বলে ওঠেনঃ 'অত নিরাশ কেন মা ? তুমি তো তুচ্ছ নও, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।' মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি—অসহ-যোগ আন্দোলন ও তৎপরবর্তীকালে বাংলার নারী-স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে প্রফুল্লমুখী বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কুমিল্লা, হিজলী, বহরমপুর প্রভৃতি নানা জেলে তিনি বন্দী ছিলেন। স্বাধীনতা-অর্জনের পর কুমিল্লার 'সারদাদেবী মহিলা সমিতি'র তিনি প্রাণশক্তি ছিলেন।[৮৫]

১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ) মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেলেন ঢাকা জেলার আউটসাহী গ্রামের স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও ভক্ত রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্তের পত্নী

শ্রীমতী গিরিজা গুপ্তা।[৮৫] নারী-সংগঠন, গঠনমূলক কার্যাদি ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৮৬]

রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি নীতিগত প্রশ্নে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তরুণ দেশপ্রেমিক এবং পরবর্তী-কালের প্রখ্যাত গান্ধীবাদী জননায়ক ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী)। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি মাকে দর্শন করতে এলেন।[৮৭] এ-সম্পর্কে তিনি বলছেন, শ্রীমায়ের 'পায়ে মাথা রেখে চরণবন্দনারও সুযোগ পেয়েছি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীশ্রীমা আমার মাথায় হাত রেখে সেদিন আশীর্বাদ করেছিলেন। সেদিনের স্মৃতি আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ। আমি জীবনে যখনই কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বা এখনও হই, তখন সেই মুহূর্তটি আমি স্মরণ করিঃ আমি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করছি এবং তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন।' তাঁর মতে, 'শ্রীমা "মানুষ" নন। সাক্ষাৎ ভগবতী। যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনী।'[৮৮]

বিখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) মায়ের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করতেন ও আশীর্বাদ পেতেন।[৮৯] বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পঞ্চানন চক্রবর্তী জানান যে, পলাতক অবস্থায় 'মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাগনান হইতে বালেশ্বর যাত্রাকালে স্টেশনে শুনিতে পান শ্রীমা সারদাদেবী ঐ ট্রেনে কোথাও যাইতেছেন। তিনি সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া যান এবং তাঁহার আশীর্বাদ...লইয়া যান।'[৯০] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিখ্যাত

বুড়িবালাম যুদ্ধের বীর নায়ক বাঘা যতীন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলা কালে জেল, জরিমানা, ফাঁসি, দি ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট—ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্টঃ অ্যাক্ট ফাইভ, ১৯১৫-এর প্রবর্তন (বিনা বিচারে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করে রাখার অধিকার) এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের স্বৈরাচারী ৩নং বেঙ্গল স্টেট প্রিজনারস রেগুলেশন অ্যাক্টের পুনঃপ্রবর্তন দ্বারাও বিপ্লববাদ দমন করা সম্ভব হল না। সরকারী দমননীতির সঙ্গে তখন চলছিল দেশজোড়া অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব। কথাপ্রসঙ্গে মা এসময় বলেছিলেনঃ 'ঠাকুর যখনই আসেন তখনই এরূপ হয়ে থাকে। আরও কত কি হবে—ওদের ধ্বংস হবে, নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।'[১১]

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দূরসম্পর্কীয়া পিসীমা বিধবা ননীবালা দেবী এগিয়ে এলেন। দেশপ্রেমের তাগিদে চব্বিশ বছরের বিধবা সেদিন সিঁথিতে সিঁদুর পরতেও কুণ্ঠিত হননি। মায়ের মন্ত্রশিষ্য রামচন্দ্র মজুমদার ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩ নং রেগুলেশনে বন্দী হলে তাঁর কাছে গচ্ছিত 'মাউজার' পিস্তলটি কোথায় আছে জানার জন্য বিধবা ননীবালা দেবী তাঁর স্ত্রী সেজে জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।[১২] ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার থেকে বন্দী করে তাঁকে কাশীতে আনা হল। অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করা সম্ভব হল না। তখন তাঁকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তরিত করা হল। এখানে আহারাদি বন্ধ করে দিলেন তিনি। পুলিসের বহু কর্তাব্যক্তির অনুরোধেও কিছু হল না। কলকাতায় ইলিসিয়াম রো-তে গোয়েন্দা পুলিসের স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট গোল্ডি (Goldie) তাঁকে বারংবার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি আহারাদি করুন এটা তিনি চান এবং এজন্য তিনি ননীবালা দেবীর যে-কোন ইচ্ছা পূরণে রাজি আছেন। ননীবালা দেবী বললেনঃ 'আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।'—'আপনি দরখাস্ত লিখে দিন।' ননীবালা দেবী তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত লিখে দিলেন। গোল্ডি সেটা নিয়ে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দিলেন। আহত সিংহীর মতো ননীবালা দেবী সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে। দ্বিতীয় চড়টি বসাবার আগেই উপস্থিত গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাঁর উদ্যত হাতকে চেপে ধরে বললঃ 'পিসীমা করেন কি, করেন কি?' ননীবালা দেবীর উত্তরঃ 'ছিঁড়ে ফেলবে তো, আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিল কেন?' এই ননীবালা দেবী হলেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে ধৃত বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার।[১৩]

নির্যাতিত দেশপ্রেমিক, মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবী ও অন্তরীণ-আবদ্ধ যুবকেরা দলে দলে

তখন মায়ের কাছে আসছেন দীক্ষা নেবার জন্য। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের কাছে দীক্ষা নিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র অনুশীলন সমিতির দীনেশ দাশগুপ্ত (স্বামী নিখিলানন্দ)। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অভিযোগে এই বছর আগস্ট মাসে দু-বছরের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ঐ একই স্থানে অন্তরীণ-আবদ্ধ ছিলেন মায়ের মন্ত্রশিষ্য সুরেন কর। বন্দীজীবনের কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মুক্তিপ্রাপ্তির পর মায়ের সঙ্গে দেখা করলে মা দীনেশ দাশগুপ্তের কাছে পুলিসী নির্যাতন সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। সুরেন করের আত্মহত্যার খবরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মা বলেনঃ 'হে ঠাকুর, আর কতদিন তুমি এই সরকারের অনাচার সইবে?'[২৫] ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কারামুক্ত হয়ে দেখা করতে এলেন সিটি কলেজের ছাত্র ভারত-রক্ষা আইনে ধৃত নরেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেলেন মঠের তরুণ ব্রহ্মচারী গোরেহরি। তিনি ছিলেন 'যুগান্তর' দলের প্রাক্তন সদস্য।[২৬]

একবার মায়ের এক নিরীহ ও ধার্মিক ভক্তকে পুলিস বিনা কারণে কষ্ট দিয়েছিল। জপধ্যান শেষে ঠাকুরঘর থেকে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে—সামান্য প্রসাদ বা একটু জল খাওয়ারও সুযোগ দেয় না। মা এই খবর শুনে গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেনঃ 'দেখ দিকি, ইংরেজের কী অন্যায়! আমার ভালো ছেলে, তাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলে, মুখে একটু ঠাকুরের প্রসাদ দিতেও দিলে না! এই ইংরেজের রাজ্য কি থাকবে?'[২৭]

মায়ের ত্যাগী-সন্তান স্বামী জ্ঞানানন্দ পুলিসের মিথ্যা সন্দেহে একবার কাটিহারে নজরবন্দী ছিলেন। কোয়ালপাড়ায় মায়ের অসুখের সংবাদে তিনি সেখানে এসে হাজির হন। দীর্ঘদিন পরে তাঁকে পেয়ে মা অত্যন্ত আনন্দিত। কিন্তু নজরবন্দী থাকার জন্য সকলে তাঁকে কাটিহারে ফিরে যেতে বললে মা গভীর দুঃখে কাঁদতে থাকেন এবং বলেনঃ 'যা হবার হবে ঠাকুরের ইচ্ছায় ছেলে এখানে আমার কাছেই থাকবে।' শেষে সকলের ইচ্ছার ফলে মা চোখের জলে ভেসে মত দিলেন বটে, কিন্তু এদেশ থেকে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের 'উচ্ছেদ কামনা' করতে লাগলেন।[২৮]

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরেশ চৌধুরী নামে জনৈক যুবক পুলিসের নজরবন্দী থেকে মুক্তি পেয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কোয়ালপাড়া আশ্রমে এসে উপস্থিত হয় এবং দীক্ষার অনুরোধ জানায়। আশ্রমের উপর তখন পুলিসের কড়া নজর থাকায় আশ্রমাধ্যক্ষ ও অপরাপর সকলে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণামের পর তাকে চলে যেতে বলেন। মা এই খবর পেয়ে স্বামী ঈশানানন্দকে বলেনঃ 'আহা, বরদা, ছেলেটি কত কষ্ট পেয়ে ব্যাকুল হয়ে বিষ্ণুপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে সোজা আমার কাছে ছুটে এসেছে। তুমি যদি আজ রাত্তিরটা গ্রামের কোন লোকের বাড়িতে বা বৈঠকখানায় তাকে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারো, তাহলে কাল সকালেই আমি দীক্ষা দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেবো।' তাই-ই হল। পরদিন খুব সকালে পথের মাঝে নিকটবর্তী পুকুর থেকে সামান্য জল এনে, আসনের অভাবে খড় পেতে তৃণাসনে বসে সুরেশ চৌধুরীকে দীক্ষা দিয়ে মা তাকে অন্যত্র চলে যেতে বললেন।[৯৯]

তৎকালে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, অশিক্ষা-কবলিত, দুরধিগম্য কোয়ালপাড়া ও জয়রামবাটীতে সরকার বহু দেশপ্রেমিক যুবককে অন্তরীণ করে রেখেছিল। স্বামী সারদেশানন্দ লিখছেনঃ 'এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক থানাতেই ঐরূপ অন্তরীণ যুবক দেখা যাইত। তাঁহাদের মধ্যে মায়ের স্নেহাশীর্বাদের পাত্রগণও ছিলেন। মায়ের মন তাঁহাদের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিত। কেহ কেহ সুবিধামতো পত্র লিখিতেন, সেই সকল পত্রে পুলিসের ছাপ মারা থাকায় দেখিয়া দেখিয়া মা চিনিয়াছিলেন। এইরূপ পত্র পাইলেই মা হাতে করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিতেন সেই পুলিস ছাপের দিকে। কখনও কখনও দু-একটি বাক্যে তাঁহার রুদ্ধ হৃদয়বেদনা ফুটিয়াও বাহির হইয়া পড়িত।'[১০০] মা এইসব সন্তানদের ত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রশংসা করে বলতেনঃ 'আহা, কি-সব চাঁদের মতো ছেলে, দেশের জন্যে কতই-না দুঃখলাঞ্ছনা ভোগ কচ্ছে!'[১০১]

মাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ 'মা, আজকাল সরকার যে ছেলেদের ধরে ধরে আটক করে রাখছে, এর পরিণাম কি হবে?' এর উত্তরে মা বলেছিলেনঃ 'তাইতো, বড় অন্যায়। এর একটা প্রতিকার শীঘ্র হবে। আর বেশী দিন নয়—ভাল হবে।'[১০২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়া আশ্রমে মায়ের ভক্তদের গমনাগমনের উপর পুলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রত্যহ পুলিস নতুন অভ্যাগতদের নাম, ধাম, পরিচয়, জন্মস্থান, কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় যাবেন—এসব জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখে নিয়ে যেত। এমনকি, আগন্তুকদের বাসস্থান বা জন্মস্থানেও তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান চলত। পুলিসের খাতায় যাতে নাম না ওঠে এজন্য রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সন্তানেরা সকালে এসে সন্ধ্যার পূর্বেই চলে যেতেন। জয়রামবাটীর মায়ের বাড়ি পুলিসের খাতায় 'মাতাজীর আশ্রম' নামে পরিচিত ছিল। সেখানে সর্বক্ষণ পাহারা দেবার জন্য চৌকিদারের উপর একজন দফাদারও নিযুক্ত হয়েছিল। স্বামী সারদেশানন্দ লিখছেনঃ 'চৌকিদার ও দফাদারের ঘন ঘন যাতায়াত

আর জিজ্ঞাসাবাদ বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল।'[১০০] পুলিসের গতিবিধি মা কখনই প্রীতির চোখে দেখতেন না, আবার এজন্য ভয়প্রকাশও করতেন না। কোন দেশ-প্রেমিক-ভক্ত সম্পর্কে তাঁর কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেনঃ 'কে স্বদেশী, আর কে বিদেশী, তা আমি কি জানি! সবাই আমার কাছে সমান, সবাই আমার ছেলে। মা বলে কাছে এসে দাঁড়ালে সব্বাইকে আমি আশীর্বাদ করি।'[১০১]

একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, নিছক ভক্তের আহ্বান নয়--জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম এবং মুক্তি-সংগ্রামীদের প্রতি সহানুভূতি না থাকলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ঐযুগে মায়ের পক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত বা পুলিসের চোখে মুক্তি-সংগ্রামীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের এভাবে আশ্রয় এবং কৃপাদান করা সম্ভব হত না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, মায়ের জীবদ্দশায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে শ্রীশ্রীমা-ই তো সব। নিবেদিতার কথায়ঃ 'তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের বীরোচিত সম্ভ্রম দেখবার মতো। তাঁকে সর্বদা "মা" বলে ডাকা হয়,—তাঁর বিষয়ে উল্লেখের সময় বলা হয় "শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী", প্রতি ব্যাপারে তাঁকে স্মরণে রাখা হয়, সব সময় তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে দু-একজন হাজির থাকেন; তাঁর ইচ্ছাকে স্থায়ী আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়।'[১০২]

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগেঃ বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে শ্রীমায়ের কি ভূমিকা ছিল (যেখানে 'তাঁর ইচ্ছাকে স্থায়ী আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়')? আমরা দেখি, আপাত-দৃষ্টিতে মঠের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হলেও মঠ-কর্তৃপক্ষ ও শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার কখনই সম্প্রীতির অভাব হয়নি। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পরেও নিবেদিতা ও মঠের মধ্যে স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা দেখা গেছে। নিবেদিতা বার বার মঠে এসেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং মঠের অন্যান্য সকল সাধুদের কাছে আগের মতোই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন। শ্রীমা ও মঠের নেতৃস্থানীয় সন্ন্যাসীরা বহুবার নিবেদিতার কাছে গেছেন এবং নিবেদিতাও শ্রীমায়ের কাছে বহুবার এসেছেন এবং আগের মতোই তাঁর স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছেন। এমনকি, মঠ-প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের রচনা-বলীতে নিবেদিতা ভূমিকা লিখেছেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষও নিবেদিতার সঙ্গে মঠের সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটিকে একটি 'ফরমাল অ্যাফেয়ার' বলে মনে করতেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মঠের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্বৈরাচারী ইংরাজ-শাসনাধীনে জাতীয়-আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর নেত্রী নিবেদিতার মঠত্যাগ সত্যই সেদিন অপরিহার্য ছিল। এ-সম্পর্কে প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছেনঃ 'মা সিস্টারকে কখনও বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলেছেন বলে শুনিনি। অথচ মায়ের প্রতি নিবেদিতার যা শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল তাতে মা যদি তাঁকে এ-বিষয়ে কোন নিষেধাত্মক নির্দেশ

দিতেন, তাহলে নিশ্চয় নিবেদিতার পক্ষে বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা অসম্ভব ছিল।' তাঁর মতে, মায়ের বিশেষ স্নেহের পাত্রী নিবেদিতার 'তথাকথিত বহিষ্কারের ...সিদ্ধান্তটির নেপথ্যে ছিল মায়ের মস্তিষ্ক ও প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হয়েও মা ছিলেন আশ্চর্য বাস্তব বুদ্ধির অধিকারিণী।'* হেমচন্দ্র ঘোষ আরও বলেন: 'শুনেছি অরবিন্দ, যতীন মুখার্জী মায়ের কাছে গিয়েছিলেন এবং মায়ের আশীর্বাদ তাঁরা পেয়েছিলেন। শুনেছি অরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাবার আগে মাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন।...বাংলার বিপ্লবীদের একজন বন্ধু গণেন মহারাজও** মায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।'[১০৬]

দেশসেবার নামে মা রাজনৈতিক ডাকাতি সমর্থন করতেন না। একবার চট্টগ্রামের জ্ঞানেন্দ্র বসু এবং কলেজের ছাত্র বিপ্লবীদলভুক্ত সতেরো-আঠারো বছরের শীতল মিত্রকে নিয়ে যদুনাথ মজুমদার মায়ের কাছে যান। জ্ঞানেন্দ্র বসু ও শীতল মিত্র মায়ের কাছে দীক্ষার অনুরোধ জানালে মা জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বললেন: 'নীচে যেয়ে বস, দিন ঠিক করে পাঠাচ্ছি।' শীতল মিত্রকে শুধু নীচে বসতে বললেন, দীক্ষার কথা কিছু বললেন না। একটু পরে রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) নীচে জ্ঞানবাবুকে দীক্ষার দিন জানিয়ে গেলেন, কিন্তু শীতল মিত্র সম্পর্কে কিছু বললেন না। খানিক পরে তিনি পুনরায় এসে যদুবাবুকে বললেন: 'যদু, মা বললেন, আজকাল এমন অনেক ছেলে এসে দীক্ষা নিয়ে যায় যাদের গভর্ণমেন্ট পরে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে, আর তাদের মা-বাপ দুঃখ জানিয়ে পত্র দেয়।' যদুবাবু লিখছেন: 'শুনিয়া চমকিত হইলাম; শীতল যে দেশের কাজের জন্য ডাকাতিও করে তাহা জানিতাম। রাসবিহারী মহারাজ পুনরায় আসিয়া বলিলেন, যদু, কি জানিস বল। আমি আর কি বলিব, কতকটা চাপিয়া গিয়া বলিলাম, এর শিক্ষক ত্রিবেণীবাবুকে গভর্ণমেন্ট অন্তরীণ করেছে; শীতল তেমন গুরুতর কিছু করে থাকলে তাকেও নিয়ে যেত। "তুই দায়িত্ব নিলে মা দীক্ষা দেবেন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া, শীতলকে প্রশ্ন করিয়া আমি তাহার ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য জামিন হইলাম।'[১০৭] এই ঘটনা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম জীবনীকার ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের সিদ্ধান্ত: 'মা তো সবই জানেন। শীতল মিত্র বিপ্লবী ছিল—ডাকাতি করত।...নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের কাজ করলে, আন্দোলন করলে মা কখনও বিরূপ ভাব দেখাননি—বরং তারা এলেই মা দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু তারা দেশসেবার নামে চুরি-ডাকাতি করবে মা তা অ্যাপ্রুভ করেননি।' বলাবাহুল্য, সদাচরণের অঙ্গীকার পাওয়ার পরই মা তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[১০৮] এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ প্রথম বয়সে 'স্বাধীনতার জন্যে' 'স্বদেশী ডাকাতি'তে বিশ্বাস করলেও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন: 'স্বদেশী-ডাকাতির ফলে মুক্তি-সংগ্রামের যে ক্ষতি হয়েছিল এ-বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নাই।' এই ক্ষতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: মানবিক

কারণে জনসাধারণ এর ফলে বিপ্লবীদের থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। তাদের মনে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে একটা সন্ত্রাস, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ভাব দানা বেঁধেছিল। তাছাড়া এর ফলে বিপ্লবীদের মধ্যে অর্থলোভ নৃশংসতা প্রভৃতি সংক্রামিত হয়েছিল যাতে বিপ্লবীদের পক্ষে অনেকেই আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।* শ্রীশ্রীমা যে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্বদেশী ডাকাতির ব্যাপারটি দেখেননি এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার আলোতেই তিনি বুঝেছিলেন স্বদেশী ডাকাতি স্বদেশপ্রেমকে কোথায় নিয়ে যাবে।

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সময় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিলজলা রেলওয়ে কেবিনের দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বাঁকুড়ার যূথবিহারী গ্রামের লোক) ও তাঁর স্ত্রী সিন্ধুবালা নিজেদের রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে যুগান্তর দলের পলাতক বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল চক্রবর্তী ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সিন্ধুবালাদেবী নিজ গ্রামে চলে গেলে 'ভারত-রক্ষা' আইনে সাবাজপুর গ্রাম নিবাসী সিন্ধুবালাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিস পাঠানো হয়। ইনি ছিলেন দেবেনবাবুর ভগ্নী এবং তখন আসন্নপ্রসবা। এই গ্রেপ্তারের পর জানা গেল নিকটবর্তী গ্রামে আর এক সিন্ধুবালা আছেন (দেবেনবাবুর পত্নী)। নামের সাদৃশ্যহেতু পুলিস দুই সিন্ধুবালাকেই গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর তাঁদেরকে রাত্রিতে হাঁটিয়ে এক জমিদারের কাছারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে হাঁটিয়ে ইন্দাস থানা এবং সেখান থেকে ট্রেনপথে বাঁকুড়া এবং বাঁকুড়া স্টেশন থেকে হাঁটিয়ে দু-মাইল দূরবর্তী বাঁকুড়া থানায় হাজির করা হয়। পনেরো দিন জেলহাজতে থাকার পর নির্দোষ প্রমাণে তাঁরা খালাস পান। সিন্ধুবালা-ঘটনায় সেদিন সমগ্র বাংলা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বঙ্গীয় আইন পরিষদে দীর্ঘ বিতর্ক চলেছিল এ-সম্পর্কে এবং বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে এই ঘটনার জন্য বঙ্গীয় আইন পরিষদে দুঃখপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১০১]

তৎকালে জয়রামবাটীতে কোন সংবাদপত্র আসত না। লোকমুখেই সংবাদাদি প্রচারিত হত। এই ঘটনাটি মুখে মুখে জয়রামবাটীতেও এসে পৌঁছাল। কালীমামা (মায়ের ভাই) খবরটি শুনে শ্রীমাকে জানান। শুনে মা বললেনঃ 'বল কি!' বলেই শিউরে উঠলেন, মুহূর্তে তাঁর চোখমুখের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তারপর গম্ভীরস্বরে বললেনঃ 'এটা কি কোম্পানির আদেশ, না পুলিস সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধা স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার মহারানী ভিক্টোরিযার সময় তো কই শুনিনি! এ যদি কোম্পানির আদেশ হয় তবে আর বেশীদিন নয়। আচ্ছা, এমন কোন ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু-চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত? দেবেনের ভাইরা সব কোথায় ছিল?' স্বামী ঈশানানন্দ লিখছেনঃ 'সেইদিন মায়ের অগ্নিময়ী মূর্তি দেখিয়া আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম।' কিছুক্ষণ পরে অবশ্য খবর এল যে, সিন্ধুবালাদ্বয়কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ-

সংবাদে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে মা বললেনঃ 'এ খবর যদি না পেতাম তবে আজ রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না।' এর দু-একদিন পরে আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়কে মা বলেছিলেনঃ 'এ রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, থাকবে না, এ আর বেশী-দিন নয়।'[১১০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতীয়দের কিছু শাসনতান্ত্রিক সুবিধা দেবার উদ্দেশ্যে সরকার মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার (Mont-Ford Reforms, 1919) পাস করলেন। অপরদিকে বিপ্লববাদ দমনের অছিলায় ভারতীয়দের স্বাধীনতা হরণ করে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মার্চ পাস করা হল স্বৈরাচারী রাওলাট আইন (Rowlatt Act)। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। শুরু হল রাওলাট সত্যাগ্রহ। ৬ এপ্রিল গান্ধীজী সর্বভারতীয় প্রতিবাদের দিন ধার্য করলেন। অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল এই ধর্মঘট। শহরের শিক্ষিত মানুষ, কৃষক, মজুর, সাধারণ মানুষ, গ্রামের অশিক্ষিতা নারী সাড়া দিল এই আন্দোলনে। লাহোর, কলকাতা, আমেদাবাদ, দিল্লী ও অমৃতসরে গুলি চলল। ১৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল জালিয়ান-ওয়ালাবাগের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড। সমকালীন রাজনীতির এসব ঘটনা সম্পর্কে মায়ের কোন মতামত জানা যায় না।[১১১] এসময় একদিন অপরাহ্নে বদনগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় এসে মাকে বললেনঃ 'মা বড়ই পরিতাপের বিষয়, পথে কী বীভৎস দৃশ্য দেখে এলাম। এখনও সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে। মা, বদনগঞ্জে পুলিস সত্যাগ্রহীদের নিদারুণ করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের রেহাই নেই, চুলের মুঠি ধরে নিয়ে চলছে।' একথা শুনে মা অস্থির হয়ে উঠলেন—ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। তারপর বললেনঃ 'জান ইংরেজের পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। দেরী নাই। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ...যে রাজ্যে নারী নির্যাতন চলেছে, সে রাজত্বের ধ্বংসের দেরী নাই।'[১১২] ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখছেনঃ 'নারীদের বা দেশসেবায় ব্রতী ছেলেদের লাঞ্ছনার কথা শুনিলে তিনি বিচলিত হইতেন।'[১১৩]

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন এক গভীর সঙ্কটময় পরি-স্থিতির সম্মুখীন হয়। ১১ ডিসেম্বর দরবার-ভাষণে[১১৪] বাংলার গভর্নর লর্ড

কারমাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলেন যে, নীচমনা ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকেরা (সন্ত্রাসবাদীরা) নিজেদের দল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন ও অপরাপর সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে উচ্চ আদর্শ-সম্পন্ন তরুণদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সর্বনাশ করছে। তরুণদের পিতামাতারা এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের সন্তানদের মিশতে দেখে খুশী হন, কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দেশের শত্রুর সংখ্যাই বৃদ্ধি করছেন।[১১৫]

শত শত যুবক যখন কারারুদ্ধ ও অন্তরীণ হয়ে আছে, দেশ যখন যুদ্ধকালীন নানা স্বৈরাচারী আইনের নিগড়ে আবদ্ধ—ঠিক এই অবস্থায় মিশন সম্পর্কে প্রাদেশিক শাসনকর্তার এই মন্তব্য মঠ-মিশনের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলল। অনেকেই সেদিন প্রাক্তন বিপ্লবীদের মঠ থেকে বিতাড়িত করার পরামর্শ দিলেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীমাকে সব কথা বললে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেনঃ 'ওমা! এসব কি কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে, তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাট-সাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।'[১১৬] গভর্নরের সঙ্গে যোগাযোগের পর শেষ-পর্যন্ত ২৬ মার্চ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি (গভর্নর) এক পত্র দ্বারা তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।[১১৭] সংঘজননীর অসাধারণ বাস্তববুদ্ধির ফলে আশু ধ্বংসের হাত থেকে মঠ-মিশন রক্ষা পায়।

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিছক ইংরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা 'রণংদেহি' মনোভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতিগঠন, জনজাগরণ, নারী-উন্নয়ন, শিক্ষা-বিস্তার, সমাজসংস্কার, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ—সবই জাতীয়-আন্দোলনের অঙ্গীভূত ছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল নারীজাতির অভ্যুদয় হোক।[১১৮] স্ত্রীশিক্ষার উপর জোর দিতেন শ্রীমা। মাকু, রাধু প্রভৃতি ভাইঝিদের তাই তিনি স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, জয়রামবাটীতে তাঁর জনৈক শিক্ষক-সন্তানকে অনুরোধ করেন স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে,[১১৯] মেয়েদের আধুনিক ইংরেজীশিক্ষার উপর জোর দেন,[১২০] বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন[১২১] এবং অবিবাহিতা মেয়েদের নিবেদিতার স্কুলে

রাখতে পরামর্শ দেন।[১২২] নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সমস্ত উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণার মূলে ছিল তাঁর আদর্শ।[১২৩] নিয়মিত সেখানে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের উৎসাহ দেন তিনি, আন্তরিকতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের মঙ্গলচিন্তা করেন। 'নরেনের মেয়ে'—জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও বিপ্লব-আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী,[১২৪] তাঁর 'আদরের খুকী' ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত হয়ে তিনি বলেনঃ 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা)।'[১২৫]

প্রাচীন রক্ষণশীলা আচারনিষ্ঠ হিন্দু-বিধবা, বিদেশী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী শিক্ষিতা নারী, অশিক্ষিত মুসলমান চাষী, এবং জাতিভেদ ও রক্ষণশীলতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হিন্দুসমাজের নানা বর্ণ ও জাতির নারী-পুরুষকে একত্রিত করে সকলের অজ্ঞাতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করে দেশবাসীকে মহত্তর জাতীয় ও বিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন তিনি।[১২৬] রোগ, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষে সন্তানদের ব্রতী করে[১২৭] খুলে দিলেন সেবাধর্মের নতুন দিগন্ত।

কেবলমাত্র গণ-আন্দোলন এবং বিপ্লববাদী রাজনীতিই নয়—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, স্বদেশী, নারীমুক্তি, অস্পৃশ্যত-দূরীকরণ—ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গঠনমূলক দিকগুলিও বিধৃত হয়েছিল তাঁর চেতনা, চরিত্র, ভাবাদর্শে। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি সাধিকা-সম্প্রদায়—চারিত্রিক দৃঢ়তা, অন্তরের ঐশ্বর্য ও আধ্যাত্মিক চেতনায় তাঁরাও কম ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মাতাঠাকুরানী ভারতে এসেছিলেন 'মহাশক্তিকে জাগ্রত করতে'। 'তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর ভারতে নতুন যে যুগ এল—জাতীয়-আন্দোলন, গণ-জাগরণ ও নারীমুক্তির ইতিহাসে তা অনন্য। ভারতীয় নারীরা সেদিন কেবলমাত্র গার্গী এবং মৈত্রেয়ীই ছিলেন না—'জোয়ান অব আর্ক'-রূপে[১২৮] জাতীয় জীবনে অবতীর্ণা হয়ে দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিস্ময়কর নজির সৃষ্টি

করলেন। শক্তিসাধক মুক্তিপাগল বাধাবন্ধহারা তরুণদল মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে জাতীয়-সংগ্রামকে নিয়ে চলল অগ্রগতির পথে। ১৯৪৭-এর বিজয় বৈজয়ন্তীর মধ্য দিয়ে পূর্ণ হল শ্রীশ্রীমায়ের অভীপ্সা: 'আগে ওদের ধ্বংস হবে—নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।'

শ্রীমা সারদাদেবী শুধু ভারতের বিগত বিপ্লবের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বব্যাপী এক অনাগত মহাবিপ্লবেরও প্রতীক। এ-বিষয়ে কারও কারও মনে প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁর আপাত-সাধারণ জীবনের মধ্যে 'বিপ্লবের চিহ্ন কোথায়?' রামকৃষ্ণ মিশনের শঙ্কর মহারাজের (তখন ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্যের) কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেছেন: 'ঐ শান্ত সমাহিত নীরব জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতিবিপ্লবের বীজ। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ—এই ত্রয়ী এক মহাবিপ্লবের প্রতীক। সারা পৃথিবীর চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক বিরাট রেভ্যুলিউশন এনে দিয়েছেন এঁরা। এঁদের বিপ্লবে চাঞ্চল্য নাই, গতির চমক নাই। দু-একটা শতাব্দী হয়তো চলে যাবে এর বহিঃপ্রকাশ মানুষের চোখে ধরা পড়তে। কিন্তু এই বিপ্লবকে, যাকে "রামকৃষ্ণ বিপ্লব" বলে আমি অভিহিত করতে চাই, তা থেমে নাই। নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ ঠিক চলছে—মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার ক্রম-বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়াই হল বিপ্লবের প্রকৃতি। আগামী-কালের মানুষ দেখতে পাবে যে, এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করে দিয়েছে।'[১২৯]

সারদাদেবীর যুক্তিনিষ্ঠা ও সমাজচেতনা

গত শতাব্দীতে ভারতে যে-নবজাগরণ ঘটেছিল তার প্রধান লক্ষণ—অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবোধের বিকাশ। মননবৃত্তির অনুশীলনে ব্যক্তিমানুষের উদ্বোধন ঘটিয়ে সমাজকে সৃষ্টিশীল করাই ছিল সেযুগের বৈশিষ্ট্য।

গত শতাব্দীর এই ভাববিপ্লবীদের একাংশ ঝুঁকে পড়লেন পাশ্চাত্যের অনুকরণে। এঁরা তুলে ধরলেন পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় জীবনধারার রীতি ; সৃষ্টি হল অধমর্ণবাদের। প্রতিক্রিয়া হিসাবেই আর এক দল তুলে ধরলেন অতীত ভারতের কীর্তিগাথা, ফিরে যেতে চাইলেন প্রাচীন ভারতে ; ফলে দেখা দিল পুনরুজ্জীবনবাদ। তৃতীয় দল আবির্ভূত হলেন যাঁরা দেশজ ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়েও পাশ্চাত্যের সদ্ভাবাত্মক দিকগুলি সম্বন্ধে রইলেন সচেতন ; এঁরা সমন্বয়বাদী হলেও পাশ্চাত্যের মানদণ্ড দিয়েই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। বিপরীতদিকে আর একটি দল (চতুর্থ দল) সমন্বয়বাদী হয়েও প্রাচ্যের মানদণ্ডে বিচার করতে চাইলেন সমগ্র বিশ্বকে।

সমন্বয়বাদের সঠিক পথটি তুলে ধরলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মিলিয়ে তৈরী হয়েছে বিশ্বসংস্কৃতি। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের কার্যকলাপ ও চিন্তার সাহায্যে এই সংস্কৃতির সৃষ্টি। মানবসভ্যতার উন্নতির অর্থ কি? জড়ের বিরুদ্ধে চৈতন্যের সংগ্রাম ও ক্রমাধিপত্য। এই জড়ের দুটি রূপ—বহিঃপ্রকৃতি (external nature) যাকে নৈসর্গিক শক্তিসমূহ বলে অভিহিত করা যায়, আর অন্তঃপ্রকৃতি (internal nature) যা হল মানুষের অন্তঃকরণ বা মন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের যে-জয়যাত্রা সেটি সম্ভব হয়েছে এই দুই প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। পাশ্চাত্যের মানুষ যেখানে বহিঃ-প্রকৃতির উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছে, প্রাচ্য-মানুষের সেখানে মূল সংগ্রাম অন্তঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে। বিশ্বসংস্কৃতির প্রকৃত চরিত্র এই দুইকে নিয়ে। মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে প্রকৃতির দুই রূপেরই বিরুদ্ধে। মানুষকে সচেতন হতে হবে তার সামগ্রিক উত্তরাধিকার নিয়ে, সামগ্রিক মানব-ঐতিহ্য নিয়ে। বিশ্ব-সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ এই মানুষই আন্তর্জাতিক মানুষ, বিশ্বমৈত্রীর চেতনাতে সমৃদ্ধ।

শ্রীশ্রীমার জীবনেও এই সঠিক সমন্বয়বাদের পথটি আমরা দেখতে পাই। তিনি এসেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে)। ১৮৭২ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তাঁর নানান বিষয়ে শিক্ষা এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধনকাল। এর পর থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লোকশিক্ষায় ব্যাপৃত। এ-সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে এতকাল যে আলোচনা হয়েছে, কথিত বা লিখিত রূপে, তার অধিকাংশই তাঁর কল্যাণময়ী মাতৃরূপ নিয়ে, তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা খুবই অল্প।

শ্রীশ্রীমার জীবনদর্শন বা তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে সামগ্রিক

আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য, তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার পরিচয় দেওয়া। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। মনীষীদের মূল্যায়নের সময় সাধারণত তাঁদের লেখা বই ও বক্তৃতা কিংবা বড় বড় কাজগুলির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীমা কিন্তু তাঁর বাণী দিয়ে গেছেন কাজের মাধ্যমে, জীবনের ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে। স্বামীজী বলতেন, ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়েই আসল মানুষটিকে চেনা যায়। তাই আমরা শ্রীশ্রীমার জীবনের নানান ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনদর্শনটি বোঝার চেষ্টা করব। সীমিত পরিসরে সব ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় বলে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ও মন্তব্য কিছু কিছু তুলে ধরব এবং কৌতূহলী পাঠকদের জন্য পূর্ণ ঘটনার আকর নির্দেশ করব পাদটীকায়।

আর একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী একই আন্দোলনকে পুষ্ট করেছেন, এবং একই ভাববিপ্লবে তাঁদের জীবন ও বাণী উৎসর্গীকৃত হলেও এঁদের প্রত্যেকেরই মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে ভাবধারার সাহায্যে নবীন এক আন্দোলনকে তাঁরা উপস্থিত করেছেন, সেই ভাবধারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা তুলে ধরেছেন স্বকীয় সৃজনী-প্রতিভায়। এটি পরিষ্কার করে উপলব্ধি না করলে এঁদের মূল্যায়নে ত্রুটি থেকে যাবে। কঠোর সাধনার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ যে-আদর্শকে তুলে ধরলেন, স্বামীজী তাকেই বহন করে নিয়ে গেলেন জগতের সর্বত্র, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে কিভাবে জীবনের প্রতি স্তরে বর্ণায়িত করে তুলতে হবে সেই অমৃতবাণী শোনালেন স্বামীজী ; আর শ্রীশ্রীমা দেখালেন সেই আদর্শ ও বাণীর ব্যবহারিক প্রয়োগ।

শ্রীশ্রীমার যুক্তিনিষ্ঠা ও সমাজচেতনা পৃথক বস্তু নয়। তাঁর অপূর্ব যুক্তিনিষ্ঠাই ছিল তাঁর সমাজচেতনার ভিত্তি। আমরা এখানে প্রথমে দেখব শ্রীশ্রীমার যুক্তিনিষ্ঠা কিভাবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে রূপদান করেছিল, পরে দেখব এই যুক্তি-নিষ্ঠার ফলেই তিনি কিভাবে অসাধারণ সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

স্কুল-কলেজের ডিগ্রী তাঁর ছিল না, যদিও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ মায়ের মধ্যে সব সময়ই দেখা যেত। বালিকা-অবস্থায় তিনি পড়াশুনা শুরু করলে ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় তাতে বাধা দেয়। লক্ষ্মী (ঠাকুরের ভাইঝি) পাঠশালা থেকে পড়ে এসে মাকে বাড়িতে পড়াত। দক্ষিণেশ্বরে ভব মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রতিদিন এসে মাকে পড়াত ও পড়া নিত। পরিণত বয়সে মা তাঁর ভাইঝি মাকু ও রাধুকে পড়াতেন। তাছাড়া গৌরী-মার আশ্রমের ছাত্রীদের পড়াশুনায় তিনি খুবই উৎসাহ দিতেন, এবং নিজের অল্পশিক্ষিত শিষ্য-শিষ্যাদেরও বিদ্যাচর্চায় অনুরাগী করে তুলতেন। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বিশ্বের কোথায় কি চলছে সে-সম্বন্ধেও তিনি সদা-কৌতূহলী ছিলেন, শিষ্যাদেরও উৎসাহ দিতেন এই বলে ঃ 'দেখ মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই।'[১] চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য, এরই সাথে মিলিত

হয়েছিল তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা তাঁকে সাহায্য করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই শিক্ষাগ্রহণেও ছিল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। অসাধারণ পতিনিষ্ঠা যেখানে অন্যান্য নারীকে স্বীয় স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করায়, সেখানে মা দেখিয়েছিলেন তাঁর স্বাতন্ত্র্য। সতীসাধ্বী নারীর মতো পতিকে অনুসরণ করেও তিনি স্বীয় স্বাধীনতা বিসর্জন দেননি, বরং যেখানেই বুঝেছেন সেখানেই নিজস্ব মতামত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন। ঠাকুরের ত্যাগী-শিষ্যদের বেশী করে খেতে দেওয়া, প্রথমজীবনে দুশ্চরিত্রা ছিল এমন একজন বৃদ্ধার সাথে গল্প করা, মুক্তহস্তে ফল বিলিয়ে দেওয়া, চরিত্রহীনা মহিলার হাতে ঠাকুরের খাবার পাঠানো ইত্যাদি কয়েকটি ঘটনায় তিনি নিজস্ব মতামত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছিলেন যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা ছিল ঠাকুরের বিপরীত। আবার পরবর্তী জীবনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মায়ের কাছে বার বার সন্ন্যাস প্রার্থনা করলেও মা তাতে সম্মতি জানাননি যদিও ঠাকুর নিজে গিরিশবাবুর জন্য গেরুয়াবস্ত্র আলাদা করে রেখেছিলেন। এই ঘটনাগুলিতেই বোঝা যায় মা প্রথম থেকেই স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন এবং যেটি ঠিক বুঝেছেন সেটিই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। সতীত্ব বা পতিনিষ্ঠার ধারণার সাথে দাস-মনোভাবের মিশ্রণ যেযুগে স্বাভাবিক ছিল, মা সেখানে পতিনিষ্ঠা বজায় রেখেছেন স্বীয় স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই।

এই স্বাধীন চিন্তা মায়ের পরবর্তী জীবনেও দেখতে পাই। প্লেগের সেবাকাজে টাকার জন্য বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করে দেবার প্রস্তাব এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে পূজার ব্যবস্থা না রাখার প্রসঙ্গে মা কিভাবে যুক্তির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করেছিলেন তা পাঠকমাত্রেরই জানা। প্রথমোক্ত ব্যাপারে স্বামীজীর মতকে খণ্ডন করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। শুধু স্বামীজীই নন, ঠাকুরের অন্যান্য সন্ন্যাসী-শিষ্যেরাও সমস্যায় পড়লে মায়ের কাছে সমাধান চাইতেন। এমনকি মায়ের কথায় তাঁরা আপত্তি করলেও মা তাঁর সিদ্ধান্ত পালটাতেন না। বেলুড় মঠ থেকে চুরির অপরাধে বিতাড়িত এক চাকরকে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাবুরাম মহারাজ সামান্য সঙ্কোচ করলে মা দৃঢ়কণ্ঠে তাঁকে আদেশ দেন : 'আমি বলছি, নিয়ে যাও।' স্বামীজী, রাজা মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্যেরা মাকে কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিকতার জন্যই সম্মান করতেন না, মায়ের বুদ্ধিমত্তা ও প্রশাসনিক দক্ষতার উপরও তাঁদের গভীর আস্থা ছিল বলেই তাঁরা মাকে সঙ্ঘজননী বলে মান্য করতেন। কথামৃত-সংকলক মাস্টারমশাই মায়ের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাদান ও সমাজসেবার কাজকে 'ঠাকুরের কাজ' বলে পরে মেনে নিয়েছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বামীজীর জীবিতকালে মাস্টারমশাই সেবাকাজকে ঠাকুরের ভাবের বিরোধী বলে মনে করতেন। কিন্তু মা যখন কাশীতে মিশনের হাসপাতাল দেখে মন্তব্য করলেন 'এসব তাঁরই (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাজ', মাস্টারমশাই তাঁর দীর্ঘকালের ধারণা ত্যাগ করে সেবাকাজকে সাধনা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

এই যুক্তিনিষ্ঠার ফলে মা বহু তুচ্ছ আচারকে উপেক্ষা করে অপরকে যথার্থ সত্যের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। দেশাচার যে তিনি মানতেন না তা নয়, তবে অনর্থক যে-দেশাচার পদে পদে জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, মানুষকে পিষে

মারে, তাকে মা কখনও সমর্থন করেননি। তৎকালীন যুগে বিধবা নারীদের সম্বন্ধে সমাজ যে-সমস্ত কঠিন আচার-বিচার স্থির করে দিয়েছিল সে-সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'ঐসব খুঁটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না ; ...যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তা-ই করবে।'[২] বেশ কয়েকজন বিধবা মহিলাকে তিনি খাওয়া-দাওয়ায় কঠোরতা করতে মানা করেছিলেন, জয়রামবাটীর মতো রক্ষণশীল গ্রামেও নিজে মাংস রান্না করে ভক্তদের খাইয়েছেন। মহিলাদের অনর্থক শুচিবাইয়ের প্রতি ছিল তাঁর স্বাভাবিক বিরাগ। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ঃ 'বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? শুচিবাই! মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না। ...শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে।'[৩]

এই তুচ্ছ আচারকে অতিক্রম করেই মা স্বামীজীকে বিদেশে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তৎকালীন যুগে সমুদ্রযাত্রার বিষয়ে পণ্ডিতদের আপত্তি কত তীব্র ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' বইয়ে। যেসব হিন্দু সেযুগে সমুদ্রযাত্রা করত, ফিরে এলে তাদের একঘরে করা হত। মা কিন্তু এই দেশাচারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই স্বামীজীকে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি দিয়েছিলেন। যেখানে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যক্তিও বলেছিলেন, সন্ন্যাসী হয়ে ম্লেচ্ছদেশে যাওয়া উচিত নয়, সেখানে মা গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণী হয়েও স্বামীজীকে আমেরিকা যেতে অনুমতি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন—সবিস্ময়ে ভাবতে হয়, তৎকালীন যুগে মা কতদূর যুক্তিনিষ্ঠা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

মা সব সময়েই আবেগসর্বস্বতাকে পরিহার করতে শিখিয়েছেন। হৃদয়বৃত্তির আধিক্য অনেক সময়েই শ্রেয়ঃ-চিন্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ভাবাবেগের মত্ততা যুক্তিবোধকে নষ্ট করে। আবেগ প্রবল হয়ে উঠে মানুষের শক্তি ও উদ্যমকে নষ্ট না করে ফেলে, সেদিকে ছিল মায়ের তীক্ষ্ম নজর। মায়ের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই যখন তিনি তাঁর এক ভক্তকে ভবিষ্যতে তাঁর কাছে আসতে মানা করেছিলেন, কারণ সেই লোকটি মায়ের পায়ের কাছে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল জপধ্যানে মন বসে না বলে। এই সংস্কারমুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ মন ছিল বলেই মা বিদেশীদের সাথে বসে খেতে আপত্তি করতেন না, নিবেদিতাকে তিনি কলকাতায় নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন।

এই বৈশিষ্ট্য মায়ের চরিত্রের এক বিশেষ সৌন্দর্য যেহেতু এসব কাজে তাঁকে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিতে হয়েছিল। সমাজের ভয় বা লোকের ভয় তাঁকে উচিত পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তাঁর এই সাহসিকতার পরিচয় পাই হরিশকে চড় মেরে দণ্ড দেওয়ার মধ্যে। অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে জয়রামবাটীতে ১৩২২ সালে। সেদিন গৌরী-মা পুরুষের ছদ্মবেশে সন্ধ্যের সময় মায়ের বাড়িতে গেলে ছোটমামী অচেনা পুরুষকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। চিৎকার শুনে মা ধীরভাবে সেখানে

আসেন কি ঘটেছে দেখতে। অচেনা পুরুষের সামনে মা দৃঢ়স্বরে বলে ওঠেন ঃ 'কে রে!' গৌরী-মা ছদ্মবেশ খুললে সকলেই তখন হাসাহাসি করেন। কিন্তু মা সেদিন তাঁর আশ্রিতজনদের রক্ষার জন্য এগিয়ে এসে যে-সাহস দেখিয়েছিলেন, তা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়।

গতানুগতিক ধারায় চলতে অভ্যস্ত মানুষ, অধঃপতিত মানুষের মধ্যে সহসা প্রকাশিত গভীর জীবন-সত্যকে অবজ্ঞায় অগ্রাহ্য করতে চায়। মা কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারমুক্ত চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে নতুন পথের হদিস দিয়েছেন সমাজের তথাকথিত চরিত্রহীনদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ও মন্তব্যে। কলকাতায় মায়ের বাড়ির সামনে একটি লোক তার উপপত্নীর কঠিন অসুখের সময় প্রাণ দিয়ে তার সেবা করে। এই দেখে মা মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'কি সেবাটাই করেছে, মা, এমন দেখিনি! একেই বলে সেবা, একেই বলে টান!'[৪] কোয়ালপাড়া গ্রামে এক ডোমের মেয়ে মাকে এই বলে অভিযোগ করে যে, সে তার উপপতির জন্য সব ছেড়ে চলে এসেছিল, কিন্তু এখন সেই উপপতি তাকে ছেড়ে চলে গেছে। মা তখন সেই লোকটিকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেছিলেনঃ 'ও তোমার জন্য যথাসর্বস্ব ফেলে এসেছে ; এতকাল তুমি ওর সেবাও নিয়েচ ; এখন যদি ওকে ত্যাগ কর, তোমার মহা অধর্ম হবে—নরকেও স্থান হবে না।'[৫] এভাবে মা উভয়ের মধ্যে আবার মিলন করে দেন।

মা তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা ও সংস্কারমুক্ত মনের ফলে তথাকথিত জাতিভেদপ্রথা মানতেন না এবং এজন্য অনেকেই তাঁর কাছে অভিযোগ করত। 'মাগো, [বামুন হয়ে] ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!'[৬] 'শূদ্রের হাতে খাচ্চ?'[৭] 'তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এদের রান্না কেন খাবে?'[৮] —এ-ধরনের অভিযোগ মাকে প্রায়ই শুনতে হত সাধারণ লোকের কাছে। তিনি নিজে অব্রাহ্মণের এঁটো পাতা পরিষ্কার করতে কোন-রকম সঙ্কোচ তো করতেনই না, এমনকি বৈদ্য, শূদ্র, বারুজীবী-বংশীয় লোকের রান্না খেতেও দ্বিধাবোধ করেননি। মায়ের এই সংস্কারমুক্ত মনকে স্বীকার করতে না পেরে গোলাপ-মা একবার তীব্র আপত্তি জানালে মা গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়ে-ছিলেন ঃ 'শুদ্দুর কে, গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?'[৯] জাতিভেদপ্রথার উপর মায়ের এই বিরূপতার জন্য গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারেরা তাঁকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন, কিন্তু মাকে এই পথ থেকে টলানো যায়নি।

কেউ কেউ মায়ের জীবনের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা তুলে দেখাতে চান যে, মা জাতিভেদপ্রথা সমর্থন করতেন। কিন্তু আমরা বিপরীত ধারণা পোষণ করি। মা যে অন্ধ জাতিভেদপ্রথায় বিশ্বাস করতেন না তা উপরের ঘটনাগুলি থেকেই প্রমাণিত হয়। অব্রাহ্মণকে পায়ে হাত দিয়ে ব্রাহ্মণের প্রণাম করা চলে কিনা

এ-বিষয়ে এমনকি রবীন্দ্রনাথের মনে দ্বিধা থাকলেও মায়ের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। নানান ঘটনার একটিতে পাই, মা রাধুকে বলেছিলেন এক ডাক্তারকে প্রণাম করতে। রাধু প্রণাম করলে কেউ কেউ আপত্তি তোলে : ডাক্তার জাতিতে কায়স্থ আর রাধু ব্রাহ্মণের মেয়ে ; অতএব এই প্রণাম করাটা সংগত হয়েছে কিনা! মা তার উত্তরে বলেন : সেকি, ডাক্তারবাবু কত জ্ঞানী; বিদ্বান ; তাঁকে প্রণাম করবে না?[১০] মায়ের কাছে তথাকথিত জাতপাতের চেয়ে বড় ছিল মানুষের চরিত্র, মানুষের জ্ঞান, মানুষের কর্ম। মায়ের এই উদার দৃষ্টির একটি নিদর্শন দেখে স্বামীজী আনন্দ-সহকারে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'শ্রীশ্রীমা এখানে (কলিকাতায়) আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ভাবতে পার, মা তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে খেয়েছিলেন! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?'[১১] মা যে অন্ধ জাতপাতে বিশ্বাস করতেন না, স্বামীজীর এই উক্তিই তার প্রমাণ। পাশাপাশি আমরা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম নায়ক বাল গঙ্গাধর তিলকের কথা তুলে ধরলেই বুঝতে পারব মায়ের মহিমময় চরিত্র। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনারিদের আয়োজিত এক চায়ের সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিলক এবং সংস্কার-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। খ্রীষ্টানদের সাথে খেয়েছেন এই অপরাধে তিলক ও রাণাডে দুজনেই পরে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন সমাজনেতাদের নির্দেশিত পথে।[১২]

মায়ের সমগ্র জীবনই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ এবং এই ভাবকেই তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে গেছেন। এ-সত্ত্বেও কিন্তু ধর্মের নামে অলৌকিকতা ও অন্ধ গুরুবাদের প্রশ্রয় তিনি কখনই দেননি। এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে যখন তাঁর দেবীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে কিংবা তিনি নিজে তাঁর স্বরূপের কথা হঠাৎ বলে ফেলেছেন। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই তিনি তা চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। নিজের বহু দৈবীদর্শনও, যাকে সাধারণত অলৌকিক দর্শন বলা হয়, তিনি গোপন রাখতেন। একবার একটি ছাত্র বাড়িতে বসে ভোররাতে দেখে একটি লাল রঙের জ্যোতি উদ্বোধন (বাগবাজার) থেকে কালীঘাট পর্যন্ত গেছে। এতে তার ধারণা হয়, মা হয়তো সেদিন কালীঘাটে গেছেন। এটি পরীক্ষা করার জন্য ছাত্রটি উদ্বোধনে এসে জানে যে, তার ধারণাটি ঠিক। মাকে তখন সে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে মা উত্তর দেন : '[তুমি] ছেলেমানুষ, ওসব খবরে কাজ কি? ..নাহয় সত্যিই দেখেছ, তাতে কি হবে?'[১৩] ধর্মের নামে চিত্তশুদ্ধির চেয়ে অলৌকিক বিষয়গুলির প্রতিই সাধারণ মানুষ বেশী আকৃষ্ট হয়। মা তাই এই অলৌকিকতার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তিনি নিজে তাঁর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং সময় সময় তা প্রয়োগও করেছেন।

গৌরী-মার বসন্তরোগে, পাগলীমামীর হাতে কুষ্ঠরোগে, রাধুর বৈধব্য খণ্ডনে, যোগীন-মার পূজাকালীন অবস্থায়, বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় ইত্যাদি নানা ঘটনায় মা স্পষ্টই তাঁর এই বিশেষ শক্তির প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু এই নিয়ে কোনও আলোচনা তিনি পছন্দ করতেন না।

অলৌকিকতার প্রশ্রয় না দিয়ে মা সাধনভজন ও চিত্তশুদ্ধির উপর জোর দিতেন। কেউ যদি জপধ্যান করতে পারবে না বলত তবে মা তাকে স্পষ্টই শুনিয়ে দিতেন ঃ 'সেকি? ইষ্টমন্ত্র জপ করবে না—সেকি কথা? ইষ্টমন্ত্র জপ না করলে তোমারই যাবে—আমার কি হবে?'[১৪] আবার বলতেন ঃ 'মন্ত্রজপ করতে করতে [মনের ময়লা] কাটবে। না করলে চলবে কেন?'[১৫] তবে তিনি যে-কয়েকজনের প্রতি বিশেষ কৃপা দেখিয়েছেন সেসব অসাধারণ ঘটনা। ঠাকুর যেমন গিরিশ ঘোষকে বিশেষ কৃপা করেছিলেন, মায়ের এই কাজও সেরকম।

এভাবে ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধনভজনের দিকে সাধকদের আকৃষ্ট করার সাথে সাথে মা অন্ধ গুরুবাদেরও বিরোধিতা করেছেন। যারা সাধারণ লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে চাপরাস না পেয়েও গুরুগিরি করে, মা তাদের 'ব্যবসাদার সাধু' বলতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করেননি। তিনি একথাও বলেছেন ঃ 'উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।'[১৬] ধর্মের নামে কেউ সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে দেখলেও মা তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। দুই গৈরিকধারিণীকে তিনি সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন ঃ '[তোমার গুরু] যদি সর্বজ্ঞ হতেন.. তাহলে ঐকথা বলতেন না।'[১৭] অনধিকারী লোক গুরু সেজে বসলে মা যেমন তার প্রতিবাদ করতেন, তেমনই তাদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতেও চেষ্টা করতেন। মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জনৈকা মহিলা লিখেছেন ঃ 'শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আমার মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনে আমাদের বাড়ির গুরু আমায় শাপ দিয়েছিলেন. মাকে সেকথা লিখেছিলুম। মা চিঠিতে উত্তর জানালেন, "যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না। তোমার কোন ভয় নাই।"'[১৮] মার্কিন মহিলা ওলি বুল যখন মাকে প্রশ্ন করেন, 'গুরুর প্রতি কি-ধরনের আজ্ঞাবহতা থাকা দরকার?' মা উত্তর দেন ঃ '[গুরু নির্বাচন করবে এবং] শিষ্যত্বে উপনীত হবার পর তাঁর আধ্যাত্মিক উপদেশ মেনে চলবে, কিন্তু জাগতিক বিষয়ে নিজস্ব স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে, এমনকি যদি তা গুরুর উপদেশের বিরোধী হয় তাহলেও।'[১৯]

মায়ের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তা এসেছে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ সংস্কারমুক্ত মনের জন্যই। জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলে মা নিতান্তই অবলা—পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ তাঁর ঘটেনি, অজ পাড়াগাঁর এক বিধবা ব্রাহ্মণী, বক্তৃতার মঞ্চ বা অসিসম লেখনী যাঁর সহায় ছিল না, কিভাবে সারাটা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন

তুচ্ছ আচারের বিরুদ্ধে তা চিন্তা করলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা তাঁকে শুধু তৎকালীন যুগের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিতই করেনি, তাঁর প্রাণশক্তি সেসব সমস্যার সমাধানে তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিল। মিথ্যা আবেগ, অন্ধ আচার, সাধারণ মানসিক সংস্কার এবং সর্বোপরি সমাজে সমষ্টির অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও বিদ্রোহ মায়ের জীবনে রূপলাভ করেছে। মা তাঁর সীমিত গণ্ডির মধ্য থেকেই বার বার তুলে ধরেছেন মানুষের মুক্তির ব্যাকুলতাকে, উদ্বুদ্ধ করেছেন মুক্তিপিয়াসী মানবমনকে। তিনি যেন চির-কালের বুদ্ধ, অথবা প্রমেথিউসের মতোই স্বর্গ থেকে আগুন ছিনিয়ে আনার কাজে ব্যস্ত। গ্ল্যামার-সচেতন মানুষের কাছে মায়ের এই রূপ ধরা না পড়লেও আজ আমাদের এ-বিষয়ে সচেতন হতেই হবে। সংকীর্ণ সমাজকেন্দ্রিক মানসিকতার জড়তা থেকে মানুষকে মুক্ত করে মা তাদের স্বকীয় ঐশ্বর্যে উদ্ভাসিত করলেন। শুচিবাই, জাতপাত, আচারসর্বস্ব ধর্ম, অলৌকিকতার মোহান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী মায়ের জীবন তাই এক মহাকাব্য। সমসাময়িক এই সমস্যাগুলির সমাধান তিনি করে-ছিলেন তাঁর মহিমময় মাতৃহৃদয়ের সাহায্যে। এইভাবে সমকালীনতাকে তিনি চিরকালীন আবেদন দিয়ে জয় করলেন—কালোত্তীর্ণ মহাকাব্যের মতোই মা তাই চিরদিনের।

তৎকালীন যুগে নারীদের মধ্যে কিছুটা রূপান্তরের ছোঁয়া লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই রূপান্তরের চেহারাটা কেমন ছিল? কেউ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন, কেউবা ইংরেজী কবিতা লিখেছেন, কেউবা বাংলা গদ্য-পদ্য লিখেছেন। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতায় এ-সবই বাহ্য। মানসিক রূপান্তর না ঘটলে, স্বাধীন চিন্তা ও কর্মে প্রবৃত্ত না হলে, প্রকৃত স্বাধীনতা তো আসতে পারে না। তৎকালীন সমাজনেতারা যে-নারীমুক্তির চিন্তা করতেন তা ছিল সীমিত—নারী সেখানে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েই স্বাধীন।

মা কিন্তু নারীকে দেখতে চেয়েছেন প্রকৃত স্বাধীনসত্তার অধিকারিণী হিসাবে, যে-নারী তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করবে কোনও পুরুষের সাহায্য না নিয়ে। গৌরী-মা তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে আশ্রম-বিদ্যালয় গঠন করলে মা তাঁকে বলেনঃ 'মেয়েদের বুঝিয়ে দিও, তারা কেবল থোড়বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়িথোড় করতে [এ-জগতে] আসেনি।'[২০] গৌরী-মায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলতেন ঃ 'এই যে গৌরদাসী; ...গৌরদাসী কি মেয়ে?...ওর মতো কটা পুরুষ আছে? এই স্কুল, গাড়ি, ঘোড়া সব করে ফেললে।'[২১] ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস নাগাদ মঠে গুরুভাইদের উদ্দেশে স্বামীজী বিদেশ থেকে যে-চিঠি লেখেন তা মাকে পড়ে শোনানো হলে মা বলেন ঃ 'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে, নরেনকে দিয়ে এসব লেখাচ্ছেন।'[২২] অর্থাৎ, চিঠিতে প্রকাশিত বক্তব্যকে মা পূর্ণ সমর্থন

জানালেন। ঐ চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ 'গৌর-মা, যোগীন-মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ঐ প্রকার একটা [মঠ] মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে। সেখানে গৌর-মাকে এক বৎসর মহান্ত করিবে...। কিন্তু তোমাদের [অর্থাৎ পুরুষদের] মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না। তারা আপনারা সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না।'[২৩] মা যাকে নিজের মেয়ের মতো দেখতেন সেই রাধুর বিয়ের আগে জনৈক ভক্ত মাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মাস্টারমশাইকে (শ্রীম) উপযুক্ত পাত্রের জন্য বলতে কারণ মাস্টারমশাই তখন মর্টন ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার ছিলেন। উত্তরে মা বলেছিলেন ঃ 'আমি কখনও কাউকে বন্ধনে ফেলবার জন্য বলতে পারব না।'[২৪] সারদেশ্বরী আশ্রমের দুর্গাপুরীকে (তখন কিশোরী ছাত্রী) মা বিশেষ স্নেহ করতেন কারণ এই দুর্গাপুরী ঠিক করেছিলেন সন্ন্যাসিনী হয়ে দেশেব সেবা করবেন। একবার তাঁর ইংরেজী পড়া নিয়ে কোন কোন মহল থেকে আপত্তি উঠলে মা গৌরী-মাকে ডেকে বলেন ঃ 'আমার মেয়ে [দুর্গাপুরী] কিন্তু ইংরিজি পড়বে।'[২৫] নিবেদিতা-স্কুলের সুধীরা দেবী প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষিকাকে স্বাধীনভাবে নারীশিক্ষায় ব্রতী দেখে মা খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন। জনৈকা ভক্তমহিলা তাঁর অবিবাহিতা মেয়েদের বিয়ের জন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলে মা তাঁকে বলেন ঃ 'বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।'[২৬] আর এক সময় মা বলেছিলেন ঃ 'মাদ্রাজের দুটি মেয়ে বিশ-বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা! তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখেছে! আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছর হতে না হতেই বলে—"পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও"!'[২৭]

এইসব মন্তব্য ও ঘটনাবলী থেকেই বোঝা যায় মা নারীমুক্তি সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলেন। বিয়ে করে সংসার করাকে মা ছোট মনে করতেন না, কিন্তু তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন যখন দেখতেন মেয়েরা বিয়ের চিন্তা না করে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশের সেবা করছে। আমরা দেখলাম, বিয়েটাই যে মেয়েদের জীবনে চরম পুরুষার্থ নয় একথা মা বার বার তুলে ধরছেন সকলের কাছে, বিশেষত মেয়েদের কাছে। এ-বিষয়ে মায়ের প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও সমাজচেতনা যে কত গভীর ছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর।

মায়ের মহিমময় চরিত্রে যুক্তিনিষ্ঠা ও ব্যক্তিমানুষের জন্য মুক্তিকামনা গভীর ছিল তা আমরা দেখলাম। সাধারণ এক শাড়িতে বিভূষিতা মা অগ্নিশিখার মতোই বার বার উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন, পুড়িয়ে দিচ্ছেন অন্ধ আচারকে। কিন্তু তা বলে কেবল ভাঙনের জয়গান গাইতেই তো তিনি আসেননি, তিনি এসেছিলেন সমাজকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে দিতে। নির্বিচারে সবকিছুকে গ্রহণ করতে যেমন তিনি

অরাজি ছিলেন, নির্বিচারে সবকিছুকে বর্জন করতেও ছিল তাঁর আপত্তি। যুগ-যুগান্তর ধরে যে-মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে, সেই অভিজ্ঞতাকে ইতিহাস-বিরুদ্ধ মানসিকতা দিয়ে উড়িয়ে দিলেন না তিনি ; যা অচল তাকে বাদ দিয়ে, যা গতিশীল তাকে আরও উজ্জ্বল করে তাঁর সুদূরপ্রসারী মননশক্তি দিয়ে তুলে ধরলেন এক উদার সমাজচেতনা। প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নিয়ে এলেন নবদিগন্তের সন্ধান যা মানুষকে এগিয়ে দেয় সমন্বয়সাধনে।

দেশের স্বাধীনতার জন্য মায়ের আগ্রহ ছিল খুবই। ব্রিটিশ-রাজত্বের অবসানের ইচ্ছা তিনি খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করতেন। মায়ের দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ছাত্র-যুবক ও মধ্যবিত্তেরা। স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ব্রিটিশ-পুলিস দুজন মহিলাকে লাঞ্ছিত করলে মা প্রকাশ্যেই বলেন : 'এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে [পুলিসকে] দু চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?'[২৮] জয়রামবাটীর মাটি মাথায় স্পর্শ করে মা উচ্চারণ করেছিলেন সেই মহামন্ত্র—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।[২৯] মায়ের অতি প্রিয় কোয়ালপাড়া আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা স্বদেশী-প্রচারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকজন গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্য বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য পুলিসের নজরবন্দী ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দেখে মা বলতেন : 'আহা, কি-সব চাঁদের মতো ছেলে, দেশের জন্যে কতই-না দুঃখলাঞ্ছনা ভোগ কচ্ছে!'[৩০] স্বভাবতই ব্রিটিশ-পুলিসের সন্দেহ মায়ের উপর ঘনীভূত হতে থাকে। জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে যারা যেত, সকলেরই নাম ও ঠিকানা থানা থেকে পুলিস এসে লিখে নিয়ে যেত। এমনকি সাদা-পোশাকের পুলিস মায়ের বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। পুলিসের সন্দেহ গভীর হওয়ায় একবার একজন গোয়েন্দা ভক্তের ছদ্মবেশে মায়ের কাছে বেশ কিছুদিন থাকেন ; পরে অবশ্য অনুতপ্ত হয়ে গোয়েন্দা-পুলিসটি মায়ের শরণ নেন এবং দীক্ষা পেয়ে কৃতার্থ হন।[৩১]

দেশের স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেও মা সব সময়েই লক্ষ্য রাখতেন বিপ্লবীদের সংগ্রাম যেন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয় না দেয়। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় ব্রিটিশদের সম্বন্ধে তিনি বলতেন : 'তারাও তো আমার ছেলে।'[৩২] মা যে কতদূর সমাজসচেতন ছিলেন তার পরিচয় পাই যখন দেখি উগ্র জাতীয়তাবাদের বদলে তিনি জোর দিচ্ছেন উদার জাতীয়তাবাদের প্রতি, কারণ এই উদার ভাবই মানুষকে আন্তর্জাতিক করে তোলে। তাঁর বিপ্লবী শিষ্যদের তিনি বলতেন : 'শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু, সবের মূল ঠাকুর [শ্রীরামকৃষ্ণ]—তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।'[৩৩] মায়ের এই উক্তির দুটি তাৎপর্য। প্রথমত, মায়ের কাছে ঠাকুরের বিশেষত্ব ছিল 'ত্যাগ' ; অতএব ঠাকুরকে ধরে থাকলে বিপ্লবীরা সহজেই ত্যাগব্রতী হতে পারবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ও স্বাধীন ভারতে

রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, ত্যাগের অভাবে অনেকেরই সং প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, ঠাকুরকে ধরে থাকলে বিশ্বের সকল নরনারীর সাথেই আত্মীয়তাবোধ হবে যেহেতু ঠাকুরের অনুরাগী ও ভক্তেরা শুধু ভারতেই নয়, এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। মা তাই দেশের স্বাধীনতা কামনা করলেও লক্ষ্য রাখতেন এই কামনা যেন ক্রমশ বিশ্বমৈত্রীতে পরিণতি লাভ করে। জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে মায়ের এই উদার ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষকেই মুগ্ধ করে।

মায়ের গভীর সমাজচেতনার আর একটি চমকপ্রদ উদাহরণ পাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। যুদ্ধ থেমে গেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন চোদ্দ দফা সন্ধিশর্ত ঘোষণা করেন শান্তির জন্য। পৃথিবীর বড় বড় নেতা যখন এই শান্তিপ্রস্তাবে আনন্দিত, তখন মা কি বললেন? যতীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রেসিডেন্ট উইলসনের সন্ধি-শর্তের কথা মাকে বললে মা উত্তর দেন ঃ 'ওরা যা বলে, ওসব মুখস্থ। ...যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।'[৩৪] অর্থাৎ, বিশ্বশান্তির এই প্রয়াস বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কেবল মুখেই বলে, আন্তরিকভাবে চায় না। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে, এ-বিষয়ে মা কতখানি অভ্রান্ত ছিলেন।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশের ভূমিকা সম্বন্ধেও মা ছিলেন পূর্ণ সচেতন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার উপনিবেশে ব্যবসায়িক স্বার্থে রেলপথ টেলিগ্রাফ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে করে। ফলে সাধারণভাবে লোকেদের কিছুটা সুবিধা হয়। কিন্তু শোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে স্থায়ীভাবে কোন লোককল্যাণ হতে পারে না, মানুষের খাওয়া-পরার কষ্ট দূর হয় না। এই দুটি দিকই মায়ের চোখে ধরা পড়েছিল। একদিন এক ভক্ত দূর থেকে ট্রেনে করে তাড়াতাড়ি এসে মায়ের কাছে পৌঁছালে মা তখন ব্রিটিশের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রশংসা করেন। ভক্তটি উৎসাহ পেয়ে ব্রিটিশের আরও প্রশংসা করলে মা তাকে শুনিয়ে দেন ঃ 'কিন্তু, বাবা, ঐসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।'[৩৫]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিভাবে প্রলোভন দেখিয়ে ভারতীয়দের নষ্ট করেছে সে-সম্বন্ধে মায়ের মন্তব্য ঃ '[আগে] ঘরে ঘরে চরকা ছিল, খেতে কাপাস চাষ হত, সকলেই সুতো কাটত, নিজেদের কাপড় নিজেরাই করিয়ে নিত, কাপড়ের অভাব ছিল না। কোম্পানি এসে সব নষ্ট করে দিলে। কোম্পানি সুখ দেখিয়ে দিলে—টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাও। সব বাবু হয়ে গেল—চরকা উঠে গেল। এখন বাবু সব কাবু হয়েছে।'[৩৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মা যখন এই কথা বলেছিলেন তখন গান্ধীজীর চরকা ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়নি।

আগের কথায় ফিরে যাই। অজ পাড়াগাঁর একজন সামান্য বিধবা ব্রাহ্মণী হয়েও মা যেভাবে অনর্থক দেশাচার, যুক্তিহীন জাতপাতের বন্ধন, অন্ধবিশ্বাস, রোমান্টিক ধর্মের অলৌকিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তা শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর

ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। মায়ের জীবনও তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই 'ফেনোমেনন'। যুক্তিহীন দেশাচার-কালাচারের উপর তিনি তো শুধু নিজেই ওঠেননি, টেনে তুলতে চেয়েছেন তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদেরও। নিজে গুরু হয়েও অন্ধ গুরুবাদের বিরোধিতা করে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি এক অপূর্ব আদর্শের সন্ধান দিয়ে গেছেন। সমাজের আচার ও বন্ধন থেকে ব্যক্তিমানুষকে তো বটেই, যথার্থ নারীমুক্তির স্বরূপটিও দেখিয়ে তিনি নারীসমাজকেও মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

পাশ্চাত্য-মানদণ্ডের-বিচারে-অভ্যস্ত পণ্ডিতদের কাছেও মায়ের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতা বিস্ময়কর ঘটনা। বক্তৃতা করে বা প্রবন্ধ লিখে মা কখনও আত্মপ্রকাশ করেননি ঠিকই, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ও সারদেশ্বরী আশ্রমের মতো দুটি পৃথক সন্ন্যাসী-সংঘ ও সন্ন্যাসিনী-সংঘের সংঘজননী হিসাবে তিনি পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অপূর্ব পরিচালিকা-শক্তির। বস্তুতপক্ষে, মায়ের নির্দেশেই এই বিরাট সংঘ দুটি পরিচালিত হত। প্রশ্ন হতে পারে ঃ বুদ্ধদেব কিংবা রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপও তো সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সংঘ পরিচালনা করেছেন, তাহলে মায়ের বৈশিষ্ট্য কোথায়? বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, বুদ্ধদেব কিংবা ক্যাথলিক পোপ কেউই নারীদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেননি, উভয় ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসিনীরা সন্ন্যাসীদের নির্দেশে কাজ করেন। মায়ের আদর্শকে অনুসরণ করে যেসব সন্ন্যাসিনী-সংঘ গড়ে উঠেছে (সারদেশ্বরী আশ্রম, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন) সেগুলির সর্বোচ্চ পদে চিরকাল সন্ন্যাসিনীরাই রয়েছেন, এবং তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, কোন সন্ন্যাসীর অধীন নন। মা তাই ইতিহাসে অনন্যা। নারী যে নিজ শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে পারে, সমাজে স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল ভূমিকা নিতে পারে—মা এটি বাস্তবে দেখিয়ে গেলেন। আগামী ইতিহাস, আগামী প্রজন্ম তাই চিরদিন ধরে মায়ের পায়ে প্রণাম জানাবে।

যুক্তিনিষ্ঠা ও মননশীলতার সাহায্যে মা সমকালীন যুগের তাৎপর্য ও ঘটনা-পরম্পরা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, মা এমন এক সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন যা নবজাগরণের অন্যান্য নায়কদের থেকে কম তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, মৌলিক ও ব্যবহারিক।

অগ্রদূত হিসাবে রামমোহন মননশক্তির পরিচয় দিলেও তাঁর প্রয়াস মূলত সভাস্থাপন ও সংবাদপত্রে মসীযুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর কাছে যা ছিল মনননিষ্ঠ প্রত্যয়, বিদ্যাসাগর তাকেই জীবনক্ষেত্রে সাকার করে তুললেন। বিদ্যাসাগর যাকে প্রাণের সাড়ায় মুখর করে তুলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সমাজ-বিকাশের সূত্র হিসাবে দেখতে চাইলেন। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর যুগপর্বে যেমন স্বাধীন ব্যক্তিত্বের জয়গান উঠেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকে তেমনই স্বাধীন সমাজের আকৃতি সমস্বরে প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের কাল থেকে এই দুটি ধারা সমভাবে পুষ্ট হয়ে ব্যক্তিমুখর স্বাধীন সমাজের তাগিদ এল, যার অন্যতম ফলশ্রুতি স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

আর মায়ের মধ্যে কি 'দেখি?' অন্ধবিশ্বাস ও বিচারহীন আচার বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ধর্মের জাগরণের যে প্রয়াস রামমোহনের মধ্যে ছিল, সেই প্রয়াসের অনুরূপ মায়ের মধ্যেও দেখা যায়। তফাৎটা হল—রামমোহনের কাছে ধর্মটা ছিল code

of conduct, ধর্মের বাস্তব উপলব্ধি তাঁর কাছে তেমন জরুরী বলে মনে হয়নি, আর মায়ের দৃষ্টিতে ধর্মের প্রধান লক্ষণ হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও কর্মে দেবত্বের প্রকাশ। নারীমুক্তির মন্ত্র খুঁজতে গিয়ে বিদ্যাসাগর আশ্রয় করেছিলেন মানবতা-বোধকে, তা উজ্জ্বলতর ও পূর্ণতর রূপে বিকাশলাভ করেছিল মায়ের মধ্যে। দেশী-বিদেশী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু তার চেয়েও বেশী নজর দিতে হবে মনন ও আত্মশক্তির বিকাশে—মা এই পথেই নারীমুক্তির সঠিক সূত্রটি ধরিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নারী যে পুরুষের মতোই সমাজের পরিচালিকা-শক্তি হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে পারে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের তেমন কোন প্রয়াস আমরা দেখতে পাই না, যদিও মায়ের মধ্যে আমরা এরই বাস্তব উদাহরণ দেখি। একদিকে অন্ধ জাতপাতের বিরোধিতা, অপরদিকে 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে' উক্তির সাহায্যে মা বুঝিয়ে দিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ নয়, সকল ধর্মের ভারতীয়দের সম্মিলিত করে সমন্বয়বাদী আদর্শের মধ্যেই যথার্থ মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। সমাজের মুক্তিকে উচ্চস্থান দিলেও মা দেখিয়ে দিলেন—সমাজ যেহেতু ব্যক্তিরই সমষ্টি, অতএব ব্যক্তিমানুষের মুক্তি না ঘটলে সামাজিক মুক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মা তাই সমাজকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেওয়ার চেয়ে ব্যক্তিমানুষ গঠনের উপর জোর দিতেন। মননশীলতা, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষের উদ্বোধন যদি না ঘটে তবে যে-কোন সামাজিক বিপ্লবই ভবিষ্যতে পথ হারাতে পারে। উগ্র জাতীয়তাবাদের সাহায্যে কেবল ইংরেজ-বিদ্বেষকে পাথেয় করে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলুক, মা এটি কখনও চাননি যদিও তিনি বিপ্লবীদের 'চাঁদের মতো ছেলে' বলে প্রশংসা করেছেন। মা যে-জাতীয়তাবোধের উন্মেষ চেয়েছিলেন তা উদার জাতীয়তাবোধ যা বিদেশীদের কাছ থেকে ভাল জিনিস গ্রহণে আপত্তি করবে না, যে-উদার জাতীয়তাবোধ পরিণতি লাভ করবে আন্তর্জাতিকতাবাদে। বিশ্বমৈত্রীকে উপেক্ষা করে—এমন কোন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদকে মা প্রশ্রয় দেননি। তাঁর জীবনের শেষ বাণীতে সেই অমৃতবার্তা: 'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।'[৩৭]

জাগতিক দৃষ্টিতে অজ পাড়াগাঁয়ের একজন সামান্য বিধবা ব্রাহ্মণী হলেও প্রখর যুক্তিনিষ্ঠা ও তীক্ষ্ন মননশীলতার সাহায্যে মা কিভাবে অপূর্ব সমাজচেতনার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা আমরা দেখলাম। এখানে আমরা শুধু মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে পাঠককে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর সমাজচেতনার মূল সূত্রগুলি দেখাবার চেষ্টা করেছি। মায়ের ধর্মবোধ, জীবনদর্শন, শিক্ষাদানপ্রণালী, অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের তাৎপর্য নিয়ে যদিও আলোচনা করা উচিত ছিল আমাদের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট-ভাবে তুলে ধরতে, তা সত্ত্বেও আমরা এ থেকে বিরত হলাম।

আদর্শ গৃহধর্ম ও সারদাদেবী

আমরা সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থবুদ্ধির অধীন, প্রাত্যহিক নানা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। লোভ, অন্যায় ও পাপ বোধে আমরা শঙ্কিত নই, তাই এখন সমাজে নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন এত বেশী। এই অধঃপতন থেকে সমাজকে উদ্ধার করবার জন্য শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী লজ্জা, বিনয়, সদাচার, কর্তব্য-নিষ্ঠা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে আমাদের মাঝে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভাবের ঠাকুর। উচ্চতর ভাবজগতে তাঁর মন ঘুরে বেড়াত। আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে সরে গিয়ে তিনি শুধু সাধনা নিয়েই ছিলেন। আর শ্রীশ্রীমা গৃহের শত কর্তব্য-কাজের মধ্যে, গৃহস্থের আদর্শ-ধর্ম পালন করে আদর্শ গৃহধর্মের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ঠাকুরের হাতে ষোড়শীপূজার অঞ্জলি গ্রহণ করেও, আদ্যাশক্তি-রূপে আধ্যাত্মিক মার্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে লীলা করতে এসেও, বহু-জনের মঙ্গলের জন্য সংসারভূমিতে মনটি নামিয়ে শ্রীশ্রীমা আদর্শ গৃহধর্মের আচরণগুলি দেখিয়ে গেছেন।

আমাদের দেশ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর দেশ। শ্রীমা সেই সনাতন ঐতিহ্যের একালিন্ সার্থক প্রতিনিধি। তাঁর আবির্ভাব ও তাঁর আদর্শ গৃহধর্মের আচরণ আমাদের দেশের সকল গৃহিণীর একান্ত অনুকরণযোগ্য। আমরা এই আলোচনায় দেখব আধুনিক স্বার্থ-বিজড়িত সংসারে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি গৃহী-মানুষের শ্রীশ্রীমায়ের কর্মজীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবী উভয়েরই জীবনাদর্শ এক। পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে যে অনন্ত আনন্দের স্থায়ী উৎস আছে সেইদিকে উভয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু সেই আদর্শ তাঁরা প্রচার করেছেন দুটি ভিন্ন পরিমণ্ডলে থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের মধ্যে গৃহীদের অনুসরণযোগ্য অনেক আদর্শ থাকলেও তাঁর জীবনযাত্রায় 'ত্যাগসম্রাট' রূপটিই বেশী পরিস্ফুট। আর সারদাদেবী অন্তরে ত্যাগীশ্বরী হয়েও গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত থেকে সাধারণ নারীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন—'গৃহী-ভক্তদের গার্হস্থ্য-ধর্ম শেখাবার জন্য।'[১] শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে বলেছিলেন যে, জগতের জন্য সারদাদেবীকে তাঁর নিজের চেয়েও অনেক বেশী করতে হবে। এই কথা বলার একটি কারণ সম্ভবত এই যে, সারদাদেবীকে গৃহীদের জন্য আদর্শ স্থাপন করতে হবে, যারা সমাজের বৃহত্তম অংশ। বস্তুত, 'সামাজিক জীব' মানুষের সমাজসচেতনতার প্রথম সূত্রপাত গৃহে। 'Charity begins at home'—ইংরেজী প্রবাদ। শুধু 'চ্যারিটি'ই নয়, যেসব সদ্গুণের জন্য মানুষ 'মানুষ' তার সবগুলিরই সূচনা এবং অনুশীলনের ক্ষেত্র পারিবারিক জীবন। সমাজ হল পরিবারের সমষ্টি। প্রতিটি গৃহই সমাজসৌধের এক একটি অঙ্গ।

এবং সেই গৃহও একান্তভাবে নির্ভরশীল গৃহিণীর উপর। তাই সারদাদেবীর জীবনে এবং উপদেশে গৃহধর্মের কি কি আদর্শ রূপ পেয়েছে এটি পর্যালোচনা করা গার্হস্থ্য-জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে তো বটেই, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমা সারদাদেবীর গার্হস্থ্য-জীবনের সূত্রপাত শৈশব থেকে কৈশোরে উপনীত হবার আগেই। সেই বয়স থেকেই তিনি গৃহধর্মের আদর্শ দেখিয়েছেন। ছোট ছোট ভাইবোনেদের দেখাশুনোর দায়িত্ব অনেকটা এসে পড়েছিল বালিকা সারদার উপরে। তাদের নিয়ে গিয়ে আমোদর নদে স্নান করিয়ে আনতেন রোজ। মা শ্যামাসুন্দরীকে রান্না ও অন্যান্য গৃহকাজে সাহায্য করা বালিকার নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মায়ের সঙ্গে মাঠে গিয়ে তুলো এনে পৈতে কাটা, গলা-সমান জলে দাঁড়িয়ে গরুর জন্য দলঘাস কাটা, খেতে মজুরদের জন্য মুড়ি-গুড় পেঁছে দেওয়া—সব কাজেই বালিকার আগ্রহ ও নৈপুণ্য। শুধু একটি কাজ বালিকা তখন ইচ্ছে থাকলেও করতে পারতেন না। আট-নয় বছরের মেয়ে ছোটহাতে ভাতের অত বড় হাঁড়ি উনুন থেকে নামাতে পারতেন না, তাই বাবা এসে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দিতেন। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান নষ্ট করে দিলে অন্যদের সঙ্গে বালিকা সারদাও মাঠময় ছিটিয়ে পড়া সেই ধান কুড়িয়ে এনেছেন। জীবন থেকে সরে গিয়ে নয়, জীবন-যুদ্ধের ছোট-বড় সমস্ত দাবিকে পূরণ করেই গৃহধর্ম সার্থক করে তুলতে হয়। সেই দাবি পূরণ করার জন্য যে সাহস, শক্তি ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তার প্রকাশ শ্রীমার জীবনে সেই বালিকা-অবস্থা থেকেই দেখা যায়।

বিবাহের পর স্বামীর কাছে কিশোরী সারদার গৃহধর্মের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে ঃ গৃহস্থের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, তথাপি তাঁকে সর্বদা কর্ম করতে হবে এবং সেই সমস্ত কর্ম তিনি ব্রহ্মে সমর্পণ করবেন।[২] অর্থাৎ গার্হস্থ্য-জীবনের কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রে থাকবে ধর্ম, ঈশ্বরনির্ভরতা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাও অনুরূপ ছিল। সারদাকে তিনি ত্যাগোজ্জ্বল ধর্মজীবন যাপনের আদর্শ যেমন শেখালেন, সঙ্গে সঙ্গে শেখালেন দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ, দেব-দ্বিজ-অতিথি সেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ, সকলের সঙ্গে যথোপযুক্ত সহৃদয় ব্যবহার—'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন'। নৌকায় বা গাড়িতে যাবার সময় সঙ্গের জিনিসপত্র সম্বন্ধে কতটা সতর্ক হতে হয়, প্রদীপের সলতে কিভাবে পাকাতে হয় প্রভৃতি খুঁটিনাটিও বাদ গেল না এই শিক্ষাসূচী থেকে। এরই সঙ্গে শ্রীমাকে কর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'কর্ম করতে হয় ; মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা সব আসে।'[৩] পরবর্তীকালে শ্রীমার মধ্যে প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজের প্রতি যে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও নৈপুণ্য দেখা গেছে, দিনরাতের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেও তাঁর মধ্যে যে সদাপ্রসন্নতা লক্ষিত হয়েছে—

শ্রীমার স্বাভাবিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও পিতৃগৃহের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সার্থক সংযোগের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। মা বলতেন ঃ 'কাজই লক্ষ্মী',[৮] 'কাজে দেহ-মন ভাল থাকে'[৯], 'একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।'[১০] এক ব্রহ্মচারীকে বলেছিলেন ঃ 'আশীর্বাদ কর, যতদিন আছি, যেন কাজ করেই যেতে পারি।'[১১]

পরিবার সচল থাকে পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির ত্যাগ ও সেবার ফলে। শ্রীমার ত্যাগ ও সেবার জীবনের সূচনা শৈশবেই। পিতৃগৃহের ছোট-বড় যে-কোন কাজে আত্মনিয়োগ করতেন, সেকথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়াও মায়ের ছেলেবেলায় বাঁকুড়া জেলা জুড়ে যখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, শ্রীমা তাঁর মায়ের সঙ্গে গ্রামবাসী সবার জন্য খিচুড়ি রান্না করেছেন। গরম খিচুড়ি পাতে দেওয়া হলে অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় ছোট দুই হাতে পাখা দিয়ে হাওয়া করেছেন যাতে সেই খিচুড়ি ঠাণ্ডা হতে পারে, ক্ষুধার্ত মানুষ তাড়াতাড়ি তা মুখে দিতে পারে।

তাঁর সেবিকা-জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় সেবা। দক্ষিণেশ্বরের নহবতের ছোট্ট ঘরে স্বেচ্ছানির্বাসিতা থেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই সেবায়। একই সঙ্গে পরমনিষ্ঠায় করতেন শাশুড়ীর সেবা। শাশুড়ীর সেবা তিনি শুধু কর্তব্যবোধে করতেন না। প্রাণের টান, আন্তরিক যত্ন ও শ্রদ্ধা তাতে সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর পরবর্তীকালের আলাপচারীতে প্রকাশিত হয়েছে, শ্বশুর-শাশুড়ীর চরিত্রমাহাত্ম্যে তিনি কতটা গৌরববোধ করতেন। এসবের সঙ্গে ছিল ঠাকুরের কাছে যেসব স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত আসতেন তাঁদের সেবাও। এক-একজন ভক্তের জন্য এক-এক রকম রান্না করতে হত। নরেনের জন্য এক রকম, গিরিশের জন্য এক রকম। সারাদিন মায়ের এই রান্নার কাজেই যেত। তবু তাঁর কিছুতেই ক্লান্তি ছিল না। কোন অভিযোগ ছিল না। অতিথিসেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম। এই অতিথিসেবা তথা ভক্তসেবা শ্রীমা করতেন পরম যত্নে। এবং এই সেবাকেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবার অঙ্গ বলেই গণ্য করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। খাদ্যের শুধু দ্রব্যদোষই নয়, স্পর্শদোষও (অর্থাৎ খাদ্য প্রস্তুতকারী বা সরবরাহকারীর চারিত্রিক দোষও) তাঁর শরীরকে প্রভাবিত করত অবিশ্বাস্যভাবে। মানুষকে দেখলেই তিনি তার অন্তস্তল পর্যন্ত পড়ে ফেলতেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভক্ত অথচ প্রকৃতপক্ষে চরিত্রহীন ভদ্রলোকের দেওয়া জল তিনি খেতে পারেননি, চরিত্রহীনা নারী যে ভাতের থালা স্পর্শ করেছে, তা থেকে অন্ন গ্রহণ করতে তাঁর হাত বার বার সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, আবার তাঁরই এক শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী-ভক্ত অসতর্কতাবশত তাঁর ভাতের থালার উপর নিঃশ্বাস ফেলে দিলে সেই অন্নও তিনি গ্রহণ করতে পারেননি—এইসব উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে

পাওয়া যায়। এমন 'অ-সাধারণ' মানুষের সেবার দায়িত্বে থেকে তাঁর শরীররক্ষা করে যাওয়া কতটা কঠিন কাজ সহজেই অনুমেয়। শ্রীমা সেই কাজ সার্থকভাবে করেছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে ঠাকুরের প্রতিটি সেবাকাজের পিছনে শ্রীমাকে কতখানি যত্ন ও চিন্তা প্রয়োগ করতে হত। একবার ঠাকুরের অসুখ হলে, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন জল বন্ধ করে ওষুধ খাওয়াতে বললেন। এমনকি, বেদানা পর্যন্ত জল পুঁছে খাওয়ানোর নির্দেশ দেন। বালক-স্বভাব ঠাকুর যাকে দেখছেন তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন: 'হ্যাঁগা, জল না খেয়ে পারব?...জল না খেয়ে কি থাকা যায়?' পাঁচ বছরের ছেলেকেও একই কথা জিজ্ঞাসা করছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলে মা সাহস দিয়ে বললেন: 'পারবে বৈকি।'[৮] ঠাকুর তখন মনস্থির করে জল খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে জলের প্রয়োজন, তা পূরণ করার জন্য মা ঠিক করলেন ঠাকুরকে দুধ খাওয়াবেন। পাঁচ-ছয় সের দুধ মা জ্বাল দিয়ে ঘন করে কমিয়ে একসের দেড়সের করে এনে ঠাকুরকে খাওয়াতেন। ঠাকুরকে জানতে দিতেন না দুধের আসল মাপ কত। কারণ ঠাকুর জানতে পারলে অত দুধ কিছুতেই খাবেন না। শ্রীমায়ের সেবাযত্নে এইসময় ঠাকুরের বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছিল। এতটা যত্ন, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতা ছিল বলেই শ্রীমার সেবা সম্পর্কে বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সর্বদা একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতা লক্ষ্য করা যেত।

শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবা করেছেন সম্পূর্ণ অন্তরালে থেকে। মন্দিরের সমস্ত খবরাখবর রাখাই যাঁর কাজ, সেই খাজাঞ্চীও কখনও তাঁকে দেখতে পাননি। পরবর্তীকালে যখন জগজ্জননীরূপে জনসাধারণ তাঁকে জেনেছে, তখনও নিতান্ত অন্তরঙ্গরা ছাড়া মায়ের শ্রীমুখ দর্শন বা কণ্ঠস্বর শ্রবণের সৌভাগ্য খুব বিরল কয়েকজনেরই হত। প্রণামের সময় ভক্তরা শুধু তাঁর চরণদুটি দেখেই তৃপ্ত থাকত। চিরকাল তিনি লজ্জাপটাবৃতা, অন্তরালবর্তিনী। সেই মা-ই কিন্তু ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় সমস্ত সংকোচ উপেক্ষা করে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে এসে ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করেছেন—যেখানকার পরিবেশে নিজেকে দক্ষিণেশ্বরের মতো আড়ালে রাখা প্রায় অসম্ভব। ঘটনাটি প্রমাণ করে, পতিসেবার প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকেও বরণ করে নিতে তিনি কতটা প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা মানে শুধু তাঁর পথ্যপ্রস্তুতই নয়, তাঁর 'ইষ্টপথে' সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের পরই দিয়েছিলেন, তা-ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবারই অন্তর্গত।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সেবার আরও একটি দিক ছিল। এই অদ্ভুত মানুষটির ভাববৈচিত্রের থৈ ছিল না। কখনও তিনি মাতৃগতপ্রাণ অবোধ শিশু—কখনও বা প্রজ্ঞাগম্ভীর পুরাতনপুরুষ। শ্রীচৈতন্যের মতো তাঁরও কখনও অন্তর্দশা—তখন জড়বৎ চিত্রার্পিতের মতো বাহ্যশূন্য হয়ে থাকেন, কখনও বা অর্ধবাহ্যদশা—তখন প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করেন। আবার কখনও বা বাহ্যদশা—তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিচিত্র আধ্যাত্মিক অবস্থাগুলি শ্রীমা সর্বদা ঠিক ঠিক বুঝতে পারতেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতেন। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর কালীমন্দিরে গেছেন। মা সেই অবসরে ঠাকুরের ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখছেন। এমন সময় ঠাকুর মাতালের মতো টলতে টলতে মায়ের একেবারে কাছে এসে উপস্থিত। ঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?' কর্মব্যস্তা শ্রীমা বুঝতেও পারেননি যে, ঠাকুর তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পিছনে ফিরে দেখেন, ঠাকুরের চোখ রক্তবর্ণ, কথা অস্পষ্ট, পদক্ষেপ অসংলগ্ন। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে মা ঠাকুরকে আশ্বস্ত করে বললেন ঃ 'না, না, মদ খাবে কেন?' ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তবে কেন টলছি, তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি মাতাল?' শ্রীমা বুঝিয়ে বললেন ঃ 'না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।' ঠাকুর তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন ঃ 'ঠিক বলেছ।'[৯] স্বামী গম্ভীরানন্দ যথার্থই বলেছেন ঃ 'মানবের সেবার একটা ধারা আছে, দেবতারও পূজার বিধি আছে ; কিন্তু দেবতা যখন মানবদেহে আগমন করেন, তখন সম্ভবতঃ শ্রীমায়ের ন্যায় দেবী-মানবীই তাঁহার সর্বপ্রকার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন।'[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ স্ত্রীর মধ্যে শান্ত, দাস্য ও বাৎসল্য ভাবও থাকে। শান্ত ভাবের প্রকাশ হয় স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচলা নিষ্ঠাতে, দাস্য ভাবের প্রেরণায় স্ত্রী প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে এবং বাৎসল্য ভাবের প্রেরণায় স্বামীকে 'প্রাণ চিরে' খাওয়ায়।[১১] শ্রীমায়ের জীবনে এই তিনটি 'ভাবই' পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাঁর জীবন দেখিয়ে দেয়, স্বামীর প্রয়োজনে স্ত্রীর পক্ষে কতটা আত্মবিলুপ্তি সম্ভব। তাঁর এই আত্মবিলুপ্তির পেছনে কোন ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই, প্রতিদানের প্রত্যাশা, এমনকি আত্মবিলুপ্তির স্বীকৃতির অভিলাষটুকুও নেই। কারণ এর মূলে আছে এমন এক ভালবাসা জাগতিক কোন ভালবাসাই যার তুলনা হতে পারে না। এই নিঃস্বার্থ আধ্যাত্মিক প্রেম যদি সামান্য পরিমাণেও সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা যায়, তাহলে দাম্পত্য-জীবন অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে। তখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পান। একজন আর একজনের কাছ থেকে কতটা পেলেন—এই হিসাবে তখন তাঁদের প্রবৃত্তি হয় না।

স্বামীকে কি দৃষ্টিতে দেখা উচিত, সে সম্পর্কে তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তবুও তাঁর উপদেশেও সে সম্পর্কে নির্দেশ আছে। নারীদের তিনি পতিব্রতা হতে বলেছেন। এক বৈরাগ্যবান ভক্তের ধারণা হয় সর্ববিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী স্ত্রীই তাঁর ধর্মজীবন যাপনের অন্তরায়। স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়েও যখন ব্যর্থ হলেন তখন স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, তিনি স্বামীকে চান না ঈশ্বরকে চান। স্ত্রী ঈশ্বরপরায়ণা, স্বামীকেও প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তাই স্বামীর প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর

দিতে পারলেন না। মায়ের কাছে এলে মা কিন্তু সব শুনে তাঁকে বলেছিলেন : 'কেন মা, তুমি কেন বলতে পারনি? তোমার বলা উচিত ছিল, আমি ভগবানকে চাই না, আমি তোমাকেই চাই।'[১২] জনৈকা স্ত্রীভক্তকে মা বলেছিলেন : 'স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাজ-অট্টালিকা।' স্ত্রীভক্তটির স্বামীকে উপদেশ দিয়েছিলেন : 'স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থেকো ; দুজনে যেখানেই থাক সেখানেই রামরাজ্য।'[১৩] দাম্পত্য-বন্ধনকে শ্রীমা এক অচ্ছেদ্য পবিত্র-বন্ধন বলে মনে করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন সব যুগেই।

শুধু স্বামী নয়, পরিবার আরও দশজনকে নিয়ে, যার কেন্দ্রে অবস্থান করেন গৃহিণী। 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। স্বামীজী এই উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন : নারীই গৃহের প্রকৃত স্তম্ভ, চেতন স্তম্ভ।[১৪] পরিবারের বিভিন্ন জনের সঙ্গে নারীর বিভিন্ন সম্পর্ক। একই নারী কন্যা, ভগ্নী, স্ত্রী, মাতা, বধূ, মাতৃস্থানীয়া গুরুজন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্পর্কে পরিবারের বিভিন্ন জনের সঙ্গে যুক্ত। সেই বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের বিভিন্ন জনের দাবিও তার উপরে বিভিন্ন। গৃহের ভরকেন্দ্রে অবস্থান করে যে-নারী ঐ বিবিধ দাবির মর্যাদা সুসমঞ্জসভাবে রক্ষা করে চলতে পারেন তিনিই সার্থক গৃহিণী। শ্রীমা এই অর্থে আদর্শ গৃহিণী। সংসারের রূঢ় বাস্তব রূপ, মানুষের স্বার্থপরতা, আত্মীয়স্বজনদের হৃদয়হীনতার পরিচয় শ্রীমা অনেক পেয়েছেন। ঠাকুরের তিরোধানের ঠিক পরেই তিনি মুখোমুখি হয়েছেন চরম দারিদ্রের সঙ্গে। অন্তর শূন্য, বাইরেও সর্বাঙ্গীণ নিঃস্বতা। ঠাকুরের নির্দেশ মনে রেখে কামারপুকুরে থেকেছেন, নিজে হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে শাক-তরকারি বুনেছেন, শতচ্ছিন্ন কাপড় গিঁট বেঁধে পরেছেন। তবুও কারও কাছে হাত পাতেননি। কারুর বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ-অভিযোগ করেননি, তাঁর মুখের প্রসন্ন হাসিটুকু মলিন হয়নি শত কষ্টেও।

এর কিছুদিন পরেই শ্রীমাকে দেখি এক বিচিত্র সংসারে। সেই সংসারে আছেন অতি স্বার্থপর ভায়েরা, আছেন বিকৃতমস্তিষ্ক ভ্রাতৃবধূ—ভক্তদের পরিচিত 'পাগলীমামী', আছে অবুঝ ভাইঝিরা, 'রাধু' যাদের অন্যতম। একদিকে এইসব আত্মীয়স্বজন, অন্যদিকে রাখাল-শরতের মতো মহাপুরুষ, ত্যাগী সাধুপুরুষ ও ভক্ত নারী-পুরুষ। শুধু ভালকে নিয়ে চলা কিংবা শুধু মন্দকে নিয়ে বসবাস করার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ভালমন্দ উভয়কেই একসূত্রে বেঁধে রাখা। শ্রীমা সেই দুরূহ কাজটিই করেছেন। পিতৃহারা ভাইঝি রাধুকে সন্তানস্নেহে বুকে তুলে নিয়েছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিয়ে দিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে লৌকিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বজায় রেখেছেন। অন্য ভ্রাতৃকন্যাদের—মাতৃহারা নলিনী

ও মাকুর দায়িত্ব নিয়েছেন, খুড়োমশাই নীলমাধবকে আমৃত্যু সেবা করেছেন। শ্রীমা দেখিয়ে গেছেন স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে সকলকে কিভাবে ভালবাসতে হয়, আত্মপর বিবেচনা না করে সংসারে জড়িত না হয়েও কত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া যায়। বিচিত্র বিরুদ্ধ একদল মানুষের মধ্যে অবস্থান করেও সর্বদা মানসিক স্থৈর্য বজায় রেখে এই যে নীরব সেবা—তাকে বর্ণনা করার পক্ষে যে-কোন ভাষাই অক্ষম। কি না করেছেন তিনি এই সংসারের জন্য! রাধুর সহস্র অত্যাচার—শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত—সহ্য করেছেন। পাগলীমামীর অসহনীয় গালিগালাজ 'পাগলের প্রলাপ' বোধেই উপেক্ষা করেছেন। নলিনীদিদির শুচিতার বাতিক যখন সকলের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসার প্রবাহ তখনও তার প্রতি থমকে দাঁড়ায়নি একটুও। ঈর্ষাপরায়ণা ভাই-ভাইঝিদের স্বার্থের কলহ সামলেছেন অসীম ধৈর্যে। ভাবলে অবাক লাগে ঃ এই সংসারের জন্য একদা লোভী ব্রাহ্মণের পায়ে ধরে সাধাসাধি করতে হয়েছে তাঁকে—হাজার হাজার নরনারীর দ্বারা যিনি জগজ্জননীরূপে পূজিতা, স্বরূপত যিনি 'অনুগ্রহনিগ্রহসমর্থা'। যে-কোন মুহূর্তে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ছুড়ে ফেলে দেওয়ার সামর্থ্য থাকলেও যে-সংসারকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন শুধু আদর্শ স্থাপনের প্রয়োজনে সেই সংসার তাঁকে নিপীড়ন করেছে অকৃতজ্ঞভাবে। তবুও সংসারের সেবায় কখনও তাঁর ক্লান্তি আসেনি, প্রতিদানের একটুও অপেক্ষা না করে সবার প্রতি সব কর্তব্য করে গেছেন নিখুঁতভাবে।

সংসারধর্মের মূল কথা সকলকে ভালবাসা, কাছে টানা। শ্রীমা তাঁর ধৈর্য, সহ্যগুণ ও মিষ্টভাষিতায় সকলকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, অতিথি-অভ্যাগত, ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ, সাধু-ব্রহ্মচারী—সবাইকে তিনি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিয়েছেন, তাদের যথাসাধ্য সেবা করেছেন, বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি গৃহপালিত পশুপাখীও তাঁর স্নেহ-ভালবাসা-পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হয়নি কখনও। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে ঃ গৃহী-ব্যক্তি পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ভৃত্য-গণের প্রতিপালন এবং সন্তোষবিধান তো করবেনই, এছাড়াও তিনি স্বধর্মনিরত একই গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি এবং অতিথি-অভ্যাগতদেরও প্রতিপালন করবেন।[১৫] গার্হস্থ-জীবনের এই নির্দেশগুলি শ্রীশ্রীমা শুধু সম্পূর্ণভাবে পালনই করেননি, বহুগুণে অতিক্রম করে গেছেন। নিজেই একসময় বলেছিলেন ঃ 'বাবা, আদর্শ হিসাবে যা করতে হয় তার ঢের বাড়া করেছি।'[১৬] একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

অন্যদেরও শ্রীমা উপদেশ দিতেন সংসারে সবার প্রতি সব কর্তব্য যথাযথভাবে করতে। কেউ সন্ন্যাস নিতে চাইলে, বাড়িতে তাঁর কে আছেন, বাবা-মার অর্থের অভাব হবে কিনা জেনে তবে সন্ন্যাসের অনুমতি দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের ফিরিয়েও দিতেন। যেমন শ্রীশচন্দ্র ঘটককে ঘরে গিয়ে বাবা-মায়ের সেবা করতে বলেছিলেন। ব্রহ্মচারী অশোককৃষ্ণের বাবা গত হবার পর শ্রীশ্রীমা তাঁকে বলেছিলেন ঃ 'তোমার বাপ যদি টাকা না রেখে যেতেন তাহলে তোমাকে টাকা রোজগার করে মার



শ্রীশ্রীমা এবং রাধু
১৩২৪ সাল : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ
স্থান : জয়রামবাটী ফটো : ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ



মাকু ও তার পুত্র ন্যাড়া এবং শ্রীশ্রীমা
১৩২৪ সাল : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ
স্থান : জয়রামবাটী ফটো : ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

সেবা করতে বলতুম।... তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হয়েছ, কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেছেন! তাঁর সেবা করা তোমার সবচেয়ে বড় ধর্ম জানবে।'[১৭]

গার্হস্থ্য-জীবনে গৃহিণীর প্রয়োজন হয় বিচক্ষণতা, উপস্থিতবুদ্ধি, যে-কোন মুহূর্তে সহসা-আগত পরিস্থিতিকে উপযুক্তভাবে সামলানোর ক্ষমতা। মায়ের এই সবকটি গুণই ছিল। একবার কলকাতা থেকে জয়রামবাটী ফেরার পথে জয়পুরে গ্রামের এক চটিতে থেমে শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গীরা রান্নার বন্দোবস্ত করেছেন। উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাবার সময় মাটির হাঁড়ি ভেঙে সব ভাত চারদিকে ছড়িয়ে গেল। সবাই এই অবস্থায় হতবাক হয়ে পড়লেও শ্রীমা একটুও বিচলিত হলেন না। একটা খড়ের নুড়ো দিয়ে ধীরে ধীরে ফেন সরিয়ে ভাতগুলি উপর উপর থেকে টেনে একত্র করলেন। তারপর বাক্স থেকে ঠাকুরের ছবি বের করে একটি শালপাতায় সামান্য তরকারি ভাত ডাল সাজিয়ে ঠাকুরকে নিবেদন করে বললেন ঃ 'আজ এইরূপেই মেপেছ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির গরম গরম দুটি খেয়ে নাও।'[১৮] মায়ের কাণ্ড দেখে সবাই হেসে উঠলেও মা একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বললেন ঃ 'যখন যেমন তখন তেমন তো করতে হবে।' তারপর অন্য সকলকেও একইভাবে খেতে দিলেন। ঘটনাটি মায়ের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচায়ক।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ ছোট ছোট ঘটনা দিয়েই মানুষের প্রকৃত চরিত্র বোঝা যায়।[১৯] জয়রামবাটীতে একদিন সন্ধ্যার সময় মাথায় পাগড়ী-বাঁধা এক 'ভিখারি' মায়ের বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে 'ছোটমামী' বাইরে এলেন, কিন্তু অসময়ে বাড়ির দরজায় অপরিচিত পুরুষমানুষ দেখে ভয় পেয়ে ছুটে তৎক্ষণাৎ মায়ের কাছে চলে গেলেন। মা কিন্তু ধীরভাবে বাইরে এসে দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কে রে!' 'ভিখারী' উত্তর দিল। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই মা বুঝলেন, এ আর কেউ নয়, 'রাত-ভিখারী'র নিখুঁত ছদ্মবেশে তাঁর গৌরদাসী—সকলের প্রিয় 'গৌরী-মা'।[২০] ঘটনাটি একদিকে যেমন কৌতুকাবহ, অপরদিকে শ্রীমা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেও কতটা মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পারতেন, তারও নিদর্শন।

পাগলীমামীর মেয়ে রাধুর শ্বশুরবাড়িতে শ্রীমাকে তত্ত্ব পাঠাতে হবে। এদিকে নলিনীদিদি আর পাগলীমামীর অহি-নকুল সম্বন্ধ—কেউ কারও ভাল দেখতে পারেন না। তত্ত্ব পাঠানোর ব্যাপারে নলিনীদিদি নির্ঘাত একটা অশান্তি করবেন। বিপদ এড়াতে শ্রীমা নলিনীদিদিকেই মুরুব্বি বানালেন, জানতে চাইলেন এ ব্যাপারে তাঁর কি মত। দেখা গেল, এই অপ্রত্যাশিত সম্মানের খাতিরে পাগলীমামীর সঙ্গে তাঁর চিরকালের শত্রুতা সাময়িকভাবে ভুলতেও নলিনীদিদির কোন আপত্তি নেই। মায়ের ফর্দ গম্ভীরভাবে দেখে তিনি বললেন ঃ 'ওতে কি করে হবে, পিসীমা? ওরা যেমনই ব্যবহার করুক—আর রাধীটা তো একটা পাগল, জ্ঞানগম্য কিছুই নেই—কিন্তু তোমার তো একটা মর্যাদা আছে, তুমি অত ছোট নজর দেখাতে যাবে কেন,

পিসীমা? তুমি তোমার মতন করে যাও।'[২১] এই বলে মা যা যা জিনিস দেবেন ভেবেছিলেন তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু জিনিস তিনি যোগ করে দিলেন! ঘটনাটি মায়ের সাংসারিক বিচক্ষণতার দৃষ্টান্ত। মা বলতেন ঃ 'যা কিছু কর না কেন, সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বই কি। একটু আলগা দিয়ে সব দিক দূরে দূরে লক্ষ্য করতে হয়—যাতে বেশী কিছু খারাপ না হয়।...সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।'[২২] গার্হস্থ্য-জীবনে তো বটেই, দশজনকে নিয়ে যাঁদের চলতে হয় তাঁদের সকলের পক্ষেই মায়ের এই উপদেশটি গ্রহণীয়।

গৃহস্থালির যে-কোন কাজে শ্রীশ্রীমার অসাধারণ নিপুণতা দেখা যেত। নহবতের মতো সংকীর্ণ ঘরে (যা ছিল তাঁর নিজের বাসস্থান আবার অন্যান্য অতিথি ভক্ত-মেয়েদেরও রাত্রিযাপনের জায়গা) যেভাবে তিনি গৃহস্থালির প্রত্যেকটি জিনিস গুছিয়ে রাখতেন তা তো কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। বাস্তবিক যখন যেখানে তিনি থেকেছেন সব কাজ নিজে করতে চেষ্টা করেছেন। অসুস্থ শরীরেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর জয়রামবাটী-জীবনের শেষের দিকে রাঁধুনীকে জলখাবার দিয়ে সেই সময়টা নিজেই দু-একটা রান্না করে ফেলতেন। দু-ঘণ্টা ধরে কুটনো কাটা, ভাঁড়ার বার করে দেওয়া, ধান সেদ্ধ করা, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা—সব মায়ের নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খুঁটিনাটি কোন বিষয়ই তাঁর নজর এড়াত না। আশু মহারাজ বাঁকুড়া থেকে মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে দেখা করতে এসে তাঁর গামছাখানি ফেলে যান, মা ঠিক মনে করে রাজেন্দ্র দত্তের হাতে দিয়ে সেটি পাঠিয়ে দেন।[২৩] উমেশবাবু যখন প্রথম জয়রামবাটীতে যান, রাতে শোবার আগে মায়ের কাছে এক গ্লাস জল চেয়েছিলেন, কারণ ভোরে তাঁর নাক দিয়ে জল টানার অভ্যাস। তারপর থেকে উমেশবাবু যখনই গেছেন, মা বলতেন ঃ বাবা জলটি মনে করে রেখো।[২৪] বাড়িতে অন্য লোক থাকলেও মা মনে করতেন, সব কাজই তাঁর নিজের কাজ। উদ্বোধনে এক বর্ষার দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে সাধু ও ভক্তদের শুকোতে দেওয়া সব কাপড়গুলি ভিজিয়ে দিল। সবাই নিশ্চিন্তমনে নিজের নিজের ঘরে বসে আছেন। মায়ের পায়ে বাত থাকলেও মা নিজেই সেই কাপড়গুলি তুলে এনে নিংড়ে ঘরের মধ্যে মেলে দিলেন।[২৫]

মা চাইতেন, সংসারে যারা থাকবে তারা ছোট-বড় প্রতিটি কাজ শ্রদ্ধা সহকারে করবে। তিনি নিজেও তা-ই করতেন। ঝাঁটাটিকে পর্যন্ত সম্মান করতে বলেছেন। কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাকে অশ্রদ্ধা করে ছুড়ে দিতে নেই। ছোট জিনিস বলেই তাকে তুচ্ছ করতে নেই। কারণ, 'যাকে রাখ সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে? তা ছাড়া, এ সংসারে ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়।'[২৬] এই সম্মান শুধু ঝাঁটার প্রতি নয়, ঝাঁটা দিয়ে যে কাজটি হয়,

সাধারণত যে কাজটিকে আমরা সম্মান দিতে চাই না, সেই 'ঝাড়ু-দেওয়া' কাজটির প্রতিও। ঝাঁটাটি কাজের শেষে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শুধুই যে রুচিহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়, তা-ই নয়, সময়ের সাশ্রয়ও কিছু হয় না। 'ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ।'[২৭] শ্রীমা বলেছেনঃ 'সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।'[২৮] 'মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক ঠিক মানুষটি চেনা যায়।'[২৯] এটি কর্মযোগের একটি মূল কথা। স্বামী বিবেকানন্দও 'কর্মযোগ' আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ কথা বলেছেন।

অপচয় মা পছন্দ করতেন না। ঠাকুর পাট দিয়েছিলেন শিকে করতে। শিকে তৈরীর পর যে ফেঁসোগুলো রয়ে গেল, তা ফেলে না দিয়ে বালিশ তৈরীর কাজে ব্যবহার করলেন। তরি-তরকারির খোসা সব সময় গরু-ছাগলকে খেতে দিতেন। বলতেন ঃ 'যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে দিতে নেই ; যা গরুতে খায়, তা কুকুরকে দিতে নেই ; গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছ খায়—তবু নষ্ট করতে নেই।'[৩০] এক ভক্ত চুবড়ি করে ফল পাঠিয়েছে। অন্যেরা ফলগুলি নিয়ে চুবড়িটা ফেলে দিতে বলল। শ্রীমা কিন্তু চুবড়িটা ধুয়ে যত্ন করে রেখে দিলেন—পরে সেটা কোন কাজে যদি লাগে।[৩১] একবার ঠাকুরের ভোগের দুধে একটা ছোট মাছ ধরা পড়ল। সেবক সেই দুধ ফেলে দিতে চাইলেন। শ্রীমা বললেন ঃ 'ফেলব কেন? ঠাকুরের ভোগে না দিলেও বাড়ির ছেলেপিলে আছে, তারা তো খেতে পাবে।'[৩২] সংসারী লোকেরা সামর্থ্যের চেয়ে বেশী টাকা-পয়সা খরচ করলে শ্রীমা বিরক্ত হতেন। বদনগঞ্জের প্রধান শিক্ষক প্রবোধবাবু একবার তাঁর জন্য অনেক ফল ও তরকারি কিনে উপস্থিত হলে মা তাঁকে অমিতব্যয়িতার জন্য তিরস্কার করেছিলেন।[৩৩]

মা চাইতেন ঃ সংসারীদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকুক। কিন্তু শুধুই 'টাকা টাকা' করা তিনি সমর্থন করতেন না। নিজের ভাইদের অতিরিক্ত অর্থাসক্তির তিনি নিন্দা করতেন।[৩৪] অর্থের দিক দিয়ে গৃহীদের জীবনে একটা পরিমিতি-বোধ থাকবে, এটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল। দারিদ্র গৌরবের নয়, বিলাসিতাও সমর্থনযোগ্য নয়। মধ্যপন্থাই শ্রেয়। অর্থের অনর্থকর দিক সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। বলতেন ঃ '"চাকি" (টাকা) না করতে পারে এমন জিনিস নাই—প্রাণসংশয় পর্যন্ত।' 'টাকা এমন জিনিস, দেখলে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।'[৩৫] বিষয়াসক্তির মোহ বড় ভয়ঙ্কর। 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥'[৩৬]

—কাম্যবস্তুর ভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না। কামনার সাময়িক তৃপ্তি কামনাকে বাড়িয়েই চলে শুধু, ঘৃতাহুতি যেমন আগুনকে নিভতে না দিয়ে বরং দ্বিগুণ তেজে জ্বলতে সাহায্য করে। মা তাই বলতেন : 'সন্তোষের সমান ধন নেই।'[৩৭] কারণ, সংসারে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত যে শান্তি, তা নির্ভর করে সন্তোষের উপর। যতটুকু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই শান্তি।

মা দাম্পত্য-জীবনে ইন্দ্রিয়সংযমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ঠাকুরের কথা উদ্ধৃত করে বলতেন দু একটি সন্তান হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীকে সংযমে থাকতে।[৩৮]

সংসারে মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যখন আদর্শ ও প্রিয়জনদের স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় কিংবা যা শ্রেয় বলে প্রতিভাত হয়, বাস্তব দিক থেকে তা প্রীতিকর বা সহজ বলে মনে হয় না। সেসব ক্ষেত্রে শ্রীমার এই উপদেশ স্মরণীয় : 'যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তা-ই করবে।'[৩৯]

সংসারে নিজের এবং অপরের শান্তি নির্ভর করে প্রয়োজনে কর্মে লিপ্ত হওয়াতে এবং প্রয়োজনের শেষে নিজেকে সেই কর্ম থেকে সরিয়ে আনার মধ্যে। সন্ন্যাসীর পক্ষে নিরাসক্তির অনুশীলন যথেষ্ট হতে পারে কিন্তু গৃহীর পক্ষে আসক্তি ও নিরাসক্তি দুয়েরই প্রয়োজন। শ্রীমা সেইটিই দেখিয়েছেন নিজের জীবনে। যে রাধুকে নিয়ে তিনি অস্থির সেই রাধুকেই তিনি অক্লেশে পরিত্যাগ করেছেন যখনই বুঝেছেন নরদেহধারণের প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছে। কিন্তু শ্রীমা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। শ্রীমা লোককল্যাণের স্বার্থে স্বেচ্ছায় নিজের উপরে 'আসক্তি' আরোপ করেছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে কিন্তু আসক্তিই স্বভাবজাত —অনাসক্তি সাধন সাপেক্ষ। মা তাঁর ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার এই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তবুও তিনি সংসারীদের অনাসক্তির উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, আসক্তি থেকেই যত দুঃখ। বলেছেন : 'যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না।'[৪০] এই নিষেধ সকাম ভালবাসা বা 'আসক্তি'র সম্বন্ধে। ভালবাসা দুঃখ দেয় যখন তার পেছনে কোন প্রত্যাশা থাকে। নিষ্কাম ভালবাসা—যা সংসারে একান্ত বিরল—তাকে মা নিন্দা করেননি। তাঁর নিজের জীবনেও নিষ্কাম অ-মায়িক ভালবাসার সর্বোচ্চ বিকাশ দেখা গেছে। শ্রীমা উপরের উক্তিতে ভগবানকে ভালবাসতে বলেছেন—কারণ, ভগবানকে ভালবাসলে অনাসক্তি সহজ হয়ে আসে। তবে ভগবানের প্রতি ভালবাসা একদিনে আসে না, সাধনভজন করতে করতে ক্রমশ ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। মা তাই নিয়মিত সাধন-ভজনের উপর জোর দিয়ে বলেছেন : 'খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারের কাজকর্মের মধ্যেও [তাঁকে ডাকার] একটি সময় করে নিতে হয়।'[৪১]

শ্রীমার জীবন ও বাণী থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, গার্হস্থ্য-জীবনে শান্তি পেতে হলে আধ্যাত্মিকতার একান্ত প্রয়োজন। মায়ের জনৈকা আত্মীয়ার মানসিক অশান্তি

প্রসঙ্গে মা বলেছিলেন ঃ 'রাত তিনটের সময় উঠে...বারান্দায় বসে জপ করুক না, দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে। তাতো করবে না, কেবল অশান্তি অশান্তি...।'[৪২] জনৈকা ভক্তকে বলেছিলেন ঃ 'জপধ্যান করতে করতে দেখবে—(ঠাকুরকে দেখিয়ে) উনি কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কী শান্তি প্রাণে আসবে!'[৪৩]

শ্রীমা এমন কিছু বলেননি, যা তাঁর নিজের জীবনচর্যায় সত্য হয়ে ওঠেনি। তাঁর সব বাণীরই জীবন্ত রূপ তাঁর জীবন। মায়ের কথা সর্বদাই অমৃত হয়ে মানুষের প্রাণে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে—বাণ হয়ে কাউকে বিন্ধ করেনি কখনও। অত্যন্ত মধুরভাষিণী ছিলেন তিনি। গোলাপ-মাকে বলেছিলেন ঃ 'অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়।'[৪৪] রাধুর মার সঙ্গে একটি সদ্‌গোপের মেয়ের ঝগড়া হচ্ছে শুনে বলেছিলেন ঃ 'কথায় মত্ত হওয়া ভাল নয়, হেটেল মারলেই পাটকেল খেতে হয়।'[৪৫] স্বয়ং পৃথিবীর মতো সহ্যশীলা—তাই বললেন ঃ 'পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইচে ; মানুষেরও সেই রকম চাই।'[৪৬] সংসারে থাকতে হয় দশজনকে নিয়ে। দশজনকে নিয়ে মানিয়ে চলতে হলে সহনশীলতার একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমা তাই বলেছেন ঃ 'সহ্যের সমান গুণ নেই।'[৪৭] নলিনীদিদির সঙ্গে সুবাসিনীদেবীর ঝগড়ার কথা জানতে পেরে চিঠিতে লিখেছিলেনঃ 'সময়ে সবই সহ্য করতে হয়; সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়।'[৪৮] শ্রীমা বলতেন ঃ 'সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? —যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন।'[৪৯] গৃহী-জীবনের প্রতিমুহূর্তের পথনির্দেশক মায়ের এইসব বাণী।

শ্রীমার মতো মানুষেরা কোন কিছু ভাঙতে আসেন না। সমাজ যেমন, সমাজকে তাঁরা তেমনভাবেই গ্রহণ করে ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাকে প্রভাবিত করেন। শ্রীমাকে তাই দেখা যায়, দেশাচার, লোকাচার ও প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে তিনি যথাসম্ভব মেনে এসেছেন। রাধুর অসুখের সময় তাকে মাদুলি পরিয়েছেন, দেবতার উদ্দেশে মানত করেছেন,[৫০] তান্ত্রিক সাধকের দৈববিধানকে সরল অন্তরে বিশ্বাস করেছেন,[৫১] ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করেছেন,[৫২] অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়েও পয়সাকে লক্ষ্মী বোধে মাথায় ঠেকিয়েছেন,[৫৩] চলার সময় ভুল করে ডান পা বাড়িয়ে ফেললে সংশোধন করে নারীসুলভ সংস্কার-অনুযায়ী বাঁ পা বাড়িয়েছেন।[৫৪]

সাধু-সন্তের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন, তাঁদের সেবা প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের

গৃহস্থরা নিজেদের একান্ত পালনীয় কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে আসছেন। জগদ্বরেণ্য সন্ন্যাসীদের দ্বারা জগজ্জননীরূপে পূজিতা হয়েও শ্রীমা সন্ন্যাসী-শিষ্যের বসার আসন শ্রদ্ধাভরে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছেন : 'কত ভাগ্যে গিরস্তের দরজায় সাধুর পায়ের ধুলো পড়ে। সাধুর আসন তো মাথায়ই রাখতে হয়। আমরা গৃহী, আমাদের এই তো ধর্ম।'[৫৫] শ্রীমা সংসারীদের উপদেশ দিতেন সাধু-ব্রহ্মচারীদের বিশেষ সমীহ করে চলতে। কোয়ালপাড়ায় এক ব্রহ্মচারীর পিঠে মায়ের এক শিষ্যার কাপড়ের আঁচল লেগে গেলে মা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন : 'কিগো, ছেলে আমার সামনে বসে লিখছে, বেটাছেলে, তোমার একটু হুঁশ নেই—ওর পিঠে আঁচল লাগিয়ে যাচ্ছ! ওরা ব্রহ্মচারী, তোমরা মেয়েমানুষ, ওদের সমীহ করে চলতে হয়, প্রণাম কর।'[৫৬] শ্রীমা সাধুদের সম্বন্ধে বলেছেন : 'তাঁদের কোন্ কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল হতে পারে তা তুমি জান না। তাঁদের দেখলে ভক্তি করতে হয় ; কোনও জবাব করে অবজ্ঞা দেখান উচিত নয়।'[৫৭]

দেবদেবীতে বিশ্বাস ভারতের সাধারণ মানুষের বিশেষত নারীদের রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে। সিংহবাহিনীর প্রতি শ্রীমার ভক্তির কথা সুবিদিত। তিনি যখন খুব অসুস্থ, জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন, গ্রামের দেবদেবীর সম্মানার্থে গ্রামের মধ্যে তিনি পালকিতে ওঠেননি। গ্রামের যাত্রা সিদ্ধিরায়কে প্রণাম করে, জননী জন্মভূমির মাটি মাথায় ঠেকিয়ে তবে মা পালকিতে ওঠেন।[৫৮]

মায়ের শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধও তুলনাহীন। মা বলতেন : 'স্ত্রীলোকের লজ্জাই হল ভূষণ।'[৫৯] পুত্রস্থানীয় শিষ্যদের কাছেও মাথায় কাপড় দিয়ে থাকতেন। কারণ সেটাই ভারতের প্রাচীন রীতি। শেষ অসুখের সময় জনৈক সাধু তাঁকে দেখতে আসবার সময় মায়ের মাথায় কাপড় দেওয়া ছিল না। সাধুটি চলে যাবার পর মা সেবিকাকে তিরস্কার করেছিলেন তাঁর মাথায় কাপড় দিয়ে দেননি বলে।[৬০] নলিনীদিদি লোকের সামনে একবুক গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে জপ করছিলেন বলে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এর প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তই মেয়েদের ভেবে দেখবার মতো।[৬১]

আদর্শ গৃহধর্মের সমস্ত গুণগুলি শ্রীমায়ের জীবনচর্যায় দেখা যায়, কিন্তু কোন ব্যাপারে তাঁর গোঁড়ামি ছিল না। নলিনীদিদির অস্বাভাবিক শুচিবাইয়ের জন্য মা বলেছিলেন : 'বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়?...মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।...আর শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে। সবই যত বাড়াবে তত বাড়বে।'[৬২] শ্রীমা অন্তরের শুচিতাকেই গুরুত্ব দিতেন। বলতেন : 'মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।'[৬৩]

শ্রীশ্রীমা চিরকাল চেষ্টা করেছেন, গৃহস্থের গৃহকে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত করতে। তিনি নিজের জন্য যেমন চাঁদের আলোর নির্মলতা চেয়েছিলেন, তেমনি

অন্য সকলের স্বভাবও শুদ্ধ সংযত করে তুলতে চেয়েছেন। পরনিন্দা-পরচর্চা তিনি নিজে যেমন করতেন না, তেমনি অন্য সকলকেও পরের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখতে বলতেন। জগতের প্রতি মায়ের শেষ বাণী ঃ 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'[৬৪] আদর্শ গৃহধর্মের মূলসূত্রটি এই উপদেশে নিহিত। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'- সমগ্র জগৎই আমার আত্মীয়। এটাই প্রকৃত সত্য—কারণ একই সত্তা জগতের সবার মধ্যে। জগৎকে যে পর মনে হয়, অন্যের সুখে যে আমরা সুখী বোধ করি না, অন্যের দুঃখ যে আমাদের বিচলিত করে না—এটাই মহা ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূরীকরণের পাঠ গৃহেই শুরু হওয়া উচিত। একটি গৃহের পরিজনদের সঙ্গে যিনি একাত্ম হতে শেখেননি, স্বপ্নেও তিনি কখনও জগৎকে আপনার বলে ভাবতে পারেন না। সংসারের সবাইকে আপন করে নিতে পারার ব্যর্থতারই একটা প্রকাশ ঘটে পরের দোষত্রুটি দেখার হীন প্রবৃত্তির মধ্যে। গার্হস্থ-জীবনের অধিকাংশ অশান্তির সূত্রপাত হয় এই পরের দোষ দেখার ত্রুটি থেকে। খুব অল্পসংখ্যক মানুষই এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। এর মূলে আছে ভালবাসার অভাব। বাবা-মায়ের চোখেও সন্তানের দোষত্রুটি ধরা পড়ে। কিন্তু সেই দোষত্রুটি দেখে তাঁরা ব্যথিত হন--উৎফুল্ল হন না কখনও। কারণ সন্তানকে তাঁরা ভালবাসেন। 'দোষ দেখা' আর 'দোষ চোখে পড়া' এক নয়। যিনি দোষ দেখেন, তিনি দোষ দেখতেই উৎসুক এবং দোষ দেখতে পেয়ে বা দোষ কল্পনা করে নিয়ে তিনি এক বিকৃত আনন্দ অনুভব করেন। সংসারে যদি পরস্পরের প্রতি ভালবাসা থাকে, তাহলে অনর্থক অন্যের দোষ খুঁজে বের করবার হীন প্রবৃত্তি চলে যাবে। সত্যিই যদি কখনও অন্যের কোন দোষ চোখেও পড়ে, তা আমাদের আনন্দিত না করে ব্যথিত করবে, দোষীর প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলবে এবং আমাদের সেই মনোভাবের ফলে দোষীর দোষ-সংশোধনও হয়তো সম্ভব হতে পারে। কারণ সাধারণত দেখা যায়, দোষীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করলে দোষী হতাশাগ্রস্ত হয়ে আরও দোষ করতে থাকে। মা বলেছেন ঃ 'লোক কেবল দোষটি দেখে। গুণটি দেখা চাই।'[৬৫] 'ভাঙ্গতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে কজনে?'[৬৬] এই গুণগ্রাহিতা বা গড়ার মনোভাব দেখা দেয়, ভালবাসা থাকলে পরে।

আদর্শ গৃহধর্মের প্রাণ বস্তুত ভালবাসায়। যে ত্যাগ ও সেবার প্রয়োজনীয়তা শুরুতে বলা হয়েছে, তারও মূল ভালবাসায়। সেবা স্বার্থত্যাগ ছাড়া সম্ভব নয়। ত্যাগ এবং সেবা নিষ্প্রাণ যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্যে পর্যবসিত হয়, যদি যার জন্য ত্যাগ, যার জন্য সেবার আয়োজন, তার প্রতি সেবকের মনে ভালবাসার উৎসার না থাকে। ভালবাসাহীন শুষ্ক কর্তব্যের অনুষ্ঠান বেশীদিন চলে না—স্বার্থের কলহ অচিরেই আত্মপ্রকাশ করে সংসারের শান্তি নষ্ট করে দেয়। সহনশীলতা, দোষদৃষ্টিরাহিত্য, গুণগ্রাহিতা—সবের মূল ভালবাসা। এই ভালবাসার গুণে গৃহিণী অনুভব

করেন ঃ গৃহ তাঁরই গৃহ, গৃহের সবাই তাঁর প্রিয়, তিনিও গৃহের সবার প্রিয়। গৃহের সেবায় তিনি নিঃশেষে আত্মনিবেদন করেন। সংসারের প্রয়োজনে নিজেকে মুছে দিয়েই তাঁর তৃপ্তি। তাঁর এই আত্মবিলুপ্তির গুণে গৃহের প্রতিটি কাজে তিনি অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। তিনি হয়তো নেপথ্যে থাকতেই ভালবাসেন, কিন্তু গৃহ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মমতা ও ভালবাসার পরশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পবিত্র দীপশিখার মতো তাঁর কল্যাণী প্রভা সংসারের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সংসারের সবার অন্তরে তাঁর আসন গড়ে ওঠে। শ্রীমার জীবনে আমরা এ সবগুলিরই পরাকাষ্ঠা দেখেছি। তাঁর অলৌকিক ভালবাসার গুণেই তিনি তাঁর আশ্চর্য সংসারে আশ্চর্যসুন্দর গৃহিণী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। 'ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে'[৬৭]—গৃহধর্মের মহাবাক্য শ্রীমায়ের এই বাণী।

৬৭। তদেব, পৃঃ ২১৫

শ্রীমা ও একালের পাশ্চাত্য নারী

'শ্রীমা ও একালের পাশ্চাত্য নারী' ঃ এই আমার বিষয়। কিন্তু কেমন করে আমার বক্তব্য উপস্থিত করব তাই ভেবে আমি শিহরিত। 'পুণ্যময়ী মাতাদেবী', 'সাক্ষাৎ জগজ্জননী', 'শিব, বিষ্ণু, রাম, রামকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গিনী'—তিনি কয়েক দশক পূর্বে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করে গিয়েছেন, ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় যাঁর জীবন 'একটি দীর্ঘ, নীরব প্রার্থনা', সেই সারদাদেবী, বস্তুত আমাদের ধ্যানের ধন—তাঁর সম্পর্কে বাগ্‌বিস্তার করতে যেন মন চায় না। শ্রীমায়ের ভালবাসার গভীরতা ও ব্যাপ্তি, তাঁর দুর্লভ দ্যুতি, সেইসঙ্গে তাঁর পবিত্রতা আর আন্তরিকতা এমনকি যদি অংশতও অনুভব করা যায় তবে তাঁকে নিয়ে আলোচনা করার কথা উঠলেই ভয় হয়, পাছে স্থূল চিন্তার স্পর্শ সেখানে লাগে, পাছে অজ্ঞতার কারণে সামান্যতমও অশ্রদ্ধার ছায়া সেখানে এসে পড়ে। শ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা করাই যদি দুরূহ মনে হয়, তবে সেখানে অত্যন্ত স্থূল ও সোচ্চার ব্যাপারের পাশে তাঁকে রেখে বক্তব্য প্রকাশ করব কেমন করে? নারী-আন্দোলন, পুরুষের তুল্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম, পুরুষের অত্যাচার, মেয়েদের তথাকথিত 'চেতনার উন্নয়ন'—এইসবের সঙ্গে জড়িয়ে স্বচ্ছন্দে শ্রীমায়ের আলোচনা করতে পারা যায় কি? অসম্ভব।

এই ভীতি অথবা দ্বিধা কেবল আমারই ব্যক্তিগত নয়! আমেরিকায় বেদান্ত-আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন সাধারণ বক্তৃতায় শ্রীমায়ের বিষয়ে আদৌ কিছু বলা হত না। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর প্রথম দিকে দেখেছি, শ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত ; সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হত নীরবে, শান্তভাবে। আমাদের বেদান্তকেন্দ্রের উপাসনাগৃহের বেদীতে একই কারণে শ্রীমায়ের প্রতিকৃতি অনুপস্থিত। চল্লিশের দশকে স্বামী অশোকানন্দের নেতৃত্বে যখন এখানকার মন্দির নির্মিত হয় তখনই মনে হয়েছিল, শ্রীমাকে সকলের সামনে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। শ্রীমা সারাজীবন লজ্জা-পটাবৃতা, অন্তরালবর্তিনী , এখানে সকলের দৃষ্টির সামনে তাঁকে স্থাপিত করা হলে সেই দৃষ্টিতে অজ্ঞান ও অশ্রদ্ধার স্পর্শ হয়তো বা থেকে যেতে পারত ; হয়তো নানাজনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীমায়ের কি সম্পর্ক ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন তুলতেন ; অথবা এমন সব প্রশ্ন করে বসতেন যার উত্তর দেওয়া অস্বস্তিকর। এইসব কারণে প্রথম দিকের সাধুরা লক্ষ্য রেখেছেন যাতে শ্রীমা তাঁর দেহত্যাগের পরেও নিরুপদ্রব অন্তরালে থাকতে পারেন, যেমন তিনি ছিলেন তাঁর জীবৎকালে। সে জিনিসই ঘটেছে ভারতবর্ষে এবং এখানেও।

দিন বদলেছে। মায়ের ছবি এখন সর্বত্র দেখা যায়, দেখা যায় তাঁর মূর্তি, তাঁর প্রতিকৃতি-সংবলিত লকেট ইত্যাদি। পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। মা যেন জগতের সামনে আত্মপ্রকাশের জন্য নিজেই এগিয়ে এসেছেন। কেন? মনে হয়, এর মূলে রয়েছে শ্রীমায়ের করুণা। মা যে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁকে আজ জগতের বড় প্রয়োজন।

স্বেচ্ছায় মায়ের এই আত্মপ্রকাশের কথা স্মরণে রেখেই আমি তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে সাহসী হয়েছি। বর্তমান পাশ্চাত্যের মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক—এই বিষয়েই আমি আলোচনা করব। হয়তো সুষ্ঠুভাবে তা করতে পারব না ; কিন্তু যেভাবেই তা করি না কেন এর দ্বারা তাঁর চিন্তা তো করা হবে, এবং সেকাজ নিশ্চয়ই কল্যাণকর। সুষ্ঠুভাবে কাজটি করতে পারব না এই আশঙ্কায় আগে থাকতেই তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি ; সেইসঙ্গে ভিক্ষা চাইছি যেন তিনি আমাকে দিয়ে কঠিন কাজটি করিয়ে নেন। এই সূত্রে শ্রীমায়ের কৌতুকোজ্জ্বল রূপটি মনে পড়ছে। একবার শ্রীমায়ের এক আত্মীয়া মর্কট-বৈরাগ্যের ঘোরে তাঁকে বলেছিলেন ঃ 'আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা নেই, যা আছে তোমাকে লিখে পড়ে দিয়ে যাব। আমি মরবার পরে তুমি সেইমতো কাজ কোরো।' শ্রীমা হেসে বলেন ঃ 'তা কবে মরবি গো!'[১] আবার মনে পড়ছে, নিবেদিতা শ্রীমাকে একদিন বলেছিলেন ঃ 'আপনি হন আমাদিগের কালী।' শুনে মা সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলেন ঃ 'না, বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।'[২] তাই যদি আমি মায়ের বর্ণনা করতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলি তবে নিশ্চয় তিনি হেসে উঠবেন। না, শ্রীমাকে আমি মা-কালী অথবা শিবপ্রিয়া অথবা বিষ্ণুজায়া রূপে দেখাতে চেষ্টা করব না, মা আমাদের মা-ই থাকুন। সেইভাবেই তাঁকে দেখব।

'উইমেন্স লিবারেশন মুভমেন্ট' দ্বারা প্রভাবিত পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের জন্য শ্রীমায়ের কি বিশেষ কোনও বার্তা বা উপদেশ ছিল? আমরা জানি, যে-সভ্যতার ঐতিহ্যে শ্রীমা তাঁর জীবন যাপন করেছেন সেখানে মেয়েদের 'অধিকার' নয়, মেয়েদের 'কর্তব্যের' কথাই শত শত বর্ষ ধরে ভাবা হয়েছে। সমাজের কাঠামোর মধ্যে থেকে ধৈর্য এবং সকলের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রত্যেক মেয়ের আচরণে প্রতিফলিত হোক—এই আদর্শের উপরই মা বার বার জোর দিয়েছেন। এই আদর্শ সামনে রেখে তিনি বড় হয়েছেন, সারাজীবন একে বিশ্বাসভরে মেনে চলেছেন, তাঁর পক্ষে কি বর্তমান পাশ্চাত্যের মেয়েদের মানসিকতা বুঝতে পারা সম্ভব ছিল—যে-মানসিকতায় রয়েছে মেয়েদের বিশেষ অধিকারের, আর্থনীতিক ক্ষমতার স্বীকৃতি দাবি, পুরুষশাসিত-সমাজ কর্তৃক দীর্ঘ নিগৃহীত মেয়েদের পূর্ণ মানুষের স্বীকৃতি দাবি? শ্রীমায়ের নিঃস্বার্থ জীবনের পাশে কোনও আন্দোলনকে টেনে আনাই যেন অসঙ্গত ; পাশ্চাত্যের এযুগের মেয়েদের প্রতি শ্রীমায়ের বিশেষ কোন বার্তা বা বাণী ছিল, একথা ভাবাও যেন কঠিন। তিনি তো বক্তৃতা দিতেন না, বাণী দেওয়াও তাঁর কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর জীবন? সেই জীবন থেকে কি এ-ব্যাপারে আমরা কিছু শিক্ষা নিতে পারি? এখানে মনে রাখতে হবে, হিন্দুনারীর আদর্শ অনুসারে তিনি অন্তরালবর্তিনী, নিজেকে কখনও জাহির করেননি, স্বামীকে পূজা করেছেন ঈশ্বরজ্ঞানে, ভাইপো-ভাইঝি এবং অন্যান্য আত্মীয়ে-ঘেরা সংসারের সকলকে সস্নেহে

সেবা করেছেন, আধ্যাত্মিক অর্থে যাঁরা সন্তান তাঁদের আদরযত্ন করেছেন, সেইসঙ্গে তাঁদের পরিচালিত করেছেন পরম লক্ষ্যের দিকে। এ সবই তিনি করেছেন সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করে। পাশ্চাত্য জগতের নারী-আন্দোলনের একটি লক্ষ্য স্ত্রীজাতির 'চেতনার উন্নয়ন' (consciousness raising) ; শ্রীমা এই শব্দ শুনলে হয়তো ভাবতেন ঈশ্বরচেতনার কথাই বুঝি বলা হচ্ছে, তা-ই বুঝি ওদের লক্ষ্য। কিন্তু তা যদি হত তবে তো পুরুষদের সমান অধিকার ইত্যাদি দাবির কোনও অর্থই থাকত না। যাই হোক, নারীমুক্তি-আন্দোলনের যারা শরিক, পশ্চিমের সেইসব মেয়ের কাছে শ্রীমা যেন অপ্রাসঙ্গিক -তারা মাকে মনে করবে সেকেলে, পুরুষশাসিত সমাজে বিনত ভূমিকায় অভ্যস্ত এক নারী। আর মা যদি এদের দেখতে পেতেন, শুনতে পেতেন এদের নানা ধরনের মুক্তির সোচ্চার ধ্বনি, তবে কি ভাবতেন তিনি? একবার শ্রীমা জনৈক ভক্তের সঙ্গে কথোপকথনে বলেছিলেন : 'গড় (প্রণাম) করি, মা, কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারও বা পঁচিশটা ছেলেমেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে—মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু! সংযম নেই কিছু নেই!'[৩] তাহলে নারীমুক্তি-আন্দোলনের মেয়েদের ধরন-ধারণ দেখে শ্রীমা কি তাদের 'সংযমহীন পশুবৎ' মনে করতেন?—আপাতত মনে হয়, মা ওদের ঠিক তা-ই মনে করতেন। যদি তা-ই হয়, তবে বর্তমান আলোচনার কি প্রয়োজন? শ্রীমা ও বর্তমান পাশ্চাত্যের মেয়েরা—এই প্রসঙ্গে আলোচনা অসম্ভব বলে তাহলে কি এইখানেই ইতি করে দেব?

তেমন কিছু করার আগে শ্রীমা প্রসঙ্গে নিবেদিতার কথা স্মরণ করে নেওয়া যাক : 'তাঁর মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য ; তবুও আমার কাছে তাঁর শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁর দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কোন প্রশ্ন যত নতুন বা জটিলই হোক না কেন, উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করে দিতে তাঁকে কখনও ইতস্তত করতে দেখিনি।...তাঁর বুদ্ধির অতীত কোন নতুন সামাজিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভত জটিল চক্রে আবর্তিত অথবা উৎপীড়িত হয়ে কেউ যদি তাঁর কাছে আসে, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করে ফেলেন এবং প্রশ্নকর্তাকে সমস্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক মানসিকতায় স্থাপিত করে দেন।'[৪] লক্ষণীয় : শ্রীমা অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রশ্নকর্তাকে সমস্যার সমাধানের যথার্থ মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত করতেন। অর্থাৎ তিনি বলে দিতেন না—ঠিক কোন্ পন্থা গ্রহণ করতে হবে, অথবা তিনি নিজে সমস্যার সমাধান করে দিতেন না, তিনি প্রশ্নকর্তাকে এমন মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন যাতে সে নিজেই সমাধানের পথটি খুঁজে নিয়ে সঙ্কটমুক্ত হতে পারে।

তাহলে আমরা ভাবতে পারি, সময়, সংস্কৃতি এবং পরিপ্রেক্ষিত স্বতন্ত্র হলেও

বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের মেয়েরাও যদি তাঁর কাছে উপস্থিত হবার সুযোগ পেত, তিনি তাদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে, এবং সেই সমস্যার সমাধানের যথার্থ মানসিকতায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারতেনই। বিদেশের ধর্মীয় রীতিনীতির গভীরে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা যে তাঁর ছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন নিবেদিতা। তিনি শ্রীমায়ের কোনও নতুন ধর্মীয় ভাব বা অনুভূতিকে মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করবার আশ্চর্য শক্তির কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ 'কয়েক বছর আগে একবার ঈস্টারের দিন বিকালে তিনি যখন আমাদের কাছে এসেছিলেন, তখন আমি শ্রীমার মধ্যে এই শক্তির প্রথম পরিচয় পাই।...ঐ দিন শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীরা আমাদের সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখবার পর ঠাকুরঘরে গিয়ে বসবার এবং খ্রীষ্টানদের এই উৎসবের অর্থ শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারপর আমাদের ছোট ফরাসী অর্গ্যান সহযোগে ঈস্টার-দিনের গান-বাজনা হল। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান-সম্পর্কীয় স্তোত্রগুলি বিদেশী এবং শ্রীশ্রীমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, তথাপি তাদের সূক্ষ্ম মর্মগ্রহণ ও গভীর সহানুভূতি প্রকাশের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম ধর্মজগতে শ্রীসারদা-দেবীর অসাধারণ উন্নতিলাভের এক অতীব হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখতে পেলাম।...

'আর এক সন্ধ্যায় তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। সেদিন অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্তপরিবৃত হয়ে তিনি বসেছিলেন। এমন সময়ে আমাকে ও আমার গুরুভগিনীকে তিনি ইউরোপের বিবাহ-অনুষ্ঠান বর্ণনা করতে বলেন। যথেষ্ট হাস্য ও কৌতুকের সঙ্গে তাঁর নির্দেশমতো আমরা একবার পুরোহিতের, পরমুহূর্তেই বর-কনের ভূমিকা অভিনয় করে দেখালাম। কিন্তু বিবাহের শপথবাক্য শুনে মায়ের যে-ভাবের উদয় হল, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না।

'"সম্পদে-বিপদে, ঐশ্বর্যে-দারিদ্র্যে, রোগে-স্বাস্থ্যে—যতদিন মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে"—এই কথাগুলি শুনে উপস্থিত সকলেই আনন্দপ্রকাশ করে উঠলেন। কিন্তু শ্রীমার মতো আর কেউই ঐ কথাগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করতে পারেননি। বার বার তিনি ঐ কথাগুলি আবৃত্তি করিয়ে শুনলেন এবং বললেন, "আহা, কী ধর্মী কথা! কী ন্যায়পূর্ণ কথা!"'[৭]

শ্রীমা যে তাঁর হিন্দু, মুসলমান এবং পাশ্চাত্যদেশোদ্ভব সন্তানদের কখনও ভেদবুদ্ধিতে দেখেননি, তার অজস্র প্রমাণ আছে। একবার জয়রামবাটীতে তাঁর গৃহনির্মাণে নিযুক্ত এক মুসলমান কর্মীকে শ্রীমা খেতে দিয়েছিলেন। লোকটির খাওয়ার পর শ্রীমাকে স্বহস্তে তার উচ্ছিষ্ট স্থান ও বাসন পরিষ্কার করতে দেখে শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। নলিনীর আপত্তির উত্তরে মা তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন ঃ 'আমার শরৎ [স্বামী সারদানন্দ] যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।'[৮]

গ্রামবাসীরা যাকে চোর বলে জানত সেই অবজ্ঞাত লোকটি একদিন শ্রীমায়ের জন্য কিছু কলা নিয়ে আসে, তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন। জনৈক স্ত্রীভক্ত তাতে বলেন ঃ 'ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?' এই কথা

শুনে শ্রীমা বলেন ঃ 'কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।'[৭] জনৈক সাধু একবার শ্রীমায়ের ভাইঝিদের জন্য বিলাতি কাপড় কেনার প্রস্তাবে আপত্তি করে বলেছিলেনঃ 'ওসব তো বিলিতি হবে, ও আবার কি আনব?' (ভারতে সেই সময়ে স্বদেশী-আন্দোলন চলছে) শ্রীমা হাসতে হাসতে বলেন ঃ 'বাবা, তারাও (বিলাতের লোক) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি একরোখা হলে চলে?'[৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে, বর্তমান কালের সমস্যা ও চাহিদার উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতেও পাশ্চাত্য-মেয়েদের ঠিক ঠিক বুঝতে পারার ব্যাপারে শ্রীমায়ের দিক থেকে কোনও বাধা থাকার কথা নয়। এখন প্রশ্ন এই ঃ সেই মেয়েরা কি মায়ের কথা শুনতে রাজি হবে? 'অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি' দিয়ে সমস্যার মূল কথাটি বুঝে নিয়ে তিনি যে-উপদেশ দিতে পারতেন, যার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে নেওয়া সম্ভব, সেই উপদেশ কি তারা শুনবে? বর্তমান নারীমুক্তি-আন্দোলনের বিশেষ কয়েকটি লক্ষ্য প্রসঙ্গে, শ্রীমাকে যাঁরা জানতেন এমন কয়েকজন শিক্ষিত ও সুধী ব্যক্তির মন্তব্য আমরা স্মরণ করতে পারি।

শ্রীমায়ের সুশিক্ষিত ও অন্তরঙ্গ মহিলা-ভক্ত গৌরী-মা বলেছেন ঃ 'শ্রীসারদাদেবী শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের সহধর্মিণী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেই আধার যার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বজননীকে পূজা করেছিলেন। নিজের সহধর্মিণীকে জগন্মাতারূপে পূজা করার ঘটনা আর কোনও যুগে দেখা যায়নি।...আজও শ্রীমাকে লোকে চিনতে পারেনি। তাঁর জীবনের পূর্ণ তাৎপর্যের উপলব্ধি বিশ্বের পক্ষে কল্যাণকর হতে বাধ্য।'[৯]

ইংরেজী ভাষায় শ্রীমায়ের বিশিষ্ট জীবনীকার স্বামী নিখিলানন্দ এই প্রসঙ্গে একটি পত্রে লিখেছেন ঃ '১৯১১ সনের কাছাকাছি শ্রীমা তাঁর বৃহত্তর শিষ্যমণ্ডলীর নিকট পরিচিত হন—বিশেষ করে স্ত্রীভক্তদের নিকট। মোটামুটি এই সময়ে মহিলারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে লক্ষণীয় ভূমিকা নিতে থাকেন। শিক্ষা, রাজনীতি এবং প্রশাসনের নানা ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ স্থান অধিকার করে নিতে দেখা যায়। তিনি যেন নারীজাতির চৈতন্য জাগ্রত করে দিয়েছেন। এই জাগ্রত নারীজাতি সমগ্র মানবজাতির পরবর্তী বিবর্তনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে এবং তখন বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার মীমাংসায় যুক্তির চেয়ে অধিকতর কার্যকর হবে প্রেম ও অন্তর্দৃষ্টি।'[১০]

নারীমুক্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ঃ এক, সমাজে পুরুষের সমান স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ; দুই, মেয়েদের মধ্যে একটি বিশেষ কল্যাণকর অন্তর্দৃষ্টির শক্তি আছে এই দাবি—যা জগতে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকার চায়। এই দুটি বিষয়ের কথা মনে রেখে যখন দেখি যে, শ্রীমা

কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের সহধর্মিণী নন, তাঁর কাছে মূর্তিমতী দেবী যাঁকে তিনি পূজা করেছিলেন জগন্মাতারূপে ; এবং ভেবে দেখি যে, সম্ভবত শ্রীমা পশ্চিমের মেয়েদের এই আন্দোলনকেও সক্রিয় করে তুলেছেন, যা মানবজাতির পরবর্তী বিবর্তন ঘটিয়ে দেবে, যেখানে যুক্তির চেয়ে অধিকতর কার্যকর হবে প্রেম ও অন্তর্দৃষ্টি—তখন মনে হয় বর্তমান আন্দোলনের সহভাগী মেয়েরাও অনুপ্রেরণা লাভের জন্য শ্রীমায়ের শরণ নিতে পারে। এই সম্ভাবনা রয়েছে ধরে নিয়ে আমি বর্তমান পাশ্চাত্যের মেয়েদের চাহিদা এবং সমস্যার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবার চেষ্টা করব। অতঃপর শ্রীমায়ের 'অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি'তে তাদের সমস্যার কোন্ রূপ ধরা পড়ত এবং কিভাবে তিনি সমস্যার সমাধানের পথে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতেন, তা-ই হবে বিচার্য।

আজকের মেয়েরা কি চায় এবং তাদের কষ্টের মূলে কি? নারীমুক্তি-আন্দোলনের যারা শরিক সেই মেয়েরা কোন্ অবস্থা থেকে মুক্তি চায়? সাধারণভাবে কি তাদের কাম্য? তারা কষ্টভোগ করছে বলে মনে করে, কিন্তু কি সেই ক্লেশ? একথা ঠিক, পাশ্চাত্য জগতের সব মেয়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তবে তার প্রতি সবার সহানুভূতি থাক বা না থাক, তার দ্বারা কোনও-না-কোনওভাবে প্রভাবিত। সেইদিক দিয়ে এটি সমকালের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। মোটামুটি এই আন্দোলনের প্রধান কয়েকটি লক্ষ্য হল :

প্রথমত, এই আন্দোলনের সহভাগীরা নারীর প্রথানুগত ভাবনা ও জীবনচর্যা থেকে মুক্তি চায়। পতি-প্রধান বিবাহবন্ধন মেনে নিয়ে ঘর সামলানো, সন্তানপালন ইত্যাদি জাতীয় প্রথানুগ কর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে তারা অনিচ্ছুক। চিত্তাকর্ষক ও কঠিন কর্মে তারা পুরুষদের সমান সুযোগ আশা করে। অধ্যাপনা, চিকিৎসা, ব্যবসা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, প্রযুক্তিবিদ্যা, রাজনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তারা সমান দক্ষতার দাবিদার, সেই কারণে আপন ইচ্ছা অনুসারে জীবিকা নির্বাচনে আগ্রহী। কর্মক্ষেত্রে তারা পুরুষদের সমান মর্যাদা ও বেতন দাবি করে।

দ্বিতীয়ত, তারা চায় এই পুরুষ-প্রভাবিত সংস্কৃতিক্ষেত্রে মেয়েদের যেন তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা না হয়—যে-দায়িত্ব পালনেই তারা নিযুক্ত থাকুক না কেন। তারা পুরুষদের কাছে লোকদেখানো সম্ভ্রমের প্রার্থী নয়, কারণ এই ধরনের আতিশয্য-চিহ্নিত সম্ভ্রম প্রদর্শন আসলে মেয়েদের নিম্নস্তরের প্রজাতি হিসাবে গণ্য করার প্রবণতাকে ঢেকে রাখার একটি প্রয়াস মাত্র। পুরুষদের তুলনায় তারা অবলা অথবা তারা পুরুষদের সম্পত্তি, বা ক্রীড়াবস্তু—এই রকম মনোভাবই প্রকাশ পায় উক্ত আচরণে।

তৃতীয়ত, ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবোধ থেকে তারা মুক্ত হতে ইচ্ছুক। নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে পুরুষরা যে-স্বাধীনতা ভোগ করছে সেটি তাদেরও কাম্য। এককথায়, দেহ ও মনের তৃপ্তি এবং আনন্দ আস্বাদনের উপায় খুঁজতে গিয়ে তারা সামাজিক বিধিনিষেধ অথবা সমাজসৃষ্ট পাপ-অপরাধবোধের বাধা আর মানতে চায় না।

চতুর্থত, পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার ফলে পূর্বে নিজেদের দক্ষতা ও জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের যে-সীমিত ধারণা ছিল সেই ধারণা থেকে তারা মুক্তি কামনা করে। তারা মনে করে, এতকাল পুরুষরা সাফল্যের সঙ্গে তাদের শিখিয়ে এসেছে—কোন্ কাজ মেয়েরা করতে পারে, কি তাদের চাওয়া উচিত, কি তাদের ভোগ্য, তাদের ন্যায়-অন্যায়বোধ কেমন হওয়া উচিত ইত্যাদি। এখন এইসব ব্যাপারে

তারা চায় স্বাধীনতা। নিজেদের সম্বন্ধে উক্ত পূর্ব-ধারণা থেকে মুক্তিকেই তারা বলে—'চেতনার উন্নয়ন'।

পঞ্চমত, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব আর চায় না। তারা চায় আর্থনীতিক ক্ষমতা—নিজের ইচ্ছামতো জীবন গঠন করার অধিকার। অর্থাৎ এককথায়, সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান অধিকার তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়—আর্থনীতিক স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর।

সবশেষে তাদের বক্তব্য, এই মুক্ত অবস্থায় তাদের বিশেষ চেতনাশক্তিকে সর্ব কর্মে নিয়োগ করতে দেওয়া হোক—যে-চেতনাশক্তি ইতিপূর্বে অন্তত পাশ্চাত্য জগতে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়নি এবং যাকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়নি। এই বিশেষ চেতনাশক্তিটি কি? একে বলা হয় 'দক্ষিণ মস্তিষ্কের' শক্তি যার সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি ও সামগ্রিক জ্ঞানলাভের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট। (প্রসঙ্গত, 'বাম মস্তিষ্কের' শক্তি দেয় বিশ্লেষণের এবং আংশিক জ্ঞানলাভের ক্ষমতা) এই বিশেষ চেতনাশক্তির বলে অন্তরের উপলব্ধি-সঞ্জাত জ্ঞান স্বতই অর্জিত হয়। এই বিশেষ চেতনাশক্তি ফলপ্রসূ হয় প্রেমে ও সংরক্ষণে। তাদের বিশ্বাস, এই শক্তি কেমন করে প্রয়োগ করতে হয় তা তারা অপরকে শেখাতে পারে এবং তা শেখানো তাদের কর্তব্য। এই শক্তির জন্যই তাদের হওয়া উচিত পুরুষের, সেইসঙ্গে সমগ্র সমাজের, শিক্ষিকা এবং পালিকা।

'দক্ষিণ মস্তিষ্ক' ও 'বাম মস্তিষ্ক' যে দুই ভিন্ন ধরনের চেতনা এনে দেয়, প্রথমটি যে অন্তর্দৃষ্টিনির্ভর ও দ্বিতীয়টি বস্তুনির্ভর এবং পাশ্চাত্য জগতে প্রথমটির প্রয়োগ যে অবহেলিত—এইসব তথ্য সন্দেহাতীতভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে মস্তিষ্কের মনস্তত্ত্বমূলক পরীক্ষায়। এই প্রসঙ্গে সানফ্রান্সিসকোর ল্যাংলি পোর্টার ইনস্টিটিউটের ডক্টর রবার্ট অর্নস্টিনের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডক্টর অর্নস্টিনের ধারণা, মানব-বিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে দক্ষিণ মস্তিষ্কগত উপায়ে জ্ঞানার্জন অতীব মূল্যবান, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে ঐ উপায় বিশেষ অবলম্বিত হয়নি ; সেখানে বাম মস্তিষ্কের যুক্তিবিচার, বিশ্লেষণ, ও বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠাকে অপরিমেয় মূল্য দিয়ে তার সবিশেষ চর্চা করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে প্রাচ্যদেশের ধ্যান-জপ, যোগপদ্ধতি, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি দক্ষিণ মস্তিষ্কের জ্ঞান-প্রক্রিয়া অবহেলিত। রেনেসাঁসের পরে পাশ্চাত্যে অধ্যাত্মচর্চার হানি ঘটেছে। স্বজ্ঞার (intuition) ভিত্তি নেই ধরে নিয়ে পাশ্চাত্যের মানুষ তাতে মনোযোগী নয়। ডক্টর অর্নস্টিনের মতে, সে অবস্থার পরিবর্তন এখন ঘটবার মুখে। পাশ্চাত্যে এখন প্রাচ্যের প্রাচীন জ্ঞান-পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে নতুন করে বুঝবার মনোভাব জেগেছে, সেইসঙ্গে তার আয়ত্তে এসে গেছে মানবমস্তিষ্ক বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল। এতদিন পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে আংশিক বাস্তবতাবোধ জাগিয়ে যাচ্ছিল, তাকে অতিক্রম করে সে এখন সামগ্রিক বাস্তবচেতনা উপলব্ধির অবস্থায় উপনীত।

বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের মেয়েরা কি চায়—কোন্ অবস্থা থেকে তারা মুক্তি চায়, উন্নীত হতে চায় কোন্ স্তরে—তার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বোঝা গেল, তারা চাইছে অনেক কিছুই। তাদের এই মুক্তি-আন্দোলনকে বলা হয়েছে 'নতুন ধরনের একটি বিদ্রোহ'—পূর্বে যাকে চিহ্নিত করা যায়নি এমন এক অত্যাচারী গোষ্ঠীর অর্থাৎ পুরুষজাতির দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এই মুক্তি-আন্দোলনের শরিকদের মানসিকতায় দেখা যায় নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়া। সেই মানসিকতারও একটি চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অথবা মোটামুটি এর দ্বারা প্রভাবিত, তাদের মনে জমেছে প্রচণ্ড ক্রোধ। এই ক্রোধ 'পুরুষ অত্যাচারীদের' বিরুদ্ধে, এবং মেয়েদের সীমিত জীবনযাত্রার পন্থা মেনে নেওয়ার পক্ষে প্রচারকারী পুরুষ ও নারীদের বিরুদ্ধেও। আমার এক তরুণী বান্ধবীর ভাষায় 'এ-ব্যাপারে যথেষ্ট ক্রোধের অস্তিত্ব রয়েছে'। এই মেয়েদের মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বস্তু হল বিচ্ছিন্নতা অথবা একাকিত্ববোধ—সমাজ থেকে যেন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ক্রমশই পারিবারিক ঐক্যে এখন ভাঙ্গন ধরছে; পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের, পিতামহ-পিতামহীর সঙ্গে পৌত্রপৌত্রীর সম্পর্কের চিহ্নটুকুও বুঝি আজ অবলুপ্ত। এখন পরিবার বলতে বোঝায় পিতা অথবা মাতার একজন এবং একটি সন্তান। এই রকম পরিবারের সংখ্যাই ক্রমবর্ধমান। অতঃপর দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে পরিবার অথবা স্বামী-স্ত্রী ও একটি সন্তানকে নিয়ে। বাবা উপার্জন করছেন আর মা সংসার দেখছেন, এই রকম পিতামাতা ও দুই বা ততোধিক সন্তান—এমন পরিবারের সংখ্যা এখন খুবই কম। বৃহৎ পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন ও অন্তরঙ্গতার যে-অস্তিত্ব একদা ছিল আজ তার অবকাশ নেই। এখনকার পরিবারে হৃদয়ের প্রসারের জন্য স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। আবার প্রায়শ স্ত্রীর পক্ষে তা-ও সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাকে অন্য কোনও এক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ব্যর্থ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হতে হয়, যে-সম্পর্কের মধ্যে সে হৃদয়ের আবেগ চরিতার্থ করতে পারবে, সেইসঙ্গে তার স্বাধীন ইচ্ছাও পাবে যথার্থ স্বীকৃতি। দেখা গিয়েছে, এই রকম সুবিবেচক পুরুষের অনুসন্ধানকালে মেয়েরা বরং নিজেদের সহচরীদেরই প্রকৃত বন্ধু হিসাবে পেয়েছে, হৃদয়ের আদান-প্রদান প্রকৃষ্টভাবে সম্ভব হয়েছে নিজেদের মধ্যেই।

ক্রোধ এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ ছাড়া ওদের মনোভাবের আর একটি দিক হল হতাশাজনিত বিক্ষোভ। যে-সামাজিক স্বীকৃতি আব আর্থনীতিক স্বাধীনতা ওদের কাম্য তার প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটছে। ওদের ইচ্ছামতো ব্যাপারটা ঘটছে না, তাই হতাশাবোধ। এই হতাশা ওদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

পরিশেষে বলতে হয় ওদের অসহায়তাবোধ আর হীনম্মন্যতার কথা। এই বোধ স্বতন্ত্রভাবে ওদের প্রত্যেকের মধ্যে, আবার গোষ্ঠীগতভাবে উক্ত নারীসম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষণীয়। কেন? ওদের ভিতরে যেন একটা হেতুবোধ মাথা তুলছে—নারী হিসাবে যে-স্বাধীনতা ও মর্যাদা ওরা দাবি করছে তা যদি আদায় করা সম্ভব না হয় তবে তার কারণ কি ওদের নিজেদেরই অযোগ্যতা নয়? এক্ষেত্রে তারা যুক্তি খাড়া করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে—পুরুষশাসিত সমাজে এতকাল যে-শিক্ষাদীক্ষা ওদের হয়েছে তার ফলেই এই অসহায়তা ও অশক্তির বোধ। তবুও ভিতরের ভয়টি স্পষ্টত থেকেই গিয়েছে। ভয় থেকে পুনরপি সঞ্জাত হচ্ছে ক্রোধ। সমাজে যারা কর্তৃত্ব করছে সেই পুরুষের প্রতি ক্রোধ—এবং নিজেদের প্রতিও ক্রোধ, কেন না তারা এই অবস্থা সহ্য করে যাচ্ছে।

শ্রীমা বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের সমস্যা সম্পর্কে কি বলতেন? শ্রীমাকে যদি

ওদের সব কথা বুঝিয়ে বলা হত, তাহলে তাঁর মনোভাব কি হত, তাঁর অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ওদের এই মুক্তিসংগ্রাম এবং তজ্জনিত বিক্ষোভবেদনার মধ্যে তিনি কি দেখতে পেতেন? শ্রীমায়ের জীবনী ও তাঁর উপদেশ পাঠ করে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে দেখার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, মা প্রথমে সরলভাবে বলে উঠতেন : আহা, ওরা বড় অসুখী! আহা...ওরা কী দুঃখী! অথবা মনের কথাটি আর একটু বিস্তার করে বলতেন : কিন্তু ওরা যে বাইরের জগতে মুক্তি চাইছে, সুখ চাইছে বাইরে থেকে! তা তো হয় না। আহা, ওরা বড় অসুখী, বড় দুঃখী!

এককথায় শ্রীমা তাঁর অভ্রান্ত, প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারতেন যে, বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের মেয়েদের সমগ্র সমস্যার মূলে রয়েছে ওদের স্বাভাবিক সুখ-সন্তোষের অভাব এবং নিজেদের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। কিন্তু কিভাবে তিনি ওদের সমস্যা সমাধানের পথে প্রতিষ্ঠিত করতেন? আহা কী সরল অথচ কী গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর! তিনি হয়তো শুধুই বলতেন, সুখের স্বাভাবিক অস্তিত্ব হৃদয়ে, সেইখানেই সুখ অনুসন্ধান করে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রয়াসে ওরা নিয়োজিত হোক। শ্রীমায়ের নিকট এটি আর কিছুই নয়, শুধু ঈশ্বরকে ভালবাসা, তাঁর মধ্যে মগ্ন হওয়া—অথবা অন্যভাবে বললে, চির-আনন্দময় সত্তাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে সেই সত্তাকে নিজের প্রকৃত সত্তা বলে চিনে নেওয়া। ক্ষণস্থায়ী বিষয়সুখ বা ইন্দ্রিয়সুখের মধ্য দিয়ে দুঃখ জয় করা যায় না, সে তো নিজের সত্তাকে খর্ব করা! দুঃখ জয় করতে হয় আপনার মধ্যে সুখ অনুসন্ধান করে—আত্মানন্দে মগ্ন হয়ে। এই যে প্রকৃত আনন্দ, পাশ্চাত্য জগতের মেয়েরা যদি সেই আনন্দের স্বাদ আহরণ করতে পারত তাহলে ওদের ক্রোধ, অত্যাচারবোধ, স্বীকৃতির অভাবের বেদনা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিজেদের অযোগ্যতার ধারণা, এই সমস্তই নিমেষে অন্তর্হিত হত ঠিক যেমন কুয়াশা অপসৃত হয়ে যায় সূর্যকিরণে।

সংস্কৃত ভাষায় 'আত্মরতি' বলে একটি শব্দ আছে ; আর একটি শব্দ হল 'আত্মক্রীড়া' (অর্থ : আত্মানন্দে আত্মার ক্রীড়া)। শ্রীমায়ের সমগ্র জীবনে অবিচ্ছিন্নভাবে ছিল সেই আত্মানন্দের সাগরে আত্মক্রীড়ার অনুভূতি। তার মধ্যেই তিনি স্বচ্ছন্দে সকল পার্থিব দুঃখের অথবা পরাধীনতাবোধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাভাবিক অবস্থার বিষয়ে বলতে গিয়ে শ্রীমা তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) এই আত্মরতি আর আত্মক্রীড়ার কথাই বলেছেন : 'কী মানুষই এসেছিলেন!...কী সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি, কথা, গল্প কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত। আমার জ্ঞানে তো আমি কখনও তাঁর অশান্তি দেখিনি।'[১১] শ্রীরামকৃষ্ণ—এবং শ্রীমা নিজেও—ছিলেন ঈশ্বরের অবতার। তাঁদের চিত্তে উদ্বেগের অস্তিত্ব থাকারও কথা নয়। কিন্তু ভাবনা-চিন্তা, উদ্বেগ, দুঃখকষ্ট এসব অতিক্রম করার প্রশ্নে শ্রীমা সকলকে একই উপদেশ দিতেন। বলতেন : বাইরের জগৎ থেকে শান্তভাবে চিত্তকে প্রত্যাহার করে নিয়ে জপধ্যানের মধ্য দিয়ে নিজের আধ্যাত্মিক স্বরূপ জানবার চেষ্টা কর। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীমায়ের যে-আত্মীয়া ঈর্ষা, কর্তৃত্বের

১১। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১০০

আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রবণতার দ্বারা তাড়িত হয়ে কতকটা মানসিকরোগগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সম্পর্কে শ্রীমা এক মহিলা-ভক্তকে বলেন ঃ 'কত সৌভাগ্যে, মা এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। আমার কথা কি বলব, মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম।...ওর কথা কি বলব ...রাত তিনটের সময় উঠে আমার ঐদিকের (উত্তরের) বারাণ্ডায় বসে জপ করুক না, দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে। তা তো করবে না, কেবল অশান্তি অশান্তি—কিসের অশান্তি তোর? আমি তো, মা, তখন অশান্তি কেমন জানতুম না।'[১২]

এসব কথা শুনলে পাশ্চাত্যের কোনও মেয়ে হয়তো প্রতিবাদ করে বলবে ঃ 'প্রথমত আমি ভগবানে আদৌ বিশ্বাস করি না, তাঁর প্রতি ভক্তি আমার হবে কোথা থেকে? আর যে-ধ্যানের কথা বলছ, যদি-বা তা করি, তাহলেও সেই ধ্যান কিভাবে আমার ঈপ্সিত মুক্তি এনে দেবে? কাজ করার যে-স্বাধীনতা আমি খুঁজছি, ধ্যান কেমন করে সেই স্বাধীনতা দেবে? পুরুষশাসিত সমাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রেখে সন্তানপালনের কাজে বেঁধে রেখেছে আমাকে—ধ্যান কেমন করে সেই শৃঙ্খল মোচন করবে? কিভাবে দেবে পুরুষের সমান ক্ষমতা, সমান স্বীকৃতি, সমান মর্যাদাবোধ?'

আমি জানি না কিভাবে শ্রীমা ওদের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করতেন ; তবে এটা জানি যে, বাহ্যত ওদের দাবি যতই যুক্তিসঙ্গত এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হোক না কেন, শ্রীমা সেগুলির উপর অনুরূপ গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তিনি মনে করতেন, যে-স্ত্রীলোক নিজের প্রকৃত সত্তাকে জেনেছে অথবা সেটি জানার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে, পার্থিব স্বীকৃতি সে পেল কি পেল না, এই দুশ্চিন্তা তাকে কদাচ পীড়িত করতে পারে না। আর তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় এটিও তাঁর জানা ছিল যে, যে-স্ত্রীলোক সব কিছু তুচ্ছ করে আত্মসাধনায় নিরত সে স্বামী, পিতা, মাতা, কন্যা—বস্তুত সকলের, গোটা সমাজেরই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁর বিচারে কোনও একটি মেয়ের অন্তরে বাইরের ঐসব সমস্যার স্বতই সমাধান হয়ে যায় যদি সে তার মনকে জীবনের পরম লক্ষ্যে অর্থাৎ নিজের ঈশ্বরীয় সত্তাকে জানার লক্ষ্যে স্থাপিত করতে পারে। জনৈক শিষ্য একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'জীবনের উদ্দেশ্য কি?' উত্তরে সহজভাবে তিনি বলেন ঃ 'ভগবানলাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্বদা মগ্ন হয়ে থাকা।'[১৩] যিনি বলতেন, 'ইষ্টদর্শন, সে তো হাতের মুঠোর ভিতর—একবার বসলেই দেখতে পাই,'[১৪] ঈশ্বরপ্রাণা সেই সারদাদেবীর পক্ষে মেয়েদের সামাজিক স্বীকৃতিলাভ, জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগের অধিকার ইত্যাদি প্রশ্ন অর্থহীন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ভগবৎ-আনন্দলাভের শক্তি নিয়ে যে জন্মেছে তার কাছে ঐসব পার্থিব দাবির প্রশ্ন অবান্তর—এই কথাই তাঁর মনে হওয়ার কথা। আবার একথাও ঠিক যে, তিনি সকল অবস্থার মানুষকে বুঝতে পারতেন। যদি কেউ বলত, 'ভগবানে আমার আদৌ বিশ্বাস নেই, নিজের বিশ্বাসের

প্রতি সৎ থেকে ভগবানের ধ্যান অথবা পূজা কেমন করে করব?'—তবে শ্রীমা তার মন বুঝে নিয়ে সেই কাতরোক্তির যথাযথ উত্তরও নিশ্চয় দিতেন। কাতরোক্তির মধ্যে আন্তরিকতা থাকলে তিনি নিশ্চয় তার দুঃখমোচনের তথা আত্মমর্যাদালাভের পথও দেখিয়ে দিতেন এবং সেপথ হয়তো ঈশ্বরলাভ তথা ভগবৎ-আনন্দলাভের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। আমরা দেখেছি, আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মেয়েরা ওদের আন্তরশক্তির এবং সামগ্রিক জ্ঞানলাভের শক্তির পুষ্টি কামনা করে। আমার যেন মনে হয়, শ্রীমা সেই দিক দিয়েই সমস্যার সমাধানের পথে ওদের প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন। সেক্ষেত্রে শ্রীমা হয়তো ওদের বলতেন : 'বেশ তো, ভগবানকে যদি তোমরা না-ও মানতে চাও, যদি তাঁর পূজা না-ও করতে পার, তবু তোমাদের ভিতর সামগ্রিক জ্ঞান এবং প্রেমবোধের একটি বিশেষ শক্তি আছে একথা যদি যথার্থ হয় তবে সেই শক্তি দিয়ে তোমরা প্রত্যেককে গ্রহণ করতে, ভালবাসতে এবং সেবা করতে তো পারবে —যার যতটুকু দরকার! দিনরাত সাধ্যমতো তোমরা যদি তা-ই কর তাহলে তোমরা প্রত্যেকটি কাজেই পাবে আনন্দ—সে যে-ধরনের কাজই হোক না কেন—আর তোমাদের সেবা যারা পাবে তাদের মনেও তোমাদের সম্পর্কে জেগে উঠবে শ্রদ্ধা। মরুভূমির প্রাণীর যেমন জলতৃষ্ণা, তেমনই মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রবল। সেই বস্তুটি যেখানে লব্ধ সেখানে পুরাতন সামাজিক বিধি-নিয়মের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির অথবা কর্মের স্বাধীনতার আর প্রয়োজন কি? সেসব তোমাদের অজ্ঞাতসারে স্বতই এসে উপস্থিত হবে। আপনার মধ্যে আনন্দ-উৎসের সন্ধান পেয়ে, নিজের সত্তাকে মর্যাদা দিতে পেরে তোমরা হয়তো নিজেদের উৎপীড়িত ভাবতেও ভুলে যাবে, হয়তো ক্রোধের, বিচ্ছিন্নতাবোধের অথবা আত্মসংশয়েরও আর প্রয়োজন থাকবে না।'

কিন্তু নিজেকে তার পূর্ণ সত্তায় আবিষ্কার করা এবং তদনুযায়ী প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেওয়া কাকে বলে সেটি বুঝতে হলে শ্রীমায়ের জীবনের দিকে আবার চোখ ফেরাতে হবে, দুই-একটি ঘটনায় তাঁর আচরণ লক্ষ্য করতে হবে, শুনতে হবে তাঁর কথা। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। জনৈক ভক্ত উদ্বোধনগৃহে নিম্নলিখিত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন : 'কিছুক্ষণ পরে নিচে একজন ভিক্ষুক এসে "ভিক্ষে দাও" বলে চিৎকার করছিল। সাধুরা বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়া দিয়ে উঠেছেন, "যাঃ, এখন দিক করিস্ নে।" মা তাই শুনতে পেয়ে বললেন, "দেখছ, দিলে ভিখারিকে তাড়িয়ে! ঐ যে নিজেদের কাজ ছেড়ে একটু উঠে এসে ভিক্ষা দিতে হবে, এইটুকুও আর পারলে না, আলস্য হল। ভিখারিকে একমুঠো ভিক্ষা দিতে পারলে না। যার যা প্রাপ্য, তা হতে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত? এই যে তরকারির খোসাটা, এও গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।'[১৫] এখানে লক্ষণীয় 'ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়' বাক্যটি। কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তি একবার দূর থেকে শ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁদের প্রতি শ্রীমায়ের সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় উক্ত ভক্তেরই স্মৃতিকথায় : 'ক্রমে মধ্যাহ্ন-ভোগের সময় হল। এমন সময়ে দূর দেশ হতে তিনটি পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক মায়ের দর্শনার্থে

১৫। তদেব, পৃঃ ৫৮

এলেন। বড়ই দরিদ্র—একবস্ত্রে, ভিক্ষা করে টাকা সংগ্রহ করে পথ খরচ চালিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন পুরুষ-ভক্ত মায়ের সঙ্গে গোপনে অনেক কথা বলতে লাগলেন। কথা আর ফুরোয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যাহ্ন-ভোগের বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে (কারণ, মা ভোগ দেবেন) মায়ের ভক্ত-ছেলেরা বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। একজন স্পষ্টই বললেন, "আর যা বলবার থাকে নিচে মহারাজদের কারও কাছে গিয়ে বলুন না।" মা কিন্তু একটু দৃঢ়ভাবেই বললেন, "তা এখন বেলা হলে কি হবে, ওদের কথাটি তো শুনতে হবে।" এই বলে বেশ ধৈর্যের সহিত তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। পরে ধীরে ধীরে কি আদেশ করলেন। তাঁর স্ত্রীকেও ডেকে নিলেন।... একঘণ্টা পরে তাঁরা প্রসাদ নিয়ে বিদায় নিলেন। মা এসে বললেন, "আহা! বড় গরীব। কত কষ্ট করে এসেছে!"'[১৬] দারিদ্র-যন্ত্রণা ভোগ করেও যারা ভগবানলাভের জন্যে ব্যাকুল তাদের প্রতি শ্রীমায়ের সহানুভূতি ছিল এমনই গভীর—তাদের কথা শোনবার জন্য তিনি নিজের নিয়মানুগ পূজোর সময়ও পার করে দিতে পারতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বেলুড় মঠের এক ভৃত্যকে চুরির অপরাধে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিপদে পড়ে সে শ্রীমায়ের শরণ নেয়। তার প্রতি শ্রীমায়ের সহানুভূতির সেই আশ্চর্য ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে: 'লোকটি উদ্বোধনে শ্রীমার কাছে গিয়ে সাশ্রুনয়নে বলে, "মা, আমি বড় গরীব, মাইনের টাকায় সংসার চালাতে পারি না। আমাদের খুব বড় সংসার। তাই, মা, আমি এই কাজ করেছি।" সেইদিন বিকালে স্বামী প্রেমানন্দ মায়ের বাড়ি যান। শ্রীমা তাঁকে বলেন, "দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" যখন তাঁকে বলা হল যে ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে স্বামীজী রুষ্ট হবেন, মা তখন জোর দিয়ে বলেন, "আমি বলছি, নিয়ে যাও।" ভৃত্যটিকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড় মঠে প্রবেশ করা মাত্র স্বামীজী বলে উঠলেন, "বাবুরামের কাণ্ড দেখ, ওকে আবার নিয়ে এসেছে।" কিন্তু যখন তিনি শুনলেন শ্রীমা কি বলেছেন তখন আর দ্বিরুক্তি করলেন না।'[১৭] আমরা দেখছি, চুরির মতো অপরাধ যে করেছে এমন লোকের ক্ষেত্রেও সমগ্র পরিস্থিতিটি তিনি (শ্রীমা) বুঝে দেখতে পারলেন এবং তাকেও ভালবেসে দয়া করলেন।

আবার উদ্বোধনে এবং শ্রীমায়ের কাছে বারবনিতাদের অথবা পূর্বে যারা গণিকা-জীবন যাপন করেছে এমন স্ত্রীলোকদের আগমন নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের বিচার সম্পর্কেও শ্রীমায়ের স্পষ্ট মনোভাব আমরা দেখতে পাই। 'পূর্বে গণিকাজীবন যাপন করেছে এমন একটি স্ত্রীলোক শ্রীমায়ের কাছে যাতায়াত করত। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই ব্যাপারটা অনুমোদন করতেন না। তাঁদের মধ্যে একজন শ্রীমায়ের কাছে নিজের বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পতিতারা

যদি এইভাবে উদ্বোধনে যাতায়াত করে তাহলে অন্যদের পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব হয়ে উঠবে। একথা শুনে শ্রীমা দৃঢ়স্বরে বলেন, "যারা আমার আশ্রয় নিয়েছে তারা এখানে আসবে। তাদের জন্য যদি কেউ এখানে আসা বন্ধ করে তো আমি কি করব?"...উদ্বোধনের জনৈক সাধু একশ্রেণীর নীতিভ্রষ্ট স্ত্রীলোকদের সেখানে যাতায়াত সম্পর্কে আপত্তি তুললে শ্রীমা বলেন, "ওদের যদি এখানে আসা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব।"[১৮]

এইসব স্ত্রীলোকের মনোবেদনা কী না গভীরভাবে শ্রীমা বুঝতেন! অতীত জীবনের গ্লানি সত্ত্বেও ওদের একান্ত প্রয়োজন ভালবাসার স্পর্শের, সেইসঙ্গে কিছু মর্যাদার স্বীকৃতির, সেকথাটা তিনি বুঝেছিলেন। কিভাবে সেই ভালবাসা তিনি প্রকাশ করেছেন তা আমরা দেখলাম ঃ তিনি বরং গঙ্গাতীরের বাসগৃহটিও ছেড়ে চলে যাবেন, তবু তাঁর আশ্রয়প্রার্থী পতিতাদের সেখানে আসা বন্ধ হতে দেবেন না।

ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্যদেশীয় অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্যদের প্রতি শ্রীমায়ের স্নেহের ভাব থেকে তাঁর আশ্চর্য ভালবাসার গভীরতা ও মাধুর্য কতকটা অনুমান করা যায়। 'ভক্তদের দেওয়া সামান্য উপহারকেও মা বিশেষ মূল্য দিতেন। তিনি বলতেন, "জিনিসের আর কি দাম, স্মৃতিরই দাম।" শ্রীমা নিবেদিতাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আদর করে বলতেন খুকী। শ্রীমার একটি তোরঙ্গে একখানি জীর্ণ এণ্ডির চাদর ছিল। তাঁর এক সেবক সেটি একদিন ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। মা সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বলেন, "না, বাবা, ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়েছিল, ওখানি থাক।" সযত্নে সেই বস্ত্রখণ্ডটি ভাঁজ করে তোরঙ্গে গুছিয়ে রেখে তিনি বললেন, "কাপড়খানিকে দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কী মেয়েই ছিল, বাবা!"[১৯]

শ্রীমায়ের ভালবাসা সেই চির-চৈতন্যের স্বাভাবিক পরিণতি যার দ্বারা তিনি নিজেকে দেহ নয়, মন নয়, অনাদি অনন্ত আত্মারূপে জানতেন—অথবা বলা যায়, এই ভালবাসা তাঁর আত্মানন্দ বা আত্মক্রীড়ারই একটি রূপ। বোধ-গভীর এই চৈতন্যময় ভালবাসার অনুভব বা প্রকাশ আমাদের সাধ্যাতীত—অন্তত দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস ও অনুশীলন ব্যতীত অমন অবস্থায় উপনীত হওয়ার আশা আমরা করতে পারি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও কি সত্য নয় যে, যে নারী-আন্দোলন-কারিণীরা আন্তরজ্ঞান বা 'সম্যক দর্শনের' ভিত্তিতে প্রেমানুশীলন করতে চায় তাদের নিকট শ্রীমা এক আদর্শ দৃষ্টান্ত? বস্তুত আন্তরপ্রেমের অনুশীলনের জন্য একটি দৃষ্টান্ত তো চাই! আর শ্রীমা ছাড়া আর কে-ই বা এক্ষেত্রে আদর্শ হতে পারেন? সর্বভূতে প্রেম তাঁর ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অনুভূতি—সেখানে না ছিল এতটুকু কৃত্রিমতা, না আয়াসের বিন্দুমাত্র লক্ষণ।

যারা হৃদয় ও মনের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিস্তার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, পাশ্চাত্যের সেই মেয়েরা শ্রীমায়ের এই ভালবাসাকে যেন আবেগপ্রবণতা অথবা গুরুগম্ভীর কিছু ভেবে না বসে। তাদের লক্ষ্য করা দরকার, অতিশয় বুদ্ধিমতী, কর্মনিপুণা এবং সমসময়ের পক্ষে অত্যন্ত উদারচেতা পাশ্চাত্য মহিলা নিবেদিতা শ্রীমাকে কি চোখে

দেখতেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, নিবেদিতার গুরুভগিনী সারা বুল যখন কঠিন সঙ্কটময় পীড়ায় আক্রান্ত, একান্ত সেই দুঃখের দিনে নিবেদিতা শ্রীমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। শ্রীমা-সম্পর্কে তাঁর এক অন্তরঙ্গ পাশ্চাত্য মহিলা-ভক্তের মনোভাব এই পত্রে প্রতিফলিত। তিনি লিখছেন ঃ

'আদরিণী মা, সারার জন্যে প্রার্থনা করব বলে আজ ভোরে গীর্জায় গিয়েছিলাম। সবাই ওখানে যীশু-জননী মেরীর চিন্তা করছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমাকে। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা দৃষ্টি, পরনে সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—সবই যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, তোমার সেই দিব্যসত্তাই যেন বেচারী সারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম, জানো মা? ভাবছিলাম সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আমার কী বোকামিই না হয়েছিল। আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মতো বসে থাকতে পারাই তো যথেষ্ট! মা গো! ভালবাসায় ভরা তুমি। আর সেই ভালবাসায় নেই আমাদের বা জগতের ভাল-বাসার মতো উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা। তোমার ভালবাসা হল এক স্নিগ্ধ শান্তি যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং কারও অমঙ্গল চায় না। ও যেন লীলাচঞ্চল একটি হৈম দ্যুতি! কয়েকমাস আগেকার সেই রবিবারটি কী আশিসই না বয়ে এনেছিল! গঙ্গাস্নানে যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য দৌড়ে তোমার কাছে গেলাম। তোমার আনন্দময় ঘরখানিতে তুমি আমায় যে-আশীর্বাদ জানালে, তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি। প্রেমময়ী মা! চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা, আহা, যদি তোমায় লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু না, তাতেও মনে হয়, বড় বেশী শব্দ করা হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মতো। সত্যিই, তুমি ভগবানের আশ্চর্যতম সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র। এই নিঃসঙ্গ দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে প্রতীক স্বরূপ ; আর আমাদের উচিত তোমার কাছে একান্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা—অবশ্য কখনও কখনও একটু-আধটু মজা করা ছাড়া। বাস্তবিকই ভগবানের যা কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই শান্ত, নীরব। গোপনে, অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদের জীবনে—যেমন বাতাস ও সূর্যের আলো, যেমন বাগানের ও গঙ্গার মাধুর্য। এইসব শান্ত জিনিসই তোমার তুলনা।'[২০]

আমরাও—সকলেই—নিবেদিতার মতো তাঁর সামনে 'স্তব্ধ ও শান্ত' হয়ে বসি না কেন, আর সেইভাবে থেকে অনুভব করি না কেন তাঁর শান্তির স্পর্শ? এই প্রয়াস কি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এনে দেবে না আমাদের নিত্যমুক্ত আনন্দময় স্বরূপের চেতনা? এবং ফলত তা কি আমাদের নিজের নিজের সমস্যার সমাধানের 'যথার্থ মানসিকতায়' প্রতিষ্ঠিত করে দেবে না?

স্বামী নিখিলানন্দ এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, শ্রীমায়ের উচ্চারিত, শেষ

লিপিবদ্ধ কথা কয়েকটি যেন মানবজাতির প্রতি তাঁর নিজস্ব বাণী। দেহত্যাগের তিন দিন পূর্বে এক মহিলা-ভক্তকে তিনি সেই কথাকটি বলেছিলেন। খুব ধীরে ধীরে তিনি বলেন ঃ 'একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'[২১]

শেষ সময়ে উচ্চারিত তাঁর এই কথা কয়টিকে যে-কোনও ব্যক্তির প্রতি তাঁর সার উপদেশ বলে মনে হয়। যে-কোনও ব্যক্তির প্রতি, অতএব পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের প্রতিও। তবে আমার মনে হয়েছে, শ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময়ে শিষ্যা সরলা এবং মহান সন্ন্যাসী স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে তাঁর আচরণে নিহিত আছে তাঁর আরও একটি প্রত্যক্ষ বাণী। আমি অনুভব করেছি, এই ঘটনায় শ্রীমা সরলাকে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে অপরের মনঃকষ্ট ও চাহিদা স্ত্রীজাতির স্বভাবজ আন্তরজ্ঞান দিয়ে বুঝতে হয় এবং তদনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়, সেইসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি যেন শরৎ মহারাজের আচরণের প্রতি নির্দেশ করেছেন। ঘটনাটি এই ঃ 'একদিন মধ্যরাত্রে সরলা যখন তাঁকে [শ্রীমাকে] খাওয়াতে যাচ্ছেন, শ্রীমা তখন আবদারের সুরে বললেন, "আমি খাব না। তোর একই কথা, 'মা খাও,' আর 'বগলে কাঠি (থার্মোমিটার) লাগাও'!" সেবিকা সরলা তখন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি স্বামী সারদানন্দকে ডাকবেন কিনা। শ্রীমা তবুও খেতে চাইলেন না, বললেন, "ডাক শরৎকে, আমি তোর হাতে খাব না।" স্বামী সারদানন্দ খবর পাওয়ামাত্র ঘরে এলেন। শ্রীমা তাঁকে কাছে বসিয়ে নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন। তারপর সারদানন্দজীর হাতদুখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, "দেখ না, বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে—খালি 'খাও, খাও' এদের রব, আর জানে খালি বগলে কাঠি দিতে। তুমি ওকে বলে দাও যেন বিরক্ত না করে।" সারদানন্দজী কোমল-কণ্ঠে বললেন, "না মা, ওরা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।" কয়েক মিনিট পরে তিনি শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, এখন কি একটু খাবেন?" মা বললেন, "দাও।" সারদানন্দজী তখন সরলাকে দুধটুকু আনতে বললেন। মা বললেন, "তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে খাব না।" সারদানন্দজী "ফিডিংকাপ" থেকে শ্রীমায়ের মুখে একটু দুধ ঢেলে দিয়ে বললেন, "মা, একটু জিরিয়ে খান।" এই মিষ্টিকথায় আনন্দিত হয়ে তিনি বললেন, "দেখ তো, কী সুন্দর কথা—'মা, একটু জিরিয়ে খান'। এই কথাটা আর ওরা বলতে জানে না? দেখ তো বাছাকে এই রাতে কষ্ট দিলে। যাও, বাবা, শোও গিয়ে।" এই বলে সস্নেহে তিনি প্রিয় সন্তানের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। স্বামী সারদানন্দ মশারি নামিয়ে দিয়ে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। মধ্যরাত্রে তাঁকে [সারদানন্দজীকে] ঘর থেকে আসতে হয়েছে বলে শ্রীমা আবার দুঃখপ্রকাশ করলেন। আর এই যে মায়ের শেষ সময়ে তাঁকে একটু সেবা করতে পেরেছেন তার জন্য সারদানন্দজী ধন্য মনে করলেন নিজেকে। ইতি-পূর্বে তিনি মাকে সেবা করেছেন দূর থেকে।'[২২]

এই ঘটনার পরবর্তী অংশটুকুও এখানে লিপিবন্ধ করব। নয়তো কেউ কেউ মনে করতে পারেন মুমূর্ষু, যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীর কি প্রয়োজন সেটি সরলাকে বুঝিয়ে দিয়েই শ্রীমা ক্ষান্ত হয়েছিলেন, সরলাকে নিজের কোলে টেনে নেননি। পরবর্তী ঘটনা এই : 'বুদ্ধিমতী সরলা পরিস্থিতিটি সম্যক্ বুঝে নিয়ে সারদানন্দজীকে নিজের কাজ বদল করে দিতে অনুরোধ জানালেন। সারদানন্দজী সম্মত হলেন। পরের দুদিন সরলা যতখানি সম্ভব শ্রীমায়ের থেকে দূরত্ব রেখে চললেন আর ওদিকে অন্য সেবিকারা ভার নিলেন তাঁর সেবার। শ্রীমা সরলার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন: সরলা কাছে আসতেই শ্রীমা তাঁর মাথাটি বুকের উপর টেনে নিয়ে বললেন, "তুই আমার উপর রাগ করেছিস, মা? আমি যদি কিছু বলে থাকি, কিছু মনে করিসনি, মা!" সরলার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি আবার যথারীতি শ্রীমার কাজ শুরু করে দিলেন।'[২০]

এই আমাদের সারদা মা—কী সরল, কী মাধুর্যময়, কী মানবিক, আবার সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা। তাঁর জীবনের অমৃতময় সব ঘটনা স্মরণে রেখে তাঁর বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার করতে আমি যে শঙ্কিত বোধ করেছি তা কি বিস্ময়কর? আর পাশ্চাত্য নারীদের সঙ্গে শ্রীমায়ের সম্বন্ধ এই প্রসঙ্গে কি-ই বা বোঝাতে পারলাম? হয়তো ওদের উদ্দেশে কেবল এইটুকু বলতে পেরেছি : তোমরা লক্ষ্য কর, আমরা এমন একজন মানুষ দেখতে পাচ্ছি যিনি প্রত্যেককে তার মতো করেই বুঝতে পারতেন, আর তার জন্য অকৃপণভাবে ঢেলে দিতে পারতেন ভালবাসা যার কাঙাল আমরা প্রত্যেকেই। যদি পার, সেই মানুষটিকে ভালবাস—সর্বদা ধ্যান কর তাঁকে, চিন্তা কর সেই অসাধারণ জীবন। কি সেই জীবন? 'একটি দীর্ঘ, নীরব প্রার্থনা!' আন্তরবোধ-সমন্বিত লোকসেবার পন্থাটি খুঁজে নেবার জন্য তাঁকেই আদর্শরূপে স্থাপিত কর। আর যদি নিজের নিজের মুক্তির কামনা থাকে—ক্ষণিক নয়, স্থায়ী মুক্তির কামনা—তবে সেই ইচ্ছাটি নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হও। তিনি সত্যিই তোমাদের সকল বাধা অতিক্রমের 'যথার্থ মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত' করে দেবেন। *

শ্রীমা ও আধুনিক ভারতীয় নারী

আধুনিক সমাজ-জীবনে অনেক মানুষের মনেই একটা প্রশ্ন প্রায়ই উঁকি মারে, শ্রীমা সারদাদেবী কি করে আধুনিক নারীর আদর্শ হবেন? তিনি তো গ্রাম্য, তিনি অশিক্ষিত, তিনি মধ্যযুগীয়, এবং আপাদমস্তক ধর্মভাবনায় নিমজ্জিত। পৃথিবী যে অনেক এগিয়ে গেছে; গ্রাম পর্যন্ত শহর হয়ে পড়েছে (অন্তত শহরের জীবনযাত্রার লোভে পাগল সে); স্কুল-কলেজে শিক্ষার জন্য হুড়োহুড়ির শেষ নেই; পুরাতন কুসংস্কারের সমূহ উচ্ছেদে ব্রতী একাল; ধর্মের আফিম খেতে মোটে রাজি নয় প্রগতি-শীলেরা। একালেও সারদাদেবী নারীর আদর্শ?

হ্যাঁ, অবশ্যই। যত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তাঁর কাছ থেকে পলায়নের ইচ্ছা, ততই অনিবার্য টানে তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন। তাইতো শুনি, পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যাঁরা দীক্ষা নিতে আসেন, তাঁরা সর্বাধিক সংখ্যায় সারদাদেবীকেই ইষ্ট করতে চান।

সারদাদেবীর মধ্যে সত্যিই আছে আধুনিক উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে স্থিরত্বের আশ্বাস, যুগযন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায়, যন্ত্রণাবর্তের মধ্যে শান্তিনিকেতন। কিভাবে?

প্রথমে যুগসমস্যার রূপ দেখে নেওয়া যাক।

আজ আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বিচ্ছিন্নতা। আমরা সবাই একা। কেউ কারও মানসিকতার শরিক নই। প্রত্যেকেই নিজেকে আলাদা করে শামুকের খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছি। ফলে, সকলের মধ্যেই শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা। জীবন অর্থহীন মনে হয়। নৈরাশ্য কিংবা হতাশা সৃষ্টি করছে নিঃসঙ্গ-বোধ। তা থেকে দেখা যাচ্ছে ভয়াবহ মেলানকোলিয়া (Melancholia)। একের প্রতি অন্যের কুৎসিত সন্দেহ, হিংসা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে স্কিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)।

আজকের সামাজিক জীবনে মানুষের সমস্যা বিচিত্র। আমি শুধু কয়েকটি মাত্র সমস্যার কথাই বলব। প্রথমেই আমি বিচ্ছিন্নতার কথা বলছি, কারণ—আধুনিক জীবনের বহুমুখী জটিল দ্বন্দ্ব, সঙ্ঘাত অধিকাংশই আসছে এই বিচ্ছিন্নতা থেকে। এই আলোচনায় আধুনিক সমাজের মেয়েদের কথাই বলতে চাই বেশী করে, যাঁরা অনেকটাই পারেন সমাজকে এই অবক্ষয়ের যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে। কেননা, মেয়েরা মায়ের জাত, ভালবাসতে এবং ভালবাসাতেই যাঁদের চরম পূর্ণতা। ভালবাসা দিয়ে গোটা সমাজকে বদলানো যায়। বদলানো যায় তিলে তিলে মানুষের আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে। ভালবাসা মানে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে ক্ষমা, ধৈর্য কিংবা সহন-শীলতা, যা ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য, জীবনচেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, যা ছিল আমাদের শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগবে, আধুনিক নারী কারা? কোন্ লক্ষণ থেকে আমরা তাঁদের আধুনিক নারী বলব? যাঁরা শিক্ষিতা, প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন, যাঁরা পর্দানশীন জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সব ক্ষেত্রেই পুরুষের

মতো যোগ্যতার অধিকারী, পুরনো দিনের চিন্তাধারা থেকে সরে এসেছেন, আমরা তাঁদেরই মোটামুটিভাবে আধুনিক নারী বলে চিহ্নিত করতে পারি।

বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা এইসব আধুনিক নারীর মধ্যে, বিশেষত সমাজের উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই বেশী। আজ যাঁরা ধনী কিংবা উচ্চবিত্ত বলে পরিচিত, তাঁদের হাতে প্রচুর টাকা, সৎভাবেই হোক আর অসৎভাবেই হোক যেভাবেই রোজগার করুন না কেন। যাঁরা শহরে আছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবন, উগ্র আধুনিকতার ঢেউ, পানাসক্তি, এল. এস. ডি., ম্যানড্রেক ইত্যাদির নেশা। শিক্ষিত মানুষ সম্পূর্ণ বিবেকবান হওয়া সত্ত্বেও যে নিজেদের এইভাবে সর্বনাশা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন, তার কারণ, জীবন তাঁদের কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে। যশ, প্রতিষ্ঠা, সম্পদ মানুষের মন ভরাতে পারছে না। কি যেন পাইনি, সেই না পাওয়ার নৈরাশ্য মানুষকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করতে প্ররোচিত করছে। স্বামী-স্ত্রী একই ছাদের তলায় থেকেও কেউ কারও আপন হতে পারছেন না। তার কারণ, দুজনের মধ্যেই স্বার্থত্যাগের অভাব। তাঁরা সুখের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান আর তাঁদের ছেলে-মেয়েরা নিঃসঙ্গ একাকীত্বে ছটফট করে বাড়িতে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির ফলে একের প্রতি অন্যের সন্দেহ বাড়ছে। ছেলেমেয়ের চোখের সামনে রয়েছে পিতা-মাতার অস্থির জীবন। তা দেখে সন্তানেরা কি শিখবে? এর জন্যে দায়ী আধুনিক সমাজ। নিশ্চয় আমরা দোষ দিতে পারি না কোন ব্যক্তিবিশেষকে। ঘরে, বাইরে, অফিসে প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা; প্রেমহীন জীবনে তাঁরা বাঁচবার হাতিয়ার হিসেবে খুঁজে নিয়েছেন উচ্ছৃংখল জীবনকে। কিন্তু আমাদের বাঁচবার পথ তো এই নয়। বাঁচবার পথ অকৃত্রিম জীবনের মধ্যে ফিরে আসা। জীবনকে ভালবাসতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকবে সেই মধুর সম্পর্ক, যা কল্যাণময় গোটা সমাজের পক্ষে। আত্মত্যাগ থাকবে দুজনেরই। সারদামায়ের জীবনে সেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী। শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভালবাসা। তাঁরা তাঁদের জীবনের আদর্শ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন কেমন করে স্বামী-স্ত্রী সংসারে বন্ধুর মতো বাস করবে, কেমন করে একে অন্যের পরিপূরক হবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে আজ এই যে ফাটল ধরতে শুরু করেছে, এটা বন্ধ করার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে, দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যৌথ দায়িত্ববোধ। কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের লড়াই বন্ধ করতে হবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের দাম্পত্য-জীবনের অশান্তির আর একটি বড় কারণ। শুধু স্বামীর রোজগারে স্ত্রী সন্তুষ্ট নন। চাহিদা, লোভ মানুষের জীবনসংগ্রামকে আরও জটিল করে তুলেছে, যদিও একথা সত্যি যে, জিনিসপত্রের এই দুর্মূল্যের বাজারে শুধু একজনের রোজগারে অনেক ক্ষেত্রেই সংসার চালানো সম্ভব হয় না। মেয়েরা তাই ঘরের পৃথিবী ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে বেরোয়। স্বামীকেও অনেক সময় স্ত্রীর রোজগারের ওপর খানিকটা ভরসা রাখতে হয়। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে তো এটা অপরিহার্য ব্যাপার। উচ্চ-মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর রোজগার ছাড়া যে সংসার চলে না, তা নয়। কিন্তু চাহিদা বেশী থাকায় তাঁরা কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাই স্ত্রীও রোজগারে নেমে পড়েন। শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার লড়াই। অন্ধ অহংবোধে আচ্ছন্ন মানুষ, বিপরীত দুই শত্রুশিবিরের

বাসিন্দা হয়ে, সমাজ-জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে আবদ্ধ থেকে আরও যেন ক্ষত-বিক্ষত হন। হয়তো প্রতিকারের উপায় হিসেবে একদিন বেছে নেন আইনগতভাবে ছাড়াছাড়ির পথ। দাম্পত্য-জীবনের এই ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয় শিশুরা। তাদের মন যেন ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দোলে, তারা মায়ের পক্ষ নেবে, না বাবার পক্ষ নেবে! ডিভোর্সী বাবা-মায়ের সন্তান অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বল মনের অধিকারী হয়। তারা যখন বড় হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাদের জীবনেও দেখা যায় স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ। তাদেরও দাম্পত্য-জীবনে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। অতএব উচ্চ চাকুরিজীবী কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত অথবা শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত যাই বলি না—আজ তাঁদের ভাববার দিন এসেছে। আত্ম-শোধনের মধ্যে দিয়েই তাঁরা সমস্যার সুরাহা করতে পারেন। সারদাদেবীকে শ্রীরাম-কৃষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?' সারদাদেবী উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'আমি...তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'[১] এই মনোভাব আজকের যুগে অত্যন্ত প্রয়োজন। সারদাদেবীই যে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণকে সহযোগিতা করে গেছেন তা-ই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে যোগ্য সম্মান করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।'[২] বলেছেনঃ 'ও আমার শক্তি!'[৩] স্ত্রীর প্রতি এই শ্রদ্ধা, আজকের তথাকথিত আধুনিক যুগের সমস্যা-জর্জরিত মানুষের কাছে এক পরম উদাহরণ। অন্যদিকে স্ত্রী যে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী, জীবনসঙ্গিনী, সেকথাও শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে গেলেন তাঁকে কঠিন দায়িত্ব দিয়ে। 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল্‌বিল্ করছে। তুমি তাদের দেখো।'[৪] কলকাতা মানে জীবের কলকাতা। জীবজগৎ অর্থাৎ যারা অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবে আছে, তাদের দেখার দায়িত্ব দিলেন ঠাকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে এই যে লোকশিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, মা তা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। নিজের দেহ-ত্যাগের আগে ঠাকুর মায়ের মধ্যে যে ত্রিশক্তি লুকিয়েছিল, তার বোধন করে গেছেন। কি সেই শক্তি? মাতৃশক্তি, জ্ঞানশক্তি, গুরুশক্তি। আজকের যুগে, কি পৃথিবীর কোন যুগে কোন কালে এর তুল্য দাম্পত্য-জীবনের উদাহরণ পাওয়া গেছে? কেউ বলতে পারেন, সারদামায়ের মধ্যে ঈশ্বরের মানবীরূপে আবির্ভাব, আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা কি করে তাঁর আদর্শ এমন করে গ্রহণ করতে পারব? উত্তরে বলব, ঈশ্বরের মানবরূপ তো মানুষকে পথ প্রদর্শন করতেই। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে, নিজেদের তৈরী করতে হবে, ভালবাসার অভ্যাস করতে হবে—যে-ভালবাসার মধ্যে থাকবে শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ।

আমি আগেই বলেছি, আধুনিক জীবনযন্ত্রণার আর একটি বড় কারণ হল চাহিদা। মানুষ নিজেদের জীবনকে বিষময় করে তোলে টাকার চাহিদায়,—যখন নিজের ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়ে অতিরিক্ত চেয়ে বসে তখন মানুষ ভুলে যায়, শুধু 'চাই চাই' মনোভাব জীবনে শান্তি দিতে পারে না। যা পেয়েছি, তারই কি মূল্য কম?

এ সমস্যা কেবল উচ্চবিত্তের নয়, সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই আজ বস্তু

বেশী চাহিদা, যে-চাহিদা মানুষকে বৃহত্তর 'আমি' থেকে ক্ষুদ্রতর 'আমি'তে পরিণত করছে। কোথায় থামতে হবে কেউ জানে না। ফলে হিংসা বাড়ছে। টাকার জন্য, সম্পত্তির জন্য খুনখারাপি অন্তত একশ গুণ বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। খবরের কাগজে আইন-আদালতের পাতায় চোখ বুলোলেই তা বোঝা যায়। নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে মানুষ টাকার কালোবাজারী করছে। কিন্তু টাকাই কি শান্তির পথ? আজকের আধুনিক সমাজ সেকথা বুঝেও বুঝছে না। মানুষ কি চায়, সেকথা তাকে পরিষ্কার করে ভাবতে হবে। মানুষ যা চায়, তা টাকা নয়, যশ নয়, শান্তি। শান্তির পথ তৈরী হবে কিভাবে? যখন মানুষ তার চাহিদা কমাবে।

শ্রীমায়ের জীবনে কোন চাহিদা ছিল না। তিনি বলেছেনঃ 'যখন যেমন তখন তেমন...।'[৫] তিনি একথা শুধু মুখেই বলেননি। তাঁর জীবনে তার উদাহরণ রেখে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের তেরো বছরের ইতিহাসে দেখি, শ্রীশ্রীমাকে কত কঠিন পরিশ্রম করতে। সারাদিন তাল তাল আটা মেখেছেন ঠাকুরের ভক্তদের জন্যে। একবিন্দু অবসর নেই। ঘোমটার আড়ালে থেকে শুধু অন্যের সেবা করে গেছেন। আধুনিক সমাজের মেয়েরা নিশ্চয় এতখানি ত্যাগস্বীকার করতে রাজি নন। তাঁরা হয়তো এখানে দেখবেন একজন বঞ্চিতা নারীকে, যিনি স্বামীর কাছে কিছুই পাননি। স্বামী, স্ত্রীকে পুজো করেছেন, দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু সন্তানের মা হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাঁকে দিয়ে শুধু সেবাই করিয়ে গেলেন। এমন নারীর কাছ থেকে আমরা কোন্ মহৎ শিক্ষা পেতে পারি? সংশয়-কুটিল এই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু শ্রীমায়ের জীবনদর্শন বলে অন্য কথা। জীবনের আনন্দ ভোগে নয়, ত্যাগে। পরের জন্যে নিজের হৃদয় খুলে দেবার মতো আনন্দ আর নেই। আমরা সাধারণ অর্থে ভালবাসা মানে বুঝি আত্মতৃপ্তি। কিন্তু ভালবাসা মানে তো আত্মত্যাগ। শ্রীমায়ের মধ্যে ছিল সেই ভালবাসা যার নাম আত্মত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহধর্মিণীকে আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে যে জগৎ-জোড়া সন্তানের মা হবার অধিকার দিয়ে গেলেন—সেই মহীয়সী নারী, গ্রাম্য সংস্কৃতিতে লালিতা, তিনিই আজ আধুনিক যুগযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত নারীদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার উদাহরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা-দেবীকে বলেছিলেনঃ 'কারও কাছে...চিতহাত করো না।' 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে; শাক বুনবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।'[৬] অর্থাৎ নিজের ক্ষমতার বাইরে যেও না। পরের কাছে হাত পাতা ভিক্ষাবৃত্তি। আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর মা কামারপুকুরেই ফিরে গিয়েছিলেন এবং শাক বুনেই খেয়েছিলেন। নুন জোটেনি। তবু কারও কাছে মুখ ফুটে কিছু বলেননি। কাপড়ে আঠারোটা গেরো। ধৈর্য ও সংযমের এই চূড়ান্ত রূপ আজকের আধুনিক সমাজের মেয়েদের কাছে হওয়া উচিত বিরাট দৃষ্টান্ত।

একথা ঠিক, এখন অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য বা জীবিকার প্রয়োজনে মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ মেয়েকেই ঘরে-বাইরে দুদিকেই লড়তে হচ্ছে, মেয়েরা আজ চেনা-মহলের সীমানা পেরিয়ে নিজেকে বহুদূর বিস্তৃত করেছেন, তাই তাঁদের জীবনের

স্বন্দ্ব, সংঘাত বহুমুখী। সত্যিই, এখন আর সারদাদেবীর যুগ নেই। মেয়েদের নিপুণভাবে সংসার দেখার সময় কোথায়? পুরো সময় যদি না থাকে, তবু যা আছে তারই উপযুক্ত ব্যবহার হবে না কেন? মায়ের জীবনেও কি দিক্‌পরিবর্তন হয়নি? তিনিও তো পল্লীবধূ থেকে এক বিখ্যাত সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের 'সংঘজননী' হয়েছিলেন। আবার একই সঙ্গে রাধুরও মা হয়েছেন। নলিনীদিদির সঙ্গে বসে রুটিও বেলেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা আজ নিপীড়িত, কেবল একথা বলে চেঁচামেচি করা ঠিক হবে না। বহুক্ষেত্রে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। যেমন শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া এ আর থামবে না বোধহয়। কিন্তু সারদা-মা পরকে আপন করেছেন, সকলকে নিয়ে ঘর করেছেন। নিজের শাশুড়ীর মতো যত্ন করেছেন গোপালের মাকে। ভক্তি করেছেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে। কাউকে তো হিংসা করেননি।

হয়তো প্রশ্ন উঠবে, মেয়েরা কি স্বামীর সব কথাই মেনে নেবে? যেখানে স্বামী ভুল পথ বেছে নেবে, সেখানে তারা চুপ করে থাকবে? নিশ্চয়ই নয়। প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু সে প্রতিবাদের ভাষা ফুটবে নারীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। শ্রীমাও ঠাকুরের সব কথা মেনে নেননি। যেমন, মায়ের কাছে নহবতে আসতেন যে বৃদ্ধা, যাঁর অতীত জীবনের ইতিহাস ছিল মলিন, ঠাকুর আপত্তি করা সত্ত্বেও মা কিন্তু তাঁর আসা বন্ধ করেননি।

আজকের আধুনিক যুগের আর এক সমস্যা, মায়েরা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চাপিয়ে দেন ছেলেমেয়ের ওপর। সন্তানদের কাছে তাঁদের দাবি, তাদের প্রথম হতেই হবে। তা না হলে মায়ের 'প্রেসটিজ' থাকে না। তার ফলে পড়াশোনার নামে সন্তানের ওপর চলে উৎপীড়ন। ফলে, ছোটবেলা থেকেই ছোটদের মনে লেখাপড়ার প্রতি ভীতি এসে যায়, আসে বিতৃষ্ণা। মায়েরা বুঝতে চান না, প্রত্যেকেই এক রকম বুদ্ধি বা ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা যেন নির্ভর করে সন্তানের সাফল্যের ওপর।

এখানে স্মরণ করতে হবে সারদা মায়ের আদর্শ। তাঁকে যে আমাদের মনে না করে উপায় নেই। তিনি ছিলেন সতেরও মা, অসতেরও মা। তাই তিনি বলতে পেরেছেনঃ আমার কাছে শরৎও যা, আমজাদও তাই।[৭] অর্থাৎ মায়ের কাছে সন্তান সবাই সমান। শিশুরা কেউই খারাপ নয়। এক একজন এক এক ধরনের গুণ নিয়ে জন্মায়। আজকের আধুনিক সমাজের মা-বাবাকে বুঝতে হবে, কার মেধা বা প্রতিভা কোন্ দিকে, তাকে সেদিক থেকে তৈরী করতে হবে। নইলে, এইসব দামী ছোট্ট হৃদয়গুলো হবে আধুনিক যুগযন্ত্রণার আর এক শিকার।

আজকের আধুনিক যুগে ছেলেমেয়ে বিপথগামী হবার সবচেয়ে বড় কারণ, মেয়েরা ভাল মা হতে পারছেন না। এই আদর্শ-মা হতে না পারার জন্যই শিশুর মধ্যে আদর্শের ছাপ নেই। উচ্চবিত্ত সমাজ, উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে আয়ার কাছে। তারা বঞ্চিত হচ্ছে মায়ের স্নেহ থেকে। স্নেহহীন জীবনে তাদের বুকজোড়া হাহাকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। বিদ্রোহী তারা। হিংস্র তারা। দায়িত্বহীন। এই বিদ্রোহ থামানোর দায়িত্ব আজ

মেয়েদেরই। ছোটবেলায় মাকে না পাওয়ার বেদনাই পরবর্তী জীবনে অশান্তির যন্ত্রণা ডেকে আনে। তাই মাকে পুরোমাত্রায় সাহচর্য দিতে হবে সন্তানকে।

আজকের যুগের মায়েদের শ্রীমায়ের যথার্থ মাতৃরূপই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। শ্রীশ্রীমা যে ছিলেন স্বদেশের মা, বিদেশের মা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর নিবেদিতা লিখেছিলেন শ্রীমাকেঃ 'গির্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল, আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ী, হাতের বালা, ...তোমার ভালবাসা পৃথিবীর ভালবাসা নয়। স্নিগ্ধ শান্তি তা; সকলের কল্যাণ আনে...।'[৮] নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw Him'-এ শ্রীমায়ের যে-ভাবমূর্তি এঁকেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জুলাই শ্রীনগর থেকে মিসেস বুল বা ধীরামাতা সুবিখ্যাত ম্যাক্সমুলারকে লিখেছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধেঃ 'দারিদ্র ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভ-ধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ, কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।'[৯]

সন্তান যদি বিপথগামী হয়, প্রয়োজনে মাকে শাসনও করতে হয়। সারদাদেবীর জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই, মায়ের সেই কঠিন-কোমল মাধুর্যে ভরা রূপের সমন্বয়। সারারাত না ঘুমিয়ে মা সন্তানদের না-করা জপ নিজে করেছেন, তাদের মঙ্গলের জন্যে। আবার হরিশের পাগলামিতে রুখেও উঠেছেন। শিষ্যের পাপ গ্রহণ করে মা অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেলেও মায়ের হাসিমুখ থেকে সন্তান বঞ্চিত হননি। শ্রীমায়ের মুখে শুনিঃ 'আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে?'[১০] স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন, কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।'[১১]

হাজার সমস্যার জালে জড়িয়ে থাকা আধুনিক সমাজের একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা ভেঙে যাওয়ার ফলে আর এক সমস্যা তৈরী হয়েছে। কেউ কাউকে আর আপন ভাবতে পারছেন না বলে দায়িত্ববোধ এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব চোখে পড়ছে। ছেলেও মাকে দেখছেন না, তাই মাকে এখন যেতে হচ্ছে 'হোমে', আমাদের দেশেও। অথচ আমাদের ভারতবর্ষের মায়েদের মানসিক গঠনও তো অন্যরকম। তাঁরা যে ছেলে-মেয়ের কাছেই বুড়ো বয়সে জড়িয়ে-কুড়িয়ে থাকতে ভালবাসেন। নাতি-নাতনী, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন এদের সবার মধ্যমণি হয়ে সেকালের কর্তামায়েরা দিন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু একালের পরিবারে কোন কোন সংসারে এখনও যেসব সেকালের

মা-বাবা পরগাছার মতো টিকে আছেন, তাঁদের অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই ভয়াবহ।

ভোরবেলা লেকে বা পার্কে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়, সেকালের অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে, যাঁরা বর্তমানে দূরবস্থার মধ্যে আছেন। লেকের বেঞ্চিতে বসে একে অন্যের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করছেন। শেষ বয়সের ধাক্কা-খাওয়া মনে যে-কান্না লুকিয়ে আছে, সে-কান্না ফুটে উঠছে তাঁদের ব্যাকুল চাউনির মধ্যে দিয়ে। আজকের যুগে তাঁরা যে একেবারেই অচল। যেমন একটা ঘটনা বলিঃ ছেলে বিরাট কারখানার কর্ম-কর্তা; সুন্দর ফ্ল্যাট; বাড়িতে দশটা বিলাতি কুকুর; তারা সকালবেলা লাইন করে বসে দুধ-রুটি খায়, দুপুরবেলা লাইন করে বসে মাংস-ভাত খায়, বিকালে দুধ-বিস্কুট, রাত্তিরে দুধ-রুটি। শরীর ভাল রাখার জন্য খাওয়ানো হয় টনিক। তারা ডানলোপিলোর গদীতে ঘুমোয়, মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক পাখা, লোডশেডিং-এ জেনারেটর চলে। বাড়ির গিন্নী তাদের গালে গাল ঘষে আদর করে। কিন্তু সে বাড়িতে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর জায়গা হয় না। এই আধুনিক সংসারে তাঁরা যে একেবারেই বেমানান! পাছে কুকুর কামড়ে দেয়, তাই ছেলের বউ তাঁদের থাকতে বলে না কোনদিন। অসহায় ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজনকে দেখা তো দূরের কথা, মনের মধ্যে কেবলই ভয়, কাউকে সাহায্য করলে পাছে টাকা কমে যায়! এই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক গোটা সমাজ স্নেহহীনতার অভাবে ভুগছে। কিন্তু সারদাদেবী তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, ত্যাগেই আনন্দ, ভোগে নয়। যার অনেক আছে, সে যদি কাউকে সামান্য দেয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। মানুষ অন্যকে সাহায্য করবে, নিজেরই মঙ্গলের জন্য। তারাও তো একদিন বুড়ো হবে!

সারদাদেবী দেখিয়েও গেছেন—সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এই তো ভারতবর্ষের পুরনো ঐতিহ্য। একে অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে দুনিয়ায় কেউই দুঃখী নয়। পাশ্চাত্য দেশ একথা বুঝেছে। তাই তারা আজ ভারতবর্ষের দিকে ছুটছে। আর আমরা ওদের অন্ধ অনুকরণ করছি। শ্রীমা তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন, ত্যাগ মানে দাসত্ব নয়। পরের জন্য ত্যাগের মতো সুখ আর কি আছে? অসংখ্য ভক্ত-সন্তানদের জন্য মা তাঁর স্নেহের আঁচল পেতে দিয়েছেন। জয়রামবাটীতে ছুটে গেছেন তাঁর ভায়েদের সংসারের গোলমাল থামাতে। কেউ পর নয়, সবাই আপন। আজকের এই আধুনিক যুগে 'আমি' এবং 'আমার' এই অহংবোধ মানুষকে ক্ষুদ্রতার মধ্যে টেনে নিচ্ছে। শ্রীমায়ের অহংশূন্য জীবনবোধ আজকের আধুনিক সমাজের কাছে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি বুঝিয়ে গেছেন, অভাব-অনটনকে হাসিমুখে জয় করে নিতে হয়। তিনি যোগীন-মাকে বলেছেনঃ 'দোষ কারও দেখো না, শেষে দূষিত চোখ হয়ে যাবে।'[১২] শ্রীমাকে একদিন উচ্ছিষ্ট কুড়োতে দেখে নলিনীদিদি বলেছিলেনঃ 'মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে।' মা বলেছিলেনঃ 'সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?'[১৩]

খবরের কাগজের পাতা খুললেই আর একটি ব্যাপার যা চোখে পড়ে প্রায় প্রতি-দিনই, তা হল গৃহবধূ হত্যা। পণের জন্য অত্যাচার। সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যেই

এটা লক্ষণীয়। উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত পর্যন্ত। চাহিদামতো পণ না পেলেই গৃহবধূর ওপর অত্যাচার চলে। তারপরই সে খুন হয়, কিংবা তাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয়। যদিও এর বিরুদ্ধে আজকাল আইন তৈরী হয়েছে। কিন্তু আইন করে কি মানুষের হীন প্রবৃত্তিকে বদলানো যায়?—যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হয়? মেয়েরাই যে শান্তির আধার, একথা আর কে বুঝছে? কে বুঝছে একটি মেয়ে সারাজীবনের মতো নিজের আপনজনদের ছেড়ে চলে আসে পরের বাড়িতে? সেই পরই হয়ে ওঠে তার আপনজন। কিন্তু তাদের কাছে ভালবাসার বদলে, সহানুভূতির বদলে যদি লাঞ্ছনা জোটে, সেটা যে কত যন্ত্রণার, কত অপমানের, সেকথা কি শাশুড়ী, ননদ, কিংবা শ্বশুরবাড়ির অন্যলোকেরা বোঝেন? সবচেয়ে আশ্চর্য, পণের জন্য যাঁরা জুলুম করেন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা। হয়তো শাশুড়ীও একদিন পণের জন্য অত্যাচারিত হয়েছেন তাঁর শাশুড়ীর কাছে, সেই প্রতিহিংসাই জেগে ওঠে তাঁর মনে নিজের ছেলেটিকে বিয়ে দেবার সময়। হিংসা ছাড়াও এর পেছনে আর একটি বিষয় কাজ করে, তা হল লোভ। নিম্নবিত্তদের দাবিও কম নয়। চাই-চাই-চাই—মেয়ের বাবা-মায়ের অবস্থা যেমনই হোক। কিন্তু সর্বনাশা এই মনোভাব বদলাতে হবে, লোভকে জয় করতে হবে। অনুধ্যান করতে হবে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন। তিনি লোভকে জয় করেছিলেন। দারিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন করেও তিনি পৃথিবীর সব দেশের সব কালের মা হয়েছেন, অকৃপণ মাতৃস্নেহের আঁচল পেতে দিয়ে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে একালের মেয়ে, মা ও শাশুড়ীদের। পরের মেয়ে যখন বউ হয়ে আসে, তখন তো সে নিজের মেয়েই হয়। সারদাদেবীর ব্যক্তিত্ববোধ, আদর্শবোধ, ত্যাগ, ক্ষমা, ধৈর্য, স্নেহ আজ সারা পৃথিবীর মেয়েদের চলার পথের পাথেয় হওয়া উচিত। শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর জোসেফিন ম্যাকলাউড বা জয়া স্বামী সারদানন্দকে যথার্থই লিখেছিলেনঃ 'সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল—আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিনহাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ!'[১৪] অতএব আজ আমাদের নতুন করে ভাববার দিন এসেছে। আমরা আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যেই খুঁজে পাব আজকের যুগযন্ত্রণার প্রতিকার

সারদাদেবী এবং আধুনিকতা

শুদ্ধতম আধুনিকতার আদর্শ

'আধুনিক' কথাটির মধ্যে একটি সুখকর সম্মোহ আছে। তাই শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য না জেনেও সকলেই আমরা 'আধুনিক' হতে চাই। নিজেকে 'আধুনিক' বলে প্রচার করতে সকলেই উৎসুক। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় বহিরঙ্গ জীবন-পদ্ধতির অন্ধ অক্ষম অনুকরণকেই আমরা আধুনিকতার পরম পরাকাষ্ঠা বলে গ্রহণ করে নিয়েছি।

বৃহত্তর অর্থে, বিপরীত তরঙ্গাবলীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকার অর্জন এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আত্মরক্ষার ক্ষমতা লাভকেই 'আধুনিকতা' বলা চলে। চেতনার গভীরে শক্তির উদ্বোধন ঘটানো হল আধুনিকতার সর্বাপেক্ষা জরুরী শর্ত। বিশ্বপৃথিবীর সমগ্র জীবজগতের ইতিহাসে এই বিচারে মানুষকেই বলা চলে সবচেয়ে আধুনিক। কারণ সে এখনও বেঁচে আছে, অজস্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। বহিঃপ্রকৃতির উপর আজ সে বিজয়ী। কিন্তু মানুষের দিগ্বিজয় এখনও পূর্ণতালাভ করেনি। কারণ স্বামীজীর ভাষায়, সে অন্তঃপ্রকৃতি বিজয়ে সার্বিক সাফল্য অর্জন করেনি। যদিও মানুষের মহৎ জ্যেষ্ঠেরা সেই পূর্ণতার অভিমুখে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন।

আধুনিকতার একালে স্বীকৃত লক্ষণ

শুদ্ধতম আধুনিকতা বাস্তবিক সুদুর্লভ এবং এর আদর্শ এত উঁচু সুরে বাঁধা যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ-সম্পর্কে ধারণা করাও কঠিন। নবজাগরণের ফল-শ্রুতিতে ইউরোপীয় জীবন-পদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়—একালের আমরা সেইসব পরিবর্তনগুলিকে আধুনিকতার সারাৎসার বলে মেনে নিয়েছি। ইউরোপীয় নবজাগরণের সেইসব কোল লক্ষণগুলি হল মোটামুটি এই রকমঃ মহৎ মানবতা ও বিশ্বৈক্যবোধ, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিরুদ্ধ পরিবেশে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা, জীবনরস-রসিকতা, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কার, মহৎ প্রগতিবাদ ও নবজীবনযোজনা, নারীমুক্তি সম্পর্কে ভাবনা, সৌন্দর্যবোধ ও নিসর্গচেতনা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতি-কতা, এবং ব্যক্তিস্বাধিকারের স্বীকৃতি। আধুনিকতার এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রীমায়ের জীবনে কতটা সম্পৃক্ত, এবং তাঁর জীবন এদের গণ্ডিকে কতখানি অতিক্রম করেছে তা মিলিয়ে দেখা যাক।

মহৎ মানবতা ও বিশ্বৈক্যবোধ

ফরাসী বিপ্লব ও ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণের ফলে সমগ্র পৃথিবী আজ অনেক কাছে এসে গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। বিশ্বৈক্যবোধ, 'একজাতি একপ্রাণ একতা' বা বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা সামাজিক, অর্থনৈতিক, বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা আদর্শে সংস্কৃতিবান মানুষকে উদ্বেজিত করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রয়োজন বা আদর্শের উপর ভিত্তি রচনা করে বিশ্বমিলন সম্ভব নয়। অন্তত ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। কারণ প্রথমত রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজনীতির কোন চিরস্থায়ী ধ্রুব আদর্শ নেই ; তা নিত্য পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয়ত এ-সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। তাই শুধুমাত্র রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির প্রয়োজনে বা আদর্শ-পরিকল্পনায় ও অনুশাসনে বিশ্বৈক্য প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত। বিশ্বমানবের মিলন ও ঐক্যের প্রকৃত সেতুবন্ধনের জন্য প্রয়োজন সকল মানুষের অন্তরে সেই এক অদ্বয় অস্তির উপলব্ধি। তার উদ্বোধনের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সূচনা। তপস্যা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে, জীবনে জীবন যোগ করে, প্রত্যক্ষ অনুভবের মহিমায় সারদাদেবী আমাদের দিয়ে গেছেন জীবন ও জগৎকে নতুন করে দেখার এই আশ্চর্য অভিজ্ঞানটি—যাতে করে সমগ্র বিশ্বমানব অপরিবর্তনীয় স্থায়ী এক ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং যথার্থই 'এক-বিশ্ব, এক-রাষ্ট্র' লক্ষ্য-অভিমুখে মানবসমাজের আকাঙ্ক্ষিত অভিযাত্রা সত্য হয়ে ওঠে। বেদান্তের কার্যকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য, বেদান্তের অভয়বাণী ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে দেবার জন্য শ্রীমা তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, বেদান্তোক্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন।

এই বিশ্বৈক্যবোধে স্থিত ছিলেন বলেই শ্রীমা ইংরাজদের সম্পর্কে বলতে পারতেনঃ 'তারাও তো আমার ছেলে।'[১] শুধু তা-ই নয়, বলতেনঃ 'ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।'[২] বলতেনঃ ইতর জীবজন্তুরও তিনি মা।[৩] এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক কর্মে, প্রত্যেক প্রাণচর্যায় শ্রীমা এই জীবনসত্যকে প্রমাণিত করে গেছেন। এই বিশ্বৈক্যবোধের আলোকে উত্তীর্ণ হয়েই মা বলতে পারেনঃ 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।'[৪]—সকলের মধ্যে একের অধিবাস প্রত্যক্ষ করেই সকল মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন মা। তাঁর পায়ে কোন ভক্তের হাত লাগলে মা তাঁকে হাতজোড় করে নমস্কার করেন।[৫] পথ-

ভ্রষ্টের প্রতি মায়ের যে সমবেদনা ও অসাধারণ মমতা তার মূল খুঁজতে হবে এই তত্ত্বে। কোন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের পথভ্রষ্টা নারীকে সস্নেহে মা আশ্রয় দিয়েছিলেন। শ্রীমা তার গলদেশ বেষ্টন করে—'এস, মা, এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস...' ইত্যাদি বলে আপনার জনের মতো কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।[৬] প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে খ্রীষ্টের জীবন-কাহিনী। ভ্রষ্টা রমণীকে ঢিল ছুড়ে মেরে ফেলার মুখে যীশুর সেই আশ্চর্য মানবিকতাঃ যে কোনও দিন কোন পাপ করেনি সেই প্রথম ঢিল ছুড়বে।[৭] মনে পড়ে মদ্যপ পদ্মবিনোদের কথা, ডাকাত আমজাদের কথা। এই মহৎ মানবতার মূলকে তথাকথিত 'হিউম্যানিজম্'-এর ধারণা ও কল্পনা দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। বোঝা যায় না মানবতাবোধের কোন্ গভীর স্তর থেকে রামকৃষ্ণ-সংঘজননী উচ্চারণ করেছিলেনঃ 'আমার শরৎ [শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী সারদানন্দ] যেমন ছেলে, এই [ডাকাত] আমজাদও তেমন ছেলে!'[৮]

ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা

কিন্তু শুধু করুণা নয়, ক্ষমা-সহানুভূতি-প্রীতির প্রস্রবণ নয়, মায়ের চরিত্রে স্ফুরিত হতে দেখি ব্যক্তিত্বের নির্মম অশনি-সঙ্কেত। বস্তুত মহৎ চরিত্রে যে বিপরীতের সমাহার-সমন্বয় ঘটে—মায়ের চরিত্রেও আমরা তা-ই দেখি। কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার সংমিশ্রণ ঘটেছে বলেই উজ্জ্বল আধুনিকতায় দীপ্তশ্রী মহামানবীরূপে সারদাদেবীকে আমরা পেয়েছি। মনে পড়ে, সেই চাকরটির কথা, চুরি করার অপরাধে স্বামীজী যাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজীর আপত্তির কথা জেনেও মা সম্রাজ্ঞীর মতো বাবুরাম মহারাজকে আদেশের ভঙ্গিতে বলেছিলেনঃ 'আমি বলছি, নিয়ে যাও।' মায়ের আদেশ স্বামী বিবেকানন্দও মেনে নেন নির্দ্বিধায়।[৯] এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে তাঁর জীবনে।

যা অন্যায়, অপরাধ, অমানবিক—তার প্রতিবাদ করতে কখনও পরাঙ্মুখ হতেন না মা। উদ্বোধনের বাড়ির উল্টোদিকের বস্তিতে একবার একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ভীষণভাবে প্রহার করছিল। প্রথমে কিল চড় পরে লাথি। মারের চোটে মেয়েটি কোলের ছেলেকে নিয়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়ল। মা আর থাকতে পারলেন না। জপ ফেলে বেরিয়ে এলেন এবং যাঁর কোমল কণ্ঠ একতলা থেকে শোনা যেত না, সেই তিনি তীব্র তীক্ষ্ন কণ্ঠে পুরুষটিকে নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করে বললেনঃ 'বলি ও মিনসে বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি? আঃ মলো যা!' ক্রোধোন্মত্ত লোকটা সেই মাতৃমূর্তি দর্শনমাত্র সাপের মাথায় ধুলোপড়ার মতো মাথা নীচু করে নির্যাতিতাকে ছেড়ে দিল।[১০]

মার্জিত-রুচি এবং সংযম ছিল তাঁর চরিত্রের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাই ঠাকুরের দেহাবসানেও সাধারণ নারীসুলভ কোন কান্না বা চিৎকার নয়। প্রত্যক্ষদর্শী

লাটু মহারাজ বলেছেনঃ '[ঠাকুরের শরীর যাবার পর] মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করলেন আর তাঁর গলার আওয়াজ শুনা গেলো না। মৈঁইয়া মানুষের এমন ধৈর্য হামনে জীবনে দেখেনি।'[১১]

বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিরুদ্ধ পরিবেশে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমুত্তীর্ণ হয়ে জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হবার সাধনা, এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পথ চলার অধিকার অর্জনের মধ্যেও রয়েছে আধুনিকতার আত্মপ্রকাশ। শ্রীমায়ের জীবনে তার সিদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বার বার মাকে ধৈর্য ও বিবিক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং মা সসম্মানে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন। 'ভ্রাতাদের স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পরস্পর হিংসা, নলিনীদিদির শুচিবায়ু, রাধুর বাতুলসদৃশ আবদার এবং ছোটমামীর পাগলামি—এই সকল মিলিয়া যে অবর্ণনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত, তাহাতে একমাত্র ধৈর্যময়ী শ্রীমায়ের পক্ষেই শান্তভাবে সংসারে কাজ করা সম্ভব ছিল। এই সমস্ত লইয়াই শ্রীমায়ের পারিবারিক জীবন।'[১২] দুঃখ-দুর্দিনেও মা সহজভাবে চিরকাল গ্রহণ করে গেছেন জীবনের দায়ভাগ। এবং সমস্ত রকম বিপরীত বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে তাঁর আদর্শনিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয় চিরকাল মাথা উঁচু করে এগিয়ে গিয়েছে—অগ্রগামী অভিযাত্রীর মহৎ ভূমিকায়, পরাজয় স্বীকার করেননি এক মুহূর্তের জন্য। যথার্থ আধুনিকতা সহজ স্বাভাবিকতায় জীবনকে তার সমগ্রতা নিয়ে গ্রহণ করতে শেখায়। যথার্থ আধুনিকতা মানুষকে সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন-রচনার দায়িত্বে উদ্বোধিত করে তোলে। সেখানে বর্জন নেই, আছে গ্রহণ, পলায়ন বা পশ্চাতে ফেরা নেই—আছে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে সমন্বয়ে ও সমাহারে জীবন-রচনার অঙ্গীকার। সংসারকে গ্রহণ করেই সংসার উত্তীর্ণ হবার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন মা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মায়ের সেই আশ্চর্য আর্ষোক্তিঃ 'যখন যেমন তখন তেমন; যাকে যেমন তাকে তেমন; যেখানে যেমন সেখানে তেমন।'[১৩] দক্ষিণেশ্বরের 'নহবত' নামক পিঞ্জরে, শ্যামপুকুরের ছোট ভাড়াটে বাড়িতে, কাশীপুরের বাগানে, জয়রাম-বাটীর গ্রাম্য পরিবেশে এবং কলকাতার নাগরিক জীবনের পরিমণ্ডলে—সর্বত্রই তিনি এই নীতিকে অনুসরণ করেছেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'তাঁহার [ঠাকুরের] জীবন প্রধানতঃ পারিবারিক গণ্ডির বাহিরে ব্যয়িত হইয়াছিল। সুতরাং শত ঝঞ্ঝাটপূর্ণ প্রতিকূল সাংসারিক ক্ষেত্রে মানুষ কিরূপে আত্মস্থ থাকিয়া দিব্য জীবনের আস্বাদ পাইতে পারে তাহার চাক্ষুষ পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আমরা অধিক পাই না। শ্রীমায়ের দিনগুলি কিন্তু পারি-বারিক ঘটনার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত: আর সে ঘটনাসমূহের অধিকাংশ

সাংসারিক দৃষ্টিতে উদ্বেগজনক, বিরক্তিকর অথবা ক্লেশদায়ক। অথচ তাঁহার আচার-ব্যবহার সর্বদা সর্বক্ষেত্রে দৈব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।'[১৪]

জীবনরস-রসিকতা

প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করে ধর্মাচরণে শ্রীমায়ের প্রবণতা বা প্রশ্রয় ছিল না। বরং চারিদিকে এই প্রাণপ্রবাহের একজন হয়ে এই জগৎ ও জীবনকে দেখে জেনে শিক্ষা গ্রহণই ছিল তাঁর জীবনপদ্ধতি। নিবেদিতা-স্কুলবোর্ডিং-এর মেয়েদের উপদেশ দিয়ে বলছেনঃ 'দেখ মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।'[১৫]

বালিকার মতো জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সদাজাগ্রত কৌতূহল ছিল মায়ের চরিত্রের আর একটি দিক। বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে থাকাকালীন ছুটির দিনে নিবেদিতা-স্কুলের ঘোড়ার গাড়িতে করে মাকে প্রায়ই মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, হগমার্কেট, গড়ের মাঠ, শিবপুরে বোট্যানিকাল গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত। এই-সব জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে মা হেঁটে হেঁটে সব ভাল করে দেখতেন এবং বালিকার মতোই আনন্দ-উৎসাহ প্রকাশ করতেন। থিয়েটার নাটক দেখতেও মা ভালবাসতেন। একবার গিরিশবাবুর 'বিল্বমঙ্গল' নাটক দেখে মায়ের সে কী উল্লাস! মহাজীবনের অভিযাত্রী হয়েও মায়ের চরিত্রে এই জীবনরস-রসিকতা তাঁকে আমাদের বড় কাছের করে তুলেছে।[১৬]

যেখানেই জীবনের যোজনা ও জয়, প্রাণের অভ্যর্থনা, মানুষের কিছু উন্নতির কর্মপ্রয়াস—সেখানেই জননী সারদার অকুণ্ঠ উৎসাহ ও আশীর্বাদ। জীবন ও জগৎকে তার ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন-সাধ নিয়ে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে তিনি জানতেন। তাই দেখা যায়, বিজয়ার ভাসানের সময় দেবীমূর্তির সামনে ডাক্তার কাঞ্জিলালের নানাপ্রকার মুখভঙ্গি ও রঙ্গব্যঙ্গ সহকারে নৃত্য—জনৈক মার্জিত-রুচি ব্রহ্মচারীর আপত্তি সত্ত্বেও মা সমর্থন করছেন। বলছেনঃ উৎসবের দিনে লোকে তো একটু আনন্দ করবেই।[১৭] মায়ের স্বাভাবিক জীবন-কৌতূহলেরই অঙ্গস্বরূপ ছিল তাঁর সদাহাস্যময় রসালাপ, রহস্যপ্রিয়তা ও রঙ্গরসিকতা। একবার ভিখারির ছদ্মবেশে গৌরী-মার জয়রামবাটীতে উপস্থিতিতে যে কৌতুকপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল এবং মায়ের কাছে গৌরী-মা ধরা পড়ে গেলে অতঃপর যে রমণীয় পরিবেশে ঘটনাটির যবনিকা পড়েছিল এবং সেখানে মায়ের যে পরিহাস-উচ্ছল ভূমিকাটি—তা আমাদের একই সঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখে। জয়রামবাটীতে মায়ের একবার জ্বর হয়েছে—তাই সাবু খেতে খেতে ভক্ত-সন্তানদের লক্ষ্য করে বলছেনঃ 'কি গো, আজ যে [তোমাদের] প্রসাদে ভক্তি নেই?'[১৮] প্রসঙ্গত মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতা

মাকে কালীরূপে দেখতে চাইলে মায়ের পরিহাস-স্নিগ্ধ উক্তিটি। নিবেদিতা বললেনঃ 'মাতৃদেবী, আপনি হন আমাদিগের কালী।' ভগিনী ক্রিস্টিনও ইংরেজীতেই ঐকথার প্রতিধ্বনি করলেন। শুনে মা সহাস্যে বললেনঃ 'না, বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।'[১৯] কাশীতে একবার গোলাপ-মা ও মা-ঠাকরুনের মধ্যে কে সত্যিকার মা-সারদা বুঝতে না পেরে ভক্তের ইতস্তত ভব দেখে —পরস্পর পরস্পরকে যথার্থ মা-সারদা বলে দেখিয়ে বিপন্ন ভক্তকে নিয়ে কিছুক্ষণ মজা করার দৃশ্যটিও কম উপভোগ্য নয়।[২০] পুরীতে বেড়াতে গিয়ে মায়ের প্রচুর গল্প, আমোদ, ঠাট্টা-তামাসা করার ক্ষমতা দেখে মাস্টারমশায়ের স্ত্রী বলেনঃ 'মা তুমি অত ঠাট্টাও জান!' তার উত্তরে মা বললেনঃ 'আমায় আর কি দেখছ? ঠাকুরকে তো দেখেছ। তাঁর কথা আর ফুরুতে চাইত না—এত কথাও জানতেন!'[২১] বস্তুত এইসব জীবনরস-রসিকতার মধ্যেই মায়ের মানবী রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সাধুভক্তদের মধ্যেও যাতে এই জীবনরসের উৎসধারা শুকিয়ে না যায়—সেদিকে ছিল মায়ের সদাসতর্ক দৃষ্টি। তাই সাদা-পাড় কাপড় পরতে ব্রহ্মচারীদের নিষেধ করতেন। বলতেনঃ 'নইলে মন বুড়ো হয়ে যাবে।'[২২] স্বচ্ছ জীবন-দৃষ্টির আলোকেই তিনি তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানদেরও খাওয়ার ব্যাপারে অকারণ কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। বলতেনঃ 'আমার ছেলেরা নিরামিষ খাবে কেন? ...খুব খাবে-দাবে, আর ফুর্তি করবে!'[২৩] কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের ভাত ও মাছ ভোগের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন শ্রীমা। অন্তত প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে। তিন তরকারি ছাড়া ঠাকুরের ভোগ হবে না —এ-ও সঙ্ঘজননীর নির্দেশ। আসলে উদ্দেশ্য তাঁর আশ্রমের ছেলেদের ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যরক্ষা।[২৪] তাছাড়া এ দেহ হল ঈশ্বরের মন্দির। একে সাজিয়ে-গুছিয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখাও তো জীবনকৃত্য। তাছাড়া বাইরে সুন্দরের তপশ্চর্যা—সে তো কোন দোষের নয়—বরং একান্তভাবেই মানবিক কর্তব্য। তা বলে বিলাসিতা, সাজগোজের প্রতি অতি-আকর্ষণ বা অতি-আসক্তি সর্বদা পরিত্যাজ্য। ঠাকুরের দেহান্তের পরে মা সরু লাল পাড়ওয়ালা কাপড়, হাতে বালা পরতেন। কথিত আছে, সে নাকি শ্রীরামকৃষ্ণেরই নির্দেশ-অনুসারে। কিন্তু সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণের বিধবার পক্ষে তা ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক। এখানেও এই আশ্চর্য আধুনিকতা আমাদের বিস্মিত করে।

কোয়ালপাড়ায় এক ডোমের মেয়েকে ত্যাগ করে গেছে তার উপপতি। মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে শ্রীমা লোকটিকে ডেকে এনে মৃদু ভর্ৎসনা করে মেয়েটিকে গ্রহণ করতে উপদেশ দেন।[২৫] কোথায় আধ্যাত্মিক চেতনার তুরীয়লোক—আর কোথায় ডোমের মেয়ের সমাজ-নিন্দিত তুচ্ছ উপপতির প্রেম। তবু এই লৌকিক পৃথিবীর নিম্নতম মানুষের জীবনসমস্যায় নেমে আসতে মায়ের কোন সঙ্কোচ নেই। প্রসারিত এই হৃদয়-বোধের প্রেরণায় অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে শিরোমণিপুরের বৃত্তিভ্রষ্ট তুঁতে-মুসলমানদের চোর-ডাকাত জেনেও আশ্রমের নানা কাজে তাদের নিয়োগ করতেন।

তাদের সৎ জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতেন।[২৬] মা বলতেনঃ 'অপচয় করতে নেই।'[২৭] এমনকি তরকারির খোসাগুলি পর্যন্ত তুলে রেখে গরুকে খাওয়াতেন। বলতেনঃ 'যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে দিতে নেই; যা গরুতে খায়, তা কুকুরকে দিতে নেই; গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছ খায়—তবু নষ্ট করতে নেই।'[২৮] এরই নাম জীবনের প্রতি যথার্থ প্রেমের দৃষ্টি। এই বাস্তববুদ্ধির ফলেই এসেছিল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সত্য দৃষ্টি। তাই অল্প-বয়সী বিধবাকে অকারণ কৃচ্ছ্রতা থেকে মুক্ত হতে আদেশ দেন। বালবিধবা ক্ষীরোদ-বালাকে বলেনঃ 'বাছা, অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি, আর করো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা?'[২৯] বালবিধবা শবাসনা দেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখে মা বলছেনঃ 'আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি, তুই জল খা।'[৩০] সুরবালা দেবী পতি-বিয়োগের পর বাকি জীবন হবিষ্যান্ন গ্রহণে কাটিয়ে দেবার প্রস্তাব করলে মা বলছেনঃ 'আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়; সে কাঁদে, "আমাকে দিলে না" বলে।'[৩১] যান্ত্রিকভাবে পালিত কোন আচার-অনুষ্ঠানই মা পছন্দ করতেন না। তাই ভক্তদের বলতেনঃ 'খেয়ে দেয়ে দেহটা ঠান্ডা করে নিয়ে ভগবানকে ডাক।'[৩২] এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'[৩৩] মনে পড়ে। জীবনের সর্বত্রই যে তাঁর আসন পাতা—প্রতি প্রাণেই যে তাঁর অবস্থিতি। তাই নিজেকে বঞ্চনা করা, নির্যাতন করা মানে যে তাঁকেই আঘাত দেওয়া। তাই তো এমন নিপুণভাবে সর্বতোমুখী জীবন রচনার অমল অঙ্গীকার মায়ের প্রতিটি কথায় ও কর্মে। তিনি জানতেন, জীবন অনেক বড়, প্রাণকে আপন নিয়মে বেড়ে উঠতে দিতে হয়। কারণ 'ওদের [বালবিধবাদের] আকাঙ্ক্ষা থাকে কিনা! নাহলে চুরি করে খাবে। যখন বুঝতে পারবে এটা সমাজবিরুদ্ধ, তখন ছেড়ে দেবে।'[৩৪] কোন আইন বা সমাজ বা নীতিশাস্ত্রের অনুশাসনে প্রবৃত্তিকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। জোর করে ছড়ি ঘুরিয়ে সংযম শেখানো সম্ভব নয়, এসব কথা শ্রীমা জানতেন। অতি স্বচ্ছ এই জীবন-দৃষ্টি। অথচ তিনি মহাজীবনের পথে অভিযাত্রী। জীবন ও মহাজীবনকে মা মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জীবন-সাধনার মুক্ত প্রাঙ্গণে। এবং আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার উত্তরাধিকার।

প্রগতিবাদ ও নবজীবনযোজনা

চিত্তকে যা ছোট করে, মনকে যা আবদ্ধ করে, তা কখনও ধর্ম হতে পারে না।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই উদার স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টির ফলেই অন্ধ কুসংস্কার, জাত-পাত, ছুঁৎমার্গ, দেশাচার ও যুক্তিহীন প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে শ্রীমায়ের ছিল এক সংগ্রামী ভূমিকা। শুধু তলোয়ার বা বন্দুকের প্রয়োগের দ্বারাই বিপ্লব ঘটে না, যথার্থ বিপ্লব সম্পাদিত হয় মানসিকতার আমূল পরিবর্তনে। কারণ বন্দুকের নল নয়—আত্মজয়ীর মনই হল সকল শক্তির উৎসমূল। এদিক থেকে বিচার করলে শ্রীমা ছিলেন এক অতুলনীয়া বিপ্লবী। নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অগোচরে বিনা প্রচারে তাঁর বিপ্লব সাধনা। ব্রাহ্মণ-ঘরের বিধবা হয়েও কতবার অব্রাহ্মণের দেওয়া এবং রান্না-করা অন্ন তিনি গ্রহণ করেছেন।[৩৫] জন্মগত অর্থে নয়, গুণ ও চরিত্রগত অর্থে সকলকে 'ব্রাহ্মণত্বে' তোলার সাধনাই রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের মূল লক্ষ্য। 'ব্রাহ্মণত্ব' হল মানবতার একটি উচ্চতম অবস্থা এবং নিজের চেষ্টার দ্বারা সকলেই সে অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। মানবসভ্যতার ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য সেকথাই বলে। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অগ্রণী নেত্রী শ্রীমা তাই ভাইঝি রাধুকে নির্দেশ দিতে পারতেন বৈদ্য শ্যামাদাস কবিরাজকে প্রণাম করতে। 'তা [প্রণাম] করবে না? কত বড় বিজ্ঞ! ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য'[৩৬]—এই হল তাঁর যুক্তি। বর্ণ এবং জাত যা-ই হোক না কেন জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠের উপযুক্ত মর্যাদা মা সর্বদাই দিয়ে এসেছেন। তাই ভানুপিসী, ক্ষীরোদবালা ও অন্যান্য অব্রাহ্মণ ভক্তদের রাধু প্রভৃতিকে প্রণাম করতে বলতেন। যুগীর ছেলে পীতাম্বর নাথের হীন জাত বলে মায়ের কাছে আসতে সঙ্কোচ। মা তাঁর সব সঙ্কোচ ও হীনম্মন্যতা ভেঙে দিয়ে কাছে ডেকে নিলেন। বললেনঃ 'কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে এসে বস।'[৩৭] 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এ আদর্শ যে জীবনে তিনি অনুবাদ করে দেখিয়ে গিয়েছেন। তাই দেখি নিত্যকার ঠাকুরপূজার আগে ঠাকুরের জন্য উদ্দিষ্ট নৈবেদ্য একদিন তুলে দিচ্ছেন একটি ছেলের হাতে। অপরে বাধা দিলে মা বলছেনঃ 'বাবা, ওর ভেতরেও ঠাকুর আছেন।'[৩৮] আবার একদিন ঠাকুরের নিত্যভোগের একবাটি দুধ পুজোর আগেই তুলে দিচ্ছেন সেবকের হাতে। সেবক আঁতকে ওঠেন। প্রতিবাদ করেন। 'তোমার ভেতরেও ঠাকুর রয়েছেন।'[৩৯]—এরকম অজস্র ঘটনা মায়ের জীবনে ঘটেছে। মহাষ্টমীর দিনে বাইরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে থাকা তাজপুরের বাগদি ভক্তকে ঘরে নিয়ে এসে তাঁর অঞ্জলি নিয়েছেন মা।[৪০]

'আমার ইচ্ছে হয় সবাইকে একপাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশে জাতের বড়াই আবার আছে।'[৪১]—এ তাঁরই উক্তি। দেশাচারকে সম্মান দিয়েও এদেশের জাতের বড়াই-এর মূলে আঘাত দিয়েছিলেন তিনি। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভক্তকে ডেকে এনে একসঙ্গে একপাত্রে বসিয়ে মুড়ি-জিলিপি খাইয়েছিলেন।[৪২] আর সেই দৃশ্য দেখে

গভীর তৃপ্তি ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ! চোরের হাত থেকেও তার ভক্তির দান কলা গ্রহণ করে তা দিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিতে কোনও সংকোচ নেই শ্রীমায়ের। 'ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?'—জনৈক স্ত্রীভক্তের এই প্রতিবাদের উত্তরে মা তাকে তিরস্কার করে বলেছিলেনঃ 'কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।' মহত্তম আধুনিকতার বেদমন্ত্র মায়ের এই বাণীঃ 'দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে কজনে।'[৪৩]

শুচিবাইকে মা মনে করতেন এক ধরনের মারাত্মক ব্যাধি। 'কাকের প্রস্রাবে' অশুচি নলিনীদিকে স্নান করতে দেখে মা বললেনঃ 'শুচিবাই! মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না। ...আর শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে।'[৪৪] আর একবার নলিনীদিকে বলেছিলেনঃ 'আমিও তো দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার "গোবিন্দ, গোবিন্দ" বললুম, বস্ শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব, মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।'[৪৫] জয়রামবাটীতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণী অধিক রাত্রিতে কুকুর ছুঁয়ে এসে স্নান করতে চাইলে মা নিষেধ করলেন। হাত পা ধুয়ে গঙ্গাজলে পবিত্র হবার নির্দেশ দিলেন। তাতেও যখন তার মন উঠল না—তখন মা বললেনঃ 'তবে আমাকে স্পর্শ কর।'[৪৬] এমনি করেই মা আত্মবিশ্বাসেরও বীজ ছড়িয়ে দিতেন মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আর একটি ঘটনাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্যঃ উদ্বোধনে শ্রীমায়ের খুল্লতাত নীলমাধব মুখুজ্জের মৃত্যুর পরে শববাহকদের মধ্যে একজন শূদ্র ছিলেন। গোলাপ-মা এই অশাস্ত্রীয় অবৈধ ব্যাপারের প্রতি মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মায়ের অপর এক বিপ্লবী উক্তিঃ 'শূদ্দুর কে, গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?'[৪৭]

বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবহারে মা ছিলেন সমস্ত সংকোচ এবং সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তাদের আচার-বিচারের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি অতি সহজে পূর্বসংস্কার বিসর্জন দিয়ে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারতেন। সহজ সৌজন্যবোধে মা অনেক সময় পাশ্চাত্যের মহিলা-ভক্তদের সঙ্গে হাত দিয়ে করমর্দনের ভঙ্গিতে স্বাগত জানাতেন। ওলি বুল প্রমুখের মিনতিতে অপরিচিত সাহেব ফটোগ্রাফারের দ্বারা মা ফটো তুলতে সম্মতি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজী এক চিঠিতে লিখছেনঃ 'শ্রীমা এখানে [কলিকাতায়] আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ভাবতে পারো, মা তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে খেয়েছিলেন! ...এ কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?'[৪৮] গোলাপ-মার আপত্তি সত্ত্বেও ১০।২ বোসপাড়া লেনের বাড়িতে শ্রীমা বহুদিন হিন্দু রীতিনীতি শেখাবার জন্য নিবেদিতাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে মা একসঙ্গে খেতেন, নিবেদিতার প্রত্যেক কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে ছিল মায়ের উৎসাহ ও সমর্থন।

উদার এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই মা নতুনকে স্বাগত জানাতে, অজানাকে

গ্রহণ করতে ইতস্তত করতেন না, যা শুভ সুন্দর ও কল্যাণপ্রদ তা গ্রহণ করতে তিনি পরাঙ্মুখ হতেন না।

জাতিভেদপ্রথার বিধিনিষেধ না মানাতে শ্রীমাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল, কিন্তু তবুও তাঁকে তাঁর প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। তেমনিভাবে যুক্তিহীন দেশাচার, অন্ধ বিশ্বাসের কুহেলিকা, প্রচলিত ধর্ম-ধারণার রোমান্স ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে শ্রীমার জীবন নীরব ও দৃঢ় প্রতিবাদস্বরূপ। স্বচ্ছ নির্মোহ যুক্তিনির্ভর বেদান্ত-সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁর জীবনপ্রাঙ্গণ আলোকিত। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেনঃ 'ভগবানলাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে জ্ঞানচৈতন্য লাভ হয়।'[৪৯] আবার অন্যত্র বলছেনঃ 'ভগবানলাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, সদসৎ-বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়। ভাবে লাভ—এ ছাড়া কে ভগবান দেখেছে, কার সঙ্গে ভগবান কথা কয়েছেন? ভাবে দর্শন, ভাবে কথাবার্তা, সব ভাবে হয়।'[৫০]

একটা কথা মা সকলকেই বলতেনঃ 'সর্বদা সদসৎ বিচার করবে।'[৫১] বলতেনঃ 'খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়?'[৫২] আবার বলেছেনঃ 'উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।'[৫৩] বলতেনঃ যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দিতে হবে। কিংবা, কাউকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই।[৫৪] সমাজবিজ্ঞানের এই মূল সূত্রগুলি তাঁর কণ্ঠে বহুবার আমরা শুনেছি।

নারীমুক্তি সম্পর্কে ভাবনা

নারীমুক্তি, নারীপ্রগতি ও নারীর সমানাধিকার প্রসঙ্গ সমকালের আধুনিক জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক সর্ববিষয়ে সর্বক্ষেত্রে নারীজাতির পুনর্বাসন ও স্বাধীনতা রক্ষা জরুরী বলে আজকের পৃথিবী মনে করে। সর্ববন্ধন বিমুক্ত করে নারীকে আবার জীবনের পাদপীঠে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা।

মা চাইতেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হোক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। এক স্ত্রী-ভক্ত মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলে মা বলছেনঃ 'বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।'[৫৫] প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, সাধু-ব্রহ্মচারীদের তিনি ইংরেজী শিখতে উৎসাহ দিতেন—যাতে তাঁরা পাশ্চাত্যের মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারেন। তাঁদের ইংরেজী শেখাবার জন্য শিক্ষক পর্যন্ত নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন।[৫৬] আমাদের দেশের বাল্য-বিবাহের কুপ্রথার তীব্র সমালোচক ছিলেন মা। কালীমামার পুত্রদের অল্পবয়সে বিয়ে দেবার ব্যাপারে মায়ের



শ্রীশ্রীমা

১৩১১ সাল : ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ

স্থান : বাগবাজার (নিবেদিতা স্কুল) ফটো : বি দত্ত



গৌরী-মা দুর্গাপুরী রাধু শ্রীশ্রীমা মাকু কুসুম হরির মা

১৩১৬ সাল : ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ ফটো : বি দত্ত স্থান : উদ্বোধন

ছিল কঠোর মনোভাব। নিজের যেমন জ্ঞানস্পৃহা ছিল তেমনি তিনি ছিলেন নারী-শিক্ষার প্রবল সমর্থক। নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের দুটি মাদ্রাজী বয়স্ক কুমারী মেয়েকে দেখে একই সঙ্গে মা খুশী ও দুঃখিত হয়ে বলেছিলেনঃ 'আহা, তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে! আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছরের হতে না হতেই বলে, "পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও!" আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হত, তা হলে কি এত দুঃখ-দুর্দশা হত?'[৫৭] অসংযত জীবন মা সহ্য করতে পারতেন না। 'অনেকগুলি ছেলেপিলে হয় যার, ঠাকুর তাকে গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ হতে পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে, ওরা কি মানুষ! সংযম নেই, কিছু নেই—যেন পশু!'[৫৮] —মায়ের নির্মম মন্তব্য। ইংরাজ পরিবারে যে অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে ছেলে-মেয়ের জন্ম হয়, আমাদের দেশেও এই রীতির প্রবর্তনা মায়ের কাঙ্ক্ষিত ছিল।[৫৯]

সৌন্দর্যবোধ ও নিসর্গচেতনা

বস্তুত মা যেন সব সমন্বয়ের একটি ঘনীভূত রূপ। একই সঙ্গে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের, প্রাচীন ও আধুনিকতার, শক্তির ও বিনয়ের, কর্মের ও ধ্যানের, ত্যাগের ও গ্রহণের, জাতীয়তার ও আন্তর্জাতিকতার, জীবন ও মহাজীবনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবন ও বাণীতে। তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন বিজ্ঞানদৃষ্টি ও যুক্তি-নিষ্ঠ বাস্তববাদ, আবার অন্যদিকে দেখতে পাই সৌন্দর্যবোধ, নিসর্গপ্রিয়তা, কবিত্ব ও শিল্পচেতনার অদ্ভুত সমাহার। আমরা বিস্মিত হয়ে সেই অপূর্ব মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকি। প্রথমেই স্মরণ করি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্না-রাতে পূর্ণ চাঁদের দিকে হাতজোড় করে প্রার্থনারত মায়ের অপরূপ রূপালেখ্যটিঃ 'তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।'[৬০] বস্তুত চিত্তের এই প্রশান্ত নির্মলতা তাঁকে শিখিয়েছিল নিসর্গের গভীরে ডুব দিতে। কোয়ালপাড়ায় ঝড় ও শিলাবৃষ্টির দিনে মাকে দেখি প্রাণশক্তিতে ভরপুর চপলা বালিকার মতো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শিল কুড়োচ্ছেন।[৬১] মনে পড়ে রামেশ্বর দর্শনের পথে মাদ্রাজ মেল থেকে চিল্‌কা হ্রদ দেখে মায়ের শিশুর মতো আনন্দ-বিহ্বল রূপটি। মনে পড়ে ট্রেনে যেতে যেতে ওয়ালটেয়ারে দুপাশে পাহাড়ের গায়ে অট্টালিকাশ্রেণী দেখে মায়ের খুশীর উচ্ছ্বাস। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠেনঃ 'দেখ দেখ, ঠিক যেন ছবিখানি।'[৬২] মায়ের এই শিল্পদৃষ্টি এবং নান্দনিক অভিচেতনার একটি অমল আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর অপরূপ শিল্পশ্রীতে উদ্ভাসিত পুষ্পবিন্যাস এবং বিচিত্র ধরনের সব পুষ্প-অলঙ্কার নির্মাণের নৈপুণ্যস্নিগ্ধ ক্ষমতার দুর্লভ প্রতিভায়। মা যে কেবল নানা রঙের নানা গন্ধের ফুল ভালবাসতেন তা-ই নয়, চমৎকারভাবে বিভিন্ন বর্ণ-সম্পাত ঘটিয়ে নানা ধরনের মালাও গাঁথতে পারতেন। দক্ষিণেশ্বরে মা-ঠাকরুনের বিরচিত মালিকা এবং পুষ্প-অলঙ্কার ভবতারিণীর পাষাণমূর্তির গলায় এবং সর্ব অঙ্গে মাঝে মাঝেই শোভা পেত এবং ভক্ত-সজ্জনদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন

করত। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর তৈরী মালা এবং পুষ্প-অলঙ্কারের একজন গুণগ্রাহী সমঝদার ছিলেন। সৌন্দর্যের অভিস্নানে অভিষিক্ত হয়েই মায়ের ভিতরে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হত আশ্চর্য এক কবিপ্রতিভা। মা যখন বলেন 'ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়'[৬৩] তখন কি মনে হয় না—আধুনিক কোন কবির কবিতা পড়ছি, 'ভাল-বাসার অন্য নাম যন্ত্রণা'? কিংবা বিবাহ প্রসঙ্গে মার সেই আশ্চর্য কাব্যোক্তিঃ 'সংসারে সবই দুটি দুটি। এই দেখ না, চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি—তেমন পুরুষ ও প্রকৃতি।'[৬৪] এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শেলীর সেই কাব্যাংশঃ

The fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean,
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single ;
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle.
Why not I with thine ?[৬৫]

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

স্বদেশপ্রীতির সংস্কার শ্রীমায়ের সহজাত। জয়রামবাটী থেকে অন্য জায়গায় যাত্রার আগে গৃহ-প্রাঙ্গণের মাটি স্পর্শ করে মা প্রণাম করতেন, বলতেনঃ 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'[৬৬] দেশের কোন প্রান্তে কোথাও কেউ বিদেশী রাজশক্তির হাতে অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হলে মা যন্ত্রণাবিদ্ধ হতেন এবং কখনও বা ক্রোধে উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। সাধারণভাবে বলা যায়, দেশের লোকের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের হৃদয়হীন ব্যবহারে মা ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে সিন্ধুবালা দেবীদের উপর পুলিসের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে মায়ের অগ্নিময়ী মূর্তির কথা মনে পড়ে।[৬৭] দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের প্রতি ছিল মায়ের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও ভালবাসা। শুধু তা-ই নয়—দেশের দুঃখ-দুর্দশার যে-কোন ঘটনাই মাতৃ-হৃদয়ে এসে আঘাত করত এবং মা উদ্বেজিত হতেন। এইসব মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে—মায়ের দুটি চোখ কখনও বিদেশী শাসকের নির্মম শোষণ এবং উৎপীড়নের প্রতিবাদে অগ্নিবর্ষণ করত, কখনও বা অশ্রুর প্লাবনে ভেসে যেত। দেশপ্রেমের সাক্ষ্যবহনকারী এমন ঘটনা বিরল নয় মায়ের জীবনে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এত সুগভীর স্বদেশপ্রেম এবং অত্যাচারী শাসক ইংরাজ সরকারের অমানবিক ব্যবহারে মায়ের এত ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে ইংরাজ-

দের প্রতি তাঁর কোন রাগ তো ছিলই না, বরং তাদেরও তিনি তাঁর সন্তান বলেই মনে করতেন। স্বদেশী আন্দোলন যে কখনই বিদেশী-বিদ্বেষ নয়, এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলেই মায়ের মধ্যে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এমন করে সমন্বিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। বস্তুত মায়ের জীবন-আদর্শের মধ্যেই রয়েছে এই মহাসমন্বয়ের বীজ। তাই এমন বলিষ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেনঃ 'জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।' [৬৮]

ব্যক্তিস্বাধিকারের স্বীকৃতি

আধুনিক অর্থে শিক্ষিতা না হলেও শ্রীমায়ের জীবন ও আচরণে এক অসাধারণ উদারতা মূর্ত হতে দেখা গিয়েছিল। নিবেদিতা বলছেনঃ 'আমার কাছে তাঁর [শ্রীমার] অধ্যাত্মমহিমার মতোই অপূর্ব ঠেকেছিল তাঁর সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য, তাঁর উদার মুক্ত মনের মহিমা।'[৬৯] মায়ের এই সুমার্জিত সৌজন্য, অপরের ভাব বুঝবার মতো পরম উদারতার একটি অনন্য উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা চলেঃ শ্রীহট্টের ভক্ত ক্ষীরোদবালা রায় তাঁর এক আত্মীয়া লেডি ডাক্তার শ্রীমতী প্রমদা দত্তকে নিয়ে এসেছেন মায়ের কাছে। মাকে প্রণাম করার পর মায়ের আদেশেই একজন ভক্ত-রোগীকে দেখলেন, মায়ের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও হল। কিন্তু অতঃপর প্রসাদ বিতরণের সময় দেখা গেল মা সকলকে প্রসাদ দিলেন কিন্তু তাঁকে দিলেন না। প্রমদা দেবী এর কারণ জানতে চাইলে মা বললেনঃ 'তুমি যে, বাছা, ব্রাহ্ম ; তুমি ইচ্ছা করে না নিলে কি করে [তোমাকে প্রসাদ] দিই?' [৭০] ব্যক্তি-স্বাধিকারের প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার এমন আন্তরিক স্বীকৃতি জানানো শ্রীমায়ের জীবনে সহজ ঘটনা। অন্তরে-বাইরে, মনে-মননে, চর্যায়-আচরণে যথার্থ আধুনিকতা অর্জন না করলে এমনটি ঘটতে পারে না। 'যত মত তত পথ'-তত্ত্বের প্রবক্তার সহধর্মিণীর পক্ষেই এ-কাজ সম্ভব। এই বোধ জন্মলাভ করেছে শ্রীমায়ের সর্বাস্তিবাদে সুগভীর বিশ্বাস এবং নববেদান্তের সর্বাত্মক সম্প্রয়োগের অভীপ্সা থেকে।

উপসংহার

শ্রীমায়ের জীবনদর্শনে দেখা যায় ধর্মসাধন ও কর্মসাধন, আধ্যাত্মিক তপশ্চর্যা ও সাংসারিক জীবনযাত্রা—এককথায় ভূমা ও ভূমির মধ্যে কোন দুস্তর ব্যবধান নেই। আসলে সবই এক অবিভাজ্য সত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। তাই তাঁর জীবনে এমন-ভাবে সম্ভব হয়েছে পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের সহজ সুসমঞ্জস সমুজ্জ্বল সমন্বয়। বস্তুত সমন্বয়ই জীবনের ধর্ম এবং এই সমন্বয়, সমাহার, সহযোগিতার মধ্য দিয়েই একই সঙ্গে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত জীবনযোজনা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। যথার্থ আধুনিকতার সেখানেই চরিতার্থতা। শ্রীমায়ের জীবন সেই চরিতার্থতারই আর এক নাম। অনেকের মতে সে জীবন হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমাজের নারীর প্রকৃত রূপের আদর্শ—যে-রূপ দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছিল মা সারদা "যেন ভারতীয় নারীর প্রকৃত আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী।

শ্রীশ্রীসারদা-'কথামৃত'

॥ ১ ॥

সব শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যেই একটি দূরত্বের ভূমিকা থাকে। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনে পরিচিতেব ছদ্মবেশে চির-বিস্ময়ের উপাদান ঘুরেফিরে দেখা দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সেকথাই বলেছেন, 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'-র সহজ-তম উপমায়। এই শিশিরবিন্দুকে আমরাও অন্বেষণের ব্যস্ততায় অনেক সময়ই উপেক্ষা করি। দুর্লভ যে একান্ত সুলভ উপাদানের অন্তরালেই বিদ্যমান, সেকথা আমাদের মনে থাকে না। শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী নিয়ে চর্চা করতে করতে একথাটি বিশেষভাবে মনে জাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব-সাধনার রূপমূর্তি শ্রীশ্রীমা। যে মাতৃভাব-সাধনা ও সিদ্ধি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদে উদ্ভাসিত, তা প্রত্যক্ষত মায়ের জীবনে সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে ইহসংসারের ও চিরসংসারের কেন্দ্রবিন্দু বিশ্বজননীতে পরিণত করেছিল। তাই শ্রীশ্রীমা জগতের ইতিহাসে সবচেয়ে আপন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। এমন শতধারে স্নেহ, করুণা, অভয়, আশ্রয় ও অভ্রান্ত পথনির্দেশ নিয়ে এত কাছের, এত আপনজন হয়ে আর কোনও ধর্মাচার্যকেই জগতের ইতিহাসে আবির্ভূত হতে দেখা যায়নি। সে-আবির্ভাবের আর এক নিঃসংশয় অভিজ্ঞান রয়ে গেছে মায়ের প্রতিদিনের আলাপে, ছোটখাট কথায়, সাধারণ মন্তব্যে, বিশেষ উপদেশে। এগুলি পূর্বচিন্তিত, পরিকল্পিত বা প্রসাধিত বাক্যবিন্যাস নয়, যুগযুগান্তের আধ্যাত্মিক ও মানবিক জীবনসত্যোপলব্ধির সহজ ঘরোয়া বাণীরূপ।

॥ ২ ॥

একহিসাবে মানব-অভিজ্ঞতার ঘনবদ্ধ বাণীরূপ প্রবাদ-প্রবচনগুলির অধিকাংশই মেয়েদের সৃষ্টি। সে কথাগুলিই ব্যাপক ব্যবহারে সাহিত্যসৃষ্টির অলঙ্করণ হয়ে দাঁড়ায়। ভাষাব রাজ্যে অন্তঃপুরিকাদের এ-ভূমিকারও স্বাভাবিক প্রতিফলন মায়ের কথায় আছে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী রয়েছে একটি মৌলিক ব্যক্তিত্বের স্পর্শ। একালে বাংলাসাহিত্যে পুরাতন প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে ও নতুন প্রবাদ-প্রবচনের সৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজাত নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে। মায়ের সব আলাপচারী একসঙ্গে সাজালে দেখা যাবে, ভাবার এই জাদুশক্তিতেও শ্রীশ্রীমা শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের যোগ্য 'সহধর্মিণী'। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'—এই পরমতন্ময়-তার স্বাক্ষররূপে তাঁর কত কথাই ভক্ত-শ্রোতাদের কল্যাণে পাঠকচিত্তে চিরজাগরূক। এ কথাগুলির অন্তর্নিহিত শ্রী ও সৌন্দর্য এমন অনায়াসসিদ্ধ যে, পরবর্তীকালের কোনও শুদ্ধি বা সংশোধন এগুলিকে পরিবর্তিত করেনি। কথামৃতের ভাষা যেমন

আর কারও পক্ষেই তৈরী করা অসম্ভব, মায়ের ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা। অথচ কথামৃত নিয়ে আজ যত আলোচনা ও চর্চা, মায়ের কথা নিয়ে ঠিক সে-ধরনের চর্চা এখনও দেখা দেয়নি। মায়ের কথার সাহিত্যসৌন্দর্য সাধারণের গোচরে আনার প্রথম কৃতিত্ব 'শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী'র লেখক মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের।

উদ্বোধন কার্যালয়ের 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' নামে দু-খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থখানি পড়লে প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমিতে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মভাবনার অনায়াসপ্রকাশে মুগ্ধ হতে হয়। মায়ের কথাগুলি এমন ভাবে ও ভঙ্গিমায় এ-গ্রন্থে বিধৃত যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত' ও স্বামী বিবেকানন্দের 'দেববাণী'র (Inspired Talks-এর বঙ্গানুবাদ) পাশাপাশি আধ্যাত্মিক প্রত্যয় ও অনুভবের অন্যতম দিশারিরূপে এখানিও ভক্তজনের নিত্যপাঠ্য। তাছাড়া, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী', আশুতোষ মিত্রের 'শ্রীমা', স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী', স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে', মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ প্রভৃতিকে ভিত্তিগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করলে মায়ের কথার অজস্র সম্ভার আজকের পাঠকের কাছে উপস্থাপিত। সাম্প্রতিককালে স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' বইখানি মাতৃমহিমার অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি। স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাম্' স্তোত্র এবং স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে মায়ের প্রথম জীবনের প্রসঙ্গ (বিশেষত 'সাধকভাবে'র বিংশ ও একবিংশ অধ্যায়) ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে মাতৃ-অনুধ্যানের শুভসূচনারূপে স্মরণীয়। কিন্তু মায়ের কথার সংকলনরূপে আমরা উদ্বোধন-প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য জীবনীগ্রন্থগুলিকেই গ্রহণ করব।

॥ ৩ ॥

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র মতো 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'ও ভক্তজন ও সাহিত্যপিপাসুজনের আনন্দের ও অনুধ্যানের সামগ্রী। কত সহজ অথচ স্বল্প কথায় বক্তব্য-পরিস্ফুটনে মায়ের স্বভাবদক্ষতা ছিল তার উদাহরণ অজস্র। আবার ইহজীবন ও মহাজীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি উন্মোচনেও তাঁর বাণীর আশ্চর্য কুশলতা! নিবেদিতা হয়তো এদিক থেকেই মায়ের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব বেশী অনুভব করেছিলেন।

মায়ের বাণীতে সেইসঙ্গে রয়েছে আপনা থেকে আসা উপমা, প্রবাদ-প্রবচন, বুদ্ধিদীপ্ত ও আন্তরিকতার লাবণ্য। বস্তুত, মেয়েলি বাক্‌ভঙ্গিমার সঙ্গে স্থির আধ্যাত্মিক প্রত্যয় মিলে মায়ের কথাগুলিও তাঁর মাতৃস্বরূপেরই এক একটি ছোট ছোট বাক্‌প্রতিমা।

কবিদৃষ্টির সৌন্দর্য-ভরা এমন একটি কথা সবার আগে চয়ন করি। প্রারব্ধক্ষয় নিয়ে মা বলছেন একদিনঃ 'আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস্ করে কি যায়? এও তো তেমনি।'[১]

দক্ষিণেশ্বরে সবার চোখের আড়ালে যখন মায়ের সাধনাপর্ব চলেছে, তখনকার

একটি প্রার্থনাঃ 'চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে—আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।'[২] আর একদিনঃ 'জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলেছি, "তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।"'[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়েছিলেনঃ 'চাঁদা মামা...সকল শিশুর মামা।'[৪] সেই চাঁদ বা ঈশ্বরকে সব অবতারের মধ্যেই উপলব্ধি করে মা বলতেনঃ 'একই চাঁদ রোজ রোজ।'[৫] গীতার ভাষায়ঃ 'সম্ভবামি যুগে যুগে।'[৬]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, চাঁদের উপমাটি ঘুরেফিরে মায়ের কথায় কত নতুন নতুন ভাবে এসেছে এবং প্রতিক্ষেত্রে নতুনতর ব্যঞ্জনা বহন করে এনেছে। এসেছে সূর্যের উপমাও ঈশ্বর-করুণার রূপাঙ্কনেঃ 'সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে নীচুতে। জলকে কি ডেকে বলতে হয়—ওগো সূর্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও? সূর্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প করে উপরে তুলে নেয়।'[৭]

শ্রেষ্ঠ উপমার গুণ অনিবার্যতা। মায়ের ঐ উপমাটি কথার মুখেই এসেছে, কিন্তু কী অপরিমেয় সার্থকতায় ভগবৎকৃপার এক অপূর্ব পরিচয় মানবমানসে উপস্থাপিত! বহু ব্যবহৃত উপমা নয়, এ-জাতীয় উপমা জীবনসত্যের নব-আবিষ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ 'মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত!'[৮] মুক্ত মনের গৌরব মায়ের ভাষায়ঃ 'শেষে মনই গুরু হয়। সাধন মানে—তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা।'[৯]

সামান্য থেকে অ-সামান্যে উত্তরণে মায়ের সহজাত সিদ্ধির আর এক উদাহরণ বটফলের বীজ প্রসঙ্গ। স্বামী অরূপানন্দ একটি বটবীজের প্রসঙ্গে মাকে বলেছিলেনঃ 'মা, দেখছ, লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট। এ থেকে অত প্রকান্ড গাছ! কী আশ্চর্য!' উত্তরে মায়ের কথাঃ 'তা হবে না? এই দেখ না, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম, এসব কত কি হয়!'[১০] ছোট্ট একটি দীপ থেকে কেমন করে বিশাল অগ্নিমশালের বহ্নিসঞ্চার হতে পারে, মায়ের এই দৃষ্টান্তটিতে তার অসামান্য উদাহরণ।

দুর্বার মনের অবাধ্য প্রকৃতি মায়ের ভাষায়ঃ 'মন না মত্ত হস্তী...! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে।'[১১] জপ-অভ্যাস সম্বন্ধে শ্রীমার উপদেশঃ 'মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। নাম করতে করতে মন আপনি স্থির

হবে—বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মতো।'[১২] গীতাতেও দেখি বায়ুশূন্য স্থানের নিষ্কম্প দীপশিখার সঙ্গে যোগীর নিরুদ্ধ চিত্তের তুলনাঃ 'যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে।'[১৩]

মায়ের কথার বৈশিষ্ট্য এমনই ছোট ছোট অথচ অভাবিত উদাহরণের মালায়। ঠাকুরের জীবনের ঘটনা থেকে নেওয়া এমনই একটি উদাহরণ মায়ের ভাষায় নব লাবণ্য পেয়েছেঃ 'একবার কামারপুকুরে জ্যৈষ্ঠমাসের দিন বৈকালে খুব বৃষ্টি হয়ে মাঠ সব জলে উপচে গেছে। ঠাকুর ডোমপাড়ার কাছে নীচু সদর রাস্তা দিয়ে এতখানি জল ভেঙে মাঠে শৌচে যাচ্ছেন। সেখানে অনেকে মাগুর মাছ উঠেছে দেখে লাঠি দিয়ে মারছে। একটি মাগুর মাছ ঠাকুরের পায়ে পায়ে কেবল ঘুরছে। তাই দেখে তিনি বলছেন, "এটিকে মারিসনে রে, এটি আমার পায়ে পায়ে শরণাগত হয়ে কেমন ঘুরছে। কেউ যদি পারিস তো একে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আয়।" তারপর নিজেই সেটিকে ছেড়ে দিয়ে এসে বাড়িতে বলছেন, "আহা, কেউ যদি এই রকম শরণাগত হয় তবেই সে রক্ষা পায়"।'—এ কাহিনীর ভূমিকাস্বরূপ মায়ের মন্তব্যঃ 'এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।'[১৪] শরণাগতির এই উদাহরণটি যেমন জীবন্ত কথাচিত্র, মায়ের বর্ণনা এবং পূর্বগামী মন্তব্যটিও তেমনই বাণীচিত্রে ভক্তিসাধনার অপূর্ব রূপায়ণ।

এক গুরুপূর্ণিমার দিন বেলুড় মঠ থেকে সাধু-ব্রহ্মচারীরা 'উদ্বোধনে' এসে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চলে যাবার পর মা বলেনঃ 'দেখ, ঠাকুরের আকর্ষণ, তাঁর আকর্ষণে সব আসছে। সূর্যোদয়ে চাঁদও ম্লান হয়ে যায়। আবার পূর্ণিমায় কেবল বড় তারাগুলো দেখা যায়। চাঁদের আলোয় তারাও মিট্ মিট্ করে। কিন্তু যেই চাঁদ একটু সরে দাঁড়ায়, আর লোকে দেখে আকাশ-ভরা তারা।'[১৫] শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার দিনগুলিতে জনাকয়েক ত্যাগী-যুবককে নিয়ে যে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, আজ তা বিরাট আকার ধারণ করেছে। ক্রমবর্ধমান এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তি কিন্তু সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই শক্তিই বিভিন্ন আধারের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে পুষ্ট করে চলেছে। মাতৃমুখে সেই সত্যই উপমার আশ্রয়ে প্রকাশিত।

বাক্যের ঐশ্বর্যের মতো অনৈশ্বর্যেও সাহিত্যের মহিমার প্রকাশ ঘটে। বাক্‌সংযম মায়ের স্বভাবসিদ্ধ। যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই বলতেন। তাতেই ফুটে উঠত কখনও সুগভীর জীবনরহস্য, কখনও বা রূপচিত্র। যখন কোন কিছু বর্ণনা করেছেন, তা হয়ে উঠেছে অনবদ্য কথাচিত্র। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

গোলাপ-মায়ের প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের এই বর্ণনাটি কৌতুকরসে মাখানোঃ 'ওর (গোলাপ-মার) ঘড়া তো দেখেছ? ঘড়া নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেছে। জলের কাছে ঘড়া রেখে, নাইছে। জোয়ার এসেছে। ঘড়া ভেসে চলেছে। ঘড়াও যায়, আর গোলাপও তার পেছু পেছু যায়। লোকে হাসছে। শেষে একটা লোক ঘড়াটা ধরে দিলে।'[১৬]

অনুরূপ আর একটি ছবি মায়ের ভাইঝি নলিনীর প্রসঙ্গে। নলিনীদি দুপুরে আর একবার স্নান করেছিলেন, কারণ তাঁর কাপড়ে কাকে প্রস্রাব করে দিয়েছিল। শুনে মা বলেছিলেনঃ 'বুড়ো হতে চললুম, কাকে প্রস্রাব করে কখনও শুনিনি।... কৃষ্ণ বোসের বোনের অমনি শুচিবাই ছিল। "টিকিটা ডুবল কি?" গঙ্গায় নাইতে ডুব দিচ্ছে, আর লোকদের জিজ্ঞেস করছে।' [১৭]

ডাকাতবাবার কথা কতজনে কতভাবেই না বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মায়ের নিজের বর্ণনা যেন কয়েকটি তুলির নিশ্চিত টানে পুরো ছবিটি এঁকে দেওয়াঃ 'কখনও তো ওদের মতো চলার অভ্যেস নেই। তবুও ধিকিধিকি চলতে লাগলুম। একা সেই তেপান্তরের মাঠে চলেছি। ওখানে বড় ডাকাতের ভয়। অনেক গল্প ছেলেবেলায় শুনেছি। সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবু চলেছি। গা ছম্‌ছম্‌ করছে। এমন সময়ে দেখতে পেলুম সামনে থেকে একটা লোক—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে রুপোর বালা—খুব ঢেঙ্গা—লাঠি হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালুম। গোটা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।' [১৮]

আবার গভীর হয়েছে কণ্ঠস্বর যখন তিনি বিরাটের সম্মুখীন। নীলাচলের সমুদ্রতটে যখন দাঁড়িয়েছিলেন, ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছিল তটের উপরে—সেই মহাগর্জনের অন্তরালে মর্মান্তিক হাহাকার শুনেছিলেন মা। আলোড়িত কণ্ঠে বলেছিলেনঃ 'ওর কি কম দুঃখু বৌমা! ব্যথায় ওর বুকটা যে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অসুরে মিলে যে যার লভ্যগণ্ডার জন্যে সমুদ্দুরকে মন্থন করলে ; ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন, অমৃত, কত কি লুটে নিলে, শেষে কিনা ওর প্রাণাধিক কন্যা কমলাকেও কেড়ে নিলে! পিতার এ বুক-চেরা দুঃখু কি কম গা? মেয়েকে একবারটি ফিরিয়ে পাবার জন্যে সমুদ্দুরের এত আর্তনাদ।' [১৯] জীবনকে জড়িয়ে সুগভীর রহস্য—মাঝে মাঝে ভাষায় ধরা পড়ে। বিরাটের সম্মুখীন হলে বেরিয়ে আসে এই ভাষা।

মায়ের জীবনীতে একটি মহদ্ভয়দ্যোতক বর্ণনা পাই—ঠাকুরের সঙ্কট-পীড়ার সময়ে মায়ের তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়ার প্রসঙ্গে। মায়ের স্বমুখে সেই বিবরণঃ 'একদিন যায়, দুদিন যায়, পড়েই আছি। রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম—যেমন অনেকগুলো হাঁড়ি সাজানো থাকলে তার উপর ঘা মেরে যদি কেউ একটা হাঁড়ি ভেঙে দেয়, সেই রকম শব্দ। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল, "এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণ হত্যা করতে বসেছি?"—একেবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে! আমি উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মন্দিরের পিছনে কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে চোখে মুখে দিলুম, খানিকটা খেলুম।' [২০] এর অসাধারণ গাম্ভীর্য বিস্ময়পূর্ণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর একে একে তাঁর ত্যাগী-ভক্তেরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছিলেন। মা শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের একত্র করে একটি সঙ্ঘ গড়ে তোলার

জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এই বলেঃ 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে, আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী-বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।'[২১]

এই একটি প্রার্থনায় রামকৃষ্ণসংঘের আদিপর্বের সংগ্রামের ইতিহাস, এবং এর অন্তর্নিহিত জননীহৃদয়ের ব্যাকুলতা কী গভীর অনুভবের রাগিণী সৃষ্টি করেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তরুণদলের মূল বন্ধন ছিল পরস্পরের প্রতি অনন্ত প্রীতি, সে-প্রীতির নির্ঝরটি মায়ের করুণা-ধারায় ত্যাগ ও সেবার ভাগীরথীতে পরিণত। সংঘের এই মূলভাবটি মনে করিয়ে দিয়েই অতিরিক্ত শাসনপরায়ণ কোন আশ্রমাধ্যক্ষকে মা বলেছিলেনঃ 'ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।'[২২]

বৈরাগ্যবান সন্তানের প্রতি সংঘজননীর স্বাভাবিক পক্ষপাত। এমন একজনের প্রসঙ্গে বলছেনঃ 'ওরা তো কাকের বাচ্চা নয়, কোকিলের বাচ্চা। বড় হলেই আসল মাকে বুঝতে পারে, লালনপালন-করা-মাকে ছেড়ে আসল মায়ের কাছে উড়ে যায়।'[২৩] বেলুড় মঠ দেখে আসা ভক্তকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ 'সেই ফুলের মতো পবিত্র ব্রহ্মচারীদের দেখনি?'[২৪] ত্যাগী-সন্তানরা মায়ের ভাষায় 'দেবশিশু',[২৫] 'দেবের আরাধ্য ধন'।[২৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর মা বলেছিলেনঃ 'এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন...।'[২৭] ঠাকুরের অপরিমেয় চরিত্রমাধুর্যকে কোন ভাষায় নির্দিষ্ট করা যায় না। সে যেন অসীমকে সীমাবদ্ধ করারই অসম্ভব চেষ্টা। এ-সম্বন্ধে সচেতন থেকেই যেন মা ব্যবহার করলেন ঐ ছোট্ট শব্দ দুটি—'সোনার মানুষ'। সাধারণ কথা কিন্তু ব্যাপ্তিতে অ-সামান্য।

মায়ের কাছে নরেন 'আমাদের সর্বস্ব'।[২৮] ইংরাজ আমলে স্বামীজী যদি দীর্ঘ-জীবী হতেন, তাহলে কি ঘটত? মায়ের কথায়ঃ 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আর তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে

পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল। বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, "মা, আপনার আশীর্বাদে এযুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি..."।'[২৯] এই বর্ণনায় স্বামীজীর প্রাণদীপ্ত ব্যক্তিত্ব একনিমেষে আমাদের মানসনেত্রে দীপ্যমান হয়ে ওঠে!

দু-চারটি কথার আঁচড়ে এক-একটি ব্যক্তিত্ব মা কেমন চিত্রময় করে তুলতে পারতেন, তার আরও কয়েকটি উদাহরণ। স্বামী যোগানন্দের মহাপ্রয়াণের পরদিন শ্রীমার শোকার্ত উক্তিঃ 'বাড়ির একখানি ইট খসল।'[৩০] শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সন্তানদের দ্বারা গঠিত সেই ক্ষুদ্র অথচ প্রচণ্ড শক্তিধর শিশু-সংঘে স্বামী যোগানন্দ কোন্ স্থানে আসীন, তা নির্দেশিত হয়েছে মায়ের এই উক্তিতে। স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজের প্রয়াণ-সংবাদে ব্যথিতা সঙ্ঘজননীর মন্তব্যঃ 'মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবু-রাম-রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত!'[৩১] রামকৃষ্ণসংঘে স্বামী প্রেমানন্দের ভূমিকার সারসংক্ষেপ এই একটি বাক্যে।

অন্তরঙ্গভক্ত সেবক-প্রধান স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) প্রসঙ্গে মায়ের মন্তব্যঃ 'সে আমার বাসুকি—সহস্র ফণা ধরে কত কাজ করছে; যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।'[৩২]

ভগিনী নিবেদিতার প্রথম বাংলা-জীবনী সরলাবালা সরকারের 'নিবেদিতা' বই-খানির পাঠ শুনে মায়ের শোকার্তহৃদয়ের প্রকাশে প্রবাদ-বচনের সুপ্রয়োগঃ 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী, জান মা?'[৩৩] উদ্ধৃত প্রতিটি মন্তব্যে মায়ের বিশ্লেষণ ও ভাবপ্রকাশের সংহতি কত স্বল্পসীমায় পরিস্ফুট তা লক্ষণীয়। ভাষার এ প্রকাশশক্তি অতি উঁচুদরের সাহিত্যগুণেরই পরিচায়ক।

আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তগ্রহণে মায়ের নিশ্চিত-নেতৃত্ব বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, গিরিশচন্দ্র, নাগমহাশয়, নিবেদিতা, সকলের দ্বারাই স্বীকৃত। সাধারণ ভক্তদের সংগে আলাপচারীতেও মায়ের এই নেতৃত্বশক্তি যে-ভাষা-ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করত, সেই রকম কিছু বাণী সংগ্রহ করে নীচে দেওয়া হল।

অকালে তীর্থদর্শন করা উচিত কিনা এ-প্রসংগে ভক্তজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে মায়ের বক্তব্যঃ 'সংসারীদের মতে একটা কথা আছে যে, অকালে তীর্থদর্শন করে না। দেখ, কালাকালের অপেক্ষা করে পুণ্যকার্য স্থগিত রাখা যায়, কিন্তু কালের (মৃত্যুর) নিকট কালাকালের বিচার নেই। মৃত্যুর যখন অবধারিত কাল নেই, তখন সুযোগ উপস্থিত হলেই কালাকালের অপেক্ষা না করে পুণ্যকার্য করে ফেলা ভাল।'[৩৪]

কোন ভক্তের প্রশ্নঃ 'অনুরাগ না থাকলে শুধু নামজপ করলে কি হবে?' মায়ের উত্তরঃ 'জলেতে ইচ্ছে করেই পড়, আর ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই।'[৩৫]

ভক্তির দ্বৈতচেতনা থেকে একেবারে অদ্বৈতবাদী-সিদ্ধান্ত অবধি সব স্তরই মায়ের কথায় কিভাবে প্রকাশিত, তার বাঙ্ময়রূপঃ 'জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়।

"মা, মা" শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা!'[৩৬]

...কালে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠুকুর সবই মায়া—কালে আসছে, যাচ্ছে।'[৩৭]

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরের ছবির উদ্দেশে ধূপ, দীপ, ফুল সাজিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে স্বামীজীর মন্তব্য শুনে সংশয়গ্রস্ত স্বামী বিমলানন্দের পত্রের উত্তরে মায়ের পত্রাংশঃ 'আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা [যখন] সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'[৩৮]

জ্ঞানভক্তির চরম কথাগুলি মায়ের ভাষায় যে সহজতা পেয়েছে, তার চেয়ে সরল পরমসত্যের প্রকাশ বাংলাসাহিত্যে এক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ছাড়া অন্যত্র অলভ্য। বিভিন্ন সময়ে ছোটখাট মন্তব্যের মাধ্যমে মায়ের জীবনদৃষ্টির গভীরতার বিস্ময়কর প্রকাশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যেমনঃ 'মানুষের কি দোষ দেখতে আছে! ওটি শিখিনি। ক্ষমারূপ তপস্যা।'[৩৯] দেহত্যাগের আগে জনৈক ভক্তমহিলাকে শ্রীশ্রীমা যেকথা বলেছিলেন বাংলাসাহিত্যের অমর-উক্তির তালিকায় সেকথাটির স্থানঃ 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'[৪০] প্রথম মহাযুদ্ধের পর শান্তি-স্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট উইলসন যে চোদ্দ দফা সর্ত করেছিলেন সে-সম্বন্ধে উক্তিঃ 'ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ।...যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।'[৪১] আর্ত-ভক্তের শরণাগতিকে যারা বিদ্রূপ করে তাদের একজনের উদ্দেশেঃ 'দুঃখী মানুষের ব্যথা কত, বড় হলে বুঝবি। তুই তো মা নস্।'[৪২] জীবনে দুঃখ যেমন সত্য, দুঃখ না থাকাও তেমনই সত্য। গভীর দার্শনিকতার সঙ্গে পরম আশ্বাস মিশিয়ে মা তাই বললেনঃ 'চিরদিন কেউ দুঃখী থাকবে না, সব জন্ম কারও দুঃখে যাবে না।'[৪৩] সিলেটের ক্ষীরোদাবালা রায় তরুণ বয়সে বৈধব্যব্রতে মুণ্ডিত মস্তকে ছিলেন বলে কেউ কেউ প্রশ্ন তুললে মা তাঁর মেয়ের (ক্ষীরোদাবালার) পক্ষ নিয়ে বলেছেনঃ '...কেশের সেতু পার হয়ে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ।'[৪৪] প্রকাশভঙ্গির অন্তর্লীন কবিত্বটুকু কী অপরূপ!

মায়ের কথার সহজাত কবিত্বের আর একটি উদাহরণঃ 'যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।'[৪৫]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়, মাতৃভাব সাধনার শেষকথা।[৪৬]

আর শ্রীশ্রীমার জীবন ও বাণী সে-সাধনারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। স্বামী অরূপানন্দ (রাসবিহারী মহারাজ) প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'তুমি কি সকলের মা?' উত্তরে মা বলেছিলেনঃ 'হ্যাঁ!' আবার প্রশ্ন হলঃ 'এইসব ইতর জীবজন্তুরও?' মা বলে-ছিলেনঃ 'হ্যাঁ, ওদেরও।'[৪৭]

জয়রামবাটীতে মাকে গিরিশচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'তুমি কি রকম মা?' মা বলে-ছিলেনঃ 'আমি সত্যিকারের মা ; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।'[৪৮]

মায়ের এই মাতৃস্বরূপটির তাৎপর্য সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই কথায়ঃ '...ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'[৪৯]

শ্রীরামকৃষ্ণসত্তার দুটি বিকাশে একদিকে শ্রীশ্রীমা, আর একদিকে স্বামীজী। কথামৃতের অনুধ্যানে আমরা বাণীশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্যতার পরিচয় পাই। সে পরিচয় স্বামীজীর ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও তেমনই সার্থক। ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের সাধনা ও উপলব্ধি ভারতীয় নারীর জীবনে, মননে, ধ্যানে ও বাণীতে যে-নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে, মায়ের কোমল মধুর 'অশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী'[৫০] ব্যক্তিত্বের দ্বারা আশ্রিত অমৃতময় বাণীভঙ্গিমায় সে-ধারারই অধুনাতন ভাগীরথীপ্রবাহ।

বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারা ও শ্রীমা সারদা

শ্রীমা সারদাদেবী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। তাঁর জীবনের অগণ্য অসামান্য বিকাশ। তার যে-কোন একটি কিরণরেখাতে আমাদের অন্তরাকাশ আলোকিত হয়ে যায়। আমি এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ দিক থেকে শ্রীমায়ের প্রকাশরূপ লক্ষ্য করতে চাই। দেখা যাবে, আমি যে-বিশেষ দিকটি নির্বাচন করেছি, সেই দিকেও তিনি আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক মহান্ প্রকাশ। শ্রীমাকে আমি দেখব বাংলার লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমিতে।

শুরু করা যাক শ্রীমায়ের আবির্ভাব-কথা দিয়ে। শ্রীমা নিজমুখে নিজের জন্মকথা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সে যেন লোকায়ত উপকথারই একটি অধ্যায়ঃ 'আমার জন্মও তো ঐ রকমের (শ্রীরামকৃষ্ণের মতো)। আমার মা শিওড়ে [শিহড়ে] ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছা হওয়ায় দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হল না, কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদর-মধ্যে ঢোকায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন যে লাল চেলী পরা একটি পাঁচ-ছ বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি তোমার ঘরে এলাম মা।" তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে; তা থেকেই আমার জন্ম।'[১]

গভীরভাবে সত্য এ কাহিনী, কিন্তু বাহ্যত অলৌকিক কিংবদন্তীর আকার। শ্রীমায়ের জন্ম হয়েছিল কঙ্করাকীর্ণ রক্ত-মৃত্তিকাময় রাঢ় অঞ্চলের প্রত্যন্ত সীমা বাঁকুড়ার ক্ষুদ্র পল্লী জয়রামবাটীতে। একটি পরিপূর্ণ লোকপ্রকৃতির পটভূমিকা। সারদাদেবীর অন্যতম জীবনীকারের ভাষায় মায়ের জন্মভূমির প্রকৃতিটি ছিল এইরূপঃ 'শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বাঁকুড়া জেলা সাধারণতঃ অভাবগ্রস্ত ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহার দক্ষিণ-পূর্বভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র জয়রামবাটী গ্রামখানি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিবশতঃ অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ, এবং অক্লান্তকর্মা কৃষক-কুলের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে উহার শস্যক্ষেত্র ইক্ষু, ধান্য, গম ও বিবিধ শাকসবজিতে পরিপূর্ণ থাকিয়া সদা হাস্যময়।...গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে পূর্বমুখে প্রবাহিত স্বচ্ছতোয় আমোদর নদ গ্রামের উত্তর-সীমা নির্ধারিত করিয়া ক্রীড়াচঞ্চল বালকের ন্যায় আপন-মনে আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় এক মাইল চলিয়াছে;...জয়রামবাটীর স্বাভাবিক অবস্থান অতি সুন্দর—প্রায় চারি পার্শ্বেই উন্মুক্ত প্রান্তর। আমোদর নদ এবং গ্রামের মধ্যবর্তী আন্দাজ অর্ধ মাইল পরিমিত ক্ষেত্র খুবই উর্বর। উহাতে এবং গ্রামসংলগ্ন

অন্যান্য ভূমিতে স্বল্পে সন্তুষ্ট কৃষক-পরিবারের উপযোগী ধান্য, দাল, লঙ্কা, হলুদ, তরকারি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীমায়ের বাল্যকালে কার্পাসেরও চাষ হইত। আর পুষ্করিণীতে যথেষ্ট মৎস্য ছিল। কথিত আছে যে, শ্রীমায়ের আগমনের পূর্বে গ্রামের তেমন প্রাচুর্য দেখা যাইত না; তাঁহার আবির্ভাবের পর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। ...শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পিতৃবংশ মুখোপাধ্যায়রা ঐ গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। এই মুখোপাধ্যায়গণ এবং তাঁহাদের দৌহিত্রবংশীয় বন্দ্যোপাধ্যায়-কুল ভিন্ন আর কোন ব্রাহ্মণ-পরিবার সেখানে নাই। এতদ্ব্যতীত বিশ্বাস, মণ্ডল, ঘোষ ও সামুই উপাধিধারী কয়েকটি সদ্‌গোপ পরিবার, কয়েক ঘর গোয়ালা, একঘর নাপিত, একঘর ময়রা, একঘর কামার এবং দুই-তিন ঘর বাগদি—এইসব মিলিয়া প্রায় একশতটি পরিবার তাহাদের স্বল্পপরিসর মৃত্তিকাগৃহে অনাড়ম্বর পল্লীজীবন যাপন করে। ...আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও জয়রামবাটীতে আনন্দোৎসবের অভাব কোন কালেই ছিল না। বৎসরে অনেক পার্বণই সেখানে জাঁকজমকে অনুষ্ঠিত হয়। আবার শরৎকালে সিংহবাহিনীর মন্দিরে তিন দিবসব্যাপী সাড়ম্বর পূজা, বলি ও ভোগরাগাদি লইয়া গ্রামবাসীরা মাতিয়া উঠে। ...রাধাষ্টমী ও শ্যামাপূজাতে গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া আনন্দোৎসব ও কীর্তনাদি করে; শিবরাত্রিতে শিহড়ে গমনপূর্বক শান্তিনাথের পূজা দেয় এবং গাজনের সন্ন্যাসী সাজিয়া ব্রত উপবাস করে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ধুমধামের সহিত শীতলাদেবীর পূজানুষ্ঠান আজও প্রচলিত আছে। সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহে অদ্যাপি সময়বিশেষে অষ্টপ্রহর-কীর্তন ও পৌরাণিক যাত্রাভিনয়াদি হইয়া থাকে। যাত্রা শুনিতে বগলে মাদুর লইয়া ও আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া গ্রামান্তরে গমনের প্রথা আজও বিদ্যমান আছে।'[২]

ধান্যক্ষেত্র, ইক্ষুক্ষেত্র, বৃহৎ দীঘি, ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, অশ্বত্থ-বট-আম্র-বকুল বৃক্ষ, গুল্ম লতার ঝোপে-ঝাড়ে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' জয়রামবাটীর লৌকিক গ্রাম্য পরিবেশে শ্রীমা বড় হয়েছিলেন। বাংলার মাটি-জল-আকাশ-বাতাস সারা অঙ্গে মেখে নিয়ে সারদামণি শৈশবের দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। তাঁর কথায় জানা যায়ঃ 'ভাইদের নিয়ে গঙ্গায় নাইতে যেতুম। আমোদর নদীই ছিল যেন আমাদের গঙ্গা। গঙ্গাস্নান করে সেখানে বসে মুড়ি খেয়ে আবার ওদের নিয়ে বাড়ি আসতুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গাবাই ছিল।'[৩] সারদাজননী শ্যামাসুন্দরী বাংলার কৃষিজীবী পরিবারের সন্তানদের মতোই তাঁর কন্যাটিকে পালন করেছেন। পিতা রামচন্দ্রের সংসার ছিল অত্যন্ত দারিদ্রের। সারদাদেবী কেবল গ্রামীণ পরিবেশেই মানুষ হননি, লোকায়ত জীবনপ্রবাহের প্রতিটি অংশে নিজেকে তিনি যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি বলেছেনঃ 'ছেলেবেলায় গলাসমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। খেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল; খেতে খেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।'[৪] মুখুজ্যেদের কয়েক বিঘা নিষ্কর জমিতে যে ধান হত তার দ্বারা সমস্ত পরিবার প্রতিপালন সম্ভব হত না। ফলে রামচন্দ্রকে পৈতৃক পৌরো-হিত্যবৃত্তির উপর নির্ভরশীল না থেকে অন্য ব্যাপারে মনোযোগী হতে হয়েছিল।

তাঁকে তুলোর চাষও করতে হয়েছিল এবং কৃষক পরিবারের মতোই তাঁর পত্নীকেও এই চাষবাসে অংশ নিতে হত। এই প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের জীবনীকার ঐ সময়কার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ 'শ্যামাসুন্দরী কোলের মেয়ে সারদাকে ক্ষেত্র-মধ্যে শোয়াইয়া তুলা তুলিতেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কন্যাও মাতাকে ঐ কার্যে সাহায্য করিতেন। মাতাপুত্রী ঐ তুলা দ্বারা পৈতা কাটিয়া দিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থে পরিবারের বসনভূষণাদি সংগৃহীত হইত।'[৫] এ সমস্ত কিছুই ভারতবর্ষের লোকায়ত পারিবারিক জীবনপ্রবাহের অকৃত্রিম রূপ। এই ধারার মধ্য দিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী।

ভারতীয় লোকায়ত জীবনের আর একটি বিশিষ্ট রূপ হচ্ছে নিটোল গৃহী-জীবনের ধারা। শ্রীমা সারদাদেবী বাল্যকাল থেকেই লোকায়ত গৃহস্থালির কাজকর্মে অত্যন্ত সুনিপুণ হয়ে উঠেছিলেন। ঘুঁটে দেওয়া, ধান সেদ্ধ করা, ঘর নিকোনো, বাসন মাজা প্রভৃতি গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সব কাজই শ্রীমা করতেন—সাধারণ গ্রামীণ দরিদ্র বাঙালী সংসারের একটি গৃহিণী যা-যা করে থাকেন। তাঁর শৈশবের ঘরকন্নার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর ভাই বলেছেনঃ 'দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিদি কি না করেছেন! ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না-বান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশী কাজই তো দিদি করেছেন।'[৬] কামারপুকুরে বধূ হয়ে এসেও মা সারাদিন বিভিন্ন ধরনের সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

গ্রামভিত্তিক এই দেশ। আর এই গ্রামের মেয়েরাই লোকায়ত গ্রামীণ জীবনপ্রবাহের ধারক ও বাহক। পুরুষের বাইরের জগতে নানা পরিবর্তন ঘটলেও অন্তঃপুরে তার ঢেউ বিশেষ একটা পৌঁছায় না। তাই ভারতবর্ষের চিরায়ত রূপটির লোকায়ত ধারাকে যদি আমাদের কোথাও খুঁজে পেতে হয় তবে এদেশের গ্রামীণ জীবনের অন্তঃপুরের গৃহস্থালি হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রভূমি। সেখানে প্রতিনিয়তই পরিবর্তনের মধ্যেও লৌকিক জীবনযাত্রার একটি সাধারণ মান নির্ধারিত হয়ে আছে, বাঙালী পুরুষেরা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যতই অগ্রসর হোক না কেন বাঙালী নারীর অন্তঃপুর ভারত-বর্ষের লোকায়ত রূপটিকে বহু যুগ ধরে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। সেই নারী পুরুষের বাইরের কাজে সাহায্য করছে, আবার আপন অন্তঃপুরে তারা অঘোষিত সম্রাজ্ঞী। আবর্জনা পরিষ্কার থেকে শুরু করে রান্না-বান্না, অতিথিসেবা, গুরুজনের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, সন্তানপালন সব ক্ষেত্রেই তাঁরা বর্তমান। আর এই ভারত-বর্ষ তথা বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিধারার পূর্ণ প্রতীকরূপে শ্রীমা আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন।

সাধারণভাবে বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারে গার্হস্থ্য জীবনচর্যার মূলকথাই হল অতিরিক্ত পরিশ্রম আর অভাব-অনটন-দুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে মানিয়ে চলার প্রচেষ্টা। শ্রীমার জীবনে এই প্রচেষ্টারই সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করি। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের নীচের অপ্রশস্ত ঘরে তিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। সেই ঘরের মধ্যেই ছিল রান্না থাকা খাওয়া সবকিছুই। সংসারের অধিকাংশ জিনিস কক্ষের ক্ষুদ্রতার জন্য শিকায় টাঙিয়ে রাখতে হত। মায়ের নিজের কথায় তাঁর এই সময়কার

জীবনযাত্রার কথা জানা যায়ঃ 'রাত চারটেয় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (নহবতের) নীচের একটুখানি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর হাঁড়ি কলকল করছে—ঠাকুরের জন্য শিঙি মাছের ঝোল হত কিনা!'[৭] এই বর্ণনায় মা তাঁর নিজের জীবনযাত্রার যে-চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন তার মধ্যে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাঙালী নারীর অসম্ভব সহ্যশক্তির অপূর্ব প্রকাশ। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে আমরা দেখেছি, কৃষক-রমণী, ভূমিহীন শ্রমিক-বধূ—সকলের অন্তর থেকেই বার বার উৎসারিত হয়েছে দুঃখ আর দারিদ্রের বারমাস্যা। 'দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান/আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।'[৮] তবে সেই দুঃখ-দারিদ্র বাঙালী নারীকে রুক্ষ করেনি, জীবন কিংবা মানুষ সম্বন্ধে বীত-শ্রদ্ধ করেনি। দুঃখকে বরণ করে নিয়ে বাঙালী-নারী আরও নিবিড়ভাবে জীবনকে ভালবেসেছে। শ্রীমার জীবনেও এই লোকায়ত বাংলার নারীপ্রকৃতি বার বার প্রকাশিত হয়েছে—সে কন্যা হিসাবেই হোক আর বধূ হিসাবেই হোক। আর মাতৃরূপে তিনি তো বাংলার চিরন্তন মাতৃসত্তার পূর্ণ প্রতীক। নহবতের ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লোক-চক্ষুর অন্তরালে তিনি থাকতেন; বাইরের লোকের কাছে একেবারে আত্মপ্রকাশ করতেন না, স্বামী-দর্শনও তাঁর পক্ষে দিনের পর দিন ঘটত না। কী যে দুঃসহ শারীরিক কষ্ট ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে মা-সারদা তাঁর বধূ-জীবনকে বহন করেছিলেন! অথচ এই কষ্টের মধ্যে ছিল না কোনরূপ নিরানন্দের ভাব। নিজেই বলেছেনঃ 'কী আনন্দেই ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত!'[৯]

শ্রীমার দক্ষিণেশ্বর-জীবনের একটি বর্ণনা যোগীন-মা উপস্থিত করেছেনঃ 'শ্রীমা ভোর চারটার আগে শৌচ ও স্নানাদি সেরে ধ্যানে বসতেন—ঠাকুর ধ্যান করতে বলতেন কিনা! এর পরে বাকি কাজকর্ম সেরে পূজায় বসতেন। পূজা, জপ, ধ্যান—এতে প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর সিঁড়ির নীচে রান্না করতে বসতেন। রান্না হলে যেদিন সুযোগ ঘটত, সেদিন মা নিজহাতে ঠাকুরকে স্নানের জন্য তেল মাখিয়ে দিতেন। সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যে ঠাকুর আহার করতেন। তিনি স্নানে যেতেন, মা এসে তাড়াতাড়ি ঠাকুরের পান সেজে নজর রাখতেন ঠাকুর স্নান করে ফিরে এলেন কিনা। তিনি তাঁর ঘরে এলেই মা এসে জল ও আসন দিয়ে তার পরে খাবারের থালা নিয়ে এসে তাঁকে আহারে বসিয়ে নানা কথার মধ্য দিয়ে চেষ্টা করতেন, যাতে খাবার সময় ভাবসমাধি উপস্থিত হয়ে আহারে বিঘ্ন না ঘটায়। একমাত্র মা-ই খাবারের সময় তাঁর ভাবসমাধি আসা অনেকটা ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন, আর কারও সে সাধ্য ছিল না। ঠাকুরের খাওয়া হলে মা একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিতেন। পরে পান সাজতে বসতেন। পান সাজা হয়ে গেলে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতেন; তা খুব সাবধানে যেন কেউ না শুনতে পায়। এর পরে কলের সেই একটার বাঁশী বেজে উঠত, যাকে ঠাকুরের মা



ঠাকুরঘরে পূজারতা শ্রীশ্রীমা
১৩১৬ সাল : ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ
স্থান : উদ্বোধন (মায়ের বাড়ি)   ফটো : বি দত্ত



পূজারতা শ্রীশ্রীমা। হাতে ঘণ্টা। স্থান-কাল একই। ফটোটি এ-পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল।

বৃন্দাবনে "কৃষ্ণের বাঁশী" বলতেন, তা-ই শুনে তিনি খেতে বসতেন। সুতরাং দেড়টা-দুটোর আগে কোনদিনই মায়ের খাওয়া হত না। আহারের পরে নামমাত্র একটু বিশ্রাম করে সিঁড়িতে চুল শুকোতে বসতেন তিনটে নাগাদ। তারপর আলো-টালো ঠিক করে তোলা জলে নমো নমো করে মুখ হাত ধুয়ে, কাপড় কেচে, সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হতেন। সন্ধ্যা এলে আলো দিয়ে ঠাকুর-দেবতার সামনে ধুনো দেখিয়ে মা ধ্যানে বসতেন। এর পরে রাত্রের রান্না; সকলকে খাওয়ানো সেরে মা আহার করতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করে শুয়ে পড়তেন।'[১০]

উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মাতাঠাকুরানীর প্রাত্যহিক জীবনচিত্রের মধ্যেও লোকায়ত বাঙালী নারীর চিরন্তনী মূর্তিটি পরিস্ফুট। ঠাকুরের দেহাবসানের পরও জয়রামবাটী বা অন্যত্র তাঁর দৈনন্দিন জীবনচিত্রের মূল রূপটির কোন পরিবর্তন হয়নি। নিবেদিতা শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে মধুর দিনগুলির স্মৃতিচারণ করে লিখেছেনঃ 'শ্রীমায়ের আবাসে দিনগুলি শান্তি ও মাধুর্যে ভরা। প্রত্যুষের অনেক আগেই সকলে একে-একে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করেন; বিছানার মাদুরের উপর থেকে চাদর ও বালিশ সরিয়ে তার উপর স্থির হয়ে বসেন, মুখ ঘোরানো থাকে দেওয়ালের দিকে, হাতে-হাতে ঘুরতে থাকে জপের মালা। তারপরে ঘর পরিষ্কারের ও স্নানাদির সময় আসে। পর্বের দিনে শ্রীমা এক সঙ্গিনীর সঙ্গে পালকিতে গঙ্গাস্নানে যান। তার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণ পড়েন। তারপরে নিজের ঘরে মা পূজায় বসেন। অল্পবয়সীরা প্রদীপ জ্বালায়, ধূপধুনা দেয়; গঙ্গাজল, ফুল ও পূজার জোগাড় করে। এই সময়ে গোপালের মা-ও এসে নৈবেদ্য তৈরীতে সাহায্য করেন। তারপর দুপুরের আহার ও বিকালের বিশ্রাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঝি লণ্ঠন জ্বালিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের কথালাপের মধ্যে: সকলে উঠে পড়ে; পট বা বিগ্রহের সামনে আমরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করি; গোপালের মা ও শ্রীমায়ের পদধূলি নিই; কিংবা বাধ্য মেয়ের মতো মায়ের সঙ্গে ছাতে উঠি গিয়ে; তুলসীতলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসি। বহু ভাগ্য তার, যে মায়ের পাশে তাঁর সান্ধ্য ধ্যানের সময়ে বসবার অনুমতি পায়—মায়ের সব পূজার শুরু ও শেষ যে গুরু-প্রণামে—সেই প্রণাম করতে সে শেখে স্বয়ং মায়ের কাছ থেকে।'[১১] এইভাবে দেখা যায়, শুধু যে তিনি লোক-সংস্কৃতির উৎস থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা-ই নয়, মাতৃরূপে এবং সংসারের গৃহ-লক্ষ্মী হিসাবে তাঁর জীবন পরিপূর্ণ লোকসংস্কৃতির পরিমণ্ডলেই অতিবাহিত হয়েছে। জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত শ্রীমা অন্যান্য সাধারণ বাঙালী নারীর মতোই গৃহস্থালির যাবতীয় কাজকর্ম নিজেই করেছেন। ভক্তদের তত্ত্বাবধান, সকালবেলা ঘণ্টা দুই ধরে তরকারি কোটা, ভাঁড়ার বের করে দেওয়া, পূজার আয়োজন, পূজা ও পূজার পর প্রসাদ বিতরণ, পান সাজা, রুটি-লুচি তৈরী করা, দুধ জ্বাল দেওয়া প্রভৃতি সবই ছিল তাঁর দৈনন্দিন আবশ্যিক কর্তব্য। জীবনীকার লিখেছেনঃ 'শেষের দিকে মার জয়রামবাটীর বাড়িতে রাঁধুনী, ঝি, প্রভৃতি সবই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রাঁধুনী আসিতে বিলম্ব করিলে মা নিজেই রান্না চাপাইয়া দিতেন, ঝি আসিতে বিলম্ব করিলে

নিজেই তাহার কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন, অথবা সে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিলে তিনি নিজেই গোয়াল পরিষ্কার করিয়া ঘুঁটে দিতে বসিয়া যাইতেন। শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী বলিয়াছেন—একদিন ভোরবেলায় পুকুরে বাসন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে মাজিতে গিয়া দেখি তাহা আর সেখানে নাই, মা মাজিয়া ঘরে লইয়া আসিয়াছেন।'[১২]

যখন জগজ্জননীরূপে হাজার-হাজার নরনারী কর্তৃক পূজিতা, তখনও শ্রীমা গ্রামীণ রীতি অনুসারে কুলপুরোহিতকে প্রণাম করেছেন, সন্ন্যাসী-সন্তান যে-আসনে বসেছে, শ্রদ্ধাভরে সেই আসন মাথায় ঠেকিয়েছেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি গ্রামের আর দশজন বধূর মতো অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। মোটা ও খাপী ধরনের একখানি সাদা নরুনপেড়ে ধুতি ছিল তাঁর পরিধেয় বস্ত্র। গায়ে জামা দিতেন না, কিন্তু বাংলার গৃহবধূর সনাতন শোভন ও শালীন শৈলীতে কাপড় পরতেন। ভক্তদের দর্শন দেবার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ চাদরে আবৃত করে রাখতেন। সাক্ষাতে পুরুষের সঙ্গে কখনই কথা বলতেন না। অন্য কারও মাধ্যমে পুরুষ-ভক্তদের কথার তিনি জবাব দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য ত্যাগী-সন্তানদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হত না। এই সাধারণভাবে জীবনযাপন এবং অপূর্ব লজ্জাশীলতা লোকায়ত বাঙালী নারীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

আশুতোষ মিত্রের বর্ণনায় এক দিনের চিত্র পাই যা থেকে বোঝা যায় শ্রীমায়ের সঙ্গে গ্রামবাংলার নাড়ির যোগ কতটা সুদৃঢ় ছিল। এক পৌষসংক্রান্তির সকালে জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে গিয়ে আশুতোষ মিত্র দেখলেনঃ শ্রীমা ঢেঁকিশালে বসে চাল কুটছেন—নিজে 'গড়ে' চাল দিচ্ছেন আর চাল কোটা হয়ে গেলে তুলে নিচ্ছেন। আশুতোষ মিত্র বললেনঃ 'আপনি কেন মা করছেন? মুষলটা যে হাতে পড়ে যেতে পারে।' শ্রীমা বিরক্ত হয়ে বললেনঃ 'তুমি থাম। আমার সব অভ্যেস আছে।' কিছুক্ষণ পরে আশুতোষ মিত্র দেখলেনঃ মা ধুচুনিতে ডাল নিয়ে কলু-পুকুরে (খিড়কি পুকুরে) কচলে ধুয়ে খোসা তুলছেন। ফিরে এসে মা সেই ডাল নলিনীদি আর ছোট-মামীকে বাটতে দিলেন। 'কি হবে' জিজ্ঞাসা করায় মা শুধু বললেনঃ 'দেখতে পাবে।' স্নান ও পূজা শেষ করে মা এরপর রান্নাঘরে গিয়ে পিঠে গড়তে ও ভাজতে বসলেন। সারাদিন ধরে নানারকম পিঠে করলেন মা। আগুন-তাতে থেকে মায়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, তথাপি সন্ধ্যে পর্যন্ত পিঠে তৈরী করলেন। রাত্রে খাবার সময় আশুতোষ মিত্র দেখলেনঃ সরুচাকলি, সিদ্ধ ও ভাজা নানা প্রকারের পুলি, রসবড়া, পাটিসাপটা এবং পায়েস তৈরী। মা সেসব পাতে পরিবেশন করতে করতে বললেনঃ 'অনেক হয়েছে—রেখে দিইছি—কাল আবার খাবে—বাসী হলে মজে।'[১৩] এই বর্ণনা থেকে পরিস্ফুট হয়ঃ শ্রীমা ছিলেন লোকায়ত বাঙালী ঘর-সংসারের যথার্থ গৃহিণী।

শ্রীমায়ের কথার মধ্যেও অনেক উপমার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলি লোকায়ত গ্রামীণ জীবন থেকে সংগৃহীত। তার কয়েকটি দৃষ্টান্তঃ 'সকলেই কি করে চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে

স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকান্ড মহামূল্য হীরা।'[১৪] 'দর্শন কি রোজই হয়? ঠাকুর বলতেন, "ছিপ ফেলে বসলেই কি রোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক মাল-মসলা নিয়ে একাগ্র হয়ে বসলে কোন দিন বা একটা রুই এসে পড়ল, কোন দিন বা নাই পড়ল, তাই বলে বসা ছেড়ো না।" জপ বাড়িয়ে দাও।'[১৫] 'ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে, হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখীর বোল বলি—একটাই পাখীর বোল আর অন্যগুলো পাখীর বোল নয় এরূপ বলি না।'[১৬] 'কাজকর্ম করবে বইকি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্তত সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি করলাম না করলাম তার বিচার আসে।'[১৭] 'যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে দিতে নেই; যা গরুতে খায়, তা কুকুরকে দিতে নেই; গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছ খায়—তবু নষ্ট করতে নেই।'[১৮] 'জলেতে ইচ্ছে করেই পড়, আর ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই। নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি-না! ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে। একটি লোক মাছ ধরছিল—পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাতনার দিকেই দৃষ্টি।'[১৯]

লোকসঙ্গীতের প্রতিও শ্রীমায়ের প্রীতি বরাবরই। যখন জয়রামবাটীতে থাকতেন হরিদাস বৈরাগী এসে মাঝে মাঝে গান শুনিয়ে যেত। কৈলাসপতি ভোলানাথ এবং গিরিরাজ-কন্যা উমা বাঙালীর লোককাব্যের নায়ক-নায়িকা। তাঁদের গার্হস্থ্য-জীবনকে কেন্দ্র করে অনেক লোককাব্য, সঙ্গীত এবং কাহিনী রচনা করেছে বাঙালী। একদিন হরিদাস বৈরাগী এসে বেহালা বাজিয়ে গান ধরলঃ

'কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)
(ও মা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?

মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই গান শুনেছিলেন। এই গানের মধ্যে শ্রীশ্রীমার বাল্যজীবনের জ্বলন্ত ছবি দেখতে পেয়ে উল্লাসে আত্মহারা হয়েছিলেন।[২০]

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, বিয়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের সঙ্গে যখন জোড়ে জয়রামবাটী আসেন, তখন ভানুপিসী শিব ও উমার সঙ্গে তুলনা করে মাকে বলেছিলেনঃ 'নাতনী তুই যেমন সুরূপা, তোর বর জুটেছে ন্যাংটা ক্ষেপা।'[২১] ভানু-পিসী ঠাকুর ও শ্রীমাকে শিব ও উমা জ্ঞানে দেখেছিলেন।

একবার সাতবেড়ে গ্রামের লালু জেলে এসে মাকে ধরে বসল সে বাউল গান করবে। মা বললেনঃ 'না রে, না। তুই কি গাইবি? শুধু শুধু আমাকে হয়রান করবি। কোথায় শামিয়ানা, লণ্ঠন; ও-সবের আমি ব্যবস্থা করতে পারবোনি।' লালু কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে বললঃ 'পিসীমা, আমি সব জোগাড় করে আনব, কোন চিন্তা নাই।'

পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা স্বামী ঈশানানন্দের ভাষায়ঃ 'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যথা-সময়ে লালু একটি ভাঙা তোরঙ্গ মাথায় করিয়া এবং কাঁধে একটি ঢোলক লইয়া আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "কেন লোক-হাসাহাসি করবি, লালু? তার চেয়ে অমনি ছেলেদের সঙ্গে বসে দু-একটি ভজন গান করে জগদ্ধাত্রীকে শুনিয়ে পরে প্রসাদ পেয়ে যাস।" লালু কোন কথা না শুনিয়া বাড়ির সামনের মাঠে বাঁশ বাঁধিয়া শামিয়ানা (ছেঁড়া চট) খাটাইয়া এবং একটা হারিকেন লণ্ঠন বাঁধিয়া দিয়া ঢোলকটা একবার জোরে জোরে বাজাইয়া পাড়ায় পাড়ায় সংবাদ দিতে গেল। কিছুক্ষণ পরে লালু আর একবার ঢোলকটি বাজাইয়া আসর একটু জমাইল। তারপর তোরঙ্গটি খুলিয়া আলখাল্লা, নূপুর, একতারা প্রভৃতি বাহির করিয়া যেমনি আলখাল্লাটি পরিতে গেল অমনি উহার ভিতর হইতে অনেকগুলি আরসোলা বাহির হইয়া পড়ায় নলিনীদি বলিয়া উঠিলেন, "মুখপোড়া, আর তোর গান করতে হবে না। আরসোলা ছেড়ে দিতে এসেছিস। শিগ্‌গির তোরঙ্গ বন্ধ করে চলে যা।" লালু আলখাল্লাটা বেশ করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া একতারা সহযোগে গান ধরিলঃ

সংসারকে সার ভাবে যে সেইতো মূঢ়।
এই ভবের মাঝে ভেবে দেখো কে কার বাবা,
কে কার খুড়ো॥
এখন আলবোলাতে টানছ তামাক,
শব্দ হচ্ছে গড়র গড়র।
যখন বৃদ্ধকালে দন্ত যাবে খেতে হবে
তখন মুড়ির গুঁড়ো॥

এইভাবে দু-চারটি দেহতত্ত্বের ও হাস্যরসের গান গাহিয়া লালু সকলকে খুব হাসাইল ও আনন্দ দিল। শ্রীশ্রীমাও ঐসকল বেশ উপভোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে হাসিতেছিলেন।'[২২]

বাংলাদেশ মাতৃকেন্দ্রিক। অন্তঃপুরে অবস্থান করেই বাংলাদেশের মা তাঁর বহু-দিনের সঞ্চিত ঐতিহ্যকে লালন করে এসেছেন, পারিবারিক জীবনের স্নিগ্ধ শুচিতা ও মাধুর্যের রূপটি অক্ষয় করে রাখবার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের মায়ের কথায় মনে হয় বাংলার লোকপ্রকৃতির কথা। বাংলার মা যেন বঙ্গপ্রকৃতির অবিকল প্রতিকৃতি। শীতে তাঁর তাপসী মূর্তি, বসন্তে উচ্ছল উজ্জ্বলতা, বর্ষায় অশ্রুভরা বেদনার বাণী, শরতের মেঘ ও রৌদ্রের মধ্যে মায়ের হাস্যময়ী স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি—সব জড়িয়ে-সব নিয়ে বাংলার মা যেন এদেশের মাটি-আকাশ-বাতাসের এক শুচিসুন্দর চিন্ময়ী বিগ্রহ। তাই কবি বলেনঃ 'চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী',

কিংবা 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে'। লোকসংস্কৃতির ছড়ায়, ব্রতকথায় বাংলা-মায়ের সদা প্রশস্তিঃ

শাঁখার আগে সোনার কাঁকন মায়ের বুকে পুতের নাচন,
মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জানে কি
মায়ের বুকের লো পুত্র আর কি;
মায়ের বাও পবনের বাও এমন শীতল নাই।

বাংলাদেশের মায়ের বাৎসল্য ও ভালবাসার এই লোকপ্রকৃতির রূপ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে। তার এক সুন্দর* চিত্র পাই ভগিনী নিবেদিতার সেই বিখ্যাত চিঠিতেঃ 'আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গির্জায় গিয়েছিলাম সারার (মিসেস ওলি বুলের) জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা; সব কিছু সামনে ভেসে উঠল।...সত্যিই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধু গন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।'[২০]

বাংলাদেশে বাৎসল্যের বিষয়কে কেন্দ্র করে মা-যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ-ভালবাসার অসাধারণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলী কাব্যে। এই বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে বালগোপালের লীলায়; তার নাচনে যশোদার উচ্ছল আনন্দ, তার দুরন্তপনায় এবং বিপদের সম্ভাবনায় গভীর শঙ্কা। তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা, সাত নয়, পাঁচ নয়, একটি মাত্র ধন—'পরান পুতলী দুটি নয়নের তারা'—তার যেন কোন অমঙ্গল না হয়। বলরামের সঙ্গে গোচারণে পাঠিয়ে বার বার করে মা-যশোদা বলেনঃ

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥ [২১]

এখানে মা-যশোদার কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত, তিনি কোমলপ্রাণা বাঙালী মায়ের প্রতীক হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিতা। মা-সারদার মধ্যে বঙ্গজননীর এই রূপটি ব্যাপকতম আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি উত্তর জীবনে যথার্থ লোকজননী-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। হয়েছিলেন 'সতেরও মা অসতেরও মা', ব্রাহ্মণের মা, চণ্ডালের মা, হিন্দুর মা, মুসলমানের মা, খ্রীষ্টানের মা, সন্ন্যাসীর মা, গৃহীর মা। মা-যশোদার বাৎসল্যের যে লোকায়ত ঐতিহ্য আমরা পেয়েছি মা-সারদা তাকে বিশ্ব-মাতৃত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন।

শ্রীমার জীবনচর্যা কতখানি বাঙালীয়ানা এবং লোকায়ত সংস্কার ও লোক-বিশ্বাসের অনুগামী ছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি নিজের ও আত্মীয়স্বজনের অসুখ-

বিসুখে তিনি সাধারণ বাঙালী নারীর সরল বিশ্বাসে দেবদেবীর কাছে মানত করছেন, মন্দিরে হত্যা দিচ্ছেন, ওঝা ও জ্যোতিষীর দেওয়া মাদুলি-কবচ গ্রহণ করছেন। রাধুর অসুখে যেমন ডাক্তারি-চিকিৎসা করিয়েছেন, তেমনই প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুসারে রোগের প্রতিকারের জন্য যে যা বিধান দিয়েছে, তিনি তার অনুষ্ঠান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। রাধুর মায়ের মস্তিষ্কবিকৃতিতে মা তাঁকে তিরোলের 'খ্যাপাকালী'র বালা পরিয়েছিলেন। রাধুর অসুখে যখন নলিনীদি মাকে 'উপদেশ' দেন, রাধীও পাগলের ছিট পেয়েছে, 'খ্যাপাকালীর বালা পরালে সে সেরে যাবে'—তখনও তিনি মা-কালীর পুজোর ব্যবস্থা করে রাধুকে ঐ বালা পরান।[২৫] আবার কালীমামা যখন পরামর্শ দেন, 'আমার মনে হয় কোন দৈব বা ভুতুড়ে হাওয়া লেগেছে। দিদি, তুমি ঐ বিষয় কাকেও দেখাও। সুক্ষেগেড়েতে একজন চাঁড়াল তান্ত্রিক সাধক আছে। তাকে একবার নিয়ে এস।'—মা তখনই স্বামী ঈশানানন্দ ও কালীমামাকে সেখানে পাঠান সেই তান্ত্রিক সাধককে আনতে। পরের দিন সেই তান্ত্রিক সাধক কোয়ালপাড়ায় মায়ের কাছে এলে মা তাঁকে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন এবং এমনভাবে সজল নয়নে রাধুর অবস্থা বর্ণনা করতে থাকেন যেন খুব বিপদে পড়েছেন আর ঐ তান্ত্রিক সাধক দয়া করলে তবে তাঁর সব শান্তি হবে। তান্ত্রিক সাধক রোগী দেখে ভৌতিক ব্যাপার বলেই সাব্যস্ত করেন এবং সেইমতো ওষুধ দেন।[২৬] মা রাধুর জন্য চন্ড নামাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। চণ্ডের উৎকট ওষুধও সংগ্রহ করে রাধুকে ব্যবহার করানো হয়েছিল।[২৭]

ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর প্রতি শ্রীমা শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন। এবং অপরেও যাতে এই লৌকিক দেবদেবীদের যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সেদিকেও ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। তাঁর জীবনযাত্রা লৌকিক সংস্কৃতিতে কতটা সম্পৃক্ত ছিল বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে। একবার মা রাধুর অসুখের কারণে তাকে মাদুলি পরাবেন বলে দেবতার উদ্দেশে পয়সা তুলে রাখছিলেন। এই নিয়ে কেউ-কেউ মাকে প্রশ্ন করেনঃ 'মা, আপনি কেন এরূপ করছেন? আপনার ইচ্ছাতেই তো সব হয়।' মা উত্তর দিলেনঃ 'অসুখ হলে ঠাকুরদের মানত করলে বিপদ কেটে যায়; আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।'[২৮] আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময়ও শ্রীমা প্রচলিত লোকবিশ্বাস মেনে তারকেশ্বরে 'হত্যা' দিতে গেছিলেন।[২৯]

সিংহবাহিনীর 'জাগরণে'র ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মায়ের নিজের ভাষায়ঃ 'আমার অসুখের সময়—তখন সব শরীর ফুলে গেছে—নাক কান দিয়ে রস ঝরছে। উমেশ (মায়ের ভাই) বললে, "দিদি, এখানে সিংহবাহিনী আছেন, হত্যা দেবে?" সে-ই আমাকে রাজি করে ধরে নিয়ে গেল। পূর্ণিমার রাত আমার কাছে অমাবস্যা—চক্ষে দেখতে পাই না, জল পড়ে পড়ে চক্ষু গেছে। গিয়ে মায়ের মাড়োতে পড়ে রইলুম। আবার আমাশা, তিন-চার বার হাতড়ে হাতড়ে রাত্রেই শৌচে গেলুম। ভিক্ষে-মা ছিল, ঐখানেই তার ঘর। সে মাঝে মাঝে গলা-খাঁকারি দিত,

আমি ভয় না পাই। পড়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই আমার মাকে এসে বলছেন, কামারদের একটি মেয়ের বেশে, রাধুর মতো অত বড় (বারো-তেরো বছরের) মেয়েটি, "যাও যাও, উঠিয়ে আনগে। অমন অসুখ, তাকে ফেলে রাখতে আছে? এক্ষুণি আনগে। এই ওষুধ দিও, এতেই ভাল হয়ে যাবে।"...তারপর মা যে ওষুধ পেলেন তা-ই নিলুম। আর লাউফুলের ফুট চোখে দিলুম। দিতেই যেমন জাল টেনে আনে, অমনি চোখের সব ময়লা টেনে বের করে দিলে। সেইদিনই চোখ ভাল হয়ে গেল। আর শরীরের সব ফুলো-টুলো কমে গেল। বেশ ঝরঝরে হলুম। সেরে গেলুম। যে জিজ্ঞাসা করত বলতুম, "মা (সিংহবাহিনী) ওষুধ দিয়েছেন।"' সেই হতেই মায়ের মাহাত্ম্য প্রচার হল। আমিও ওষুধ পেলুম, জগৎও ধন্য হল। আগে আগে মাকে অত কেউ জানত না।' স্বামী গম্ভীরানন্দ মন্তব্য করেছেনঃ 'সিংহবাহিনীর প্রতি শ্রীমা চিরজীবন অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি পোষণ করিতেন। তিনি বিশ্বাসভরে সেখানকার মাটি কৌটায় পুরিয়া রাখিতেন, নিজে নিত্য উহার কিছু গ্রহণ করিতেন, রাধুকে একটু একটু খাইতে দিতেন, এবং অপরকেও মায়ের মহিমা শুনাইতেন। শ্রীমায়ের এই আরোগ্যলাভ-দর্শনে আশান্বিত দূরদূরান্তরের বহু লোক মানত করিয়া সিদ্ধকাম হওয়ায় এবং দেবীস্থানের মৃত্তিকাপ্রয়োগে রোগমুক্ত হওয়ায় তথায় বহু ভক্ত আসিতে লাগিল।'[৩০] শ্রীমা একাধিক ক্ষেত্রে সাপে কামড়ানোর জন্য সিংহবাহিনীর মাটি প্রয়োগ করেছেন।

শুধু হিন্দু দেবদেবীই নয় অন্য ধর্মের দেবস্থানের প্রতিও শ্রীমায়ের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। মুসলমান ধর্মস্থানের প্রতি মায়ের ভক্তিপ্রসঙ্গে স্বামী সারদেশানন্দ একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেনঃ 'চিৎপুর ব্রিজের নিচে রাস্তার পাশেই ভূতসাহেবের দরগা বড় জাগ্রত স্থান বলিয়া পরিচিত। উদ্বোধন ও পাশের বাড়ির মেয়েরা দর্শনে যাইবেন, মা তাঁহার একটি রোগা ছেলেকে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। দরগা দর্শন করিয়া, সেখানে পূজা শিন্নি দিয়া প্রণামান্তর বাবা ভূতসাহেবের প্রসাদ রজঃ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে ছেলেটি মার হাতে সেই রজঃ প্রসাদ দিল। মা একস্থানে উপবেশন করতঃ অতি ভক্তিসহকারে সেই রজঃ মস্তকে স্বয়ং ধারণ করিয়া পাশে দণ্ডায়মান ছেলের হাতে অতি সন্তর্পণে দিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "বাবা ভূতসাহেবের প্রসাদী ধূলি গায়ে মাথায় মাখো, দেহ সুস্থ হবে, বড় জাগ্রত।" মায়ের ভক্তিভাব দেখিয়া বিস্মিত সন্তান—তাঁহার মনে তত আস্থা না থাকিলেও—মাথায় ও দেহে নাভির উপর ভক্তিভরেই মাখিলেন। মা ততক্ষণ অতীব কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "বাবা ভূতসাহেব! আমার ছেলেকে ভাল কর, বাবা!"'[৩১]

মায়ের পিলে বেড়ে যাওয়ায় মাকে কয়াপাট বদনগঞ্জে নিয়ে গিয়ে পিলে দাগানো হয়। পিলে দাগানোর সময় একটা জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়ে রোগীর পেটের নির্দিষ্ট জায়গায় ঘষা হত এবং রোগী যাতে হাত-পা ছুঁড়ে অসুবিধে সৃষ্টি না করতে পারে সেইজন্য অন্য কয়েকজন জোর করে যন্ত্রণাকাতর রোগীর হাত-পা চেপে ধরে থাকত। মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী গিয়েছিলেন। যন্ত্রণার ভয়াবহ

দৃশ্য দেখেও মা তাঁর হাত-পা ধরতে নিষেধ করলেন এবং নীরবে অসীম কষ্ট সহ্য করলেন। লক্ষণীয় এই যে, মা স্বেচ্ছায় এই আসুরিক গ্রাম্য পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।[৩২] মায়ের জীবনে এরকম ছোটখাট ঘটনা অনেক—যা প্রমাণ করে লোকায়ত সংস্কৃতির ধারায় তিনি কতটা সম্পৃক্ত ছিলেন।

গ্রামবাংলার লোকবিশ্বাস অনুসারে মা 'বারবেলা'য় বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন যাত্রার সময় ও লক্ষণ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসকেও। একবার মা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় যাচ্ছেন। মায়ের পালকি গ্রামের বাইরে রাখা হয়েছিল। কারণ গ্রামের দেবদেবীর সম্মানার্থে তিনি গ্রামের মধ্য থেকে পালকিতে উঠতেন না। তাই বাড়ি থেকে মা পায়ে হেঁটে চললেন। যাবার সময় মাথার উপর দিয়ে একটি শঙ্খচিল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। গ্রাম্য লোকবিশ্বাস অনুসারে যাত্রার সময় শঙ্খচিলের এ-জাতীয় আবির্ভাব একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ। একজন মাকে বললেনঃ 'মা, যাত্রা শুভ।' মা বললেনঃ 'হ্যাঁ বাবা।'[৩৩] এরপর মা পালকির কাছে এলে সেবক গ্রামীণ রীতি অনুসারে গামলায় জল নিয়ে তাঁর পা ধুয়ে মুছে দিলেন। যখন গ্রাম থেকে শহরে আসতেন গ্রামের মাটি মাথায় স্পর্শ করে মা বলতেনঃ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।[৩৪]

এই লোকপ্রচলিত আচার-ব্যবহারকে অনেকসময় কুসংস্কার বলে মনে হয়। তবুও মায়ের মতো যুক্তিবাদী মন এসব কেন মানছেন? মানুষের জীবন সবকিছু নিয়ে। শুধু মেরুদণ্ডের উপর যেমন মনুষ্যদেহ দাঁড়িয়ে নেই, শিরা-উপশিরা প্রভৃতি মিলিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তেমনই বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-বিচার সব মিলিয়েই মানুষের জীবন। অবতার এবং অবতার-প্রতিম পুরুষরা প্রচলিত জীবনধারাকে আপাতত বরণ করে, পরে ধীর নীরব অথচ নিশ্চিত ভাবে তাকে শুভপথে পরিবর্তিত করেন। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেনঃ I am not come to destroy, but to fulfil.[৩৫] জীবনের কোন অঙ্গকেই এঁরা বাদ দেন না। শ্রীমাও তাই প্রচলিত লোকবিশ্বাসগুলিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন—কারণ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেগুলি।

তাছাড়া, বুদ্ধি এবং যুক্তির বিচারে লোকবিশ্বাসগুলির গুরুত্ব যদিও বা অকিঞ্চিৎকর হয়, মানুষের মনের সঙ্গে সেগুলির যোগাযোগ কেউই অস্বীকার করতে পারে না। বিশ্বাসের দ্বারা ইচ্ছাশক্তির জাগরণ ঘটে। অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসের দ্বারাই দৈবী-করুণাকে নিজের জীবনে অনুভব করে। তাদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসই মনকে সক্রিয় করে তোলে, ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলে মনকে দৈবীকৃপা আবাহনের উপযুক্ত করে তোলে। এবং এই বিশ্বাস সাধারণত গড়ে ওঠে সেই বস্তুকে কেন্দ্র করে—যাকে যুগ যুগ ধরে মানুষ অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা নিবেদন করে এসেছে। বহু মানুষের বহু-দিনের সযত্ন-লালিত সেই বিশ্বাসগুলিকে শ্রীমা তাঁর আচরণের মাধ্যমে যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করতে কার্পণ্য করেননি।

তথাপি লক্ষণীয় এই যে, প্রচলিত লোকবিশ্বাসকে শ্রীমা ততক্ষণই মর্যাদা দিয়েছেন, যতক্ষণ তা ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে, যতক্ষণ তা মানুষকে শুভের পথে নিয়ে গেছে। যখনই তিনি মনে করেছেন, এই বিশ্বাস শুভের সংস্পর্শবিহীন হয়েছে কিংবা কুসংস্কারের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনই তিনি তাকে অগ্রাহ্য করেছেন। কারণ, লোকায়ত জীবনের সার্থক প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমা ছিলেন আশ্চর্য আধুনিক মনের অধিকারিণী। গ্রামীণ কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করে তিনি নিবেদিতা প্রভৃতিকে নিয়ে একসঙ্গে আহার করেন, আমজাদকে সামনে বসিয়ে নিজে পরিবেশন করে খাওয়ান, নিবেদিতাকে উৎসাহ দেন নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য, ভাইঝি রাধুকে মিশনারী স্কুলে পড়ান, অল্পবয়সী বিধবাকে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে অকারণ কৃচ্ছ্রতা না করতে পরামর্শ দেন, নরেনকে উদ্দীপিত করেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে কালাপানির পারে যেতে, 'মিশনে'র কাজকর্মকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাব বলে ঘোষণা করেন। সব জড়িয়ে তিনি অনন্যা। একদিকে তিনি লোকায়ত জীবন, রীতিনীতি ও বিশ্বাসের পরমা প্রতিমা, আবার অন্যদিকে কল্যাণদায়ী আধুনিক আদর্শের উৎসাহী সমর্থক। তাই বোধহয় নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না, নূতন আদর্শের অগ্রদূত?' তিনি উভয়ই।

দুঃখী ও অবহেলিতের মা

যিনি 'সতের মা, অসতেরও মা', যিনি 'ভালোর মা, মন্দেরও মা' সেই জননী সারদামণির অমৃতসমান জীবনকথার বৈচিত্র্যময় ঘটনাধারায় বার বার দেখি তিনি যেমন সবলের মা তেমনি দুর্বলেরও মা, আর্ত-পীড়িত-অবহেলিতের মা, আবার শোকে-দুঃখে জর্জরিত মানুষের জীবনে একমাত্র আশার আলো। তিনিই বরাভয়দায়িনী জননী। দুঃখের আঁধার রাত্রি যাঁদের জীবনে অনন্ত বাস্তব, বঞ্চনার অভিঘাতে যন্ত্রণা-বিদ্ধ জীবন যাঁদের—তাঁরাই এই 'সত্যিকারের মায়ের' কাছে পেতে পারেন নিরাপদ ও নির্ভয় আশ্রয়। শুধু সেদিন নয়, শুধু তাঁর সমকাল বা ক্ষণকালের মানুষই নয়, চিরকালের মানুষ সেই মাতৃত্বের জীবন-জাগানিয়া স্পর্শে বেঁচে উঠতে পারে, প্রাণ-মন সমর্পণ করে শুনতে পারে সেই শাশ্বত আশ্বাস: 'মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন "মা" আছেন।'[১]

তিনি 'আছেন' বলেই জগৎসংসারের তাপিত ও পীড়িত মানুষ আজও নতুন আশ্বাসে বেঁচে আছে, যেমন বেঁচে ছিলেন সেদিন। জননী সারদামণির নরদেহ ত্যাগের তখনও পাঁচদিন বাকি। রোগ-জর্জর দেহ নিয়েও তিনি অপরিমেয় দিব্য-শক্তিতে তখনও মানুষের প্রাণে জ্বালিয়ে চলেছেন নিত্য-নতুন আশার আলো। সেদিন ভক্ত অন্নপূর্ণার মা এসেছেন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে মাকে দেখতে। কাছে গিয়ে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন: 'মা, আমাদের কি হবে?' করুণাবিগলিত ক্ষীণ-কণ্ঠে সেদিনও অভয় দিয়ে মা থেমে থেমে বললেন: 'ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি?' একটু পরে আবার ধীরে ধীরে বললেন: 'তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'[২] আর্ত-পীড়িত-দুঃখী মানুষের জন্যই তাঁর এই পৃথিবীতে আসা, তাঁদের জন্যই সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের সমুদ্রমন্থন করে সবটুকু বিষ ধারণ করেছেন নিজের দেহে—আর তাই বিদায় নেওয়ার আগে শোনালেন অমোঘ বার্তা: 'জগৎ তোমার।' কিন্তু এই সঙ্কটকালে সেই বার্তা কি আমাদের মনে প্রবেশ করেছে?

আমরা তাঁকে বুঝি বা না বুঝি—তবু জানি: 'তিনি আমাদের মা।' সকলের মা। শ্রেণীবিচার নেই, জাতিবিচার নেই, নেই গোত্রবিচারও। বরং যে সন্তান দুর্বল—তার দিকেই মায়ের টান বেশী। স্বামী সারদেশানন্দ লিখছেন: মায়ের বাড়িতে কুলি, মজুর, গাড়িওয়ালা, পাল্কি-বেহারা, ফেরিওয়ালা, মেছুনী-জেলে যে-ই আসুক, সকলেই তাঁর পুত্র-কন্যা; সকলে ভক্তগণেরই মতো স্নেহ-আদর পায়। এখানে শুধু

জিনিসপত্র ও টাকাকড়ির আদান-প্রদান নয়, স্বার্থপর সাংসারিক রীতির ঊর্ধ্বে নিঃস্বার্থ প্রেমের ব্যাপার; সকলেই তা জানে। সকলেই মায়ের সন্তান, যে-কোন উপলক্ষেই আসুক, সুমিষ্ট সম্ভাষণ, স্নেহাদরে জলখাবার মুড়ি-গুড়— না হলে অন্তত একটু প্রসাদী মিষ্টি-জল পাবেই। আর সেই সকরুণ স্নেহদৃষ্টি—যা ইহ-পরকালে আর ভুলতে পারবে না, যদি বা বিস্মরণ হয়, দুঃখে-কষ্টে পড়লেই মনে হবে অভয়াকে, আর মনে পড়বে তাঁর অভয়বাণী, কৃপাদৃষ্টি![৩]

ময়নাপুরের অতি সাধারণ সেই মেয়েটির জন্মও তাই সার্থক। মাতৃস্মৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারী স্বামী সারদেশানন্দের অনুসরণে জানতে পারিঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনের জন্মস্থান ঐ ময়নাপুর গ্রাম।[৪] তখন তিনি অসুস্থ। নিজে মাতৃ-দর্শনে জয়রামবাটী যেতে পারেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের সেবায় কিছু কিছু জিনিস পাঠাতেন। সেবার একটি 'নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মেয়ের' হাতে অক্ষয়কুমার সেন মায়ের জন্য কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়েছেন। মা তাকে স্নেহ-সমাদর করে বিশ্রাম ও স্নানাহারের পর স্বগ্রামে ফিরে যেতে বললেন। তেল মেখে স্নান করে পেট ভরে প্রসাদ পেয়ে ময়নাপুরের 'মুটে মেয়েটি পরমানন্দিত'। বেলা গিয়েছে দেখে মা তাকে অবেলায় চলে যেতে নিষেধ করে রাত্রেও বিশ্রাম করে যেতে বললেন। মায়ের ঘরের বারান্দায় দরজার পাশেই তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। মেয়েটির বয়স হয়েছিল —বৃদ্ধাই বলা চলে। ম্যালেরিয়ার রোগী—অনেক দূর থেকে হেঁটে বোঝা বহন করে এনেছে। খুব ক্লান্ত। তার উপর আবার জ্বরও হয়েছে। মা ভোররাত্রেই ওঠেন— বরাবরের অভ্যেস। দরজা খুলেই বুঝলেন অসুস্থ মেয়েটি নিজের অজান্তেই বিছানা নোংরা করে ফেলেছে। কি উপায়? অন্যেরা ঘুম থেকে উঠে টের পেলে তাঁর দুঃখিনী মেয়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হবে। শেষপর্যন্ত মিষ্টি কথায় প্রবোধ দিয়ে চুপি চুপি জলপানির জন্য মুড়ি-গুড় হাতে দিয়ে বললেনঃ 'মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে রোদে কষ্ট হবে না।' সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করে বিদায় নিলে মা স্বহস্তে সব পরিষ্কার করলেন।[৫]

এই আমাদের মা। অবহেলিতের মা। আর্ত-পীড়িতের মা। সকলের মা। তাই তিনি গোবিন্দেরও মা।

জয়রামবাটীতে মায়ের নতুন বাড়ি হওয়ার পর স্বামী জ্ঞানানন্দ মায়ের জন্য দুটি ভাল গাই-গরু কিনে আনেন। সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মশাই গরুর খরচ বহন করেন। ঘটনাচক্রে এই গাই-গরু দুটি দেখাশোনার জন্য গোবিন্দকে নিয়োগ করা হল। গোবিন্দকে কেউ বলে রাখাল, কেউ বলে বাগাল। অল্পবয়সে মা-বাপ মারা যাওয়ায় খুবই দুঃখের মধ্য দিয়ে গোবিন্দ বড় হয়েছে। তার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় তাকে মায়ের বাড়িতে এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মাইনে সামান্য, কিন্তু খাওয়া-পরাসহ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে। নয়-দশ বছরের বালক নিজের কাজকর্ম ভালই করে এবং মায়ের স্নেহ-আদরে বেশ সুখেই তার দিন কাটে। কিছুদিন পরেই তার শরীরে

খোস-পাঁচড়া দেখা দিল, চিকিৎসা-ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হল। কিন্তু তাতে বিশেষ উপকার হল না। একদিন রাত্রে গোবিন্দের ভীষণ যন্ত্রণা। অসহায় বালক খোস-পাঁচড়ার যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল। আর সে সহ্য করতে পারছে না। সেদিন রাত্রে কোনরকমে তাকে রাখা হল। পরদিন ভোর হতে না হতেই মা তাকে বাড়ির ভিতর ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর নিজের হাতেই শিলনোড়াতে নিমপাতা-হলুদ বাটতে শুরু করলেন। বিস্মিত গোবিন্দ মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। মা কিছুটা বাটেন, আর গোবিন্দের হাতে দিয়ে বলেন, কিভাবে সেটা লাগাতে হবে। মাতৃহীন বালক মাতৃ-স্নেহের অপার করুণাঘন স্পর্শে যেন নতুন জীবন ফিরে পায়। 'উভয়ের মুখ দেখিয়া কথাবার্তা শুনিয়া কে বুঝিবে—নিজের ছেলে নয়? "আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং" দেখা, "পরকে আপন করা"-শিক্ষা দিবার জন্যই তো তুমি এসেছ, মা!'[৬]

আবার ভুবনমোহন গুহের মতো মানুষ—তিনিও তো 'অহৈতুকী কৃপার' মাধুর্যে ফিরে পেয়েছেন নতুন জীবন। তখন নিতান্তই সাধারণ যুবক, কলেজের ছাত্র তিনি। সেটা ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তিনি ও তাঁর এক বন্ধু কলকাতার চেতলা থেকে রওনা হলেন জয়রামবাটী। যাওয়ার সময় মায়ের জন্য কি নিয়ে যাবেন? তিনি লিখছেনঃ 'এক পুকুরের পাড়ে কে যে আমরুলির বাগান করে রেখেছে, এত শাক! আমরা সেই শাক তুলে, ধুয়ে, কলাপাতায় মুড়ে মায়ের জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম।'

জয়রামবাটীতে গিয়ে পৌঁছালেন দুই বন্ধু। যেতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি লিখছেনঃ 'দেখলাম, শ্রীশ্রীমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।...আমাদের এই মাকে প্রথম দর্শন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। আগে মায়ের কোন ছবিও দেখি নাই, এমনকি, তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পত্নী বলেও জানতাম না।' তবুও মা এই একান্ত অপরিচিত সাধারণ দুটি কলেজের ছাত্রকে সেদিন বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন। ভুবনমোহন গুহ লিখছেনঃ 'দীক্ষার পর মা মুড়ি ও কিছু ভাজা খেতে দিলেন—"বাবা এদেশে তো কিছু পাওয়া যায় না, মুড়ি খাও, পরে অন্নপ্রসাদ পাবে।" ...আজ স্তম্ভিত হই, যখন ভাবি,—যে-মায়ের কথা কখনও আগে শুনিনি, তাঁর ছবিও দেখিনি, দীক্ষা কি তাও জানি না—তাঁর কাছে দূর-দুর্গম রাস্তা সঙ্গীবিহীন পেরিয়ে কেন উপস্থিত হলাম। শুধু মনে হয় আমরা তো তাঁর কাছে যাইনি, তিনি নিজেই অপার করুণায় আমাদের তাঁর পায়ে টেনে নিয়ে জন্ম সার্থক করে দিয়েছেন।'[৭] এমনি কত অজানা, কত অচেনা মানুষদের কাহিনী—যাঁরা নিজেদের অবহেলিত বা শোকার্ত জীবনে ফিরে পেয়েছেন নতুন করে বেঁচে ওঠার, মানুষ হয়ে ওঠার আশ্বাস। ডাকাতবাবা বা আমজাদের কাহিনী তো সর্বজন-পরিচিত, বহু-আলোচিত। কিংবা বিষ্ণুপুর স্টেশনের এক সাধারণ বিহারী কুলি—যে কিনা মাতৃদর্শনে অভিভূত হয়ে সারদামণির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল জানকী-মাকে, যাকে মা এক পলকের পরিচয়েই স্থান দিয়েছিলেন নিজের পদপ্রান্তে—সেসব ইতিবৃত্তও আজ আর অজানা নেই। তবুও কি সব জানা হয়ে গেছে? এখনও কত অজানা ঘটনা রয়েছে মানুষের স্মৃতিভাণ্ডারে—তার সন্ধান রাখেন কতজন?

শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর ডঃ গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল সেরকমই এক অকথিত কাহিনী জানিয়েছেন। ডঃ মণ্ডলের বড় দাদা বিজয় মণ্ডল এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডঃ মণ্ডলের এক দাদা ভূদেবচন্দ্র মণ্ডল লিখছেনঃ এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে তাঁর মা মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। তিনি কোন-মতেই পুত্রশোক ভুলতে পারছিলেন না। সেই যন্ত্রণার কাহিনী নিজেই বলেছেনঃ 'আমি নিজেকে কোনমতেই শান্ত করতে পারছিলাম না। শেষে তীর্থে যাওয়া মনস্থ করলাম। জগন্নাথ দর্শনের জন্য আমি শ্রীক্ষেত্র যাবার কথা স্থির করলাম। শ্রীক্ষেত্র যাবার মানসে আমি বিষ্ণুপুর স্টেশনে উপস্থিত হয়েছি, এমন সময়ে দেখলাম, অদূরে সারদা মা স্টেশনে বসে আছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাবেন। আমাকে অতি বিমর্ষ দেখে সারদা মা আমার কাছে আসেন এবং বলেন, মা, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' এই অন্তরস্পর্শী সুধাবচনে পুত্রহারা জননীর বুকে যেন শোকের সাগর উত্তাল হয়ে উঠল। জগৎ-জননীকে পুত্রশোকাতুরা এই জননী নিজ দুঃখের কথা বললেন। জগৎ-জননী সমস্ত শুনে বললেনঃ 'আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।' পুত্রহারা জননী বললেনঃ 'আমার গুরু তো আছেন; আমি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত, আপনার মন্ত্র আমি কি করে নেব? আমি তা তো নিতে পারব না।' একথা শুনে মা সারদা বললেনঃ 'তা হোক, তুমি গুরুর মন্ত্র আগে জপ করবে, তারপর আমার মন্ত্র জপ করবে।'

তার পরের ঘটনা বিজয় মণ্ডলের জননী নিজেই বলছেনঃ 'তখন বিষ্ণুপুর স্টেশনে একান্তে একটি গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে মা সারদা আমাকে মন্ত্র দেন। এর বেশ কিছুদিন পর আমার শোক অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। সারদা মা আমার বাড়িতে আসেন আমার খোঁজ নিতে। আমি পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে তাঁকে ঘরে বসাই এবং তাঁর সেবা করি।' ভূদেবচন্দ্র বলছেনঃ 'মায়ের কাছে একথা শুনতে শুনতে সারদা মা যে কত করুণাময়ী ছিলেন এবং পরের দুঃখে যে তাঁর প্রাণ কতখানি বিগলিত হত, সেকথা সহজেই বুঝতে পারি।' [৮]

এরকম আরও কত প্রাণস্পর্শী ঘটনা, কত অসংখ্য কাহিনী। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র বা পদ্মবিনোদের প্রতি অপার করুণার কথা আজ সর্বজনজ্ঞাত, যেমন সর্বজনজ্ঞাত সেই কাহিনীও, যেখানে মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে শুধু মাতৃসম্বোধনে বদ্ধ হয়ে এক দুশ্চরিত্রা নারীর হাত দিয়ে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ন পাঠাতেও দ্বিধা করেননি।

এই যেমন একদিকের জীবন্ত ছবি, অন্যদিকে তেমনই 'মূক যারা দুঃখে-শোকে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে'—সেই চিরকালের অবহেলিত মানুষও মাতৃ-সন্নিধানে এসে ফিরে পেয়েছে নিজের অপহৃত সম্মান, ফিরে পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এমনই কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। একদিন মা কোয়াল-পাড়ার জগদম্বা আশ্রমে তেঁতুলতলায় চৌকির উপর বসে আছেন, এমন সময় পল্লীর এক ডোমের মেয়ে এসে কেঁদে নালিশ করল, তার উপপতি হঠাৎ তাকে ত্যাগ করেছে। মেয়েটি এই উপপতির জন্যই ঘর-সংসার সব ছেড়েছিল—এখন সে সম্পূর্ণ নিরুপায়। মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে শ্রীশ্রীমা ঐ ডোমকে ডেকে আনালেন। তারপর

স্নেহপূর্ণ মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললেনঃ 'ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে; এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে—নরকেও স্থান পাবে না।' মায়ের কথায় লোকটির মন গলল এবং সে মেয়েটিকেও বাড়ি নিয়ে গেল।[৯]

শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ জাতি-বর্ণ, দোষগুণ, সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না। যে তাঁর কাছে এসে পড়ত, চাইত আশ্রয়—মা তার দোষ বা দুর্বলতা জানলেও তাকে অকাতরে স্নেহ করতেন, আশ্রয় দিতেন, সাহায্য করতেন, শোকে-দুঃখে প্রাণঢালা সহানুভূতি দেখাতেন এবং অপরকে ওরকম করতে শেখাতেন। তাঁর সেই অকৃত্রিম মাতৃত্বের প্রভাবে দুশ্চরিত্র লোকেরও স্বভাব পরিবর্তিত হত, দস্যুও পরিণত হত ভক্ততে।

জয়রামবাটীর কাছেই শিরোমণিপুরে বহু মুসলমানের বাস। তারা একসময় তুঁতের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বিদেশী রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তুঁত চাষ বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ তুঁতে চাষী নিরুপায় মুসলমানরাই চুরি-ডাকাতি আরম্ভ করে। শেষপর্যন্ত জননী সারদামণির উদার ভাব এবং অপার করুণায় সেই কুখ্যাত 'তুঁতে ডাকাতদের' জীবনেও দেখা দেয় পরিবর্তন। গ্রামের মানুষ অবাক বিস্ময়ে বলেঃ 'মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল রে!'[১০]

এই যে সামাজিক রূপান্তর—এটি ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমিত হলেও আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়নি। কিংবা এই মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি কোন মন্ত্রবলেও। এর পিছনে ছিল জননীর অপার উদার ভাব—যা মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ ঘটাতে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বিষয়টিকে স্পষ্টতর করার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা এনে বললঃ 'মা, ঠাকুরের জন্য এইগুলি এনেছি, নেবেন কি?'

মা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বইকি?'

মায়ের জনৈক স্ত্রীভক্ত সেখানে ছিলেন। তিনি বললেনঃ 'ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?'

মা সে-প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে কলাগুলি তুলে রাখলেন এবং মুসলমানকে মুড়ি-মিষ্টি দিতে বললেন। সে চলে গেলে মা সেই ভক্তটিকে তিরস্কার করে গম্ভীরভাবে বললেনঃ 'কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।'[১১] তিনি বলতেনঃ 'দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে কজনে।'[১২]

মা তা জানতেন বলেই আজ তিনি বিশ্বজননী। তাই 'সাতবেড়ে গ্রামের লালু জেলের'[১৩] গান শোনানোর আবদার অতি সহজেই প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেন

তিনি। আবার জয়রামবাটীর চৌকিদার অম্বিকাকেও[১৪] নিজের দাদার আসনে গ্রহণ করতে পারেন একান্ত আপনজন হিসেবে। 'জীবই শিব'—এই তত্ত্ব ব্যাপক ও বৃহৎ অর্থে তিনি নিজের জীবনে সপ্রমাণ করেছিলেন। আর সেইজন্যই চিরকালের অবহেলিত মানুষের সুপ্ত ও ম্রিয়মাণ হৃদয়ে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন দেবত্বের সম্ভাবনা। তাই দেখি প্রচণ্ড জল-ঝড়ের মধ্যেও শিহড় গ্রামের সেই পাগলটা সাঁতার কেটে ভয়াবহ নদী পার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে মায়ের জন্য একবোঝা সজনে শাক নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।[১৫]

মায়ের আর একজন দীক্ষিত ভক্ত—জাতে যুগী, তাই তার চলাফেরায় বড়ই সঙ্কোচ। এটা মায়ের চোখেও পড়েছে। একদিন তিনি ঐ যুগী ভক্তকে ডেকে বললেনঃ 'তুমি যুগী বলে সঙ্কোচ করছ? তাতে কি, বাবা? তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।'[১৬] এখানেই শেষ নয়, সেই কুণ্ঠিত ভক্তের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলার জন্য বললেন, দীক্ষাদানকালে তিনি তো কি জাতি এ-প্রশ্ন করেননি। জাতবিচার করেননি। এ থেকেই বুঝে নেওয়া উচিত, তিনিও মায়েরই ঘরের ছেলে।

এরকম কত ঘটনা। একবার মহাষ্টমীর দিন ভক্তরা সবাই শ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিচ্ছেন। মায়ের নজরে পড়ল, শুধু একজন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। মা তাঁকে ডাকলেন, তাঁর কাছ থেকে জানলেন, বাড়ি তাঁর তাজপুরে, জাতিতে তিনি বাগদি। তাই, ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিলেন না। যিনি দুর্বলের বুকে সাহস সঞ্চার করতেই এসেছিলেন, যিনি বেদনা-জর্জর বুকের পাঁজরে বজ্রের শক্তি সঞ্চার করতেই মানবী-বেশে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি তো জাতপাতের সঙ্কীর্ণতাকে ভেঙে চুরমার করার ব্রত পালন করেই আজ বিশ্বজননী। মা সেই বাগদিকে ভিতরে এসে পায়ে ফুল দিতে বললেন। মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে তিনি প্রণাম করলেন।[১৭] চরণ-পূজা করে তাঁর প্রাণের আর্তি পূর্ণ হল।

করুণাময়ী জননীর অপরূপ জীবনকথার পাতায় পাতায় দুঃখীজনের নিত্য আনাগোনা। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। চারদিকে নানা সঙ্কটের কালো ছায়া, প্রচণ্ড সঙ্কট জামা-কাপড়েরও। এই সঙ্কটের করালগ্রাস থেকে নিভৃত পল্লীজীবনও মুক্ত নয়। সেদিন সকাল দশটার সময় দেশড়াগ্রামের বৃদ্ধ হরিদাস বৈরাগী এলেন মায়ের কাছে। হরিদাসের গান শুনে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। এমনকি গিরিশ-চন্দ্রের মতো একজন খ্যাতনামা মানুষও এই বৈরাগীর গুণগ্রাহী। হরিদাসকে মা তেল মেখে স্নান করতে বললেন। স্নানান্তে করলেন প্রসাদের ব্যবস্থা। কথায় কথায় সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মায়ের কাছে নিবেদন করলেনঃ তাঁর পরিধেয় বস্ত্র নেই। শ্রীমা সকালে স্নানান্তে নিজের কাপড়খানি উঠোনে শুকোতে দিয়েছিলেন। কাপড়টি একেবারেই নতুন—মাত্র দু-একদিন মা পরেছেন। বৃদ্ধের বস্ত্রাভাবের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাপড়টি উঠোন থেকে তুলে এনে তাঁকে দিলেন। হরিদাস এই অপ্রত্যাশিত মাতৃস্নেহে বিহ্বল হয়ে অশ্রুসিক্ত-নয়নে সেই স্নেহের দান মাথায় ঠেকিয়ে বিদায় নিলেন।[১৮]

বাগবাজারে 'উদ্বোধন' কার্যালয়—যা এখন 'মায়ের বাড়ি' বলেই সর্বজনে পরিচিত—সেই উদ্বোধনের সাধারণ একজন কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্ত মায়ের করুণাধারায় অবগাহন করে অক্ষয় জীবনের অধিকারী। নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় কলকাতায় এসেছিলেন তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে। পূর্ববঙ্গে নিজের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন সবাই ছিল—যাদের ভরণপোষণের জন্যই তিনি কলকাতা শহরে সেদিন অনশনে অর্ধাশনে পথে পথে ঘুরছিলেন। তাঁর ভাগ্য ছিল ভাল, জীবন হয়েছিল ধন্য। তিনি মায়ের বাড়িতে একটা কাজ পেয়ে গেলেন। এমনই ভাগ্যবান ছিলেন তিনি যে, মায়ের ফাই-ফরমাশ যেমন খাটেন, তেমনি পান জননী সারদার স্নেহাদর। হঠাৎ একদিন খবর এল কীর্তিনাশা পদ্মা চন্দ্রবাবুর বাড়িঘর সব গ্রাস করেছে। তাঁর পরিবার সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—মাথা গোঁজারও স্থান নেই। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে চন্দ্রবাবু দিশেহারা হয়ে পড়লেন—কি করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। পাগল হওয়ার জোগাড়। আহারনিদ্রা ভুলে গেলেন। খবরটা এক সময় জননী সারদার কানেও পৌঁছাল। মা প্রিয় সন্তান চন্দ্রের বিপদের কথা জেনে বিষম ব্যথিতা হলেন এবং একান্ত গোপনে চন্দ্রকে তিনশ টাকা দিয়ে বললেনঃ 'দেশে গিয়ে ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এস।' স্মরণে রাখা প্রয়োজন, সেসময় তিনশ টাকার অর্থমূল্য বহুগুণ বেশী ছিল।

এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্বামী সারদেশানন্দ বলেছেনঃ মায়ের সেই অহেতুক কৃপার কথা ভক্তিবিগলিত চিত্তে বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে চন্দ্রদা বহুবার আমাদের শুনিয়েছেন। এরকম কত বিচিত্র ঘটনা যে উদ্বোধনে ঘটত, তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন স্বভাবের বহু সন্তানকে স্নেহশৃঙ্খলে বদ্ধ করে স্বল্পপরিসর উদ্বোধনের বাড়িতে যে অদ্ভুত সমাবেশ মা সৃষ্টি করেছিলেন, তা দেখে মনে হয় 'সর্বস্য হৃদি সংস্থিতে' মহামায়া![১৯] তিনিই আবার লিখছেনঃ উদ্বোধনের কর্মচারী, ঝি চাকর বামুন সকলেই মায়ের সন্তান—মায়ের স্নেহের সম-অধিকারী, তাদেরও সকলের জন্য মায়ের সমান ভাবনা।[২০]

কার জন্য ভাবেননি মা? যার জন্য কেউ ভাবে না, কেউ ভাবেনি—সেই অসহায়া অনাথের জন্যও মাতৃবক্ষের পাঁজর ভেদ করে উঠেছে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়। 'বহুজন-হিতায়, বহুজনসুখায়' আজ যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছে, সেই আন্দোলনের মূল ভাবটিও মা তাঁর নিজের জীবনেই প্রমূর্ত করে দিয়েছেন। বহু মানুষের দুঃখের অনল নিজের বক্ষে ধারণ করেছেন অক্লেশে, সেই-সঙ্গে তাদের জীবনে জ্বালিয়ে দিয়েছেন প্রাণের প্রদীপ। যেমন সেদিন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী-সন্তানদের জীবনে।

স্বামী ঈশানানন্দ সেদিনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেনঃ সকালে কিছু আনাজপাতি, পূজার ফুল ইত্যাদি নিয়ে বেলা নটা নাগাদ কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটী পৌঁছে শুনলাম, মা বাঁড়ুজ্যেদের বাড়িতে গেছেন। সময়টা হচ্ছে ১৩২৪ সালের (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাস। কিছুক্ষণ পরে মা সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, বাঁড়ুজ্যেদের একটি অনাথা বিধবার (*রাজেন্দ্রবাবুর স্ত্রী) কানের

মধ্যে ঘা হয়েছে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। অথচ ভদ্রমহিলার থাকার মধ্যে আছে কেবল একটি নাবালক ছেলে। কে চিকিৎসা করবে, দেখবেই বা কে? সময়মতো চিকিৎসা না হওয়ায় কানের ভিতর ঘা পচে গিয়ে বড় বড় পোকা হয়েছে, দুর্গন্ধে কেউ কাছেও যেতে পারে না। ঐ সহায়হীন বিধবার জন্য আর কেউ না থাকলেও মা সারদা আছেন। তাই তিনি সকালে নিমপাতার জল গরম করে নিয়ে একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করে গেলেন এবং পিচকারি দিয়ে ঘা ধুইয়ে ফিরে এলেন।

স্বামী ঈশানানন্দ বলছেনঃ বেলা অনেক হয়েছে। মা তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে ঠাকুরপূজা সেরে আমাকে প্রসাদ ও জল খেতে দিলেন এবং স্ত্রীলোকটির অবস্থার কথা সব জানিয়ে বললেনঃ 'আচ্ছা, তোমরা কোয়ালপাড়া আশ্রমে মাঝে মাঝে অসহায় রোগীদের রেখে সকলে সেবা-শুশ্রূষা কর। আহা, কেদারকে বলে তোমরা যদি বাঁড়ুজ্যেদের বিধবা বউটিকে নিয়ে গিয়ে সেবা কর তো তার বড় উপকার হয়। দেখবার কেউ নেই। যত্নের অভাবে ঘায়ের দুর্গন্ধে কাছে কেউ যায় না। নাবালক ছেলেটিরও কী কষ্ট, বাবা!'

মায়ের ঐ বুকভরা যন্ত্রণা যেন স্বামী ঈশানানন্দের প্রাণে গিয়েও আঘাত করল। তিনি আর দেরি না করে তখনই কোয়ালপাড়া চলে গেলেন। তারপর কেদার মহারাজের কাছে সব জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে কেদার মহারাজ বললেন পালকি ঠিক করতে। কিন্তু পালকি না পাওয়ায় একটা গরুর গাড়ি ঠিক করা হল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঐ গরুর গাড়ি নিয়ে স্বামী ঈশানানন্দ জয়রামবাটী রওনা হলেন। পথ যদিও বেশী নয়, কিন্তু সেযুগে সেই সংক্ষিপ্ত পথও ছিল দুর্গম। নদী পার হয়ে শিরোমণিপুর শিহড় ঘুরে যখন তিনি জয়রামবাটী পৌঁছালেন, তখন সকাল হয়ে গেছে।

তাঁদের দেখে মা সারদা খুব খুশী হলেন, বললেন, তোমরা বেশ করে মুড়ি খেয়ে বউটিকে নিয়ে রওনা হও। তা না হলে কোয়ালপাড়া পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে।

সেযুগে তো গ্রামাঞ্চলে স্ট্রেচার ছিল না। তাই একটা তক্তা জোগাড় করে তাতে রোগীকে শুইয়ে এনে গরুর গাড়িতে তোলা হল। মা সারদা একটু গরম দুধ নিয়ে এলেন, রোগিনীকে খাওয়ালেন—তারপর সেই শাশ্বত জননীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল আশ্বাসবাণী, সান্ত্বনার কথা। অবশেষে জানালেন বিদায়।

শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা—জলকাদায় একেবারে ভয়াবহ। সেই সাত-আট মাইল রাস্তা পার হয়ে কোয়ালপাড়া আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখানে পৌঁছেই গ্রামের এক ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। তিনি এসে সম্ভবমতো ওষুধ দিয়ে ঘা বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মাথার ভিতর পর্যন্ত ঘা, নাক-মুখ দিয়েও বড় বড় পোকা বেরিয়ে আসছিল, দুই কান দিয়েই পুঁজ-রক্ত পড়ছে—খুবই দুর্গন্ধ।

এ-ও যেন সেবাধর্মে দীক্ষিত সেই নবীন সন্ন্যাসীদের এক পরীক্ষা-ক্ষেত্র, ভাবী-কালের সেবাব্রত পালনের পটভূমিকা। কোয়ালপাড়া আশ্রমের সন্ন্যাসী-কর্মীরা দিনরাত এই নতুন পূজা-অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করলেন। আর্ত-পীড়িতের মধ্যেই শুরু হল ঈশ্বর-সাধনা।

কিন্তু শেষপর্যন্ত সব চেষ্টাই বিফল হল। সেই অনাথা রমণী যন্ত্রণার সমুদ্র পেরিয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন।

এবার সৎকার ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাই বাঁড়ুজ্যেদের খবর দেওয়ার জন্য জয়রামবাটী গেলে মা সারদা অশ্রু-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুনলেন সেই অভাগিনীর শেষ যন্ত্রণার কাহিনী। তারপর বললেনঃ 'আহা! তোমরাই তার ছেলের কাজ করলে, বাবা। এখানে থাকলে মুখে একটু জলের অভাবেই মারা যেত।'[২১]

দুঃখী-জনের বেদনায় জননী সারদামণি যে কিভাবে জর্জরিতা হতেন—তা বোঝার জন্য আমরা স্বামী ঈশানানন্দ কথিত আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারিঃ

সেটা ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। শীতকাল। সেদিন স্বামী সারদানন্দ পুরী থেকে জয়রামবাটীতে মাকে একটি পত্র দিয়েছেন—মা সেই পত্রটি শ্যামবাজারের প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়কে পড়তে দিলেন। পত্রটি বড়—তিন-চার পৃষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সেসময় উড়িষ্যায় ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকটি অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র খুলে ক্ষুধার্তের অন্নদান-সেবার ব্রত পালন করছিল। স্বামী সারদানন্দ ঐ পত্রে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে মানুষের দুঃখকষ্টের প্রাণস্পর্শী বিবরণ যেমন দিয়েছেন তেমনি মিশন সীমিত সাধ্য নিয়ে কিভাবে সেবাব্রত পালন করছে, তারও বর্ণনা দিয়েছেন। আর সেইসঙ্গে মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন, যাতে মানুষের অসহনীয় দুঃখকষ্টের অবসান হয়।

তিনি ঐ পত্রে আরও লিখেছেন, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের ব্যাপক অভাবের তুলনায় মিশনের সাহায্য অতি সামান্য—কিভাবে এর প্রতিবিধান হবে, সেটাই একটা সমস্যা।

স্বামী ঈশানানন্দের লেখা অনুসরণে দেখি, মা ঐ চিঠি পড়া শুনছেন আর অবিরাম চোখের জল ফেলছেন এবং বলছেনঃ 'ঠাকুর, লোকের দুঃখকষ্ট আর দেখতে শুনতে পারিনে। তাদের দুঃখজ্বালার অবসান কর।'

তারপরই প্রবোধবাবুকে বলছেনঃ 'প্রবোধ, শরতের দিল দেখলে? যেন বাসুকি—যেখানে জল পড়ে, শরৎ আমার সেখানেই ছাতা ধরে। শরতের মতো অমন দিলদরিয়া লোক, জীবের দুঃখে এত প্রাণ-কাঁদা—সকলকে পালন করছে, অন্নদান করছে, যেন পালনকর্তা! ঠাকুর, রাশ ঠেলে দাও, সকলকে দেবার জন্যে তার দুহাত ভরে দাও।'

জীবের দুঃখে আত্মহারা, দুঃখী-জনের আর্তনাদে দিশেহারা মা সারদা আপনমনে এইকথা বলছেন, আর চোখের জল দুহাত দিয়ে মুছছেন।[২২]

কারণ তিনি যে দুঃখী-জনের মা। জগতের মা। সবাকার মা।

তাইতো দেখি তাঁর অপার অনন্ত করুণাধারায় অবগাহন করে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে কত অভাজন। দুর্গাপুরী দেবীর অনুসরণে আমরা জানতে পারি সেই ভাগ্যবান সাপুড়ের বৃত্তান্তঃ

সেদিন একদল সাপুড়ে ডুগডুগি বাজিয়ে জয়রামবাটীর পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে তারা এসে পৌঁছাল মায়ের বাড়ির কাছেই। ডুগডুগির শব্দ মায়ের কানেও গিয়েছে—তিনি নিতান্তই একটি বালিকার মতো সাপের খেলা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সাপুড়েদের ডাকাবেন কাকে দিয়ে? কাছে-পিঠে কেউ তো নেই। শেষপর্যন্ত নিজেই এগিয়ে গিয়ে সাপুড়েদের ডেকে নিয়ে এলেন। সাপুড়েরা খেলা

দেখালে কত নেবে—তা ঠিক না করেই তিনি ওদের বললেনঃ তোমরা ভাল করে খেলা দেখাও, আমি তোমাদের খুশী করে বখশীশ দেব।

ডুগডুগির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের মানুষ এসে ভিড় করল সাপের খেলা দেখতে। বাঁশী বাজিয়ে মনের আনন্দে সাপুড়েরা অনেক রকম খেলা দেখাল। খেলা শেষ হলে মা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের দুটি টাকা, একটা কাপড় এবং মুড়ি-গুড় খেতে দিলেন।

মাতৃস্নেহে ধন্য সাপুড়েরাও খুবই অভিভূত। বিদায়কালে ওদের দলপতি মায়ের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করল। মা-ও কোন সঙ্কোচ না করে সেই সাপুড়ে-সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

এই দৃশ্য দেখে মায়ের এক ভ্রাতৃবধূ রীতিমতো অসন্তুষ্ট হলেন, বললেনঃ 'সাপুড়েকে টাকা দিয়েছ, কাপড় দিয়েছ, খেতে দিয়েছ, এই তো বেশ। ওদের আবার ছোঁয়া কেন বাপু!'

জননী সারদা কাঁচুমাচু হয়ে বললেনঃ 'কি করি বলো? লোকটা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, আমি কি করে বারণ করি? প্রণামই যদি করলে, আর আমি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবোনি? তোমাদের এ কেমনতর কথা!' [২৩]

সেই যে আশীর্বাদ—যা জাতিগোত্রের কোন বন্ধন মানেনি, যা ডাকাত আমজাদ থেকে শুরু করে এক অন্ত্যজ সাপুড়ের মাথায়ও হয় অঝোরে বর্ষিত—সেই চিরকালের এবং অনন্তকালের আশীর্বাদ আজও গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের মতোই করুণা-ধারায় প্রবাহিত। দুঃখী-জনের জীবনে, আর্ত-পীড়িতের যন্ত্রণায়, অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া হতাশা-জর্জর প্রাণে সেই আশীর্বাদই নতুন করে বেঁচে ওঠার একমাত্র আশ্বাস।

বাংলা ১৩২৭ (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) সালের সেই ৪ শ্রাবণ—আকাশের মেঘে মেঘে সঞ্চারিত হয়েছিল বাষ্পরুদ্ধ অশ্রুধারা—মা তাঁর নরদেহ ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত। স্নেহের কাঙাল যে অসংখ্য মানুষ, ভালবাসার ভিখারি যে হাজার হাজার প্রাণ—সেদিন সবাই সবকিছু হারাবার আশঙ্কায় রুদ্ধবাক্।

কিন্তু মা—চিরকালের মা, সকলের মা—সেই দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবের কথা সেদিনও বিস্মৃত হননি। তাই বিদায় নেওয়ার কয়েকদিন আগেই চিরকল্যাণময়ী মা অতি করুণার্দ্রকণ্ঠে মহাকালের বুকে ছড়িয়ে দিলেন আশীর্বাদের ফুল, বললেনঃ 'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, —আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।' [২৪]

আর আছে বলেই তো দুঃখী ও আর্ত মানুষ আজও দুঃখের সমুদ্র ডিঙিয়ে বেঁচে ওঠার দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয় যেখানে জননী করুণাময়ীর আশীর্বাদই তাদের একমাত্র সম্বল।

সারদাদেবী : ভারতের মাতৃসাধনার পরমা সিদ্ধি[১]

ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় জননী-রূপ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মাতৃভাব সাধনার শেষ কথা।[১] স্বয়ং শ্রীশ্রীমাও বলেছেন: 'জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়।...শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়।'[২] ঈশ্বর আছেন বলেই জীব-জগৎ। জীব-জগৎ আছে বলেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। যতক্ষণ 'আমি' আছি ততক্ষণ ঈশ্বর-জীব-জগৎ আছে। 'আমি'র লোপ হলে ঈশ্বর-জীব-জগৎ লোপ হয়। তখন সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদশূন্যা মা একমাত্র সদ্‌বস্তু। মানুষে মানুষে সজাতীয় নাম-রূপের ভেদ, মানুষ আর অন্য জীবের বিজাতীয় ভেদ, আর জীবাত্মা-পরমাত্মার স্বগত ভেদ সব চলে গিয়ে যখন বোধ হয় আমি সেই 'বড় আমি', এখানে সেই অবস্থার কথা মা বলছেন। ঠাকুর আর মা এই ভেদরহিত ভাব বা মাতৃভাব নবরূপে উপলব্ধি করেছেন, আর কত নরনারী তাঁদের নির্দিষ্ট পথে সেই অনুভূতি পেয়েছেন।

স্বামীজী বলেছেন: 'মাতৃ-উপাসনা একটি স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের অনুভূত বিবিধ ধারণার মধ্যে শক্তির স্থান সর্বপ্রথম। প্রতি পদক্ষেপে ইহা অনুভূত হয়। অন্তরে অনুভূত শক্তি—আত্মা, বাহিরে অনুভূত শক্তি—প্রকৃতি। এই দুই-এর সংগ্রামই মানুষের জীবন। আমরা যাহা কিছু জানি বা অনুভব করি, তাহা এই দুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মানুষ দেখিয়াছিল, ভাল এবং মন্দ—উভয়ের উপর সূর্যের আলো সমভাবে পড়িতেছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ এক নূতন ধারণা—এক সার্বভৌম শক্তি সব কিছুর পশ্চাতে। এই-ভাবেই মাতৃভাব উদ্ভূত। সাংখ্য-মতে ক্রিয়া প্রকৃতির ধর্ম, আত্মা বা পুরুষের নয়। ভারতে নারীর সর্ববিধ রূপের মধ্যে মাতৃমূর্তি সবার উপরে।...বর্তমানে মাতৃ-উপাসনা উচ্চস্তরের হিন্দুদের সাধনার প্রধান অঙ্গ।'[৩]

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যের মূলকথা: ব্রহ্ম ও তাঁর মায়াশক্তি অভিন্ন। তেমনই সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ্য। তন্ত্রের শিব আর কালী অবিচ্ছেদ্য। ঠাকুর বলছেন, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ করা যায় না অথবা সাপকে ছেড়ে তার তির্যক গতি ভাববার যো নাই তেমন ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তিকে ভিন্ন বলা যায় না। ঈশ্বর ও ঐশী শক্তির মধ্যে কোন ভেদ-কল্পনা ঠিক নয়। চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাশক্তিময়ী চৈতন্যসত্তার স্বরূপের মধ্যে দুটি ভাবের মিলন। একটি আত্মসমাহিত ভাব আর একটি বিচিত্ররূপ লীলায়িত ভাব। একটি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, অন্যটি সগুণা, সক্রিয়া,

বিচিত্রভাব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাত্রী মহাদেবী। অন্য দৃষ্টিতে এই দুই ভাবকে বলা যায়—উন্মনা ও সমনা শক্তি। এক আমি বহু হব এই ইচ্ছা হলে শিব ও শক্তি আলাদা হয়ে যান ও জগৎ সৃষ্টি করেন। শিবাধিষ্ঠিতা সমনা শক্তি দিয়েই জগৎ সৃষ্টি। উন্মনা শক্তি মনের অতীত। ভগবান ত্রিগুণাত্মিকা, সর্বব্যাপিনী, নিজমায়া দ্বারাই দেহধারীর মতো লক্ষিত হন।

ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও সবিশেষ, নির্গুণ ও সগুণ। পরব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিকল্প, নিরুপাধিক। অপর-ব্রহ্ম নাম, রূপ, উপাধি যুক্ত। নির্গুণ ব্রহ্ম অবাঙ্মনসো-গোচরম্—মন ও বাক্যের অতীত। সগুণ ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আবৃত। নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় তরঙ্গবিহীন। সগুণ ব্রহ্ম সক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁরই শক্তি। ঠাকুর বলছেনঃ সগুণ ব্রহ্ম মা জগৎকারণ। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি।[৪] ঠাকুর বলছেনঃ স্থির জলও জল আর জল যখন হেলচে-দুলচে তখনও জল। সর্প নড়লে বা কুণ্ডলী অবস্থায় এক।[৫]

মায়া ব্রহ্মেই স্থিত এবং ব্রহ্মেরই শক্তি। মায়া দ্বারা এইসকল জগৎ সৃষ্ট হয়। মায়ার 'প্রভাবে চরম সত্যকে--অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া আমরা মনে করি।'[৬] মায়ার দুই শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। মায়ার আবরণশক্তি স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার প্রতিবন্ধক। মেঘ যেমন সূর্যকে আচ্ছন্ন করে, আবরণশক্তি তেমন চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করে রাখে। জ্ঞানের অভাববশত রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। বিক্ষেপশক্তি বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে অনিত্যকে নিত্য বোধ করায়। জীবের বিষয়াসক্তি, সুখদুঃখাদি মনের বিকার মায়াব বিক্ষেপশক্তি হতে নির্গত। ঠাকুর বলছেন ঃ সচ্চিদানন্দ জল আর মায়ারূপ পানা।[৭] পানা সরালে পরিষ্কার জল, পুকুরের নিচ পর্যন্ত দেখা যায়। সেই পরিষ্কার সচ্চিদানন্দ-সাগরে স্বরূপ জানা যায়। সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের অবয়বরূপ। 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।'[৮] সেই অদ্বিতীয় দেব ঊর্ণনাভির মতো মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক আমাদের নাম রূপ কর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। সেই মায়াশক্তিই ঋগ্বেদে রাত্রি-সূক্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাত্রি। রাত্রিকে ভুবনেশ্বরী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঠাকুরের সাধনার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন—এই শাস্ত্রবচনের ও অনুভূতির সামঞ্জস্য ও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একমাত্র ঠাকুরের জীবনীতেই লিপিবদ্ধ আছে। মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ঠাকুর মাকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন আর বলেছেনঃ মা জ্ঞানদায়িনী। শ্রীভগবান যখন নরদেহে অবতীর্ণ হন শক্তিকেও সঙ্গে আনেন। শক্তিকে বাদ দিয়ে অবতারের কার্যকলাপ অসম্ভব। 'শক্তিরূপং জগৎ সর্বম্।' যুগে যুগে ঈশ্বর অবতীর্ণ স্ত্রী পুরুষ উভয় দেহ ধারণ করে। বিষ্ণুপুরাণে আছেঃ নারায়ণ যখনই অবতীর্ণ হন দেববদেহে বা নরদেহে তাঁর শক্তি দেবীরূপ বা মানবীরূপ নিয়ে অবতীর্ণা

হন।[৯] ঠাকুর আর মায়ের আবির্ভাব নারায়ণ ও লক্ষ্মীর যুগল আবির্ভাব। ঠাকুর বলছেনঃ 'ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।'[১০] আবার বলছেনঃ '[ও] জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী।... ও আমার শক্তি!'[১১] বস্তুত ঠাকুর ও মা অভিন্ন।

ঠাকুর আধুনিক যুগে আদ্যাশক্তির আলোকস্তম্ভ। ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য যে তপস্যা ও সাধন করেছেন এক শুভদিনে জগতের হিতকামনায় তাঁর সেই সব তপোলব্ধ শক্তি তাঁরই শক্তিরূপিণী লীলাসহচরীকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ঠাকুর মাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন। পূজক ও পূজিতা হলেন একাত্মা। 'প্রভু সঙ্গে এইবার, জগমাতা অবতার, সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।...প্রভু আর শ্রীশ্রীমায় রূপে দুঁহু আত্মায় অভেদ।'[১২] ঠাকুর প্রার্থনা করলেনঃ 'হে বালে, হে সর্ব-শক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!' ঠাকুর তখন তাঁর সাধনার ফল, জপের মালা সারদা-পাদপদ্মে বিসর্জনপূর্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁকে প্রণাম করলেনঃ 'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্ন-কারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।'[১৩] মহাবিদ্যা ষোড়শী শ্রী-বিদ্যা নামেও অভিহিতা। তন্ত্রশাস্ত্রে ইনি সুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিপুরাসুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী, ললিতা, বালা প্রভৃতি নামে ও মূর্তিতে পূজিতা। শ্রীশঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চার মঠে শ্রী-যন্ত্রে এই শ্রী-বিদ্যা পূজিতা হয়ে আসছেন। প্রয়াগে ললিতাদেবী পীঠদেবীরূপে বিরাজিতা। শ্রীশঙ্করাচার্য সৌন্দর্যলহরী, আনন্দলহরী এবং ললিতা—ত্রিশতী ভাষ্যে এই শ্রী-বিদ্যা-তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। ষোড়শী দেবী জগতের আহ্লাদদায়িনী, জগৎ-আকর্ষণ-কারিণী এবং জগতের কারণস্বরূপিণী। ঠাকুর মাকে জগন্মাতা জগদম্বা ভাবে পরিপূর্ণতা দিয়ে মায়ের মাতৃ-ভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটালেন। জগতের কল্যাণের জন্য এই বিকাশ।

ঠাকুর বালকভক্ত পূর্ণকে মায়ের কাছে নহবতে আহারের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে মায়ের মাতৃস্নেহ জাগিয়েছিলেন। মা পূর্ণকে মালাচন্দনে সাজিয়ে তাঁর পাশে বসিয়ে খেতে দিয়েছিলেন।[১৪] তেমনি স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানদের মায়ের হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁকে সব রত্ন-সন্তান দিলেন। মা এই সন্তানদের ভবিষ্যৎ দেখবেন বলেছিলেন। ঠাকুরের সন্তানরা মাকে দিব্যচক্ষে মহামায়া ব্রহ্মময়ী রূপে দেখতেন। মায়ের কৃপাতেই এইসব হত। স্বামীজী মায়ের দর্শনে চলেছেন। নিজের গায়ে

গঙ্গাজল ছিটাচ্ছেন আর মুখে গঙ্গাজল দিচ্ছেন। মায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতার্থ হচ্ছেন।[১৫] স্বামী ব্রহ্মানন্দ মায়ের কাছে চলেছেন। গা থরথর করে কাঁপছে। পরমা প্রকৃতি পবিত্রতাস্বরূপিণী মাকে দেখছেন। স্বামী সারদানন্দকে মা বলেছেন তাঁর ভারী। সুমেরুবৎ অচল-অটল থেকে তিনি মা ও তাঁর সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করেছেন। ঠাকুর শরৎ মহারাজের কোলে বসে দেখেছিলেন কতটা ভার বহন করবেন। মা বলছেনঃ 'শরৎ আমার মাথার মণি।'[১৬] স্বামীজী যখন তীর্থ-ভ্রমণে রওনা হবেন, মা স্বামীজীকে তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। স্বামীজী তখন বললেন যে, মা সারদা স্বামীজীর একমাত্র মা।[১৭] তরুণ কালীকৃষ্ণ মহারাজ জগদ্ধাত্রী পুজোর পর শরৎ মহারাজের সঙ্গে কলকাতায় ফিরছেন। বিদায়ের সময় খিড়কি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মা অবিরাম অশ্রু-বিসর্জন করছেন। সন্তানও মাকে ছেড়ে যাবার ব্যথায় অশ্রু সংবরণ করতে পারছেন না। পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে কালীকৃষ্ণ মহারাজ বলেছেনঃ এ যে জন্মজন্মান্তরের মা, চিরকালের মা।[১৮] এ-ই হল ঈশ্বরীয় মাতৃত্ব।

সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্কে বাৎসল্যময়ী আদর্শ জননীরূপে যেমন তাঁকে আমরা দেখি, তেমনি এর পরে মাকে দেখি সঙ্ঘমাতারূপে। মায়ের এই সঙ্ঘমাতা রূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় এবং এখানে মায়ের অমূল্য অবদান। কি করে এই সঙ্ঘ গড়ে উঠল? এই সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে মায়ের ভালবাসাতে। মায়ের শ্রীমুখ থেকে এই উক্তি লিপিবদ্ধঃ 'ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। ...তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, "ঠাকুর, তুমি এলে, এই কয়জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী-বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি

পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ান দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।" তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।'[১১]

মায়ের বিশ্বাস ছিল এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ঠাকুর তাঁর ভাবধারার তরঙ্গ প্রবাহিত করবেন। এক সময়ে মা ব্রহ্মচারীদের জ্ঞানার্জনের জন্য ইংরেজী লেখাপড়াও শিখতে বলেছিলেন। মা এর কারণও বলেছিলেন যে, অনেক বিদেশী ভক্ত আসবে।[২০] এই সঙ্ঘ-গঠনের মূল একদিকে যেমন মায়ের ভালবাসা আর একদিকে মায়ের শিক্ষা। সে শিক্ষা ত্যাগের, তিতিক্ষার, বৈরাগ্যের। একবার একজন এম.এ. পাস করে মায়ের কাছে এসে বলেন যে. তাঁর সাধু হবার ইচ্ছা কিন্তু তিনি সংশয়ে পড়েছেন। মহাপুরুষ মহারাজ যুবকটিকে উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু মাস্টারমশায় বলছেন তাড়াহুড়ো করে কিছু না করা ভাল। এই যুবক মায়ের কাছে এসে প্রণাম করলে মা আশীর্বাদ করে বলেনঃ 'মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক. বাবা। তারক যা বলেছে, খাঁটি কথাই বলেছে।'[২১] সাধু-ব্রহ্মচারীরা মায়ের দৃষ্টিতে 'দেবশিশু'।[২২] আর একবার একটি যুবক সন্ন্যাস নেবার পর তাঁর মা ও স্ত্রী মায়ের উপর আক্রোশ দেখান। মা খুব দৃঢ়ভাবে বলেন ছেলে তাঁদের সব ব্যবস্থা করে ভাল পথেই গেছে।[২৩] সন্ন্যাস কথার প্রকৃত অর্থ সম্যক্-ভাবে ন্যাস, সম্পূর্ণ ত্যাগ। মা বলছেনঃ ত্যাগীরা না হলে কাদের নিয়ে থাকবেন![২৪] মা অন্তরে বৈরাগ্যের বীজ বপন করে কত সন্তানকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে দিয়েছেন। মায়ের শক্তি জ্ঞান বল ও ক্রিয়া তিনটি প্রণালীতে কাজ করেছে। মায়ের স্পর্শ, ইচ্ছা, বাণী. কৃপা সন্তানেরা অনুভব করেন। মায়ের শিক্ষার মূল. বিশ্বাস আর নিষ্ঠা। ঠাকুরের কাজ. ঠাকুরের স্মরণ-মনন, সবই তো তপস্যা—এই মন্ত্র দিয়ে মা সঙ্ঘ গড়েছেন। জনৈক সন্ন্যাসী-সন্তানকে মা বলেছিলেনঃ 'আমার কাজ করছ. ঠাকুরের কাজ করছ, একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে?'[২৫]

মাকে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেনঃ 'মা, তোমাকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ কালী. আদ্যাশক্তি, ভগবতী এসব বলেন। ...তবে তুমি স্বয়ং যদি সেকথা বল, তাহলে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তোমার নিজের মুখেই শুনতে চাই. ওকথা সত্য কিনা।' মা উত্তরে বলেনঃ 'হ্যাঁ, সত্য।'[২৬] এক ভক্ত-মহিলা মাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'মা, আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?' মা বললেনঃ 'সকলে কি করে চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা।'[২৭] মাকে বাগদি-দম্পতি বলেছিলেনঃ 'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখেছি।'[২৮] একদিন জয়রামবাটীতে সকালে মা বারান্দা

ঝাঁট দিচ্ছেন। এমন সময় একজন ভিখারি ভিক্ষা চাইল। মা আপনমনে বলে উঠলেনঃ 'আমি আর অনন্ত হাতেও কাজ শেষ করতে পারছি না।' সেখানে উপস্থিত একজন সন্ন্যাসী-সন্তান মায়ের প্রতি চাইতেই মা সহাস্যে বলছেনঃ 'দেখ, আমার দুটো হাত, আমি কিনা আবার বলছি, আমার অনন্ত হাত।'[২৯] একবার শিবুদাদা মাকে বললেনঃ 'তুমি কে, বলতে পার?' মা উত্তর দিলেনঃ 'আমি কে? আমি তোর খুড়ী।' শিবুদাদা বললেনঃ 'তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।' বিব্রতস্বরে মা বললেনঃ 'দেখ দেখি, আমি আবার কে রে? আমি মানুষ, তোর খুড়ী।' শিবুদাদাকে না যেতে দেখে মা শেষে বললেনঃ 'লোকে বলে কালী।' শিবুদাদাঃ 'কালী তো? ঠিক?' মা বললেনঃ 'হ্যাঁ।'[৩০]

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ লিখেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমায়ের দুইটি রূপ দেখা যাইত। একটি সাধারণ মানবীর রূপ।...অপরটি মায়ের অসাধারণ রূপ...সংসারের সব কোলাহলের মধ্যে তাঁহার মন ছিল সর্বদাই প্রশান্ত ও ঊর্ধ্বমুখী—সবই যেন বহু নিম্নে পড়িয়া আছে, সবকিছুর মধ্যে থাকিয়াও যেন তিনি কিছুতে নাই!...তখন এমন এক স্তরে অবস্থান করিতেন যে, সে স্তর সাধারণের নাগালের বাহিরে। এই অবস্থায় মা কেবল তাঁহার সন্তানদের মঙ্গল কামনা করিতেন। তাহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ইহকাল পরকালের সব কর্মসংস্কার খণ্ডন করিয়া দিয়া ভগবানের পথে প্রেরণা দিতেন এবং ক্রমে শাশ্বত শান্তির পথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন।'[৩১]

সারদাদেবীর আবির্ভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেছেনঃ 'বর্তমান যুগে এই দেশের আদর্শকে সঞ্জীবিত করার ও উহার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল; আর সে প্রয়োজন-সম্পাদন একমাত্র জগদম্বার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্য কোন উপায়ে পরাধীন ভারতকে আত্মসংস্থ করা এবং সমস্ত বিশ্বকে এই প্রাণপ্রদ আদর্শ-সম্বন্ধে অবহিত করা অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ভারতের মর্মকথা জগৎসমাজে প্রচারের ইহাই চিরন্তন পন্থা। সত্য কথা বলিতে গেলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ধর্মের অধোগতি যেমন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, শক্তির অবতরণও তেমনি সর্বোত্তম হইয়াছে। দেবী-গুরু-মাতৃ-জ্ঞানে এই শক্তির পূজার ভিতর দিয়াই নবীন সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হইবে।'[৩২]

স্বামী সারদানন্দ 'ভারতে শক্তিপূজা' পুস্তিকাটি উৎসর্গ করেছেন এইভাবেঃ 'যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণচিত্তে অর্পিত হইল।' ব্রহ্মদর্শন বহুভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মা বলেছেনঃ অবতারের কথা কি এরকম কোথাও লেখা হয়েছে?[৩৩] স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলেছেনঃ "ঠাকুর ও মাকে অভেদ-দৃষ্টিতে দেখবি। মনে রাখবি, ঠাকুরের কৃপা না

হলে মাকে পাওয়া যায় না, আবার তেমনি মায়ের কৃপা না হলেও ঠাকুরকে পাওয়া যায় না।'[৩৪] মা বলছেনঃ 'এ যে ঠাকুরের রাজ্য। এখানে কোন আইন-কানুন নেই। এখানে সকলেরই অবারিত দ্বার। যখন যার সময় ও সুযোগ হবে, তখনই আসবে।'[৩৫] মায়ের পাদপদ্মে জানা-অজানা সকলের জন্য ফুল দেওয়া হচ্ছে। শতকোটি শশী হাসে চরণ নখরে। নাগ মহাশয় যেমন বলেছেন 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু',[৩৬] তেমন সকলে বলছিঃ 'অখণ্ডা অরূপা তুমি, তুমি নিরুপমা, পুরুষ প্রকৃতি তুমি, তুমি মা প্রধানা।'[৩৭] মা বলেছেনঃ 'ঠাকুর তোমাদের জন্য নূতন রাজ্য তৈরী করেছেন।'[৩৮] গোলোকে সর্বমঙ্গলা মা, ব্রজে কাত্যায়নী, কাশীতে অন্নপূর্ণা মা, অনন্তরূপিণী। মা সেই মহাশক্তি। ভারতের মাতৃসাধনার পরমা সিদ্ধি শ্রীশ্রীমা।

ভারতীয় চিন্তাধারায় শক্তিতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীমা

॥ ১ ॥

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জড় ও চেতন সমন্বিত এই অনন্ত প্রপঞ্চের রহস্য উদ্ভেদের জন্য মনুষ্যবুদ্ধি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমাত্মক পঞ্চ মহাভূত ও তাহার মিশ্রণ হইতে উদ্ভূত যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের বিচিত্র লীলা যেমন একদিকে মানবজিজ্ঞাসায় বিস্ময়, আনন্দ, ভীতি, শঙ্কা, মোহ প্রভৃতি বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করিয়াছে অপরদিকে সেইরূপ জড়সৃষ্টির অন্তরালে যে আন্তর মনোজগৎ আছে, তাহার অপার রহস্যও তাহাকে কম অভিভূত করে নাই। বাহ্য জড় জগতের অন্তর্গত যাবতীয় প্রাকৃত পদার্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পরিবর্তন ও বিকার যেন কোন অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। মনো-জগতের অন্তর্গত সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক, শৌর্য-ভীরুতা, আসক্তি-বৈরাগ্য, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—এ-সকলের পিছনেও অনুরূপ কোন এক পরম-সূক্ষ্ম শক্তি বিরাজমান থাকিয়া আমাদের যাবতীয় চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করিতেছে—এই বোধ সুপ্রাচীন কাল হইতেই মনুষ্যসমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সূক্ষ্ম-তত্ত্বের রহস্য উন্মোচনেই মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা। কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটিতে সেই পরম রহস্য সম্বন্ধে মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

> কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
> কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।

'প্রাণ' ও 'মন' যথাক্রমে বাহ্য জড় প্রপঞ্চ ও আভ্যন্তর অধ্যাত্ম প্রপঞ্চেরই প্রতীক-স্বরূপ। এই উভয়বিধ প্রপঞ্চের অন্তরালস্থিত, ইহাদের সর্altবিধ প্রেরণার উৎস, ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের মূলীভূত কারণ সেই পরমতত্ত্বকেই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা ও অধ্যাত্মসাধনার এক বিশিষ্ট ধারায় 'শক্তি'রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।[১] এই শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণের জন্যই ভারতে 'শক্তিতন্ত্র'রূপ সুবিশাল সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ সঙ্ঘটিত হইয়াছে, এবং সেই পরমা শক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভের জন্য উদগ্র তপস্যাই ভারতীয় শক্তিসাধনাকে প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

॥ ২ ॥

'চিৎ শক্তি' এবং 'অচিৎ শক্তি' এই উভয়ের পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের দ্বারা এই বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। 'অচিৎ শক্তি' অপেক্ষাকৃত স্থূল, ইহার প্রকাশ সাধারণ জীবলোকের সহজেই বুদ্ধিগম্য। অপরপক্ষে 'চিৎ শক্তি'র প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম, প্রাকৃতজনের দূরবগাহ। তাহা হইলেও 'চিৎ শক্তি'ই 'অচিৎ শক্তি'কে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, 'অচিৎ শক্তি' সেই সূক্ষ্ম, দুর্জ্ঞেয় 'চিৎ শক্তি'রই স্থূল আংশিক প্রকাশ মাত্র—এই ধারণা প্রাচীন ভারতীয়গণের নিকট বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় পদার্থ-স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে নানাভাবে 'শক্তি'র স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। 'ইচ্ছা-শক্তি', 'বাক্-শক্তি', 'মনন-শক্তি', 'কুণ্ডলিনী-শক্তি' প্রভৃতি শক্তির বিচিত্র ভেদ ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানে নানা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।[২]

জাগতিক পদার্থের 'শক্তি' নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ যেরূপ সূক্ষ্ম মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, এই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিলয়ের যিনি মূলীভূত কারণ—'জন্মাদ্যস্য যতঃ', তাঁহার পরম-সূক্ষ্ম, অচিন্ত্য অনন্তশক্তি যে তাঁহাদের মননকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কেনোপনিষৎ-এর অন্তর্গত 'উমা হৈমবতী'র উপাখ্যানে আমরা দেখিতে পাই যে, সামান্য একটি তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করিবার শক্তিও অগ্নির নাই, প্রবলগতি-সম্পন্ন বায়ুও তাহাকে বিন্দুমাত্র কম্পিত করিতে পারে না। সুতরাং যাবতীয় পদার্থের স্ব-স্ব কার্যসম্পাদনের অনুকূল শক্তি যে তাহাদের নিজস্ব নহে, পরন্তু কোন এক অচিন্তনীয় পরম-সূক্ষ্ম দৈবীশক্তিরই অংশমাত্র, ইহা উক্ত আখ্যায়িকাটির মধ্যে অতি সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পরমেশ্বরই সেই দৈবীশক্তির আধার। উপনিষদে ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ঐশ্বর্য, অনন্ত শক্তি, অনন্ত বল, অনন্ত বীর্য, অনন্ত তেজঃ প্রভৃতির একমাত্র আশ্রয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিদ্যারূপিণী 'উমা' সেই ব্রহ্ম বা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনন্ত, বিচিত্র শক্তিরই প্রতীক। ঈশ্বর ও তাঁহার 'শক্তি'—এই দুইয়ের সমন্বয়ের ফলেই এই বিশ্বের সৃষ্টি। পুরুষ ও নারীর রূপকল্পনা ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। ঈশ্বর পুরুষ, নিষ্ক্রিয়, অলস, চৈতন্যস্বরূপ; 'শক্তি' স্ত্রীরূপিণী, নিয়ত পরিবর্তনশীলা, সতত সক্রিয়। পুরুষ ও নারীর মিলনে যেমন সন্তানের জন্ম, সেইরূপ পরমতত্ত্ব হইতে বিচিত্র, পরস্পর-ভিন্ন, অনন্ত জীব ও জাগতিক জড়প্রপঞ্চের উদ্ভব ঈশ্বর ও তাঁহার নিত্য-শক্তির যুগল-লীলার ফলেই সংঘটিত হইতে পারে। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষবাদ এই দৃষ্টিভঙ্গির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরমতত্ত্বকে উপনিষদেই কখনও পুরুষরূপে, কখনও স্ত্রীরূপে

কল্পনা করা হইয়াছে। যিনি নিরাকার, সর্বব্যাপী, তাঁহাকে 'পৌরুষবিধিক' আকারাদিযুক্ত করিয়া দেশ ও কালে পরিচ্ছিন্ন করিয়া আমরা আমাদের সংকীর্ণ বুদ্ধির গোচর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৈদিক সংহিতার মন্ত্র-সমূহেই আমরা দেবতাকে কখনও পুরুষরূপে, পিতারূপে বর্ণিত হইতে দেখি, যেমন—'দ্যৌঃ পিতা'—আবার কখনও বা স্ত্রীরূপে, মাতারূপেও বর্ণিত হইতে দেখি—যেমন, 'পৃথিবী মাতা', 'অদিতি দেবমাতা'।[৩] আবার 'দ্যৌঃ' এবং 'পৃথিবী' এই উভয় দেবতাকে দ্বন্দ্ব সমাসে পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় 'দ্যাবা-পৃথিব্যৌ' রূপে। সুতরাং দেবতাকে স্ত্রী ও পুরুষ রূপে কল্পনা অতি প্রাচীন যুগ হইতেই যে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্র, রুদ্র, ভব, শিব প্রভৃতি পুরুষদেবতার পত্নীরূপে ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, ভবানী, অম্বিকা প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতারও নিয়মিত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, সেইযুগ হইতেই দেবতা ও তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে যথাক্রমে পুরুষ ও নারীরূপে কল্পনা ঋষিগণের নিকট প্রথাসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।[৪] পরমতত্ত্বই যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপনাকে পুরুষ ও নারী রূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন মনুসংহিতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করিতেছেঃ

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥[৫]

ভগবান মনুর এই উক্তিও বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্' (১।৪।৩)—এই ঘোষণারই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি মাত্র। বস্তুতঃ 'পরমতত্ত্ব' বা 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে পুরুষ বা স্ত্রী রূপে লিঙ্গ কল্পনার কোন অবকাশই নাই। 'ব্রহ্ম', 'পুরুষ' ও 'শক্তি' বা প্রকৃতি[৬] সেই একই পরমতত্ত্বের বাচক, যদিও এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। একই অদ্বয় তত্ত্বের এই ত্রিবিধ রূপকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে একজন পণ্ডিতের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করিঃ 'The assumption of *Sakti* or a female divinity as the supreme personality is likely to

give rise to some confusion and misbelief. To conceive Brahman in a feminine form may be to some a curious sort of unjustifiable conviction. But this is absolutely childish. Because the question of gender or sex cannot arise at all, so far as the Supreme Reality is concerned. The Great God is said to have divided Himself into the twofold aspect of husband and wife. He is both male and female. The word Brahman is used in neuter to impress upon us the *nirguna* aspect of the *Absolute*.'[৭] বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে যে পরমপুরুষের পুরুষ ও স্ত্রী রূপে, পতি ও পত্নী রূপে কল্পনা সূচিত হইয়াছে, তাহাই পরবর্তীকালে সংস্কৃত-সাহিত্যে ও শিল্পে অর্ধনারীশ্বর রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রী রূপে, জায়া ও পতি রূপে পরমতত্ত্বের এই দ্বৈধীভাব যে বাস্তব নহে, ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তি, পুরুষ এবং প্রকৃতি—এই দ্বৈতভাবনা যে কল্পনামাত্র, বস্তুতঃ যে শক্তি এবং শক্তিমান একান্তই অভিন্ন, ইহাও পুরাণ এবং তন্ত্রসাহিত্যে বারংবার নানা ভঙ্গিতে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণের অন্তর্গত একটি শ্লোকে বলা হইয়াছেঃ

উমাশঙ্করয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ।
দ্বিধাঽসৌ রূপমাস্থায় স্থিত একো ন সংশয়ঃ॥[৮]

'শক্তি' ও 'শক্তিমান' হইতে উদ্ভূত এই জগৎ 'শাক্ত'ও বটে 'শৈব'ও বটে। 'শিব' ও 'শক্তি'র পরস্পর বিনাভাব বা বিচ্ছেদ কখনও সম্ভব হইতে পারে নাঃ

ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্ত্যা চ বিনা শিবঃ।[৯]

যেমন 'চন্দ্রিকা' ব্যতিরেকে 'চন্দ্র' ম্লান, সেইরূপ 'শক্তি' বিরহে শিবও সৃষ্টি-সামর্থ্য-শূন্যঃ

চন্দ্রো ন খলু, ভাত্যেষ যথা চন্দ্রিকয়া বিনা।
ন ভাতি বিদ্যমানোঽপি তথা শক্ত্যা বিনা শিবঃ॥[১০]

এইভাবে যদিও শক্তি ও শক্তিমান, জায়া ও পতি, মাতা ও পিতা রূপে পরমতত্ত্বের ভেদকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অবান্তর বলা হইয়াছে, তথাপি শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের দার্শনিক সাধকগণের দৃষ্টিতে সাধনার নিম্নতর পর্যায়ে কখনও শক্তির প্রাধান্য কখনও বা শিবের প্রাধান্য খ্যাপন করা হইয়াছে। দুই মতেই শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভেদ কল্পিত হইলেও শাক্ত-সাধকগণের দৃষ্টিতে মূল অনাদি পরমা শক্তির মাতৃভাবই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, অপরপক্ষে শৈবসিদ্ধান্তের অনুবর্তিগণের দৃষ্টিতে পরমতত্ত্বের পুরুষভাব ও শিবস্বরূপতাই প্রতিভাত হইয়াছে। শাক্ত-তন্ত্রসাহিত্যে পরমতত্ত্বের মাতৃভাবে উপাসনাই প্রশস্ত, অপরপক্ষে উত্তরভারতীয় শৈবাগমসমূহে শিবদৃষ্টিতে পরমতত্ত্বের ধ্যান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা শুধুই দৃষ্টিভেদ-মাত্র. ইহার দ্বারা দার্শনিক উপলব্ধির চরম স্তরে অদ্বৈতবোধের বিশেষ তারতম্য প্রমাণিত হয় না। অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকল্পনায় এই দুই তত্ত্বের—শিবতত্ত্ব ও শক্তি-তত্ত্বের, জায়া ও পতি রূপের, জনক ও জননী রূপের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। সেখানেও যাঁহারা বামভাগস্থিত নারীরূপের উপাসক তাঁহারা 'বামাচারী'রূপে[১১] পরিচিত, অপরপক্ষে শিবরূপে পুরুষমূর্তি, যাহা দক্ষিণভাগে অবস্থিত, তাহাই দক্ষিণোপাসকগণের আরাধ্য। কিন্তু মূলতঃ ঈশ্বর ও শক্তি অদ্বয়। বেদান্ত ও তন্ত্র, তাহা শৈবাগমই হউক বা শাক্ততন্ত্রই হউক, অদ্বৈতবাদের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

॥ ৩ ॥

যদিও বিশ্বের মূলস্বরূপ পরমা শক্তিকে স্ত্রীরূপে উপাসনা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে সুপরিচিত, তথাপি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্যত্র দুর্লভ। জায়ারূপে নারীশক্তির পূজা ও উপাসনা দ্রাবিড়-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং বৌদ্ধযুগেই ভারতবর্ষে ইহার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। পরে শাক্ত-সাধনায় ও বিশেষতঃ বামাচার-সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতিতে ইহার অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে শক্তির উপাসনা নিম্নস্তরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়া উঠে। এবং ইহার ফলে নানা উচ্ছৃংখলতা শাক্ত-সাধনাকে কলুষিত করিয়া তুলে। কিন্তু মাতৃভাবে শক্তির উপাসনার মধ্যে এই-জাতীয় স্খলনের বা বিকৃতির সম্ভাবনা নাই। কুমারী হইতে বর্ষীয়সী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর, সকল বয়সের নারীর প্রতি মাতৃদৃষ্টি ভারতীয় সাধনার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরকে পুরুষরূপে ভাবনা—যাহা পাশ্চাত্য ধর্মসাধনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—তাহার ফলে সমাজের সর্বস্তরে পুরুষের প্রাধান্য দীর্ঘকাল যাবৎ পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্য মনীষীর সুস্পষ্ট অভিমত প্রণিধানযোগ্যঃ '...a purely masculine concept of Divinity, and a consequent purely masculine religious organization with its sequel, a purely masculine social machine.... The full inclusion of the feminine element in public life will be the great fight of the immediate future, together with the uprising of a complete democracy (displacing the pseudo-democracies of to-day) based on the equal rights and duties of men and women in the human household of the state.'[১২]

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শাক্ত-সাধনায় সর্বত্রই শক্তির স্ফুরণ স্বীকৃত হওয়ায় সমাজের সর্বস্তরে পুরুষের সহিত স্ত্রীজাতির সমান মর্যাদা ও অধিকার অবিসংবাদিত—ইহা আমাদের দেশের ও বিদেশের মনীষিবৃন্দ আজ মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেন। তবে প্রাচীন শাক্ত-সাধনার সেই সমুন্নত আদর্শ যে বাস্তব আচরণে যথাযথভাবে পালিত হয় নাই, তাহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বরং আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জগতেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমানাধিকার বহুল পরিমাণে স্বীকৃত এবং নারীর প্রতি মর্যাদাবোধও যথেষ্ট মহিমান্বিত, ইহা স্বামী বিবেকানন্দের নানা রচনা, জীবনী ও পত্রাবলীর ভিতরে নানাভাবে উদ্ঘোষিত হইতে দেখা যায়। চিকাগো হইতে হরিপদ মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে স্বামীজী বলিতেছেনঃ 'বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদ-ভাঙ্ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তা-ই দেখে; এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—যেখানে

স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তা-ই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।'[১৩]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের 'পাশ্চাত্যে শক্তিপূজা' শীর্ষক পরিচ্ছেদেও পাশ্চাত্য জগতে শক্তিপূজা সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেনঃ 'ধর্ম এদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। "বামে বামা ...দক্ষিণে পানপাত্রং...অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসং...কৌলো-ধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।" প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার—মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেস্ট্যান্ট তো ইউরোপে নগণ্য—ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে-ধর্মে জিহোবা যীশু ত্রিমূর্তি—সব অন্তর্ধান, জেগে বসেছেন "মা"! শিশু-যীশু কোলে "মা"। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে "মা", "মা", "মা"! বাদশা ডাকছে "মা", জঙ্গ বাহাদুর (Field-Marshal) সেনাপতি ডাকছে "মা", ধ্বজাহস্তে সৈনিক ডাকছে "মা", পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে "মা", জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে "মা", রাস্তার কোণে ভিখারি ডাকছে "মা"। "ধন্য মেরী", "ধন্য মেরী"—দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।

'আর মেয়ের পুজো। এ শক্তিপুজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপুজো কুমারী-সধবা-পুজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তিপুজো। তবে আমাদের পুজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণ মাত্র; এদের দিনরাত, বারো মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির। এ যে-সে স্ত্রীলোকের পুজো, চেনা-অচেনার পুজো, ভদ্রকুলের তো কথাই নাই, রূপসী যুবতীর তো কথাই নাই। এ পুজো ইউরোপে আরম্ভ করে মূরেরা—মুসলমান আরবমিশ্র মূরেরা—যখন তারা স্পেন বিজয় করে আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময়। তাদের থেকে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তি-পূজার অভ্যুদয়। মূর ভুলে গেল, শক্তিহীন শ্রীহীন হল। স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগল, আর সে শক্তির সঞ্চার হল ইউরোপে, "মা" মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন ক্রিশ্চানের ঘরে।'[১৪]

ব্রাহ্মসমাজের তরুণ উৎসাহী সভ্য, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় নিবদ্ধচিত্ত নরেন্দ্রনাথের শাক্ত-সাধনায় এই দীক্ষা এবং শক্তি-উপাসনার নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে এই অবিচলিত আস্থা যে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার সহধর্মিণী সারদাদেবীর পুণ্যজীবনের সান্নিধ্যলাভের ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা তো আজ ঐতিহাসিক সত্য। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহারাই ছিলেন অদ্বয়, অমূর্ত শিব-শক্তিতত্ত্বের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অর্ধনারীশ্বর বিগ্রহ—যাঁহার উপাসনার দ্বারা স্বামীজীর সুপ্ত শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্ববাসীকে

চমকিত করিয়াছিল, এবং তাহাদের চিত্তে ভারতের অতুলনীয় অধ্যাত্মসম্পদের অপার মহিমা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও গৌরববোধ উদ্রিক্ত করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া আমাদের এই আলোচনা সমাপ্ত করিতে চাইঃ 'যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজা ভারতে বর্তমান যুগে আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রতীকে এমন শুদ্ধভাবের শক্তিপূজা জগৎ আর কখন দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। জগন্মাতার ধ্যান-সমাধিতে নিরন্তর তন্ময় হইয়া থাকা এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার উপর সর্বদা সকল বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করা, সকল নারীর ভিতর জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া, সকল সময়েই তাঁহাদের যথার্থ ভক্তি-পূর্ণ চিত্তে মাতৃসম্বোধন করিয়া, তাঁহাদিগকে নিজ উপাস্য ইষ্টদেবতার মূর্তি বলিয়া জ্ঞান করা, বিবাহিত হইলেও প্রাপ্ত-যৌবনা পত্নীর সন্দর্শন মাত্র মাতৃভাবের প্রেরণায় তাঁহাকে মূর্তিমতী সাক্ষাৎ জগদম্বারূপে দর্শন করিয়া মাতৃসম্বোধন করা এবং জবাবিল্ব-দল দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করা, ঘৃণ্য বেশ্যা-রমণীকুলের ভিতরেও জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়া তাহাদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মানিত করিয়া সমাধিস্থ হওয়া, সর্ব-জনসমক্ষে ভক্তিপূতচিত্তে কুলাগার প্রতীকে জগদ্‌যোনির পূজা করিয়া আনন্দে সমাধি-মগ্ন হওয়া, তান্ত্রিকী পূজার উপকরণ "কারণ" দেখিবামাত্র জগৎকারণের কথা মনে উদিত হইয়া প্রেমে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়া এবং সর্বোপরি জগন্মাতার প্রেমে আত্ম-হারা হইয়া স্বার্থপর ভোগসুখ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া পূর্ণব্রহ্মচর্যে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যময় জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্ যুগে, কোন্ অবতার-পুরুষের জীবনেই বা নারীপ্রতীকে শক্তিপূজার ঐরূপ জ্বলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে?' [১৫]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও মাতা সারদাদেবীর দিব্যজীবনে শিব-শক্তির যে অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল, তাহা বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে সুদুর্লভ। পরমহংসদেব যদিও সারদা-দেবীকে আপনার শক্তিস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন এবং উভয়ের অদ্বৈতসত্তা তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বদাই নিঃসংশয়ভাবে প্রকাশমান ছিল, তথাপি তিনি মাতৃজ্ঞানে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন, ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠানের দ্বারা মাতৃরূপিণী সেই পরমা শক্তির বোধন করিয়াছিলেন সারদাদেবীর মানুষী-তনুর মধ্যে। লৌকিক দৃষ্টিতে আপন সহধর্মিণীকে মাতৃরূপে আরাধনা অস্বাভাবিক বোধ হইলেও পরমহংসদেব যে লোক-

কল্যাণের জন্যই সারদাদেবীকে এই বিশ্বমাতৃত্বে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, ইহা পরবর্তী ঘটনাবলীর দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীমাও প্রায়ই বলিতেনঃ 'জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে...।'[১৬] স্বামী বিবেকানন্দ, সারদাদেবীর মধ্যে যে বিশ্বমাতৃত্বের উদ্বোধন ঘটিয়াছিল, তাহার স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া একটি পত্রে স্বামী শিবানন্দকে লিখিতেছেনঃ 'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তি-হীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী. মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইওরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এইকথা বুঝতে পারো কি?'[১৭]

স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিউইয়র্কে প্রদত্ত একটি ভাষণে ভারতীয় দৃষ্টিতে মাতৃ-উপাসনার গভীর তাৎপর্য যেভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশ্রীমা সারদার জীবনে যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজী বলিয়াছিলেনঃ 'ভারতে নারীর সর্ববিধ রূপের মধ্যে মাতৃমূর্তি সবার উপরে। মা সর্বাবস্থায় সন্তানের পাশে পাশে থাকেন। স্ত্রী-পুত্র মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে, মা কিন্তু কখনও সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারেন না। আবার মাতৃশক্তিই পক্ষপাতশূন্য মহাশক্তি। মায়ের স্বচ্ছ স্নেহ প্রতিদানে কিছু চায় না, কিছু কামনা করে না, সন্তানের দোষগুলি গ্রাহ্য করে না —সেজন্য বরং আরও বেশী ভালবাসে। বর্তমানে মাতৃ-উপাসনা উচ্চস্তরের হিন্দুদের সাধনার প্রধান অঙ্গ।...

'মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসো—ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার আশায় নয়। তাঁহাকে ভালো-বাসো, কারণ তুমি সন্তান। ভালোয় মন্দে—সর্বত্র তাঁহাকে সমভাবে দেখ। যখন আমরা তাঁহাকে এইরূপে অনুভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব ও চিরশান্তি—ইহাই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভূতি না হয়, ততদিন দুঃখ আমাদের অনুসরণ করিবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমরা নিরাপদে থাকি।'[১৮]

পরমহংসদেব এবং শ্রীমায়ের শিষ্যমণ্ডলী সারদাদেবীর মধ্যে মাতৃত্বের এই পরিপূর্ণ

আদর্শের অভিব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে মহামায়া পরমা শক্তির প্রত্যক্ষ মানবী-রূপে পূজা করিতেন। সারদাদেবীর মধ্যে শুধুই যে মাতৃত্বের কোমল দিকটিই প্রকাশিত ছিল তাহা নহে। মহামায়ার মধ্যে যেমন একই সঙ্গে কৃপা ও নিষ্ঠুরতা, সৌম্য ও রুদ্র রূপের সমাবেশ ঘটিয়া থাকে, তিনি যেমন যুগপৎ 'গৌরী' ও 'কালী'—'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা। ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি' [১৯]—সারদাদেবীর লোকোত্তর দিব্যজীবনে অনুরূপভাবে যুগপৎ কোমলতা ও কঠোরতার, নমনীয়তা ও দৃঢ়তার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দের ন্যায় বীর সন্তানগণও তাঁহার নিকটে আসিতে কম্পিত হইতেন—সারদাদেবীর লীলামাহাত্ম্য যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে ইহা অজ্ঞাত নহে। পরমহংসদেবের জীবন-সাধনায় যেমন জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত সাংসারিক মায়া ও করুণার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল, সারদাদেবীর জীবনলীলাতেও সেইরূপ বৈরাগ্যের সহিত আসক্তির, মুক্তির সহিত স্বয়ং-স্বীকৃত সহস্র বন্ধনের সহাবস্থান ভক্তবৃন্দের চিত্তে দৈবীশক্তিরই অনন্যসাধারণ উন্মেষরূপে প্রতিভাত হইত। নিত্যমুক্ত হইয়াও তিনি লোকশিক্ষার জন্য মানবীরূপে অবতীর্ণ হইয়া কখনও গুরুরূপে, কখনও পল্লীগ্রামের সামান্য অশিক্ষিতা নারীরূপে, গৃহিণীরূপে, রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী সঙ্ঘমাতারূপে, ভক্তজননীরূপে, জ্ঞানদায়িনীরূপে এবং দেবীরূপে আপন অপরিমিত শক্তিকে লোককল্যাণের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' [২০]—শাস্ত্রের এই বচন পরমহংসদেবের ক্ষেত্রেও যেমন শ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একইরূপে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। সারদাদেবীর চরিত্রের এই লোকোত্তর রূপ বুঝাইবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দ ভক্তমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেনঃ 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে?...ঐশ্বর্যের লেশ নাই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; ...কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কী মহাশক্তি!—জয় মা!! জয় মা!!! জয় শক্তিময়ী মা!!! ...অনন্তশক্তি—অপার করুণা! জয় মা!' [২১]

বস্তুতঃ শিব ও শক্তির যে অদ্বৈততত্ত্ব প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের দার্শনিক মনীষায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ভারতের অতীত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধকগণ যে অদ্বৈততত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্য আজীবন তপস্যায় নিরত থাকিতেন, আধুনিক যুগে শিব-শক্তির সেই অভিন্নতা ও অন্যোন্যসাপেক্ষতাই পরমহংসদেব ও সারদাদেবীর নরলীলার মধ্যে বাস্তবরূপ ধারণ করিয়াছে। তাই পরমহংসদেবও যেমন সারদাদেবীকে জগদম্বারূপে মনে করিতেন, সারদাদেবীও পরমহংসদেবকে সর্বদেবদেবী-স্বরূপ বলিয়া ভক্তসমাজে প্রচার করিতেন [২২]—এমনকি, পরমহংসদেবের লীলাসংবরণের পর ভক্তের নিকট হইতে শ্বেত ও পীত পুষ্পের অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া একই দেহে শিবশক্তির অপূর্ব সমন্বয় তিনি শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আভাসে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। [২৩] তাই শিব-শক্তির এই অলৌকিক বিগ্রহকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বামীজী বন্দনা করিয়াছিলেনঃ 'দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।'

শ্রীশ্রীমা ঃ প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নবীন আদর্শের অগ্রদূত

ভারতীয় নারী-আদর্শের ঐতিহ্যধারা ঃ ভারতীয় নারী-আদর্শের আলোকে শ্রীমা সারদাদেবীর চরিত্রের মহিমা উপলব্ধি করতে হলে সে আদর্শের স্বরূপটি স্মরণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্যই একটা মহনীয় আদর্শ ভারতের সমাজ-সংস্কৃতিতে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান। সে আদর্শ আধ্যাত্মিকতার। ভারতের শিক্ষা, সমাজ, জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, চিত্র-ভাস্কর্য, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি সংস্কৃতি-অঙ্গের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক আদর্শমুখীনতার রূপ ভারত-ইতিহাস-পাঠকের নিকট প্রতীয়মান হয়। ভারতীয় সমাজে ধর্মবীরগণই ভারতীয় জনগণের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। মহত্তম নর বা মহত্তমা নারী বলতে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতায় সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশযুক্ত নর বা নারীকেই বুঝে থাকে। প্রশ্ন হবেঃ এই আধ্যাত্মিক আদর্শের মূলভাবটি কি? তা হল মানুষের মধ্যে দেবত্ব আছে—একটা অবিনাশী দৈবগুণসম্পন্ন সত্তা আছে—সেইটাই তার স্বরূপ, তার সারাংশ। মানুষ মানে রক্ত-মাংসের পিন্ডমাত্র নয় অথবা রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-যুক্ত একটি মনও নয়। পরন্তু মানুষ হল এসকলে অনুস্যূত অথচ এসকলের থেকে স্বতন্ত্র একটা চেতন, দিব্য, পবিত্র সত্তা, যাকে বলি আত্মা। এই আত্মা বিরাট আত্মা বা বিশ্বাত্মার অংশ। এই আত্মা আমাদের বর্তমান মলিন দেহমনে অবস্থানহেতু যেন সুপ্ত বা সঙ্কুচিত। এই আত্মাকে বিকশিত করার উপায়—চিত্তকে নির্মল করা—অর্থাৎ ত্যাগ, সেবা, প্রেম, পবিত্রতা, সত্য, সংযম প্রভৃতি গুণের—যাকে গীতায় দৈবীসম্পদ নামে অভিহিত করা হয়েছে—নিরন্তর নিরলস চর্চা। যিনি সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সুখাশ্রয়ী বাসনা-কামনা-ভোগ-সুখ-লালসা পরিত্যাগ করে উপরি-উক্ত গুণগুলির মূর্তবিগ্রহে পরিণত হন, অন্য ভাষায় বলতে হয়—নিজ অন্তরস্থিত দেবত্বকে পূর্ণ-বিকশিত করেন, ভারতীয় সমাজে তিনিই আদর্শ পুরুষ বা আদর্শ নারী। বৈদিক সমাজে লক্ষ্য করি কঠোপনিষৎ আখ্যায়িকার কিশোর বালক নচিকেতাকে। যমরাজ প্রদত্ত ইহ-পরলোকের স্পৃহনীয় সর্বপ্রকার ভোগসুখকে অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করে সে বলছেঃ এইসব গীত-বাদ্য, অপ্সরাকুল, সুদীর্ঘ পরমায়ু, সুবিশাল রাজ্য তোমারই থাকুক যমরাজ, আমি এসব চাই না। আত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি ছাড়া নচিকেতা অন্য কিছুই চায় না। 'নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।'[১] নরসমাজে যেমন নচিকেতার আদর্শ শ্রেষ্ঠ মানবাদর্শ বলে গৃহীত, নারীসমাজে তেমনিভাবে লক্ষণীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত মৈত্রেয়ীর আদর্শ। প্রব্রজ্যা-প্রাক্কালে পতি যাজ্ঞবল্ক্য চাইলেন দুই পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে আপন পার্থিবসম্পদ বিভাগ করে দিতে। মৈত্রেয়ী তাতে বললেনঃ 'যেনাহং নামৃতা স্যাং

কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।'[২] যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করব না তা দিয়ে আমার কি হবে? অমৃতত্ব লাভের উপায় আপনি যা জেনেছেন দয়া করে আমাকে তা-ই বলুন। নিজ নিজ জীবনে ভোগ-সুখ-কামনার এরূপ আত্যন্তিক ত্যাগ, দৈবীগুণের চরম-উৎকর্ষসাধন সাধারণ মানব বা মানবী করতে পারে না ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় জীবনাদর্শ বলে যিনি যতখানি ঐ লক্ষ্যের অভিমুখী হন তিনি ততখানি বড়, ততখানি মহীয়ান্। আধ্যাত্মিকতা উন্মোচনের ও দেবত্ববিকাশের জন্য যেসব গুণের প্রয়োজন তার মধ্যে প্রধান সহায়ক হল ত্যাগ—স্বার্থত্যাগ, নিঃস্বার্থপরতা। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'—ত্যাগের দ্বারাই সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন। এই ত্যাগের কর্মে-পরিণত রূপ হল সেবা। তাই ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—নর ও নারী উভয়েরই ক্ষেত্রে। তাই শুধু সাধিকা নয়, গৃহিণী, আচার্যা, সাহিত্যিক, কবি, সমাজসেবিকা, রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী আদি বহুরূপে নারীজীবনের কৃতিত্ব ভারত-ইতিহাসে প্রমাণিত থাকলেও, যে-দুটি গুণের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার সর্বাধিক বিকাশ—সে-দুটি গুণ—'সতীত্ব' ও 'মাতৃত্ব'—এখানে নারী-মহত্বের শ্রেষ্ঠ পরিমাপক। 'মাতৃত্বপদবী জগতের উচ্চতম পদবী। কেননা একমাত্র এই পদবীতে অবস্থান করে চরম স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করা যায়, অভ্যাস করা যায়। আমাদের প্রতি ভগবানের ভালবাসাই শুধুমাত্র মায়ের ভালবাসার উপরে স্থান পেতে পারে. অন্য সমস্ত ভালবাসাই মায়ের ভালবাসার নিম্নে। মায়ের কর্তব্য হল সন্তানের স্বার্থ আগে চিন্তা করা—তারপরে নিজের চিন্তা।'[৩] মাতৃত্ব একটি উচ্ছ্বসিত ভালবাসা যা কখনও প্রত্যাখ্যান করে না, যা আমাদের মাথায় চিরবর্ষিত একটি আশীর্বাদ। যে ভালবাসা কখনও কিছু পাবার কথা ভাবে না, যে ভালবাসা শুধু দান করেই চলে, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না—সেটাই মাতৃভাব। এই মাতৃভাবের চরম বিকাশে নারী শুধু গর্ভজাত সন্তানকে নয় সকল মানুষকে, এমনকি সকল প্রাণীকে সন্তান-জ্ঞানে স্নেহ করতে, সেবা করতে অগ্রসর হয়। মানুষ—শত্রু বা মিত্র. ধনী বা নির্ধন, ক্ষুদ্র বা মহৎ, সৎ বা অসৎ সে-বিচার মাতৃহৃদয় করে না। পুত্র কুপুত্র হলেও মাতা কখনও কুমাতা হন না—'কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।'[৪] মাতৃভাব যদিও নারীমাত্রে স্বাভাবিক তবুও সচরাচর তা আপন গর্ভজাত সন্তানে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু যে-নারী যত অধিক ত্যাগ, সেবা. সংযম, পবিত্রতাদি চারিত্রিক দৈবীগুণের চর্চা করে, অধিকারিণী হয়. ততই তার মাতৃত্ব ব্যাপকতর হয়, বিশ্বাবগাহী হয়, ততই তা সন্তানরূপে গৃহীত মানবের জাগতিক, আত্মিক, সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে রত হয়। মাতৃত্বের মতো আর একটা বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহুমানিত আদর্শ—সতীত্ব। কিরূপ নিষ্ঠাসহকারে, কতখানি সংযম, পবিত্রতা, তিতিক্ষা ও ত্যাগস্বীকারের দ্বারা হিন্দু-নারী, পাতিব্রত্য-আদর্শ অনুসরণ করে, তার বিচিত্র কাহিনী ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, এই সতীত্ব ও মাতৃত্বকে হিন্দু-

নারী ঈশ্বরলাভের সাধনারূপে জেনেছে। পতির সেবা নয়—পতি-নারায়ণের সেবা ; পুত্রস্নেহ নয়—পুত্র-নারায়ণের প্রতি স্নেহ করে, ভারতীয় নারী যোগী-মুনি-বাঞ্ছিত লক্ষ্য—ঈশ্বরানুভূতি লাভ করেন। ভারতীয় নারী-আদর্শের ঐতিহ্যধারা অনুধাবন করলে সংক্ষেপে এই বলতে হয়, এ ধারার মৌল-উপাদান—সতীত্ব-মাতৃত্ব, সংযম-পবিত্রতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, স্নেহ ও সেবা প্রভৃতি দৈবীগুণ এবং এইসকল গুণের চরম উৎকর্ষে আত্মানুভূতি, ঈশ্বরানুভূতি, ব্রহ্মানুভূতি।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ সর্বভোগসুখত্যাগিনী মৈত্রেয়ীর অপূর্ব আলেখ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে চিত্রিত রয়েছে। উপনিষদেরও পূর্বে জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থরূপে খ্যাত ঋগ্বেদে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্-এর ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরিচয় পাই। ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত সৃজনী-পালিনী-সংহারিণী শক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভব করে তিনি বলছেনঃ

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥[৫]

—'আমিই একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসু রূপে বিচরণ করি। দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেব-গণ আমারই নানা অভিব্যক্তি। মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে, ইন্দ্র ও অগ্নি এই দেবতা-দ্বয়কে তথা অশ্বিনীকুমারযুগলকেও আমি ধারণ করে আছি।' অত্রি ঋষির কন্যা অপালা স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্তা হবার পর পিতৃগৃহে কঠোর তপস্যা করে ঋষিত্ব লাভ করেন ও বেদমন্ত্র রচনা করেন। অঙ্গিরা ঋষির দুহিতা শাশ্বতী মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষিকা-রূপে বৈদিক সাহিত্যে খ্যাতিমতী ছিলেন। ঐ বৈদিক যুগেই রাজ্ঞী বিশপলা স্বামীর সহায়িকারূপে একত্রে স্বামীর সঙ্গে বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বামী-ভক্তি-প্রকাশের একটা নিজস্ব ধারা দেখিয়ে গেছেন।[৬] আধ্যাত্মিক আদর্শে গরীয়ান্ যেসব নারীচরিত্র রামায়ণের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করেছে—পাতিব্রত্য, পবিত্রতা ও সর্বংসহা ধরিত্রীর তুল্য সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সীতাদেবী তাঁদের অগ্রগণ্যা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ 'সীতাচরিত্র অসাধারণ...ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ ; নারীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্র হইতেই উদ্ভূত...মহামহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমনকি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শস্বরূপা মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। ...ভারতীয় নারী-গণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।'[৭] সীতাদেবীর চিত্র ছাড়াও রামায়ণে বর্ণিত জননী কৌশল্যার স্বামী-ভক্তি ও ধর্মপ্রাণতা, আবাল্য তপস্বিনী শবরীর বাল্য

থেকে বার্ধক্য ব্যাপী সুচিরকালের প্রতীক্ষা ও নীরব সাধনা, বিভীষণ-সহধর্মিণী নিষ্কলুষ সরমা, সূক্ষ্ম ধর্মবুদ্ধি-পরায়ণা রাবণ-মহিষী রাজ্ঞী মন্দোদরী এবং আরও কয়েকটি পূত নারীচরিত্র ভারতীয় নারী-আদর্শের গৌরবমণ্ডিত ধারাকে গভীরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভক্তিভাবের চরম বিকাশ ভারতের তথা বিশ্বের ইতিহাসে যাঁদের জীবনে রূপায়িত —শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী শ্রীকৃষ্ণ-বিরহবিধুরা শ্রীরাধা তাঁদের মধ্যে স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তি, ভাব, মহাভাব, প্রেম প্রভৃতি ভক্ত-সাধকের যে-সমস্ত উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম অবস্থালাভের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলির বিকাশ পরবর্তী-কালে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে সংঘটিত হয়েছিল, সে-সমস্তের নিদর্শনরূপে রাধারানী ভারতের পুরাণ-সাহিত্যে চিত্রিতা রয়েছেন। তিনি যুগ যুগ ধরে ভক্তিপথের সাধক ও সাধিকাকুলকে অনুপ্রাণিত করছেন।

মহাভারতের গান্ধারী, শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতি চরিত্রে পাতিব্রত্যের সঙ্গে অসাধারণ তেজস্বিতা ও কোমলতার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী রাজ্ঞী গান্ধারীর স্বামীর জন্য ত্যাগস্বীকার পাঠককে বিস্ময়-মুগ্ধ করে। পতিকে অন্ধ, দৃষ্টিসুখে বঞ্চিত জেনে তিনি নিজ-চক্ষুকেও সর্বদা আবৃত রেখে সহধর্মিণী হয়েছিলেন। তাঁর পতিপ্রেম যেমন অনবদ্য তেমনই অভূতপূর্ব তাঁর নীতিবোধ ও ধর্ম-নিষ্ঠা। স্বামী-অনুরাগিণী তিনি, তথাপি কদাপি অধর্মপথাশ্রয়ী পুত্রের প্রতি স্বামীর স্নেহান্ধ পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করেননি। এহেন পুত্রকে শাসনে রাখার সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন স্বামীকে, নিজে পুত্রকে ভর্ৎসনা করেছেন, প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন। পুত্র প্রতিদিনই যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মাতাকে প্রণাম করে জয়ের জন্য তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছেন সকরুণভাবে। ধর্মাশ্রিতা মাতা কখনও বলেননি—তুমি জয়ী হও, বলেছেন—যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ।'[৮]

সত্যবান-পত্নী সাবিত্রী আবাল্য রাজপ্রাসাদের সুখে অভ্যস্ত হয়েও যেভাবে মৃত পতির দেহকে গভীর অরণ্যে স্বক্রোড়ে স্থাপন করে সকরুণ প্রার্থনার দ্বারা যমরাজের কাছ থেকে পতির পুনর্জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন, হিন্দুরমণী ভক্তিভরে তা শ্রবণ করে সাবিত্রীতুল্যা পতিব্রতা হবার চেষ্টা করে। তেমনিভাবে সে অনুসরণের প্রয়াস পায় দময়ন্তীকে, যিনি নিদারুণ দুঃখবিপর্যয়ের মধ্যে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করেছেন, তাঁর দুঃখভাগিনী হয়েছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বর্ণিত রাজকন্যা, রাজমহিষী, রাজকার্যনিপুণা, গার্হস্থ্যধর্মনিষ্ঠা চূড়ালাদেবী যোগী-মুনি-বাঞ্ছিত পরমতত্ত্বজ্ঞান অধিগত করেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও রাজ্যশাসন-রূপ-ধর্ম দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় করেছিলেন নিজ জীবনে।[৯] মার্কণ্ডেয় পুরাণে চিত্রিতা আত্মজ্ঞানামৃততৃপ্তা মদালসা নিজ শিশুসন্তানগণকে দোলনায় দোলাবার কাল থেকেই 'শুদ্ধোসি রে তাত'—'তুমি শুদ্ধ আত্মা' বলে শিক্ষা দিয়ে আত্মজ্ঞ করে তুলতে সচেষ্ট হতেন।[১০] বৌদ্ধ সাহিত্যে 'থেরী-গাথা' নামক পুস্তকে সন্ন্যাসব্রতাভিষিক্তা ক্ষেমা, সুমেধা, পটাচারা প্রভৃতি বাহাত্তরজন থেরীর নামোল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধদেবের বিমাতা

ও মাতৃষ্বসা রাজ্ঞী মহাপ্রজাপতি বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করেন। কথিত আছে বুদ্ধদেবের পত্নী যশোধরা 'স্বামীর গৃহত্যাগের পর হইতেই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাসাদেই বাস করিতেছিলেন।'[১১] গৃহে বাস করেও তিনি সন্ন্যাসিনীই ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব-সহধর্মিণী ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী-ভক্তি, কঠোর কৃচ্ছ্রতাময় জপতপ-পরায়ণ জীবন মধ্যযুগীয় ভারতের নারী-ঐতিহ্যের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বার্থচিন্তা বিস্মৃত হয়ে তিনি জগৎকল্যাণে স্বামীকে গৃহ-ত্যাগে সম্মতি জানিয়েছেন। নিজে অন্তঃপুরচারিণী থেকে স্বহস্তে অতিশয় নিষ্ঠা-ভক্তির সঙ্গে বৃদ্ধা শাশুড়ী, গৃহদেবতা রঘুনাথ, অতিথি-অভ্যাগত ও ভক্তজনের সেবায় জীবন অর্পণ করেছেন এবং অবসর-কালটুকু ভগবদারাধনা ও জপধ্যানে ব্যয় করেছেন। উত্তরকালে তাঁর সাধনভজনের মাত্রা, জীবনযাপনের কঠোরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাতঃকালে স্নানান্তে শালগ্রামে তুলসীমঞ্জরী নিবেদন, বেলা তৃতীয়প্রহর পর্যন্ত 'হরেকৃষ্ণ' নামজপ, তৎপরে ষোড়শ সংখ্যক জপের দ্বারা পবিত্রীকৃত হত যে-কটি তণ্ডুল —স্বহস্তে তা রন্ধন ও ভোগ নিবেদন, প্রসাদধারণ, প্রসাদ-বিতরণ, ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ —এরূপ নিষ্ঠাময় জীবন অনলসভাবে যাপন করেছেন। শ্রীবিশ্বম্ভর চৈতন্যদেবের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ভক্তগণের ভক্তিসাধনার সহায়করূপে শ্রীচৈতন্য-পূজার পথ নির্দেশ করেছেন।[১২]

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে যেসব মহান্ আধ্যাত্মিক ব্যক্তির দ্বারা সহজ-সরল অনাড়ম্বর, জনমানস-অনুকূল ভক্তিসাধনার প্রবর্তনা হয়েছিল মেবার রাজবংশীয়া মীরাবাঈ (১৫০৪-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। গিরিধর গোপালের প্রেমে রাজপ্রাসাদ-কুল-মান-ত্যাগিনী মীরার ভক্তিভাব, তাঁর গভীর মরমীয়া অনুভূতি, তাঁর রচিত ও গীত ভজনাবলী, ভক্তিমার্গ-অনুসারীদের সাধনার বিশেষ সহায়করূপে পরিগৃহীত হয়েছে। বহু সাধকের নিকট তিনি শ্রীরাধার দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে সম্পূজিতা। রাজপুতানী পদ্মিনীর শৌর্যবীর্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন নয়—তা বিশেষভাবে তাঁর সংযমপূত পাতিব্রত্যধর্মের উজ্জ্বল ছটা। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ (১৮৩৫-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) স্বামী রাজা গঙ্গাধর রাও-এর আদেশক্রমে সহমরণে ক্ষান্ত হয়ে দত্তক পুত্রের অভিভাবিকা হন, এবং রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুর্ধর্ষ ব্রিটিশরাজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রেও লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরাঙ্গনাধর্ম বা স্বাধীনতাধর্ম তাঁর পাতিব্রত্যধর্মেরই অন্যতর প্রকাশ।[১৩] অষ্টাদশ শতকে মহারাষ্ট্রের আর একজন বীরাঙ্গনা অহল্যাবাঈ (১৭৩৫-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) একদিকে যেমন সুষ্ঠু রাজ্য-পরিচালনা, তৎসহ ভারতবর্ষের নানাস্থানে অসংখ্য মন্দির, রাজপথ, ধর্মশালা, স্নানঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করে খ্যাতিমতী, তেমনিভাবে তিনি তাঁর ত্যাগ-তপস্যা ও কৃচ্ছ্রতাময় তপস্বী জীবনের জন্যও প্রসিদ্ধা। বিত্তশালিনী রাজ্ঞী হয়েও

তিনি নিজেকে সর্বদা দেশ, সমাজ ও মানুষের দীন সেবিকা বলে মনে করতেন। কলকাতার ভক্তিমতী রানী রাসমণি (১৭৯৩-১৮৬১ খৃষ্টাব্দ), তাঁর অসাধারণ বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা, সেবাপরায়ণতা, পরদুঃখকাতরতার সঙ্গে তাঁর তাপসী-সুলভ অনাড়ম্বর, বিলাসবর্জিত, পূজা-জপ-নিরত দিব্যজীবনের জন্য অগণিত মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ আজও পেয়ে থাকেন। পরলোকগত পতির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বিস্ময়কর দক্ষতার সঙ্গে সুবিশাল জমিদারি পরিচালনা করতেন। দরিদ্র প্রজাকুলের আপদে-বিপদে, সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে যে নিরন্তর জননীসুলভ চেষ্টা-যত্ন তিনি করতেন, তা তাঁর বিশাল মাতৃত্বের পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণি দেবী, শ্রীসারদাদেবীর মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গুরু যোগেশ্বরী ভৈরবী, শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলা-ভক্তদের মধ্যে অঘোরমণি দেবী (গোপালের মা), যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস (যোগেন-মা), গোলাপসুন্দরী দেবী (গোলাপ-মা), সন্ন্যাসিনী গৌরী-মা, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি দেবী প্রভৃতি কয়েকজন অতি উচ্চকোটি সাধিকার আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালে আমরা লক্ষ্য করি। এঁদের জীবনী পাঠ করলে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, এঁরা ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার যোগ্য ধারক, বাহক ও পুষ্টিবর্ধক। দক্ষিণ ভারতের মহীয়সী সাধিকাকুল সমভাবেই শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বিশেষত অধ্যাত্ম-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য পুণ্যশ্লোক অণ্ডাল, মধুরভাবাশ্রিত ভক্তিসাধনায় তিনি ভাগবতে বর্ণিত গোপীদের মতো উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন। তেমনি উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন কারাইক্কাল আম্মেয়ার, দেবাদিদেব মহাদেব শিবের প্রতি ভক্তিরসের আস্বাদন বিতরণে। বলাবাহুল্য, দক্ষিণ ভারতেও বহু নারী সাহিত্য, প্রশাসন বা শৌর্যবীর্যের ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধা হয়েছেন, কিন্তু সর্বত্র তাঁদের সংযম, তিতিক্ষা, পবিত্রতা, মাতৃজাতিসুলভ গুণের বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সনাতন ভারতীয় নারী-আদর্শের প্রতিমূর্তি শ্রীমা সারদাদেবীঃ শ্রীমা সারদা-দেবীর জীবন পাঠ করলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, অধ্যাত্মকেন্দ্রিক ভারতীয় নারী-জীবনাদর্শের, নারী-ঐতিহ্যের তিনি বিগ্রহস্বরূপা ছিলেন। তিনি পবিত্রতা-স্বরূপিণী, ক্ষমারূপা তপস্বিনী, পতিনিষ্ঠায় 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা তন্নামশ্রবণপ্রিয়া' এবং সর্বোপরি নিখিল জগন্মাতা। ত্যাগ-সেবা-স্নেহ-সরলতা-দিব্যজ্ঞান দিয়ে যেন নির্মিত তাঁর তনু। অতীব শারীরিক কঠোরতা ও অসচ্ছলতার মধ্যে যখন দক্ষিণেশ্বরের অপ্রশস্ত নহবতে তিনি দিন কাটাচ্ছেন তখন উপনিষদের মৈত্রেয়ীর মতো, ধনপতি লছমীনারায়ণ-নিবেদিত বিপুল অর্থ বিনম্র দৃঢ়তায় অকাতরে ত্যাগ করেছেন। রামনাদ-রাজপ্রতিনিধির আন্তরিক প্রার্থনাতেও তিনি রাজরত্নাগারের কানাকড়িটি পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয়েছেন : কামারপুকুরে স্বহস্তে শাক বুনেছেন ; লবণ জোটেনি—শুধু দুটি ভাত-সিদ্ধ খেয়ে দিনাতিপাত করেছেন, গাঁট দেওয়া ছিন্নবস্ত্র পরিধান করেছেন, কিন্তু স্বামীর নির্দেশ অমান্য করে একটি পয়সার জন্য কখনও কারুর কাছে হাত পাতেননি, অপরকে নিজ অভাবের কথা ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি।[১৪] পরবর্তীকালে অর্থ যা

জাগতিক ব্যবহার্য বস্তু তাঁর কাছে বহু এসেছে—সেসব অকাতরে বিলিয়েছেন। আর বিলিয়েছেন হৃদয় উজাড় করে জগতের মানুষকে, ইতরপ্রাণীকুলকেও—অপার্থিব স্নেহ, সেবাযত্ন। সামর্থ্যের অধিক শ্রম করে মানুষের সেবায়, সন্তান-নারায়ণের সেবায় শরীরস্বাস্থ্য ক্ষয় করেছেন। ত্যাগীশ্বরের তিনি যোগ্যা ত্যাগব্রতধারিণী সহধর্মিণী। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মতো শ্বাপদসংকুল অরণ্যে পতির অনুগমন তাঁকে করতে হয়নি, কিন্তু স্বামী-সেবার জন্য দস্যু-অধ্যুষিত তেলোভেলোর বিজন প্রান্তর নীরব নিশীথে নিঃসঙ্গভাবে অতিক্রম করা, অথবা পরবর্তীকালে স্বামীর জন্য বহুবার কামারপুকুর-জয়রামবাটী-দক্ষিণেশ্বরের সুদীর্ঘ পথ কোমল ক্লান্ত পদে, অবসন্ন দেহে অতিক্রম করা—কম বিপদ্বহ, বা কম দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল না। নিজের অসুবিধা তাঁর ভ্রূক্ষেপের মধ্যেই ছিল না। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের 'খাঁচায়' স্বামী, শাশুড়ী ও ভক্তসেবায় দিন-মাস-বর্ষব্যাপী স্বেচ্ছায় সানন্দে সোৎসাহে 'বন্দী'জীবন যাপন করেছেন, সেজন্য স্থায়ী বাতরোগ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার। কলকাতার ভক্ত-মেয়েরা নহবতের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে বলতঃ 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!'[১৫] অরণ্যচারিণী সন্ন্যাসিনীর মতো, মীরাবাঈ বা অণ্ডালের মতো, গভীর গহনে তপস্যা তিনি করেননি, কেননা প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু যেখানেই থেকেছেন সে স্থানকে, সে কুটিরকে, সে গৃহতলকে, প্রাসাদোপম অট্টালিকাকে, অথবা পথিপার্শ্বের পান্থশালাটিকে পর্যন্ত পুণ্যভূমি তপোভূমিতে রূপান্তরিত করেছেন। সর্বত্রই তপস্যা ও নীরব প্রার্থনাময় জীবন তাঁর। স্বামী, শ্বশ্রূ ও ভক্তদের সেবা নিরলসভাবে শরীরের কঠোর শ্রম দিয়ে যখন করছেন তখন তার সাথে সমান্তরালভাবে প্রত্যহ একলক্ষ জপ ও অবিরাম প্রার্থনা চালিয়ে গেছেন।[১৬] অন্যভাবেও সাধন করেছেন। নিজ আসনের চারিদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে, মস্তকের উপরে পঞ্চম অগ্নি গ্রীষ্মকালীন মার্তণ্ড রোষ বর্ষণ করছে—এর মধ্যে উপবিষ্ট থেকে সাতদিন উদয়াস্ত 'পঞ্চতপা' তপস্যা করেছেন—লোকালয়-বর্জিত অরণ্যে নয়, নিজ বাসগৃহের নিভৃত ছাদে।[১৭] রামকৃষ্ণদেবের মতো মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি তাঁর দেখা যেত না। আত্মস্বরূপ-গোপনপরা তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক-ঐশ্বর্য অনায়াসে কর্মের আবরণে আবৃত রাখতেন। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহে অবস্থান-কালেই ষোড়শীপূজার সময়, নহবতে ধ্যান-অবকাশে এবং পরবর্তী জীবনে বহুবার গভীর সমাধির ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। ঋগ্বেদের ঋষিকন্যা বাক্-এর মতো জগৎ-পালিনী শক্তি বা বিশ্বমাতার সঙ্গে, প্রতিটি অন্তরাত্মার সঙ্গে, আপন ঐক্য অপরোক্ষ করেছেন। 'যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥'—যিনি সমুদয় বস্তুকে নিজের মধ্যে এবং সমুদয় বস্তুর মধ্যে নিজেকে দেখেন, তিনি সেই দর্শনের ফলে কাউকে ঘৃণা করেন না।—ঈশোপনিষদের এই বাক্যের প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন। যদিও হাঁকডাক করে নিজ অনুভবের কথা রটনা করেননি, তবুও কথাপ্রসঙ্গে, পরিবেশের প্রয়োজনে, কখনও বা পূতচিত্ত ভক্তের প্রতি

অনুকম্পায়, আপন স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করে ফেলেছেন। বলেছেন: 'বেরাল-গুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।'[১৮] বলেছেন, তিনি সতের মা, অসতেরও মা, হ্যাঁ, ইতর জীবজন্তুরও তিনি মা।[১৯] বলেছেন, আমি কি এক মুখে খাই, আমি বহু মুখে খাই। ভগবতীর সঙ্গে, সতীর সঙ্গে, সীতার সঙ্গে, রাধিকার সঙ্গে, মা-কালীর সঙ্গে নিজ তাদাত্ম্যের কথাও বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে তিনি বাস করেছেন অথচ কখনও কখনও এমন হয়েছে, দু-মাসেও ভক্তপরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ-দর্শন ঘটেনি। বিরহবিধুরা শ্রীরাধার মতো প্রতীক্ষা করেছেন, মনকে প্রবোধ দিয়েছেন: 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি!'[২০] সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, যা সব সাধনার শেষের কথা—তা ছিল তাঁর কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ ও স্বাভাবিক। আপামর সকলকে তিনি সন্তানভাবে এবং নারায়ণভাবেও দেখতেন।[২১] নিশ্চয়ই নিজ অনুভূতি স্মরণে রেখেই বলতেন: 'সাধন করতে করতে দেখবে, আমার মাঝে যিনি তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি।' তাঁর একসময়কার অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন: 'নৈবেদ্য থেকে পিঁপড়েটাকে পর্যন্ত তাড়াতে পারিনে, বোধ হয় যেন ঠাকুর খাচ্ছেন।'[২২] এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই তিনি দস্যু আমজাদ, গৃহভৃত্য গোপাল, অন্য বাড়ির ঝি, চাকরানী ও অগণিত অনাহূত রবাহূতের সেবায় তিলে তিলে নিজ শরীর-স্বাস্থ্য ধ্বংস করেছেন, সেবিতের হৃদয় আনন্দে ভরপুর করে দিয়েছেন, এবং নিজেও আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন এই নিঃশেষ আত্মত্যাগের মধ্যে। জগতের ইতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', যাকে স্বামী বিবেকানন্দ 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' আখ্যা দিয়েছেন, শ্রীমার জীবনচর্যা তার প্রকৃষ্ট জ্বলন্ত উদাহরণ। পুত্রকন্যাজ্ঞানে সবার সেবা করেছেন কিন্তু স্নেহান্ধতা বা মোহের সঙ্কীর্ণতা তাতে ছিল না। মদালসার মতো আত্মজ্ঞানলাভের পথে, সন্ন্যাসের পথে সুকুমারমতি তরুণদের উৎসাহিত করেছেন, সাহায্য করেছেন, অফুরন্ত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আর অবর্ণনীয় তাঁর সুস্থিত প্রজ্ঞা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা! যে পারিবারিক পরিবেশে—শিষ্ট ও অশিষ্ট, সৎ ও অসৎ, পাগল ও বদমেজাজী, খাম-খেয়ালী ও ঝগড়াটে, শান্ত ও কলহপ্রিয়দের মধ্যে বাস করে চিত্তের উদার-প্রসন্নতা যেভাবে অনুক্ষণ বজায় রেখেছেন, তা আমাদের স্তম্ভিত করে। চিন্তায় তার তল পাওয়া যায় না। তাঁকে অনুধ্যান করলে ধারণা হয়—গীতোক্ত 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বা স্থিত-প্রজ্ঞত্বভাবের পূর্ণতা সত্যই সম্ভবপর। পতি-অনুগামিনী তিনি, সর্বপ্রকারে সহ-ধর্মিণী। বৈদিক বিবাহমন্ত্রে পতি নিজব্রতে পত্নীকে হৃদয় নিয়োগ করতে, পত্নীচিত্তকে পতিচিত্তের অনুসরণ করতে বলেন:

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু
মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু।[২৩]

সারদাদেবী ঠিক তা-ই করেছিলেন—পতির ব্রতে হৃদয় দিয়েছিলেন, পতির চিত্তের অনুচিন্তা হয়েছিলেন। তাঁর জীবনবীণাকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবীণার সঙ্গে একই সুরে বেঁধেছিলেন। 'কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রশ্নের উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে সমীপাগতা শ্রীমা বলেছিলেন: 'না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'[২৪] শুধু বলা নয়, আচরণদ্বারা সে উত্তরের যাথার্থ্য তিনি প্রমাণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামীর আরব্ধ ব্রত—মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে ধর্মসংস্থাপন—নিরলসভাবে উদ্‌যাপন করেছেন, মরজীবনের অন্তিম দিবস পর্যন্ত, সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পতি শ্রীচৈতন্যদেবের দেহত্যাগের পর আদর্শ-জীবন যাপন দ্বারা ভক্তসমাজকে অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত রেখেছিলেন। শ্রীমা শুধু আদর্শ-জীবন যাপন নয়, সক্রিয়ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাই যে-কোন বিচারে শ্রীমাকে ভারতের প্রাচীন নারী-আদর্শের যোগ্য প্রতিনিধি, সে-আদর্শের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ বলে স্বীকার করতে হয়। কবিদের ভাষায় বলতে হয়:

হিন্দু-নারী-মহিমার পূর্ণরূপ প্রকট তোমায়।
আদর্শ জননী, জায়া, কন্যা, ভগ্নী, আচার্যা মায়ায়
মহাদেবি, মানবীর বেশে
দেশ কাল পাত্র-পাত্রী, জাতি-বর্ণ, ধর্ম-নির্বিশেষে
সকলেরে বাসিয়াছ ভাল,
তব স্নেহচ্ছায়াতলে কত খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, জৈন, অহিন্দুরও জীবন জুড়াল!
খ্রীষ্টান তোমার মাঝে দেখিয়াছে মেরী জননীর
পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি; বৌদ্ধ সমাজীর
যশোধরা দেবী তুমি, বৈষ্ণবের তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া,
এক হাতে বর আর হাতে অভয় বহিয়া
আসিয়াছ বিশ্বধামে প্রচারিতে মায়ের মহিমা
শ্রীমা, তুমি জগতের শ্রীমা।
তোমার চরিত্রপাঠ, গীতা, বেদ, সংহিতা পাঠের
সুফল প্রদান করে; সর্বগ্লানি ঘুচায়ে প্রাণের
জীবন সার্থক করে; তুমি মূর্ত গীতা,
তুমি স্বাহা, স্বধা, গৌরী, তুমি গঙ্গা হিমাদ্রিদুহিতা;
সারদা সার্থক নাম,
তোমারে প্রণাম।[২৫]

নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়: তাঁর চরিত্র-দর্পণে অতীতের অসংখ্য বরণীয়াকে প্রতিবিম্বিত দেখেছি, তাঁরই জীবন-মর্মে পশ্চাতের ভুলে যাওয়া অনাদৃত কত না সম্পদের মূল্য নিরূপণ করতে পেরেছি! তিনি এক হয়েও অগণ্য বহুর পরিচয় বহন করে এনেছেন, নতুন হয়েও দূরবিস্তৃত পুরাতনকে ধরে রেখেছেন।[২৬] তিনি বিদুষী-

রূপে, কবিরূপে, কথাসাহিত্যিকরূপে, বিতর্ককুশলা মনস্বিনীরূপে, রাজ্ঞীরূপে বা যোদ্ধৃরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হননি—কিন্তু নিঃসন্দেহে তিনি ঐসকল ভূমিকার শক্তি-ভিত্তি। মাতৃত্ব-সতীত্ব-সংযম-ত্যাগ-তপস্যা-স্নেহ-সেবা আদি গুণরাজির এক সর্বাঙ্গসুন্দর পূজার্হ প্রতিমা।

শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে আধুনিক যুগের গ্রহণীয় জীবনাদর্শঃ বর্তমান যুগ কর্মমুখর। পুরুষদের মতো নারীদেরও জীবনে বহুপ্রকার জটিল কর্মের প্রসার ও ব্যস্ততা এযুগে। ভারতের নারীজীবনে মূল্যবোধের অনেক পরিবর্তনও লক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষাদীক্ষায়, প্রতিভা-বিকাশের সর্বভূমিতে, সর্বপ্রকারের কর্মক্ষেত্রে, পুরুষদের সঙ্গে সমকক্ষ, এমনকি প্রতিযোগী হয়ে চলার ব্যাপারে নারীসমাজ দ্রুত পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। নারীসমাজ যেন ভাবতে শুরু করেছে যে, তার জীবনের সার্থকতা—সনাতন কালার্জিত দৈবীগুণসমূহের বিকাশে নয়, তা সর্বকর্মক্ষেত্রে, সর্বপ্রতিভা-বিকাশভূমিতে, পুরুষদের সমকক্ষ বা তুলনায় অধিকতর দক্ষ হওয়ায়। এহেন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন জেগেছেঃ শ্রীমা সারদাদেবী প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের অধুনাতন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেও আধুনিক নারীজগৎ তাঁকে কি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নারী-জীবনাদর্শের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে বা বরণ করে নিতে পারবেন? এযুগের নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্তরের গভীর আকূতি, আদর্শবোধ, মূল্যবোধ কি শ্রীমার জীবনাদর্শদ্বারা তৃপ্ত হবে? অথবা একথা কি মানতে হবে যে, তিনি যে-আদর্শের প্রতিনিধি তার দিন ফুরিয়ে গেছে? একথা কি বলতে হবে যে, তিনি প্রাচীন নারী-আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, এবারে রাজত্ব করবে নতুন যুগের নতুন আদর্শ? এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, উত্থাপন করেছেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে। তিনি উল্লেখ করেছেনঃ 'আমার সব সময় মনে হয়েছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোন নতুন আদর্শের অগ্রদূত?' [২৭]

নবীন জীবনদর্শনের আদর্শ রূপ—শ্রীমার জীবনচর্যায় তার প্রবহমান ধারা। শ্রীমার জীবনচর্যার মধ্যে বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ-জীবনের ফল্গুধারাঃ প্রশ্ন হতে পারেঃ নবীন নারী-জীবনাদর্শ বলতে আমরা কি বুঝব? কাল প্রাচীন বা নবীন যা-ই হোক, ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসারে সর্বকালের মনুষ্যজীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য—আর আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতম বিকাশসাধন—একে আত্মোপলব্ধি, ভগবৎ-উপলব্ধি, স্বরূপদর্শন, সত্য-সাক্ষাৎকার, মুক্তি, নির্বাণ—যে-নামে বর্ণনা করা হোক না কেন। এ ঐতিহ্য-মতে, মনুষ্যসমাজের, তৎসহ সামাজিক রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানাদিরও লক্ষ্য ঐরূপ বিকাশে মানুষকে সাহায্য করা। চরম লক্ষ্যের দিক থেকে বিচার করলে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ আর নবীন ভারতীয় জীবনাদর্শ মূলত একই বস্তু। কিন্তু যে-উপায়ে, যে-জীবনচর্যার দ্বারা, যে-বাহ্যিক কর্ম ও কর্মকেন্দ্রিক শুভভাবনার দ্বারা, সে-আদর্শে উপনীত হওয়া যায়—তা যুগভেদে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অনেকখানি ভিন্ন হতে বাধ্য। সে উপায়কে তত্তৎযুগের আশা-

আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তত্তৎযুগের নরনারীর মানসিক গঠন ও প্রকৃতির অনুকূল হতে হবে। নবীন জীবনাদর্শ ভগবৎ-উপলব্ধির জন্য শুধুমাত্র ব্রত-উপবাস-জপতপযুক্ত জীবনচর্যা অনুমোদন করে না। সে বিশ্লেষণ ও যুক্তিবিচারের তুলাদণ্ডে প্রাচীনের মধ্যে যা কিছু কুসংস্কারময়, অযৌক্তিক, তাকে বর্জন করে. এবং আধুনিক কালের, বর্তমান সভ্যতার, যা কিছু মহৎ সেগুলি সাগ্রহে বরণ করে স্বায়ত্ত করে। এই মহত্তম জীবনাদর্শগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্যঃ যুক্তিবিচার-নির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, মানবসাম্যবাদ, দেশসেবা, মানবসেবা, সর্বপ্রকারে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগসাধন, শিক্ষা-শিল্প-বাণিজ্যাদি সংগঠন, সর্বকর্মক্ষেত্রে কুশলতা অর্জন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমর্থিত, স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত, ঈশ্বরসেবা-বুদ্ধিতে নরনারায়ণের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অভাবপূরণের দ্বারা তার বিচিত্র প্রকারের সেবা—এই নবীন জীবনাদর্শের প্রধান সাধনা বলা যেতে পারে। এরূপ নবীন জীবনাদর্শের সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর কি সংযোগ ছিল ?

এযুগের প্রগতিশীল নারীদের মতো শ্রীমার স্কুল-কলেজের বিদ্যা ছিল না, যদিও গৃহে চর্চার দ্বারা রামায়ণাদি তিনি পড়তে পারতেন। শিক্ষিতা মেয়েরা আজকাল শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা, আইনজীবী, ব্যারিস্টার, করণিক, সমাজসেবিকা, প্রশাসিকা, নেত্রীপদাভিষিক্তা হচ্ছেন। শ্রীমা তার কোনটাই ছিলেন না।

পল্লীগ্রামে অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম, বিধিনিষেধ-সঙ্কুল গ্রাম্য-সমাজে তাঁর বাল্য, কৈশোর এবং পরবর্তী জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত। শহুরে নারীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারী-স্বাধীনতা, শিক্ষায় ও জীবিকায় সম-অধিকার অর্জনের যে-ভাবধারা তখনকার দিনেই জেগেছিল এবং বর্তমানে প্রবল রূপ ধরেছে, তা তাঁকে স্পর্শমাত্র করেনি। সাধারণ বিজ্ঞান ও ছোটখাট যন্ত্রপাতি-বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা, তাঁর স্বভাবসুলভ সরলতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অপরের হাসির খোরাকই জোগাত। 'তিনি [লণ্ঠনের] চিমনি খুলিয়া পরিষ্কার করিতে পারিতেন না ; বলিতেন. "ওতে অনেক কলকব্জা, আমি খুলতে পারিনে।"' কলকাতার একটি মেয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ 'অমুকের বউ ঘড়িতে দম দিতে জানে।'[২৮]

বাল্যে—গৃহস্থালির কাজে মা-বাবাকে সাহায্য করা, গরু-বাছুর পালন, মুনিষ-দের খাবার নিয়ে যাওয়া, ভাইদের যত্ন নেওয়া, কৈশোরে-যৌবনে—পতিদেবতা ও শ্বশ্রূ-দেবীর সেবা, আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগতের পরিচর্যা—এই ছিল শ্রীমার নিত্য-কর্ম। উত্তরকালে এর সঙ্গে যুক্ত হল সমীপাগত নরনারীদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটানো—দীক্ষা-সদুপদেশ দান ও জননীর স্নেহ-যত্ন-সেবা। প্রাচীনপন্থী রমণীদের কর্মসূচীর সঙ্গে এই কর্মচিত্র খুবই মেলে। শ্রীমার নিজের জপ-তপ-সাধনা—এসবের ফাঁকে ফাঁকে। তার চিত্রঃ শেষরাত্রে শয্যাত্যাগ, গঙ্গাস্নান, নিয়মিত জপ-ধ্যান-প্রার্থনা, কখনও তীর্থপর্যটন, কখনও সুকঠোর 'পঞ্চতপা' অনুষ্ঠান এবং অনুরূপ বহু কিছু। ধর্মসাধনার এসকল অঙ্গও প্রাচীনদের সাধনপদ্ধতিরই অনুসরণ করছে। সুতরাং এসব দেখে মানুষ তাঁকে প্রাচীন আদর্শপন্থীদের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করতেই চাইবে—এটাই স্বাভাবিক মনে হয়।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে যে, উপরি-উক্ত চিত্র শ্রীমার জীবনের সব দিক প্রকাশ করছে না। তাঁর জীবনবৃত্ত ঐ কর্মসূচীর বাইরেও সম্প্রসারিত ছিল। নবীনপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি তাই সহজেই তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল। নিবেদিতা লিখছেনঃ 'মা পড়তে জানেন...লিখতে পারেন না। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন, তিনি অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকমাত্র। দীর্ঘকাল ধরে তিনি শুধু সংসার পরিচালনা এবং ধর্মজগৎ সম্বন্ধে কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা নয় ; ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং প্রায় সমস্ত প্রধান তীর্থগুলো দর্শন করেছেন। আর মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে ব্যক্তিগত চরিত্রে যতখানি উৎকর্ষ লাভ সম্ভব, তিনি তার পূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাতসারে এই মহাপুরুষ-সংসর্গের পরিচয় দিয়ে থাকেন।'[২৯] সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে শ্রীমা নরদেহে পরমেশ্বরী। সুতরাং বাহ্য-অভিজ্ঞতা ছাড়া নিজ দিব্যদৃষ্টির দ্বারাও একালের মানুষের মানসিক গঠন, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি জেনেছিলেন—ধরে নেওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, অবতার দিব্য ও লৌকিক উভয় ভাবভূমি থেকে জীবজগৎকে প্রত্যক্ষ করেন। আমাদের ধারণা, শ্রীশ্রীমার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তা-ই হয়েছিল। যেভাবেই হোক, অপরের ভাব যথাযথ বুঝবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে এতখানি উৎকর্ষলাভ করেছিল যে, তিনি সনাতনপন্থীদের ভাবধারা যেমন বুঝতে পারতেন, নবীন-মার্গানুসারীদের চিন্তাভাবনা, বিশেষত যে-কোনও প্রকার 'নূতন ধর্মীয় ভাব বা অনুভূতিকে মুহূর্ত-মধ্যে হৃদয়ঙ্গম'[৩০] করতে পারতেন। এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হিসাবে নিবেদিতা নিজ স্মৃতি থেকে দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার ইস্টারের দিন অপরাহ্ণে নিবেদিতাদের বাসায় খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কীয় কিছু স্তোত্র একটা 'অর্গান'যোগে গাওয়া হয়। স্তোত্রগুলি শ্রীমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। শ্রীশ্রীমা কিন্তু ঐগুলির সূক্ষ্ম মর্ম গ্রহণ করলেন এবং এমনভাবে ঐবিষয়ে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন—যা নিবেদিতার মতে—গভীর পাণ্ডিত্যমণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে আশা করা যায়। আর এক সন্ধ্যায় খ্রীষ্টানসমাজে প্রচলিত বিবাহের 'শপথবাক্যগুলি তাঁকে হাস্যকৌতুকমিশ্র-ভঙ্গিতে, বর-কন্যা-পুরোহিতের অভিনয় করে শোনানো হল। 'সম্পদে-বিপদে, ঐশ্বর্যে-দারিদ্রে, রোগে-স্বাস্থ্যে—যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে' শপথবাক্যগুলির এইসব অংশ শুনে সকলেরই আনন্দ হল বটে কিন্তু শ্রীশ্রীমার মতো অপর কেউই ঐ কথাগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করতে পারলেন না। বার বার তিনি ঐ কথাগুলির আবৃত্তি করালেন এবং বললেনঃ 'আহা, কী অপূর্ব ধর্মভাবের কথা! কী ন্যায়পূর্ণ কথা!'[৩১]

নবযুগাদর্শ—সেবাধর্ম: নবীন জীবনাদর্শের সাধনপদ্ধতির বিশেষত্বসূচক প্রধান অঙ্গটি হল—শিবজ্ঞানে জীবসেবা—উপাসনাবুদ্ধিতে সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করা। ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য গৃহী বা সন্ন্যাসী সকলেই এই উপায়ের উপর জোর দেবেন নবীনমার্গ একথা ঘোষণা করছে। অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান—সবই এই সেবাবুদ্ধি,

পূজাবুদ্ধি যুক্ত হয়ে করতে হবে। নবীনপন্থা বলে—জপধ্যান, ব্রত-উপবাস যেমন সাধন-অঙ্গ, নারায়ণবুদ্ধিতে মানবসেবাও তেমনই। এ-মতে সব কাজই আধ্যাত্মিক (spiritual) ; জাগতিক (secular) বলে কিছু নেই। অতএব যে নিষ্ঠাদ্বারা প্রাচীনরা ধ্যান-ধারণা করতেন, সেই ভক্তিনিষ্ঠা দিয়ে মানুষ-নারায়ণের সেবা করতে হবে। শুধু মন্দির-মসজিদকে উপাসনাগার মনে করা চলবে না ; হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, খেত-খামার, কলকারখানাগুলিকেও ঈশ্বর-আরাধনার পীঠ বলে ধারণা করতে হবে। কারণ সেসব জায়গায় তো নরনারায়ণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেবারূপ পূজা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত এই শিবজ্ঞানে জীবসেবাকেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'প্র্যাকটিক্যাল (ব্যবহারিক) বেদান্ত'।

গৃহীদের পক্ষে সর্বপ্রকারের সমাজসেবামূলক কাজে যোগ দেওয়ায় অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীরা অন্তত বিগত অনেক শতাব্দী কেবল শ্রবণ-মনন, ধ্যান-ধারণা, ব্রত-উপবাস, তীর্থপর্যটন, শাস্ত্রব্যাখ্যান—এই কার্যক্রম অনুসরণ করে চলেছেন। সমাজে ঐহিক (secular) শিক্ষাবিস্তার, রোগী-পরিচর্যা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে, বৌদ্ধযুগের কথা ছেড়ে দিলে তাঁদের সংস্রব ছিল না বললেই চলে। কাজেই স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে এই নবীন-সাধন-পথকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী বরণ করে নিল তখন সনাতনপন্থীর দল—এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যমণ্ডলীর অনেকেও—সে-পথকে নির্দ্বিধায় স্বাগত জানাতে পারলেন না।[৩২] অন্যে পরে কা কথা! স্বামীজীর প্রিয় গুরুভ্রাতাদের অন্যতম স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে বোঝাতে চাইলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনে ঐসকল কাজের প্রবর্তন বিদেশীভাবে করা হচ্ছে। তাঁর ঐ ধারণা স্বামীজীর কথায় পরে বিদূরিত হলেও গৃহী-ভক্তদের মনে ঐ-বিষয়ে সন্দেহ বহুদিন বলবৎ ছিল।

সারদাদেবী-কর্তৃক বিদেশীয় ও ভিন্ন-ধর্মীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য উপলব্ধির কথা আমরা নিবেদিতার লেখা থেকে পেলাম। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগোপযোগী এই নবীন-সাধন-পন্থাকে শ্রীমা কতখানি গ্রহণ করেছিলেন? সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে কতখানিই বা অনুমোদন করেছিলেন? কিংবা অনুমোদন যদি বা করে থাকেন, অনুমোদনের পর ঐ-পন্থাকে সমাজে প্রচলিত করতে তিনি কিছু সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কিনা? শ্রীমা নবীনপন্থীদের নবীন জীবনাদর্শের অগ্রদূত কিনা, হলে কতখানি, তা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করছে—যেহেতু এইরূপ সেবাব্রত নবীনপন্থার প্রাণসদৃশ।

এ-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 'আমার জীবন ও ব্রত' নামে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেছেন যে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লব্ধ নবযুগধর্ম প্রচারে তাঁরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ত্যাগব্রতী যুবক বদ্ধপরিকর তখন তাঁদের মনোভাবকে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করবেন, তাতে সহানুভূতি দেখাবেন এমন কেউই ছিলেন না—একজন ছাড়া। সে একজন হলেন শ্রীমা সারদাদেবী।[৩৩] স্বামীজীর এই উক্তিটির তাৎপর্য বড় কম নয়। তৎকালের

প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের পর, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত গৃহী-ভক্তদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। স্বামীজীর শ্রদ্ধেয় জীবনীকার উল্লেখ করছেনঃ 'ইহাই [ব্রাহ্মসমাজের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন] কিন্তু নবযুগের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই অতঃপর আসিলেন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্তবৃন্দ। ইঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া চিনিলেও তাঁহার জীবন ও বাণীর নবযুগোপযোগী কোন নূতন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রাচীন ধারা, ভাষা ও প্রতীকাদি অবলম্বনে তাঁহাকে বুঝিতে যাইয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হইলেন। অতএব প্রয়োজন হইল ইয়ং বেঙ্গলের--বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকবৃন্দের...যাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিক পথ ভিন্ন অন্য পথে না চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যায় নাই, সত্যের জন্য যাঁহারা উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত দ্বার। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বাগ্রণী ছিলেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (ভাবী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ)।'[৩৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃতবিদ্য, বহুদর্শী, বিদ্বান গৃহী-ভক্তগণও যে-নবীনপন্থার মর্ম-গ্রহণে সক্ষম নন—লজ্জাশীলা, স্কুল-কলেজীয় শিক্ষাদীক্ষাহীনা শ্রীমা তা সম্যক্ বুঝলেন—এটি যেমন বিস্ময়ের বিষয় তেমনই তাঁর উদার, উন্মুক্ত, স্বচ্ছ দৃষ্টিরও পরিচায়ক।

সন্ন্যাসীদের নবীন-সাধন-পন্থাকে এযুগে প্রবর্তন করতে শ্রীশ্রীমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাঃ স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বোল্লিখিত উক্তিটি শ্রীমা সারদাদেবীর নবীনপন্থী ভাবগ্রাহিতার একমাত্র প্রমাণ নয়। পরবর্তীকালের বহু ঘটনা সুস্পষ্ট করে যে, তিনি হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে ঐ পন্থাকে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ঐ ভাবধারাকে সমাজে, বিশেষত রামকৃষ্ণসঙ্ঘের মাধ্যমে, কার্যকর রূপ দেবার ক্ষেত্রে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রয়েছে।

শ্রীমার প্রগতিপন্থী মনের একটা নিদর্শন—স্বামী বিবেকানন্দকে প্রচারকার্যে আমেরিকায় যাবার জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও অনুমতি দান। মনে রাখতে হবে সেকালে রক্ষণশীল, শাস্ত্রবিশারদ অনেক পণ্ডিতও স্বামীজীর সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে দৃঢ় মত পোষণ করতেন।

নবীন ভাবধারা অনুশীলন ও প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণ মঠ ও সঙ্ঘ। শ্রীমা আপাতদৃষ্টিতে এই মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করেননি, কিন্তু তাঁর সকরুণ সাশ্রু প্রার্থনা এই প্রতিষ্ঠার মূলে। এই প্রার্থনার কথা, সেইসঙ্গে ভাবী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও ব্রতের কথা তাঁর নিজভাষায় এইরূপঃ 'আহা, এর [এই মঠের] জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় আজ মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সব সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, "ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে, আনন্দ করে চলে গেলে ; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট

করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। ...আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসার-তাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে।" ...তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।'[৩৫] কথাগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুধু মাতৃস্নেহের পরিচয় আমরা পাই না, রামকৃষ্ণসঙ্ঘের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর প্রগতিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ এখানে সমুজ্জ্বল। তাঁর মতে, নবীন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গতানুগতিক, প্রাচীন পন্থায় অভ্যস্ত গাছতলার সাধুসম্প্রদায়ের মতো হবে না। দ্বিতীয়ত, সেই সঙ্ঘের কাজ হবে ঠাকুরের ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্র থাকা। স্বামীজী এই কথাটিকেই যেন রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য বলে পরে ঘোষণা করলেন: 'মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার...তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই "প্রচারের" (মিশনের) উদ্দেশ্য।'[৩৬] তৃতীয়ত, শ্রীমার দৃষ্টিতে এই মঠের ব্রত শুধু নিজ নিজ মুক্তি নয় (শুধু ঠাকুরের ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্র থাকা নয়), সঙ্গে সঙ্গে জগতের কল্যাণসাধন। তিনি চান—সংসার-তাপ-দগ্ধ লোকের আশ্রয়স্থল হবে এই মঠ। এ যেন একটু অন্য-ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আদর্শেরই মুখবন্ধ-কথন।

নবীনপন্থার ধারক ও বাহক রূপী রামকৃষ্ণসঙ্ঘ স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ক্ষান্ত হননি, 'তিনি যতদিন মর্তধামে ছিলেন, ততদিন সঙ্ঘ যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হয় তদ্বিষয়েও সচেষ্ট ছিলেন।'[৩৭] 'প্রত্যক্ষতঃ উহার পরিচালনায় নিরত না থাকিলেও দূর হইতে পরামর্শ দিয়া, আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং স্নেহের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া সঙ্ঘের গতি নিয়মিত করিতেন।'[৩৮] স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ সঙ্ঘনেতাগণও তাঁর মতামতকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। কার্যক্ষেত্রে দেখাও যেত যে, শ্রীমার মত অভ্রান্ত, তাঁর নির্দেশিত পথ উদ্ভূত সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধানসূত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তাঁর করণীয়গুলির মধ্যে তরকারিকাটা, বাসনমাজা, ঘরনিকানো প্রভৃতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গৃহস্থালির কাজ যেমন অন্তর্ভুক্ত তেমনই অন্তর্ভুক্ত ক্রমবর্ধমান একটি সঙ্ঘের মৌল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার চিন্তন ও উপযুক্ত নির্দেশদান। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বহু জটিল বিষয়ে তিনি কত সহজে সমাধান দিতেন, আর ঐসব চিন্তা করার মতো তাঁর বুদ্ধি কিরূপ স্বচ্ছ, দৃষ্টিভঙ্গি কত দেশকালোপযোগী ছিল! ভগিনী নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন: 'তাঁর সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তাঁর সকল অভিজ্ঞতার মূলে আছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস।' তবু 'কোন প্রশ্নের—সে প্রশ্ন যত নতুন বা জটিল হোক না কেন—উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করে দিতে তাঁকে কখনও ইতস্তত করতে

দেখিনি।...তাঁর বুদ্ধির অতীত কোন নতুন সামাজিক জটিল সমস্যার দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে বা কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যদি কেউ তাঁর কাছে আসে, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত দৃষ্টি দ্বারা প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করে প্রশ্নকর্তাকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। যদি কোন কারণে কঠোর হবার প্রয়োজন হয়, অর্থহীন ভাবপ্রবণতার দ্বারা বিচলিত হয়ে তিনি দোলায়মান-চিত্ত হন না।'[৩৯] স্নেহ-কোমলতার প্রতিমূর্তি শ্রীমার এরূপ কর্ম-দক্ষতা, এবং জটিল সমস্যা অনুধাবনের বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করবার বিষয়। কেননা তাঁর জীবনের এই দিকটা না জানলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েরা হয়তো চিন্তা করবেন যে, তাঁর মাতৃত্ব-পবিত্রতা-ভক্তি-সেবাময় জীবনাদর্শ গৃহস্থালি-পরিবেশেই অনুসরণ করা যেতে পারে কিন্তু দেশ ও সমাজের বৃহত্তর, জটিলতর কর্মক্ষেত্রে নামলে সেটা করা সম্ভব নয়। স্বামী বীরেশ্বরানন্দের[৪০] মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছেনঃ 'আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা আগেকার মতো কেবল রান্নাঘরে আবদ্ধ না থেকে বাইরে কাজকর্মে নানাদিকে এগিয়ে আসছেন। কেউ রাজনীতিক্ষেত্রে, কেউ ডাক্তারীতে, কেউ নার্সিং-এ এমনি সর্বত্র তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এ প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু এইসব করতে গিয়ে তাঁদের নিজস্ব আদর্শ ভুলে যাবার ভয়ও আছে। সেইজন্যই—মা আদর্শ জীবন দেখিয়ে গেলেন—যেন আদর্শের একটি ছাঁচ তৈরী করে রেখে গেলেন। আমাদের দেশের মেয়েদের আদর্শ হল মাতৃত্ব, পবিত্রতা। আমাদের মেয়েদের আজ মায়ের জীবনের ছাঁচে জীবন ঢেলে নিতে হবে; ...আবার সেইসঙ্গে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েও চলতে হবে।' এ-আদর্শ 'শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা জগতের জন্যই প্রয়োজন।'[৪১]

আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে নতুন অবস্থার সঙ্গে, দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার শিক্ষা শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটেই লাভ করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশই ছিলঃ 'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন।' শ্রীমার নবীন দৃষ্টিভঙ্গির ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবার পরিচায়ক কিছু কিছু দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন—রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধ মনোভাবের কথা জেনেও মা নিবেদিতা প্রমুখ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যাদের আপন বলে গ্রহণ করলেন; নিবেদিতাকে নিজঘরে বিশ্রাম করতে দিলেন।[৪২] আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করে আমাদের বালিকারা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা লাভ করবে এই উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতা বাগবাজার পল্লীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন। শ্রীমা স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর-পূজা করে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে এই শুভ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। পূজান্তে প্রার্থনা করলেনঃ 'যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।'[৪৩] বিদ্যালয়টির সুবিধা-অসুবিধা, উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে শ্রীমার বরাবরই দৃষ্টি ছিল। বিদ্যালয়ে খুব স্থানাভাব দেখে একবার গণেন মহারাজকে

অনুরোধ করছেন: 'এদের...মাথা গুঁজবার [একটা] জায়গা করে দাও।'[৪৪] সুধীরা দেবী ঐ স্কুলে মেয়েদের সেলাই করা, জামা তৈরী করা ইত্যাদি শেখান। এ-ধরনের আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা অনুমোদন করে শ্রীমা তাঁর খুব তারিফ করেন।[৪৫] গৌরী-মার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিও শ্রীমার অনুরূপ সুপ্রসন্ন দৃষ্টি। মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, কাজ শিখছে—এতে তাঁর আনন্দ। যখন কোন কোন অভিভাবক মেয়েদের সেরূপ সুযোগ না দিয়ে 'আট বছর হতে না হতেই বলে—"পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও"' শ্রীমা তখন তাদের দেখে 'পোড়া দেশের' জন্য.আক্ষেপ করছেন।[৪৬]

রামকৃষ্ণসঙ্ঘে নরনারায়ণসেবাকে সাধন হিসাবে গ্রহণ করা ব্যাপারটা খুব সহজ-ভাবে সম্পন্ন হয়নি—আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভক্তদের মধ্যে মাস্টারমশাই ('কথা-মৃত' চয়নকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) প্রভৃতি ভাবতেন যে, সাধনভজন দ্বারা ঈশ্বরলাভ না করে সমাজসেবায় ব্রতী হওয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবের অনুকূল নয়।[৪৭] এরূপ পরিস্থিতিতে শ্রীমা স্বামীজী-প্রবর্তিত নবীন-সাধন-মার্গকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন—তাঁর দিব্য অনুভব ও যুক্তির ভিত্তিতে এবং নিজ আচরণের দৃষ্টান্তে। তাঁর অনুভবের বহু নিদর্শন তাঁর উক্তি থেকেই পাওয়া যায়। তিনি যে সবার সেবা করতেন. সে তাদের একইসঙ্গে সন্তানভাবে ও নারায়ণভাবে দেখে করতেন।[৪৮] মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীর মধ্যেও ঈশ্বরদর্শন করে তিনি তাদের সেবা আজীবন করেছেন। কাশী সেবাশ্রমে রোগীদের সেবা-পরিচর্যা দেখে তিনি বললেন: 'দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।' সাধু-ব্রহ্মচারীদের সেবাব্রত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—একথা এরপর থেকে মাস্টারমশাই আর অস্বীকার করলেন না।[৪৯] মনস্তত্ত্বসম্মত-যুক্তি তিনি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন মোটামুটি এইরূপে: 'কাজ না করলে কি মন ভাল থাকে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানচিন্তা করা যায়? তাই কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ওতে মন ভাল থাকে।' 'সব সময় জপধ্যান করতে পারে কজন? ...মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার ঐসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।' 'ঠাকুরের কথা বলছ—তাঁর আলাদা কথা...।' 'ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।'[৫০] শ্রীমার এরূপ দৃঢ় সমর্থন ছাড়া 'সন্ন্যাসীর পক্ষে নবীন সেবাধর্ম বিধেয়'—এই মত নিঃসঙ্কোচে উত্তরকালীন সন্ন্যাসিগণ ও সাধারণ মানুষ প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারত কিনা সন্দেহ। শ্রীমা নিজে উদার, নবীন দৃষ্টিযুক্ত না হলে এরূপ সমর্থন করতে নিশ্চয়ই পারতেন না।

নিজ আচরণের দৃষ্টান্তে শ্রীমা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ নবীন-সাধন-পন্থাকে যে কী অতুলনভাবে এযুগে উপস্থাপিত করেছেন তা বুঝাবার অপেক্ষা রাখে না। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ঘন ঘন সমাধিলীন হয়ে তিনি 'জীব-শিব তত্ত্ব' আমাদের বোঝাচ্ছেন না। তাঁর সমাধি আছে—কিন্তু তা খুবই চাপা. অদ্ভুত তাঁর আত্মগোপন! স্বামী বিবেকানন্দের মতো দর্শন-বিজ্ঞান-যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আস্তিক-নাস্তিক,

অধ্যাত্মবাদী-জড়বাদী, পণ্ডিত-মূর্খ সবার কাছে জীবের শিবত্ব (দেবত্ব) অথবা শিব-জ্ঞানে জীবসেবার দ্বারা মানবসমাজের পুনর্গঠন-কৌশল ব্যাখ্যাও করছেন না। যুক্তি দিয়ে তিনি 'নরেনের' প্রবর্তিত সেবাধর্মের প্রয়োজনীয়তা বলেছেন—কিন্তু বলাটা খুব কম, করাটা অনেক বেশী তাঁর ক্ষেত্রে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়ের মতো গৃহ-পরিজন থেকে দূরে—দক্ষিণেশ্বরের নিভৃত দেবালয়ে অথবা বরানগর-বেলুড়ের মঠভূমিতে, সংসারের ঝড়ঝাপটা বিমুক্ত হয়ে অধিকাংশ সময় বসবাসও করছেন না। তাঁর জীবনে ধ্যান আছে কিন্তু তা কর্মমুখরতার মধ্যে। তাঁকে আমরা পাই কামারপুকুর-জয়রামবাটীর সাংসারিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, প্রীতি-কলহ, তুচ্ছতাময় পরিবেশে। আত্মীয়বন্ধু, স্বজনপরিজন, শিষ্ট-অশিষ্ট, শান্ত-বদমেজাজী, স্থিতধী ও পাগলাটে, বৈরাগ্যবান ও বিষয়লোলুপদের নিয়ে (আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্লান্তিকর, বিরক্তিজনক পরিবেশে) তিনি বাস করছেন। কিন্তু সর্বদা শান্ত-সমাহিত-ভাবে, যুগপৎ নারায়ণ ও সন্তান বুদ্ধিতে তিনি সকলের সেবা সর্ব-অবস্থায় করে যাচ্ছেন। তরকারিকাটা, বাসনমাজা, রান্নাকরা, ঘরনিকানো থেকে আরম্ভ করে ঠাকুরপূজা পর্যন্ত সব কাজকেই তিনি ঈশ্বর-আরাধনায় রূপান্তরিত করছেন। অবতার-পার্ষদ শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও ডাকাত আমজাদ, ইংরাজ ও ভারতীয়, অসৎ ও সৎ, মদ্যপ ও ভক্ত—সকলের সঙ্গে সর্বদাই তিনি নারায়ণদৃষ্টিতে, ব্রহ্মদৃষ্টিতে লোক-ব্যবহার করছেন। অবস্থা বুঝে কায়িকশ্রম, মন অথবা বাক্যের দ্বারা সেবা করছেন। নবীন-সাধন-পন্থার এ-অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ব্যবহারাদর্শ মানুষ বোধহয় কল্পনাও করতে পারবে না। বস্তুত পুরুষ বা নারী আমরা সকলে বর্তমান সমাজের কর্মমুখর অজস্র প্রতিকূলতাময় পরিবেশে বাস করেই নবীন ধর্মাদর্শে, নবীন পন্থায় জীবন গড়তে পারি, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যই যেন বিধাতাপুরুষ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীরূপ অতুলন মানবী-প্রতিমা ধরাধামে প্রেরণ করেছেন।[৫১]

আধুনিক পরিস্থিতিতে, জটিল সমস্যায় শ্রীমার নির্দেশনাঃ নবীন-সাধন-মার্গে গুরুত্ব জ্ঞানভক্তি-চর্চাযুক্ত কর্মের উপর, অর্থাৎ কর্মযোগের উপর, নিছক কর্মের উপর নয়। ধ্যান-জপ-পূজা-পাঠ এসবের একই সঙ্গে অনুশীলনের দ্বারা সেরূপ কর্ম করা সুসাধ্য হয়। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের কর্মপদ্ধতি (policy) যেন এইসব মৌলনীতি থেকে বিচ্যুত না হয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি, প্রতি ব্যক্তি-চরিত্রে ত্যাগ-বৈরাগ্যভাব সমুজ্জ্বল রাখাও সেই মৌল নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমার প্রখর বিচারশীল দৃষ্টি সঙ্ঘস্থ সন্তানদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কোয়ালপাড়া আশ্রম-উদ্যোক্তাদের তিনি বলছেনঃ 'দেখ, তোমরা "বন্দেমাতরম্" করে হুজুগ করে বেড়িয়ো না; তাঁত কর, কাপড় তৈরী কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতো কাটি। তোমরা কাজ কর।'[৫২] ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষকে বলছেনঃ 'সে কি গো, পেঁচোয়া বুদ্ধি রেখে অত হুকুম চালালে কি করে আশ্রম চলবে?' 'ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভাল-বাসাতেই তো তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] সংসার গড়ে উঠেছে।'[৫৩] ইংরেজী শিক্ষাহীন কোন আশ্রম-সেবককে বলছেনঃ 'দেখ, ওদেশ থেকে অনেক সাহেব-সুবো ভক্ত আসবে;

তোমরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখে নাও।' শুধু বলা নয়। তিনি এই কার্যে প্রথমে জনৈক সন্ন্যাসীকে পরে জনৈক ভক্তকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৪] শ্রীরামকৃষ্ণের মৌল কর্মনীতির (policy) সমর্থনে ও সংরক্ষণে শ্রীমার ভূমিকা আমরা জানলাম। পর পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শ্রীমা কিভাবে মতামত দিয়েছিলেন তা স্মরণ করব। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্লেগনিবারণ সেবাকার্যের ব্যয়ভার মিটাবার জন্য স্বামীজী ভাবছেন—মঠভূমি-বাড়ি বিক্রি করে দেবেন। শ্রীমার কাছে গিয়ে তিনি বলছেনঃ 'মা, রোগীদের সেবার জন্য টাকা নেই। এজন্য মঠের সম্পত্তি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে সেবাকাজ চালাব মনে করছি। আমরা তো সাধু, গাছতলায় জীবন কাটিয়ে দেব। আপনার অনুমতি চাই।' মাতাঠাকুরানী বললেনঃ 'না বাবা, মঠ বিক্রি করতে পারবে না। এ তোমার মঠ নয়, ঠাকুরের মঠ। তোমরা শক্তিমান ছেলে, গাছতলায় জীবন কাটাতে পার। কিন্তু পরে আমার যেসব ছেলেরা আসবে তারা গাছতলায় জীবন কাটাতে পারবে না। তাদের জন্য এই মঠ।'[৬৫] স্বামীজী এই নির্দেশ শিরোধার্য করে নিলেন। অর্থ অন্যভাবে এসে পড়ায় সেবাকার্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হল। এই প্রসঙ্গে শ্রীমা স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেনঃ 'বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর [ঠাকুরের] কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এই ভাব চলবে।...বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সঙ্কল্প করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ, তোমার ওসব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়?'[৬৬]

দ্বিতীয় ঘটনা স্বামীজীর দেহত্যাগের বেশ পরে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। তদানীন্তন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনের সম্বন্ধে কতকগুলি বিরূপ মন্তব্য করেন। এর ফলে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক জাগে যে, মিশনের কিছুমাত্র সংস্রবে থাকলে রাজরোষে পড়তে হবে। মিশনের কর্মসচিব স্বামী সারদানন্দকে অনেকে পরামর্শ দিলেন—মঠের মধ্যে যেসব সন্ন্যাসীর পূর্বে রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় যোগ ছিল তাদের আলাদা করে দেওয়া হোক। এতে সরকারের মিশনের প্রতি প্রতিকূল ধারণা দূর হবে। স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেনঃ 'এই সময় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। আমরা তো সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খুবই চিন্তিত, এসব শুদ্ধসত্ত্ব উচ্চমনা সাধু কয়জনকে মঠ থেকে আলাদা করে দিতে হবে, এ চিন্তাই করতে পারি না। তখন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ধীরে ধীরে সমস্ত নিবেদন করলাম। শ্রীশ্রীমা ধীর-ভাবে সব শুনে সুমিষ্টভাবে দৃঢ়তার সহিত বলে উঠলেন, "ওমা! এসব কি কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে...তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি [বরং] একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।"'[৬৭] মাতাঠাকুরানীর নির্দেশমতো স্বামী

সারদানন্দ মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতির সাহায্যে গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গভর্নরও কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক নতুন বিবৃতি দিলে সঙ্কট কেটে যায়।

এইসব ও অনুরূপ ঘটনাসমূহ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, শ্রীশ্রীমা ক্রমবর্ধমান বিরাট একটি ধর্মসঙ্ঘের একাধারে মাতা, অভিভাবিকা ও নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাও সুদৃঢ় হয় যে, তাঁর জীবন থেকে শুধু গৃহকর্মনিরতা অন্তঃপুরচারিণীরাই শিক্ষা লাভ করবেন না—যেসব মেয়ে সমাজে বড় বড় জটিল সমস্যাসঙ্কুল কাজকর্ম করবেন তাঁরাও।

পাশ্চাত্য নারীসমাজের কাছে শ্রীমায়ের জীবনাদর্শ—তাঁর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য নারীদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ ঃ লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'বেদান্ত ফর ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' পত্রিকায় জনৈকা অধ্যাপিকা (Dr Nancy Tilden) তাঁর 'শ্রীশ্রীমা ও একালের পাশ্চাত্য নারী' (Holy Mother and Western Women Today) প্রবন্ধে প্রথমে বলতে চেয়েছেন ঃ পাশ্চাত্যের নারীজীবনের বহু সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা অনবহিতা ছিলেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ওদেশের মেয়েরা তাঁর জীবন থেকে শিক্ষণীয় কি-ই বা পাবে? তাদের খণ্ড খণ্ড সমস্যাগুলি সমাধানের পৃথক্ পৃথক্ উত্তর শ্রীমার জীবন থেকে তারা পাবে না—সত্য। নিবেদিতার বক্তব্যের জের টেনে লেখিকা তারপর বলেছেন—কিন্তু শ্রীমার জীবনী পাঠ, অনুধ্যান করলে তারা অর্জন করবে এমন একটা অভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, এমন একটা অব্যর্থ মনোভাব যার দ্বারা নিজেরাই খণ্ড খণ্ড সমস্যাগুলির—যত কঠিন সে সমস্যা হোক না কেন—সমাধান করতে পারবে।[৫৮] বক্তব্য আর একটু বিশদ করেছেন এইভাবে ঃ এই মহাজীবনের কাছে স্থির হয়ে বসলে তারা, পাশ্চাত্য মেয়েরা, নিজেদের নিত্য আনন্দময় চিত্তসত্তা সম্বন্ধে, সর্বদা-স্বাধীন দিব্য-স্বভাব সম্বন্ধে দিন দিন অধিকতর সচেতন হবে। দিব্যসত্তা সম্বন্ধে এই নিবিড় সচেতনতা তাদের দেবে সর্ব-সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত হাতিয়ার, উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি।[৫৯]

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী শুধু ভারতীয় নয়, পৃথিবীর নারীজাতির কাছে যুগোপযোগী জীবনাদর্শ, জীবনচর্যার মূর্ত বিগ্রহরূপে, যতই দিন যাচ্ছে, ততই দেশে-বিদেশে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় গৃহীতা হচ্ছেন। উল্লিখিত প্রবন্ধটি সে তথ্যের সমর্থনসূচক একটা নমুনা মাত্র। এ-বিষয়ে স্বামী নিখিলানন্দ শ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তীকালে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর আমেরিকা-জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যা লিখেছিলেন তা অধিকতর সত্য প্রমাণিত হচ্ছে দিন দিন। তিনি লিখেছিলেন ঃ শ্রীমার জীবনী প্রচারের চেষ্টা স্বাভাবিক কতকগুলি কারণে তাঁর (শ্রীমার) জীবৎকালে বা তৎপরবর্তীকালেও করা হয়নি। কিন্তু তাঁর শতবর্ষ-জয়ন্তী বৎসর থেকে সে-জীবন ভক্ত-অনুরাগীদের ক্রমবর্ধমান দলকে—বিশেষত মেয়েদের গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারছেন যে, শ্রীশ্রীসারদাদেবী ভারতীয় নারীজাতির লুপ্তপ্রায় শুধু প্রাচীন জীবনাদর্শেরই প্রতিনিধি নন, যে-নবীন নারীজাতির

অভ্যুদয় হচ্ছে তিনি তাঁদেরও আদর্শ। ...(পাশ্চাত্যে) আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, যখনই ধর্মপ্রসঙ্গকালে শ্রীশ্রীমার কোন শিক্ষা, তাঁর জীবনের সাধারণ কোন ঘটনার উল্লেখ করা হয় তখনই আমাদের ও শ্রোতাদের মধ্যে একটা নিবিড় প্রীতি গড়ে ওঠে এবং শ্রোতারা তখন অখণ্ড, অবিভাজ্য মনোযোগদ্বারা আমাদের কথা শোনেনেই শোনেন। তাঁরা যেন সহজাত প্রেরণাবশে অনুভব করেন যে, শ্রীশ্রীমা এযুগের এক অনন্যা, অদ্বিতীয়া, দিব্যচরিত্রা সাধ্বী ; তাঁর জন্ম শুধু ভারতের নয় সমগ্র পৃথিবীর 'নারীত্ব'কে মহীয়ান্, গরীয়ান্ করে তুলেছে। ...ভারতীয় মেয়েরা ও পাশ্চাত্যের মেয়েরা—যে যে আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করে তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে—ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বশত। ...কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমেরিকান মেয়েরা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের মাহাত্ম্য-মাধুর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করছে—এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[৩০]

উপসংহার—শ্রীমাকে অনুসরণ করে প্রাচীন ও নবীন পন্থার শ্রেষ্ঠাংশগুলির দ্বারা মানুষ নিজ নিজ জীবন মহৎ ও সুন্দর করতে পারে: শ্রীমা সারদাদেবী প্রাচীন আদর্শের প্রতিনিধি অথবা নবীন আদর্শের অগ্রদূত?—দু-দশ ব্যক্তির সাময়িক কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এ-প্রশ্ন নয়, এ-প্রশ্ন আজকের বৃহৎ যুগজিজ্ঞাসার একটি অঙ্গ। শ্রীমার জীবন যতই মহীয়ান্ হোক—তা যদি এযুগের পরিবর্তিত দেশ-কাল-পরিস্থিতির সঙ্গে, এযুগের আশা-নিরাশা, আদর্শ-উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মানসিক-গঠন ও ভাব-ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়—এককথায় এযুগের জীবনাদর্শের প্রতিভূ যদি তিনি না হন তবে তাঁকে 'মডেল' বা আদর্শরূপে গ্রহণ করে অনুসরণ করা আজকের নারীজাতির পক্ষে সম্ভবই নয়।—বড়জোর সম্ভব প্রাচীন ঠাকুর-দেবতার মতো তাঁর প্রতিকৃতি কুলঙ্গীতে রেখে তাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় ফুলচন্দন, ধূপধুনা দেওয়া। কিন্তু তাঁর নিরপেক্ষ জীবনীপাঠক লক্ষ্য করবেন—না, এ-মহাজীবন সেরূপ কোন প্রাচীন আদর্শ নয়। আধ্যাত্মিক আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরে যে-কোনও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা, অন্যভাষায়, ঐশ্বরিকজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান বা 'জীবশিব'-জ্ঞান 'আঁচলে বেঁধে' ছোটবড় সকল কর্ম নির্বাহ করার বিস্ময়কর অসাধারণ নৈপুণ্য—এই দিব্যজীবনের পরতে পরতে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশিত। এ-আদর্শ নবীন কিন্তু অতীতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য খাপছাড়া নবীন নয়। প্রাচীন নারী-আদর্শের যা-কিছু শ্রেয়, যা-কিছু বরণীয়, নিত্যকালের রক্ষণীয়—তার সমস্তকে গ্রাস করে ফেলেছে এই নবীন। শ্রীরাম-কৃষ্ণকে স্বামী বিবেকানন্দ 'পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ' বলে ঘোষণা করেছেন। শ্রীশ্রীমাকেও মনে হয় অতীতের মহীয়সী নারী-আদর্শের ঘনীভূত সমষ্টি ও নব-অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করলে অতিশয়োক্তি করা হয় না।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে আজ পৃথিবীর সর্বত্র নারীসাম্য, নারীপ্রগতি, নারী-অধিকারের কথা শোনা যাচ্ছে এবং ভারতের বায়ুমণ্ডলেও সেই কথা ধ্বনিত হচ্ছে। বিদেশ থেকে আমদানি করা এই বুলি ভারতীয় নারীসমাজে প্রচার করা হচ্ছে। যে আত্মিক সৌন্দর্যে ভারতীয় নারীজীবন শ্রীমণ্ডিত, যে আধ্যাত্মিক-সম্পদে সে-জীবন ইতিহাস-প্রারম্ভকাল থেকে ঐশ্বর্যশালী, আজ এই যুগসঙ্কটকালে একদল নারী সে

পূত সৌন্দর্যকে, সে অপার্থিব সম্পদকে নির্মম উদাসীনতায়, কখনও বা সচেতন অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ করতে চাইছেন। বোধহয় এই মহাদুর্বিপাক থেকে আমাদেরকে তথা মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য পবিত্রতাস্বরূপিণী সারদাদেবীর জীবনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারীর মহান্ আদর্শ পুনরুদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এক-দিকে তিনি স্বকীয় জীবন দ্বারা বহু প্রাচীন রীতিনীতির সার্থকতা প্রমাণ করেছেন. অন্যদিকে আবার আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির মধ্যে যা-কিছু কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাযুক্ত, প্রচন্ড বলিষ্ঠতার সাথে তা পরিহার করেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় নারী-সংস্কৃতির যা-কিছু শিব ও সুন্দর তা এই যুগে তুলে ধরেছেন ; আবার পৃথিবীর বর্তমান নারীসমাজের শ্রেষ্ঠ আশা-আকাঙ্ক্ষাও সফল করেছেন। তিনি প্রাচীন ও নবীন নারী-ঐতিহ্যের সংযোগসেতুরূপে যেন আবির্ভূতা হয়েছেন।[৬১] নারীপ্রগতির নামে আত্মিক শ্রী-সম্পদ বিসর্জনের যে অন্ধ-উন্মত্ততা যত্র তত্র দেখা যাচ্ছে শ্রীমা সারদা-দেবীর জীবন তার অতি-প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁকে অবলম্বন করে প্রাচীন ও নবীন যুগের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী-সমৃদ্ধ নারীপ্রগতির এক নবীন অধ্যায় আসন্নপ্রায়—স্বামী বিবেকানন্দ তা ঋষিদৃষ্টি সহায়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জনৈক গুরুভ্রাতাকে এক পত্রে লিখেছিলেনঃ 'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।... মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'[৬২]

শ্রীমা সারদাদেবী ঃ এক অলৌকিক ব্যক্তিত্ব

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনের পর উদ্ধব বলেছিলেনঃ 'যদুবংশীয়েরা বড়ই হতভাগ্য; মাছেরা যেমন প্রতিবিম্ব চন্দ্রের সাথে খেলা করেও চন্দ্রের স্বরূপকে বুঝতে পারে না, সেইরকম শ্রীকৃষ্ণের সাথে একত্রে বাস করেও, পরম বুদ্ধিমান যাদবেরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেননি।'[১] যুগে যুগে অবতারপুরুষেরা মানুষের মধ্যে এসে ঠিক মানুষেরই মতো ব্যবহার করেছেন। তাঁদের জীবিত-অবস্থায় অতি অল্প লোকই তাঁদের চিনতে পেরেছেন। তবুও মাছের সাথে চন্দ্রের যে পার্থক্য, মানুষের সাথে অবতারেরও সেই পার্থক্য। কারণ অবতারের বাইরের খোলটাই কেবল মানুষের মতো; ভিতরটা সবটাই ভগবৎসত্তায় ভরপুর। অবতারের প্রতিটি প্রাকৃত-জনোচিত আচরণের পিছনেও সুগভীর লোককল্যাণ-স্পৃহা উপস্থিত থাকে—যার তাৎপর্য সমকালীন সাধারণ মানুষ হয়তো তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে না, কিন্তু ক্রমশ তা সকলের কাছে পরিস্ফুট হয়। অবতার-চরিত্র তাই সর্বদাই অ-লৌকিক। লৌকিক আধারে তার প্রকাশ হয় বলে দেবভাব ও মানবভাবের মিশ্রণে অবতারের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে বিচিত্র, মধুর, তীব্র আকর্ষণীয়, রহস্যঘন, কখনও বা দুর্বোধ্য। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধেও এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

সন্তানের প্রতি জননীর যে দৃষ্টি, সমগ্র জগৎকে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দৃষ্টিতে দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্যদৃষ্টিই রূপ পরিগ্রহ করেছে শ্রীমার মাতৃমূর্তির মধ্যে। মায়ের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাই হয়েছে প্রধানত মাতৃভাবের আকারে। তা সত্ত্বেও মায়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মাতৃভাবের পাশাপাশি কিংবা মাতৃভাবের অতিরিক্ত আরও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বহুল আলোচিত বলে এই প্রবন্ধে মায়ের মাতৃ-ভাবময়ী ব্যক্তিত্বের কথা• অতি সংক্ষেপে আলোচনা করে ব্যক্তিত্বের অন্যতর কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীমা জগতের সবাইকে দেখেছেন সন্তানরূপে। একদিন এক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও সন্তানভাবে দেখেন।[২] শ্রীমার জীবনের যে-কোন অংশই এই অপার্থিব মাতৃস্নেহের মহিমায় মহিমান্বিত। এই মাতৃস্নেহের প্রেরণায় শ্রীমা অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাকেও উপেক্ষা করেছেন দেখা যায়। শ্রীমা ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলে জানতেন এবং সেইভাবেই তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, সর্ব-

বিষয়ে তাঁর কথা মেনে চলতেন। এ-সত্ত্বেও যখন ঠাকুরের ইচ্ছার সাথে তাঁর মাতৃভাবের বিরোধ উপস্থিত হত, তখন কিন্তু শ্রীমা তাঁর নিজের ভাবের অনুকূলেই চলতেন—ঠাকুরের কথাও মানতেন না। ঠাকুরের কাছে ভক্তেরা অনেক ফল মিষ্টি নিয়ে আসতেন এবং তিনিও সেসব জিনিস নহবতে শ্রীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। শ্রীমা ঐসবের অগ্রভাগ ঠাকুরের জন্য সামান্য রেখে বাকি সব মাতৃভাবের প্রেরণায় পাড়ার ছেলেপিলে এবং ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। একদিন এইভাবে সমস্ত জিনিস বিলিয়ে দিতে দেখে গোপালের মা বলেছিলেনঃ 'বউমা, আমাব গোপালের [অর্থাৎ ঠাকুরের] জন্য কিছু রাখলে না?'[৩] ঠাকুরও শ্রীমার এই মুক্তহস্তের কথা জানতেন। একদিন তিনি শ্রীমাকে অনুযোগ করে বলেছিলেনঃ 'এত খরচ করলে কিভাবে চলবে?' শ্রীমা কোন কথা না বলে সেখান থেকে চলে গেলে ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে রামলালদাদাকে বলেছিলেনঃ 'ওরে, রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখিয়ে) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।'[৪] ঠাকুর জানতেন যে, শ্রীমার এই 'অমিতব্যয়িতা' তাঁর মাতৃভাবেরই এক বহিঃপ্রকাশ। আর সারদাদেবীর মধ্যে এই মাতৃশক্তির স্ফুরণের জন্য তিনি নিজেও তপস্যা করেছিলেন। ক্রমে শ্রীমায়ের মধ্যে মাতৃশক্তি স্ফুরিত হল অতুলনীয়রূপে। জগন্মাতার হৃদয়ের প্রকাশ হল তাঁর মধ্যে, কিন্তু লক্ষ্মীস্বরূপা হয়েও লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডারের প্রকাশ ছিল না সেখানে, তাই না বিরোধ। দেখা গিয়েছে, যখনই মাতৃভাবের সঙ্গে অন্য কর্তব্যের বিরোধ ঘটেছে শ্রীমা প্রথম স্থান দিয়েছেন তাঁর জননীত্বকে।

শ্রীমা জানতেন যে, ঠাকুর সকলের ছোঁয়া জিনিস খেতে পারেন না। তাই ঠাকুরের খাবার তিনি নিজেই এনে তাঁকে খাইয়ে যেতেন। একদিন তিনি ঠাকুরের খাবার নিয়ে আসছেন; হঠাৎ একজন মহিলা এসে, 'মা, আমায় দিন', বলে শ্রীমার হাত থেকে থালাটি নিয়ে ঠাকুরের সামনে রেখে চলে যায়। ঠাকুর শ্রীমাকে বললেনঃ 'তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? ওকে কি জান না? ...এখন আমি ওর ছোঁয়া খাই কি করে?' শ্রীমা মিনতি করে বললেনঃ 'জানি ; আজ খাও।' ঠাকুর তখন বললেনঃ 'আর কোন-দিন কারও হাতে দেবে না বল।' শ্রীমা তখন মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর নিজের জীবনের সারকথাটি বলে ফেললেনঃ 'তা তো আমি পারব না ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব ; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।'[৫] শ্রীমার এইকথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঠাকুরের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে তিনি সদা-সচেতন থাকলেও, মাতৃ-ভাবের প্রতিকূল কোন আদেশ মানা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমার কাছে যে-কোন সম্পর্ক, যে-কোন ভাবের চেয়ে মাতৃভাবই বড়।

ঠাকুর তাঁর ত্যাগী বালক-ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট থাকতেন। রাত্রিতে বেশী খেলে সাধনভজনের ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে তিনি শ্রীমাকে বলে দিয়েছিলেন কাকে কয়টা রুটি খেতে দিতে হবে। একদিন বাবুরামকে

জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, সে বেশী রুটি খেয়েছে এবং এই বেশী খাবার জন্য শ্রীমা-ই দায়ী। ঠাকুর অমনি শ্রীমাকে গিয়ে অভিযোগ করলেন যে, তিনি বেশী খাইয়ে ছেলে-দের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছেন। শ্রীমা বললেনঃ 'ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।'[৬] গুরু শিষ্যকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ব্যগ্র এবং সেইজন্য দরকার হলে শিষ্যকে আধপেটা খাইয়েও রাখতে পারেন। মা-ও সন্তানের কল্যাণ চায় কিন্তু তাকে আধপেটা খাইয়ে রাখা মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং উপায়? শ্রীমা সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করে গুরু-ভাব এবং মাতৃভাবের এই দ্বন্দ্বের সমাধান করেছিলেন। তবে শ্রীমার সমাধান কেবল অবতারের পক্ষেই করা সম্ভব। কারণ, অবতার ছাড়া কেউ অপরের আধ্যাত্মিক জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শ্রীমার এই ব্যবহারও অননুকরণীয়।

স্ত্রীর কর্তব্য পতির সব আদেশ নিঃসঙ্কোচে পালন করা। জননীর কর্তব্য সন্তানের মঙ্গলার্থে আর সব কিছু তুচ্ছ করা। শ্রীমার জননীভাবের কাছে জায়াভাব বার বার পরাজিত হয়েছে : 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' সারদাকে ছাপিয়েও অনেক সময় বড় হয়ে উঠেছে তাঁর 'ভক্তজননী' রূপটি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্তানভাবে যে-মাতৃশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন, সেই মাতৃশক্তিই শ্রীমায়ের প্রতি কাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই গিরিশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'আমি সত্যিকারের মা ; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।'[৭] সাধারণ মানুষ একথার অর্থ যেভাবেই নিক, এটা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, জগতের ইতিহাসে এমনটি আর কখনও দেখা যায়নি। শ্রীমায়ের এই মাতৃভাব জগতে এক অতি পবিত্র মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে।

সাধারণ জীবনে দেখতে পাই যে, বিভিন্ন লোকের সাথে আমরা বিভিন্ন রকমের ব্যবহার করে থাকি। আত্মীয়স্বজনদের সাথে এক রকম (আত্মীয়ের মধ্যেও কত রকমের ব্যবহার!), শিষ্যদের সাথে এক রকম, প্রতিবেশীদের সাথে এক রকম, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর এক রকম। এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। কিন্তু শ্রীমায়ের জীবনে দেখি যে, তিনি যখন বিভিন্ন লোকের সাথে ব্যবহার করেছেন, তখনও বিভিন্ন সম্পর্ককে ছাপিয়ে তাঁর মধ্যে মাতৃভাবই প্রাধান্যলাভ করেছে। অথচ মজা এই যে, এই মাতৃভাবের প্রাধান্য সত্ত্বেও অপরাপর সম্পর্কও কোনরকমেই ব্যাহত হয়নি। ভাইদের কাছে শ্রীমা ছিলেন তাদের দিদি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্নেহময়ী মায়ের মতো ভাইদের সকল রকমের অন্যায় আবদার সহ্য করে সব সময় তাদের রক্ষা করেছেন। অপর আত্মীয়-কুটুম্বদের সম্বন্ধেও এই একই কথা। রাধুর খুড়শ্বশুর সম্পর্কে শ্রীমার বেয়াই ; কিন্তু শ্রীমা তাঁকে 'বাবাজীবন' বলে চিঠি লিখতেন। এতে রাধুর মা আপত্তি করলে শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'সে আমাকে "মা" বলে আনন্দ পায়। আমিও তার কাছে তা-ই।'[৮]

শ্রীমার এই বাৎসল্যভাবের গণ্ডি মানুষকে ছাড়িয়ে জীবজন্তুর মধ্যেও সম্প্রসারিত

হয়েছিল। জয়রামবাটীতে শ্রীমার বাড়িতে কতকগুলো বেরাল ছিল। শ্রীমায়ের সেবক জ্ঞান মহারাজ কিন্তু বেরালগুলোর ওপর খাপ্পা ছিলেন এবং মাঝে মাঝে মারধরও করতেন। একবার শ্রীমা কলকাতায় আসার আগে জ্ঞান মহারাজকে ডেকে বললেনঃ 'জ্ঞান, বেরালগুলোর জন্যে চাল নেবে ; যেন কারও বাড়ি না যায়।' আরও বলেছিলেনঃ 'বেরালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।'[১] আত্মজ্ঞান ও বিশ্বব্যাপী মাতৃভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব। তাই একজন সেবকের প্রশ্নঃ 'তুমি কি সকলেরই মা?' এর উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'হাঁ।' আবার প্রশ্নঃ 'এইসব ইতর জীবজন্তুরও?' শ্রীমা বললেনঃ 'হাঁ, ওদেরও।'[১০] এমন আত্মজ্ঞান ও অপরূপ মাতৃভাবের সমন্বয় আর কেউ কোথাও দেখেছে কি?

॥ ২ ॥

শ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী সারদেশানন্দ বলেছেনঃ 'যাঁহার স্নেহসুধায় প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, তিনিই মা। আবার পুলকিত প্রাণের স্নেহধারা যাঁহার দিকে ধাবিত হয়, তিনিই মেয়ে।'[১১] শ্রীমা সকলের মা, বিশ্বজননী। কিন্তু এই অলোকিক জননীর মধ্যেও একটি কন্যা-রূপ লুকানো ছিল যার প্রকাশ ক্বচিৎ হয়েছে—বিশেষ বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা একদিন যোগীন-মাকে বললেনঃ 'যোগেন, তুমি শুকনো বেলপাতায় পুজো কর কি?' যোগীন-মা বললেনঃ 'হ্যাঁ মা, কিন্তু তুমি তা কি করে জানলে?' শ্রীমাঃ 'আজ আমি সকালে ধ্যান করবার সময় দেখতে পেলুম, তুমি শুকনো বেলপাতা দিয়ে আ—।' এটুকু বলেই শ্রীমা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেনঃ 'পুজো করছিলে।' বুদ্ধিমতী যোগীন-মার বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি কলকাতায় বাড়িতে পুজোর সময় যা করেছেন, দক্ষিণেশ্বরে বসেই শ্রীমা তা জানতে পেরেছেন। তিনি স্তম্ভিত হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মা-ও ধরা পড়ে গেছেন দেখে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে যোগীন-মাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই মুহূর্তে যোগীন-মার মনে হয়, তাঁর কন্যা গনু যেন তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। স্নেহে বিগলিত হয়ে তিনি শ্রীমাকে বুকে ধরে চুমো খেলেন। পরে হুঁশ হলে তাঁর চরণ স্পর্শ করে পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।[১২]

অসুখের সময় মায়ের বালিকা-ভাব বিশেষভাবে প্রকাশিত হত। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে অসুস্থ। মায়ের এক সন্তান রোজ ভোরবেলা এবং রাত্রে শোবার আগে মায়ের ঘরে গিয়ে খোঁজ করে আসেন, শ্রীমা কেমন আছেন। একদিন ভোরে গিয়ে মাকে কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসা করতেই শ্রীমা বললেনঃ 'বাবা, ভাল আছি। একটু

খিদে পাচ্ছে।' মায়ের চোখে-মুখে ছোট্ট বালিকার মতো ভাব ; কথাগুলিও বললেন বালিকার মতো আবদারের সুরে। মায়ের ইচ্ছা বুঝে মায়ের জনৈক সেবিকা একটি ছোট টেকোয় ছাতুর মতো একটি জিনিস কিছুটা নিয়ে এলেন। জিনিসটির আঞ্চলিক নাম 'ময়না-কোটা'। টাটকা ভাজা খই-এর ভিতর যে আধ-কোটা মুড়ির মতো খই থাকে, তার সঙ্গে পরিষ্কার ভাজা তিলের গুঁড়ো এবং কিছুটা ঝাল-নুন মিশিয়ে তৈরী। জিনিসটি মুখরোচক, লঘুপাক ও সুস্বাদু। মায়ের খুব প্রিয়। সেবিকা জিনিসটি সেবক-সন্তানের হাতে দিতেই মা ছোট্ট মেয়ের মতো আবদার করে বললেনঃ খাইয়ে দাও। সন্তান একটু ইতস্তত করছিলেন—কারণ 'ময়না-কোটা' বস্তুটি তিনি আগে কখনও দেখেননি, জিনিসটি মায়ের অসুস্থ শরীরের পক্ষে উপযোগী কিনা তা-ও তিনি জানেন না। কিন্তু মা ততক্ষণে সাগ্রহে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন। কাজেই, আর ভাবনা-চিন্তা করতে পারলেন না। মায়ের বিছানার উপর বসে একটু একটু করে সেই খাবার মায়ের মুখে দিতে লাগলেন। খেয়েদেয়ে মায়ের চোখে-মুখে বালিকার মতো তৃপ্তি ও আনন্দ ফুটে উঠল।[১৩]

সেই সময় স্বদেশী আন্দোলন চলছে। কোয়ালপাড়া আশ্রমে যেসব সাধুভক্তেরা আসত, তাদের উপরেই পুলিসের নজর থাকত। মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত বিভূতিবাবুর সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট-এর পরিচয় ছিল। মায়ের আশ্রম যাতে পুলিসের সুনজরে থাকে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ডি. এস. পি.-কে জয়রামবাটীতে এনে মাকে দর্শন করানোর ব্যবস্থা করলেন। পুলিস-কর্তা সব দেখেশুনে বিদায় নেওয়ার সময় হাসিমুখে মাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'এইসবে (অর্থাৎ পুলিস যে সদা-সর্বদা খোঁজখবর করে) ভয় করে না তো?' বিভূতিবাবু আগ বাড়িয়ে উত্তর দিলেনঃ 'ভয় করবেন কেন? কিসের ভয়?' চারপাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে—সবাই নীরব। পুলিস-সাহেব মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। শ্রীমা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ঠিক একটি ছোট মেয়ে যেমন তার বাবাকে আবদার করে বলে তেমনি সুমধুর স্বরে বললেনঃ 'হ্যাঁ বাবা! আমার ভয় করে।' পুলিস-কর্তাও সস্নেহে যেন কন্যাকে প্রবোধ দিচ্ছেন, এইভাবে মাকে সাহস দিয়ে বললেনঃ 'কোন ভয় নেই, মা, আমি সব ঠিক করে দিয়ে যাব।' মায়ের দিকে চেয়ে তিনি পালকিতে উঠে যাত্রা করলেন। মা-ও চেয়ে আছেন পুলিস-কর্তার দিকে। বালিকার নিশ্চিন্ত দৃষ্টি—যেন কন্যা চেয়ে আছে পিতার দিকে।[১৪]

শ্রীমার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁর বালিকার মতো সরলতার কথা ভাবি, তখন মনে হয়, একই জীবনে এই দুয়ের সমন্বয় কি করে সম্ভব হতে পারে। শ্রীমা হারিকেন লণ্ঠনের চিমনি খুলতে পারতেন না ; বলতেনঃ 'ওতে অনেক কলকব্জা।'[১৫] একটি মেয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করে বলেছিলেনঃ 'অমুকের বউ ঘড়িতে দম দিতে জানে।'[১৬] নিবেদিতার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভক্তি-অর্ঘকে শ্রীমা কত সহজে, সকৌতুকে গ্রহণ করেছিলেন! নিবেদিতা কয়েকটি বাংলা শব্দে শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ 'মাতৃদেবী, আপনি হন আমাদিগের কালী।' শ্রীমা হেসে বলেছিলেনঃ

'না, বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।'[১৭] দেবীত্বের সাথে অতি সহজ মানুষীভাবের অপূর্ব সম্মিলন!

মায়ের বালিকা-ভাবের আর একটি দৃষ্টান্তঃ কোয়ালপাড়ার 'জগদম্বা আশ্রমে' একটা দোলনা খাটানো হয়েছিল। অনেক সময় মা ঐ দোলনায় বসে দোল খেতেন, ভক্ত-মেয়েরা দুলিয়ে দিত; কখনও বা ভক্ত-মেয়েদের কেউ দোল খেত, আর মা নিজেই দোল দিতেন। ক্রীড়াচঞ্চল ছোট্ট মেয়ে যেন একটি—সমবয়স্কদের সঙ্গে নির্মল আনন্দে রত![১৮]

বালিকার মতো মান-অভিমানের একটি দৃষ্টান্তঃ জয়রামবাটীতে একদিন রাঁধুনী না থাকায় নলিনীদি রুটি সেঁকছেন, শ্রীমা রুটি বেলছেন। মায়ের একটি সন্তান মাকে রুটি বেলে দিয়ে সাহায্য করছেন। নলিনীদি হঠাৎ বলে বসলেনঃ 'পিসীমার [অর্থাৎ শ্রীশ্রীমার] রুটি ভাল হচ্ছে না।' এই শুনে শ্রীমা ছোট মেয়ের মতো অভিমানে মুখ ভারী করে বেলুন ঠেলে দিয়ে বললেনঃ 'রইল তোমার রুটিবেলা, আমার রুটি যদি ভাল বেলা না হয়, তবে আমি আর বেলবো না।' সন্তান মুশকিলে পড়লেন। নানাভাবে মাকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। মা বললেনঃ 'আমি সারাজীবন রুটি বেলে আসছি, আর আজ আমার রুটি খারাপ হলো।' সন্তানটি বুঝিয়ে বললেনঃ 'না মা, আপনার রুটি খুব ভালই হচ্ছে। নলিনীদিদি কি করে জানলেন কোন্‌টি কার বেলা রুটি? দুজনের রুটিই তো একত্রে আছে। মিছেমিছি আপনাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? আপনার রুটি খুব ভালই হচ্ছে।' তিনি চাকি-বেলুন আবার এগিয়ে দিলেন, 'বালিকা'র মুখে হাসির রেখা ফুটল। আবার দুজনে কথাবার্তা বলতে বলতে আনন্দে রুটিবেলা চালিয়ে যেতে লাগলেন।[১৯] কিছুক্ষণ আগের মান-অভিমান তখন সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সেই 'বিরাট শিশু'। নিবেদিতাও লিখেছেন এক পত্রেঃ শ্রীমা 'বালিকার মতোই হাসি-খুশী'।[২০]

॥ ৩ ॥

জগতে শিষ্ট এবং অশিষ্ট—দুই রকম লোকই থাকে। শিষ্টের পালনের জন্য অশিষ্টের দমনের দরকার; নইলে শিষ্টের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। মাতৃভাবে সর্বত্রই এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির প্রকাশ দেখা যায়—'চিত্তে কৃপা সমর-নিষ্ঠুরতা।' শিষ্টজনের জন্য 'চিত্তে কৃপা' আর অশিষ্টজনের জন্য 'সমর-নিষ্ঠুরতা'। অশিষ্ট ব্যবহার থেকে কাউকে বিরত করার অর্থই হল তাকে শিষ্ট পথে আনা। ওষুধ তেতো হলেও প্রাণদায়ী। 'সমর-নিষ্ঠুরতা'ও পরিণামে কল্যাণকারী। শ্রীমাকে আমরা কোমলস্বভাবা, পরম স্নেহশীলা রূপেই দেখে থাকি—যেমন সকলে নিজের নিজের মাকে দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রয়োজনে মা দৃঢ় অনমনীয় মনোভাবও ধারণ

করতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে করুণাপাথার জননী কখনও কখনও রুদ্রমূর্তিতে ফেটে পড়েছেন, কৃপাবিতরণই যাঁর স্বভাব তাঁর মধ্যেও 'সমর-নিষ্ঠুরতা'র প্রকাশ দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়েছে।

একদিন শ্রীমা উদ্বোধনের দোতলার বারান্দায় বসে জপ করছিলেন। সেই সময় সামনের বস্তির একটি লোক ক্রুদ্ধ হয়ে তার স্ত্রীকে বেদম প্রহার করতে থাকে। প্রথমে কিল, চড়, পরে এমনভাবে লাথি মারে যে, মেয়েটি কোলের ছেলেটিকে নিয়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে। এতেও লোকটি শান্ত না হয়ে আবার তাকে মারতে থাকে। এই নৃশংস ব্যবহার দেখে শ্রীমার জপ করা বন্ধ হয়ে গেল। যাঁর গলার আওয়াজ একতলা থেকেও শোনা যেত না, সেই তিনিই চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ 'বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি?' লোকটা তখন রাগে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য। কিন্তু শ্রীমার তেজোদৃপ্তমূর্তির প্রতি একবার দৃষ্টি পড়া মাত্রই সংবিৎ ফিরে পেল লোকটি, মাথা নীচু করে নির্যাতিতাকে তখনই ছেড়ে দিল।[২১]

কামারপুকুরে পাগল হরিশের পাগলামি একদিন যখন চরমে উঠেছিল, তখন শ্রীমা ধারেকাছে কাউকে সাহায্যের জন্য দেখতে না পেয়ে নিজেই হরিশের বুকে হাঁটু দিয়ে, জিব টেনে ধরে গালে চড় মারতে লাগলেন। সেই চড় খেয়ে হরিশ শুধু যে সেই সময়টুকুর জন্য সংযত হয়েছিল তা-ই নয়—তার পাগলামি চিরতরে ঘুচে গিয়েছিল।[২২]

কখনও কখনও মায়ের মধ্যে এমন একটা অপার্থিব গাম্ভীর্য দেখা যেত যে, মায়ের অতি নিকটজনের মনেও এক অজানা আতঙ্কের সঞ্চার হত। উদ্বোধনের কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্ত মায়ের বাজার করা প্রভৃতি অনেক কাজ করেন। সেজন্য প্রায়ই মায়ের কাছে যেতে হয়। একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দ কৌতুক করে চন্দ্রবাবুকে বললেনঃ 'চন্দ্র, তুমি তো মার কাছে সর্বদা গিয়ে প্রসাদ খাও ; আমি একটি কথা বলি—তুমি মাকে বলতে পার ?' চন্দ্রবাবু বললেনঃ 'কেন পারব না ?' স্বামী শুদ্ধানন্দ বললেনঃ 'তুমি মাকে বলতে পার—"মা, আমি মুক্তি চাই"?' চন্দ্রবাবু বললেনঃ 'আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি এক্ষণি বলে আসছি।' তিনি উপরে গিয়ে দেখেন, শ্রীমা পূজার আসনে বসেছেন। চন্দ্রবাবু অন্যান্য দিন অতি স্বাভাবিকভাবেই মায়ের ঘরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। আজ কেন যেন অজানা ভয়ে শরীর কাঁপতে লাগল। একটু পরে শ্রীমা তাঁর দিকে চেয়ে আসার কারণ জানতে চাইলেন। মায়ের সেই দৃষ্টি ও প্রশ্নের মুখে চন্দ্রবাবুর সব গোলমাল হয়ে গেল। অভ্যাসবশে বলে ফেললেনঃ 'প্রসাদ চাই।' মা ইঙ্গিতে তক্তপোশের নিচে প্রসাদ দেখিয়ে দিয়ে আবার পুজোয় মন দিলেন। 'মুক্তি'র বদলে প্রসাদ নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চন্দ্রবাবু নেমে এলেন। তাঁর সেই কাঁপুনি থামতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছিল।[২৩]

শ্রীমার জীবনের প্রথম পর্বের কথা। কাশীপুরে একদিন ঠাকুর শ্রীমাকে বলে-ছিলেনঃ 'হাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজের শরীর দেখিয়ে) এই সব

করবে?' শ্রীমা উত্তরে বলেছিলেনঃ 'আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?' ঠাকুর বলেছিলেনঃ 'না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।'[২৪]

এর বহু বছর আগে, শ্রীমা তখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, বয়সও কম। সেই সময় একদিন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?' উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'না, আমি...তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'[২৫] শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার আগেই ঠাকুর তাঁর জীবনের প্রায় সমস্ত সাধনাই পূর্ণ করেছিলেন। একমাত্র ষোড়শীপূজা ছাড়া ঠাকুরের আর কোন সাধনাতেই শ্রীমার প্রয়োজন হয়নি। সুতরাং ঠাকুরকে ইষ্টপথে সাহায্য করার অর্থ কি? সাধারণ মানুষের ইষ্টপথ এবং ঠাকুরের ইষ্টপথের মধ্যে পার্থক্য ছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মমুক্তি অথবা ভগবানলাভই ইষ্টপথের চরম পরিসমাপ্তি। কিন্তু ঠাকুরের বেলায় জগৎকল্যাণ—মানুষের মধ্যে ভগবৎসত্তাকে জাগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে পরম ইষ্ট, কারণ জগৎকল্যাণের জন্যই তো তাঁর আবির্ভাব। ঠাকুরকে ইষ্টপথে সাহায্য করার কথায় শ্রীমা সম্ভবত এইকথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে. তিনি ঠাকুরেরই জগৎকল্যাণরূপ আরব্ধ কাজ পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবেন, এবং তারই প্রস্তুতির জন্য শ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন। তাইতো পরবর্তীকালে দেখতে পাই যে, রামকৃষ্ণসঙ্ঘ যাতে ভালভাবে চলে তার জন্য তিনি সদা-সচেষ্ট থাকতেন—সঙ্ঘের দায় যে তাঁরই দায়। সঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সকল শ্রীমার উপদেশমতোই নেওয়া হত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী শ্রীমা। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছা ও আদেশ বেদ-বাক্যের মতো মনে করতেন। সঙ্ঘের তরুণ সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা মায়ের মাতৃস্নেহের আস্বাদে সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকতেন। মায়ের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে অনেক ছোটখাট অপরাধের শাস্তি থেকে সাধু-ব্রহ্মচারীরা রেহাই পেয়ে যেতেন। কারণ. মা ছিলেন 'হাইকোর্ট'। মা যাকে ক্ষমা করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখেরা তার অপরাধ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন তুলতেন না। একবার চুরি করার অপরাধে মঠের একটি চাকরকে স্বামীজী তাড়িয়ে দেন। সেই গরীব লোকটি নিরুপায় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমার কাছে এসে উপস্থিত হয়। শ্রীমা তাকে বাড়িতে রেখে স্নানাহার করালেন। সেদিন বিকেলে বাবুরাম মহারাজ শ্রীমাকে প্রণাম করতে এলে তিনি বললেনঃ 'দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জ্বালা ; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' স্বামীজী রাগ করতে পারেন বলায় দৃঢ়তার সাথে শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'আমি বলছি, নিয়ে যাও।' পরে বাবুরাম মহারাজের কাছে সব শুনে স্বামীজী আর কিছু বললেন না—লোকটি মঠে রয়ে গেল।[২৬] এ বড় অদ্ভুত বিচার! সাধারণত সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীরা মায়ের এই ক্ষমাসুন্দর স্নেহমূর্তির সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সেই মা-ই সন্ন্যাসের মূল ব্রতগুলি যে ভঙ্গ করেছে, তার প্রতি কঠিন হয়েছেন। নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'আর যখন কঠোরতার প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে [মা] কোনোরকম 'বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হন না, যে-ব্রহ্মচারীকে

আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শাস্তি দিয়েছেন, তাকে তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে—তাঁর আদেশ। তাঁর দৃষ্টিতে সাধুর আচরণ যে লঙ্ঘন করেছে, সে কখনই তাঁর সাক্ষাতে আসতে অনুমতি পাবে না।'[২৭] জনৈক ত্যাগী-সন্তানকে বলেছিলেনঃ 'তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি, তুমি আমার সন্তানই থাকবে, কিন্তু ব্রতভঙ্গকারীর কোন প্রায়শ্চিত্তেই সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে স্থান হতে পারে না।'[২৮] অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে আর একজন ত্যাগী-সন্তানকে চিরকালের মতো সঙ্ঘ ত্যাগ করে চলে যেতে হচ্ছে। বিদায়ের সময় শ্রীমা ও সন্তান দুজনেই কাঁদছেন। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদবার পর শ্রীমা আঁচলে চোখ মুছলেন এবং সন্তানকে কলঘরে গিয়ে চোখ ধুয়ে আসতে বললেন। আর বললেনঃ 'এস বাবা, যেখানে বলেছি, সেখানে গিয়ে থাকগে। জেনো, আমি তোমার কাছে সব সময় আছি। এটা (নিজের শরীর দেখিয়ে) গেলেও তা-ই।...কোনও ভয় নেই।' সন্তান যখন যায়, মা জানলায় দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায়, দেখতে থাকেন। সেদিন শ্রীমা সারাদিন কেঁদেছেন। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত করতে পারেননি।[২৯] লক্ষণীয় যে, পতিত সন্তানের প্রতি এতটা সহানুভূতি সত্ত্বেও মা কিন্তু তার শাস্তি রদ করেননি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

মায়ের তেজোদৃপ্ত মূর্তি আমরা আর একবার দেখেছি সিন্ধুবালা ঘটনার প্রসঙ্গে। মা সেদিন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বলেছিলেনঃ 'এটা কি কোম্পানির আদেশ, না পুলিস সাহেবের কেরামতি?...এমন কোন ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু-চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারতো?'[৩০]

রুদ্রতেজ এবং বিগলিত করুণার যুগপৎ প্রকাশে নিম্নলিখিত ঘটনাটি মায়ের জীবনে অনন্য হয়ে আছেঃ শ্রীমার সংসারে অনেকের মতো পাগলীমামীও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একদিন বিকালে শ্রীমা রাত্রের কুটনো কুটছেন। হঠাৎ পাগলীমামী এসে বলছেনঃ 'তুমিই তো রাধুকে আফিম খাইয়ে পঙ্গু করে বশ করে রেখেছ। আমার নাতিকে, আমার মেয়েকে আমার কাছে পর্যন্ত যেতে দাও না।' শ্রীমা নির্বিকারচিত্তে বললেনঃ 'নিয়ে যা না তোর মেয়েকে, ঐ তো পড়ে আছে। আমি লুকিয়ে রেখেছি নাকি?' মায়ের কথা শুনে পাগলীমামী যথারীতি গালাগালি শুরু করলেন। শেষে শ্রীমাকে মারবার জন্য একখানা জ্বালানি কাঠ আনতে ছুটলেন। শ্রীমা তখন চিৎকার করে উঠেছেনঃ 'ওগো কে আছ, পাগলী আমায় মেরে ফেললে!' সেবক স্বামী ঈশানানন্দ ছুটে এসে দেখেন, পাগলীমামী কাঠখানা প্রায় মায়ের মাথায় বসিয়ে দিচ্ছেন। তিনি শেষমুহূর্তে সেটিকে পাগলীমামীর হাত থেকে সরিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে পাগলীমামীকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। এদিকে শ্রীমাও এই উত্তেজনার মুখে যেন অন্য লোক হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বের হয়ে পড়লঃ 'পাগলী,

কি করতে বসেছিলি? ঐ হাত তোর খসে পড়বে।' পরক্ষণেই তিনি জিব কেটে শিউরে উঠলেন এবং ঠাকুরের দিকে চেয়ে জোড়হাতে বললেনঃ 'ঠাকুর, একি করলাম! এখন উপায় কি হবে? আমার মুখ দিয়ে কোনদিন তো কারও ওপর অভিসম্পাত-বাক্য বেরোয়নি; শেষটায় তা-ও হল? আর কেন?' মায়ের সেই করুণামূর্তি দেখে সেবক স্তম্ভিত—তাঁর নিজের রাগও কোথায় মিলিয়ে গেল।[৩১]

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীমার মধ্যে আপাত-'আসক্তি' ও সুস্পষ্ট নিরাসক্তির যুগপৎ প্রকাশ দেখা গেছে। সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ, প্রত্যেকের সেবাযত্ন শ্রীমা যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণভাবে করতেন, প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ তাঁকে যেভাবে ব্যাকুল করত তা সাধারণ লোকের কাছে আসক্তি বলেই মনে হত। পাগলীমামী, রাধু, অবুঝ ভাইঝি, বিষয়াসক্ত ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে শ্রীমার যে বিচিত্র সংসার—তার মধ্যে শ্রীমার আপাত-আসক্ত রূপটির পরিচায়ক ঘটনা অজস্র।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। পাগলীমামী রাধুর গয়নাগুলি নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। বাবা ঘোর বিষয়ী—লোভে পড়ে গয়নাগুলি কেড়ে রেখে দিয়েছেন। গয়না হারিয়ে পাগলীমামী আরও খেপেছেন এবং জয়রামবাটীতে ফিরে সিংহবাহিনীর মন্দিরে 'মা, গয়না দাও ; মা, গয়না দাও' বলে কাঁদছেন। শ্রীমা তখন নিজের বাড়িতে বসে আছেন। অন্য কেউ শুনতে না পেলেও, পাগলীমামীর কান্না শ্রীমার কানে পোঁছেছে। তিনি বলে উঠলেনঃ 'যাই, যাই! বাবা, ওর আমি ছাড়া কেউ নেই। পাগলী সিংহবাহিনীর কাছে গয়নার জন্য কাঁদছে।' এই বলে তিনি সিংহবাহিনীর মন্দির থেকে তাঁকে নিয়ে এলেন। পাগলীর তখন খেয়াল চাপলঃ মা-ই তাঁর গয়না নিয়েছেন। তিনি সুর পালটে বলতে লাগলেনঃ 'ঠাকুরঝি, তুমিই আমার গহনা আটক করে রেখেছ, তুমিই দিচ্ছ না।' শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'আমার হলে আমি কাক-বিষ্ঠাবৎ এই দণ্ডে ফেলে দিতুম।' সেদিনের ঘটনা এখানেই শেষ হল। পরে একদিন সকালে শ্রীমা লোক পাঠালেন, পাগলীমামীর বাবার কাছে—অলঙ্কার ফিরিয়ে আনতে কিংবা ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করে আনতে। ব্রাহ্মণ এলেন, কিন্তু গয়না দিলেন না। শ্রীমা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে ধরে অনুরোধ করলেনঃ 'আপনি আমাকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করুন।' কিন্তু লোভী ব্রাহ্মণের মন গলল না। উপায়ান্তর না দেখে শ্রীমা কলকাতায় সব জানিয়ে চিঠি দিলেন। মায়ের চিঠি পেয়ে মাস্টারমশাই এবং ললিত চট্টোপাধ্যায় (যিনি 'কাইজার' নামে ভক্তমহলে পরিচিত ছিলেন) জয়রামবাটী এলেন। ললিতবাবুর সঙ্গে কলকাতা-পুলিসের একজন বড় কর্মচারীর চিঠি ছিল। তিনি নিজেই পুলিসের বড়কর্তা সেজে গয়না উদ্ধার করতে রওনা হলে শ্রীমা ভয় পেলেন, পাছে ব্রাহ্মণের কোন অপমান হয়। তাই তিনি মাস্টারমশাইকেও পিছনে পাঠালেন। সন্ধ্যার আগেই গয়না-সমেত ব্রাহ্মণকে শ্রীমার নিকট উপস্থিত করা হল এবং ব্রাহ্মণ অলঙ্কার ফেরত দিলেন। এই ঘটনার এখানেই সমাপ্তি হল। কিন্তু

রাত দুটোর সময় খবর এল—শ্রীমার ঘুম হচ্ছে না, মাথা ঘুরছে। শ্রীমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে শ্রীমা বললেনঃ 'ওরা তো সব চলে গেল গয়না আনতে ; আমি সমস্ত দিন ভেবে অস্থির, পাছে ব্রাহ্মণের কোনরূপ অপমান হয়। এই ভাবনায় বায়ু প্রবল হয়ে এমন হয়েছে।'[৩২]

সংসারে অধিকাংশ সময়েই যে বিরক্তি ও অশান্তির কারণ, সেই পাগলীমামীর প্রতিও সহানুভূতি ও করুণা; লোভী ব্রাহ্মণকে প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ, পরে তার অন্যায়ের উপযুক্ত প্রতিবিধান এবং সর্বাবস্থায় সেই অপরাধীর প্রতিও সহমর্মিতা—সব মিলিয়ে এই ঘটনাটি শ্রীমার ব্যক্তিত্বকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করেছে। শ্রীমার দৈনন্দিন জীবনে এই ধরনের অনেক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে শ্রীমাকে স্থাপিত করে সেইসব জটিল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শ্রীমার সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বকে আরও উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তথাপি, সাধারণ গ্রাম্য নারীর গার্হস্থ্য-জীবনকেই স্বীয় কর্মক্ষেত্র করেছিলেন বলে, তাঁর সান্নিধ্যে-আসা অনেক ভক্তের মনেই এই সংশয় জেগেছেঃ শ্রীমা যেন সংসারে প্রবলভাবে আসক্ত। এমনকি উচ্চকোটির সাধিকা যোগীন-মা পর্যন্ত এই সংশয় থেকে রেহাই পাননিঃ 'ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন, আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারীর মতন—ভাই, ভাইপো, ভাইঝিদের জন্য অস্থির।'[৩৩] কিন্তু শ্রীমার বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের আচরণ থেকে বোঝা যায়, তাঁর এই আসক্তি একান্তভাবেই বাহ্যিক—অন্তরের অনাসক্তিই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ টাকা স্পর্শ করতে পারতেন না, অথচ শ্রীমা অর্থ ও অলঙ্কার লক্ষ্মী-জ্ঞানে মাথায় ঠেকাতেন। তা বলে অর্থের প্রতি শ্রীমার কোনও আসক্তি ছিল না। একবার জয়রামবাটী যাবার আগে শ্রীমা সেবককে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে দেশের এক দুঃস্থা মেয়ের জন্য একখানা গায়ের কাপড় কিনে আনতে বললেন। সেবক আড়াই টাকায় কাপড় কিনে বাকি সাড়ে সাত টাকা ফেরত দিতে গেলে মা বললেন যে, তিনি পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিলেন, সুতরাং অত টাকা তিনি ফেরত নেবেন না। সেবক মাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'প্যাঁটরায় কখানা দশ টাকার নোট এবং কখানা পাঁচ টাকার নোট ছিল মনে আছে তো?' মা বললেনঃ 'না।' সেবক আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'সর্বসুদ্ধ কত টাকা ছিল তা-ও কি মনে আছে?' মা বললেনঃ 'না।' সেবক মুশকিলে পড়লেন। কারণ, এরপরে মা যে দশ টাকার নোটই দিয়েছেন, পাঁচ টাকার নোট দেননি—মায়ের কাছে তা প্রমাণ করার আর কোন উপায় রইল না। অনেক বলে-কয়ে সেবক সেদিন মাকে ঐ টাকা ফেরত নিতে রাজী করতে পেরেছিলেন।[৩৪] ঘটনাটি প্রমাণ করে, অর্থকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিলেও মা তার প্রতি কতটা উদাসীন ছিলেন।

শ্রীমা যখন দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বর দর্শনে গিয়েছিলেন, তখন রামনাদের রাজার আদেশে তাঁকে মন্দির-সংলগ্ন রত্নাগারটি খুলে দেখানো হয়। রামনাদের রাজা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন। মন্দিরের কর্মচারীদের তিনি তারযোগে বলে পাঠিয়ে-ছিলেনঃ 'আমার গুরুর গুরু পরমগুরু যাচ্ছেন—সব ব্যবস্থা করবে।' তাঁর আদেশ ছিল, রত্নাগার দেখে মা যদি কিছু চান, তৎক্ষণাৎ যেন তাঁকে তা উপহার দেওয়া হয়।

কর্মচারীরা মাকে রাজার এই আদেশ জানালে, মা ভেবে পেলেন না, তাঁর চাইবার মতো কি আছে। বললেনঃ 'আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।' পাছে রাজকর্মচারীরা মনঃক্ষুণ্ণ হন, সেইজন্য শ্রীমা এইকথা বললেন বটে, কিন্তু যখন কোষাগার খুলতেই হীরা-জহরতের সব জিনিস ঝক্‌মক্ করে উঠল, তখন শ্রীমা বালিকা রাধুর জন্য ভয় পেয়ে গেলেন। সে যা দেখে তা-ই চেয়ে বসে। তাই শ্রীমা ঠাকুরের কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলেনঃ 'ঠাকুর, রাধুর যেন কোন বাসনা না জাগে।' ঠাকুর প্রার্থনা শুনলেন। সব দেখে রাধু বললঃ 'এ আবার কি নেব? ওসব আমার চাই না। আমার লেখবার পেনসিলটা হারিয়ে ফেলেছি, একটা পেনসিল কিনে দাও।' শ্রীমা এইকথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।[৩৫]

শ্রীমার 'সংসার-আসক্তি'র সূত্র রাধু। সারদা-লীলায় রাধু যোগমায়া। শ্রীমার 'নির্বাসনা' মন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর যখন ঊর্ধ্বলোকে ছুটে চলেছিল তখন তাকে জাগতিক ভূমিতে নামিয়ে এনে শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কাজ সম্পাদনে ব্রতী করানোর জন্য রাধুরূপী যোগমায়ার প্রয়োজন হয়েছিল। রাধুর মা সুরবালা দেবী বলেছেনঃ '"রাধী" "রাধী" করে মা ব্যস্ত ও রাধীর জন্য ব্যাকুল হওয়ার পূর্বে মাকে দেখে সাক্ষাৎ এক দেবীমূর্তি মনে হত, কাছে যেতে সাহস হত না। তখন অন্যরকম ছিল ঠাকুরঝি, ঠাকুরুনটির মতো ; পূজার আসনে যখন বসত, তখন কাছে যেতে সাহস হত না। ভয় করত।'[৩৬] রাধুকে অবলম্বন করে শ্রীমা যে সংসার-লীলা করেছেন, তা দেখে প্রাকৃত-জনের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছেঃ মা দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ। তাদের সেই সংশয় নিরসন করতে মায়ের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। ক্বচিৎ কখনও ভাগ্যবান শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের কাছে বলেছেনঃ 'তাঁর কাজের জন্যই না "রাধী, রাধী" করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে, তখন আর এ দেহ থাকবে না।'[৩৭] রাধু অতিরিক্ত আবদার উৎপীড়ন করলে মাঝে মাঝে শ্রীমা মৃদু হেসে বলেছেনঃ 'ও কি মনে করে, ওকে না হলে আমার চলে না। এক্ষুণি মনকে তুলে নিলে কোথায় পড়ে থাকবে এসব!'[৩৮] মায়ের অন্ত্যলীলার দিনগুলিতে দেখা গেছে, কিভাবে মা অনায়াসে রাধুর উপর থেকে মন তুলে নিয়েছেন। উদ্বোধনে শেষ অসুখের সময় মা হঠাৎ আদেশ দিলেন রাধুকে জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিতে। ভক্তেরা স্তম্ভিতঃ 'মা রাধুগতপ্রাণ ; এত ভালবাসেন, তাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, এই অসুখে শুয়ে থেকেও রাধু ও তার খোকার অনুসন্ধান করেন। আর আজ এই অবস্থায় তাদের জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিতে বলছেন—একি ব্যাপার!' একদিন সুস্পষ্টভাবেই মা বললেন যে, রাধুর উপর থেকে তিনি মন তুলে নিয়েছেন। স্বামী সারদানন্দ সব শুনে বললেনঃ 'তবে আর মাকে রাখা গেল না। রাধুর উপর থেকে যখন মন তুলে নিয়েছেন, তখন আর আশা নেই।'[৩৯] রাধুর সঙ্গে মায়ের যে শেষ কথা, তাতেও এই বাঁধন-ছেঁড়ার সুর স্পষ্টঃ 'কুটো ছেঁড়া করে দিয়েছি। তুই আমাকে কি করবি, আমি কি মানুষ?'[৪০]

মা নিজেই একবার তাঁর এই আসক্তি-নিরাসক্তির রহস্যের উপর আলোকপাত করেছিলেনঃ 'কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, তখন শার্সিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।'[৪১]

মহামায়ার মানবী-লীলার সবটুকুই অনির্বচনীয়। উচ্চকোটির সাধু-পুরুষের চোখে এই লীলার রহস্য কিছুটা ধরা পড়ে—তাঁরই কৃপায়। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাই বুঝতে পেরেছিলেনঃ 'কী মহাশক্তি [শ্রীমা সারদাদেবীরূপে] জগতের কল্যাণের জন্য রয়েছেন! যে মনকে আমরা এখানে (কণ্ঠদেশে) ওঠাতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, সেই মনকে তিনি সেখানে "রাধু রাধু" করে জোর করে নাবিয়ে রেখেছেন।'[৫২] স্বামী সারদানন্দও বিস্মিত হয়ে বলেছিলেনঃ 'এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি।'[৫৩]

॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীমার মধ্যে উচ্চতম আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার সঙ্গে নিখুঁত ব্যবহারিক জ্ঞানের সমাবেশ হয়েছিল। নবযুগের ধর্মঃ কর্মপরিণত বেদান্ত—যা বলে জীবের মধ্যেই শিব, মানুষ ভগবানেরই একটি রূপ ; প্রতিটি কাজ বস্তুত নানা রূপে নানা নামে বিরাজিত সেই জীবরূপী ঈশ্বরেরই আরাধনা। শ্রীশ্রীমা এই ধর্মকে জীবনে রূপায়িত করেছেন জীবনকে অস্বীকার করে নয়—জীবনকে সর্বতোভাবে বরণ করে নিয়ে, সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত কর্তব্যকর্মকে উপাসনা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলে যে ব্যবহারিককে পারমার্থিকের স্তরে উন্নীত করা সম্ভব, শ্রীমা তাঁর জীবনে দেখিয়েছেন। ব্যবহারিক জীবনকে অস্বীকার করেননি বলেই তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার সঙ্গে বাস্তববুদ্ধির দুর্লভ সমাবেশ হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্মস্থাপনের জন্য লীলাসঙ্গিনীরূপে নির্বাচন করে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীরূপে নিজে যাঁকে জগতের কাছে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা বাহুল্যমাত্র। আমরা এখানে শুধু মায়ের ব্যবহারিক জ্ঞান ও বাস্তববুদ্ধির কয়েকটি উদাহরণ দেব।

ঠাকুর তখন স্থূলশরীরে আছেন। একবার উল্টোরথের পর বলরামমন্দির থেকে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরছেন। একই নৌকায় ঠাকুরের সঙ্গে আছেন দু-একজন বালকভক্ত, গোলাপ-মা ও গোপালের মা। গোপালের মার সঙ্গে বলরামবাবুর বাড়ির মহিলারা একটা বড় পুঁটলিতে কাপড় ইত্যাদি দরকারী জিনিস দিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুর সর্বদা সঞ্চয়ের বিরোধী। ঐ পুঁটলিটি দেখেই তিনি গোপালের মার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। নৌকায় তিনি আর গোপালের মার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। তাঁর এই সুস্পষ্ট ভাবান্তর দেখে গোপালের মা সব বুঝলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, তক্ষুণি পুঁটলিটি গঙ্গাজলে ফেলে দেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই

গোপালের মা শ্রীশ্রীমার কাছে সব খুলে বললেনঃ 'ও বউমা, গোপাল [অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ] এইসব জিনিসের পুঁটলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়?—তা এসব আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই!' শ্রীশ্রীমা কিন্তু বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করে বললেনঃ 'উনি বলুন গে। তোমায় দেবার তো কেউ নেই, তা তুমি কি করবে, মা?—দরকার বলেই তো এনেছ!'[৪৪] ঠাকুর শুধুমাত্র পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে-সমস্যাটিকে দেখছিলেন শ্রীমা এখানে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার সুন্দর সমাধান করে দিলেন। বৃদ্ধার আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মায়ের সহানুভূতি ও সহমর্মিতাও এখানে লক্ষণীয়।

জয়রামবাটীতে মায়ের নতুন বাড়ির উপর স্থানীয় পঞ্চায়েত বার্ষিক চার টাকা ট্যাক্স ধার্য করেছিলেন। প্রথমবারের ট্যাক্স যখন দেওয়া হয়, শ্রীমা তখন কলকাতায় ছিলেন। দ্বিতীয় বছর ট্যাক্স আদায়ের জন্য যখন চৌকিদার এলেন মা তখন জয়রামবাটীতেই ছিলেন। মা সেবককে ঐ ট্যাক্স দিতে নিষেধ করলেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলে ঐ ট্যাক্স মকুব করতে বললেন। সামান্য টাকার জন্য মাকে এত কড়াকড়ি করতে দেখে সেবক মনে মনে আশ্চর্য হলেন। কারণ, তিনি ভাল করেই জানেন, টাকা-পয়সার ব্যাপারে মা কতটা উদার। মা পরে সেবককে বুঝিয়ে বললেনঃ 'এখন আমি এখানে রয়েছি, নাহয় ট্যাক্সের টাকা দিয়ে দিলুম, কিন্তু পরে যে সাধু-ব্রহ্মচারী থাকবে, তাকে হয়তো ভিক্ষে করেই খেতে হবে। সে কোথায় টাকা পাবে?'[৪৫]

জিবটার শম্ভু রায়ের ভাইপো সজনীবাবু মায়ের বাড়ির দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ের ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ডাক্তার মাঝে মাঝে নিজেদের বাগানের শাকসবজি নিয়ে আসেন, মা তা সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু দীক্ষার সময় সজনীবাবু দুটি টাকা দিয়ে মাকে প্রণাম করলে মা সেই টাকা ফিরিয়ে দিলেন। সেবক এতে একটু অবাক হয়েছেন দেখে মা পরে বুঝিয়ে বললেনঃ 'দেখ, সজনীর টাকা রাখলুম না ; জিনিসপত্র নিজেদের বাগানের নিয়ে আসে, সেটা আলাদা কথা। ওর বাড়ির লোকেরা টাকা নেওয়ার কথা শুনলে ভয় পাবে—আমি তাদের বিষয়সম্পত্তিতে না হাত দিই। ওরা ভারী বিষয়ী লোক—তালুকদার। ওদের মনে সন্দেহ হতে পারে।'[৪৬] ঘটনা তিনটি মায়ের ব্যবহারিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।

অন্যতম সেবক জ্ঞান মহারাজ জয়রামবাটীতে বেশী দাম দিয়েও খাঁটি দুধ কিনতে চাইতেন। তিনি গোয়ালাকে বলতেনঃ টাকায় আট সের দেবে, তবু খাঁটি চাই। মা শুনে তাঁকে তিরস্কার করে বললেনঃ 'ওকি, জ্ঞান? এখানে পয়সায় পোয়া দুধ মেলে, গরীবে খেতে পায়। আর তুমি অমন করে দর বাড়াচ্ছ! গোয়ালা—সে তো জল দেবেই ; দর বাড়ালে তখন তো পয়সা বেশী পাবে বলে আরও জল মেশাতে চাইবে।'[৪৭] আর একবার জ্ঞান মহারাজ বেশী দামে প্রচুর খাঁটি দুধ জোগাড় করে গোপেশ মহারাজকে দিয়ে জয়রামবাটী পাঠালেন ঠাকুরসেবার জন্য। রাস্তায় গোপেশ

মহারাজ লক্ষ্য করলেন, দুধে একটি ছোট মাছ ভাসছে। তাঁর মনে হল, এই দুধ যখন আর ঠাকুরসেবায় লাগবে না, ফেলে দেওয়াই উচিত। তথাপি নিজের বুদ্ধি না খাটিয়ে ঐ দুধ মায়ের কাছে নিয়ে এসে মাকে সব কথা বললেন। মা সব শুনে বললেনঃ 'ফেলব কেন? ঠাকুরের ভোগে না দিলেও বাড়ির ছেলেপিলে আছে, তারা তো খেতে পারে।'[৪৮] দুটি ঘটনাই মায়ের সাংসারিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

পারমার্থিক সত্যে নিজেকে সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেও শ্রীশ্রীমা জীবনকে সামগ্রিক-ভাবে ভালবেসেছিলেন ; আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, জীবনের মধ্যে সেই এক চিরন্তন সত্যেরই বহুধা বিচিত্র প্রকাশ সব সময় লক্ষ্য করেছেন বলেই জীবনের সব অঙ্গকে তিনি ভালবেসেছেন। এই ভালবাসায় কোন আসক্তি বা বন্ধন ছিল না। ছিল না বলেই, ব্যবহারিক জীবনের জটিল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতেন, সেগুলি সব সময়ই হত সেই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সর্বোত্তম সুষ্ঠু সমাধান। ভগিনী নিবেদিতা মায়ের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বলে-ছিলেনঃ 'মায়ের অগোচরে সমাজে যেসব বিপ্লব ঘটছে, তার দ্বারা বিভ্রান্ত বা বিপর্যস্ত হয়ে কেউ যদি তাঁর কাছে উপস্থিত হত, তবে তিনি অভ্রান্তদৃষ্টিতে সেই সমস্যার মর্মোদ্ঘাটন করে প্রশ্নকর্তার মনকে সেই বিপদ কাটাবার জন্য প্রস্তুত করে দিতেন।'[৪৯]

জাগতিক দৃষ্টিতে শ্রীমা একরকম নিরক্ষরই ছিলেন—নিজের নামটাও লিখতে পারতেন না। সেই তিনিই যখন স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশবাবু প্রভৃতি প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকদের উপদেশ দিয়েছেন এবং তাঁরাও সেই উপদেশ অবনতমস্তকে মেনে নিয়েছেন, তখনও শ্রীমার অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে আমরা মোহিত হই। স্বামীজী যখন ঠিক করতে পারছিলেন না, তিনি আমেরিকায় যাবেন কিনা, তাঁর বিদেশযাত্রা শ্রীরাম-কৃষ্ণের অভিপ্রেত কিনা, তখন শ্রীমার অনুমোদনই স্বামীজীকে সর্বসংশয় থেকে মুক্ত করে তাঁকে আমেরিকায় যেতে উৎসাহিত করেছিল। আর একবার অমরনাথ দর্শন করে ফিরে স্বামীজী শ্রীমাকে অভিমান করে বলেছিলেনঃ 'মা, এই তো তোমার ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত যেত বলে সে শাপ দিলে, "তিন দিনের ভেতর ওকে উদরাময়ে এখান ছেড়ে যেতে হবে।" আর কিনা তা-ই হল—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না! তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।' শ্রীমা বললেনঃ 'বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বইকি বাবা! তাঁরা তো আর ভাঙতে আসেন না! আমাদের ঠাকুর হাঁচি, টিকটিকি পর্যন্ত মেনেছেন। শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই নিজের শরীরে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জান, খুড়তুত দাদার (হলধারীর) অভিসম্পাতে ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে আসা একই কথা।' স্বামীজী তখনও অভিমানভরে বললেন যে, শ্রীমা যতই বলুন না কেন, তিনি মানতে রাজী নন ; আসলে ঠাকুর কিছুই নন। শ্রীমা তখন সকৌতুকে বললেনঃ 'না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা!' স্বামীজী তখন সেকথার সত্যতা অনুভব করে শ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।[৫০] এই থেকে বোঝা যায়, ঠাকুরের আদর্শকে

শ্রীমা কতটা অধিগত করেছিলেন। যেখানে বাইরের ঘটনা স্বামীজীকে পর্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে, সেখানে শ্রীমা-ই স্বামীজীকেও পথ দেখিয়েছেন। আর একদিন গিরিশবাবু শ্রীমার কাছে সন্ন্যাস-গ্রহণের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। শ্রীমা রাজী হলেন না। তখন মহাকবি গিরিশবাবু বহুক্ষণ ধরে নানা যুক্তি-তর্ক দিয়ে শ্রীমাকে নিজের মতে আনতে চেষ্টা করলেও শ্রীমা কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তেই অটল রইলেন।[৫১] গিরিশবাবুর ভবিষ্যৎজীবন শ্রীমার সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

শ্রীমা ছিলেন করুণার নির্ঝরিণী। বহু লোক তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে আসত। তিনিও ঠাকুরের সেই নির্দেশ, 'তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে'[৫২]—মেনে নিয়ে তাদের ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। দীক্ষা দিলে শিষ্যের পাপ গুরুকে গ্রহণ করতে হয় ; ফলে অনেক সময় শ্রীমাকে কষ্ট ভোগ করতে হত। কিন্তু তবুও তিনি নির্বিচারে যারাই এসেছে, তাদেরই দীক্ষা দিয়ে ধন্য করেছেন। এই সম্বন্ধে স্বামী প্রেমানন্দ একবার বলেছিলেনঃ 'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে—সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। —অনন্তশক্তি —অপার করুণা! ...আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত "বাজিয়ে বাছাই করে" লোক নিতেন!...আর এখানে...[শ্রীমা] সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন।'[৫৩] পাপী-তাপীর স্পর্শে শ্রীমার শরীরেও ঠাকুরের মতো অসহ্য যন্ত্রণা হত ; কিন্তু সে যন্ত্রণা তিনি নীরবে সহ্য করতেন। একদিন সেবক দেখলেন যে, সকলের প্রণাম হয়ে গেলে পর, শ্রীমা বার বার গংগাজল দিয়ে পা ধুচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমা বললেনঃ 'আর কাউকে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করতে দিও না। যত পাপ এসে ঢোকে, আর পা জ্বলে যায় ; পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এই জন্যই তো ব্যাধি।' বলেই, আবার বললেনঃ 'এসব কথা শরৎকে বলো না! তাহলে প্রণাম করা বন্ধ করে দেবে।'[৫৪] কোয়ালপাড়ায় এক শিষ্য প্রণাম করতে গিয়ে কথা-প্রসংগে শ্রীমাকে বলেছিলঃ ভক্তদের স্পর্শে যখন কষ্ট হয়, তখন স্পর্শ না করাই উচিত। উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'না বাবা, আমরা তো ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে?'[৫৫] একথার আর কি উত্তর হতে পারে!

আর একদিন শ্রীমা তাঁর একজন শিষ্যকে বলেছিলেনঃ 'এরা সব ঘুমুতে বলে। ঘুম কি আর আছে, না আসে? মনে হয়, যতক্ষণ ঘুমুব, ততক্ষণ জপ করলে জীবের কল্যাণ হবে। এক একবার মনে হয়, এই শরীরটুকু না হয়ে একটা খুব বড় শরীর হত, তাহলে কত জীবেরই না কল্যাণ হত!'[৫৬] এই যে শ্রীমা অপরকে আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে দেবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করেছেন, নিজে ঘুমুতে পর্যন্ত চাইতেন না, এ কি কেবল তাঁর অবতারত্বের দায় পূরণের জন্যে, অথবা তাঁর সর্বগ্রাসী করুণার প্রেরণায়? শ্রীমা একদিন বলেছিলেনঃ 'একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি

তাকে মারবে—দেখলুম কি তা জান? দেখলুম, সেটা পিঁপড়ে তো নয়—ঠাকুর—ঠাকুরের সেই হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই।—রাধিকে আটকালুম—ভাবলুম, তাইতো, সব জীব যে ঠাকুরের! আমি আর কি করতে পারছি—কজনকে দেখতে পাচ্ছি? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন! সকলকে দেখতে পারতুম, তবে তো হত।'[৫৭] এতক্ষণে বোঝা গেল, কেন শ্রীমা অপরের কল্যাণের জন্য অত ব্যাকুল হতেন। তাঁর অবতারত্বের দায়, মাতৃভাবের প্রেরণা, ঠাকুরে ভার-সমর্পণ—এ সবই যেন বিধৃত হয়েছিল শ্রীমার এই ভাব—'সর্বং রামকৃষ্ণময়ং জগৎ' এই সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর। এই অনুভূতির পর শ্রীমার পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি অপরের কল্যাণের জন্যে সদাসর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকবেন। স্বাভাবিক, কিন্তু জগতের পক্ষে অতুলনীয়।

আমরা এখানে মায়ের অ-তুলনীয় ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এই আলোচনা অসম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে। মায়ের ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কনের পক্ষে যে-কোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ। এই ব্যক্তিত্বের অলৌকিকত্ব নীরবতায়, দৃষ্টান্তস্থাপনে ও প্রচারবিমুখতায়; এই ব্যক্তিত্বের অলৌকিকত্ব প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তিকে সাধারণত্বের আবরণে আবৃত রাখায়। এই ব্যক্তিত্বের অ-সাধারণত্ব মান-সম্মান ও অসম্মানের মুখে অবিচল থাকায়; এই ব্যক্তিত্বের শক্তি ধৈর্যে, স্থৈর্যে ও নমনীয়তায়! নমনীয় হয়েও আদর্শে অবিচল থাকায়। এই ব্যক্তিত্বের অলৌকিকত্বের মূলসূত্র মানবী-আধারে দেবীর প্রকাশে। ভক্তদের বিশ্বাস, স্বয়ং মহামায়া সারদা-দেবীরূপে জগতে এসেছিলেন। মা নিজেও একবার বলেছিলেন যে, তিনিই স্বয়ং মায়া। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাই অসাধারণ, অনির্বচনীয়। সাধারণ মানুষের সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য এবং সাধারণ মানুষের সাথে সম্পূর্ণ অমিল—এই দুটি ধারা তাঁর জীবনকে পরম মহিমায় মণ্ডিত করেছে।

শ্রীমা এসেছিলেন তাঁর সময়ের বহু-পরবর্তী কালের ভাবাদর্শ নিয়ে। সেই ভাবাদর্শ মহৎ উদার প্রেমের আদর্শ—উচ্চ-নিচ, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান, ভারতীয়-অভারতীয় প্রভৃতি বিবেচনা ও বিচারের মূঢ়তা যাকে স্পর্শ করে না। শ্রীমায়ের আচরণে এই আদর্শের রূপায়ণ বার বার আমরা দেখি (বর্তমান গ্রন্থমধ্যে তা বহু-আলোচিতও)। তাই তিনি অতুলনীয়া। তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ঘটনায় তাঁর সেই অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। অনেক সময় আমরা তা বুঝতে পারি, আবার অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি গুলিয়ে যায়—তাঁর স্বরূপকে ভুলে যাই। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অতুলনীয়, তাঁর প্রতিটি কথা ভাবগাম্ভীর্যে ভরপুর, তাঁর প্রতিটি ব্যবহার ভগবদ্ভাবে মহিমামণ্ডিত। যদি সেগুলি হৃদয়ের গভীরে চিন্তা করতে পারি, তবেই শ্রীমার অলৌকিক ব্যক্তিত্বের কিছুটা পরিচয় পেতে পারব; অথবা তিনি নিজে যদি চিনিয়ে দেন, তবেই হবে। বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা এই ব্যক্তিত্বকে বোঝা যায় না, কোন লৌকিক মাপকাঠিতে একে তুলনা করা যায় না। শ্রীমা নিজেও একবার বলেছিলেন জনৈক ভক্তকেঃ 'তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মতো একটি বের কর দেখি!'[৫৮]

সমন্বয়ের আলোকে শ্রীমা

'যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক।'[১]—শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমরা সর্বধর্মের সমন্বয়কারী বলিয়া থাকি। যদিও সমন্বয় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে একটি বহু প্রাচীন ধারণা, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে, আচরণে ও শিক্ষায় ইহা যেরূপ সুস্পষ্টতা ও পরিবিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা সত্যই অভিনব। শ্রীমা সারদাদেবী ঠাকুরের প্রতিচ্ছায়া—মহাশক্তি। যে-সমস্ত জীবনাদর্শ ও অধ্যাত্মচেতনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা জননী সারদাদেবীর মধ্যেও যে পরিস্ফুট হইবে ইহাই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে যে বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, আত্মজ্ঞান, সমাধি, লোকসেবা প্রভৃতির সমুজ্জ্বল অভিব্যক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, শ্রীমার মধ্যেও তাহার প্রচুর পরিস্ফুরণ লক্ষিত হয়। সর্বধর্মসমন্বয়ের অনুভূতিও ইহার ব্যতিক্রম নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু-সাধনার নানা আদর্শ পৃথক পৃথক ভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বেদমত, পুরাণমত, তন্ত্রমত তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞানে সজীব হইয়াছিল। পরে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সাধনাও করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। শ্রীমার সাধনজীবনে উপর্যুক্ত নানা ভাবের ব্যাপক সাধনার কোনও পরিচয় পাওয়া না গেলেও ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ—তিনি যে নানা সময়ে প্রত্যক্ষানুভূতিতে লাভ করিতেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিভিন্ন মতের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বহুসময়ে পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—'যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক'—শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল। যে সমন্বয়ানুভূতি ঠাকুরের চরিত্রকে সর্বদা সকল একদেশদর্শিতা, অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিত, শ্রীমাও ঐ অনুভূতি লইয়া চলাফেরা করিতেন। কি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, কি তান্ত্রিক ভৈরবী, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান—জননী সারদাদেবী যে সকলের প্রতিই একটি উদার সমদৃষ্টি পোষণ করিতেন তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। সর্বধর্মসমন্বয়ের দিক দিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্টতম প্রতিচ্ছায়া।

যিনি জীবনে সমন্বয়স্থাপন করিয়াছেন তাঁহার আচরণে সকলের সহিত একটি তাদাত্ম্যভাব স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে। কোনও ক্ষেত্রেই তিনি আপনাকে অপরের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেন্ না। জয়রামবাটী পল্লীর সর্বজনীন দেবতা সিংহবাহিনীর প্রতি জননী সারদাদেবীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি পল্লীর অন্য শত শত নরনারীর ভক্তি-বিশ্বাসকে অনুসরণ করিয়া চলে। পল্লীবাসীরা দেবীর মন্দিরে যেসকল আপাত-কুসংস্কারপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করে, শ্রীমাও একান্ত তন্গতভাবে তাহা পালন

করেন। কাহারও বুঝিবার উপায় নাই যে, তাঁহার মন সকল আচার-অনুষ্ঠানের পারে ব্রহ্মানুভূতির ভূমিতে সর্বদাই বিলাস করিতেছে। পুরীতে মা জগন্নাথ-দর্শন করিতে যাইবেন। পালকি করিয়া যাইবার কথা উঠিতে মা বলিতেছেনঃ না, আমি দীন-হীন কাঙালিনীর মতো পায়ে হেঁটে যাব।[২] অপর শত শত দর্শনার্থীর ন্যায় তিনি তাহাই করিতেছেন। জগৎস্বামীর সহিত তাদাত্ম্যবোধ যাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি তিনি তাহা লুকাইয়া রাখিয়া সাধারণ ভক্ত-নরনারীর দলভুক্ত হইয়া জগন্নাথ-দর্শনে চলিয়াছেন।

জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজার সময় মায়ের পরিশ্রমের অন্ত নাই। রান্না করা, বাসন মাজা, সমাগত সকলের পরিচর্যা করা—অক্লান্তভাবে করিয়া চলিতেছেন। আবার সন্ধ্যারতির সময় করজোড়ে দীনভাবে একপাশে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন, কে বুঝিবে তিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অপরামূর্তি—শত সহস্র ভক্ত-নরনারীর সম্পূজিতা দিব্যজননী?

যাঁহার অন্তরে সমন্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত, সমদর্শিতা তাঁহার লৌকিক ব্যবহারে প্রতি পদে প্রকাশ পায়। তাই সারদাদেবীর মুখে শুনিতে পাই সন্ন্যাসিবর স্বামী সারদানন্দ তাঁহার কাছে যাহা, দরিদ্র আমজাদও তাহাই। গীতায় ভগবান বলিতেছেনঃ

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥[৩]

—'তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালে সমদৃষ্টি পোষণ করেন।' এই সমদর্শনের মূল কোথায়? সমন্বয়ানুভূতিতে। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে পরমসত্যে সমন্বিত সেই সত্য যখন শুধু ধ্যানে নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত, প্রত্যেকটি জ্ঞান ও কর্মের সহিত মিশিয়া যায় তখনই সমন্বয়ানুভূতি পরাকাষ্ঠা লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই একত্বানুভূতি লইয়া সর্বদা বিচরণ করিতেন। শ্রীমা সারদাদেবীরও চেতনা যে অনুক্ষণ এই একত্বে স্থাপিত থাকিত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঠাকুর অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া সংসার করিবার কথা বলিতেন। মাকে উহা আঁচলে বাঁধিতে হয় নাই। উহা তাঁহার দেহমনের রক্তপ্রবাহ, স্নায়ুতন্ত্রীর সহিত ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সমদর্শন বস্তুতঃ ঠাকুরের সমদৃষ্টিকেও কখনও কখনও ছাপাইয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে বাবুদের দাসী ভগবতী সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের ঘরে আসিয়া দূর হইতে ঠাকুরকে প্রণাম করিল। 'ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর বাবুদের বাড়িতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না। কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর পতিতপাবন, তাহার সহিত অনেক পুরানো কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন তো বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, সাধু-বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস তো?

ভগবতী (ঈষৎ হাসিয়া)—তা আর কি করে বোলবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশী, বৃন্দাবন—এসব হয়েছে?

ভগবতী (ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া)—তা আর কি করে বোলবো? একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বলিস কি রে?

ভগবতী—হাঁ, নাম লেখা আছে, "শ্রীমতী ভগবতী দাসী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া)—বেশ বেশ।

এই সময়ে ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

'বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া "গোবিন্দ" "গোবিন্দ" এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল—এখনও আছে! হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল গঙ্গাজল লইয়া সে স্থান ধুইতে লাগিলেন।

'দু-একটি ভক্ত যাঁহারা ঘরে ছিলেন তাঁহারা অবাক ও স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছেন। দাসী জীবন্মৃতা হইয়া বসিয়া আছে। দয়াসিন্ধু পতিত-পাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া করুণামাখা স্বরে বলিতেছেন—"তোরা অমনি প্রণাম করবি।" এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিলেন, "একটু গান শোন্।"

তাহাকে গান শুনাইতেছেন—

(১) মজলো আমার মন-ভ্রমরা...।

(২) শ্যামাপদ আকাশেতে...।

(৩) আপনাতে আপনি থেকো মন...।'[৪]

এই বর্ণনায় উল্লিখিত 'দু-একটি ভক্তের' মতো আমরাও যাহারা মানসচক্ষে ঐ ছবিটি দেখিবার চেষ্টা করি স্বভাবতঃই অবাক ও স্তব্ধ হই। এত অপার্থিব করুণার পাশাপাশি অত কঠোরতা কি করিয়া দেখা দেয়? এখানে ঠাকুরের অদ্বৈতজ্ঞানের ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা এই প্রশ্নও মনে উঁকি মারিতে চায়। তাঁহার ভক্তগণের সহিত ব্যবহারে অনুরূপ বাছবিচারের আরও কিছু কিছু উদাহরণ আছে। তৎকালীন কোন কোন ভক্ত ইহা লক্ষ্য করিয়া কিছু দুঃখ বা সংশয় যে অনুভব করিতেন না তাহাও বলা যায় না। তবে ঠাকুরের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের সম্মুখে ঐ মনঃকষ্ট বা সংশয় যে অচিরাৎ দূর হইয়া যাইত ইহা সুনিশ্চিত। সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তিনি যাহা করেন তাহা ঠিকই—এই বিশ্বাসেরই জয় হইত।

কিন্তু জননী সারদাদেবীর সমদর্শনের ক্বচিৎ কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। 'আমার শরৎ [স্বামী সারদানন্দ] যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।'—এই সূত্র ছোট বড় সকল আচরণে বৎসরের পর বৎসর মায়ের জীবনে পরিপালিত হইয়াছে অতি স্বাভাবিকভাবে। শ্রীশ্রীমায়ের সমন্বিত মানস দিব্যালোকের মতো পরিষ্কার; কোথাও কোনও ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামী প্রেমানন্দের উক্তিঃ 'ঠাকুরের

বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল...কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কী মহাশক্তি!—জয়মা!! জয়মা!!! জয় শক্তিময়ী মা!!!...যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে —সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন।—অনন্ত শক্তি...স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত "বাজিয়ে বাছাই করে" লোক নিতেন!... আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন—সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে!...অসীম ধৈর্য—অপারিসীম করুণা —সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য।'[৫]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমা একদিন ঠাকুরের পদসেবা করিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ '"আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।"'[৬]

ইহার এক বৎসর পরে ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রে শ্রীশ্রীমাকে আসনে বসাইয়া জগন্মাতাজ্ঞানে আনুষ্ঠানিক পূজা করিয়া ঠাকুর এই উক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছিলেন। মানবী মা যে জগজ্জননীর সহিত অভিন্ন তাহা ঐ ষোড়শীপূজা দ্বারা সর্বকালের জন্য আমাদের কাছে ঘোষিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার ভগবান। ভগবানের মতো সমন্বয়-বিধায়ক আর কে আছে? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কি হিন্দু-মুসলমানে, ইহুদী-খ্রীষ্টানে পার্থক্য আছে?—ধনী-নির্ধন, সুন্দর-কুৎসিৎ, জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ আছে? শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ানুভব পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাঁহার পরমপুরুষের সহিত তাদাত্ম্যের জন্যই।

সারদাদেবী ঈশ্বরের পরমা শক্তির সহিত অভিন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহার আচরণের সর্বানুগ্রাহী সমতা অত স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইত। আমরা দেখিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় হই, কিন্তু মায়ের প্রতি ঠাকুরের দেবীত্ব-দৃষ্টির কথা সঙ্গে সঙ্গে যদি স্মরণে রাখা যায় তাহা হইলে ঐ বিস্ময় আর আমাদিগকে অত আলোড়িত করিতে পারে না। আমাদের শত ব্যতিক্রম-যুক্ত অল্পপরিধির ভিতর ক্রিয়াশীল পারস্পরিক প্রীতি-সহানুভূতির সহিত শ্রীশ্রীমায়ের অণুমাত্রভেদহীন সকল মানুষের প্রতি নির্বিচারে প্রবাহিত অনুকম্পার কী বিপুল পার্থক্য! তিনি যদি আমাদের মতো একটি সাধারণ মানুষ হইতেন তাহা হইলে সত্যই তাঁহার আচরণ সর্বপ্রকার ব্যাখ্যা ও যুক্তির বাহিরে অতি বিস্ময়কর বলিতে পারিতাম। কিন্তু সকল অভিব্যক্তি যাঁহাতে অবস্থিত এবং যাঁহার দ্বারা ক্রিয়াশীল তিনি যে সেই পরমেশ্বরী—মহাশক্তি। সেই মহাশক্তির নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। সর্বপ্রসারী একত্ববোধ তাঁহার পক্ষে অতি স্বাভাবিক।

মাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ 'মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে, তুমি কি বল?' মা বলিয়াছিলেনঃ 'হাঁ, তিনি আমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।'

পুনরায় প্রশ্নকর্তা বলিলেনঃ 'অ প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আমি সেভাবে জিজ্ঞাসা করছি না।' মা বলিলেনঃ 'হাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামিভাবেও, এমনি ভাবেও।'[৭] স্বামী অভেদানন্দ রচিত শ্রীসারদাস্তোত্রের একটি শ্লোকঃ

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥[৮]

—যাঁহার সমস্ত প্রাণ রামকৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণনামশ্রবণে যিনি পরমা প্রীতি লাভ করিতেন, যাঁহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহুতর আধ্যাত্মিক ভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল—সেই সারদাদেবীকে বার বার প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীমায়ের সকল অনুভবে, কর্মে ও বাক্যে ঠাকুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। ঠাকুরকে যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন জানিয়া তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার ভিতর দিয়া যে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা অভিব্যক্ত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয় শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে যেভাবে বিকশিত হইয়াছিল তাহার মূল মায়ের ঠাকুরের সহিত এই একান্ত তাদাত্ম্যতেই। ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেনঃ যে এখানে (অর্থাৎ তাঁহার) চিন্তা করবে সে এখানকার ঐশ্বর্য লাভ করবে, ছেলে যেমন বাপের সম্পত্তি পায়।[৯] —শ্রীশ্রীমায়ের ন্যায় নিবিড়ভাবে ঠাকুরের চিন্তা আর কে করিতে পারিতেন? সেইজন্য বলিতে হয় শ্রীশ্রীমা যেমন ভাবে ও যে পরিমাণে ঠাকুরের ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। মা যখন চতুর্দশ-বর্ষীয়া বালিকা তখন হইতেই ঠাকুর তাঁহার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ঠাকুরের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনজীবন তখন শেষ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীকে যেমন ছোট ছোট উদাহরণ দিয়া শিখাইতে হয় তেমনভাবেই ঠাকুর তাঁহার বালিকা-পত্নীকে শিক্ষা দিয়াছিলেনঃ 'চাঁদা মামা যেমন সব শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে।'[১০] সারদাদেবীর মতো ছাত্রীও দুর্লভ। ঠাকুরের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি অকুণ্ঠ যত্নে পরিপালন করিয়া চলিতেন। চতুর্দশ-বর্ষীয়ার কর্ম ও ধর্ম জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে আপন গরিমায় দৃঢ়ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। তিনি যখন অষ্টাদশ-বর্ষীয়া তখন ঠাকুরের সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন এবং তখন হইতেই তাঁহাকে ঠাকুর আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যান-ধারণা-প্রার্থনাদির কথা বিভিন্ন পুস্তকে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। সাধনার নানা উপলব্ধির বিষয় মা নিজে কোনও কোনও অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। সাধনজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে উন্মত্ততা দেখা দিয়াছিল মায়ের ক্ষেত্রে তাহা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য ব্যাকুলতা অন্তর্নিবিষ্ট—বাহিরে বুঝিবার উপায় নাই। নিজের সাধন দ্বারা

যেসকল ভাববৈভব তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার উপর যুক্ত হইয়াছিল ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ। এই সম্পদ তাঁহাতে উপনীত হইয়াছিল তাঁহার আত্মবিস্মৃত শ্রীরামকৃষ্ণময়তা দ্বারা। ষোড়শীপূজার রাত্রে উত্তরদিকে মুখ করিয়া সারদাদেবী মহাকালিকার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্টা। পূজক শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বদিকে মুখ করিয়া পূজানিরত। বাহিরের পূজা আর কতক্ষণ চলিবে? অতি শীঘ্রই পূজিতা সারদাদেবী গভীর ধ্যানমগ্না—পূজক শ্রীরামকৃষ্ণও সমাধিস্থ। সমাধিভূমিতে পূজ্যা ও পূজকের ভেদ চলিয়া গিয়াছে। পূজার ফল—মানবদেহধারিণীর চিরকালের জন্য মহাদেবীত্বের মর্যাদায় সমারোহণ। কিন্তু শুধু কি তাই? উহার দ্বিতীয় ফলও আমরা সহজেই অনুমান ও বিশ্বাস করিতে পারি—জননী সারদাদেবীর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তার সহিত একাত্মতা। যিনি ঠাকুর তিনিই মা; যিনি মা তিনিই ঠাকুর। ঠাকুর ও মায়ের জীবন ও ভাবৈশ্বর্য এক যুক্ত-জীবন, উভয়ের যুক্ত-বিভূতি।

ঠাকুর একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী। তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার যে স্ত্রী বর্তমান, তাঁহার যে পৈতৃক আবাসের সহিত সম্পর্ক আছে একথা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। গুরু তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহিত জানিয়াও তাঁহাকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিতে দ্বিধা করেন নাই। বরং বলিয়াছিলেন, স্ত্রী কাছে থাকিলেও যাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনিই তো ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত। সম্পূর্ণ আসক্তি-বিযুক্ত, সর্বপ্রকার কামনামুক্ত গার্হস্থধর্ম ঠাকুর পালন করিয়াছিলেন। আবার সন্ন্যাসের যাহা মর্মকথা—জ্ঞান-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা—তাহা তো অহরহঃ তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত। গার্হস্থ ও সন্ন্যাসের এইরূপ অপূর্ব সমন্বয় আর কোনও ধর্মগুরুর জীবনে দেখা যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, যদিও সন্ন্যাসের গভীরতম সত্য লইয়া তিনি সর্বদা চলাফেরা করিতেন। বুদ্ধ পরিণীতা স্ত্রীকে দূরে রাখিয়াছিলেন, পরিশেষে ভিক্ষুণী করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য গার্হস্থধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও সন্ন্যাসগ্রহণের পর দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন নাই। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে একই ব্যক্তি গৃহী ও সন্ন্যাসী—ইহার নজির নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের ধর্মাচরণে একটি নূতন সমন্বয় স্থাপন করিলেন। তবে ইহা যে অপরের অনুসরণের জন্য নয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি আশ্চর্য আদর্শ স্থাপনের জন্য—যে আদর্শের সম্যক্ উপলব্ধি তাঁহাতেই সম্ভবপর হইয়াছিল। পরবর্তীরা তাঁহার এই সমন্বয় দেখিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে। সন্ন্যাসী তাঁহার জ্ঞান-বৈরাগ্যের অনুধ্যানে নিজের সন্ন্যাসধর্ম দৃঢ় করিবে, গৃহী তাঁহার নির্লিপ্ত সংসারধর্ম দেখিয়া হৃদয়ে প্রেরণা ও বল পাইবে, সংসারে বাস করিয়াও যে সংসারকে জয় করা যায় এই বিশ্বাস লাভ করিবে।

জননী সারদাদেবীর জীবনে গার্হস্থ ও সন্ন্যাসের সমন্বয় কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল? মা আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি কি মনঃপ্রাণে সন্ন্যাসিনী ছিলেন না? শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত যিনি অনুক্ষণ তন্মগতা, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্য তাঁহার সকল সত্তায় যে অনুপ্রবিষ্ট হইবে না ইহা কি ভাবিতে পারা যায়? আত্মীয়স্বজন, বিশেষতঃ রাধুকে লইয়া তাঁহার অনেক আচরণ দেখিয়া কখনও কখনও

কাহারও মনে সংশয় উঠিত—আমরাও তো পুত্রকন্যা, নাতিনাতনীর প্রতি এত 'আসক্তি' পোষণ করি না, শত শত ব্যক্তির আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীশ্রীমা 'রাধু' 'রাধু' করিয়া এত পাগল হন কেমন করিয়া? এক মহিলা তো একবার বলিয়াই বসিলেনঃ 'মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।' অস্ফুটস্বরে মায়ের উত্তরঃ 'কি করব, মা, নিজেই মায়া।'[১১] মায়াকে যেমন মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ মা সারদাদেবীর মায়ামুক্ত মন কোনও লৌকিক ব্যবহার দ্বারা কখনও সংলিপ্ত হইবার নহে—ইহাই উপরের উক্তিটির ব্যাখ্যা। ঐরূপ মন যাঁহার তাঁহাকে সর্বোত্তম সন্ন্যাসী না বলিয়া পারি কি?

ঐ অন্তঃসন্ন্যাসের সহিত প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবন কী আশ্চর্যভাবেই না তাঁহাতে সমন্বিত হইয়াছিল! অর্থলোলুপ, ঘোর বিষয়াসক্ত ভাইদের কেহ কখনও বলিতে পারিত না, দিদি তাঁহাকে গ্রাহ্য করিলেন না বা শত শত ভক্ত নরনারীর সমর্চিতা হইয়া তাঁহার আর্তি-আবেদন শুনিবার সময় পাইলেন না। দিদি এখন রাজ-রাজেশ্বরীর গরিমায় বসিয়াও তাঁহাদের সেই বাল্যসঙ্গিনী স্নেহময়ী দিদিই যে আছেন তাহাতে ভাইদের কাহারও কোনও সংশয় উঠিবার সুযোগ হয় নাই। ভাইদের যেমন দিদি, ভাইঝি-ভাইপোদের তেমনই পিসীমা, ভাসুরপুত্র-পুত্রীদের খুড়িমা, হৃদয়ের মামীমা, শ্বশ্রূমাতা চন্দ্রমণিদেবীর বৌমা। এই বিভিন্ন ভূমিকা শুধু নামেই তিনি পালন করেন নাই, নিখুঁত অক্লান্ত ব্যবহারে প্রমাণ করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের যথোচিত মর্যাদা দিয়াছেন, শোকাকুলা নারীর ক্রন্দনের সহিত কাঁদিয়া তাহার প্রাণে শান্তি আনিয়াছেন। অত্যাচারী শাসকদের নির্যাতনের সংবাদে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সর্বাত্মভাবের প্রকাশ শুধু ধ্যানের উপলব্ধিতে নহে, নানা স্তরের শত শত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-হর্ষ-বিষাদের সহিত নিজেকে মিশাইয়া একাত্ম ব্যবহারের মধ্যেও।

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি যোগের সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যেমন বিশিষ্টভাবে সাধিত হইয়াছিল শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও তাহার পরিপূর্ণতা দেখা যায়। ঠাকুর সমাধি হইতে নামিয়া মন্দিরে গিয়া দেবীর পায়ে ফুল দিতেছেন, ভাববিহ্বল কণ্ঠে মায়ের গান করিতেছেন, আবার ঘোর দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ভাড়াগাড়িতে উঠিয়া ভক্তদের সহিত দেখা করিতে কলিকাতায় ছুটিতেছেন, এক বাড়ি হইতে অপর বাড়িতে যাইতেছেন। সকলের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ, ভজনানন্দ করিয়া রাত্রি বারোটা বা আরও দেরিতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতেছেন। কে বলিবে তিনি সর্বদা সমাধিস্থ পুরুষ? তিনি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা, ভক্তোত্তম ও সর্বভূতহিতেরত প্রচণ্ড কর্মযোগী। যোগময়ী শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জীবনচর্যা অনুরূপভাবে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম সমন্বিত। শ্রীরাম-কৃষ্ণের অদ্বৈতজ্ঞান মা পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছিলেন এবং উহা লইয়া সর্বদা কাজকর্ম করিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের পূজার্চনা, জপতপ, প্রার্থনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং যাহার কিছু কিছু নানা সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহার জীবন্ত প্রেমভক্তির একটি সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আদর্শ কর্মযোগীর যেসকল লক্ষণ বর্ণিত, তাহাদের সকলগুলিই শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রে মিলাইয়া লওয়া যায়। নিষ্কাম, অনাসক্ত,

নির্দ্বন্দ্ব-নিত্যসত্ত্বস্থ, সমদর্শী, নিরলস কৃৎস্নকর্মকৃৎ, মহাযোগিনী দেবী সারদা। তিনি কর্মযোগ 'ষোল টাং' পরিপালন করিয়াছেন, তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আমরা যদি উহার 'এক টাং'ও করিতে পারি তাহা হইলে কর্মের বন্ধন আমাদের কাটিয়া যাইবে।

মানবদেহে বাস করিয়া অবতারপুরুষদিগকে কখনও কখনও তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে হয়—সকলের কাছে নয়, যাহারা বুঝিতে পারিবে তাহাদের নিকট। তাঁহারা না ধরা দিলে আমরা কি করিয়া তাঁহাদিগকে আবিষ্কার করিব? বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষতলে বোধি লাভ করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পাদচারণ করিতেছেন। ভাবিতেছেনঃ সর্বদুঃখবিদারক এই জ্ঞান কিভাবে কাহাকে বিলাইব? পদব্রজে চলিতে চলিতে মৃগদাবে তাপসের সাক্ষাৎ পাইলেন। একসময়ে ইহারা সিদ্ধার্থের কঠোর তপশ্চর্যার সঙ্গী ছিল। তাহারা সিদ্ধার্থকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে 'বন্ধু সিদ্ধার্থ' বলিয়া সম্বোধন করিল, লৌকিক আপ্যায়নে। বুদ্ধকে বলিতে হইলঃ আমি আর তোমাদের আগেকার তপঃসঙ্গী সিদ্ধার্থ নই। আমি এখন তথাগত। তাহারা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া স্বতঃই বুঝিতে পারিল, সত্যের আলোক সেই মুখমন্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়াছে—ইনি এখন মানবদেহে অতিমানব বিদেহী সম্বুদ্ধ শাস্তা, লক্ষের একজন নন। শ্রীকৃষ্ণ গীতার নানাস্থলে অর্জুনকে স্পষ্টভাবে খ্যাপন করিয়াছেন—তিনি নরদেহ ধারণ করিলেও সেই লোকাতীত পরমেশ্বর। ভগবান যীশুখৃীষ্টও এইভাবে অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনেও এই ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহার কিছু কিছু অপ্রাকৃত আচরণ হইতে অন্তরঙ্গগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, যিনি দেবকীনন্দন তিনিই শচীমাতার পুত্র।

১৮৮৬ খৃীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি বিকালবেলায় অসুস্থ দেহ সত্ত্বেও ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটির দোতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। কয়েকজন ভক্ত তাঁহার নিকট জড় হইয়াছে। 'ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে গদগদস্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি।"'[১২] স্বয়ং নরেন্দ্রকেও শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলেনঃ 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই এ দেহে রামকৃষ্ণ।'[১৩]

শ্রীমা সারদাদেবীকেও কোন কোন ভক্তের নিকট নিজের লোকাতীত মহিমা বাক্যে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

'ঠাকুর ও আমাকে অভেদভাবে দেখবে, আর যখন যে ভাবে দর্শন পাবে, সেই ভাবেই ধ্যান-স্তুতি করবে।'[১৪]

'অনেক সময় ভাবি যে, আমি তো সেই রাম মুখুজ্যের মেয়ে, আমার সমবয়সী

আরও তো অনেক মেয়ে জয়রামবাটীতে আছে, তাদের সঙ্গে আমার তফাত কি? ভক্তেরা সব কোথা থেকে এসে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করলে শুনি, কেউ হাকিম, কেউ উকিল। এরাই বা এমন আসে কেন?'[১৫]

'তিনি [ঠাকুর] বলতেন, "ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী"।'[১৬]

'সকলেই কি করে চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে, সেখানা এক প্রকান্ড মহামূল্য হীরা।'[১৭] 'তিনি [ঠাকুর] সাক্ষাৎ ভগবান।'. 'আমি আর কে, আমিও ভগবতী।'[১৮]

'দেখ মা, এ শরীর [নিজ শরীর দেখাইয়া] দেবশরীর জেনো।'[১৯] '[ষষ্ঠী, শীতলা] তারা তো আমারই অংশ।'[২০] 'ভগবান না হলে কি মানুষে এত সহ্য করতে পারে?'[২১] 'আমার দয়া যে কার উপর নেই তা বুঝি না—প্রাণীটা পর্যন্ত।'[২২]

'তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করিস নে। এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কারও সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।'[২৩]

তাঁহার এই মহাদেবীত্বের সহিত তাঁহার মানবীত্বের কী আশ্চর্য সমন্বয় তাঁহাতে ঘটিয়াছিল! মানবীরূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত শরণাগতা ভক্ত। নলিনীদিদিকে বলিতেছেনঃ 'আমি কি, মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—আমার "আমিত্ব" যেন না আসে।'[২৪] শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভূমিকায় সর্বদা 'মা' 'মা' করিতেন। জগন্মাতাই সব, তিনি কিছুই নন। জগন্মাতা যন্ত্রী, তিনি যন্ত্র। শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণকে জগন্মাতার সহিত অভিন্ন জানিয়া চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়া থাকিতেন। ভক্তজননীরূপে মায়ের পরিচয়ঃ 'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।'[২৫] 'মা বলে এলে আমি যে থাকতে পারি নে।'[২৬] 'আমরা তো ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে?'[২৭]

অবতারপুরুষে দেবত্ব ও মানবত্বের যে সমন্বয় লক্ষিত হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে তাহা এইভাবে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদাদেবী—উভয়েই মহা-সমন্বয়ের আদর্শ। ইহা সকল ধর্মমতের সমন্বয়, বিভিন্ন যোগসাধনার সমন্বয়, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের সমন্বয়, দেবত্ব ও মানবত্বের সমন্বয়। তাঁহাদের সমন্বিত জীবন সংসার ও সংসারাতীতকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয়ের ভেদ তুলিয়া দিয়াছে, স্বর্গকে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিয়াছে, মানুষকে অজস্র বিক্ষেপের মধ্যে শান্তির সন্ধান দিয়াছে, জাতি-ধর্ম-কুল-খ্যাতির বিভিন্নতা ও সঙ্ঘর্ষকে প্রতিহত করিয়া সকল মানুষকে এক অপার্থিব প্রেমে সম্মিলিত করিয়াছে।

সারদা ঃ তত্ত্বে ও স্বরূপে

'স্বে মহিম্নি'

মানবের অন্তরে যে পরম দেবতার অবস্থান রহিয়াছে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের ধর্ম তাহার অনুভূতিকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই অনুভূতির মাধ্যমে ভারত-মানসে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে যে, জীবের আত্মাই একমাত্র সত্য, এবং অদ্বিতীয়। এই বিরাট বিশ্ব দেশ-কাল-নিমিত্ত-রূপ উপাদান লইয়া আমাদের সম্মুখে প্রসারিত থাকিলেও ইহা সত্য নহে। জ্ঞানলাভ করিয়া আত্মদর্শন হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না। পারমার্থিক দৃষ্টির দিক হইতে এই তত্ত্বই পরমসত্য এবং পরমসত্যের উপলব্ধি হইলেই মানুষের অমৃতত্বলাভ হয়। অমৃতত্বলাভের আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরমা প্রাপ্তি না আসিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎকে স্বীকার করিয়া লইয়া জগৎকারণ ঈশ্বরকেও স্বীকার করিতে হইবে। জগৎকারণ ঈশ্বর তাঁহার মায়ার সাহায্যে এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মায়াকে উপনিষদে দেখা যাইতেছে 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্'¹-রূপে। অদ্বৈতবেদান্ত-মতানুসারে এই মায়াশক্তি এবং মায়োপহিত ঈশ্বর জ্ঞানবাধিত। জ্ঞানের উদয় হইলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মই থাকেন, আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টি হইতে দেখিতে গেলে ঈশ্বর এবং তাঁহার মায়াকে স্বীকার করিতেই হইবে। জগতের সকল কিছুই কার্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সুতরাং, জগতের কারণরূপে ঈশ্বর এবং তাঁহার মায়াকে স্বীকার করিতে হইবে।

উপনিষদের যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়া যখন আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যুগে উপস্থিত হই, তখন দেখি যে, সেখানে একটি নূতন মতবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহাতে বলা হইতেছে যে, ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুদয় হইলে ঈশ্বর মানবদেহ অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।² পরম বৈদান্তিক ভগবান শঙ্করাচার্য এই অবতরণের কথা গীতার শঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ 'স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব লক্ষ্যতে।'³ অর্থাৎ সদা জ্ঞান-ঐশ্বর্য-শক্তি-বল-বীর্য-তেজঃ প্রভৃতিতে যুক্ত, জন্মরহিত, অবিকৃত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ও সৃষ্ট জীবগণের ঈশ্বর হইয়া সেই ভগবান প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক ত্রিগুণাত্মিকা, মূলপ্রকৃতি-রূপা স্বীয় বৈষ্ণবীমায়াকে বশীভূত করিয়া 'যেন' দেহযুক্ত, 'যেন' জন্মগ্রহণ করিয়াছেন —এইভাবে প্রতীত হন। ভগবানের মনুষ্যদেহে অবতরণের কথা প্রথম আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে সুপরিস্ফুটভাবে পাইয়া থাকি। তাহার পরে এই অবতারতত্ত্বই ইতিহাস-পুরাণাদি-মুখে বিস্তৃতভাবে উপন্যস্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মায়িক

জগৎকে স্বীকার করিয়া লইলে ভগবান এবং তাঁহার অবতারের কথা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম তিনটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার ত্রিবেণীসঙ্গম। বৈদিক ও পৌরাণিক এই দুইটি ধারার কথা আমরা আলোচনা করিলাম। ইহা ছাড়াও একটি ধারা রহিয়াছে। সে ধারা তন্ত্র বলিয়া কথিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিবদ্ধ আছে। সেই চিন্তাধারা ইহাই বলিতেছে যে, মায়াশক্তি বলিয়া যাহা বেদে উল্লিখিত, সে শক্তি জ্ঞানবাধিত নহে। সে শক্তি—শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন বলিয়া- ঈশ্বরের সহিত এক এবং অ-পৃথক্। সমস্ত জগৎই শক্তিময়। এই শক্তির দুইটি ভাগ—বীজমধ্যগত দ্বিদলের ন্যায় ইহারা অবস্থিত। একাংশের নাম উন্মনা-শক্তি, অপরাংশের নাম সমনা-শক্তি। এই দুই শক্তি বিচ্ছিন্নরূপে দর্শন করিলে শিব ও শক্তি রূপে প্রতীয়মান হয়। শিব স্বয়ং নিষ্ক্রিয় এবং শক্তি সক্রিয়। এই মতে শক্তিকে বেদান্তমতের ন্যায় 'অনির্বচনীয়', 'ভাবরূপ', 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং 'জ্ঞানবিরোধী' বলা হয় না। এখানে শক্তি 'নিত্যা', তিনি 'সচ্চিদানন্দ-ময়ী'। তিনি 'সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্রী'। মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতী গ্রন্থে এই শক্তির আবির্ভাব-রহস্য বিস্তারিতভাবে কথিত হইয়াছে। সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে, যখনই 'দানবোত্থা-বাধা' উপস্থিত হয়, তখনই তিনি অবতীর্ণা হন।[৪] কিন্তু এ-অবতরণ লৌকিক অবতরণ নয়। এ-অবতরণ দিব্যাবতরণ—অর্থাৎ স্থূল জগৎকে অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম যে-সমস্ত দিব্যভূমি রহিয়াছে, সেই সেই দিব্যলোকে ঘটিয়া থাকে।

পুরাণাদি-মুখে কথিত অবতারতত্ত্ব যেখানে আলোচিত হইয়াছে, সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, অবতারপুরুষের সঙ্গে একটি নারীরও অবতরণ ঘটিয়া থাকে, সে-নারী সেই অবতারের শক্তি এবং তাঁহার লীলার সহচরী। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা এবং ঐতিহাসিক যুগে শ্রীবুদ্ধের সহিত রাহুলমাতা এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব এই তত্ত্বেরই প্রকাশ। এই চিন্তাধারায় তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও পুরাণাদির অবতারতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

স্বয়ং শ্রীভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার সঙ্গে তাঁহারই দ্বিতীয় স্বরূপ হিসাবে তাঁহার অবতারলীলা-সহচরীর আবির্ভাব না ঘটিলে অবতারলীলা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অবতার জন্মগ্রহণ করেন যুগের প্রয়োজনে, যুগধর্ম প্রচারের জন্য এবং 'আপনি আচরি ধর্ম' জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অবতার পুরুষশরীরে আবির্ভূত হওয়ার জন্য একথা বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁহার প্রবোদিত এবং প্রচারিত ধর্ম পুরুষশরীরে কি রূপ ধারণ করিবে। কিন্তু জগতের অর্ধেক মানব-অধিবাসী নারী, সে-নারীর জীবনধারা, শারীরিক এবং মানসিক গঠন পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই, অবতারজীবনে প্রকাশিত যে-ধর্ম, সেটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্যই প্রত্যেক অবতারের সঙ্গে আবির্ভূত হন এমন একটি নারী, যিনি আপন জীবনে অবতার-প্রচারিত ধর্ম সাধিত করিয়া নারীজাতির সম্মুখে একটি আদর্শ রাখিয়া যান।

ইতিহাস এবং পুরাণাদি পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই অবতারলীলাসঙ্গিনী-

গণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহারা সকলেই অবতার-প্রচারিত ধর্মকে তাঁহাদের জীবনে সুপরিস্ফুট করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে অবতারের ধর্ম প্রচারের জন্য কোন প্রচেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা অবতারমহিমার প্রচ্ছায়ে আত্মাবলুপ্তির মাধ্যমে স্বীয় মহিমাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা হইলেও তাঁহাদের জীবন এবং আচরণ অন্যান্য নারীদের পক্ষে আদর্শস্থল ছিল ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

ঊনবিংশ শতকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। সে আবির্ভাবের মধ্য দিয়া ভাগবতী শক্তির যে দিব্য প্রকাশ ঘটিয়াছিল, তাহা জগতে আর কখনও ঘটে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ এই আবির্ভাব সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ 'শ্রীভগবান পরম কারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাব-সমন্বিত, সর্ববিদ্যা-সহায় যুগাবতাররূপে প্রকাশ করিলেন।'[৫] সেইজন্যই স্বামিপাদ তাঁহাকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৬] এইযুগে আবির্ভূত এই মহা অবতারের লীলাসঙ্গিনীরূপে দেবী সারদামণির প্রকাশ।

শ্রীসারদামণির জীবনী আলোচনা করিলে অনেকের মনে এই সংশয় উঠে, আপাত-দৃষ্টিতে যিনি একটি সরলা গ্রাম্যবালা, তাঁহার ভিতর এমন কি আছে যাহার জন্য তাঁহাকে দিব্যশক্তির অধিকারিণী বলা যায়। এই প্রশ্নই জনৈক ভক্ত স্বামী সারদানন্দকে করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেনঃ 'মহারাজ, ঠাকুর যে অবতার তা নাহয় তাঁর দিব্যভাব দেখে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী সেকথা মনে আনতে পারি না কেন?' স্বামী সারদানন্দ বলিলেনঃ 'ঠাকুরকে যদি ভগবান বলে বিশ্বাস করতেই পেরে থাক তবে এ সন্দেহ তোমার আসে কেন?' ভক্তটি বলিলেনঃ 'আমার এ সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছে না।' স্বামী সারদানন্দ বলিলেনঃ 'তাহলে বল ঠাকুরকে অবতার বলে তোমার ঠিক ধারণা হয়নি।' ভক্তটি বিনীতভাবে বলিলেনঃ 'না মহারাজ, ঠাকুরে সে বিশ্বাস আমার আছে।' তখন স্বামী সারদানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেনঃ 'তোমার তাহলে বিশ্বাস ভগবান একটি ঘুঁটেকুড়োনীর মেয়েকে বে করে-ছিলেন?'[৭] স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ 'মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন...রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।'[৮] একটি কবিতায় স্বামীজী লিখিয়াছেনঃ 'দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।'[৯] স্বামী প্রেমানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছেনঃ 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারানী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন! ঐশ্বর্যের লেশ নাই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল ; তাঁর ভাবাবেশ সমাধি এসব আমরা জন্মে দেখেছি—কত দেখেছে! কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কী মহাশক্তি!—জয়মা!! জয়মা!!!

জয় শক্তিময়ী মা!!!' [১০]

পূর্বোল্লিখিত চিন্তাধারার মধ্য দিয়া আমরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দেহ এবং মনের উপাশ্রয়ে যে ভাগবতীলীলা পরিস্ফুরিত হইয়াছিল, তাহার কিছুটা ধারণা করিতে পারি। এই ধারণা আরও সুদৃঢ় হয়, যখন আমরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের উক্তিসমূহ অনুধাবন করি। পূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, তন্ত্রের দৃষ্টিতে সমস্ত জগতের মূলে রহিয়াছে এক পরমা শক্তির লীলাবিলাস। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অবতার যেমন পরমপুরুষের নরদেহে প্রকাশ, তেমনই পুরাণাদি-গ্রন্থমুখে আমরা জানিয়াছি, অবতারলীলার সহচরীরূপে ভাগবতীশক্তিরও নারী-দেহকে অবলম্বন করিয়া অবতরণ ঘটিয়া থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও উহাই ঘটিয়াছিল, এবং অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত যে-মহাশক্তির নারীরূপ-পরিগ্রহ, তাহা জগৎকারণীভূতা মহাশক্তির সামগ্রিক প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পুরাণ এবং তন্ত্রাদি গ্রন্থে এই মহাশক্তির নানা রূপ বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাধানিক রহস্যে কথিত হইয়াছেঃ

সর্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥ [১১]

—অর্থাৎ 'পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী ত্রিগুণময়ী ও সকলের আদ্যা প্রকৃতি। তিনি সগুণা ও নির্গুণা এবং জগৎপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।' এই মহালক্ষ্মী নানা ভাবে, নানা রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। ইনিই কালী, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি মহাবিদ্যা। কিন্তু ষোড়শীবিদ্যায় মহালক্ষ্মীর পূর্ণ প্রকাশ। সেইজন্যই তিনি শ্রীবিদ্যা-রূপে কথিতা। বামকেশ্বরতন্ত্রে কথিত হইয়াছেঃ

ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যা জ্ঞানাদিতঃ প্রিয়ে।
স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা॥ [১২]

—'হে প্রিয়ে, ত্রিপুরা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা পরমা শক্তি। ইনি জ্ঞানের আদি বলিয়া আদ্যা, ইনি স্থূল ও সূক্ষ্ম ত্রিজগতের জনয়িত্রী।' পরশুরামকল্পসূত্রেও বলা হইয়াছে, 'ইয়মেব মহতী বিদ্যা সিংহাসনেশ্বরী সাম্রাজ্ঞী' [১৩]—অর্থাৎ ইনিই শ্রেষ্ঠা বিদ্যা, পরম শিব তাঁহার অধিষ্ঠানভূমি, ইনিই সম্রাজ্ঞী অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ন্ত্রী।—সুতরাং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ষোড়শীবিদ্যাই সমস্ত শক্তির আদিভূতা এবং পরমেশ্বরী।

এইবার আমরা তন্ত্র এবং পুরাণের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জীবনতত্ত্বের আলোচনা করিতে পারি। অধ্যাত্মদৃষ্টির দিক দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাঠাকুরানী সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি সরস্বতী। শ্রীশ্রীমা নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তিনি কালী। [১৪] স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তিনি 'জ্যান্ত দুর্গা' [১৫] এবং

অন্যত্র বলিয়াছেন যে, তিনি 'বগলার অবতার'।[১৬] স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার শ্রীসারদা-স্তোত্রে লিখিয়াছেন, তিনি 'পরমা প্রকৃতি'।[১৭] তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, তাঁহার যথার্থ স্বরূপ কি?

তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিসাধনপদ্ধতির দুইটি কুল নির্দিষ্ট রহিয়াছে। একটিকে বলা হয় কালীকুল, যাহা বঙ্গ প্রভৃতি দেশে অনুসৃত, আর অন্যটিকে বলা হয় শ্রীকুল, যাহা দাক্ষিণাত্যে অনুসৃত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনজীবন আরম্ভ করেন কালীকুলের সাধক হিসাবে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বহু মত ও পথের সাধনা করেন। আনুমানিক ১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের ফলে তিনি শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের[১৮] পুরীসম্প্রদায়ভুক্ত হন। এই পুরীসম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাক্ষী। দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুরমে এই দেবীর মন্দির রহিয়াছে। সেখানে ষোড়শীদেবীর মূর্তি এবং শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত শ্রীযন্ত্র রহিয়াছে। এইভাবে কালীকুলের সাধন হইতে এখন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকুলে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পরেই তাঁহার দীর্ঘ সাধনজীবনের পরিসমাপ্তির কাল উপস্থিত হইল। ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের (মে ১৮৭৩)[১৯] ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রে তিনি শ্রীকুলারাধ্যা দেবতা দেবী-ষোড়শীর পূজানুষ্ঠান করিলেন।[২০] কিন্তু এই পূজা কোন মূর্তিতে বা প্রতীকে হইল না। তিনি একটি মানবীর দেহকে অবলম্বন করিয়া এই পূজা নির্বাহ করিলেন। এই মানবী-দেবী শ্রীশ্রীসারদামণি। পূজা আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিকট তিনি প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেনঃ 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।'[২১] যে দেবী জগতের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীসারদামণির দেহমনে অধিষ্ঠাতা, তাঁহার উদ্বোধন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের হিন্দুধর্মের সমস্ত সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। তিনি নিজের সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা শ্রীশ্রীদেবীর পাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জন দিলেন। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কী মহাশক্তির অধিকারিণী ছিলেন শ্রীসারদামণি দেবী। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, ষোড়শী, ত্রিপুরাসুন্দরী, শ্রীবিদ্যা, রাজরাজেশ্বরী, ললিতাম্বিকা প্রভৃতি একই দেবীর বিভিন্ন নাম।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে এই যে, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমাকে কখনও কালী, কখনও বগলা, কখনও সরস্বতী, কখনও দুর্গা কেন বলা হইয়াছে। ইহা কি সকল মাতৃশক্তি

পরমার্থতঃ এক বলিয়া? না, তাহা নহে। কালী, তারা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবী-গণ পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি। কিন্তু শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীবিদ্যা পরমা শক্তির মুখ্য প্রকাশ বা তাহার প্রকৃত স্বরূপ। দেবীর একটি মন্ত্রের নাম ত্রিকূট মন্ত্র। এই ত্রিকূট মন্ত্রের একটি অংশের নাম বাগ্‌ভবকূট, অপরটি কামরাজকূট এবং অন্যটি শক্তিকূট। এই তিনটি অংশ লইয়াই ত্রিকূট মন্ত্র। আদ্যা শক্তি ত্রিপুরা জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াময়ী। বাগ্‌ভবকূট জ্ঞানকে প্রকাশিত করিতেছে, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। কামরাজকূট ইচ্ছাকে প্রকাশিত করিতেছে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী। শক্তিকূট ক্রিয়াকে প্রকাশিত করিতেছে এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা বা বগলা। ত্রিকূট মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শীর এই সকল দেবীই অংশ বা বিভূতি। সুতরাং শ্রীসারদাদেবী এই ষোড়শীর মানববিগ্রহ বলিয়া বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাঁহাকে কালী, সরস্বতী, বগলা, পরমা প্রকৃতি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা ধারণা করিতে পারি যে, অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই জগতে আদ্যা শক্তির যেরূপ অবতরণ ঘটিয়াছিল—সেরূপ অবতরণ পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সঙ্ঘ সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে ইহাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্থির সিদ্ধান্ত। শ্রীদেবী সারদা, যিনি এই সঙ্ঘের আরাধ্যা দেবীর মানববিগ্রহ, তাঁহারই অদৃশ্য হস্ত এই সঙ্ঘকে লালন-পোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল এবং এখনও নরলীলাবসানের পর করিতেছে, ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

অন্যান্য অবতারের লীলাসঙ্গিনীদের অবতারলীলায় যে-অংশগ্রহণ, তাহা অনেকটা গৌণ, কিন্তু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী রামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রচারে এবং প্রসারে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর মুখ্য এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের জীবনের আদর্শে, সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণে, জনসাধারণকে অধ্যাত্মপথ প্রদর্শনে তিনি তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার বরাভয়কর সমগ্র মানবজাতিকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে এবং নূতন ভবিষ্যতের পথে লইয়া যাইতেছে।

আনন্দলহরী-স্তোত্রের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়া শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাবের পিছনে কোন্ মহাশক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা বুঝাইয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছিঃ

> তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং
> বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।
> বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং
> হরঃ সংক্ষুদ্যৈনং * ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিধিম্ ॥[২২]

—জননি, তোমার চরণপদ্ম হইতে উদ্ভূত ধূলির কণামাত্র কুড়াইয়া লইয়া ব্রহ্মা অ-বিকলভাবে [যথাযথভাবে] এই জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, আর [জগৎ-প্রপঞ্চরূপে পরিণত] এই ধূলিকণাকেই সহস্র শিরের দ্বারা বিষ্ণু [অনন্তরূপে] কোন প্রকারে বহন করেন, আর [প্রলয়-সময়ে] তাহাকেই [অর্থাৎ লোকরূপে পরিণত সেই ধূলি-কণাকেই] চূর্ণ করিয়া শিব [স্বীয় অঙ্গে] বিভূতি-লেপন-ক্রিয়ায় নিরত হন।

শক্তিরূপিণী

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনায় যে পরমতত্ত্ব একমাত্র ধ্যেয়, জ্ঞেয় বা উপেয় রূপে সংস্থাপিত, তার যে নামই দিই না কেন, তার সঙ্গে অবিনাভাবে নিত্য সংযুক্ত হয়ে আছেন শক্তি। যখন তাকে ব্রহ্ম নামে চিহ্নিত করি, তখন শক্তি ধরেন মায়ার রূপ এবং ব্রহ্ম হন সেই মায়ার অধিষ্ঠাতা। যখন তাকে পুরুষরূপে চিনি, তখন ছায়ার মতো তার নিত্য-অনুগামিনী হন প্রকৃতি, যা শক্তিরই নামান্তর। আবার যখন তাকে শিব-রূপে আরাধনা করি, তখন তার সঙ্গে শক্তিও দেখা দেন সদা-সহচারিণীরূপে। সগুণ উপাসনার ক্ষেত্রে এটি আরও প্রকট, যেমন সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, হর-গৌরী। আমাদের উপাস্য সর্বদাই যুগলমূর্তি, একলা নন্। এই শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতা মহাকবি কালিদাস একটি অনুপম উপমায় প্রকাশ করেছেনঃ

> বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
> জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥ [১]

—বাক্ এবং অর্থ যেমন পরস্পর সম্পৃক্ত, একটিকে ছেড়ে আর একটি থাকতে পারে না, তারা পরস্পর মুখাপেক্ষী, ঠিক তেমনই শক্তিরূপিণী পার্বতী শক্তিমান পরমেশ্বরের সঙ্গে নিত্য-সম্বদ্ধ। শুধু তা-ই নয়, এই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বাকের বা শক্তিরই, কারণ তিনিই অভিব্যক্তির মাধ্যম, অমূর্ত ভাবের, বস্তুর বা অর্থের মূর্তিদায়িনী রূপকারিণী। প্রখ্যাত শাব্দিক দার্শনিক প্রাচীন আচার্য ভর্তৃহরি তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের প্রারম্ভে ব্রহ্মকাণ্ডে শব্দতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে তাই অকপটেই এই তত্ত্বটি ঘোষণা করেছেনঃ

> বাগ্রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
> ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিণী॥ [২]

—প্রকাশস্বরূপ শিব কোনদিনই প্রকাশ পেতেন না, যদি সেই চিরন্তনী বাগ্রূপিণী শক্তি তাঁকে অভিব্যক্ত না করতেন। এই প্রত্যবমর্শ বা বিমর্শরূপিণী বাকের দর্পণে যেন প্রকাশ বা আলোর দীপ্তি ঠিকরে ঠিকরে পড়ে। প্রকাশের অভিব্যক্তি তাই সর্বদাই বিমর্শের অধীন। নইলে সবই অপ্রকাশ থেকে যেত, ঘন অন্ধকারে আবৃত হয়ে যেত। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী তাই যথার্থই বলেছেনঃ

> ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
> যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥ [৩]

—যদি শব্দনামক জ্যোতি বা আলো সারা সংসার জুড়ে না জ্বলত, তাহলে তিনভুবনের সবকিছুই অন্ধ তমসায় ডুবে যেত। 'তন্ত্রের বর্ণরসায়নে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা তাই

১। রঘুবংশম্, ১।১

২। বাক্যপদীয়ম্, ব্রহ্মকাণ্ডম্, শ্লোক ১২৪

৩। কাব্যাদর্শ, ১।৪

বলেন যে, শিবের ই-কারটি যদি সরে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি শবে পরিণত হন। এই ই-কারই ইচ্ছারূপিণী বিমর্শময়ী মহাশক্তি—রিক্ত, নিঃস্ব, শ্মশানচারী শিবের যা কিছু ঐশ্বর্য বা বৈভব। ভূতপ্রেতের অধীশ্বর থেকে জগদীশ্বরের পদবী-লাভ সবই ভবানীর পাণিগ্রহণের ফলে। শঙ্করাচার্য তাই তাঁর দেবীস্তুতিতে বড় সুন্দর করে এই তথ্যটি উদ্ঘাটন করেছেনঃ

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারঃ পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্‌॥[৮]

—যাঁর সর্বাঙ্গে বিলিপ্ত শুধু চিতাভস্ম, আহার যাঁর গরল বা বিষ মাত্র, বসনও যাঁর জোটে না, যিনি দিগম্বর, মাথায় যাঁর জটার জঞ্জাল, গলায় যাঁর সাপের মালা, হাতে যাঁর নরকপাল, সেই ভূতপ্রেতের অধীশ্বর কিনা হয়ে গেলেন জগদীশ্বর! ভবানি! এ সবই তোমার পাণিগ্রহণের ফল। অর্থাৎ তোমার সঙ্গে বিবাহের দৌলতেই শিবের জগদীশ্বর পদবী লাভ। শক্তির এই মুখ্যতা বা প্রাধান্যের কথা জেনেই বৈদিক ঋষি অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের যজ্ঞে আবাহন করতে গিয়ে সেই যজনীয় দেবগণকে আগে 'পত্নীবান্‌' বা শক্তিযুক্ত করার জন্য সেই অগ্নির কাছেই আবেদন জানিয়েছেনঃ

তান্‌ যজত্রাঁ ঋতাবৃধোঽগ্নে পত্নীবতস্কৃধি।
মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য়॥[৫]

॥ ২ ॥

এবারও যুগাবতার যখন এলেন, পত্নীবান্‌ বা সশক্তিক হয়েই এলেন কিন্তু সারদা-রূপিণী মহাশক্তির এক আশ্চর্য অভিনবত্ব। প্রথমত, পঞ্চবর্ষীয়া কন্যাকুমারিকারূপে তিনি ঠাকুরের পাণিগ্রহণ করে দেখালেন যে, স্বরূপত তিনি সেই আদি কৌমারী শক্তি, যিনি একদা অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে সেই উদাত্ত ঘোষণা করেছিলেন বৈদিক যুগেঃ

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্‌
মম যোনিরপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥[৬]

—'পিতারও আমি প্রসবিতা'—এ এক পরম আশ্চর্য উদ্ঘোষণ। সত্যই মায়ের তল পাওয়া যায় না। চৈতন্যসমুদ্রের অতলান্ত জলরাশি থেকে তাঁর উদ্ভব। কে তাঁর পরিমাপ করবে? —যদিও তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন বিশ্বভুবনে, ছড়িয়ে আছেন ঐ সুদূর দ্যুলোক পর্যন্ত, ছুঁয়ে আছেন ভুবন থেকে গগন পর্যন্ত।

জননী সারদার শক্তিরূপকে আরও ধরা যায় না, বোঝা যায় না, তার কারণ তাঁর

সমস্ত ঐশ্বর্য নিজের মধ্যে সংহত করে লজ্জাপটাবৃতা হয়ে তিনি আত্মগোপন করেছেন নহবতখানার অপরিসর সংকীর্ণ সীমানায়। কিন্তু শক্তিমান তাঁকে চিনেছেন স্বরূপে, তাই জানিয়ে দিয়েছেনঃ 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।'[৭] তিনি যে এবার নিজেকে আবৃত করে এসেছেন, সেকথাও ঠাকুর জানাতে ভোলেননিঃ 'ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।'[৮] শিষ্যদেরও চিনিয়ে দিয়েছেন, যেমন মহাপুরুষ মহারাজকে একদিন বলেছিলেনঃ 'ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন আর এই নহবতের মা—অভেদ।'[৯] তেমনই হৃদয়কেও তিনি সতর্ক করে দিয়ে একদা বলেছিলেনঃ 'ওরে, হৃদে, একে [অর্থাৎ তাঁকে, ঠাকুরকে] তুই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে [অর্থাৎ শ্রীশ্রীমাকে] আর কখনও এমন কথা বলিসনি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস ; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।'[১০] ঠাকুরের এই উক্তির মধ্যে যে গভীর ইঙ্গিত রয়েছে, সেটি অনুধাবন করলে আমরা শক্তিরূপিণী সারদার যথার্থ পরিচয়ের কিছু আভাস পেতে পারি। 'একে' বা 'এর' ভিতর বলে ঠাকুর নিজেকে বুঝিয়েছেন কারণ তিনি ধরাছোঁয়ার নাগালের মধ্যে 'এই যে', 'ইদমস্তু সন্নিকৃষ্টং', 'ইদমে'র দ্বারা সন্নিকৃষ্ট বা কাছের জিনিসকে 'এই' বলে যেমন নির্দেশ করা হয় তেমনি কাছে রয়েছেন, কিন্তু জননী সারদাকে তিনি 'ওকে' বা 'ওর' ভিতর বলে নির্দেশ করে তিনি যে বুদ্ধির নাগালের বাইরে যেন কোন সুদূরের অগম্য তত্ত্ব, তাই 'অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টং'—'অদস্' শব্দের দ্বারা বিপ্রকৃষ্ট বা দূরের বস্তুকে যেমন জানানো হয় তেমনরূপে বোঝাতে চেয়েছেন। 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না'—এই উক্তির মধ্যেও রয়েছে তারই সমর্থন, কারণ এঁরা সবাই সেই মহাশক্তি থেকেই উদ্ভূত, তাঁরই প্রসূতি এবং সেইজন্য তাঁর কোপ থেকে রক্ষা করতে তাঁরা একান্ত অসমর্থ। ঠাকুরের এই উক্তির সমর্থন আমরা পাই স্বয়ং ব্রহ্মার সেই স্তবে, যেটি শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রারম্ভেই উদ্গীতঃ

> বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
> কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥[১১]

—পরমা আদ্যা শক্তির স্তুতি করার শক্তি কার আছে, তাঁর মহিমা খ্যাপন করার সামর্থ্যই বা কার আছে? কারণ, ব্রহ্মাদি সকলের শরীর গ্রহণ করিয়েছেন তিনিই, তাঁর থেকেই তাঁদের উদ্ভব। সুতরাং সকলের যিনি মূল, সকলের যিনি উদ্ভবস্থল, সেই 'অমূলং মূলমের'—অমূলের অর্থাৎ স্বয়ং মূলহীন সেই মূলের স্বরূপ কে উদ্ঘাটন করবে?

জননী সারদার সম্বন্ধে তাই স্বামী প্রেমানন্দ যথার্থই বলেছেনঃ 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারানী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন! ঐশ্বর্যের লেশ নাই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; তাঁর ভাবাবেশ সমাধি এসব আমরা জন্মে দেখেছি—কত দেখেছে! কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কী মহাশক্তি!—জয় মা!! জয় মা!!! জয় শক্তিময়ী মা!!!'[১২]

শক্তিরূপিণী সারদাকে সেইজন্যই ধরা যায় না, চেনা যায় না, বোঝা যায় না, কারণ আমরা জানি শক্তি মানেই ঐশ্বর্য বা বিভূতি। তাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে, লুপ্ত করে এমন আত্মপ্রকাশ কখনও কোথাও দেখা যায়নি। তবু কখনও কখনও অবগুণ্ঠন সরে গিয়েছে, লজ্জাপটাবৃতার আবরণ উন্মোচন ঘটে গিয়েছে। 'অহমেব স্বয়মিদং বদামি'[১৩] —আমিই নিজে বলছি এই সব। আত্মপরিচয় দিয়ে ফেলেছেন কখনও কখনও। যেমন আত্মীয়াদের জ্বালাতনে যেন উত্ত্যক্ত হয়ে একদিন বলে উঠলেনঃ 'তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করিস নে। এর ভিতরে যিনি আছেন, [তিনি] যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কারও সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।'[১৪] পাগলীমামীকে বলেছেনঃ 'আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই, পুণ্যও নেই।'[১৫] কিংবা 'তুই আমাকে সামান্য লোক মনে করিসনি।...তুই যে আমাকে অত বাপান্ত মা-অন্ত করে গাল দিচ্ছিস, আমি তোর অপরাধ নিই না। ভাবি দুটো শব্দ বই তো নয়। আমি যদি তোর অপরাধ নিই তাহলে কি তোর রক্ষা আছে?'[১৬] পূর্বে উদ্ধৃত শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা শ্রীশ্রীমায়ের এইসব স্বীকৃতিতে সুস্পষ্ট। কোনও ভক্ত প্রশ্ন করেছেনঃ 'মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে?' বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে মা উত্তর দিয়েছেনঃ 'আমি আর কে, আমিও ভগবতী।'[১৭] আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি শিবুদার মুখ থেকে শোনা সেই ঘটনাটিও। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী আসছেন শ্রীমা। সঙ্গে আসছেন শিবুদা—তখন ছেলেমানুষ। জয়রামবাটীর প্রায় কাছে মাঠের মধ্যে এসে শিবুদার হঠাৎ কি মনে হওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়েন। মা কিছুদূর এসে পিছনে কারও পায়ের শব্দ শুনতে না পেয়ে ফিরে দেখেন, শিবুদা দাঁড়িয়ে আছেন। মা বললেনঃ 'ও কিরে, শিবু, এগিয়ে আয়।' শিবুদা বললেনঃ 'একটা কথা বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।' মা বললেনঃ 'কি কথা?' শিবুদাঃ 'তুমি কে, বলতে পার?' মাঃ 'আমি কে? আমি তোর খুড়ী।' শিবুদাঃ 'তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।' এদিকে বেলা শেষ হয়ে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মা বিপন্ন হয়ে বললেনঃ 'দেখ দেখি, আমি আবার কে রে?

আমি মানুষ, তোর খুড়ী।' শিবুদাঃ 'বেশ তো, তুমি যাও না।'—শিবুদাকে নিশ্চল দেখে মা শেষে বললেনঃ 'লোকে বলে কালী।' শিবুদাঃ 'কালী তো? ঠিক?' মাঃ 'হাঁ।' শিবুদা তখন খুশী মনে বললেনঃ 'তবে চল।'[১৮] তাহলে অধিকাংশ মানুষই তাঁকে ভুল করে সাধারণ মানুষ ভাবে কেন? তারও উত্তর দিয়েছেন শক্তিরূপিণীঃ 'সকলেই কি করে চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা।'[১৯] একথা তিনি জানিয়ে গিয়েছিলেনঃ 'আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সব।'[২০] এখন শ্রীশ্রীমায়ের শক্তিরূপের মহিমা কিছু কিছু গোচর হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে।

॥ ৩ ॥

আমরা দেখলাম, ক্বচিৎ কখনও আবরণ উন্মোচন করে তিনি তাঁর স্বরূপের পরিচয় স্বয়ংই উদ্‌ঘাটন করেছেন। আবার পাছে সবাই তাঁকে চিনে ফেলে, জেনে ফেলে, তাই সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংবরণ করে অতি সাধারণ মানবীরূপেই নিজেকে গোচর করেছেন। স্বামী অরূপানন্দ প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'তোমাকে এই দেখছি যেন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো বসে রুটি বেলছ, এসব কি? মায়া, না কি!' শ্রীমা অকপটেই স্বীকার করেছেনঃ 'মায়া বইকি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।'[২১]

মায়ার আবরণে নিজেকে আবৃত করে সেই মহাশক্তি নেমে আসেন এই মাটির পৃথিবীতে বার বার। শ্রীশ্রীমা তাই একদা বলে ফেলেছিলেনঃ 'বার বার আসা—এর কি শেষ নেই? শিব-শক্তি একত্রে; যেখানে শিব, সেখানেই শক্তি—নিস্তার নেই! তবু লোকে বোঝে না।'[২২] লোকে যে বোঝে না তারও কারণ, তাঁরই রচিত মায়ার আবরণ, যার কথা গীতায় ঘোষিত হয়েছে স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখেঃ 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'[২৩]—আমি সকলের কাছে প্রকাশ হই না, কারণ যোগমায়া দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখি।

তাই শ্রীশ্রীমাকে কেউ যখন দেখেছে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো বসে বসে রুটি বেলতে বা রাধুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত হতে, তখন অনুযোগ করে বলেছেঃ 'মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।' সঙ্গে সঙ্গে মা সে অনুযোগ মাথা পেতে নিয়ে রহস্য করে নিজের পরিচয়ও দিয়ে ফেলেছেন তার উত্তরেঃ 'কি করব, মা, নিজেই মায়া।'[২৪]

আমরা দেখেছি, নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য সংহরণ করে শক্তিরূপিণী সারদা প্রকট হয়েছিলেন, এবং সেই কারণেই অত্যন্ত সাধারণ একজন মানবীরূপেই তিনি প্রতিভাত হন আমাদের কাছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, ঐশ্বর্য হল শক্তির বাইরের দিক,

তার বিভূতি বা বিস্তার। শক্তির আসল রূপ, তার কেন্দ্রবিন্দু নিহিত যেখানে, সেটি হল মাধুর্য। সেটিকে তিনি ঢাকতে পারেননি। বরং এখানে মায়ার আবরণ যেন তাঁর এই মাধুর্যের মহিমা প্রকাশ করার সবচেয়ে সহায়ক হয়েছে। নিখিল সৃষ্টির সঙ্গে যেন শক্তিরূপিণী এই সারদা বাঁধা পড়েছেন মায়ামমতার অচ্ছেদ্য পাশে। তাঁর সেই ব্যাপ্ত স্নেহপাশে ধরা দিতে হয়েছে দুর্বৃত্ত তস্কর আমজাদকে, পোষা চন্দনা পাখীকে, গোয়ালে বাঁধা গোবৎসকে। চন্দনা পাখী তাঁর পড়ানো বুলিতে যখন ডেকে উঠত, 'মা, ওমা'—অমনি মা পাখীটিকে ছোলা-জল দিতে যেতেন আর বলতেনঃ 'যাই, বাবা, যাই।'[২৫] তেমনই গোবৎসের হাম্বারব শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন, ব্যস্ত হয়ে বলতেনঃ 'যাই, মা, যাই, আমি এক্ষুণি তোকে ছেড়ে দেবো, এক্ষুণি ছেড়ে দেবো।'[২৬]

॥ ৪ ॥

শক্তিরূপিণী সারদার তাই সবচেয়ে বড় পরিচয় এই মাধুর্যময়ী, মমতাময়ী মাতৃরূপের মধ্যে নিহিত, যা তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ 'আমি মা, জগতের মা, সকলের মা।'[২৭] 'ব্রহ্মান্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।'[২৮] অনেকে তাঁর এই অহৈতুকী মমতা, নির্বিচার স্নেহের সুযোগ নিত। সবাইকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া অনেকেরই পছন্দ হত না, কিন্তু তবু তিনি নিরুপায়। বলেছিলেন একদা গোলাপকেঃ 'কি করব, গোলাপ? মা বলে এলে আমি যে থাকতে পারি নে।'[২৯] যোগীন-মাকে বলেছেনঃ 'তা বাপু, যাই বল, কেউ মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।'[৩০] অহর্নিশ উচ্চারিত হত এই প্রার্থনাঃ 'সব ভাল থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক।'[৩১]

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অন্তর্ধান করলেন, তখন এই মমতাময়ীর অসীম স্নেহপাশেই তাঁর মানসসন্তানেরা একত্রে বাঁধা রইলেন, সুরক্ষিত হলেন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 'সব ভাল থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক' এই পরম কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগের প্রেরণা লাভ করলেন। আমরা ভুলে যাই যে, শক্তিস্বরূপিণী সারদার জগৎকল্যাণস্পৃহারই সৃষ্টি আজকের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। তিনিই প্রসূতি, তিনিই জননী যাঁর শক্তিতে ঠাকুরের দিব্যবাণী জীবসেবার বাস্তবরূপ ধারণ করেছে এবং আজ বিশাল বনস্পতির আকারে শাখাপ্রশাখা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে, যার স্নিগ্ধ ছায়ায় দেহমনের সন্তাপে তাপিত অসংখ্য জীব এসে আশ্রয়লাভ করে ধন্য হচ্ছে।

শক্তিরূপিণী এই সারদা যেমন সংগঠনের মূলে ঠাকুরের ভাবধারার বিধাত্রী ও

রূপদাত্রী, তেমনই ঠাকুরের লীলাসঙ্গিনীরূপে পরমা গায়ত্রী, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। শক্তির দুটি রূপঃ বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। আমরা গায়ত্রীমন্ত্রে আবাহন করি, ধ্যান করি বিদ্যারূপিণী মহামায়ার বরেণ্য ভর্গকে, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যথাযথভাবে প্রেরণা দিলে তবেই আমরা পৌঁছাতে পারি সেই পরম লক্ষ্যে। আবার অবিদ্যারূপিণী মায়ার বা শক্তিরও ভর্গ বা তেজ কিছু কম নয়, যা সর্বকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে নষ্টভ্রষ্ট করে দিতে পারে, তাই সেটি অবরেণ্য! তাকে যারা বরণ করে মূঢ়ের মতো, তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, 'ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি।'[৩২] তারা সেই পদ লাভ করতে পারে না। সংসারেই ঘুরে মরে।

কিন্তু বরণ করার স্বাধীনতাও বস্তুত কোনও মানুষের নেই। আমরা সবাই সেই শক্তির অধীন। ইচ্ছাময়ী তারার উপরই তাই ভক্ত বা সাধক নির্ভর করে থাকেন, কারণ তিনি জানেনঃ 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।'[৩৩] —তিনি প্রসন্না, বরদা হলেই মানুষের মুক্তির কারণ হন। আবারঃ 'সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।'[৩৪] —সংসারবন্ধনের কারণও তিনিই, সেই সকল ঈশ্বরের যিনি ঈশ্বরী, কিনা নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী। তিনিই জীবকে 'মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিত' করে থাকেন, তাই একমাত্র তিনি ইচ্ছা করলেই সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারেন।

যুগাবতারের পাশে এবার যখন তিনি দাঁড়ালেন তখন বিদ্যামায়ার ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে তাঁর লীলাসঙ্গিনী হলেন। এখানেই শক্তিরূপিণী সারদার আবির্ভাবের অতুলনীয় একক বৈশিষ্ট্য। এতদিন সবাই দেখেছে ও জেনেছে যে, স্ত্রীরূপে তিনি আসেন মানুষকে সংসারে বাঁধতে। শক্তির এই অবিদ্যারূপের সঙ্গেই পরিচয় ছিল এতদিন সকলের। তাই যাঁরাই অধ্যাত্মপথের পথিক হতে চেয়েছেন, তাঁরা সভয়ে দূর থেকে সযত্নে পরিহার করে এসেছেন শক্তির সঙ্গে সর্বকিছু সম্পর্ক। কিন্তু শক্তির সঙ্গে এই দিব্য সম্পর্ক স্থাপন যে সম্ভব, তা দেখাবার জন্যই যেন শক্তিরূপিণী সারদার বিস্ময়কর আবির্ভাব। যা ছিল দেবলোকে কল্পনার বস্তু, ধ্যানের বিষয়—যেমন যুগল ইষ্টের উপাসনায়, তাই রক্তমাংসের দেহে মানবীমূর্তিতে আবির্ভূত হল।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ '(took) the kingdom of heaven by violence',[৩৫] সহসা সবেগে একেবারে সরাসরি যেন স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন। বিদ্যারূপিণী এই শক্তির সহায়তাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ তা করেছিলেন। একের পর এক সাধনার স্তর অবলীলাক্রমে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন এবং সেখানে নিজের সহজ অধিকার স্থাপন করেছেন। এই উত্তরণে এবং অধ্যাত্মসাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় রাজচক্রবর্তীর সিংহাসনে সমারোহণে তাঁর অনন্য সহায় শক্তিরূপিণী সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে, শক্তিরূপিণী সারদা যদি তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে অবিদ্যাশক্তির রূপ ধারণ করেন, তাহলে তাঁর সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সারদা সদা-প্রসন্না বরদা হয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তিনি তাঁর সাধনার সহায় হতেই সহধর্মিণী-

রূপে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সাধনা থেকে তাঁকে ভ্রষ্ট করে টেনে নীচে নামাবার জন্য নয়। শক্তিরূপিণী সারদার এই মহিমা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে জগতের সমক্ষেও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে ষোড়শীরূপে পূজা করেছিলেন এবং জপের মালা, সাধনার সমগ্র ফল, এমনকি নিজেকেও পর্যন্ত তাঁর চরণে সমর্পণ করেছিলেন।

একজন সারদাকে প্রশ্ন করেছিলঃ 'মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন?' কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে গম্ভীরভাবে মা বললেনঃ 'সন্তানের মতো দেখি।'[৩৬] ঠাকুরের সেবা-পরিচর্যার মধ্যেও ফুটে উঠেছে তাঁর বাৎসল্য রস, কারণ তিনি সেই আদি কৌমারীশক্তি, যাঁর আত্মবিঘোষণ আমরা আগে শুনেছি দেবীসূক্তেঃ 'অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্'—বিশ্বপিতারও আমি প্রসবিতা। মায়ের নিজের মুখেও আমরা শুনতে পাই এই বিঘোষণঃ আমিই সেই চিরপুরাতন আদ্যা শক্তি জগন্মাতা, জগৎকে কৃপা করতে আবির্ভূত হয়েছি; যুগে যুগে এসেছি, আবার আসব।[৩৭]

শক্তিরূপিণী সারদা তাই মাধুর্যের প্রতিমা, দয়া, করুণা, মমতার মূর্তবিগ্রহ। বলেছেন নিজেইঃ 'আমার দয়া যার উপর নেই সে নেহাত হতভাগ্য। আমার দয়া যে কার উপর নেই তা বুঝি না—প্রাণীটা পর্যন্ত।'[৩৮] 'বলরামবাবু বলতেন, "ক্ষমারূপা তপস্বিনী"।...আমি কখনও কখনও দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই, ভুলে যাই যে আমি কে।'[৩৯] দয়া বা করুণার কোমল আবরণে নিজেকে আবৃত করে আশ্রিত সকল সন্তানের কল্যাণসাধনে সদা-ব্যাপৃতা এই শক্তিরূপিণী সারদা কিন্তু প্রয়োজনবোধে তাঁর 'জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্'[৪০] (সমস্ত অসুর নির্মূলকারিণী অসহনীয় দীপ্তিময়ী করাল ভয়ঙ্কর) মূর্তি ধারণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। যেমন, হরিশের পাগলামির প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 'তখন নিজ মূর্তি এসে পড়ল। আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল।'[৪১]

'নিজ মূর্তি' বলে এখানে শক্তিরূপিণী সারদা ইঙ্গিত করেছেন তাঁর সেই 'অগ্নি-বর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং' (অগ্নিরূপিণী তপস্যায় দীপ্যমানা) মূল রূপের, যাকে আবৃত করে তিনি এবার প্রকট হয়েছিলেন 'সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী'[৪২] রূপে। শক্তি তাই এখানে ঘোরা ভয়ঙ্করী নন, তিনি অভয়া বরদায়িনী। আশ্বাস দিয়ে বলেছেনঃ 'আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?'[৪৩] সেইটিই আমাদের পরম ভরসা, চরম সান্ত্বনা। তাঁর বাৎসল্য থেকে কেউ যে বঞ্চিত নয়, সে ঘোষণাও তিনি

করে গিয়েছেনঃ 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।'[৬৪] শক্তিরূপিণী সারদার উদার কোলে তাই সকলেরই ঠাঁই আছে, কাউকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি, সন্তান বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি।

সবাইকে নিবিড় মমতায় এমনি করে আপন কোলে ঠাঁই দিলেও শক্তিরূপিণী সারদা কিন্তু কোথাও আসক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়েননি। তাঁর একান্ত সেবক ও ঘনিষ্ঠ সেবায় নিবেদিতপ্রাণ প্রিয় সন্তান স্বামী সারদানন্দ তাই যথার্থই বলেছেনঃ 'মার মহিমা, মার শক্তি কত—আমাদের কি সাধ্য বুঝি! এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি।'[৬৫] যুগপৎ আসক্তি ও বিরক্তি বা বৈরাগ্যের এই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই বোঝা যায় যে, কোন কিছুর গণ্ডি বা সীমায় এই শক্তিরূপিণী সারদাকে আবদ্ধ করা যায় না। সর্বকিছু অতিক্রম করে স্বমহিমায় তিনি বিরাজিত, যদিও আমাদের কাছে মমতাময়ী জননীরূপে তিনি প্রকাশিত।

এত সাধারণ নিরাভরণ রূপে সব ঐশ্বর্যকে অন্তরালে রেখে শক্তিরূপিণী সারদার প্রকাশ তাই এযুগের এক পরম বিস্ময়। ঠাকুরের লীলাসঙ্গিনীরূপে, তাঁর সন্তানদের সঙ্ঘজননীরূপে, সমস্ত আর্ত, পীড়িত, শরণাগতের আশ্রয়দায়িনীরূপে কোথাও তিনি নিজেকে সামনে তুলে ধরেননি, সব সময়ই পিছনে থেকেছেন আধারভূতা হয়ে, সর্বংসহা পৃথিবীর মতো নিঃশব্দে নীরবে সকলকে বুকে ধরেছেন, আপন কোলে আশ্রয় দিয়েছেন। ঠাকুর তাঁকে না চিনিয়ে দিলে আমরাও তাঁকে চিনতে পারতাম না পরমা শক্তিরূপে। শ্রীশ্রীমা পরীক্ষাচ্ছলে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'আমি তোমার কে?' ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেনঃ 'তুমি আমার মা আনন্দময়ী।'[৬৬] অন্যত্র তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেনঃ '[ও] জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!'[৬৭]

শক্তিরূপে তাঁকে যাতে চিনতে পারি, তাঁকে আশ্রয় করতে পারি, তাই জ্ঞানদায়িনী, আনন্দময়ী শক্তিরূপিণী এই সারদার চরণে আমাদের বারংবার বিনম্র প্রণতিঃ

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥[৬৮]

– যে দেবী সমস্ত ভূতের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজিতা, তাঁকেই নমস্কার, তাঁকেই নমস্কার, তাঁকেই নমস্কার বার বার।

সীতারূপিণী

সীতা ও ভারতবর্ষ এবং সারদা

বহু শতাব্দী আগে ভারতের আদিকবির লেখনী একটি অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করেছিল। এক তিলোত্তমা নারী-চরিত্র। সে চরিত্রের নাম সীতা। মহাকবি বাল্মীকি সত্যিই তিল তিল করে নির্মাণ করেছিলেন তাঁর এই অপাপবিদ্ধা মানসকন্যাকে। সীতা ভারতবর্ষের গণমানসে আজও এক অনন্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিতা। কত যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে ; কত সামাজিক সংকট, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘর্ষ ভারতবর্ষের জীবনে এসে উপস্থিত হয়েছে ; কত বিজাতীয় চিন্তাধারা ও বিপরীতমুখী ভাবাদর্শের উত্তাল তরঙ্গ ভারতের কূলে এসে আছড়ে পড়েছে। কিন্তু সীতা তাঁর পূর্ণ মহিমা নিয়ে আজও অম্লান। আজও ঐ দু-অক্ষরের নামটি ভারত-বাসীর বুকের মধ্যে একইভাবে ধ্বনি তোলে ; ঐ নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ-কোটি হিন্দুর হৃদয়তন্ত্রী এখনও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ 'সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা।...সীতা চরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতে অনুস্যূত হইয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে—সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোন পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত চরিত্রের আদর্শ তেমন হয় নাই। ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্য, "সীতা" নামটি তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে-ভাবকে নারীজনো-চিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, "সীতা" বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে।'[১]

সীতা ভারতবর্ষের প্রাণের কোন্ গভীরে প্রবেশ করেছেন ভারতবাসীকে তা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান কালে ভারতসত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামীজীর আগে এবং পরেও আর কোন আধুনিক চিন্তানায়ক জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে ভারতীয় নারীর জীবনে সীতার অপরিসীম গুরুত্বের কথা এত জোর দিয়ে বলেছেন কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পরে মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় স্বামীজী গভীর আবেগময় ভাষায় ভারতবর্ষের জীবন ও চেতনায় সীতার অবিনাশী প্রভাবের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। বলেছেনঃ 'ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ ; নারী-চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্র হইতেই উদ্ভূত ; আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ

পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমনকি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শস্বরূপা মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।...আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমনকি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতি অমার্জিত গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান।'[২] ভগিনী নিবেদিতাও অপূর্ব দক্ষতায় ভারতবাসীর অন্তরে সীতার এই কালজয়ী প্রতিষ্ঠার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ 'খ্রীষ্টান জগতের নারীদের কাছে জননী মেরী যে স্থান অধিকার করে আছেন হিন্দুনারীদের কাছে সেই স্থান অধিকার করে আছেন অযোধ্যার রানী সীতা। বাস্তবিক সীতার যে জগৎ তা জাগতিক রাজকীয় সমস্ত আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে। কারণ তিনি নারীত্বের মূর্তিমতী আদর্শ—প্রেম ও বেদনার এবং অকলঙ্ক নারীত্বের মহিমা ও গৌরবের সাম্রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে তাঁর অবিসংবাদী প্রভাব।...মানবজীবনের সর্বোচ্চ সুখের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, কিন্তু সুখের মোহ তাঁর দৃষ্টিকে অন্ধ করতে পারেনি কখনও। জীবনে গভীরতম এবং তিক্ততম দুঃখের অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর জীবন ছিল শান্ত এবং অবিচলিত। প্রেমে মণ্ডিতা, দুঃখে অবগুণ্ঠিতা, নারীকুলে তুলনারহিতা—এই হলেন সীতা, অযোধ্যার রানী!'[৩]—একালের এক পাশ্চাত্য মহীয়সীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের চিরন্তনী নারীশ্রেষ্ঠা। যেন এক নিপুণ চিত্রশিল্পীর তুলির কয়েকটি আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে ওঠা একটি অপরূপ চিত্র। এই মনোহর প্রকাশশৈলী (অনুবাদে যদিও সামান্যই উপস্থাপিত) অবশ্যই নিবেদিতার নিজস্ব—তাঁর সহজাত, কিন্তু ঐ অনবদ্য দৃষ্টি তাঁর মহান্ উত্তরাধিকার—তাঁর স্রষ্টা, তাঁর আচার্যদেব স্বামী বিবেকানন্দের দান। নিবেদিতা বলতেনঃ 'সীতা ভারতবর্ষের চিরকালের রানী।' একদিন তিনি তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'আচ্ছা, বল তো তোমাদের রানী কে?' ছাত্রীরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠেছিলঃ 'ভিক্টোরিয়া! ভিক্টোরিয়া!' মুহূর্তে নিবেদিতার শুভ্র মুখ লজ্জা ও অসন্তোষে আরক্ত হয়ে উঠল। বিদেশিনী ভারতকন্যা তৎক্ষণাৎ তাঁর ছাত্রীদের ভর্ৎসনা করে বললেনঃ 'সে কি! তোমাদের রানীর নাম তোমরা জান না! ভিক্টোরিয়া কেন তোমাদের রানী হবেন?' তারপর আবেগময় কণ্ঠে বললেনঃ 'তোমাদের রানী সীতা! সীতা ভারতবর্ষের চিরকালের রানী!'[৪]

বাস্তবিক, সীতা যেন ভারতবর্ষের নারীর শাশ্বত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিগ্রহ।

'ভারতবর্ষের নারীর চিরন্তন আদর্শ—সীতা; ভারতীয় নারীর চিরন্তন অভীপ্সা 'সীতা হওয়া'। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কিনা, সীতার উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, সীতা নিছক বাল্মীকির কল্পনা কিনা—এসব প্রশ্ন ভারতের অগণিত হিন্দু নরনারীর মস্তিষ্ককে কখনও পীড়িত করেনি, আজও করে না, ভবিষ্যতেও করবে না। তাদের কাছে সীতার চরিত্র শুধু বাস্তবই নয়, বাস্তবের চেয়েও অধিকতর বাস্তব। সীতা তাদের কাছে স্বয়ং বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ 'একথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, রামায়ণ-কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনও অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণ-কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ-বনিতা আপামর-সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে; কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।...রামায়ণে ভারত-বর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।...ইহার সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।'[৫]

বাল্মীকি, কম্বন, কৃত্তিবাস, ভবভূতি, তুলসীদাস প্রমুখ অসংখ্য ভারতীয় কবির রচনায় এবং বিভিন্ন পুরাণ-গ্রন্থে সীতার যে চিত্র অংকিত হয়েছে এবং ভারতবর্ষের নরনারী যুগ যুগ ধরে সীতার যে রূপকল্প অন্তরে লালন করে এসেছে তা হলঃ সীতা তিতিক্ষার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি; সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণু; আত্মত্যাগ ও নম্রতার সাকার বিগ্রহ; পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক; পতিপ্রাণতার দেহধারী পরাকাষ্ঠা।

সীতা যেন ভারতবাসীর কাছে সনাতন ভারতবর্ষের প্রতীকস্বরূপা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী। সেই কল্যাণী স্রোতস্বতীর অমৃতধারায় অবগাহন করে ভারতবর্ষের নারী জীবনের জটিল যাত্রাপথকে অতিক্রম করার প্রেরণা পেয়েছে। অজস্র কুটিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে জীবনের পরিপূর্ণতায় উত্তরণ করতে সঞ্জীবিত হয়েছে। তাই ভারতবর্ষের নারীর দৃষ্টিতে পরিপূর্ণতার আর এক নাম 'সীতা'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ 'পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব-সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।'[৬] একদিকে রাম অপরদিকে সীতা —ভারতীয় পুরুষ ও নারীর শাশ্বত আকাঙ্ক্ষার বাঙ্খিত রূপ। তাঁদের উপাখ্যান যেন 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস'।[৭] রবীন্দ্র-নাথ তাই বলেছেনঃ 'বাল্মীকির রামচরিত-কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোন ঐতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল, এবং আজ পর্যন্ত তাহা

অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। একথা বলে নাই যে, বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে; একথা বলে নাই যে, এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তাহার [পক্ষে] যত সত্য।'[৮]

ভারতবর্ষে রামায়ণ আর চিরন্তন যেন সমার্থক। মহাকালের নির্মম ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে রামায়ণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান'।[৯] বাল্মীকিকে ব্রহ্মা বলেছিলেনঃ

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥[১০]

—যতকাল পৃথিবীতে গিরি নদী সকল অবস্থান করবে ততকাল রামায়ণকথা লোক-সমাজে প্রচারিত থাকবে। প্রজাপতির আশীর্বাদ যে অমোঘ তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু রামায়ণের এই মহিমা তো প্রকারান্তরে সীতারই মহিমা। কারণ ভারতবর্ষে রামায়ণের শাশ্বত আবেদনের প্রধান হেতু সীতা। রাম এবং লক্ষ্মণ ভারত-বর্ষের প্রাণের জিনিস হলেও রাম অথবা লক্ষ্মণ নয়, সীতাই যেন রামায়ণের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। নিবেদিতা যথার্থই লিখেছেনঃ 'শত শত বছর ধরে হিন্দুনারীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করার ক্ষেত্রে রামায়ণ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবরূপে সক্রিয়। মহা-ভারতকে ভারতবর্ষের জাতীয় বীরগাথারূপে পরিগণিত করা যেতে পারে, কিন্তু রামায়ণ হল ভারতবর্ষের নারীত্বের মহাকাব্য। সীতাই ভারতবর্ষের মানসচেতনায় রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র।'[১১]

বর্তমান ভারতবর্ষে সমাজের যে চিত্র তাতে শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন সকলেই উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। পাশ্চাত্যের উগ্র আধুনিকতার অশুভ প্রভাব ভারতবর্ষের শান্ত জীবনচর্যায় আজ ছায়া বিস্তার করছে। ক্রমে ঐ আগ্রাসী স্রোত ভারতবর্ষের অন্তঃপুরের দ্বারে নয়, একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। এর সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই। ক্রান্তদর্শী স্বামীজীর দৃষ্টিতে তা এড়ায়নি। ভারতবর্ষকে সে-সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে স্বামীজী উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর স্বদেশমন্ত্রঃ 'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।'[১২] ভারতীয় নারীর আদর্শরূপে স্বামীজী সীতার সঙ্গে এখানে সাবিত্রী ও দময়ন্তীর নাম সংযোজন করেছেন। কারণ তাঁরা সীতারই ছায়া অথবা প্রতিরূপ। আধুনিকতার মোহে ঐ আদর্শকে প্রত্নযুগীয় বলে চিহ্নিত করলে ভারতবর্ষের এতকালের ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হবে। ঐ আদর্শকে বর্জন করার আগে ভারতীয় নারীদের, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর' সীতাকে 'কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে'।[১৩] ভারতবাসীর জীবনে সীতা অপরিহার্য। সীতার আদর্শকে বাদ দিয়ে ভারতের নারী-প্রগতির যে-কোন পরি-কল্পনা বা প্রয়াস চূড়ান্ত অবিমৃষ্যকারিতা। ভারতবর্ষে চিরকাল নারীই সংস্কৃতির

পিলসুজটিকে নেপথ্যে ধারণ করে রেখেছে। সেই ভারতবর্ষের নারী যদি তার চিরায়ত আদর্শের দিক দিয়ে বর্ণসংকর হয়ে যায় তাহলে তা হবে সমগ্র জাতির চরম অবক্ষয়। সীতার আদর্শ ভারতীয় নারীর চিরায়ত আদর্শ। তাকে অস্বীকার করার অর্থ ভারতীয় সংস্কৃতির অবলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করা। ভারত-ইতিহাসের বিদগ্ধ ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে ঐ হঠকারিতার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেনঃ 'আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতা-চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।'[১৪]

ধনীর প্রাসাদ থেকে কৃষকের কুটির পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রত্যেক গৃহেই গৃহিণী যেমন গৃহের কেন্দ্র, গৃহের প্রাণ—সীতাও তেমনই এই বিশালায়তন ভারত-ভবনের কেন্দ্র, তার প্রাণ, তার ভিত্তি, তার শক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য-প্রভাবিত আধুনিক ভারতবর্ষে ঐ প্রাণশক্তির পুনর্জাগরণের জন্যই সারদা-দেবী নব-কলেবরে যুগাবতারের সহযাত্রিণী হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের পরিচিতি প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন সেই বহুশ্রুত বাক্যটিঃ 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।'[১৫] একবার নয় বহুবার।[১৬] আবার সারদাদেবীর স্বরূপ বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেনঃ 'ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!'[১৭] একবার জনৈক ভক্ত সারদাদেবীকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'মা, সব অবতারেই কি আপনি এসেছেন?' স্নিগ্ধ সহজ কণ্ঠে তিনি উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'হ্যাঁ বাবা।'[১৮] এই কয়টি সুস্পষ্ট ঘোষণার যোগফলঃ অগ্নির সঙ্গে তার দাহিকাশক্তির মতো যিনি রামচন্দ্র-অবতারে সীতারূপে এবং কৃষ্ণ-অবতারে রাধারূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন সেই তিনিই বর্তমান যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনীরূপে শরীর পরিগ্রহ করেছিলেন। অর্থাৎ যে সীতা, যে রাধা, সেই এবারে সারদা।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে সারদাদেবীর সীতারূপ

সারদাদেবীর সীতারূপের প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। তাঁর ঐ স্বীকৃতির ভঙ্গিটিও অনবদ্য। সাধনার প্রথম অবস্থায় পঞ্চবটীতে তিনি যখন সীতার দর্শন পান তখন সীতার হাতে 'ডায়মনকাটা সোনার বালা' দেখেছিলেন। তাই তিনি সহধর্মিণীকে অনুরূপ অলঙ্কার উপহার দিয়েছিলেন। শ্রীমা বলেছেনঃ 'পঞ্চবটীতে [ঠাকুর] সীতাকে দেখেছিলেন—হাতে ডায়মনকাটা বালা। সীতার সেই বালা দৃষ্টে আমাকে [ঐরকম] সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন।'[১৯] শ্রীমার এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি এক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত ইঙ্গিতময় সূত্র এবং এর একতম তাৎপর্য হলঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীমার সীতারূপের অপূর্ব অঙ্গীকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সীতার দর্শনকালে যেমনি তিনি মাতৃ-সম্বোধন করে তাঁর চরণে প্রণত হতে উদ্যত হয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ ঐ মূর্তি তাঁর নিজের শরীরের মধ্যে এসে 'প্রবিষ্ট' হন। ঘটনার এই আকস্মিকতায় শ্রীরামকৃষ্ণ যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ভাবের গভীরে ডুবে যান।[২০] বাস্তবিক, রামকৃষ্ণরূপী হলেও তিনি তো রামচন্দ্রই। শুধু 'লীলান্তরে রূপান্তর আপনার কাজে'। যদিও 'রূপান্তর মাত্র কিন্তু গুণান্তর নয়'।[২১] কাজেই রামচন্দ্রের মাতৃ-সম্বোধন ও প্রণিপাত সীতা কেমন করে গ্রহণ করবেন! দর্শনলব্ধ সীতার আচরণে শ্রীরামকৃষ্ণের নিশ্চয়ই 'দপ্' করে জেগে উঠেছিল জন্মান্তরের স্মৃতি। স্মরণ-পথে সহসা উদিত হয়েছিল জানকীর সঙ্গে তাঁর জন্মান্তরের সম্পর্কের কথা। সম্ভবত এই গূঢ় কারণেই এই বিশেষ দর্শন ও অনুভবের কথা তাঁর মনে 'গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্বক্ষণ জাগরূক ছিল'।[২২] এবং শ্রীমাকে দেওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ বিশেষ উপহারটি তারই ফলশ্রুতি। শ্রীমাকে অলঙ্কার গড়িয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে সকৌতুকে বলেছিলেনঃ 'ওরে আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ।'[২৩] ঐ 'ডায়মনকাটা' সোনার বালাজোড়া যেন অবতারবরিষ্ঠ ও তাঁর লীলাসঙ্গিনীর কাছে ছিল তাঁদের ত্রেতা-যুগের সম্পর্কের স্মারকচিহ্ন। কৌতুকের অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝি সেই ইঙ্গিতই করতে চেয়েছিলেন। •

শ্রুতিপ্রমাণের পর এবার ন্যায়প্রমাণ। শ্রীরামকৃষ্ণের পর স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞান। পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পর শ্রীমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষ) স্বামীজী শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলেছিলেনঃ 'মা, আপনার আশীর্বাদে এযুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি।'[২৫] স্বামীজীর এই উক্তির মধ্যে স্পষ্টত শ্রীমার প্রতি তাঁর সীতা-দৃষ্টি এবং নিজের প্রতি দাস্যভক্তির বিগ্রহ মহাবীর-দৃষ্টি সুপরিস্ফুট। স্বামীজী কি শ্রীমার কাছে কৌতুকচ্ছলে এই উক্তিটি করেছিলেন? বলাবাহুল্য, সে সংশয় অবান্তর। শ্রীমাকে স্বামীজী (এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সন্ন্যাসী-সন্তান) যে মহান্ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন তাতে তাঁর পক্ষে শ্রীমায়ের কাছে সামান্যতম চপলতা প্রকাশও অভাবনীয়। পরবর্তীকালে শ্রীমা স্বামীজীর এই উক্তিটি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ 'নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।'[২৫] অর্থাৎ শ্রীমাও স্বামীজীর এই বিশেষ উক্তিটিকে লঘুভাবে গ্রহণ করেননি। স্বামীজীর শ্রীমার প্রতি সীতা-দৃষ্টি এবং নিজের প্রতি মহাবীর-দৃষ্টি যে তাৎক্ষণিক কোন ভাবনাপ্রসূত ছিল না তার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে লেখা বিখ্যাত চিঠিটি। সেখানে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ 'তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ করে পগার পার, এই বুঝ।'[২৬] স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, বন্ধুহীন সেই অজানা দেশে—যেখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন—শ্রীমার আশীর্বাদই তাঁকে বর্মের মতো রক্ষা করেছিল। সহস্র সংকট ও অজস্র প্রতিকূলতার অগ্নিদাহ তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। শ্রীমার সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত সাক্ষাতের সময় স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'সেখানে [আমেরিকায়] আমি যে বিরাট সম্মান ও সাফল্য লাভ করেছি, তা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, শুধুমাত্র মার আশীর্বাদের শক্তিতেই সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।'[২৭] স্বামীজী তাই সগর্বে বলতেনঃ 'মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়।'[২৮] এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে লঙ্কায় শ্রীরামের বার্তাবহ মহাবীরের কথা। ক্রুদ্ধ রাবণের নির্দেশে অসংখ্য রাক্ষস-কর্তৃক মহাবীরের অগ্নিসহযোগে দৈহিক নির্যাতনের সংবাদে ব্যাকুলা সীতা তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা-আশীর্বাদ উচ্চারণ করেছিলেনঃ দুরন্ত অগ্নির স্পর্শ যেন মহাবীরের অঙ্গে শীতল ও সুখস্পর্শ হয়ে প্রতিভাত হয়।[২৯] কার্যত তা হলে মহাবীর উপলব্ধি করলেন, সীতার কৃপাতেই এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়েছে। দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি তখন প্রাসাদ-প্রাকার-তোরণ সমেত সমগ্র লঙ্কানগরীকে দগ্ধ করে মূর্তিমান অগ্নিদেবতার মতো বিরাজ করতে লাগলেন এবং রাম-কিঙ্করের যোগ্য পরাক্রম দেখিয়ে সীতার চরণপ্রান্তে এসে

প্রণত হলেন।[৩০] বাস্তবিক, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত-সহায়কারী', যুগাবতারের প্রধান পার্ষদ স্বামীজীই তো এবারের লীলাঙ্গনে মহাবীর। স্বামীজী নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর 'জন্মজন্মান্তরের দাস'[৩১] বলতেন। বলতেনঃ 'দাস তোমা দোঁহাকার।'[৩২] এ কি গুরু ও গুরুপত্নীর প্রতি প্রিয় শিষ্যের ভক্তির উচ্ছ্বাস? শাস্ত্র বলছেঃ 'সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।'[৩৩] অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে সাধকের জাতি-স্মরত্ব লাভ হয়। তাঁর স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ইতিপূর্বে তিনি যেখানে যতবার শরীর গ্রহণ করে যা কিছু অনুষ্ঠান করেছেন সকল বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ স্মরণ করতে পারেন। এই শাস্ত্রবাক্যের আলোকে স্বামীজীর উক্তিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। বোঝা যায়, ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ স্বামীজী জাতিস্মরত্ব লাভ করেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ত্রেতাযুগে যিনি রামচন্দ্র ও সীতার অবতারলীলায় মহাবীররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনিই বর্তমান কালে পুনরায় বিবেকানন্দ-শরীর আশ্রয় করে রামকৃষ্ণ-সারদার লীলাসহায়করূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। লোককল্যাণের প্রয়োজনে এই ধারা বার বার অনুবর্তিত হয়েছে। শ্রীমা বলতেনঃ 'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।'[৩৪] শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের পরিচিতি প্রসঙ্গে শ্রীমা তাঁর এক সেবককে বলেছিলেনঃ 'যারা সব (পূর্বে) এসেছিল তারাই এসেছে।'[৩৫] শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ 'আমি যদি আসি তো থাকবে কোথা? প্রাণ টিকবে না। কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'[৩৬] সুতরাং রামচন্দ্র ও সীতার কথা স্মরণ করেই যে স্বামীজী নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার 'জন্মজন্মান্তরের দাস' বলে ভাবতেন তা বলাবাহুল্য। রামচন্দ্রই যে ইদানীংকালে রামকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হয়েছেন তা বলতে গিয়ে স্বামীজী তাঁর অন্যতম শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রে সশক্তিক রামচন্দ্রের বর্ণনা করেছেন।[৩৭] বলে-ছেনঃ তিনি জানকীর পরম প্রেমাস্পদ—'জানকীপ্রাণবন্ধঃ'। এবং জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের তনুদেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতার দ্বারা আবৃত—'ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ।' শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন রামচন্দ্র, শ্রীমাও তেমনই সীতা—স্বামীজীর এই বর্ণনায় তার দ্যোতনা সুস্পষ্ট।

স্বামীজী শ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরও উপরে স্থান দিতেন। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছেঃ 'মা ঠাকুরের চাইতেও বড়।'[৩৮] মহাপুরুষ মহারাজকে লেখা তাঁর পূর্বোক্ত চিঠিতে তো তিনি স্পষ্টই বলেছেনঃ 'রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ!'[৩৯] এবং এই প্রসঙ্গেও রাম ও সীতার কথাই তাঁর মনে এসেছে। বলেছেনঃ 'দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, "কো রামঃ?"'[৪০] —অর্থাৎ রামচন্দ্র আবার কে? সীতাই আমার সব। 'মায়ের দিকে' স্বামীজী কোন

যুক্তিবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর সোজা-সরল স্বীকারোক্তিঃ 'দাদা, শুধু ঐ যে বলছি, ঐখানটায় আমার গোঁড়ামি।'[৪১] মহাবীরের এরকম 'গোঁড়ামি' ছিল কিনা সে-বিষয়ে বাল্মীকি কোন আলোকপাত করেননি। তবে একটি মত আছে যে, মহাবীরও এই গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ 'ভক্তি-উন্মাদ আছে। যেমন হনুমানের। [অগ্নিপরীক্ষার সময়] সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মারতে যায়।'[৪২] স্বামীজী শেষদিকে একদিন শ্রীমাকে প্রণাম করে বলেছিলেনঃ 'মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই!'[৪৩] উক্তিটি স্বামীজীর সীতা সম্পর্কে একটি মন্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ 'সীতার কথা কি বলিব! তোমরা জগতের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারো, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পারো, কিন্তু [আমি] তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতা-চরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র একবারই চিত্রিত হইয়াছে, আর কখনও হয় নাই, হইবেও না।'[৪৪]

অতঃপর স্মৃতিপ্রমাণ। এ-প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মনে পড়ে শ্রীমার প্রথম মন্ত্রশিষ্য মাতৃগতপ্রাণ সেবক স্বামী যোগানন্দের কথা। যোগীন মহারাজের বিশেষত্ব হল যে, শ্রীমা তাঁর দীক্ষাগুরু হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমার স্বরূপ-প্রচার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ভয় ছিল পাছে ঐসব প্রকাশ ও প্রচারের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীমার ভাগবতী তনুরও পৃথিবীতে অবস্থিতি স্বল্পস্থায়ী হয়ে যায়। এমনকি শ্রীমার প্রচার-বিষয়ে স্বয়ং স্বামীজীর প্রবল আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প থাকলেও যোগীন মহারাজ তাঁকে ঐ যুক্তি দেখিয়ে নিরস্ত করেছিলেন।[৪৫] শুধু কথায় নয়, তাঁর নিজের কোন আচরণেও যাতে কোনভাবে তাঁর অন্তরের ভাব বাইরে প্রকাশ না পায় সে-বিষয়েও তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন। স্বামী সারদানন্দ বলেছেনঃ 'যোগীন মহারাজ কখনও মাকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করতেন না; তিনি [মা] চলে গেলে সে জায়গা থেকে পদরজঃ তুলে মাথায় দিতেন।'[৪৬] কিন্তু তবু অন্তত একটি ক্ষেত্রে এই সদাসতর্ক পুরুষও তাঁর ভাবকে দমন করে রাখতে অসমর্থ হয়েছিলেন এবং সেই অসতর্ক মুহূর্তে শ্রীমার সম্পর্কে তাঁর উচ্চারিত শব্দটি হল—'সীতামায়ী'। ঘটনাটি হলঃ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর শ্রীমা স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, গোলাপ-মা প্রভৃতিকে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে একদিনের জন্য অযোধ্যায় নেমে রামচন্দ্র ও সীতার লীলাভূমি দর্শন করেন। শ্রীমার একজন জীবনীকার লিখেছেনঃ 'মাতাঠাকুরানীর সহিত সীতা-রামের মূর্তি দর্শন করিয়া সন্তানগণ নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিলেন। অধিকন্তু, অযোধ্যাতীর্থে মাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সন্তানদিগকে ভোজন করাইলেন। এইরূপ অভাবনীয় যোগা-

যোগে সকলের কী অপরিসীম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি! যোগানন্দজী আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, “কী ভাগ্য! আজ আমরা অযোধ্যাতীর্থে সীতামায়ীর প্রসাদ পাইলাম।”'[৪৭] স্বামী যোগানন্দের জীবনে সম্ভবত এই প্রথম এবং সম্ভবত এই সর্বশেষ অসতর্কতা। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, যোগীন মহারাজ 'মাকে যে চক্ষে দেখিতেন তাহা সত্যানুভূতির চক্ষু'।[৪৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর আর এক প্রিয় সন্তান লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে মুখর হলেও শ্রীমা-সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থেই মূক ছিলেন বলা চলে। তাঁর সেই কঠোর মৌনতার কারণও তিনি একাধিকবার স্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বলেছেনঃ 'আমি মায়ের কথা যেখানে সেখানে বলি না, ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা বলে থাকি। সকলে বুঝবে না, উলটো বুঝবে, তাই।'[৪৯] তিনি জানতেন, তাঁর স্বরূপ বোঝা সাধারণ অন্তঃসারশূন্য মানুষের পক্ষে অসম্ভব। 'উলুবনে মুক্তো ছড়ানো'তে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তবু প্রেরণার গভীরতম ক্বচিৎ কোন মুহূর্তে লাটু মহারাজ শ্রীমা সম্পর্কে তাঁর অন্তরের কথাটি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। বলেছিলেনঃ 'মাকে কি মনে করি, জিজ্ঞাসা কচ্ছো?—তিনি মা লক্ষ্মী, আবার কখনও তিনি সীতা।'[৫০] শ্রীমার সম্পর্কে লাটু মহারাজের এই উক্তিটি তাঁর উপলব্ধির কোন্ গভীরতা থেকে উত্থিত তা সহজেই অনুমেয়।

প্রসঙ্গত দু-একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। লাটু মহারাজ ছিলেন বিহারের কোন এক দরিদ্র রামভক্ত মেষপালক-দম্পতির একমাত্র সন্তান। কথিত আছে, অতি শৈশবে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনসংশয় উপস্থিত হলে তাঁর মা রামচন্দ্রের কাছে সন্তানের নিরাময়ের জন্য আকুল প্রার্থনা জানান। শিশু সুস্থ হলে জননীর একান্ত বিশ্বাস হল যে, প্রভু রামচন্দ্রের অনুগ্রহেই তাঁর পুত্রের জীবনরক্ষা হয়েছে। তাই শিশুর নাম রাখা হয় 'রাখতুরাম'। গৃহের ভগবৎপ্রবণ পরিমণ্ডল এবং পল্লী-বিহারের অনুরূপ মানসিকতার প্রভাবে শৈশবেই রাখতুরামের হৃদয়জুড়ে রাম-সীতা অভীষ্টদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নিজেকে তিনি তাঁদের 'দাস' ভেবে আনন্দ পেতেন। সৌন্দর্যময়ী পল্লী-প্রকৃতির অনাবৃত পটভূমিকায় শিশুর অন্তরকে মথিত করে প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতধ্বনি কল্লোলিত হয়ে উঠতঃ 'মনুয়ারে, সীতা-রাম ভজন কর লিজিয়ে।' বয়ঃপ্রাপ্ত লাটু মহারাজ যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এলেন তখনও ঐ সঙ্গীত তাঁর অন্তরে মূর্ছনা তুলত। একদিনের ঘটনা। 'দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে—যেখানে তিনি নির্জনে প্রাণের আবেগে তন্ময় হইয়া ঐ কলিটাতে সুর যোজনা করিয়াছিলেন। অদূরে পরমহংসদেব দণ্ডায়মান। মৌন মুগ্ধ স্তব্ধতা লইয়া ভক্তের জীবনসঙ্গীত শুনিয়া সস্নেহে তিনি বলিয়াছিলেন—“ওরে! তোর এতেই হবে।”'[৫১] কিন্তু তখন কি তিনি বুঝেছিলেন যে, সঙ্গীতের সেতু বেয়ে

তিনি যাঁর 'চরণ ছুঁতে' চেষ্টা করছিলেন তিনি স্বয়ং তার সামনে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন? মনে হয় পারেননি। পরে পেরেছিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়ঃ 'একদিন ঠাকুরের পদসেবায় নিযুক্ত লাটুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দিকিনি, তোর রামজী এখন কি করছেন?" লাটু "রামজীর ব্যাপার" তখন আর কি বুঝিবেন—তিনি নীরব রহিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই কহিলেন, "ওরে, এখন তোর রামজী সূচের ভিতর হাতী চালাচ্ছেন।" লাটু উহার তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "আমার এতটুকু আধার; আমার মধ্যে তিনি সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন।"'[৫২] অর্থাৎ তিনিই যে স্বয়ং লাটুর আরাধ্যদেবতা রামচন্দ্র—তার ইঙ্গিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন লাটুকে দিতে চেয়েছিলেন। লাটু মহারাজ সেদিন সে ইঙ্গিতের মর্ম গ্রহণ করতে অসমর্থ হলেও এরই কাছাকাছি কোন সময়ে স্পষ্টতর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের স্বরূপের আভাস পুনরায় তাঁকে দিয়েছিলেন। ধ্যানপ্রবণ লাটু মহারাজ প্রায়ই তখন গঙ্গাতীরে তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন। হয়তো তাঁর প্রাণের দেবতা রামজী ও সীতামায়ীর চিন্তায় তিনি তখন বিভোর হয়ে থাকতেন। একদিন ঝাউতলার দিকে যাবার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন সারদাদেবী নহবতে ময়দা ঠেসছেন আর অদূরে গঙ্গাতীরে লাটু নিশ্চল হয়ে ধ্যানমগ্ন। অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে বললেনঃ 'আরে, তুই যাঁর ধ্যান কচ্ছিস, তিনি তো নবতে ময়দা ঠেসছেন।'[৫৫] লাটু মহারাজের ভুল ভাঙল। সেদিনই তিনি প্রথম জানলেন যে, এতদিন তিনি তাঁর কল্পলোকের যে যুগলবিগ্রহের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন আজ তাঁরাই জীবন্ত, প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর সামনে বিরাজমান। রামকৃষ্ণ ও সারদার মধ্যে রাখতুরাম খুঁজে পেলেন তাঁর রামজী আর সীতামায়ীকে। পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনও কি সেই ইঙ্গিতটিই ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন?—

প্রভুভক্ত-চূড়ামণি হিন্দুস্থানী জেতে।
প্রবল অটল দাস্যভক্তিভাব চিতে॥

*   *   *

শ্রীপ্রভুর দাস সেবা-ভক্তি অন্তরে।
দাস্যভাবে হনু যথা রাম অবতারে॥[৫৭]

পক্ষান্তরে, শ্রীমার সম্পর্কে নিজের ধারণা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন যোগীন মহারাজ এবং লাটু মহারাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ভক্তমহলে শ্রীমার মহিমা 'অকুণ্ঠহৃদয়ে', 'ডাকিয়া হাঁকিয়া' প্রচার করে বেড়াতেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'স্বামী নিরঞ্জনানন্দ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অকুতোভয়ে সর্বসমক্ষে প্রচার করিতেন। ইহারই ফলে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে শ্রীমায়ের স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন।'[৫৫] সেই মহা-আবিষ্কারের চমকপ্রদ কাহিনী বুক ফুলিয়ে 'ভক্ত ভৈরব' ভক্তদের কাছে বর্ণনা করতেন। কাহিনীটি এইঃ জীবনের নানা দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে গিরিশচন্দ্র একদিন নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের কাছে অনুযোগ করেছিলেন, 'ভাই নিরঞ্জন, আমার পরমাশ্রয় ঠাকুরের দর্শন তো কই আর এখন পাই না।' তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু নিরঞ্জন মহারাজ তাঁকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেনঃ 'কেন, মা-ঠাকুরানী তো রয়েছেন! ঠাকুর ও মায়ের মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? ...রামচন্দ্র আর সীতা কি আলাদা? কৃষ্ণকে রাধা অথবা রুক্মিণী ছাড়া কি ভাবতে পারেন?' তখনকার দিনের অন্যান্য অনেক গৃহী-ভক্তের মতো গিরিশচন্দ্রও শ্রীমাকে শুধু গুরুপত্নী হিসাবেই দেখতেন। নিরঞ্জন মহারাজের দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ কথায় অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে তাই তিনি প্রতিপ্রশ্ন করলেনঃ 'বলছ কি তুমি? ঠাকুর মা এক—তাঁরা অভিন্ন?' নিরঞ্জন মহারাজ জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অগাধ ভক্তি-বিশ্বাসের কথা। জানতেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে রাম ও কৃষ্ণের অবতার বলে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর সেই বিশ্বাসের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের সময় থেকেই তিনি সর্বত্র নির্দ্বিধায় প্রচার করে আসছেন। তিনি উত্তর দিলেনঃ 'আচ্ছা, আপনি তো বিশ্বাস করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার -নরদেহে ভগবান স্বয়ং। আপনি কি মনে করেন যে তিনি একটি সাধারণ মেয়েকে তাঁর দিব্যজীবনের লীলাসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন? আমাদের ঠাকুরের সেইকথা তো আপনার স্মরণ থাকা উচিত যে ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি এক এবং অভেদ, যদিও প্রকাশের দিক দিয়ে তাঁরা আমাদের কাছে দুই বলে প্রতিভাত হন। মা হলেন সেই শক্তি—পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণের শক্তি।'[৫৬] এবং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রাম ও কৃষ্ণ যদি ইদানীং রামকৃষ্ণ-শরীরে আবির্ভূত হয়ে থাকেন তাহলে শ্রীমাও যে 'সীতা' এবং 'রাধা' অথবা 'রুক্মিণী'—নিরঞ্জন মহারাজ তাঁর সেই উপলব্ধিজাত প্রত্যয় সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রকে প্রথমেই অবহিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, রামচন্দ্রের অংশে নিরঞ্জনের জন্ম।[৫৭] নিজের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পরিচিতি প্রসঙ্গে অন্য এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'যারা যারা [আমার] আত্মীয়, তারা কেউ [আমার] অংশ, কেউ কলা।'[৫৮] 'আত্মীয়' শব্দের অর্থও তিনি পরিষ্কার করে বলেছেনঃ যেমন ছেলে।[৫৯] রামচন্দ্রের অংশ নিরঞ্জন রামকৃষ্ণেরও অংশ—তাঁর আত্মজ। এবং ঘোমটায় সম্পূর্ণ মুখ ঢাকা থাকলেও একমাত্র আত্মজই ভুল করে না তার মাকে চিনতে। নিরঞ্জনেরও তাই, তাঁর মাকে চিনতে ভুল হয়নি। নিজে চিনেছিলেন বলে অপরকে চেনাতেও তিনি পারতেন। নিরঞ্জন

মহারাজের সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ করে গিরিশচন্দ্র বলতেনঃ 'নিরঞ্জনের কথায় আমার চোখ খুলে গেল।'[৬০] গিরিশচন্দ্র একদিন নতজানু হয়ে করজোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেনঃ ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশী আর কি বলতে পারি?[৬১] আর, 'নিরঞ্জন ভাই'-এর কাছে সেদিন তিনি অতিরিক্ত জানলেন যে, গুরুপত্নীরূপে এতদিন যাঁকে জেনে এসেছিলেন ব্যাস-বাল্মীকি তাঁরও ইয়ত্তা করতে পারেননি।

স্বামী শিবানন্দ বলতেনঃ 'শুধু রামকৃষ্ণ-অবতারেই নয়, রাম-অবতারে সীতারূপে, কৃষ্ণ-অবতারে রুক্মিণী ও রাধা রূপে আমাদের মা-ই এসেছিলেন। যুগে যুগে ঠাকুরের সঙ্গে মাকেই আসতে হয়।'[৬২]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সীতা ও রামচন্দ্র হিসাবে প্রত্যক্ষ করতেন। 'সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নিম্নোক্ত প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণটিতে তাঁর সেই দৃষ্টির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ, এলাহাবাদ। ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৪। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বাল্মীকি রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। বালকান্ড ও অযোধ্যাকান্ডের কয়েক অধ্যায় প্রেসে দেওয়া হয়েছে। ঐ পুস্তকে গোড়াতেই শ্রীসীতা, রামাদি চার ভাই এবং হনুমানজীর ছবি দিয়েছেন এবং গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য তিনি খুবই সচেষ্ট। আজকাল সীতা-রামের ভাবেই সর্বক্ষণ তন্ময় থাকেন। সমবেত ভক্তদের কাছে ঐ সম্বন্ধেই বলছেনঃ 'কয়েকদিন পূর্বে বাইরে শুয়ে আছি; এমন সময় হঠাৎ ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন—"কই আমার ধনুর্বাণ কোথায়?" তাই ভাবলাম ঠাকুর ও মায়ের ছবিও রামায়ণে দেব। ছোট একখানি ব্লক করিয়ে ফেললাম। কিন্তু ব্লকটা ইংরাজী মতের হয়ে গেছে—(হাসতে হাসতে)—মা আগেই বসে গেছেন। ঠাকুর মায়ের বাঁদিকে বসেছেন। তা আর কি করা যাবে। মায়ের যা ইচ্ছা—তিনি আগেই বসে পড়লেন। ...[ঠাকুর] আমাকে খুবই আদর করে ভাবাবস্থায় বলে-

ছিলেন—"আমি চৌদ্দ বৎসর বনে ছিলাম।"'[৬৩] এই প্রসঙ্গে নন্দীপতি মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সম্পর্কে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দৃষ্টিকে স্পষ্টতর করে দেয়ঃ '১৯৩৫ সনে যখন তিনি বাল্মীকির মূল রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ করছিলেন, সেই সময়ে ঐ-বিষয়ে এলাহাবাদে একদিন কথা হচ্ছিল। তাঁর বইয়ে রামচন্দ্র আর সীতা-দেবীর ছবির পাশাপাশি শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং শ্রীশ্রীমায়ের ছবিও ছাপা হয়েছিল। রামায়ণে ঠাকুর এবং মায়ের ছবি কেন তিনি দিলেন এই বিষয়ে প্রশ্ন করাতে পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর একটি দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। কিছুদিন আগে তিনি উত্তর প্রদেশের এক ভক্তগৃহে গিয়েছিলেন। রামচন্দ্র ঐ ভক্তের ইষ্টদেবতা; তাঁর ঠাকুরঘরের বেদীতে ছিল রামচন্দ্র আর সীতাদেবীর পট। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ রামচন্দ্র আর সীতাদেবীকে প্রণাম করার পর দেবতার সেই সিংহাসনে দেখলেন শ্রীশ্রীঠাকুর আর শ্রীশ্রীমা বসে আছেন। স্পষ্ট সেই দর্শন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে যা দেখিয়ে দিয়েছেন, রামায়ণের অনুবাদ-গ্রন্থে পাশাপাশি ঐ দুখানি ছবি সাজিয়ে তা-ই তিনি প্রকাশ করেছেন।'[৬৪] স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলতেনঃ 'আমি পরমহংসদেবকে যখন দেখেছিলাম তখন তো ছেলেমানুষ, অল্পদিনই তাঁর সঙ্গ করেছি—আর তাঁকে [তখন] অতি অল্পই বুঝতে পেরেছি।'[৬৫] তরুণ হরিপ্রসন্ন আর প্রবীণ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান। এই ব্যবধান শুধু কালের নয়—অভিজ্ঞতার, অনুভবের এবং উপলব্ধির। জীবনসায়াহ্নে উপনীত অধ্যাত্ম-রাজ্যের এই দিক্‌পালের সীতা-রাম ও সারদা-রামকৃষ্ণে অভেদদৃষ্টি যে তাঁর অপরোক্ষ দর্শনের ফলসিদ্ধি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে পরিণত বয়সে সীতা-রামের প্রতি তিনি একটা গভীর 'প্রাণের টান' অনুভব করতেন।[৬৬] এই টানও ছিল আসলে সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভালবাসার আর এক অভিব্যক্তি মাত্র। কারণ তখন আর তাঁর নিজের বলে কোন আলাদা ইচ্ছা ছিল না। বলতেনঃ 'ঠাকুর, মা যেমন করাচ্ছেন, তেমনই করছি।'[৬৭] তখন তিনি শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। বলতেনঃ 'আমি ঠাকুর ও মা ছাড়া আর কিছু জানিনে।'[৬৮] শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার মধ্যে তিনি তখন বিশ্বপ্রপঞ্চের পরম-পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করতেন। বলতেনঃ 'ঠাকুর হলেন শিব আর মা শক্তি; ঠাকুর নারায়ণ, মা লক্ষ্মী; ঠাকুর রাম, মা সীতা; ঠাকুর কৃষ্ণ, মা রাধা।'[৬৯]

স্বামী সুবোধানন্দ বলতেনঃ 'ঠাকুর আর মা-ঠাকরুন যেন টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তি যেমন অভিন্ন তাঁরাও তা-ই। একে অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাঁরা পরস্পরের পরিপূরক। মা হলেন মহামায়া—আদ্যা শক্তি। ভগবান তাই নরদেহে অবতীর্ণ হলে তিনিও তাই সঙ্গে সঙ্গে আসেন। নতুবা অবতার-লীলা পূর্ণ হয় না। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন সীতা হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা হয়ে, বুদ্ধদেবের সঙ্গে যশোধরা হয়ে, মহাপ্রভুর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে। আর এবার এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের মা-ঠাকরুন হয়ে।'[৭০]

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ শ্রীমাকে নরতনুতে স্বয়ং পরমা প্রকৃতি বলে বর্ণনা করতেন। আবার কখনও কখনও করতেন, সীতা অথবা রাধা রূপেও। তাঁর রচিত 'শ্রীসারদাদেবীধ্যানম্'-এর সর্বশেষ শ্লোকটিতে তিনি শ্রীমার সীতা ও রাধা রূপটিই স্মরণ করেছেনঃ

জানকীরাধিকারূপধারিণীং সর্বমঙ্গলাম্।
চিন্ময়ীং বরদাং নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম্॥[৭১]

গৃহী-ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এবার উল্লেখ করা যেতে পারে কথামৃতকার 'শ্রীম'র কথা। তাঁর আন্তর চেতনায় শ্রীমায়ের যে রূপ প্রতিভাত ছিল তার একটি অনবদ্য আলেখ্য পাওয়া যায় তাঁর একটি কবিতার মধ্যে। কবিতাটি 'শ্রীম' লিখেছিলেন তাঁর জননী স্বর্ণময়ী দেবীর উদ্দেশে। শিশু-পুত্রকে নিয়ে স্বর্ণময়ী দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন নব-প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণীর মন্দির দেখতে। গর্ভধারিণীর উদ্দেশে লিখছেন 'শ্রীম'ঃ

আর দেখেছিলে কি মা
নহবতের ঘর বকুলতলায়
যেথা জগতের মাতাঠাকুরানী. মা আমার,
ধরি নারীরূপ যাপিবেন কাল.

রাম ত্বমেব বরুণো ভার্গবী জানকী শুভা।
বায়ুস্ত্বং রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা॥
কুবেরস্ত্বং রাম সীতা সর্বসম্পৎ প্রকীর্তিতা।
রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্ত্বং লোকনাশকৃৎ॥
লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎ সর্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্বং ত্বং হি রাঘব॥
তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন॥
[অধ্যাত্ম-রামায়ণ, ২।১।১৩-৯]

—আপনি বিষ্ণু, জানকী লক্ষ্মী; আপনি শিব, জনকতনয়া শিবানী; আপনি ব্রহ্মা, সীতা সরস্বতী. আপনি সূর্য, জানকী প্রভা; আপনি শশাঙ্ক, শুভলক্ষণা সীতা রোহিণী; আপনি ইন্দ্র, সীতা শচী ; আপনি অগ্নি, সীতা স্বাহা ; আপনি কালরূপী যম, সীতা সংযমনী ; হে জগন্নাথ! আপনি নির্ঋতি, সীতা তামসী ; আপনি বরুণ, জানকী ভার্গবী ; আপনি পবন, সীতা সদাগতি ; আপনি কুবের, সীতা সর্বসম্পদ; আপনি লোকসংহারক রুদ্র, সীতা রুদ্রাণী। হে রাঘব! জগতে স্ত্রীবাচক যা-কিছু আছে সে-সমস্তই জানকী এবং পুরুষবাচক যা-কিছু সবই আপনি। অতএব ত্রিভুবনে আপনারা দুজন ব্যতীত আর কিছুই নাই।

দ্বাদশ-বর্ষ ধরে,
রামকৃষ্ণদেব নারায়ণ শ্রীপতির
চরণদুটি সেবিবার তরে?
যেন পতিগতপ্রাণা সীতাদেবী
এসেছেন চিত্রকূটে
কিংবা পঞ্চবটীবনে, রাজসুখ ত্যজি,
সেবিতে কমল-লোচন-শ্রীরামপদ॥ [৭২]

পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনও লিখেছেন তাঁর অনুভবের কথা:

মা তোমার নরলীলা লীলাশ্রেষ্ঠ গণি।
অযোধ্যায় সীতারূপে জনকনন্দিনী॥
রামময় প্রাণ-ভাব প্রাণের আরাম।
মন প্রাণ ধ্যান জ্ঞান দূর্বাদলশ্যাম॥
আগোটা জনম দুঃখ সহিলে পরাণে।
জনম-দুঃখিনী সীতা পুরাণে বাখানে॥ [৭৩]

সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভক্তদের মধ্যে অন্যতম প্রধান গৌরী-মা শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বয়ং রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ এবং শ্রীমাকে সাক্ষাৎ সীতা ও রাধা হিসাবে জানতেন! তাঁর ঐ ধারণার কথা তিনি ভক্তমহলে এবং অন্যত্রও সগর্বে প্রচার করতেন। শ্রীমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে (প্রসন্নমামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুবাসিনী দেবীকে) গৌরী-মা বলেছিলেন: 'আমাদের মা-ঠাকরুনকে তুমি ঠাকুরঝি মনে করো না। তিনি সাক্ষাৎ মা সীতা।' [৭৪] আর একবার কলকাতার পথে বিষ্ণুপুর স্টেশনে কুলিদেরকে তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীমা স্বয়ং 'জানকীমায়ী'। [৭৫]

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, শ্রীমার নহবতে বাসকালেই তাঁকে দেখে যোগীন-মা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আরও কোন কোন স্ত্রীভক্তের 'সীতা' বলে মনে হয়েছিল। [৭৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য-শিষ্যাদের কাছেই শুধু নয়, অন্যান্যদের কাছেও শ্রীমা তাঁর জীবিতকালেই সীতারূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, একটি শিশু তাঁকে 'সীতা' বলে ডাকত, রোজ তাঁর পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করত। ছেলেটি শ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্রী সুশীলার (মাকুর)—নাম 'ন্যাড়া'। অসাধারণ শুভ সংস্কার নিয়ে ছেলেটি জন্মগ্রহণ করেছিল। আড়াই-তিন বছর বয়সেই সে মারা যায়। তার মৃত্যুতে শ্রীমা খুব আঘাত পেয়েছিলেন। ন্যাড়ার মৃত্যুর দু-তিনদিন পরে তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীমা বলেছিলেন: 'ন্যাড়া যে আমাকে "সীতা" বলেছিল! ন্যাড়া যে আমাকে "সীতা" বলেছে!' [৭৭] এই শিশুকে তো কেউ শিখিয়ে দেয়নি শ্রীমাকে 'সীতা' বলতে। ন্যাড়া কি তবে জন্মান্তরে রাম-সীতার অনুরাগী কোন ভক্ত-সাধক ছিল?

জাতিস্মরত্ব সহায়ে সে কি তার পূর্বজন্মের আরাধ্য দেবীকে দর্শনমাত্রই চিনতে পেরেছিল? ন্যাড়ার মৃত্যুর দিন শ্রীমা যা বলেছিলেন তাতে সেই আভাসই ছিল। তিনি বলেছিলেনঃ 'হয়তো [তাঁর জন্মান্তরের] কোন ভক্ত এসে জন্মেছিল।'[৭৮]

শ্রীমার সীতারূপ সম্পর্কে আরও একটি চমকপ্রদ ও অপরূপ ঘটনার কথা জানা যায়। ঘটনাটি হলঃ একবার (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীমা, গৌরী-মা প্রভৃতি জয়রামবাটী থেকে কলকাতা আসার পথে বিষ্ণুপুর স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় একটি হিন্দুস্থানী কুলি শ্রীমাকে সেখানে দেখে খুব ব্যগ্রতার সঙ্গে তাঁর কাছে ছুটে আসে এবং বলেঃ 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিত্‌নে দিনোঁসে খোঁজা থা, ইত্‌নে রোজ তু কাঁহা থী?' কথাগুলি বলে সে অঝোরধারে কাঁদতে থাকে। শ্রীমা স্নেহবাক্যে তাকে শান্ত করে একটি ফুল নিয়ে আসতে বলেন এবং সে ফুল নিয়ে এসে তাঁর পায়ে দিলে তিনি তাকে ঐখানে বসেই মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করলেন।[৭৯] শ্রীমায়ের অন্যতম

জীবনীকার ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেনঃ 'কুলি-বেশী এই ভক্তটি নিশ্চয়ই স্বপ্নে বা অন্য কোন অবস্থায় মাকে শ্রীসীতারূপে দর্শন করিয়াছিল; নতুবা দীর্ঘকাল তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে কেন? দেখিবামাত্রই বা চিনিতে পারিবে কেন?'[৮০] অন্য-ভাবে বলা যায় যে, শিশু অথবা শিশুর মতো যে সরল তার কাছেই তো ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। যীশুখৃীষ্ট থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত জগতের সকল ধর্ম-গুরু সেকথাই বলেছেন। ন্যাড়া এবং ঐ সরল নাম-গোত্রহীন কুলিটির কাছে শ্রীমারও কি সেই স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-উন্মোচন? আর, তথাকথিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক-বর্জিত ঐ 'অমার্জিত' কুলিটি স্বামীজীর সীতা-প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত সেই উক্তিটির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলঃ 'অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতি অমার্জিত গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে।'

শ্রীমা সম্পর্কে সীতা-দৃষ্টি শুধুমাত্র তাঁর কালের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐ দৃষ্টি এক নবতম ঐতিহ্য রচনা করেছে। সেই ঐতিহ্য—সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আজও অসংখ্য মানুষ তাঁদের চিন্তা, ধ্যান ও কল্পনায় শ্রীমাকে সীতারূপে প্রত্যক্ষ করছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। সাম্প্রতিককালে তাঁদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি বাংলার খ্যাতিমান সাহিত্য-শিল্পী 'বনফুল'। তিনি শ্রীমার উদ্দেশে তাঁর শতবর্ষের প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেনঃ

> শ্রীরামচন্দ্রের সীতা—
> পাবক-পরিশুদ্ধা জনক-নন্দিনী বৈদেহী
> সমাধিস্থ হয়ে আছেন
> তোমারি অন্তর-পাতালের স্তব্ধলোকে।[৮১]

নিজের সীতারূপ প্রসঙ্গে সারদাদেবী স্বয়ং

১৯১১ খৃীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীমা রামেশ্বর দর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁর এই তীর্থ-পরিক্রমার অন্যতম সঙ্গী এবং সেবক স্বামী ধীরানন্দ[৮২] বলেছেন, অনাবৃত[৮৩]

রামেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করে শ্রীমা বলে ফেলেছিলেনঃ 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।' কথাটি কানে যাওয়ামাত্র তাঁর কাছে যে ভক্তেরা ছিলেন তাঁরা বলে উঠলেনঃ 'মা, ও কি বললে?' শ্রীমা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন, তাঁর অনবধানতাবশত উচ্চারিত ঐ উক্তিটি কী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে উপস্থিত ভক্তদের মনে! তাই ব্যাপারটিকে লঘু করার অভিপ্রায়ে সহাস্যে বললেনঃ 'ও একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।' শ্রীমার অপর সঙ্গিনী 'কেদারের মা'ও বলেছেনঃ 'রামেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীমা শিবলিঙ্গ দেখেই বলেছিলেন, "আহা, যেমনকার তেমনটি আছে গো!" কী বললে মা, কী বললে?—গোলাপ-মা এই প্রশ্ন করাতে মা সেকথা চেপে যান।'[৮৪] রামেশ্বর থেকে শ্রীমা কলকাতায় ফিরে এলে কোয়াল-পাড়ার কেদারবাবু উদ্বোধনের বাড়িতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন?' উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলাম, ঠিক তেমনটিই আছেন।' 'সদা-উৎকর্ণা' গোলাপ-মা তখন পাশের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কথাটি শোনামাত্র তিনি বলে উঠলেনঃ 'কি বললে, মা?' একটু চমকে উঠে শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'কই, কি বলব? বলছি এই তোমাদের কাছে যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনটিই দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল।' গোলাপ-মাও ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি বললেনঃ 'না, মা, আমি সব শুনেছি, এখন আর কথা ফেরালে কি হবে? কেমন গো, কেদার?' গোলাপ-মার মুখে তখন আবিষ্কারের উল্লাসের ছটা। সেখান থেকে গিয়ে তিনি যোগীন-মা ও অন্যান্যদের ঐ সংবাদ সোৎসাহে জানিয়ে দিলেন।[৮৫]

রামেশ্বর লিঙ্গকে দর্শনমাত্র এবং রামেশ্বর-দর্শন প্রসঙ্গে কেদারবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমার মুখ থেকে যে বাক্যটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়েছিল তার মাধ্যমে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে দিয়েছিলেনঃ 'আমিই সীতা।' শ্রীমার এই উক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শ্রীমাকে কদাচিৎ নিজের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলতে শোনা গিয়েছে। এ-ব্যাপারে তিনি আজীবন একটি সযত্ন-সতর্কতা রক্ষা করার চেষ্টা

করেছেন। সব সময় নিজেকে অবগুণ্ঠনের আড়ালেই রাখতে চেয়েছেন। তবে দু-একটি বিরলতম মুহূর্তে শ্রীমার কঠোর গুণ্ঠন তাঁর অজ্ঞাতসারেই সামান্য উন্মুক্ত হয়েছিল এবং নিমেষের জন্য হলেও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তাঁর ঐশী স্বরূপের কিঞ্চিৎ হিরণ্ময় উদ্ভাস। রামেশ্বর সংক্রান্ত তাঁর উক্তি সেরূপ একটি দৃষ্টান্ত। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির আকাশকে বিদীর্ণ করে হঠাৎ একটু বিদ্যুতের ঝলক যেমন অন্ধকার ধরিত্রীর একটু অংশকে পলকের জন্য মানুষের চোখের সামনে প্রকাশিত করে দেয়, ঠিক তেমনই যেন শ্রীমার এই ক্ষণিক আত্ম-উন্মোচন। যেসব পরম সুকৃতিবান লীলাময়ীকে তখন দেখেছেন, তাঁর শ্রীমুখ থেকে সেই স্বরূপজ্ঞাপক উক্তিটি শুনেছেন তাঁরা ধন্য। তাঁদের অভিজ্ঞতার সম্পদ উপহার দিয়ে সমগ্র জগতের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

রামেশ্বর সংক্রান্ত শ্রীমার উক্তির নেপথ্য কাহিনীটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম 'স্কন্দপুরাণ'-এ কাহিনীটির একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়ঃ সীতা-উদ্ধারের পর লঙ্কা থেকে পুষ্পক বিমানযোগে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে রামচন্দ্র সমুদ্রকূলবর্তী এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে অবতরণ করেছিলেন। সেখানে অগস্ত্য প্রমুখ মুনিগণ রামচন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। রাবণকে বধ করায় ব্রহ্মহত্যাজনিত যে পাপ রামচন্দ্রকে স্পর্শ করেছিল তা অপনোদনের জন্য রামচন্দ্র মুনিগণের উপদেশ চান। তাঁরা তাঁকে ঐ দ্বীপে লিঙ্গ স্থাপন করে শিবার্চনার বিধান দেন। রামচন্দ্র সানন্দে সে বিধান গ্রহণ করেন এবং হনুমানকে কৈলাস থেকে অবিলম্বে শিবলিঙ্গ আনয়ন করতে নির্দেশ দেন। হনুমান যথারীতি কৈলাস যাত্রা করলেন। কিন্তু কৈলাস থেকে হনুমানের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হওয়ায় আরাধনার জন্য নির্দিষ্ট শুভমুহূর্ত অতিক্রান্ত হবার উপক্রম হলে মুনিগণের পরামর্শে রামচন্দ্র সীতা-কর্তৃক লীলাচ্ছলে নির্মিত বালুকাময় শিবলিঙ্গকে স্থাপন করে দেবাদিদেবের অর্চনা করেন। এদিকে হনুমান কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে এসে দেখেন যে, রামচন্দ্র ইতিমধ্যে সীতা-নির্মিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও আরাধনা করেছেন। এতে অপমানিত, ক্রুদ্ধ ও অভিমানাহত হনুমান সীতার বালুকা-লিঙ্গকে উৎপাটন করার জন্য কৃতপ্রযত্ন হন। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ঐ শিবলিঙ্গের স্থানচ্যুতি ঘটাতে অসমর্থ হন। সীতা-নির্মিত এবং রামচন্দ্র-পূজিত এই লিঙ্গ তদবধি 'রামেশ্বর' নামে লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করে।[৮৬] রামেশ্বরকে কেন্দ্র করে সুপ্রাচীন কাল থেকে লোক-মুখে যে-কাহিনী প্রচলিত আছে এবং মন্দির-অভ্যন্তরে একটি প্রকোষ্ঠে মূর্তি-আকারে যে-কাহিনী বিবৃত দেখা যায় তা-ও মূলত স্কন্দপুরাণাশ্রয়ী। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় ঘটনাটি সামান্য ভিন্নভাবে চিত্রিত হলেও মূল ঘটনায় কোন পার্থক্য নেই। কৃত্তিবাস সম্ভবত অন্য কোন পুরাণ থেকে কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন। কৃত্তিবাস লিখেছেনঃ

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন।
শিবপূজা করি দেশে করিব গমন॥
শিবপূজা করিতে রামের লাগে মন।
বুঝিয়া পুষ্পক-রথ নামিল তখন॥
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।

হনুমান আনিলেন কুসুম চন্দন ॥
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরানী।
জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি ॥
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
সেকারণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর নাম ॥ [৮৭]

সুতরাং রামেশ্বর লিঙ্গ দর্শনমাত্র কোন্ যুগান্তরের, কোন্ জন্মান্তরের স্মৃতি শ্রীমার মনে জেগেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাই লিখেছেনঃ 'ভক্তগণের বিশ্বাস, যিনি ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র-প্রেয়সী, জন্মদুঃখিনী সীতাদেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়া সমুদ্রতীরে বালুকানির্মিত শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন, তিনি পুনঃ কলিতে সর্বংসহা, অশেষ কল্যাণময়ী ভক্তজননীরূপে অবতীর্ণা হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গকে এত দীর্ঘকাল পরে একইরূপে থাকিতে দেখিয়া সহসা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া গিয়া ত্রেতাযুগে উপনীত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার সেই সময়কার অনুভব অজ্ঞাতসারে কতকটা স্বগতোক্তির মতো এইভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।' [৮৮] জানা যায়, শ্রীমা অন্তত আরও একবার নিজের সীতারূপের অঙ্গীকার করেছিলেন। সেবার সুস্পষ্ট ভাষায় কোন এক ভাগ্যবান সন্তানকে তিনি বলেছিলেনঃ 'আমিই সীতা।' [৮৯] উল্লেখ্য যে, একবার শ্রীমা জনৈক ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেনঃ 'আমিই রাধা' [৯০]

শ্রীমার এমন কিছু অভিব্যক্তি বা আচরণের কথা জানা যায় যেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে যথেষ্ট সংকেতবহঃ রামেশ্বর দর্শনের বহু বছর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহ অপ্রকট হওয়ার অব্যবহিত পরে বৃন্দাবনের পথে অযোধ্যা দর্শনকালে শ্রীমার সীতা-স্বরূপের উদ্দীপন হয়েছিল। শ্রীমার ভ্রমণসূচীতে অযোধ্যার নাম ছিল না। কিন্তু বারাণসী দর্শনের পর অযোধ্যা দর্শনের জন্য তিনি এক দুর্নিবার ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। হোক না সে দর্শন স্বল্পক্ষণের জন্য, তবু তাঁকে সেখানে যেতে হবে। জন্মান্তরের প্রধান লীলাভূমির আকর্ষণকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ-সম্পর্কে একজন জীবনীকার লিখেছেনঃ '[বৃন্দাবন যাত্রাকালে] পথিমধ্যে তাঁহারা বৈদ্যনাথধামে বাবা বৈদ্যনাথ এবং কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথ ও মাতা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করেন। সেবকবৃন্দের কাহারও কাহারও অভিমত হইল যে, প্রয়াগের ত্রিবেণীতে পুণ্যস্নান করিয়া পরে বৃন্দাবনে যাইবেন। কিন্তু বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া মায়ের কেবলই মনে হইতে লাগিল--যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, আর তিনিই রামকৃষ্ণ। সুতরাং অযোধ্যায় রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন, অন্য তীর্থে পরে যাইবেন। তাঁহার প্রাণের এই প্রকার অভিলাষ জানিতে পারিয়া যোগানন্দজী প্রয়াগ গমন আপাততঃ স্থগিত রাখিলেন, অযোধ্যাভিমুখেই তাঁহারা যাত্রা করিলেন। সরযূতীরবর্তী অযোধ্যার যতই সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন, মায়ের ভাবাবেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্র এবং জানকীমাতাকে দর্শন করিলেন এবং অনুভব করিলেন, এই সকল স্থান তাঁহার পূর্বপরিচিত।' [৯১] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বামী

যোগানন্দ অযোধ্যায় 'আত্মহারা' হয়ে বলেছিলেনঃ 'কী ভাগ্য! আজ আমরা অযোধ্যা-তীর্থে সীতামায়ীর প্রসাদ পাইলাম।' সীতার ভাবে আবিষ্টা শ্রীমার আচরণ ও অভিব্যক্তিতে যে সেদিন সাক্ষাৎ জানকীরই আবির্ভাব হয়েছিল স্বামী যোগানন্দের ঐ উক্তিটিই তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। অনুরূপভাবে, শ্রীমার বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তাঁর মধ্যে হয়েছিল রাধাভাবের আবেশ। বৃন্দাবনে তিনি এক বছর ছিলেন। কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীমতীর দিব্য-উন্মাদনার পূর্ণতা এবং বৈচিত্র তাঁর মধ্যে তখন যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু অযোধ্যায় মাত্র একদিন থাকার জন্য শ্রীমার জানকীভাবের পূর্ণতর রূপ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য থেকে তাঁর সঙ্গিগণ বঞ্চিত হয়েছিলেন। জানা যায়, বৃন্দাবনে বাসকালেও কখনও কখনও কৃষ্ণলীলার সঙ্গে রামচন্দ্রলীলার কথাও তাঁর স্মরণ হত। জীবনীকার লিখেছেনঃ 'আর একদিন [মা] একাকিনী চলিয়া গেলেন "ধীরসমীরে"। ধীরসমীরের চতুর্দিকে শান্ত পরিবেশ, সম্মুখে নীল যমুনা। তাঁহার দৃষ্টি চলিয়া গেল নিকট হইতে দূরে, ভাবিতে লাগিলেন তিনকালের লীলা—সরযূতীরে শ্রীরামচন্দ্র, যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আর গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণ।'[২২] লীলা মানে তো সশক্তিক লীলা। সুতরাং সারদার যে রামকৃষ্ণের রামচন্দ্ররূপের সঙ্গে নিজের সীতা-অবতারের কথাও স্মৃতিতে উদিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। রামেশ্বর-দর্শনের জন্যও এক ব্যাকুলতা শ্রীমা যেন দীর্ঘদিন ধরে পোষণ করতেন বলে মনে হয়। কারণ কোঠারে থাকাকালীন জনৈক সেবক তাঁর কাছে রামেশ্বর-দর্শনের প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র তিনি গভীর আগ্রহভরে বলেছিলেনঃ 'ঠিক বলেছ, বাবা; আমার শ্বশুর গিয়েছিলেন, সেখান থেকে রামশিলা এনেছিলেন—কামারপুকুরে দেখেছ তো, এখনও পুজো হয়ে থাকে। আমি যাব।'[২৩] কেন রামেশ্বর-দর্শনের জন্য শ্রীমার এত আগ্রহ? তাঁর শ্বশুর গিয়েছিলেন বলেই কি? অথবা, অযোধ্যার মতো এখানেও প্রাক্তন লীলাক্ষেত্রের আকর্ষণ ক্রিয়াশীল ছিল? রামেশ্বর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে সমুদ্রের মধ্যে স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকা ও প্রস্তরময় স্তূপ দেখে শ্রীমা উচ্ছ্বসিত হয়ে পার্শ্বস্থ সেবককে বলেছিলেনঃ 'দেখেছ বাবা, কোন্ যুগের চিহ্ন আজও রয়েছে!'[২৪] লোকপ্রসিদ্ধি এই যে, ঐ সমস্ত স্তূপ হচ্ছে ভারতের শেষ প্রান্ত থেকে লঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রেতাযুগের সেই বিখ্যাত নল-নির্মিত সেতুর ভগ্নাবশেষ। বহু ভৌগোলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও এতকাল পরে রামচন্দ্রের সেতুর চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে দেখে শ্রীমা উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। অতীত জন্মের স্মৃতি এক্ষেত্রেও তাঁর মনে জাগ্রত হয়েছিল কিনা কে জানে?

শ্রীমার মন্ত্রশিষ্য বিভূতিভূষণ ঘোষ জয়রামবাটীতে সিংহবাহিনীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত রামায়ণ-গান প্রসঙ্গে একদিন বলেনঃ 'আহা, কেমন সুন্দর রামায়ণ শুনলুম!' ঐকথা শোনামাত্র শ্রীমা গম্ভীরভাবে বললেনঃ 'এবার [রামায়ণ] অনেক বড়।'[২৫] শ্রীমার এই উক্তিটির তাৎপর্য হলঃ 'সর্বাধুনিক' অবতার রামকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী পূর্ববর্তী অবতার রামচন্দ্রের লীলাকাহিনীর তুলনায় অধিকতর বৈচিত্রময়,

অধিকতর ব্যাপক ও গভীর। বাস্তবিক, এটাই ধর্ম-ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে, ভগবান তাঁর পরবর্তী প্রত্যেক অবতারে যুগ-প্রয়োজন অনুযায়ী স্বীয় স্বরূপ ও মহিমা 'সমধিক' অভিব্যক্ত করেন।[৯৬] সেই ঐতিহ্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 'সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাব-সমন্বিত, সর্ববিদ্যা-সহায় যুগাবতার-রূপ' প্রকাশ করেছিলেন।[৯৭] যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনী সম্পর্কেও ঐ সত্যটি একই-ভাবে প্রযোজ্য। সম্ভবত ঐ অর্থেই অসাম্প্রদায়িকতার প্রতিমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দ বলতেনঃ শ্রীমা সীতা, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া- 'এ'দের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন!'[৯৮] একটি কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। দেখা গিয়েছে, রামায়ণের প্রতি শ্রীমার একটি 'বিশেষ' আকর্ষণ ছিল। মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, এমনকি কথামৃত, স্বামীজীর বই-ও তাঁকে অপর কেউ পড়ে শোনাতেন। কিন্তু রামায়ণ তিনি নিজেই পড়তেন এবং বিশেষ করে 'উদ্বোধনে' থাকার সময় 'রামায়ণ পাঠেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত'।[৯৯] রামায়ণের প্রতি তাঁর এই বিশেষ আকর্ষণটি তাৎপর্যময়।

শ্রীমা কখনও কখনও নিজের সম্পর্কে এমন কিছু কিছু উক্তি করেছেন যেগুলিতে তিনি তাঁর সীতারূপের পরোক্ষভাবে আভাস দিয়েছেন। একদিন শ্রীমার হাত 'পাগলীমামী'র পায়ে ঠেকে যাওয়ায় মামী অত্যন্ত অস্থির হয়ে বলে উঠলেনঃ 'কেন তুমি আমার পায়ে হাত দিলে? আমার কি হবে গো!' তাঁর ঐ আতঙ্কের ভাব দেখে শ্রীমা হেসেই আকুল। শ্রীমার সেবক রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) কাছে ছিলেন। তিনি বললেনঃ 'মা, দেখেছ, এদিকে পাগলী তোমাকে এত গালাগাল করে, মারতে আসে, কিন্তু তোমার হাত তার পায়ে লেগেছে বলে তো খুব ভয়।' শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'বাবা, রাবণ কি জানতো না যে রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, সীতা আদ্যা শক্তি জগন্মাতা—তবুও ঐ করতে এসেছিল! ও (পাগলী) কি আমাকে জানে না! সব জানে, তবু এই করতে এসেছে!'[১০০] মায়ের ভাই (প্রসন্নমামা) একদিন তাঁকে বলেনঃ 'এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমাকে এবার যেভাবে পেয়েছি, এইভাবে জন্মে জন্মে পাই, অন্য আর কিছুই চাইনে।' মা শুনে বলেনঃ 'তোদের ঘরে আর? এই যা হয়ে গেল। রাম বলেছিল, "মরে যেন আর না জন্মাই কৌশল্যার উদরে।" আরও তোদের মধ্যে? বাবা পরম রামভক্ত ছিলেন...তাই এ ঘরে জন্মেছি।'[১০১] এও তাঁর সীতারূপের অস্পষ্ট স্বীকৃতি কিনা কে জানে? ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে অথবা কথাপ্রসঙ্গে এরকম অস্পষ্ট স্বীকৃতির আরও দৃষ্টান্ত আছে। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ '১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কোয়ালপাড়ায় নবাসনের বউ-এর বৃদ্ধা মাতার চিকিৎসার জন্য শ্রীমায়ের আদেশে আরামবাগ হইতে ডাক্তার প্রভাকরবাবুকে লইয়া ব্রহ্মচারী বরদা সেখানে আসিতেছেন। আরামবাগের মণীন্দ্রবাবুও ইঁহাদের সঙ্গে গরুর গাড়িতে চলিয়াছেন। দ্বিপ্রহরের

রৌদ্রে সকলেরই পিপাসা পাইল; তাই মণীন্দ্রবাবু ব্রহ্মচারীকে অনুরোধ করিলেন, গ্রাম হইতে কিছু শাঁখ-আলু ও শসা সংগ্রহ করিতে। অনেক ঘুরিয়াও তিনি ঐসব না পাইয়া পথের ধারের এক গাছ হইতে প্রচুর কাঁচা আম পাড়িয়া আনিলেন। সেগুলি এত টক যে, পল্লীগ্রামের লোক ভিন্ন অপরে খাইতে পারে না। মণীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাঁখ-আলু কই?" ব্রহ্মচারী রহস্য করিয়া বলিলেন, "গ্রামে অনেক ঘুরেও যখন শসা বা শাঁখ-আলু পাওয়া গেল না, তখন হঠাৎ ত্রেতাযুগের কথা মনে পড়ে গেল, আর ঢিল মেরে আম পেড়ে আনলুম। এখন সকলে খুশীমতো পিপাসা মিটাতে পারেন।" বলাবাহুল্য, বিনা লবণে ঐ ফল তাঁহাদের ভোগে আসিল না। তাঁহারা যথা-সময়ে কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিয়া সব ঘটনাটি শ্রীমায়ের নিকট বিবৃত করিলে মা স্মিত-মুখে বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, 'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।' ওরা না হলে আমার এসব কাজ চলে কই? এদের ভরসাতেই রাধুর এই অবস্থায় জঙ্গলে বিপদের মধ্যে পড়ে আছি।"[২০২] কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক—'ত্রেতাযুগের কথা'টি কি? বাল্মীকি রামায়ণে এ-বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া না গেলেও কৃত্তিবাস একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যাতে পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তি হতে পারে। লঙ্কায় অশোকবনে সীতা বন্দিনী হয়ে আছেন। হনুমান তাঁর খোঁজে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সীতার কাছে পরিচয় ও লঙ্কায় আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। সীতা খুশী হয়ে তখন বললেনঃ

সীতা কহে, এলে হনু লঙ্ঘিয়া সাগরে।
কি দিবে অনাথা সীতা খাইতে তোমারে॥
সরমা পাঁচটি আম্র দিয়াছে আমায়।
তুমি বাছা লয়ে যাও, দিলাম তোমায়॥
সেই পঞ্চ ফল হনু লয়ে যাও তুমি।
তিলেক বিলম্ব কর, দিই বাপু আমি॥
এক আম্র দিবে রামের চরণ-কমলে।
দুটি আম্র দিবে বাছা বানর সকলে॥
এক আম্র দিবে মোর লক্ষ্মণ-দেবরে।
শত শত আশীর্বাদ জানাবে তাহারে॥
এক আম্র আছে বাছা পবন-কুমার।
ইহার অর্দ্ধেক ভাগ সুগ্রীব রাজার॥
অবশিষ্ট অর্ধভাগ খেও বাছা তুমি।
একে একে ফল বাছা বেঁটে দিনু আমি॥

* * *

সীতা বলিলেন, বাছা হইল স্মরণ।
অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ॥
হাত পাতি লয় বীর পরম-কৌতুকে।
অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে॥

অমৃত-সমান সেই অমৃতের ফল।
ফল খেয়ে হনুমান হইল বিকল॥
হনুমান কহে ওগো জননী জানকী।
অমৃত-সমান ফল আরও আছে নাকি॥
কোথায় তাহার গাছ, কহ মা বিধান।
খাইব এমন ফল, দেখ বিদ্যমান॥
* * *
দেখান অঙ্গুলি দিয়া সীতা সেই বন।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবন-নন্দন॥
জাল দড়া দিয়া বান্ধা আছে চারি পাশ।
তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস॥
খাইতে না পায় পক্ষী, রাক্ষসেরা রাখে।
ধীরে ধীরে হনুমান সেই ফল দেখে॥
নেউল-প্রমাণ হয়ে বৃক্ষডালে আছে।
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে॥
ফল রাখে হনুমান ডালে ডালে পাড়ি।
দেখিয়া রাক্ষস সব হেসে গড়াগড়ি॥
রাক্ষসেরা বলে, এ বানর নাহি মারি।
রাখুক বানর ফল, নিদ্রা আগে সারি॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় রাক্ষস সকল।
পবন-নন্দন বীর খায় সব ফল॥
ফল ফুল খায় বীর, ছিঁড়ে আর পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ, কোথা বৃক্ষ-লতা॥ [১০৩]

কৃত্তিবাসের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে 'ত্রেতাযুগের কথা' প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের স্নেহসিক্ত মন্তব্য 'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার' তাঁর সীতারূপের অঙ্গীকারেরই পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে।

শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের দিন রাসবিহারী মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে, তুমি কি বল?' শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'হ্যাঁ, তিনি আমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।' রাসবিহারী মহারাজ অতঃপর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেনঃ '"আমার" বলায় আমি বলিলাম, "তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন। আমি সেভাবে জিজ্ঞাসা করছি না।"

মা—হ্যাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামী-ভাবেও, এমনি ভাবেও।

তখন আমার মনে হইল, তিনি [অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ] পূর্ণব্রহ্ম হইলে মা জগদম্বা স্বয়ং—যেমন সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন। আমিও এই বিশ্বাস লইয়াই মাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। [অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, শ্রীমা স্বয়ং ভগবতী, শ্রীরাম-কৃষ্ণ রাম, শ্রীমা সীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণ, শ্রীমা রাধা—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস] জিজ্ঞাসা

১০৩। কৃত্তিবাস-রামায়ণ, সুন্দর-কাণ্ড

করিলাম, "তবে যে তোমাকে এই দেখছি যেন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো বসে রুটি বেলছ, এসব কি? মায়া, না কি!"

মা—মায়া বইকি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।

বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "ভগবান নরলীলা করতে ভালবাসেন কি-না। শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে ছিলেন। রাম দশরথের বেটা।"

আমি—তোমার কি আপনার স্বরূপ মনে পড়ে না?

মা—হ্যাঁ, এক একবার মনে পড়ে; তখন ভাবি, এ কি করছি, এ কি করছি! আবার এইসব বাড়িঘর, ছেলে-পিলে (হাত চিৎ করিয়া সামনের সব দেখাইয়া) মনে আসে ও ভুলে যাই।' [১০৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা যে আসলে নারায়ণ ও লক্ষ্মী—নরলীলায় পূর্ব পূর্ব কালে রাম ও সীতা, কৃষ্ণ ও রাধা, এবং বর্তমানে রামকৃষ্ণ ও সারদা—শ্রীমার উপরোক্ত আলাপচারীতে সেই সংকেতটি পেতে অসুবিধা হয় না। রাসবিহারী মহারাজকে শ্রীমা সেদিন বলেছিলেনঃ 'বাবা, তোমার সঙ্গে আমার যেমন খোলাখুলি কথা হয়েছে এমন আর কারও সঙ্গে হয়নি।' [১০৫] শ্রীমার এই মন্তব্যটিও এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

স্বামী গম্ভীরানন্দ যথার্থই লিখেছেনঃ 'এই পরিচয় দেওয়া ও না দেওয়া লইয়াই তাঁহার জীবন।' [১০৬]

সীতা ও সারদাঃ 'রূপান্তর মাত্র কিন্তু গুণান্তর নয়'

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে পুঁথিকার লিখেছেনঃ

সেই রাম সেই কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ-সাজে।
লীলান্তরে রূপান্তর আপনার কাজে॥
রূপান্তর মাত্র কিন্তু গুণান্তর নয়।
রামকৃষ্ণ মহালীলা তার পরিচয়॥ [১০৭]

রাম থেকে রামকৃষ্ণ—মাঝে কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্য—শুধু রূপের পরিবর্তন, শুধু দেহ থেকে দেহান্তর; কিন্তু গুণের অর্থাৎ জীবন ও চরিত্রের কোন পরিবর্তন নেই। একই ব্যক্তি কখনও নৃপতির ভূমিকায়, কখনও সমরকুশল যোদ্ধার, কখনও সন্ন্যাসীর, কখনও বা 'নিরক্ষর' দরিদ্র পুরোহিতের। যুগের প্রয়োজনে শুধু ভূমিকার পরিবর্তন এবং ভূমিকা অনুযায়ী 'সজ্জা'র। গুণের দিক দিয়ে তাঁরা সকলেই একই ধাতুতে গড়া। চরিত্রের ঐশ্বর্যে তাঁদের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। একই গুণাবলী 'সমভাবে' তাঁদের মধ্যে 'বিরাজিত'—'ঐশ্বর্যবানেতে যেন তেন নিরৈশ্বর্যে।' [১০৮] ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, সাহস, প্রেম, পবিত্রতা ও প্রজ্ঞার তাঁরা প্রত্যেকেই পরাকাষ্ঠা। যেমন অবতারের ক্ষেত্রে তেমনই অবতার-সঙ্গিনীদের ক্ষেত্রেও ঐ একই ধারা। সীতা, রাধা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সারদা—

প্রত্যেকেই যেন পরস্পরের অবিকল প্রতিরূপ। এঁদের সকলের জীবন ও চরিত্র যেন একই সুরে বাঁধা। ত্যাগ ও তিতিক্ষার তাঁরা জীবন্ত প্রতিমা, প্রিয়তমের প্রতি আত্ম-নিবেদনের তাঁরা জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনে সীতা ও সারদার মধ্যে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ। সীতার তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা ও পতিপরায়ণতা ভারতবর্ষের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর কাছে স্মরণাতীতকাল থেকে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তিনি এই গুণগুলির প্রতীকস্বরূপা। আধুনিককালে ভারতবর্ষ তার চির-গৌরবের সেই সনাতনী নারী-মূর্তি সারদার মধ্যে পুনর্বার প্রত্যক্ষ করেছে। শ্রীমার আকৃতির মধ্যেও বোধহয় ভারতবাসীর কল্পনায় আঁকা সীতার আকৃতির সাদৃশ্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভক্তদের মধ্যে অন্যতম এবং শ্রীমার 'জয়া'–উচ্চকোটির অধ্যাত্ম-সাধিকা যোগীন-মার উক্তি থেকে তা জানা যায়। যোগীন-মা বলতেন: 'মা সেসময় দক্ষিণেশ্বরে নবতে সীতে ঠাকরুনের মতো থাকতেন। পরনে কস্তাপেড়ে চওড়া লাল শাড়ী। সিঁথেয় সিঁদুর। কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় পা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। গলায় সোনার কণ্ঠি-হার। নাকে মস্ত বড় নথ। কানে মাকড়ি। হাতে চুড়ি (যে চুড়ি মথুরবাবু ঠাকুরকে মধুরভাব-সাধনের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন)। তাঁকে দর্শন করে, তাঁর কাছে থেকে বড় আনন্দ হত।' [১০৯]

বাল্মীকির সীতা স্বয়ংবরা হয়েছিলেন। সারদাও তা-ই। 'বিবাহ' শব্দের তাৎপর্য-বোধরহিত ক্ষুদ্র বালিকা সারদা যখন শিহড়ে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে (মতান্তরে ঐ গ্রামের 'শান্তিনাথ শিবমন্দির' প্রাঙ্গণে) এক সঙ্গীতের আসরে অদূরে উপবিষ্ট অপরিচিত যুবক গদাধরকে দু-হাত তুলে নিজের পতি হিসাবে নির্দেশ করেছিলেন [১১০] তখন সেখানে সমবেতদের মধ্যে কেউ কি জানত যে শিশু সারদা তার জন্ম-জন্মান্তরের পতিকে চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি? ভক্তের দৃষ্টিতে শিশু-সারদার সেদিন দু-হাত তুলে গদাধরকে দেখানো তাঁর বরমাল্য-দানের মুদ্রাকেই সূচিত করেছিল। [১১১] সুতরাং সেদিনের সেই সঙ্গীতের আসরটিকে যদি ধরে নেওয়া হয় আত্মীয়স্বজন-পরিবৃতা সারদার স্বয়ংবর-সভা, তাহলে তাঁর এই মাল্যদান-মুদ্রাটি কি গভীর ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে না? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজর্ষি জনকের প্রাসাদ থেকে সখী-পরিবৃতা সীতা যখন রামচন্দ্রকে প্রথম দর্শন করেন তখনই তিনি তাঁকে মনে মনে পতিরূপে নির্বাচন করেন। [১১২] বিবাহকালে সীতার বয়স ছিল ছয় বছর। [১১৩] সারদারও তা-ই। [১১৪] এই সমস্ত কারণে ভক্তরা বিশ্বাস করেন: 'শিহড়ের সেই ঘটনাটি একটি "কৌতুকাবহ ঘটনা" মাত্র নয়, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সেই ত্রেতাযুগে পতিনির্বাচনের অগ্রাধিকার নিয়েছিলেন যে-সীতা এবারও সেই সীতাই সারদারূপে নিলেন সেই অধিকার একটি মধুর ইঙ্গিতে।' [১১৫]

পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনগমন। তিনি বলেছিলেন সেটাই তাঁর প্রকৃত কর্তব্য, তাঁর সত্যব্রত। সেই সত্যব্রতে সীতা হয়েছিলেন রামচন্দ্রের অকম্পিত সহযাত্রিণী। তাঁকে বনবাসের দুঃখকষ্ট, বিপদের কথা বলে নিরস্ত করতে চাইলে সীতা রামচন্দ্রকে সগর্বে বলেছিলেনঃ

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্॥[১১১]

—দ্যুমৎসেনের পুত্র বীর সত্যবানের অনুব্রতা সাবিত্রীর মতো আমাকে তোমার একান্ত অনুগামিনী জানবে। অর্থাৎ আমি তোমার সত্যব্রতে সহযাত্রিণী হব। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমায়ের দ্ব্যর্থহীন নিষ্কম্প উত্তরঃ '[আমি] তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'[১১৭] সীতা যেমন স্বামীর সত্যব্রতকে গ্রহণ করে বনবাসের অশেষ দুঃখকষ্টকে বরণ করেছিলেন, সারদাও তেমনি স্বামীর ইষ্টপথে সাহায্যের অঙ্গীকার করে নহবতে আক্ষরিকভাবেই 'বনবাসে'র জীবনই যাপন করেছেন দীর্ঘ বারো বছর।[১১৮] গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটীতে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বনবাসিনী সীতা আর গঙ্গাতীরে আর এক 'পঞ্চবটী'র কাছে নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্বেচ্ছা-নির্বাসিতার জীবন সারদার! মায়ের নিজের কথায় সেই জীবনের একটা চিত্র পাওয়া যায়ঃ 'নবতে যে কি করে কাটিয়েছি, তা কে বুঝবে! নটীর মা [শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী], মেয়ে যোগেন, গোলাপ, যে যে দেখেছে, সব্বাই বলত, "মা, এইটুকু ঘরে কি করে থাক?" ঘর তো দেখেছ?—ঐটুকু ঘরে মাথার ওপরে সব শিকে ঝুলছে—গেরস্তঘরে মানুষের যা যা দরকার—মসলা-টসলা সব—এমনকি ঠাকুরের জন্যে মাছ পর্যন্ত জিয়োনো আছে, সিধে হয়ে দাঁড়াবার যো ছিল না—দাঁড়াতে গেলেই মাথায় লাগতো—মাথাটা আমার লেগে লেগে ফুলে গিয়েছিল। মেঝেয় আবার চাল, ডাল, হাঁড়িকুঁড়ি, শিল, নোড়া, চাকি, বেলুন, উনুন, সবই আছে—বাকি কতটুকুই বা

জায়গা থাকে—তাতেই উঠতুম বসতুম, আবার কোন মেয়েকে ঠাকুর যদি বললেন থাকতে—সেও আমার সঙ্গে সেইটুকুর ভেতর শুতো, হয়তো তাকে শুইয়ে আমায় বসে রাত কাটাতে হয়েছে!'[১১৯] ঘরটির দরজা এত ছোট যে, সোজা হয়ে ঘরে ঢোকা বা সেখান থেকে বেরুবার উপায় ছিল না। কতবার মায়ের মাথা ঠুকে যেত, কেটেও গিয়েছিল একবার।[১২০]

শ্রীমায়ের এই স্বল্পপরিসর আলো-বাতাসহীন কক্ষটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন 'খাঁচা'।[১২১] যেসব মহিলা-ভক্ত ঠাকুরের কাছে আসতেন তাঁরা শ্রীমায়ের ঐ ঘর এবং তাঁর সেখানে থাকার কষ্ট দেখে আক্ষেপ করে বলতেনঃ 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা-লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!'[১২২] সীতার বনবাসকালে বনবাসের অসংখ্য দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটি পরম আনন্দও ছিল। তিনি স্বামীকে বড় কাছে পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন পরম একান্তভাবে। আর এখানে মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানে রয়েছেন স্বামী—সারদার আরাধ্য দেবতা। কিন্তু তাঁর কাছে স্বামী-দর্শন একটি দুর্লভ ব্যাপার। এত কাছে, তবু কত দূরে! শ্রীমা বলছেনঃ 'তখন কী দিনই গেছে। দিনান্তে হয়তো একবার ঝাউতলায় যেতে ঠাকুরকে দেখতে পেতুম, নয়তো নয়!—তা-ও দূর থেকে। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকতুম।'[১২৩] নহবতের বারান্দায় যে চিকের আড়াল ছিল তার মধ্যে ফুটো করে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর ঘরে বা বারান্দায় এক ঝলক দেখার চেষ্টা করতেন সারদা। ঐভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর পায়ে বাত ধরে গিয়েছিল।[১২৪] নহবতের সেই বাত-যন্ত্রণা তাঁকে সারাজীবন বহন করতে হয়েছে। স্বামীকে কাছে পাওয়া তো দূরের কথা, এক ঝলক দেখা—তা-ও হয় না সারদার। প্রাণ আটুপাটু করে তাঁর। কত ভক্ত আসছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে! পুরুষ-ভক্তের সংখ্যা অধিক হলেও মহিলা-ভক্তরাও আসেন। তাঁরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেন, শোনেন তাঁর অমৃতকথা। কিন্তু মানুষটির উপর দাবি সকলের চেয়ে যাঁর বেশী, তাঁর সঙ্গে যাঁর সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক সেই সারদার কথা কারও খেয়াল থাকে না। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরও ছিল কি? অথচ শ্রীমা নিজের জন্য স্বামীর সেবাধিকার ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কখনও কিছু চাননি। আর ঐ সেবার বাসনাও তিনি মুখ ফুটে তাঁর কাছে কখনও প্রকাশ করেননি; অন্তরের অন্তস্তলে তা গোপন রেখে সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করেই নীরবে দিন কাটিয়েছেন। সাধারণত সারাদিনে সামান্য সময়ের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি সাক্ষাতের সুযোগ পেতেন। তা হল খাবার সময় পাশে বসে ভুলিয়ে-ভালিয়ে 'শিশু ভোলানাথ'কে খাওয়ানো। কিন্তু এমন কতদিন হয়েছে যে, সেই সামান্য দর্শনের সুযোগটুকু থেকেও অতি উৎসাহী কোন মহিলা-ভক্ত তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। তবু তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হননি বা অন্যের উপর দোষারোপ করেননি! কারও বিরুদ্ধে কখনও কোন অভিযোগ করেননি। তাঁর সেসময়ের মনোভাব প্রসঙ্গে তিনি বলতেনঃ 'কখনও কখনও দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, "মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি!"'[১২৫] কোন অভিযোগ, কোন অভিমানের লেশমাত্রও নেই! শ্রীরাম-

কৃষ্ণের উপর তাঁর যে অন্য কারও চেয়ে বেশী দাবি আছে তা তাঁর চিন্তাতেই আসত না। পরবর্তীকালে নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'তাঁকে জানে না এমন কারো পক্ষে তাঁর কথাবার্তা থেকে কোনোমতে অনুমান করা সম্ভব নয় যে, চারপাশের অন্য কারো থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে তাঁর দাবি অধিকতর বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর!'[১২৬] অরণ্যবাসকালে সীতাকে কখনও বিষণ্ণ দেখা যায়নি। নহবতে (এবং পরে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে) থাকার সময় শত অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রীমা বলেছেনঃ '[তখন] কী আনন্দই ছিল!'[১২৭] বলতেনঃ হৃদয়-মধ্যে 'আনন্দের পূর্ণঘট' যেন বসানো ছিল তখন।[১২৮]

স্বামীকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন সীতা। স্বামীর কাছে তিনিও ছিলেন প্রাণের চেয়েও প্রিয়। কিন্তু সেই স্বামীর কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশী আঘাত এবং অসম্মান পেতে হয়েছে তাঁকে। সারদা যদিও এদিক দিয়ে সীতার চেয়ে ভাগ্যবতী ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনেও দু-একটি ঘটনা আছে যেগুলিতে তাঁর প্রতি শ্রীরাম-কৃষ্ণের আচরণ তাঁর জীবনী-পাঠকদের মনকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। এক-বার শ্রীমা তাঁর মা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতির সঙ্গে জয়রামবাটী থেকে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কিত ভাগ্নে হৃদয় তাঁদের সঙ্গে সেবার চরম দুর্ব্যবহার করেন। যাওয়ামাত্রই হৃদয় বলেনঃ 'কেন এসেছে? কি জন্য এসেছে? এখানে কি?' এসব যে শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন না তা নয়। কিন্তু হৃদয়কে তিনি ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। অথচ শ্রীমাকে কটু কথা বলার জন্য হৃদয়কে কঠোর ভর্ৎসনা যে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও করেননি তা নয়। মেয়ের অপমানে শ্রীমায়ের মা বললেনঃ 'চল, ফিরে দেশে যাই; এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?' সুতরাং দক্ষিণেশ্বর থেকে সেদিনই চলে যেতে হল তাঁদের। রামলালদাদা পারের নৌকা এনে দিলেন। শ্রীমা কিন্তু আগাগোড়া নীরবেই সব সহ্য করেছিলেন। মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে শ্রীমাকে সেবার বিদায় নিতে হল। শুধু কি বেদনা? অপমানও কি কম হয়েছিল তাঁর, তাঁর মায়ের? কিন্তু এই বেদনার জন্য, এই অপমানের জন্য কারও বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ বা অভিমান ছিল না তাঁর। যাবার সময় মা-ভবতারিণীর কাছে বলেছিলেনঃ 'মা, যদি কোনদিন আনাও তো আসব।'[১২৯] পরবর্তীকালেও যখন এ নিয়ে কথা উঠেছে তখনও কোন অনুযোগ ফুটে ওঠেনি তাঁর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণের উদাসীনতা সম্পর্কে। না, হৃদয়ের রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কেও নয়।

আর একবার জয়রামবাটী থেকে সারদা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তখনকার দিনে জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বর আসতে তিনদিন সময় লাগত। আর কত দুঃসহ কষ্টকর ছিল সেই যাত্রা! পথশ্রমে ক্লান্ত সারদা সবে এসে পৌঁছেছেন দক্ষিণেশ্বরে। প্রাণে ব্যাকুল আগ্রহ এবং আনন্দ স্বামী-সন্দর্শনের। কিন্তু নৌকা থেকে নেমে

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে কাপড়ের পুঁটলিটি রেখে প্রণাম করতেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কবে রওনা হয়েছ?' সারদার উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ 'তুমি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়েছ বলে আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাও যাত্রা বদলে এসোগে।' সেইদিনই ফিরতে চাইলেন সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ 'আজ থাক, কাল যেও।' শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে সারদার মনে তখন কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মুখে সে গভীর ব্যথার কোন প্রকাশ ছিল না তাঁর। নীরবে স্বামীর আদেশ শিরোধার্য করে আবার পরদিনই তিনি যাত্রা বদল করতে জয়রামবাটী ফিরে চললেন। আবার সেই ভয়ানক কষ্ট ও ক্লান্তিকর দীর্ঘ যাত্রা![১৩০]

অথচ শ্রীমার মুখে আমরা সব সময় শুনেছিঃ 'আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম যে তিনি কখনও আমাকে "তুই" পর্যন্ত বলেননি।'[১৩১] কখনও আবার তিনি বলেছেনঃ 'আহা! তিনি আমার সঙ্গে কী ব্যবহারই করতেন! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মতো কিছু বলেননি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেননি।'[১৩২]

সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা সীতা সম্পর্কে রামচন্দ্র চরম অবিচার করেছিলেন। আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষার সাক্ষাৎ প্রতিমা, পতিপ্রাণতার বিগ্রহ সারদার জীবনের এই ঘটনাদুটি স্মরণ করিয়ে দেয় সীতা ও সারদা বেদনা বহনের শক্তিতে পরস্পরের কত কাছাকাছি! সর্বংসহা সারদার অসাধারণ সহিষ্ণুতার কাছে নতমস্তক হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গোলাপ-মাকে তিনি বলেছিলেনঃ 'ওর সহ্যগুণ কত! ওকে নমস্কার।'[১৩৩]

সীতা ছিলেন 'রামময়জীবিতা'। সারদাও ছিলেন রামকৃষ্ণময়জীবিতা। সীতা ছিলেন রামগতপ্রাণা, সারদাও ছিলেন 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা'। অশোকবনে হনুমানের মুখে রামচন্দ্রের কথা শুনে সীতার কী আনন্দ! সারদারও তা-ই—'তন্নামশ্রবণপ্রিয়া'। সারদার সব কথার মূলে ছিলেন রামকৃষ্ণ, সব কাজের কেন্দ্রে ছিলেন রামকৃষ্ণ, সব ভাবনার উৎসে ছিলেন রামকৃষ্ণ। বলতেনঃ 'আমি কি…? ঠাকুরই সব।'[১৩৪] একবার একজন সন্তানকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'কেমন আছ?' সন্তানটি বলেনঃ 'আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি।' বিরক্ত হয়ে শ্রীমা বলেনঃ 'সব কথায় আমাকে যোগ দাও কেন? ঠাকুরের নাম বলতে পার না? যা-কিছু দেখছ সবই ঠাকুরের।'[১৩৫] জনৈক সেবক একবার তাঁকে বলেছিলেনঃ 'ঠাকুর আর আপনি তো এক।' সঙ্গে সঙ্গে সেবককে বাধা দিয়ে শ্রীমা বলেনঃ 'ছিঃ, ওকথা বলতে আছে, বোকা ছেলে? আমি যে তাঁর দাসী।'[১৩৬] শ্রীমার শেষ অসুখের সময় একদিন জনৈকা প্রাচীন স্ত্রীভক্ত তাঁকে 'তুমি জগদম্বা, তুমিই সব' ইত্যাদি বলছিলেন। শুনেই মা রুক্ষস্বরে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধমক দিলেনঃ 'যাও, যাও,

"জগদম্বা"! তিনি দয়া করে পায়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে বর্তে গেছি। "তুমি জগদম্বা! তুমি হেন!"—বেরোও এখান থেকে।'[১৩৭] তিনি নিজে যেন কিছু না, শ্রীরামকৃষ্ণই সব। এ-ই ছিল তাঁর প্রাণের ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণকে সামনে রেখে তিনি চাইতেন সব সময় তাঁর আড়ালে থাকতে। আর এই আবরণকে তিনি তাঁর আভরণ বলে মনে করতেন। একজনকে বলেছিলেনঃ 'আমি কি, মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল (হাতজোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন)—আমার "আমিত্ব" যেন না আসে।'[১৩৮] বাস্তবিক, শ্রীমা নিজেকে একেবারে মুছে ফেলে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে লীন করে দিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথমদিকে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'তুমি কে?' শ্রীমা বললেনঃ 'আমি তোমার সেবা করতে আছি।' শ্রীরামকৃষ্ণ যেন শুনতে পাননি। বললেনঃ 'কি?' শ্রীমা বললেনঃ 'আমি তোমার সেবা করতে আছি।' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিপ্রশ্ন করলেনঃ 'তুমি আমা বই আর কাউকে জান না?' সারদার সরল অকপট উত্তরঃ 'না, তিন সত্য!'[১৩৯] প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণা-সূত্রে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা তাঁকে কখনও কখনও এমনই আবিষ্ট করত যে, ঐ আবেশের সময় তাঁর ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ সব 'হুবহু' শ্রীরামকৃষ্ণের মতো হয়ে যেত।[১৪০] স্বামীর ভবনায় সারদা ছিলেন এমনই নিমগ্না। এই দিক দিয়ে সারদা যেন সীতাকেও অতিক্রম করেছিলেন। সীতাকে সারদা অতিক্রম করেছিলেন আরও একটি ক্ষেত্রে যেখানে তিনি হয়ে উঠেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববিগ্রহ—'তদ্ভাবরঞ্জিতাকারা'। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কাল মানুষের কাছে তিনিই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিরূপ ও জীবন্ত ব্যাখ্যা—তাঁর সার্থক লীলাসঙ্গিনী।

শুধু এক্ষেত্রেই নয়, স্বামীর প্রতি ভালবাসায়, স্বামীর প্রতি নিঃশেষ আত্ম-বিলুপ্তিতেও সারদা ছিলেন তুলনাহীনা। নিবেদিতার সন্ধানী অন্তর্দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল। নেল হ্যামন্ডকে একটি চিঠিতে (৩ মার্চ ১৮৯৯) নিবেদিতা লিখছেনঃ 'তাঁর [শ্রীমার] মতো স্বামীকে পুজো করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি—এমন কাউকে ভাবতে পারো! মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনও কখনও উদিত হবেন—এই লোভ তো থাকতে পারত! না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয়—ইনি তা-ও চাননি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি!'[১৪১]

সীতা ছিলেন পবিত্রতাস্বরূপিণী। রামচন্দ্র বলেছিলেনঃ

অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা।
বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা॥[১৪২]

—সূর্যের প্রভা যেমন সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন, সীতাও তেমনি আমার সঙ্গে অভিন্না। জনকনন্দিনী সীতা ত্রিভুবনে সর্বাপেক্ষা পবিত্রস্বভাবা। শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিশিষ্টা

স্ত্রীভক্ত একদিন গঙ্গাতীরে জপ করার সময় ভাবচক্ষে দেখলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর সম্মুখে এসে বলছেনঃ 'গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র হয়?...ওকে (শ্রীমাকে) তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না। ওকে (আর) একে (নিজেকে দেখিয়ে) অভেদ জানবে।'[১৪৩] বাস্তবিক, শ্রীমায়ের কাছে উপস্থিত হলেই অনুভূত হত যে, তাঁর কাছ থেকে যেন পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর সেই পবিত্রতার স্নিগ্ধ প্রবাহ যেন শরীর ও মনের সব মালিন্যকে ধুয়ে দিচ্ছে। অনেকের মতো তাঁকে দেখে মিস ম্যাকলাউডের হয়েছিল ঐ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা শুধু নিজে অন্তরে অন্তরে অনুভব করা যায়। অপরকে বোঝানো যায় না। মাকে দেখে এসে তাঁর ঘরে ফিরে যাবার পথে থেমে থেমে অস্ফুটস্বরে সেদিন ম্যাকলাউড বার বার বলছিলেনঃ 'আমি তাঁকে দেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি।' হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীকে কাছে দেখে তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললেনঃ 'পবিত্রতাস্বরূপিণী মা! আমি তাঁকে দেখেছি!' তারপর প্রায় অনেকটা পথ ভাবের আবেশেই চললেন হেঁটে—পা টলছে, কোথায় পা পড়ছে হুঁশ নেই। মাঝে মাঝে বলছেনঃ 'মা, মা!—পবিত্রতাস্বরূপিণী মা!'[১৪৪] স্বামীজীর কাছেও মা ছিলেন স্বয়ং পবিত্রতা। মায়ের কাছে যখন স্বামীজী যেতেন তখন তাঁর ভাব ও আচরণ দেখে তা-ই মনে হত।[১৪৫] স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিখ্যাত মাতৃস্তোত্রে বলছেনঃ মায়ের চরিত্র পবিত্র, তাঁর জীবন পবিত্র—তিনি সাক্ষাৎ পবিত্রতাস্বরূপিণী। একদিনের ঘটনা। জয়রামবাটীতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণী রাত নটার সময় এসে বললঃ 'কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।' মা বললেনঃ 'এত রাত্রে স্নান করো না, হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়।' রাঁধুনী বললঃ 'তাতে কি হয়?' মা বললেনঃ 'তবে গঙ্গাজল নাও।' তাতেও তার মন উঠল না। তখন মা বললেনঃ 'তবে আমাকে স্পর্শ কর।'[১৪৬] সাক্ষাৎ পবিত্রতাস্বরূপিণী!

রামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিলেন। রামচন্দ্র জানতেন, সীতা পবিত্রতা-স্বরূপা। এ-সম্পর্কে তাঁর নিজের মনেও বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। অথচ রামচন্দ্রই এই অগ্নিপরীক্ষা ঘটিয়েছিলেন। কেন? ঘটিয়েছিলেন জগতের সামনে সীতার পবিত্রতার স্বরূপ এবং তাঁর মাহাত্ম্য তুলে ধরবার জন্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণও সারদার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিলেন। যদিও অন্যতর ছিল সে পরীক্ষা, তবুও তা অগ্নিপরীক্ষাই। সেও জগতের সামনে পবিত্রতাস্বরূপিণী সারদার মহিমা তুলে ধরবার জন্যে।

পরিপূর্ণভাবে কামজিৎ হয়েছেন কিনা সে-বিষয়ে আচার্য তোতাপুরীর উপদেশ স্মরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নিজের সংযমের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেইসঙ্গে শ্রীমার অগ্নিপরীক্ষারও। পূর্ণযৌবন শ্রীরামকৃষ্ণ নবযৌবনসম্পন্না শ্রীমার সঙ্গে দীর্ঘদিন এক শয্যায় অতিবাহিত করেন। আশ্চর্য তাঁদের এই দিব্য লীলা-বিলাস, যেখানে সামান্যতম কামভাবেরও অস্তিত্ব কদাচ দেখা যায়নি। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃতিত্বের কথাই সকলে স্বীকার করেন। কিন্তু শ্রীমার মহত্ত্ব যে কোন

অংশেই শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে কম ছিল না, বরং বেশীই ছিল, সেকথা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে মুক্তকণ্ঠে বলেছেনঃ 'ও (শ্রীমা) যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে (আমার) সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে?'[১৪৭]

শ্রীশ্রীমাকে দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় যখন মাড়োয়ারী ভক্ত লছমীনারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য দশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে কাঞ্চনজিৎ শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে দেন। কিন্তু এখানেই ঘটনার শেষ নয়। তিনি পরীক্ষা করতে চাইলেন শ্রীশ্রীমাকে। বললেনঃ 'ওগো, এই টাকা দিতে চায়। আমি নিতে পারব না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে। তুমি ওটা নাও না কেন? কি বল?' প্রলোভনের এই অগ্নিপরীক্ষায় অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন শ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেনঃ 'তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ওটাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না করে থাকতে পারব না; ফলে ওটা তোমারই নেওয়া হবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য; কাজেই টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।'[১৪৮]

অগ্নিপরীক্ষার ঘটনায় রামচন্দ্রের মহিমার চেয়ে সীতার মহিমাই উজ্জ্বলতর। এক্ষেত্রেও তা-ই। কাম ও কাঞ্চনের অগ্নিপরীক্ষায় সারদার মহিমাও যেন রামকৃষ্ণের চেয়ে উজ্জ্বলতর। কঠিন পরীক্ষায় অগ্নিস্নান করে অক্ষত দেহে বেরিয়ে এসেছেন পবিত্রতাস্বরূপিণী সারদা।

শ্রীমা জানতেন তিনি সীতা—আজন্মশুদ্ধা, পবিত্রতাস্বরূপিণী। এবং এ-ও জানতেন যে, আগামী সহস্র বছর ভারতবর্ষের নারীকে তাঁর জীবন, তাঁর আদর্শ পথ দেখাবে। কিন্তু সে-আদর্শ বিদ্যুতের আলোকের মতো চোখ-ধাঁধানো নয়, জ্যোৎস্নার আলোকের মতো নির্মল, স্নিগ্ধ, শান্ত—অথচ জীবনের মূল রসকে যা সঞ্জীবিত করে রাখে। ঐ জ্যোৎস্নার মতো জীবনই তাঁর ছিল। জীবনে ঐ জ্যোৎস্নার জন্য তাঁর আকুতি ছিল বরাবরঃ 'জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলেছি, "তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।"'[১৪৯] জ্যোৎস্নার মতো জীবন হবে, কিন্তু চাঁদের কলঙ্কের রেখাটুকুও সেখানে থাকবে না। মা বলছেনঃ 'যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠতো, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম—"চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।"'[১৫০]

সারদার জীবনে, তাঁর মনে কখনও কোন দাগই ছিল না। বস্তুত, যে পবিত্রতার জন্য তিনি প্রার্থনা করতেন সেই পবিত্রতাই ছিল তাঁর স্বরূপ। কিন্তু স্বরূপের জ্ঞান তাঁকে কখনও আত্মসন্তুষ্টি দেয়নি। তাঁর কঠোর অতন্দ্র সাধনার ফলে দক্ষিণেশ্বরের ক্ষুদ্র নহবত ঘর আলো করে তাঁর যে অপার্থিব রূপ ফুটে উঠেছিল সে-রূপ সেই প্রাচীন আর্যকন্যার, সেই সর্বংসহা ধরণীতনয়ার—যাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা, পতিপ্রাণতা,

সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার কাহিনী ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের কাছে শত শত শতাব্দী ধরে একই সঙ্গে কিংবদন্তী এবং বাস্তবতা। সে-রূপ একালের সারদার—যিনি প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই বিপরীত মেরুর দুই প্রান্তকে স্পর্শ করে মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে আছেন ঐ গুণগুলির প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে। যেমন সীতার, তেমনি সারদার—উভয়ের জীবন ভারতবর্ষের গৃহাশ্রমের এক অপরূপ কাব্য। ভারত-বর্ষের শত-সহস্র বছরের গার্হস্থ্য-জীবনের 'প্রীতি-সমুদ্রের উচ্ছলিত লীলা' সেখানে বাস্তবায়িত। এই দুটি জীবন-কাহিনীতে 'হিন্দুগৃহের পবিত্র প্রেমের চরমকথা উচ্চারিত হইয়াছে, অথচ আধুনিক হিন্দুগৃহের কাপুরুষতা ও ভীরুতা উহাকে স্পর্শ করে নাই'।[১১১]

সারদাদেবীর দেহান্তের সংবাদ পেয়ে মিস ম্যাকলাউড স্বামী সারদানন্দকে একটি চিঠি লিখেছিলেন (১৫ আগস্ট ১৯২০)। সেখানে তিনি লিখেছিলেনঃ 'সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল। আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ!'[১১২]

সে আদর্শ সীতার। শুচিস্মিতা সীতার জীবন ভারতবর্ষের নারীর চিরন্তন আদর্শ। আধুনিক ভারতবর্ষে তা পুনরায় দেখানোর প্রয়োজন ছিল। তাই সারদার আবির্ভাব।

'রামায়ণী কথা'র বিখ্যাত লেখক দীনেশচন্দ্র সেন সীতা-চরিত্রের আলোচনার উপসংহারে লিখেছেনঃ 'সীতার কাহিনী, দুঃখ পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী। এই সতীচিত্র বাল্মীকি চিরজীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল আলেখ্য হিন্দুস্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত। অলক্ষিতভাবে সীতার সতীত্ব হিন্দুস্থানের পত্নীকুলের মধ্যে অপূর্ব সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালিকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। নূতন সভ্যতার স্রোতে নূতন বিলাসকলাময় চিত্র দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী ও অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন না হই। এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ—তাহার পুনরুদ্দীপন কর, আবার ঘরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি ভারতবাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্যে, তুমি তাঁহাদিগের কঠোর সহিষ্ণুতায়, প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও পবিত্র আত্মসমর্পণের মধ্যে বিরাজ কর। তোমার সুকোমল অলক্তকরাগ-রঞ্জিত পাদযুগ্মের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত—তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান। আমাদিগের নানা দুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া অলক্ষ্যে ভাসিয়া বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া আমাদের স্বল্প খাদ্য ও ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে।'[১১৩]

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছেন। প্রার্থনা করেছিলেন সীতার পুনরাবির্ভাবের। কিন্তু তিনি অবহিত ছিলেন না যে, ভারতবর্ষ তথা জগতের কল্যাণের জন্যে ইতিপূর্বেই তিনি পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন।

রাধারূপিণী

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষ অবতারবাদে বিশ্বাসী। ভগবান গীতায় বলেছেনঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥[১]

—যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই ভগবান আসেন। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। গীতাতে আরও বলা হয়েছেঃ যিনি অজ, অবিকারী তিনি আত্মমায়ার দ্বারা আবির্ভূত হন (সম্ভবামি আত্মমায়য়া)[২]। যিনি আবির্ভূত হন তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম নন, সগুণ ঈশ্বর ; মায়ালেশবিনির্মুক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের অবতরণ সম্ভব নয়। গীতার এই অবতরণ-তত্ত্বে স্বয়ং ভগবানের অবতরণের কথাই আছে, 'শক্তি'র অবতরণের কথা নেই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখছি দেবীর আশ্বাসবাণীঃ

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥[৩]

—এইরূপে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন বিঘ্ন উপস্থিত হবে, আমি তখনই আবির্ভূত হয়ে শত্রু বিনাশ করব। গীতা ও চণ্ডীর বাণী একত্রে পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারিঃ যখন ভগবান আসেন তখন শক্তিও আসেন। সশক্তিক ভগবানই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে যুগধর্মে আস্থাবান করে তোলেন। সেইজন্যই দেখি, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে এসেছিলেন সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকা, বুদ্ধদেবের সঙ্গে যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীমা একসময় বলেছিলেনঃ 'বার বার আসা—এর কি নিস্তার নেই? যেখানে শিব, সেখানেই শক্তি—শিব শক্তি একত্তরে, বার বার সেই শিব, সেই শক্তি। নিস্তার নেই।'[৪] অর্ধবাহ্যদশায় কতকটা স্বগতোক্তির মতো শ্রীমা আরও অনেক কথা সেদিন বলেছিলেন, যার মর্মার্থঃ জীবের যন্ত্রণা দূর করতে একই ভগবানকে বার বার আসতে হয়—যেমন 'একই চাঁদ রোজ রোজ।'[৫] যখনই ভগবান আসেন ভগবতীও আসেন, 'ঠাকুর' যখনই আসেন 'শ্রীমা'ও আসেন। জীবের যন্ত্রণা, ঠাকুরেরই যন্ত্রণা, শ্রীমারও যন্ত্রণা। তাই জীবনপণ করে তাঁকেও চেষ্টা করতে হয় জীবের যন্ত্রণা ঘোচাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সুস্পষ্টভাবে বলেছেনঃ 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই এ দেহে রামকৃষ্ণ।'[৬]

সারদাদেবীকে তিনি নিজের 'শক্তি' হিসেবেও ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ভারতীয় চিন্তার ধারা অনুসারে আমরা বলতে পারিঃ রাম অবতারে যিনি ছিলেন সীতা, কৃষ্ণ অবতারে যিনি শ্রীরাধিকা, ইদানীং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ-'শক্তি' সারদাদেবী।

॥ ২ ॥

সারদাদেবীর রাধারূপ ধরা পড়েছে নানা উপলক্ষে নানা জনের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে সীতা, সরস্বতী, আদ্যা শক্তি, ভবতারিণী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে যেমন চিনেছেন, তেমনি উপলব্ধি করেছেন রাধারূপেও। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্ত্যলীলার দিনগুলিতে প্রায়ই সারদামণিকে তাঁর স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দিতেন, লোকের দায় বহন করার ভারার্পণ করতেন এবং ভক্তদের শ্রীমায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করার উপদেশ দিয়ে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করার সুযোগ দিতেন। একদিন তিনি সারদাপ্রসন্নকে [স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে] মন্ত্র গ্রহণের জন্য নহবতে মায়ের কাছে পাঠাবার সময় তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বলেছিলেনঃ

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥[৭]

এই উক্তির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সারদাদেবীর উপস্থিতিতেই গৌরী-মাকে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'বল্ তো গৌর-দাসী, তুই কাকে বেশী ভালবাসিস ?' রঙ্গময়ী গৌরী-মা উত্তরে গান গেয়ে উঠলেনঃ

রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী!
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল, 'রাই কিশোরী'।

গান শুনে শ্রীমা লজ্জায় গৌরী-মার হাত চেপে ধরলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ? হাসতে হাসতে তিনি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।[৮] পরিষ্কার বোঝা গেল, গৌরী-মার সঙ্গে তাঁর কোন মতপার্থক্য নেই। শ্রীমাকে একই সঙ্গে তিনি রাধা এবং নিজের থেকে শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকার করে নিলেন।

দুর্গাপুরীদেবী 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে শ্রীমা সারদাদেবীর রাধারূপের একটি চমৎকার ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ 'গড়পার অঞ্চলে শীতলামাতার এক পূজারী ব্রাহ্মণ গৌরী-মাকে অতিশয় ভক্তি-বিশ্বাস করিতেন। মায়ের পূজারী হইলেও তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। একদিন গৌরী-মার নিকট প্রস্তাব করিলেন, "মাগো, বৃন্দাবনধামে গিয়ে ব্রজেশ্বরী রাধারানীকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। তোমার সঙ্গে একবার গিয়ে দেখব।" গৌরী-মা উত্তর দিলেন, "তা আর এমন কি? আচ্ছা, তোমায় একদিন জ্যান্ত রাধারানী দেখিয়ে আনব।" পূজারী ইঙ্গিতটা বুঝিলেন না, প্রতীক্ষায় থাকেন সেই সুদিনের। গৌরী-মা আসিয়া মাকে বলিলেন, "শেতলার বামুনকে বলে এসেছি মা, সে একদিন জ্যান্ত রাধারানীকে দেখতে আসবে।" মা প্রতিবাদ করেন, "ছিঃ, অমন কথা কি বলতে আছে, গৌরদাসী? রাধা যে চিন্ময়ী।" "আর

তুমি কে? তুমিও তো চিন্ময়ী"—মায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া গৌরী-মা ঈষৎ হাস্যে বলেন।

'আরও কয়েকদিন অতীত হইল। গৌরী-মা উক্ত স্থানে শীতলামাতার পূজা দিতে গিয়াছেন, পূজারী তাঁহার পুরাতন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, "তুমি যে বলেছিলে মা, আমায় রাধারানী দেখাবে।" গৌরী-মা ব্রাহ্মণকে লইয়া সেইদিনই মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এঁকে ভাল করে দেখ, স্বাভীষ্ট দেখতে পাবে।" "ইনি তো মানুষ!" সংশয়ে দোদুল্যমান-চিত্তে ব্রাহ্মণ মাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করিলেন, প্রণামান্তে তাঁহার মুখদর্শন করিতে মাথা তুলিলেন। বিস্ময়বিহ্বল-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে লাগিলেন মাতার মুখারবিন্দ, দর্শন আর শেষ হয় না। অবশেষে, পুনরায় চরণবন্দনা করিয়া ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "বন্দে রাধাং আনন্দরূপিণীং, রাধাং আনন্দরূপিণীং, রাধাং আনন্দরূপিণী।"'[৯] সেদিন শীতলা মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে মাতার মুখারবিন্দে যে রাধারানীর মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের মাতৃজীবনীতে আর একটি ঘটনা পাওয়া যায়। শৈশবে মা-হারা এক বালক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পড়ে মায়ের কথা জানতে পারে। মায়ের শেষ অসুখের সময় সে মাকে দর্শন করতে যায়। মায়ের পাদস্পর্শ করে ছেলেটির আবেশের মতো অবস্থা হয়। 'গুরু ও ইষ্ট অভেদ', 'ঠাকুর ও মা অভেদ', 'ঠাকুর মাকে জগদম্বা-রূপে পূজা করেছিলেন, অতএব ইনিই মা-কালী', 'যিনি রাধা তিনিই সারদা'—এই চারটি চিন্তা পর পর তার মনে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে অর্ধশয়ানা মায়ের মূর্তির জায়গায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি, ঠাকুর, মা-কালী এবং শ্রীরাধামূর্তি দর্শন করে। কালীরূপ দর্শন করার সময় সে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। মা শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করে তাকে প্রকৃতিস্থ করেন। রাধারূপ দর্শনের পর মা বলেছিলেনঃ 'তুমি বৈষ্ণব বংশে জন্মেছ, সেই সুকৃতির ফলে এই দর্শন পেলে। যদি আর কখনও এঁকে দর্শন কর, মা বলে ডেকো না।'[১০]

ক্ষীরোদবালা রায়ের স্মৃতিকথায় জানা যায়, প্রমদা দত্ত নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্ম ডাক্তার মাকে রাধারানীরূপে চিনেছিলেন। প্রমদা দত্তের অনুরোধে ক্ষীরোদবালা রায় একদিন তাঁকে মায়ের বাড়িতে নিয়ে যান। মায়ের বাড়িতে উপরের তলায় সিঁড়ির পাশের ঘরটিতেই মায়ের ধ্যানস্থ একখানা ফটো থাকত। প্রমদা দত্ত সেই ফটোটির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেনঃ 'ইনিই স্বয়ং রাধা।' মাকে দর্শন, প্রণাম ও মায়ের প্রসাদ আঁচলে বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে প্রমদা দত্ত তাঁর স্বামীকে বললেনঃ 'দেখ, আজ আমি যেখানে গিয়েছিলাম তা স্বর্গ। যাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করে এসেছি তিনি স্বয়ং রাধা।' প্রমদাদেবী সব বর্ণনা করে কেবলই বলতে লাগলেনঃ 'আজ বৃন্দাবনে গিয়ে রাধারানীর পাদপদ্ম দর্শন করে এসেছি, ধন্য হয়ে এসেছি!'[১১]

স্বামী অভেদানন্দও সারদাদেবীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে 'জানকীরাধিকারূপধারিণীম্'-রূপে বর্ণনা করেছেন।[১২]

স্বীয় রাধারূপের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি সারদাদেবীর জীবনে বিরল হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। জনৈক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'মা, ঠাকুরের জপ তো আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার জপ কি করে করব?' মা উত্তর দেনঃ 'রাধা বলে পার, কি অন্য কিছু বলে পার, যা তোমার সুবিধা হয় তা-ই করবে। কিছু না পার, শুধু মা বলে করলেই হবে।'[১৩] এখানে মা অকপটে নিজের রাধারূপ ঘোষণা করেছেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর মা যখন বৃন্দাবন গিয়েছিলেন, জনৈক ভক্তের একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ 'আমিই রাধা।'[১৪] অন্নদার আত্ম-পরিচয়ের হেঁয়ালি এখানে নেই। আত্মপরিচয় এখানে সরাসরি ও স্পষ্ট।

কলিযুগের শ্রীরাধার জীবনে বৃন্দাবনের শ্রীরাধার ব্যবহারের কিছু পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ার পর শোকাতুরা বিরহব্যাকুলা সারদামণি বৃন্দাবনে গিয়ে যোগীন-মার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ব্যবহার বার বার কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলা রাধাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ 'শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীগীতায় উল্লিখিত আছে যে, রাসভূমি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সহসা অন্তর্হিত দেখিয়া গোপীরা বিহ্বলচিত্তে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু উহাতে বিফলমনোরথ হইয়া বিরহজনিত তন্ময়তার ফলে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া তাঁহার শুভ লীলাবিলাসের অনুকরণ করিতে থাকিলেন। শ্রীমায়েরও দেহমনে এই সময়ে অনুরূপ তন্ময়তা প্রকাশ পাইয়াছিল।...শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়া যাইতেন। কালাবাবুর কুঞ্জে একদিন ধ্যান করিতে করিতে তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন—সমাধি কিছুতেই ভাঙে না। যোগীন-মা অনেকক্ষণ নাম শুনাইলেও ব্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে যোগীন মহারাজ আসিয়া নাম শুনাইলে সমাধির একটু উপশম হইল এবং সমাধি-ভঙ্গে ঠাকুর যেমন বলিতেন শ্রীমাও তেমনি বলিলেন, "খাব।" কিছু খাবার, জল ও পান সম্মুখে ধরিলে তিনি ঠাকুরেরই মতো একটু একটু খাইলেন। এমনকি, ঠাকুর যেমন পানের সরু দিকটা দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া খাইতেন, শ্রীমাও সেইভাবে খাইলেন। তখন যোগীন মহারাজ কয়েকটি প্রশ্ন করিলে ঠিক ঠাকুরেরই মতো উত্তর দিলেন। বস্তুতঃ, ঐসময়ে তাঁহার হাব-ভাব অবিকল ঠাকুরের মতো দেখাইয়াছিল। সাধারণ ভূমিতে নামিয়া তিনি নিজেও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাতে ঠাকুরের আবেশ হইয়াছিল।'[১৫]

বৃন্দাবনের আরও কয়েকটা ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—যেগুলির মাধ্যমে সারদাদেবীর মধ্যে রাধাভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। দুর্গাপুরী দেবী লিখেছেনঃ 'একদিন [মাতাঠাকুরানী] একাকিনী চলিয়া গেলেন "ধীরসমীরে"। ধীরসমীরের

চতুর্দিকে শান্ত পরিবেশ, সম্মুখে নীল যমুনা। তাঁহার দৃষ্টি চলিয়া গেল নিকট হইতে দূরে, ভাবিতে লাগিলেন তিন কালের লীলা—সরযূতীরে শ্রীরামচন্দ্র, যমুনা-তীরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আর গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরের বৃন্দাবনবাসের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। ওদিকে কালাবাবুর কুঞ্জে অনেকক্ষণ মাকে দেখিতে না পাইয়া সকলে চতুর্দিকে তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। গৌরী-মা গেলেন ধীরসমীরে, দেখেন—মা একাকিনী, বাহ্যজ্ঞানহীনা, চক্ষে পলক পড়িতেছে না, শ্বাসপ্রশ্বাস অনুভূত হইতেছে না। গৌরী-মা ভাবিলেন—গোবিন্দভাবিনী শ্রীরাধা আজ কৃষ্ণবিরহে তন্মনা, কৃষ্ণের অদর্শনে ভাববিহ্বলা। তিনি রাধানাম গাহিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে যোগীন-মা এবং যোগানন্দজীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়ের বাহ্যচৈতন্য ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে রাধানাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে স্পন্দন অনুভূত হয় মায়ের দেহে। ওষ্ঠে ঈষৎ হাস্য, নয়ন অর্ধোন্মীলিত। অস্ফুটভাষায় কি যেন বলিলেন, কেবল বুঝা গেল একটি কথা—"কোথায়"?'[১৬]

বৃন্দাবনে কালাবাবুর যে-কুঞ্জে মা ছিলেন, তার খুব কাছেই বংশীবট। অনেক সময় বংশীবটে গিয়েও মা একা একা বসে থাকতেন। 'মন চলিয়া যাইত সেই দ্বাপরযুগে, চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিত কত চিত্র।' একদিন শ্রীমা মানসপটে দেখলেন: 'যমুনাপুলিনে মনোরম এক কুঞ্জবন, ব্রজবালাদিগের সহিত তিনিও মধুর বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। কোন্ মুহূর্তে তিনি ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে মিলিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না, [স্বয়ং রাধা বলেই কি পৃথক্‌ভাবে রাধারানীকে দেখতে পেলেন না?] ...ইহার পর আর কিছু তাঁহার স্মরণ হয় না। বাহ্যচৈতন্য যখন ফিরিয়া আসিল, ব্রজবিহারী তখন অদৃশ্য হইয়াছেন। বংশীবটে তিনি একাকিনী, বিরহব্যথায় ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুনরায় বাহ্য-চৈতন্য হারাইলেন। ...এই অবস্থাদর্শনে শঙ্কিত হইয়া কালিদাসী [সঙ্গিনী বিধবা ব্রাহ্মণী] মায়ের মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন এবং অবিরত "রাধেশ্যাম" নাম শুনাইতে লাগিলেন। ...মাকে সন্তর্পণে কুঞ্জে লইয়া যাওয়া হইল। এই দিবস তাঁহার স্বাভাবিক চৈতন্য ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল।'[১৭]

বৃন্দাবনে শ্রীমা কখনও কখনও নৌকাযোগে যমুনায় বেড়াতেন। কোন কোন দিন নৌকায় করে অনেকদূরে পর্যন্ত চলে যেতেন। দুর্গাপুরী দেবী লিখেছেন: 'একদিন এইরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি যমুনার জলে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, কি যেন দেখিতেছেন। অতঃপর কাহাকে ধরিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন। মাতার দেহের অধিকাংশ নৌকার বাহিরে এবং তাঁহার নিজের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, মুহূর্তের মধ্যে জলে পড়িয়া যাইবেন, তাহা বুঝিয়াই ভীতত্রস্ত যোগানন্দজী চিৎকার করিয়া উঠিলেন; এবং যুগপৎ গৌরী-মা ও গোলাপ-মা মাকে ধরিয়া ফেলিলেন। নৌকার উপর অনেকক্ষণ তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন।'[১৮]

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমাদের রাধা-বিগলিত-তনু শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীল সমুদ্রকে কালিন্দীর কালো জল মনে করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভাবাবেশে মহাপ্রভু সেদিন ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি দেখেছিলেন। আমাদের আলোচ্য ঘটনায় শ্রীমা সারদাও সম্ভবত যমুনার নীল জলে নীলবরণ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছিলেন। শ্রীমা এই সময় সদলবলে বৃন্দাবন পরিক্রমা করে-ছিলেন। পরিক্রমার সময় মনে হত, যেন তিনি মনোযোগ-সহকারে ব্রজের পথঘাট দেখছেন। যেন বহুদিন পরে পূর্ব-পরিচিত স্থানগুলি আর একবারের জন্য দেখে নিচ্ছেন। কোথাও বা তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেনঃ 'না, চল।' সঙ্গিনী যোগীন-মা এবং অন্যান্যদের স্পষ্টই মনে হত, মা যেন ভাবমুখে চলেছেন এবং নানারকম দর্শনও তাঁর হচ্ছে।[১৯]

এই রকম আরও অনেক ঘটনা আছে মায়ের জীবনে, যার সঙ্গে জড়িত আছে মায়ের রাধা-সত্তার দূর ও নিকট যোগ। শ্রীমার নিজমুখে বিবৃত একটি তথ্যঃ 'দক্ষিণেশ্বরে রেতে কে বাঁশী বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত, মনে হত সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাচ্ছেন—অমনি সমাধি হয়ে যেত।'[২০] এই সমাধির কারণ কি অতীত জীবনের স্মৃতির গভীরে প্রবেশজনিত রসানুভূতি? বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার করে এ বোঝা যাবে না।

ঠাকুরের অদর্শনের পর শ্রীমা হাতের বালা খুলে ফেলেছিলেন। মাকে ঠাকুর দর্শন দিয়ে বলেনঃ 'তুমি হাতের বালা ফেলো না। বৈষ্ণবতন্ত্র জান তো?' মা বললেনঃ 'বৈষ্ণবতন্ত্র কি? আমি তো কিছু জানি নে।' ঠাকুর বললেনঃ 'আজ বৈকালে গৌর-মণি আসবে, তার কাছে শুনবে।' সেদিনই বিকেলে গৌরী-মার আগমন হল। বৈষ্ণব-শাস্ত্র অবলম্বনে তিনি শ্রীমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর বৈধব্য অসম্ভব, কারণ তাঁর 'চিন্ময় স্বামী'।[২১]

এক দোলপূর্ণিমার দিন দুটি অল্পবয়স্ক বালক ও একটি যুবক শ্রীমাকে প্রণাম করতে আসে। ছেলেদুটি সঙ্গে আবীর এনেছিল। তারা বললঃ 'আমরা আবীর দেব।' এইকথা শোনামাত্র মায়ের ভাবান্তর হল। 'আবীর দেবে?' বলেই তিনি চপলা বালিকার মতো হয়ে গেলেন এবং ছেলেরা তাঁর পায়ে আবীর দিতে না দিতেই তাদেরই আবীর নিয়ে চপল ভঙ্গিতে তাদের গায়ে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।[২২] সেই মুহূর্তে শ্রীমার মনে কি বৃন্দাবন-স্থলীর কোন অতীত দোলপূর্ণিমার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল? তাই কি তিনি সহসা নিজ মাতৃভূমিকা বিস্মৃত হয়ে চপলা বালিকায় পরিণত হয়েছিলেন?

১৩০১ সালে শ্রীমা যখন বৃন্দাবনে যান, একদিন যমুনার জলে অবগাহন করবার সময় তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। যমুনার জলকে তাঁর মনে হয় 'কৃষ্ণপ্রেমের ধারা', আর মনে হয়, 'মা-যশোদার নীলমণি' যেন তাতে লুকিয়ে আছেন।[২৩]

রাধাভাবের গানে মায়ের বিশেষ প্রীতি ছিল। নিম্নোক্ত গানটি তিনি ঠাকুরের মুখে শুনে শিখে নিয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি এই গানটি গাইতেন এবং তাঁর মুখে শুনে রাধুর পর্যন্ত গানটি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

যদি কিশোর, তোমার কালাচাঁদের—
গোকুলচাঁদের উদয় ঘুচল হৃদে।
দুঃখ কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে এখন থাকবি রাধে॥
যাই আমাদের যথা আছেন মধুসূদন,
শুনব না তোর বারণ, মানব না তোর রোদন,
প্যারী গো, আমরা থাকব না তোর সদন,
কৃষ্ণত্যাগীর বদন দেখতে নিষেধ আছে পুরাণে বেদে।[২৫]

স্বামী তপানন্দের মুখে শুনে শ্রীমা রাধাভাবের এই গানটি সাগ্রহে লিখিয়ে নিয়েছিলেনঃ

হৃদি-বৃন্দাবনে আমারি কারণে সর্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।
(তাঁরে) জানি না তবু যে, ভুলি লোকলাজে পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর॥
প্রমত্ত উজান মন-যমুনায় লুকাইয়া বাঁশী ডাকে—'সখি আয়' ;
প্রাণের কালিয়া বলে দে কোথায়, বড় যে সুখেরি কলঙ্ক রাধায়॥
প্রতি অঙ্গ মোর কানু-ক্ষুধাতুর, সে কানু কেন লো দূর—এতদূর!
প্রেমের রাজা সে যে ছিল না নিঠুর, কোটি কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।
যত ছিল রাস, যত বৃন্দাবন, যত লো কদম্ব নিকুঞ্জ কানন,
(সেথা) জনমে জনমে মোর কানুধন, প্রেম-ভিখারিণী আমি রাধা তাঁর॥[২৬]

একবার বাগবাজারে কিরণ দত্তের বাড়িতে মাথুর-কীর্তন শুনে মা গভীর ভাবাবিষ্টা হয়েছিলেন।[২৬]

॥ ৩ ॥

শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের 'শক্তি'। রাধাও বস্তুত শক্তি ছাড়া কিছু নন—মধুর রসের প্রেমমুখে যে-শক্তির প্রকাশ। শক্তিবাদের প্রতি ভারতীয় গণমনের যেন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেজন্যই ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যে ও ধর্মদর্শনে শিবশক্তির অনুরূপ কল্পনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই শক্তিবাদের প্রভাব শুধু ভারতীয় শাক্ত বা শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় না, বৈষ্ণব মতবাদেও শক্তিবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, রাম-সম্প্রদায়ে লক্ষ্মীর স্থান গ্রহণ করেছেন সীতা, কৃষ্ণ-সম্প্রদায়ে রাধাই এই শক্তি। সৌর এবং গাণপত্য সম্প্রদায়েও শক্তি স্বীকৃত। শক্তিবাদের মূল উৎস নিহিত অম্ভৃণ ঋষির বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কন্যার উক্তিতে—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশ পঁচিশ সূক্তটিতে, যা 'দেবীসূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। বেদের 'রাত্রিসূক্ত'টিকেও দেবীর বা শক্তির দ্যোতক বলে মনে করা হয়।

রাধাবাদের বীজ নিহিত ভারতীয় শক্তিবাদে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেনঃ 'যিনি ছিলেন বিশুদ্ধ শক্তিরূপিণী, ক্রমপরিণতির প্রবাহের ভিতর দিয়া তিনিই আসিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন পরমপ্রেমরূপিণী মূর্তিতে।'[২৭] শাক্তমতে 'শক্তি'র স্রষ্টারূপের

প্রাধান্য। গৌড়ীয় রাধাতত্ত্বে শক্তির স্রষ্টারূপের চেয়ে আনন্দ ও প্রেম রূপের প্রাধান্য। প্রকৃত-পক্ষে, শক্তির যে স্রষ্টারূপ তারও মূলে আনন্দ। কারণ, আনন্দ ছাড়া কোন সৃষ্টিই হয় না। শ্রুতিও বলেনঃ 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'[২৮]—সমস্ত কিছু আনন্দ থেকেই জাত। সেই আনন্দের নানা প্রকাশ—সৃষ্টি, প্রেম, মাতৃত্ব প্রভৃতি। আনন্দের প্রকাশ যখন সৃষ্টিরূপে, তখনই আসে শাক্তমতাবলম্বীর 'শক্তি'র কল্পনা। আর সেই আনন্দের প্রকাশ যখন প্রেমরূপে, তখনই এসেছে বৈষ্ণবমতের 'রাধা'র ধারণা। অতএব শাক্তমতের 'শক্তি' এবং বৈষ্ণবমতের 'রাধা'র মধ্যে বিরোধ-কল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণ-অবতারে যিনি রাধা, শক্তিরূপে রাম-অবতারে তিনিই সীতা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ইদানীংকালে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী সারদা-দেবী। তাই সারদাদেবীর মধ্যেও রাধাভাব অবশ্যই ছিল। তাঁর রাধাভাব তাঁর স্বরূপেরই একটি দিক। যুগপ্রয়োজনে সারদাদেবীর মধ্যে মাতৃভাবের প্রাধান্য দেখা গেলেও শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁরও অনন্ত ভাব এবং সে অনন্ত ভাবরাশির একটি নিঃসন্দেহে রাধাভাব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে হ্লাদিনী-শক্তি-বিগ্রহা শ্রীরাধার শ্রীভগবানের নিত্যবৃন্দাবনে নিত্যলীলা। অবতার এবং অবতার-শক্তির লীলাও চিরকালের। সারদার নিত্যকালের লীলাবিলাস শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে—শুধু ভিন্ন নামে, ভিন্ন রূপে, ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। কখনও স্থূলরূপে, কখনও সূক্ষ্মরূপে 'কোন কোন ভাগ্যবানে'র দৃষ্টিগোচরে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে রাধা হলেন ভগবানের আনন্দবিধায়িনী। এর পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করি, এ-যুগের ভগবানের উক্তি সারদাদেবী সম্বন্ধেঃ 'তুমি আমার মা আনন্দময়ী।'[২৯] গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব অনুযায়ীঃ ভক্তেরা শ্রীরাধিকার কৃপাতেই পরমানন্দের অধিকারী হন। 'শক্তি' সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুস্পষ্টভাবে উক্ত আছেঃ 'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।'[৩০]—তুমি (অর্থাৎ দেবী) প্রসন্না হলেই মুক্তির কারণ হও। শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলেছেনঃ শক্তি বা মহামায়া প্রসন্ন না হলে সাধকদের সিদ্ধি অসম্ভব। সারদাদেবীকে এই শক্তি বা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহরূপে চিনেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ 'ও রাগ করলে (নিজেকে দেখিয়ে) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।'[৩১] সর্বদা সারদাদেবীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। ভুল করে 'তুমি'র বদলে 'তুই' বলে ফেলে সারা রাত ঘুমোতে পারেননি।[৩২] সারদাদেবীর মর্যাদার প্রতি অন্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, সারদাদেবী যদি কারও ওপর অপ্রসন্না হন, তাহলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও সাধ্য নেই তাকে রক্ষা করে।[৩৩] এ সবকিছুর কারণ একটিইঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভবতারিণীর মধ্যে যে আদ্যা শক্তিকে উপাসনা করেছেন, সারদাদেবীকে তাঁরই সচল বিগ্রহ-রূপে সর্বদা প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সন্তান এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও একই কারণে সর্বদা সারদাদেবীর কৃপাভিখারি ছিলেন।[৩৪] মর্ততনুধারিণী শক্তি যাতে

প্রসন্না হয়ে নিখিল জীবের মুক্তির হেতু হন, সেজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে সেই শক্তির বোধন করেছিলেন। অবশিষ্ট জীবন ধরে সারদা-দেবী জীবের জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি-মুক্তি বিধানের কাজ করে গেছেন অকাতরে। ভক্তদের বিশ্বাস আজও তিনি সেই কাজ করে চলেছেন অলক্ষ্যে থেকে।

শ্রীরাধিকার মধ্যে লক্ষিত হয় মধুরভাবের পরাকাষ্ঠা। পক্ষান্তরে সারদাদেবী প্রতিষ্ঠা করেছেন মাতৃভাবের অনুপম আদর্শ। উভয় চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে আপাত বৈসাদৃশ্যই কি বেশী নয়? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দের বক্তব্য। মধুরভাব—শান্ত, দাস্য ইত্যাদি চার প্রকার ভাবের সমষ্টি এবং অধিক—এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেনঃ 'প্রেমিকা নায়িকা ক্রীতদাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সখীর ন্যায় সর্বাবস্থায় তাঁহাকে সুপরামর্শ দানপূর্বক তাঁহার আনন্দে উল্লসিতা ও দুঃখে সমবেদনা-যুক্তা হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাঁহার শরীরমনের পোষণে এবং কল্যাণ কামনায় নিযুক্তা থাকেন।'[৩৫] শ্রীমাও দাসীর মতোই ঠাকুরের সেবা করেছেন; প্রয়োজনে সখীর মতো তাঁকে ভরসা, সাহস ও পরামর্শ দিয়েছেন, আবার জননীর স্নেহে ঠাকুরের শরীরমনের যত্ন নিয়েছেন।

গোপী-প্রেমের চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাঃ

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥[৩৬]

গোপিকা-শ্রেষ্ঠ রাধার সমগ্র জীবন কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে। কৃষ্ণসুখেই তাঁর সুখ। সারদাদেবীর জীবনেও আমরা দেখি, সর্বাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতিতেই তাঁর প্রীতি। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহে থাকার সময় একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পরও। লোককল্যাণার্থে তিনি যা কিছু করেছেন, তারও মূলে ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রীতি-ইচ্ছা। তিনি নিজমুখে বলেছেনঃ 'তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন! সকলকে দেখতে পাত্তুম, তবে তো হত।'[৩৭] সারদাদেবীর রাধা-সত্তার উজ্জ্বলতম প্রকাশ সেইখানেই যে, চিরকাল তিনি 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা'।

স্বয়ংবাদিনী

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নেত্রীরূপে এবং মহিমময়ী মাতৃমূর্তিতে বিশ্বের অধ্যাত্মসাধনার ইতিবৃত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবী অদ্বিতীয়া। সাধারণ লজ্জাশীলা পল্লী-রমণীর মতো গৃহকোণে অতিবাহিত সারদাদেবীর জীবন এক অভূতপূর্ব রহস্যে আবৃত—সাধারণের অনধিগম্য। সারদাদেবী কোনও মতবাদ প্রচার করেননি! তাঁর শুচিশুদ্ধ তপস্যাসুন্দর জীবনই তাঁর বাণী। যদিও নীরবতা তাঁর চরিত্রের বিশেষ প্রকৃতি, তবুও অসাধারণত্ব দিয়ে নিজেকে তিনি সাধারণের কাছ থেকে কখনও সরিয়ে রাখেননি। নিজের স্বরূপ বা মহিমাকে সব সময় প্রচ্ছন্ন রাখতেই প্রয়াস পেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের দ্বারা 'সঙ্ঘজননী' এবং 'জগজ্জননী' রূপে বন্দিতা হলেও, এবং ভক্তজনদের দ্বারা স্বয়ং ভগবতী-জ্ঞানে পূজিতা হলেও, তিনি তাঁর চারদিকে কোন অলৌকিকতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে দেননি। তাঁর মর্ত-লীলায় সবার অতি কাছের মানুষ হিসেবে নিজেকে সর্বক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ করেছেন।

শ্রীমায়ের নিরভিমান সরলতা ও নিরহঙ্কার সরসতা এক বিস্ময়ের বস্তু। যখন শত শত ভক্ত তাঁর কৃপা লাভের জন্যে ব্যাকুল তখনও তিনি ছায়াঘেরা পল্লীর শ্যামল অঞ্চলে দীনতম বেশে সকলের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে রেখেছেন। কত দূর-দূরান্তর থেকে লোকজন আসে, শ্রীমাকে তারা দেবীজ্ঞানে পুজো করে। কিন্তু গ্রামের লোক-জন সেসব কিছুই বোঝে না, তাদের কাছে তিনি 'দিদি', 'পিসী', অথবা 'সারু'। স্বভাবতই পাড়া-প্রতিবেশীরা কেউ কেউ শ্রীমাকে প্রশ্ন করেছেঃ 'তোমাকে দেখতে কত লোক কত দূরদেশ থেকে আসছে; অথচ আমরা তোমাকে বুঝতে পারছি না কেন?' একটু হেসে শ্রীমা উত্তর দিয়েছেনঃ 'তা নাই বা বুঝলে, তোমরা আমার সখা, তোমরা আমার সখী।'[১] গ্রামের চৌকিদার অম্বিকা বাগদি একদিন তাঁকে বলেঃ 'লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত কি বলে; আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না।' স্নিগ্ধকণ্ঠে শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'তোমার বুঝে দরকার কি? তুমি আমার অম্বিকা দাদা, আমি তোমার সারদা বোন।'[২] একদিন এক ভক্ত-সন্তান মাকে বললেনঃ 'কালে তোমার জন্য লোকে কত সাধন করবে।' শ্রীমা হেসে উত্তর দিলেনঃ 'বল কি! সকলে বলবে আমার মায়ের এমনি বাত ছিল, এমনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত।'[৩] শ্রীমার মাতাঠাকুরানী শ্যামা-সুন্দরী দেবী যখন তাঁর শেষ বয়সে তাঁকে বলেছিলেন, 'মাগো, তুই যে আমার কে মা! আমি কি তোকে চিনতে পারছি, মা?'—বিরক্তি সহকারে শ্রীমা বলেছেনঃ 'কে আবার, কে আবার? আমার কি চারটে হাত হয়েছে? তাহলে তোমার কাছে আসব

কেন?'[৪] নলিনীদিদি (শ্রীমার ভাইঝি) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, লোকে তাঁকে যে অন্তর্যামী বলে—সেকথা ঠিক কিনা। মৃদু হেসে মা উত্তর দিলেনঃ 'ওরা বলে ভক্তিতে। আমি কি, মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—আমার "আমিত্ব" যেন না আসে।'[৫] দৈবী-স্বরূপ গোপনের এত সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও শ্রীমা কিন্তু কখনও কখনও অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর ঐশী চরিত্র সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন, এমনকি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণাও করেছেন। মুহূর্তের জন্যে হলেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন আপন মহিমায়।

দেবীত্বই সারদাদেবীর প্রকৃত স্বরূপ। অমর্তলোকের দেবী মানবীরূপে ধরাধামে অবতীর্ণা। তাই তাঁর আবির্ভাবও সম্পূর্ণ দৈবীমহিমা-বর্জিত থাকেনি। জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন দুপুরবেলা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন, বহুমূল্য অলঙ্কার-সজ্জিতা একটি অসামান্যা সুন্দরী বালিকা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলছেঃ এই আমি তোমার কাছে এলুম।'[৬] এর কিছুদিন পর বাংলা ১২৬০ সালের ৮ পৌষ জননী শ্যামাসুন্দরীর কোল আলো করে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘরে সারদামণির পুণ্য আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের আগেও তাঁর পিতামাতার নানা রকম দৈবঅনুভূতি হয়। অনেক পরে শ্রীমা স্বয়ং তাঁর জন্মকথা ভক্তদের কাছে বলেছেনঃ 'আমার জন্মও তো ঐ রকমের (শ্রীরামকৃষ্ণের মতো)।' শ্রীমায়ের মা শিহড়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর দেখতে। ফেরার পথে এক গাছের নিচে তাঁর এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। শ্রীমায়ের নিজের ভাষায়ঃ '[মা] বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদরমধ্যে ঢোকায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল...তখন মা দেখেন যে লাল চেলী পরা একটি পাঁচ-ছয় বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি তোমার ঘরে এলাম মা।" তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল ..তা থেকেই আমার জন্ম।'[৭]

দেবী এসেছেন দারিদ্রের ঘরে। শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে নিয়ে সারাক্ষণ গৃহে থাকতে পারেন না। জমিতে তুলোর চাষ হয়, মাঠে যেতে হয় তুলো তুলতে। শিশুকন্যাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। যখন তুলো তোলেন, শিশুকে শুইয়ে রাখেন খেতের মধ্যে। মা খেতে কাজ করেন, শিশু খেলে আপন মনে। শিশু সারদা যখন 'বালিকা' হলেন, মাকে সাহায্য করতে শিখলেন, তখনকার কথা পরে শ্রীমা জয়রামবাটীতে ভক্তদের কাছে বলেছেনঃ 'ছেলেবেলা দেখতুম, আমারই মতো মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত—আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত; কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ-এগারো বছর পর্যন্ত এরকম হয়েছিল।'[৮] বালিকা সারদা যখন জলে নেমে দলঘাস কাটতেন, দেখতেন সঙ্গিনী মেয়েটিও তাঁর সঙ্গে ঘাস কাটছে। ঘাস কাটা হলে আঁটি বেঁধে যখন পাড়ে রেখে আসতেন, দেখতেন ঐ মেয়েটি এক আঁটি ঘাস ইতিমধ্যেই কেটে রেখে দিয়েছে।

একবার জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় হলদে-পুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল দেবী জগদ্ধাত্রীর সামনে ধ্যানরতা বালিকা সারদাকে দেখে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন—কিন্তু বার বার দেখেও বুঝে উঠতে পারেননি কে জগদ্ধাত্রী—ঐ মৃন্ময়ী মূর্তি? নাকি এই চিন্ময়ী বালিকা? অবতারশক্তি সারদাদেবীর বাল্যলীলা প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেছেনঃ 'দেবত্ব ও মানবত্বের অত্যাশ্চর্য মিশ্রণে মায়ের বাল্যলীলা বড়ই চমকপ্রদ; ...সেসময়ে ঊর্ধ্বলোক হইতে ইহধামে সদ্যঃসমাগতা মা দেবমানবত্বের সন্ধিস্থলে অবস্থান-পূর্বক এই মর্তলীলায় কোন্ ভাবের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবেন, তাহা যেন সহসা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।'[৯]

বধূ সারদা যখন তেরো বছর বয়সে কামারপুকুরে আসেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনমন্দির দক্ষিণেশ্বরে। একা একা তাঁর হালদারপুকুরে স্নান করতে যেতে ভয় করত। স্নান করতে যাবার সময় আটটি মেয়ে কোথা থেকে এসে তাঁকে সঙ্গ দিত। শ্রীমা স্বমুখে বলেছেন সেকথাঃ 'হালদারপুকুরে নাইতে যাব, ভয় হত! খিড়কির ছোট দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে ভাবচি, নতুন বউ, কি করে একলা নাইতে যাই। ভাবতে ভাবতে দেখি কি, আটটি মেয়েমানুষ এল; আমিও রাস্তায় নামলুম। নামবার পরেই তারা চারজন আমার আগে, চারজন আমার পেছনে হয়ে, আমাকে মাঝে নিয়ে হালদারপুকুরের ঘাটে চলল। আমি স্নান কললুম, তারাও কললে। পরে আবার সেরকম করে বাড়ি ফিরে এল। ঐ সময়টায় যতদিন ওখানে ছিলুম, রোজ এইরকম হত। অনেকদিন মনে করেচি, মেয়েগুলি কারা, আমার স্নানের সময় রোজই আসে; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।'[১০]

তপস্বিনী জনকনন্দিনীর মতো জয়রামবাটীতে তরুণী সারদামণির ঠাকুরের জন্যে অপেক্ষা করে চারটি বছব অতিবাহিত হতে চলেছে. সুদূর দক্ষিণেশ্বরে সাধনায় নিমগ্ন ঠাকুরকে গ্রাম্য আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী পাগল বলে রটনা করছে। তাদের অবজ্ঞা-উপহাসকে উপেক্ষা করে শ্রীমা বিরহ-বেদনায় দিনযাপন করছেন। সারদাদেবী দ্বিধা আর শঙ্কা ভরা মন নিয়ে সত্য-অসত্য নির্ধারণে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সঙ্গে পিতা এবং আরও কয়েকজন। দুদিন পথ চলার পরই শ্রীমা জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। যাত্রা স্থগিত হল। বাইরে জ্বরের প্রবল যন্ত্রণা, অন্তরে ততোধিক মনোবেদনা। এই অবস্থায় এক দিব্যদর্শনের ফলে উভয় যন্ত্রণাই একটু কমল। মা নিজে পরবর্তীকালে সেই দর্শনের কথা বলেছেনঃ 'জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ. লজ্জাসরমরাহিত হয়ে পড়ে আছি. তখন দেখলাম পাশে একজন মেয়ে এসে বসল—মেয়েটির রং কালো. কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখিনি!—বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল -এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কোথা থেকে আসচ গা?" মেয়েটি বলল. "আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি।" শুনে অবাক হয়ে বললাম. "দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব. তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা

করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐসব আর হল না।" মেয়েটি বলল, "সেকি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" আমি বললাম, "বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?" মেয়েটি বললে, "আমি তোমার বোন হই।" আমি বললাম, "বটে? তাই তুমি এসেছ!" ঐরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম!'[১১] পরদিন সকালবেলায় শ্রীমা দেখলেন, জ্বর সেরে গেছে। রাত নটা নাগাদ মা দক্ষিণেশ্বর পৌঁছালেন।

অষ্টাদশী সারদাদেবী প্রথম দক্ষিণেশ্বর এলেন। তার কয়েক মাসের মধ্যেই যুগদেবতা ষোড়শীপূজার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অন্তর্নিহিত দেবত্বকে উদ্বোধিত করলেন। এই অভূতপূর্ব ঘটনা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের এক পরমাশ্চর্য অধ্যায়। শ্রীমা নিজেই ভক্তদের কাছে এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেনঃ '(ফল-হারিণী কালীপূজার) রাত্রে প্রায় নটায় আমাকে তাঁর ঘরে আনালেন। পূজার সব জোগাড়। ভাগ্নে সব জোগাড় করে দিয়েছে। আমাকে বসতে বললেন। আমি তাঁর চৌকির উত্তর পাশে (গঙ্গাজলের) জালার পানে মুখ করে (পশ্চিম মুখে) বসলুম। ঠাকুর পূর্বমুখ হয়ে পশ্চিমদিকের দরজার কাছে বসেছেন। দরজা সব বন্ধ। আমার ডান পাশে সব পূজার জিনিস।...দীনু বলে একটি ছেলে, আমার ভাসুরপো হয়, মুকুন্দপুরের জ্ঞাতির ছেলে, ঠাকুরের কাছে থাকত। তিনি খুব ভালবাসতেন। সে সব ফুল-বেলপাতা জোগাড় করে এনে দিতে লাগল। হৃদয় সব ঠিকঠাক করে দিলে। পূজার সময় আর কেউ ছিল না, একা তিনি ছিলেন। পূজার শেষাশেষি হৃদয় এসেছিল।'[১২] লক্ষ্মীদিদিকে শ্রীমা বলেছিলেনঃ 'পূজার প্রথমে [ঠাকুর] পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন, সিঁদুর দিলেন, কাপড় পরিয়ে দিলেন। পান, মিষ্টি খাওয়ালেন।'[১৩] পূজা আরম্ভ হতে মা বাহ্যচেতনা হারিয়েছিলেনঃ 'আমি একটু পরেই বেহুঁশ হয়ে গেলুম। পূজার মধ্যে কি হয়েছে জানতে পারিনি। ...[হুঁশ হলে] আমি মনে মনে [ঠাকুরকে] প্রণাম করলুম। পরে চলে এলুম।'[১৪] নরদেহ-ধারী ভগবানের পূজা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে শ্রীমা প্রকারান্তরে নিজের দেবীত্বই জগতে প্রকাশিত করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে নানাভাবে শ্রীমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনব্রত সাধনে শ্রীমারও এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শ্রীরাম-কৃষ্ণের আরব্ধ কাজ তাঁকেই পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর রামকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীমারও শরীরত্যাগ করতে ইচ্ছা হল। শ্রীমা বলেছেনঃ 'যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, "না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকি আছে।" শেষে দেখলুম, তাইতো অনেক কাজ বাকি।'[১৫] কিন্তু মানুষের শরীর বজায় থাকে বাসনাকে অবলম্বন করে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের

পর শ্রীমার অনাসক্ত বৈরাগ্যদীপ্ত চিত্তে বাসনার কোন লেশ ছিল না। লোককল্যাণের প্রয়োজনে শ্রীমায়ের শরীর রক্ষার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাই তার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীমার স্বমুখে আমরা পেয়েছি সেকথাঃ 'ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারে আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন হু হু করছে, আর প্রার্থনা করছি, "আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে!" সেই সময় হঠাৎ দেখলাম, লাল কাপড় পরা দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, "একে আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।" পরক্ষণেই তিনি অন্তর্ধান হলেন, মেয়েটিকেও আর দেখতে পাইনি। তারপর একদিন ঠিক এই জায়গাটিতে বসে আছি, ছোট বউ (রাধুর মা) তখন বদ্ধ পাগল, ...রাধু হামা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার পেছনে যাচ্ছে। ...ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলাম। মনে হল, তাই-তো, একে আমি না দেখলে কে আর দেখবে? বাবা নেই, মা ঐ পাগল। এই মনে করে যাই ওকে কোলে তুলে নিয়েছি, অমনি ঠাকুরকে সামনে দেখলাম। তিনি বলছেন, "এই সেই মেয়েটি, ওকে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।"'[১৬]

রাধুর প্রতি তাঁর অতিরিক্ত স্নেহ ও আকর্ষণ অনেক ভক্তের মনে সংশয় জাগায়। কেউ কেউ তা মুখে প্রকাশও করেন। ভবদারা নিজের দৈবী স্বরূপকে আবৃত রাখতেই চান। অনুযোগের উত্তরে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো বিনয়-নম্রতার সঙ্গে বলেনঃ 'আমরা মেয়েমানুষ, আমরা এই রকমই।'[১৭] তবে একদিন এক ভক্তের অনুরূপ অভিযোগের উত্তরে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেছিলেনঃ 'তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মতো একটি বের কর দেখি? কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন শার্শিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।'[১৮] অন্য এক সময় বলেছিলেনঃ 'দেখ, সব বলে কিনা আমি "রাধু রাধু" করেই অস্থির, তার উপর আমার বড় আসক্তি! এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই না "রাধু রাধু" করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে তখন আর এ দেহ থাকবে না।'[১৯] আর এক সময় বলেনঃ 'এই যে "রাধী রাধী" করি, এ একটা মায়া নিয়ে আছি বইতো নয়!'[২০] বস্তুত শ্রীমা তাঁর লীলাসংবরণের পূর্বে রাধুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যান। এসব দেখেই স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেনঃ 'এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি।'[২১] সংসারাবদ্ধ সাধারণ মানুষের কাছে রাধুর প্রতি মায়ের আসক্তি সাধারণ স্ত্রীলোকের স্নেহান্ধতা-রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। এই আসক্তি আসলে যে একটি ছলনামাত্র তা বোঝার ক্ষমতা সকলের ছিল না।

জগতের কল্যাণের জন্যে নিজের উপর মায়ার আবরণ টেনে অবতার এবং অবতার-সঙ্গিনী স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে থাকেন। একদিন এক সন্ন্যাসী-

ভক্ত মাকে প্রশ্ন করেনঃ 'আচ্ছা, আপনাদের কি সব সময়ে নিজেদের স্বরূপ মনে থাকে না?' মা উত্তর দেনঃ 'তা কি সব সময়ে থাকে? তাহলে কি এইসব কাজকর্ম করা চলে? তবে কাজকর্মের ভেতর যখন ইচ্ছা হয়, সামান্য চিন্তাতে দপ্ করে উদ্দীপনা হয়ে মহামায়ার খেলা সব বুঝতে পারা যায়।'[২২] স্বেচ্ছায় আত্মবিস্মৃতা জগন্মাতা তাই নিজেকে প্রশ্ন করেছেনঃ 'অনেক সময় ভাবি যে আমি তো সেই রাম মুখুজ্যের মেয়ে, আমার সমবয়সী আরও তো অনেক মেয়ে জয়রামবাটীতে আছে, তাদের সঙ্গে আমার তফাত কি? ভক্তেরা সব কোথা থেকে এসে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করলে শুনি, কেউ হাকিম, কেউ উকিল। এরাই বা এমন আসে কেন?'[২৩] কখনও বা বলছেনঃ 'লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও ভাবি—সত্যিই বা তা-ই হব। নইলে আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত যা সব হয়েছে!'[২৪]

অনেক সময় দেখা যেত অন্তরঙ্গদের আত্মপরিচয় দিতে গিয়েও শ্রীমা আত্মসংবরণ করে নিতেন। পুরানো দিনের কথা। দক্ষিণেশ্বরের ঘটনা। একদিন শ্রীমা তাঁর অন্তরঙ্গ সেবিকা যোগীন-মাকে বলেনঃ 'যোগেন, তুমি শুকনো বেলপাতায় পুজো কর কি?' যোগীন-মা বললেনঃ 'হ্যাঁ, মা, কিন্তু তুমি তা কি করে জানলে?' মৃদু হেসে শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ 'আজ আমি সকালে ধ্যান করবার সময় দেখতে পেলুম, তুমি শুকনো বেলপাতা দিয়ে আ—।' এই বলে কথাটা শেষ না করে তাড়াতাড়ি বলেনঃ 'পুজো করছিলে।' যোগীন-মা স্তম্ভিত। হতবাক হয়ে তিনি শ্রীমায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ধরা পড়ে গেছেন দেখে শ্রীমাও লজ্জা পেয়ে যোগীন-মাকে জড়িয়ে ধরলেন।[২৫] অনেক পরের ঘটনা—কামারপুকুরে এক ভক্ত শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় শ্রীমা সহসা বললেনঃ 'বৈকুণ্ঠ, আমায় ডাকিস্।' বলেই আত্মসংবরণ করে বললেনঃ 'ঠাকুরকে ডেকো, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।'[২৬] সেখানে উপস্থিত লক্ষ্মীদিদি ভক্তটিকে বুঝিয়ে দিলেন শ্রীমার এই স্বীকৃতির ও আদেশের তাৎপর্য। বৈকুণ্ঠ যেন শ্রীমাকেই ডাকে। আবার কখনও কখনও রহস্যময় ভাষায় তিনি তাঁর স্বরূপের ইঙ্গিতটুকুমাত্র দিয়েছেন। স্বামী অরূপানন্দ লিখেছেন যে, তিনি শ্রীমাকে প্রথম দর্শনে বলেনঃ 'সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো বসে রুটি বেলছ, এসব কি? মায়া, না কি!' শ্রীমা বললেনঃ 'মায়া বৈকি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।'[২৭] একবার কাশীতে শ্রীমাকে সাংসারিক কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখে একজন স্ত্রীলোক তাঁকে বলেনঃ 'মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।' তাতে মৃদু হেসে মহামায়া উত্তর দিয়েছিলেনঃ 'কি করব, মা, নিজেই মায়া।'[২৮] এই উক্তির তাৎপর্য অনুযোগকারিণী সম্ভবত বুঝতে পারেননি।

পারিবারিক পরিবেশে সাধারণ লোকের সঙ্গে কথাবার্তা-প্রসঙ্গে হঠাৎ কখনও

কখনও শ্রীমার আত্মপরিচয় প্রকাশিত হত। একবার জয়রামবাটীতে রাত নটার সময় পাচিকা এসে বলে যে, সে কুকুর ছুঁয়েছে বলে স্নান করবে। শ্রীমা তাকে কাপড় ছাড়তে ও গঙ্গাজল স্পর্শ করতে বলায় তার তৃপ্তি হল না দেখে পবিত্রতা-স্বরূপিণী বললেনঃ 'তবে আমাকে স্পর্শ কর।' [২৯] উদ্বোধনে ঠাকুরপুজোর সময় পাগলীমামী কটুকথা বলছে ; পুজো সেরে পাগলীর দিকে তাকিয়ে তার অভিসম্পাতের উত্তরে স্নিগ্ধকণ্ঠে শ্রীমা বললেনঃ 'কত মুনি ঋষি তপস্যা করেও আমায় পায় না; তোরা আমায় পেয়েও হারালি!' [৩০] একদিন কাশীতে পাগলীমামী সারারাত তাঁকে গালাগালি দিয়েছেঃ 'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক।' প্রভাতে সেইকথার উল্লেখ করে শ্রীমা বললেনঃ 'ছোট-বউ জানে না যে, আমি মৃত্যুঞ্জয়।' [৩১] জয়রামবাটীতে এক-দিন আত্মীয়াদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেনঃ 'দেখ্,...এর ভিতরে যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কারও সাধ্য নেই যে তোদের রক্ষা করে।' [৩২] কিংবা 'আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই, পুণ্যও নেই।' [৩৩] একবার রাধুর অত্যাচারের প্রসঙ্গে একজনকে বলছেনঃ 'এ শরীর দেবশরীর জেনো...ভগবান না হলে কি মানুষ এত সহ্য করতে পারে?' [৩৪]

কোঠারে এক ভক্ত শ্রীমাকে বলেনঃ 'ঠাকুর আর আপনি তো এক।' অমনি শ্রীমা বলে উঠলেনঃ 'ওকথা বলতে আছে ...? আমি যে তাঁর দাসী। পড়নি?—"তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র...।" সব ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই।' [৩৫] শ্রীমা সব সময়েই বলতেনঃ 'ঠাকুরই সব—তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।' [৩৬] অবশ্য কখনও একথাও বলেছেনঃ 'আমরা কি আলাদা?' পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে বলেছেনঃ 'কি বলে ফেললুম!' [৩৭] নর-শরীরে মহামায়াকে চেনার জন্য তাঁর কৃপা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাধনলব্ধ শুভ সংস্কারেরও। এক ভক্ত-মহিলা একবার শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'মা, আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?' সুন্দর উপমার সাহায্যে শ্রীমা তাঁর বক্তব্যটি উপস্থাপিত করলেন। বললেনঃ 'সকলেই কি করে চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা।' [৩৮] শ্রীমায়ের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে এই জহুরীর সংখ্যা বেশী ছিল না। তাই তাঁর দৈবীস্বরূপ তাঁর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সত্ত্বেও অধিকাংশের কাছেই অজানা থেকে যেত। অবতার-জীবন দেব ও মানব ভাবের আলো-আঁধারিতে রহস্যপূর্ণ। রাজরাজেশ্বরী জগন্মাতা হয়েও শ্রীমা অতি সাধারণভাবে থাকতেন। জয়রামবাটীতে যখন বিশেষ শিক্ষিত, সম্মানিত বিদগ্ধজন ছুটে আসত তাঁর কৃপা লাভের জন্য, তখনও তিনি অত্যন্ত সাধারণ বেশে বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, রান্না করছেন,

পান সাজছেন। একদিন সকালে মা বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছিলেন, তখন এক ভিখারি এসে বলেঃ 'মা, ভিক্ষে পাই গো!' তার ডাক শুনে এক অপার্থিব সুমিষ্ট স্বরে শ্রীমা বলে উঠলেনঃ 'আমি আর অনন্ত হাতেও কাজ শেষ করতে পারছি না।' শ্রীমার সেই কণ্ঠ-স্বরে আকৃষ্ট হয়ে নিকটবর্তী ত্যাগী-সন্তান স্বামী ঋতানন্দ বিস্মিত হয়ে শ্রীমার দিকে তাকালেন। শ্রীমা সহাস্যে বলে উঠলেনঃ 'দেখ, আমার দুটো হাত, আমি কিনা আবার বলছি, আমার অনন্ত হাত।'[৩৯] ঘটনাটির মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে দেবীত্ব ও মানবত্বে মিশ্রিত শ্রীমায়ের সমগ্র জীবনলীলার বিচিত্র রূপটি।

ধর্মের সংস্থাপন করতে যুগে যুগে ভগবানকে অবতীর্ণ হতে হয়। স্বয়ং ভগবতীও তাঁর সঙ্গে আসেন অবতার-শক্তিরূপে। বিভিন্ন যুগের অবতার-শক্তিদের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা শ্রীমা নিজ মুখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এক ভক্ত-সন্তান নলিনবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'মা, সব অবতারেই কি আপনি এসেছেন?' শ্রীমায়ের সহজ স্নিগ্ধ উত্তরঃ 'হ্যাঁ, বাবা।'[৪০] শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের ঠিক পরে শ্রীমা যখন বৃন্দাবনে যান, তখন রাধাকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে জড়িত বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানগুলি তিনি এমনভাবে লক্ষ্য করতেন, যেন তাঁর পূর্বপরিচিত। যেন তা বহুদিন পূর্বের কোন স্মৃতি তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। কখনও বা রাধারানীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে তিনি সকলের অলক্ষ্যে যমুনায় চলে যেতেন। এই সময় তিনি একদিন বলেছিলেনঃ 'আমিই রাধা।'[৪১] একবার এক ভক্ত-মহিলা প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'মা, ঠাকুরের জপ তো আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার জপ কি বলে করব?' শ্রীমায়ের উত্তরঃ 'রাধা বলে পার...কিছু না পার, শুধু মা বলে করলেই হবে।'[৪২] দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় শ্রীমা যখন রামেশ্বর-তীর্থে গিয়েছিলেন, অনাচ্ছাদিত রামেশ্বর শিবলিঙ্গকে দেখে সহসা তিনি বলে ফেলেছিলেনঃ 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।' কাছে যে-ভক্তেরা ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'মা, ও কি বললে?' শ্রীমা তখন আত্মসংবরণ করে বললেনঃ 'ও একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।'[৪৩] কলকাতায় ফিরেও শ্রীমা একই কথা বলেছিলেন। সীতাদেবী রামেশ্বরে শিবলিঙ্গ পূজা করেছিলেন। ভক্তদের বিশ্বাসঃ 'যিনি ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র-প্রেয়সী, জন্মদুঃখিনী সীতাদেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়া সমুদ্রতীরে বালুকা নির্মিত শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন, তিনিই পুনঃ কলিতে সর্বংসহা, অশেষ কল্যাণময়ী ভক্তজননীরূপে অবতীর্ণা হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গকে এত দীর্ঘকাল পরে একইরূপে থাকিতে দেখিয়া সহসা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া গিয়া ত্রেতাযুগে উপনীত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার সেই সময়কার অনুভব অজ্ঞাতসারে কতকটা স্বগতোক্তির মতো এইভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।'[৪৪]

শ্রীমা একাধারে অবতারের লীলাসঙ্গিনী, সর্বদেবীস্বরূপিণী, এবং বিশ্বজননী। এই তিনটি ভাবের সংমিশ্রণে সারদাদেবীর মর্তলীলার বৈচিত্র অপরূপ। তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর মধ্যেও এই তিনটি ভাবেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অভেদত্ব স্বীকার করে, ভক্তজনদের কাছে বিভিন্ন দেবীরূপে আবির্ভূতা হয়ে, আর মহিমান্বিত 'বিশ্বমাতৃত্ব' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই তিনটি অনির্বচনীয়

ভাবের মিলনকেন্দ্র শ্রীমার নিরঞ্জন জীবনপদ্মটি দিব্য সৌরভে, অপূর্ব দীপ্তিতে বিরাজিত। অবতার ও অবতার-শক্তি স্বরূপত অভেদ। ভক্তদের কল্যাণার্থে শ্রীমা কোন কোন ক্ষেত্রে বলেছেনঃ 'ঠাকুর ও আমাকে অভেদ-ভাবে দেখবে।'[৪৫] একসময় স্বামী কেশবানন্দ শ্রীমার কাছে ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে আক্ষেপ করেন যে, দুর্ভাগ্যবশত তিনি ঠাকুরের দর্শন পেলেন না। তাতে শ্রীমা নিজেকে দেখিয়ে বলেনঃ 'এর ভেতর তিনি সূক্ষ্মদেহে আছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন, "আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।"'[৪৬] জনৈক ভক্ত-সন্তানকে শ্রীমা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন—তাঁর আর ঠাকুরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, শুধু রূপের পার্থক্য। 'যেই ঠাকুর সেই আমি।'[৪৭] একবার দেখা গেল শ্রীমা নিজের একটি ছবি মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। উপস্থিত ভক্তটি হাসলে তিনি বুঝিয়ে বললেনঃ 'এরও ভেতর তো ঠাকুর আছেন।'[৪৮] একদিন উদ্বোধনে এক তরুণ ব্রহ্মচারী (পরবর্তীকালে স্বামী দয়ানন্দ) ঠাকুরের পুজো শেষ করে শ্রীমাকে প্রণাম করলেন। তখন শ্রীমা, মা-কালীর ছবি, ঠাকুরের ছবি এবং নিজেকে দেখিয়ে বললেনঃ 'এঁরা এক।'[৪৯] শ্রীমার কী মহিমময় স্বরূপ-প্রকাশ আর সেই ব্রহ্মচারীর কী অচিন্তনীয় সৌভাগ্য! এই প্রসঙ্গে ভক্তদের মনে আসে শ্রীমায়ের প্রতি ঠাকুরের কথাঃ 'সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।' সেইসঙ্গে মনে আসে ঠাকুরের মহাসমাধির পর বিলাপ-রতা শ্রীমার সেই বিচিত্র আক্ষেপঃ 'মা-কালী গো, তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!'[৫০] এ পরমতত্ত্ব সাধারণ বুদ্ধির অতীত।

শ্রীমায়ের স্বরূপ-স্বীকারের একটি অনবদ্য উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর শ্রীমা একবার পদব্রজে কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী আসছেন। সঙ্গে শিবুদাদা (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো), শ্রীমার ভিক্ষাপুত্র। জয়রামবাটীর কাছে মাঠের মধ্যে এক জায়গায় এসে শ্রীমার মনে হল পিছনে শিবুদাদার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। পিছনে ফিরে দেখেন শিবুদাদা বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মা বললেনঃ 'ও কিরে, শিবু, এগিয়ে আয়।' শিবুদাদা বললেনঃ 'একটি কথা বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।' মা জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কি কথা?' শিবুদাদা বললেনঃ 'তুমি কে, বলতে পার?' মা উত্তর দিলেনঃ 'আমি কে? আমি তোর খুড়ী।' শিবুদাদা বললেনঃ 'তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।' তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বিব্রতস্বরে মা বললেনঃ 'দেখ দেখি, আমি আবার কে রে? আমি মানুষ, তোর খুড়ী।' শিবুদাদা উত্তর দিলেনঃ 'বেশ তো, তুমি যাও না।' শিবুদাদাকে নিশ্চল দেখে শ্রীমা শেষে বললেনঃ 'লোকে বলে কালী।' শিবুদাদা বললেনঃ 'কালী তো? ঠিক?' মা বললেনঃ 'হ্যাঁ।' তখন শিবুদাদা খুশী মনে হাঁটতে শুরু করলেন।[৫১]

অনেকদিন পরের ঘটনা। শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় আসবেন। শিবু-দাদা দেখা করতে এসে তাঁর শ্রীচরণে মাথা রেখে কাঁদেন আর বলেনঃ 'তুমি আমার ভার নাও. আর তুমি যা বলেছিলে, তুমি তা-ই কিনা, বল।' শ্রীমা নানাভাবে শিবুদাদাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবুদাদা কেবলই কাঁদেন আর বলতে থাকেনঃ 'বল, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ, আর সাক্ষাৎ মা-কালী কিনা।' শিবুদাদার এই ব্যাকুলতায় শ্রীমায়ের সহসা ভাবান্তর হল। তিনি শিবুদাদার মাথায় হাত রেখে আত্মস্থভাবে শান্তকণ্ঠে বললেনঃ 'হাঁ, তা-ই।'[৫২] সেখানে উপস্থিত স্বামী ঈশানানন্দের তখন শ্রীমাকে দেখে স্থির প্রত্যয় হল—শ্রীমা মানবী নন. তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী।

শ্রীমা কালীরূপে ধরা দিয়েছিলেন তাঁর ডাকাত বাবা-মার কাছেও। তেলোভেলোর প্রকাণ্ড নির্জন প্রান্তরে দিনের শেষে রাতের আগে একাকিনী শ্রীমায়ের সঙ্গে ডাকাতের দেখা হওয়া এবং আনুষঙ্গিক কাহিনী বহু-আলোচিত। এই অভাবনীয় ঘটনা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা সম্ভব। আমরা এই রহস্যের উপর আলোকপাত করতে শ্রীমা ও দস্যু-দম্পতি, উভয়পক্ষেরই উক্তি উপস্থিত করব। শ্রীমা বলছেনঃ 'লোকটা জাতে বাগদি, ডাকাতের মতো রুক্ষ কথায় জিজ্ঞেস করলে, "তুই কে?" আর আমার পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।' যাঁর সঙ্গে মায়ের কথা হচ্ছিল. সেই ভক্ত জানতে চাইলেনঃ 'ডাকাত আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছিল?' শ্রীমাঃ 'পরে বলেছিল. কালীরূপে নাকি দেখেছিল।' ভক্ত বললেনঃ 'তাহলেই হল—আপনি দেখিয়েছিলেন।' শ্রীমা সহাস্যে বলেনঃ 'তা তুমি যা-ই বল না কেন?'[৫৩] শ্রীমা নিজে একবার বাগদি-দম্পতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো?' বাগদি-দম্পতি উত্তর দিয়েছিলঃ 'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও. আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখেছি।'[৫৪] কত শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের যে-সৌভাগ্য হয়নি, দস্যুবৃত্তি-পরায়ণ এই ডাকাত-দম্পতি অনায়াসে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী কি করে হল, ব্যাখ্যা করা কঠিন।

চণ্ডীতে যাঁর মধ্যে 'কৃপা' এবং 'সমরনিষ্ঠুরতা'র যুগপৎ অবস্থানের কথা বলা হয়েছে. ভক্তদের বিশ্বাস, শ্রীমা নরদেহে সেই আদ্যা শক্তি। মায়ের সমগ্র জীবনের যে-কোন অংশেই কৃপা. দয়া, করুণা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় যত সহজে পাওয়া যায়. কঠোর ও প্রচণ্ড রূপের পরিচয় সেই পরিমাণে অবশ্য পাই না। তবে অন্তত একটি ক্ষেত্রে মায়ের মধ্যে রুদ্রাণীরূপের প্রকাশ হয়েছিল এবং তার বর্ণনা আমরা পেয়েছি মায়ের নিজের মুখেঃ 'হরিশ এই সময় [শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পরে মা যখন কামারপুকুরে আছেন] কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি। এসে বাড়ির ভিতর যেই ঢুকেছি, অমনি হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটেছে। হরিশ তখন খেপা। পরিবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাই। তাড়াতাড়ি ধানের হামারের (তখন ঠাকুরের জন্মস্থানের উপর ধানের গোলা ছিল) চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আমি আর পারলুম না। তখন...আমি নিজ-মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে গালে এমন চড়

মারতে লাগলুম যে, ও হে‍ঁ হে‍ঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল।'[৫৫] এখানে 'নিজমূর্তি' কথাটি লক্ষণীয়। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের মতেঃ 'নিজমূর্তি' বলতে মা তাঁর বগলা-স্বরূপের কথা বলেছেন। স্বামীজীও মায়ের সম্বন্ধে বলেছেনঃ 'তিনি বগলার অবতার, সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।... উপরে মহা শান্তভাব কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি।'[৫৬] এই প্রসঙ্গে আর এক ভক্তের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যঃ 'জয়রামবাটীতে একদিন বিকালবেলা শ্রীশ্রীমা কেমন এক ভাবে ভাবিত হইয়া দণ্ডায়মানা বরাভয়া মূর্তিতে নরেশ চক্রবর্তীর পূজা গ্রহণ করেন। পূজার জন্য কিরূপ ফুল সংগ্রহ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছিলেন, সাদা ফুল, হলদে ফুল দুই-ই আনতে বল ; সাদা ফুল ঠাকুর ভালবাসেন, হলদে ফুল আমি ভালবাসি। তিনি সাদা ফুল তাঁহার ডান পায়ে ও হলদে ফুল বাঁ পায়ে দিতে বলেন। হলদে ফুলের কথায় মা বগলা-স্বরূপেরই পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। পীতপুষ্প বগলাপূজার আবশ্যিক উপকরণ।'[৫৭]

সুমতি নামে এক ভদ্রমহিলা স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি শ্রীমাকে লালপাড় শাড়ী দিয়ে চণ্ডীরূপে পুজো করছেন। সেই রকম শাড়ী নিয়ে শ্রীমার কাছে এলে শ্রীমা হাসিমুখে বলেনঃ 'জগদম্বাই স্বপ্ন দিয়েছেন কি বল, মা?'[৫৮] এটি তাঁর নিজের চণ্ডীরূপ স্বীকারের নামান্তর।

ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে, এক দেবীমূর্তি তাঁকে মন্ত্র দিলেন এবং বললেনঃ 'আমি সরস্বতী।' মন্ত্র তিনি জপ করলেন না। এই ঘটনার সাত বছর পর তিনি শ্রীমাকে দর্শন করতে জয়রামবাটী যান। শ্রীমা যখন তাঁকে দীক্ষা দিলেন তখন তাঁর সেই স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রের কথা মনে পড়ল—বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হলেন—জ্ঞান হলে দেখলেন স্বপ্নে দৃষ্ট দেবীমূর্তি ও শ্রীমার মূর্তি এক। মাকে বলতে গেলেন, 'মা, আমি অনেকদিন আগে স্বপ্নে একটি মন্ত্র পাই'—শ্রীমা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'কেন, মিলচে না? ঠিক মিলেচে তো?'[৫৯] আমাদের স্মরণে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীঃ 'ও সরস্বতী।' একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী কেশবানন্দ বললেনঃ 'মা, আপনাদের পরে ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাকে আর কেউ মানবে না।' শ্রীমা বললেনঃ 'মানবে না কেন? তারা তো আমারই অংশ।'[৬০] একবার বলরাম বসুর ভবনে 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয় অনুষ্ঠানে শ্রীমা, গোলাপ-মা, যোগীন-মা সকলে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে দিদিরা সুসজ্জিতা হয়ে পিতৃগৃহে চলেছেন দেখে সতী বেদনাহতা—এই দৃশ্যে শ্রীমার মুখ দিয়ে অসতর্কে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হলঃ 'হায় রে! দিদিরা যে যার চলে গেল, আমারই কেবল যাওয়া হল না।' পাশে ছিলেন গৌরী-মা। তিনি শুনে বললেনঃ 'কি হল এবার, ধরা দিয়ে ফেললে!' শ্রীমা ব্যস্ত হয়ে মিনতি করলেনঃ 'তোমরা চুপ কর।'[৬১] শ্রীমা যে শিবানী সতী,

সে-সম্পর্কে তাঁর স্বমুখের স্বীকৃতি পাওয়া যায় আর একটি ঘটনায়। সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসার আগে তাঁর মা শ্যামাসুন্দরী দেবী প্রায়ই দুঃখ করতেনঃ মেয়ে-জামাই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ হল না, পাগল জামাইয়ের হাতে পড়ে সারদার সংসারে সুখ ভোগ হল না। পতিনিন্দায় অধীরা হয়ে একদিন শান্তশীলা সারদা উগ্রকণ্ঠে বললেনঃ 'দ্যাখ, আমার কাছে বার বার তুমি পাগল পাগল করোনি, বলে দিচ্ছি। একবার পতিনিন্দায় দেহ ছেড়েছি, আবার কি তুমি তা-ই দেখতে চাও?'[৬২]

একবার এক ভক্ত শ্রীমাকে প্রশ্ন করেনঃ 'ঠাকুরকে ও তোমাকে যে ভোগ দিই তা কি ঠাকুর পান? তুমি কি তা পাও?' মা উত্তর দেনঃ 'হ্যাঁ।' ভক্তের প্রশ্নঃ 'বুঝবো কি করে?' মা বলেনঃ 'কেন, গীতায় পড় নাই—ফল, পুষ্প, জল ভগবানকে ভক্তি করে যা দেওয়া যায়, তা তিনি পান।' ভক্ত অবাক হয়ে বলেনঃ 'তবে কি তুমি ভগবান?' মা হেসে উঠলেন।[৬৩] সেই হাসির হেঁয়ালি ভক্ত সম্ভবত ভেদ করতে পারেন না।

অন্য একসময় জনৈক সন্ন্যাসী-সন্তান প্রশ্ন করেনঃ 'মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে?' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে শ্রীমা উত্তর দেনঃ 'আমি আর কে, আমিও ভগবতী।'[৬৪] চৈতন্যরূপিণী শ্রীমা বিশ্বের সকল মানুষ শুধু নয়, সকল জীবের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেন। একবার জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় আসার সময় বলেছিলেনঃ 'দেখ, জ্ঞান, বেরালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।'[৬৫] তাঁর ভাগবতী-দৃষ্টিতে সব এক—ভেদাভেদের স্থান নেই। এক ভক্ত শুনেছিলেন—মা সাক্ষাৎ কালী—আদ্যা শক্তি, ভগবতী। সেকথা তিনি শ্রীমার নিজের মুখে শুনতে চান। তিনি শ্রীমাকে বলেনঃ 'তোমার কথা যা শুনেছি, তা আমি বিশ্বাস করি।...তোমার নিজের মুখেই শুনতে চাই, ওকথা সত্য কিনা।' শ্রীমার কণ্ঠে উচ্চারিত হলঃ 'হ্যাঁ, সত্য।'[৬৬] গীতায় এইরূপ স্বীকৃতির উল্লেখ আছে। আছে চণ্ডীতেও। মহাদেবী শ্রীমারও স্বরূপ-মাহাত্ম্য তাঁর শ্রীমুখেই উদ্ঘাটিত!

শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেই শ্রীমা সীমাহীন মাতৃত্বের বিশ্ব-বিমোহন প্রেম নিয়ে মহিমান্বিতা দেবী-মাতৃকারূপে এবং পার্থিব-অপার্থিব সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে বিশ্ববিজয়িনী সঙ্ঘজননী ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নেত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। রেল-স্টেশনের পশ্চিমা কুলির কাছে 'মা জানকী'রূপে আর মনস্বিনী বিদেশিনীর কাছে যীশুমাতা মেরীরূপে প্রতিভাত, এক নতুন জীবন-দর্শনের রচয়িত্রী সারদাদেবীর মহাজীবন এক মহাকাব্য। অবতার-শক্তির এমন প্রকাশ অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। অবতার ও তাঁর শক্তি অবতীর্ণ হন যুগ-প্রয়োজনে। বর্তমান যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নারী-জাগরণ—তাই প্রয়োজন নারীমুক্তি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাঙ্গনে নারীর ভূমিকা অভাবনীয়, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে সারদাদেবীর অবদান অপরিমেয়। শ্রীমা নিজে বলেছেনঃ 'ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'[৬৭] শ্রীমার ঐশী মাতৃত্বের অহেতুকী কৃপাবারি প্রবহনের শুরু

হয় দক্ষিণেশ্বর থেকেই—সেটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর সার্বজনীন মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যে। শ্রীমার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। দেবী যশোধরা এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার নেতৃত্বের দিকটি ছিল অপ্রকাশিত। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নেতৃত্ব আজও পৃথিবীর অন্য কোথাও স্বীকৃত নয়।

শ্রীমা সারদাদেবীর দেবীত্বময় মাতৃত্বের পরিচয় সর্বান্তঃকরণে সকল সন্তানের সতত কল্যাণসাধনের মধ্যে। স্বামী অরূপানন্দ প্রশ্ন করলেনঃ 'তুমি কি সকলেরই মা?' শ্রীমার সহজ উত্তরঃ 'হ্যাঁ।' আবার প্রশ্নঃ 'এইসব ইতর জীবজন্তুরও?' শ্রীমার স্থির উত্তরঃ 'হ্যাঁ, ওদেরও।'[৬৮] বিশ্বজননী স্বমুখে প্রকাশ করলেন তাঁর বিশ্বজননীত্ব। তিনি ঘোষণা করলেনঃ 'ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি।'[৬৯] তাঁর শ্রীমুখের এই মহা-অঙ্গীকার ভক্ত-সন্তানদের শান্তি-মুক্তির আনন্দ-অমৃত-রাজ্যে উত্তরণের সিংহদ্বার। 'আমি মা, জগতের মা, সকলের মা'[৭০]—শ্রীমার শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই বাণী শাশ্বত সত্য। 'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।'[৭১]—মর্তধাম ছেড়ে নিত্যধামে মহাপ্রয়াণের পূর্বলগ্নে স্বমহিমায় উদ্ভাসিতা চিরকল্যাণময়ী বিশ্বজননীর করুণা-কোমল কণ্ঠের অবিনাশী অঙ্গীকার।

পরিশিষ্ট

স্মৃতি-সংকলন

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি আমি প্রথম বেলুড় মঠে আসি। দুমাস মঠে থাকার পর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে জয়রামবাটী যাই। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল জুন মাস। এক ভদ্রলোক জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে একখানা চিঠিও লিখে দিলেন তিনি। আমরা জয়রামবাটীর পথে বেরিয়ে পড়লাম। হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন রেলে চেপে আমরা চাঁপাডাঙায় পেঁৗছালাম। হাওড়া থেকে চাঁপাডাঙার দূরত্ব কতটা তা আমার জানা ছিল না। তবে এটা মনে আছে হাওড়া থেকে বিকেল তিনটে বা সাড়ে তিনটেয় ট্রেনে চেপেছিলাম, আর চাঁপাডাঙায় পেঁৗছেছিলাম রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। মার্টিন ট্রেন চলত ধীর গতিতে, ঠিক যেমন ট্রাম চলে তেমনি, এমনকি ট্রামের চেয়েও ধীরে ধীরে। ঐ ট্রেনে আরও দুজন যুবক[১] যাচ্ছিল, তারাও আমাদের সঙ্গে চাঁপাডাঙায় নেমে পড়ল। সে রাতটা আমরা চাঁপাডাঙা স্টেশনেই কাটালাম। স্টেশন মানে ছোট একটা কামরা, তার অর্ধেকটায় আবার ছাদ নেই। পরদিন সকালে জয়রাম-বাটীর পথে হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুদূর যাবার পর ঐ যে দুজন যুবক আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল, তাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ল। দেখা গেল তার আমাশা, কাজেই তার বন্ধুটি তার জন্যে একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করল। কিন্তু আমাশা বেড়েই চলল। ঐ যুবক দুটি তখন বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফিরে গেল। তাদের জন্যে আমাদের বেশ অনেকটা সময় পথে দেরি হল। যাহোক, আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। বড় গরম ছিল। আমার মনে পড়ে না দুপুরের খাওয়ার জন্য অথবা বিশ্রাম করার জন্য আমরা পথে কোথাও থেমেছিলাম কিনা। যাহোক, আমরা যখন দ্বারকেশ্বর নদ পেঁৗছালাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সে রাতে আর কামারপুকুরে যাবার সময় ছিল না। সে রাতটা আমরা দ্বারকেশ্বরের পাড়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। অনেক গাড়োয়ানকেও দেখলাম বালুর চড়াতে শুয়ে থাকতে। তারা গাড়ি থেকে গরুগুলোকে খুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে আমরা কামারপুকুরের দিকে রওনা হলাম। কামার-পুকুরে পেঁৗছাতে দশটা বেজে গেল। শিবুদার (ঠাকুরের ভাইপোর) সঙ্গে দেখা হল, তিনি তখন বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের পরিচয় নিয়ে যখন বুঝলেন যে, আমরা জয়রামবাটী যাচ্ছি তখন তিনি বাড়ির ভেতর চলে গেলেন আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। আমরা হালদারপুকুরে স্নান করে খেয়ে নিলাম এবং একটু বিশ্রামের পর জয়রামবাটী রওনা হলাম। আমরা যখন জয়রামবাটীতে

পৌঁছালাম তখন বিকেল চারটে কি সাড়ে চারটে। এখন যেটাকে মায়ের নতুন বাড়ি বলা হয় সেটা তখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি। তার সংলগ্ন বাইরের দিকটায় যে বৈঠকখানা, সেখানে পুরুষ-ভক্তরা কেউ মায়ের কাছে এলে তাদের থাকতে দেওয়া হত। আমাদেরও সেখানে থাকতে দেওয়া হল। মা তখন থাকতেন তাঁর পুরনো বাড়িতে। আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ির উঠোনে ঢুকে দেখি মা বারান্দায় বসে রাত্রের রান্নার জন্য তরকারি কাটছেন। আর কেউ তখন সেখানে ছিল না। পুরুষরা আসছে বলে বোধহয় মেয়েরা সব সরে গিয়েছিল। আমরা মাকে প্রণাম করলাম। আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি মাকে স্বামী প্রেমানন্দের চিঠির কথা বললেন। মা একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন চিঠিটা তাঁকে পড়ে শোনাতে। চিঠি পড়া হলে মা বললেনঃ 'বেশ, কালই ওদের দীক্ষা হবে।' আমরা নতুন বাড়ির বৈঠকখানায় ফিরে এলাম।

পরদিন আমরা দীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। মা সকালবেলা ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষার জন্যে আমাদের এক এক করে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের দীক্ষা হয়ে গেল। মা সাধারণত ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষা দিতেন। তবে এ-বিষয়ে তাঁর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। যে-কোন সময়ে, যে-কোন অবস্থাতেই দীক্ষা দিতেন। একবার বিষ্ণুপুর স্টেশনের এক কুলিকে রেল-প্ল্যাটফর্মেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনটে খড় মাটিতে পর পর সাজিয়ে তাতে তাকে বসতে বললেন—যেন ঐ খড়-তিনটে আসন। তারপর তাকে দীক্ষা দিলেন। আর একবার একটি মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এই মহিলাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন, একসঙ্গে খেলাধুলোও করেছেন। দুপুরবেলা খাওয়ার পর একসঙ্গে মায়ের ঘরে পাশাপাশি শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। এই অবস্থাতেই মা তাঁকে দীক্ষা দিলেন। এ-থেকে বোঝা যায় দীক্ষার ব্যাপারে মা কোন বিশেষ নিয়ম মানতেন না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার ছিল এই যে, কেউ আধ্যাত্মিক উপদেশ-প্রার্থী হয়ে এলে মা তাকে কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। যে এসেছে সে-ই পেয়েছে। মা বলতেনঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেরা সেরা আধারগুলিকে বেছে নিয়েছেন, যত আজেবাজেগুলি আমার জন্যে রেখে গেছেন। এজন্যেই আমার যত ভোগ।' একথা বললেও, কেউ দীক্ষা নিতে চাইলে মা তাকে হতাশ করতেন না। দেশের সর্বত্র তখন জোর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলছে। যেসব ছেলেরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তারা মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসত প্রণাম জানাতে বা দীক্ষা নিতে। পুলিস তাদের পিছনে পিছনে ঘুরত, আর তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখত। পুলিসের গোয়েন্দারা মায়ের বাড়ির উপরও নজর রাখত। মা কিন্তু সেসব গ্রাহ্য করতেন না। একবার দুজন যুবক এল। দুজনই রাজদ্রোহী। মা তাদের স্নান করতে পাঠালেন, তারা স্নান করে এলে তাদের দীক্ষা দিলেন। তারপর তাদের খাইয়ে-দাইয়ে তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলে যেতে বললেন। এসব ছেলেদেরও দীক্ষা দিতে মা এতটুকু ভয় পেতেন না। মা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। মা যখন উদ্বোধনে অত্যন্ত অসুস্থ, তখন একদিন এক পারসী যুবক এসে উপস্থিত। তিনি মঠে অতিথি হয়ে কয়েকদিন ধরে বাস করছিলেন। এখন মায়ের কাছে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে। মায়ের তখন এত অসুখ যে দর্শন একেবারে বন্ধ। এই যুবকটি নিচে

বসে রইলেন, তাঁকে দোতলায় যেতে দেওয়া হল না। মা কিন্তু কিভাবে জেনে গেলেন যে, এই যুবকটি নিচে তাঁর দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি তখন এক-জনকে বললেন তাঁকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে আসতে। মা তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নিচে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করলেনঃ 'মায়ের যদি এক পারসী শিষ্য করার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলে আমার আর কি বলার আছে ?' এই পারসী যুবকটি আর কেউ নয়, চিত্রজগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক বম্বের সোরাব মোদি।

শ্রীমায়ের মধ্যে আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিঃ বাইরে থেকে তাঁর চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যেত না, যাতে বোঝা যায় যে, তিনিই শ্রীশ্রীমা। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি এক সাধারণ পল্লীরমণী। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যখন তিনি বসে থাকতেন, তখন তিনি যে আমাদের 'মা' তা বুঝতে পারা যেত না। গিরিশবাবু তাই বলতেনঃ 'এই যে মহিলা, গ্রামের সাধারণ বউটির মতো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই যে জগতের রাজরাজেশ্বরী, তা কে বলবে?' স্বামী সারদানন্দ একবার বলে-ছিলেনঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরের ভাব বাইরে থেকে খানিকটা ধরা যেত, মায়ের কিন্তু কিছুই বোঝা যেত না। ভাব চেপে রাখার অসম্ভব ক্ষমতা ছিল তাঁর। বাইরে তাঁর ভাবের এতটুকু প্রকাশ নেই। মা যেন মোটা কাপড়ের এক ঘোমটা দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে রেখেছেন। তাই কেউ তাঁকে একটুও দেখতে পাচ্ছে না।' মায়ের যে দিব্য ব্যক্তিত্ব তা সহজে কেউ বুঝতে পারত না। মা মাদ্রাজে আসছেন শুনে সেখানকার লোকেরা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল মা বক্তৃতা করবেন কিনা। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বললেনঃ 'না।'

মা কারও মধ্যে ত্যাগের ভাব দেখতে পেলে খুশী হতেন। যাদের মধ্যে ত্যাগের ভাব দেখতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন। একবার মা বলেছিলেনঃ 'সবাই বলে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয় প্রচার করতে এসেছিলেন। তিনি যে বিভিন্ন ধর্ম সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধর্মে কিভাবে ঈশ্বরকে ডাকে তা জানা।' তাই মায়ের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ্য শিক্ষা ধর্মসমন্বয় নয়, তিনি ত্যাগ কি বস্তু তা তাঁর জীবন দিয়ে লোককে শেখাতে এসেছিলেন। এই যুগের আদর্শ হিসাবে তিনি জগৎকে যা দিয়ে গেলেন তার মধ্যে এই ত্যাগের আদর্শই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। মা বলতেনঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের মতন ত্যাগের কথা এর আগে কেউ কখনও শোনেওনি। মা নিজেও এই ত্যাগের আদর্শের উপর জোর দিতেন। স্বামীজী বলতেনঃ 'ত্যাগ ও সেবা হচ্ছে এই জাতির দুটি মহান্ আদর্শ। যদি এই আদর্শ ধরে আমরা থাকতে পারি, তাহলে আমাদের সব ঠিক চলবে!' মা-ও তাই তাঁর নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে এই ত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে গেলেন। আজ বিশ্বব্যাপী স্বার্থপরতা, যেন-তেন প্রকারেণ স্বার্থসিদ্ধি অসদুপায়ে অর্থোপার্জন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, এই ত্যাগের আদর্শের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী।

আমি আগেই বলেছি; মা সবাইকে এই ত্যাগের পথে চলতে উৎসাহ দিতেন। একবার এক ভদ্রলোক বাংলার কোন এক অঞ্চল থেকে মায়ের কাছে এলেন। তাঁর ইচ্ছা—তিনি সংসার ত্যাগ করে হৃষীকেশ বা ঐরকম কোন জায়গায় গিয়ে সাধনভজনে জীবন কাটান। কিন্তু তিনি বিবাহিত, একটি সন্তানও আছে। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে তুমুল

তর্কের ঝড় উঠল—এরকম লোক কি করে সাধু হতে পারে? এসব অনেক কথা অনেকে বলতে লাগল। মা কিন্তু একটি কথাও বলছেন না, একেবারে চুপ। কয়েকদিন পরে যখন সব ঝড় থেমে গেছে, তখন একদিন মা ঐ ভদ্রলোকটিকে ডেকে 'গেরুয়া' দিয়ে হৃষীকেশে যাবার অনুমতি দিলেন। পরবর্তীকালে তিনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের একজন বিশেষ সম্মানীয় সাধুরূপে গণ্য হয়েছিলেন।

জয়রামবাটীতে একটি যুবক ছিল—খুব ভাল। সে ভাল গান গাইতে পারত। আর সবাই তাকে ভালবাসত। একদিন হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ, কোথায় গেছে কেউ জানে না। কয়েকবছর পরে সে গ্রামে ফিরে এল। সে ফিরে এসেছে দেখে গ্রামে খুব উত্তেজনা। অনেকে তাকে দেখতে এসেছে। তাকে যেন সবাই ঘেরাও করে রেখেছে, আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে। গ্রামে এমন সাড়া পড়ে গেছে যে. মায়েরও কৌতূহল হল কি ব্যাপার জানতে। সাধারণত মা পাড়ায় কারও বাড়িতে যেতেন না। সেদিন কিন্তু মা ভাবলেন—যাই ব্যাপারটা কি দেখে আসি। মা ঐ ছেলেটির বাড়িতে গেলেন। দেখেন তখনও বহু লোক তাকে ঘিরে রয়েছে, আর বলছে, 'কেন তুমি না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে', 'এত বছর কোথায় ছিলে',. 'এভাবে আর পালিয়ে যেও না' ইত্যাদি। মা কিন্তু কিছু বললেন না, চুপ করে সব শুনতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেনঃ 'বাবা, তুমি সাধু হয়ে ভালই করেছ।' তিনবার এই কথাটি বললেন। তারপর দুপুরে তাঁর কাছে এসে প্রসাদ পেতে বললেন।

মাঝে মাঝে কলকাতায় ভক্তেরা এসে মাকে বলতেন যে, ভাল পাত্র পাচ্ছেন না বলে তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছেন না। এ-সম্পর্কে মা বলতেনঃ 'কেন বাবা-মা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বলে এত দুঃখ-আক্ষেপ করে? মেয়েকে নিবেদিতা স্কুলে সুধীরার কাছে পাঠায় না কেন?' এই হচ্ছে মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি।

সবার প্রতি মায়ের কী দরদ, কী ভালবাসা! যে একবার এই ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছে, সে কখনও তা ভুলতে পারবে না। একটি মেয়ে মায়ের কাছে আসত তরি-তরকারি বেচতে। দেখা গেল—মায়ের শরীর যাবার পরেও সে মাঝে মাঝে আসে, কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ 'এখন আর তুমি কি জন্যে আস?' তখন সে উত্তরে বললেঃ 'মায়ের এত ভালবাসা পেয়েছি যে, তাঁকে আর কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তাই এখানে আসি, কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যাই। এতেই আমার খুব আনন্দ হয়।'

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাজারে স্পিরিট পাওয়া খুব শক্ত ছিল, কারণ যুদ্ধের কাজে স্পিরিটের তখন ভয়ানক চাহিদা। সাধারণত এক বোতল স্পিরিটের দাম ছিল ছ-আনা, কিন্তু তখন অনেক দাম দিয়েও বাজারে স্পিরিট পাওয়া যেত না। একজন ভক্ত কোন রকমে জয়রামবাটীর ডিসপেনসারির জন্যে কয়েক বোতল স্পিরিট জোগাড় করেছিলেন। মায়ের পায়ে বাত ছিল, সেজন্যে বেশ কষ্ট পেতেন। স্পিরিট দিয়ে মালিশ করলে তাঁর একটু আরাম হত। ঐ ভদ্রলোক যে-স্পিরিট এনে দিয়েছিলেন, তা থেকে একটু নিয়ে মাকে ব্যবহার করতে বলা হল। মা কিন্তু রাজী হলেন না। তিনি বললেনঃ 'ঐ স্পিরিট এসেছে গরীবদের জন্যে, তাদের বঞ্চিত করে আমার নিজের আরামের জন্যে তা আমি ব্যবহার করতে পারব না।' মায়ের কি দৃষ্টিভঙ্গি, তা এ-থেকেই বোঝা যাবে।

আর একবার এক ভক্ত এসে মাকে বললেনঃ 'মা, অমুক মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে এক উইল করে তিনি বেলুড় মঠ এবং প্রাচীন সাধুদের জন্য প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন।' মা চুপ করে সব শুনলেন। ঐ ভক্তের কথা শেষ হলে মা বললেনঃ 'তা বেশ, তিনি যা করেছেন তা তো সব শুনলাম, কিন্তু তিনি গরীব-দুঃখীদের জন্যে কি কিছু রেখে গেছেন?' ভক্তটি আর কি বলবেন, চুপ করে থাকলেন, কারণ সত্যি সত্যিই ঐ ব্যক্তি গরীবদের জন্যে কিছু রেখে যাননি। গরীব-দুঃখীদের জন্যে তাঁর প্রাণ কিরকম কাঁদত, তা এ-থেকে বোঝা যায়। স্বামীজীও বলতেনঃ গরীব-দুঃখী বা যারা সমাজে পিছিয়ে আছে, তাদের অবহেলা করার ফলেই আজ বিদেশী শক্তি এদেশে রাজত্ব করতে পারছে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে আমরা উপেক্ষা করে এসেছি, তাই আজ হাজার বছর ধরে আমরা বিদেশী শক্তির পদানত হয়ে আছি। তাই মা-ও আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, গরীব-দুঃখীদের তোলা যেন আমাদের প্রথম কর্তব্য হয়। স্বামীজী আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন—এই আদর্শ থেকে যেন আমরা কখনও বিচ্যুত না হই।

যা আমার মাথায় এখন আসছে এমন দু-চারটে বিক্ষিপ্ত কথা বলব।

একদিন মায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবী মাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আচ্ছা, বল তো এক পায়ের উপর আর এক পা দিয়ে বসেন ঐ দেবীর নাম কি?' মা বললেনঃ 'জগদ্ধাত্রী।' শ্যামাসুন্দরী দেবী বললেনঃ 'আমার ওঁর পুজো করতে ইচ্ছে করছে।' পর পর দু বছর জগদ্ধাত্রীপুজো হল। পরের বছর আবার যখন মায়ের মা পুজো করার কথা বললেন, তখন মা আপত্তি করে বললেনঃ 'এসব হাঙ্গামা পোয়াতে আমার আর ভাল লাগে না।' শেষপর্যন্ত মা অবশ্য রাজী হলেন, পুজোও হল। প্রথমবার পুজোর আগে কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হয়। মা স্বামী শান্তানন্দকে পরে বলেছিলেনঃ 'বৃষ্টির জন্যে পুজোর প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র শুকোন হল না। কিন্তু মজা এই, দেখা গেল চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের উঠোনে রোদ।' এ এক অলৌকিক ব্যাপার, কিন্তু এটা সত্য ঘটনা।

আর একবারের ঘটনা—সে ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। মহাসমাধির পরদিন মায়ের শরীর মঠে আনা হল। এখন যেখানে তাঁর মন্দির সেখানেই তাঁর স্থূল শরীর দাহ করা হয়। তখনও কোন ঘাট হয়নি। তবে ওখানে গঙ্গার পাড়টা নদীর দিকে ঢালু ছিল। যথাসময়ে চিতা সাজিয়ে আগুন দেওয়া হল। চিতা জ্বলছে। ঠিক ঐ-সময় দেখা গেল গঙ্গার অপর তীরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এমন বৃষ্টি যে ওপারের ঘরবাড়ি, গাছপালা কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বৃষ্টি গঙ্গার মাঝামাঝি পর্যন্ত এল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এপারে তখন বেলুড় মঠে খটখটে রোদ। চিতা যথারীতি জ্বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মায়ের দেহ সম্পূর্ণ দাহ হয়ে গেল। এবার চিতার আগুন নেভাতে হবে। সেখানে একজন ছিলেন—তিনি তান্ত্রিক। তিনি চেয়েছিলেন, তান্ত্রিক বিধিতে আগুন নেভানো হোক। সেজন্য যেসব জিনিসের দরকার ছিল, তা তখন ওখানে ছিল না। তিনি তাই সেসব আনতে বাজারে গিয়েছিলেন। তাঁর ফিরতে দেরি হচ্ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) অধৈর্য হয়ে বড় একটা কলসি নিয়ে গঙ্গা থেকে জল ভরে এনে শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) বললেনঃ 'আপনি জল ঢেলে চিতা নেভান। আমাদের আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।' শরৎ

মহারাজ চিতায় জল ঢাললেন। অনেকেই এর মধ্যে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসেছে চিতায় ঢালবার জন্য। কিন্তু কারুরই আর ঢালা হল না। শরৎ মহারাজের যেই চিতায় জল ঢালা শেষ হল সঙ্গে সঙ্গে ওপারের বৃষ্টি এপারেও এসে গেল। সে এমন জোর বৃষ্টি যে, তাতেই তৎক্ষণাৎ চিতার আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেল। ফলে শরৎ মহারাজের পরে কারও আর জল ঢালা হল না। আমরা সবাই বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেলাম। এরকম ঘটনাও ঘটে। শুনতে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক মনে হলেও বাস্তব এ ঘটনা।

একবার এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'মা, আমাদের দেশ কবে স্বাধীন হবে?' মা স্পষ্টভাষায় বলে দিলেনঃ 'বাবা, তোমরা কি তাদের (ব্রিটিশদের) দেশ থেকে তাড়াতে পারবে? তা পারবে না। ওদের যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগবে তখন তোমরা স্বাধীন হবে।' ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে, বহুদিন আগে তিনি যা বলেছিলেন তা-ই সত্য হয়েছে। আমরা অবশ্য বলতে পারি আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিলাম, তাই স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু আসল কথা এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যদি না হত, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা পেতে আরও অনেক বছর লেগে যেত। স্বামীজীও বলতেনঃ 'এরা অর্থাৎ "ব্রিটিশরা" চোরের মতো পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের দেশে ঢুকেছে, আর তারা এদেশ ছেড়ে যাবেও সেইভাবে, কোন রক্তপাত ঘটবে না। রক্তপাতহীন এক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ভারত স্বাধীন হবে।' আজ আমরা জানি, আমাদের স্বাধীনতালাভের সময় রক্তপাত হয়নি। বিনা রক্তপাতেই এক বিপ্লব ঘটে গেল।

মাঝে মাঝে ভক্তেরা মাকে বলতঃ 'মা, আমাদের কিছুই হচ্ছে না। ধ্যান-জপ করি, কিন্তু তাতেও কোন আনন্দ পাই না।' মা বলতেনঃ 'একথা অনেকেই এসে বলে আমাকে, কিন্তু তারা রোজ দশ-পনের হাজার জপ করুক দেখি, তখন কেমন আনন্দ না পায় দেখব।' এইটি মা প্রায়ই বলতেন। মা আরও বলতেনঃ 'মুনিঋষিরা ঈশ্বরলাভের জন্যে কত জন্ম কাটিয়েছেন তপস্যা করে, আর তোমরা ঈশ্বরলাভ করতে চাও কিছু না করে ফাঁকি দিয়ে। বিনা চেষ্টাতেই কি তা সম্ভব? যা চাও তা পেতে গেলে উঠে-পড়ে লাগতে হবে। সবাই আসে, আর বলে—"কৃপা, কৃপা।" কৃপা কি করবে? কৃপা গিয়ে ফিরে আসে।' কৃপা যার কাছে এল, সে যদি প্রস্তুত না থাকে, তাহলে কৃপা এসেও ফিরে যাবে। তবে মা সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বলতেনঃ 'এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে ঈশ্বরলাভের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গেছেন, যে-কেউ একটু উদ্যোগী হয়ে ঈশ্বরচিন্তা করবে, সে-ই তাঁকে পেয়ে যাবে।'

মায়ের শেষ উপদেশ ছিলঃ 'কারও দোষ দেখো না।' আর একটি কথা বলতেনঃ 'যখন তোমরা কোন সমস্যায় পড়বে, যখন কোন মানসিক অশান্তি আসবে, তখন মনে রাখবে তোমাদের একজন মা আছেন।' বিপদ-আপদ যা-ই আসুক আমরা যেন মাকে ডাকতে পারি, তাহলে মা আমাদের দেখবেন, আর আমাদের ভয়-ভাবনা সব দূরে চলে যাবে। মা আমাদের কৃপা করুন—এ-ই তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা।[২]

ইংরেজী থেকে অনুবাদঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

স্বামী নির্বাণানন্দ

মাকে আমি প্রথম দেখি কাশী সেবাশ্রমে। যতদূর মনে পড়ে সেটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথমদিকের ঘটনা।[১] কালীপুজোর পরদিন মা এসেছিলেন সেবাশ্রমে। আমি সেবাশ্রমে এসেছি এর কদিন আগে মাত্র—সঙ্ঘে যোগদানের উদ্দেশ্য নিয়ে। এখানে আসার আগেই আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও অন্যান্য সূত্রে শ্রীমায়ের কথা জেনেছিলাম। মহারাজও (স্বামী ব্রহ্মানন্দও) তখন সেবাশ্রমে অবস্থান করছিলেন। মা ছিলেন অদ্বৈত আশ্রমের কাছে বাগবাজারের কিরণ দত্তদের বাড়ি 'লক্ষ্মীনিবাসে'। মা সেদিন সেবাশ্রমের সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন। সেবাশ্রমের সাধুদের নারায়ণ-জ্ঞানে রোগীর সেবা দেখে মা অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ 'দেখছি ঠাকুর এখানে স্বয়ং বিরাজ করছেন। আর আমার ছেলেরা প্রাণপণে রোগীদের সেবা করে তাঁরই পূজা করছে।' অনেকক্ষণ সেবাশ্রমে কাটিয়ে মা 'লক্ষ্মীনিবাসে' ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই চারু মহারাজের (স্বামী শুভানন্দের) কাছে একটা দশটাকার নোট পাঠিয়ে দিলেন মা। চারু মহারাজ কাশী সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তখনও তিনি অবশ্য সাধু হননি। তখন তিনি চারুবাবু—চারুচন্দ্র দাস। যিনি টাকাটা নিয়ে এসেছিলেন তিনি বললেনঃ 'মা সেবাশ্রমের কাজ দেখে খুব খুশী হয়েছেন। তাই এই টাকা পাঠালেন। মা আরও বলেছেন, "সেবাশ্রম দেখে আমার এত ভাল লেগেছে যে, এখানেই স্থায়িভাবে থাকতে ইচ্ছা করছে।"' সেকথা শুনে মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ, কেদারবাবা (স্বামী অচলানন্দ), চারু মহারাজ প্রভৃতির সে কী আনন্দ! মাস্টারমশাইও তখন কাশীতে ছিলেন। সেবাশ্রমের কাজ তাঁর মনঃপূত ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল রোগীর সেবা, হাসপাতাল চালানো—এগুলি সাধুদের কাজ নয়। এসব ঠাকুরের ভাবেরও পরিপন্থী। সাধুরা শুধু সাধনভজন নিয়ে থাকবেন। সেবাশ্রম দেখে মায়ের মন্তব্য এবং দশটাকা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে মহারাজ মাস্টারমশাইকে বললেনঃ 'শুনলেন তো সব?' মাস্টারমশাই বললেনঃ 'মা যখন বলেছেন তখন আর কি কথা। এসব নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাজ—না মেনে উপায় আছে?'

মা সেবার কাশীতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। মাঝে মাঝে অদ্বৈত আশ্রমে এবং সেবাশ্রমে তাঁর পদধূলি পড়ত। মহারাজ রোজই সকালে 'লক্ষ্মীনিবাসে' যেতেন মাকে প্রণাম করতে। সঙ্গে আমরাও থাকতাম কখনও কখনও। মায়ের সঙ্গে তখন কথা খুব বেশী না হলেও মা আমাকে যে বিশেষ স্নেহ করতেন তা টের পেতাম।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে মহারাজের নির্দেশে সেবাশ্রম থেকে মঠে আসি। মা তখন উদ্বোধনে। মঠে ফিরে আসার পর মাকে দর্শন করতে উদ্বোধনে গিয়েছি। মঠে আসার আগে মাস-দুয়েক বন্যাত্রাণের কাজে কাশী থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলাম। পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে আমার শরীর তখন একটু খারাপ হয়েছিল বোধহয়. মায়ের চোখে তা এড়ায়নি। আমাকে দেখেই খুব উদ্বেগ-ব্যাকুল স্বরে মা বললেনঃ 'এ কি চেহারা করেছ তুমি?' আমি বললামঃ 'কিছুদিন বন্যাত্রাণের কাজে থাকতে হয়েছে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। সেজন্য হয়তো শরীর একটু খারাপ হয়েছে।' মা বললেনঃ 'একটু না, বেশ খারাপ করেছ শরীর। এবার

কদিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করে শরীর সেরে নাও। কত কাজ করবে তোমরা ঠাকুরের। শরীর ঠিক না হলে কি করে চলবে?' মঠে ফেরার সময় আবার মা ঐকথা মনে করিয়ে দিলেন। সেবার মঠে কয়েকমাস মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। এই সময় আমার মনে উত্তরাখণ্ডে গিয়ে কিছুদিন তপস্যা করার জন্য প্রবল বাসনা হয়। মা আছেন 'উদ্বোধনে'র বাড়িতে। সেখানে গিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালাম তপস্যায় যাবার অনুমতি দিতে। মা প্রথমটায় কিছুতে রাজী হলেন না। ব্যাকুলভাবে বললেনঃ 'না বাবা, তুমি ছেলেমানুষ। তোমার এখন তপস্যায় গিয়ে কাজ নেই। সেখানে কোথায় থাকবে, খাওয়া কি করে জুটবে?' কিন্তু আমিও ছাড়ব না। মাকে মিনতি করতে থাকি অনুমতি দেওয়ার জন্য। মা আবার বলেনঃ 'না বাবা, তোমার কষ্ট হবে। তপস্যায় যাবার দরকার নেই বাবা তোমার।' মায়ের কণ্ঠে ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠা যেন ঝরে পড়ে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। বার বার মিনতি করে যেতে থাকি যাতে তিনি অনুমতি দেন। মা শেষে বললেনঃ 'আচ্ছা বাবা, তপস্যার জন্য যখন তুমি এত ব্যাকুল হয়েছ, তখন বলি, তুমি বাবা কাশী যাও। সেখানে সেবাশ্রমে থাকবে আর বাইরে ভিক্ষা করে খাবে। অন্য কোথাও আর যেও না।' আমি তখন মাকে বললামঃ 'আমি কিন্তু মা তাহলে পায়ে হেঁটে কাশী যাব।' মা প্রথমে তাতে রাজী হননি। পরে আমার মিনতিতে রাজী হন। বিদায় নেবার আগে মা আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেনঃ 'খুব আশীর্বাদ করছি বাবা, তোমার সিদ্ধি হোক।' একদিন মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পদব্রজে কাশী রওনা হলাম। সেবার সাত-আট মাস কাশী সেবাশ্রমে ছিলাম। কাশী থেকে মঠে ফিরে এসে আবার মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হলাম।[২]

মহারাজ বলরাম-মন্দিরে থাকতে খুব ভালবাসতেন। প্রায়ই মঠ থেকে আসতেন বলরাম-মন্দিরে। বলরাম-মন্দিরে মহারাজের কাছে থাকবার সুবাদে প্রায়ই উদ্বোধনে যেতাম। তাই তখন মাকে প্রণাম ও দর্শন করার সৌভাগ্য প্রায় রোজই হত। কথাবার্তাও হত। মায়ের গলার স্বর খুবই মিষ্টি ছিল। অন্যদের সামনে সাধারণত লম্বা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখলেও আমি কখনও মাকে ঐভাবে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমি মাকে যখনই দেখেছি, মায়ের শ্রীমুখ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে।

মায়ের শেষ অসুখের সময় মহারাজ ছিলেন ভুবনেশ্বরে। আমিও ছিলাম সেখানে তাঁর সেবায়। মায়ের মহাসমাধির দিন (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই, মঙ্গলবার) রাত দেড়টা নাগাদ আমি মহারাজের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি একটি আলোয়ানে সারা শরীর ঢেকে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। মুখ খুব গম্ভীর। আমাকে দেখে মহারাজ বললেনঃ 'সুজ্জু, রাত এখন কত? কেন জানি না মা-ঠাকরুনের জন্যে মনটা কেমন করছে। তিনি কেমন আছেন কে জানে।' আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ 'শোবেন না?' মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। মহারাজের মুখের ঐ গম্ভীর ভাব দেখে এবং মায়ের জন্যে তাঁর মন-খারাপের কথা জেনে, তাঁর মন একটু হাল্কা করার জন্যে বললামঃ 'তামাক সেজে নিয়ে আসব মহারাজ?' মহারাজ কোন উত্তর না দিয়ে

একইভাবে বসে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। আস্তে আস্তে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরদিন সকালে মহারাজকে একটু অস্থির বলে মনে হল। অন্যান্য দিন সকালে একটু বেড়াতে বেরোতেন। সেদিন গেলেন না। সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। সেদিনই পোস্টাপিস থেকে পিওন একটি টেলিগ্রাম নিয়ে এল। শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দের) টেলিগ্রামঃ আগের রাত্রে দেড়টার সময় উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমা দেহরক্ষা করেছেন। আমার মনে পড়লঃ গতরাত্রে প্রায় ঐসময়েই মহারাজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলেন আর বলেছিলেন মায়ের জন্যে মন কেমন করছে। খবরটি পেয়ে মহারাজের মুখ এক অব্যক্ত বেদনায় থম্‌থম্ করতে লাগল। তিনি শুয়ে পড়লেন। খানিক পরে আবার উঠে বসলেন। বললেনঃ 'আমি হবিষ্যি করব। মায়ের শিষ্য যারা আছে তারা তিনদিন হবিষ্যি করবে, জুতো পরবে না।' তিনদিন তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেননি। বারো-দিন হবিষ্যান্ন খেয়েছিলেন এবং জুতো ব্যবহার করেননি। একদিন বললেনঃ 'এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম।'

শুনেছি, মায়ের শরীর দাহ হয়ে যাবার পর মহাপুরুষ মহারাজ উপস্থিত সাধু ও ভক্তদের বলেছিলেনঃ সতীর শরীরের এক একটি অঙ্গ বুকে নিয়ে সারা দেশে একান্নটি পীঠ গড়ে উঠেছে। সেই সতীর সমস্ত শরীর আজ বেলুড় মঠের মাটিতে মিশে রইল। তাহলেই বুঝে দেখ, বেলুড় মঠ কত বড় তীর্থ!

মঠে গঙ্গার ধারে যে তিনটে মন্দির আছে (রাজা মহারাজের মন্দির, মায়ের মন্দির আর স্বামীজীর মন্দির) তার মধ্যে মায়ের মন্দির গঙ্গার দিকে মুখ করা—অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। মায়ের গঙ্গাবাই ছিল। গঙ্গাস্নান করতে, গঙ্গাদর্শন করতে ও গঙ্গাতীরে থাকতে মা ভালবাসতেন। তাই মায়ের মন্দির গঙ্গার দিকে মুখ করা। মা সব সময় গঙ্গাদর্শন করছেন।

মহারাজ বলতেনঃ 'মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে সাধারণ মেয়েদের মতো থাকেন, অথচ তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতাম?' একজন ভক্ত আমাকে একবার বলেছিলেন, তাঁকে মা নিজে বলেছিলেনঃ 'আমিই সীতা।'

সংগ্রহ ও অনুলিখনঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বামী অভয়ানন্দ

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে আমি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পেয়েছি। কেমন করে তাঁর আশ্রয় পেয়েছি সেকথা বলতে হলে তার আগে সংক্ষেপে জানাতে হয় আমার বেলুড় মঠে প্রথম আগমনের বৃত্তান্তটি—ঢাকা থেকে অল্প কয়েকদিনের জন্য বেলুড় মঠে এসে কেমন করে এখানে বরাবরের জন্য থেকে গেলাম সেই কথাটি।

ঢাকায় আমি একটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। দলটি হল অনুশীলন সমিতি। তখন আমি ছেলেমানুষ, সব জিনিস ভাল বুঝি না। অনুশীলন

সমিতির একটা আড্ডা ছিল ঢাকায়—হোস্টেলের মতো। বাড়িঘর ছেড়ে আসা কিছু ছেলে সেখানে থাকত। কিছুদিন থাকার পর দেখলাম, দলের কিছু কিছু নীতি আমি মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। তাই এমন কারও কাছে যেতে চাইছিলাম যিনি এ-বিষয়ে আমাকে যথার্থ উপদেশ দিতে পারবেন। নানা কারণে আমার রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ প্রার্থনার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু কোন্ সূত্রে তাঁর কাছে যাব? কে-ই বা তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে? এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে আমার বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ বোস।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে উৎসুক একথা বীরেন জানত। একদিন, সম্ভবত দুর্গাপূজার পর (১৯১০ খৃীষ্টাব্দে?), বীরেন একটি চিঠিতে জানাল, সে কলকাতায় যাচ্ছে, যদি আমি চাই সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। কলকাতা থেকে বেলুড় মঠে নিয়ে গিয়ে মহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দের] সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবে, এই প্রতিশ্রুতিও সে চিঠিতে দিয়েছিল। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢাকায় ওদের বাড়ি গেলাম। পরদিন একসঙ্গে কলকাতার পথে যাত্রা করা হল। শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছানোর পর বন্ধু আমাকে নিয়ে গেল বেলুড় মঠে। স্টীমারে গঙ্গার এপারে এসে সালকিয়ার ভিতর দিয়ে হাঁটা-পথে আমরা বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়েছিলাম। মঠে প্রথমেই দেখা হয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে। তিনি একটি আরাম-কেদারায় বসে গড়গড়ায় তামাক সেবন করছিলেন। আমরা প্রণাম করলাম। বীরেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মহারাজকে বললঃ 'অনেকদিন থেকে আমার এই বন্ধু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিল। ওর কিছু কথা আছে।' সেইসঙ্গে বীরেন জিজ্ঞাসা করে নিল, আমি কিছুদিন মঠে থাকতে পারি কিনা। মহারাজ সম্মতি দিলেন। বীরেন কলকাতায় ফিরে গেল। বীরেনের সঙ্গে কথা রইল, কিছুদিন পরে ওর সঙ্গে ঢাকায় ফিরব ; মাঝের সময়টুকু বেলুড় মঠে থাকব।

মঠে আমার থাকার ব্যবস্থা হল, প্রতিদিন যথাসময়ে প্রসাদ গ্রহণেরও। মহারাজ সেইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ঠাকুরের স্থানে কিছু কাজ ছাড়া অন্নগ্রহণ করা অনুচিত। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) আমার জন্য যে-কাজ ঠিক করে দেবেন, রোজ তা-ই করব, পরে প্রসাদ পাব—এই স্থির হল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ উক্ত ভাবটি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন এবং আমিও বাবুরাম মহারাজের নির্দেশমতো রোজ কিছু কাজ করতাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে আরও বলেছিলেনঃ 'রোজ তুমি আমার সঙ্গে একটু বেড়াবে।'

তিনি বেড়াতেন মঠবাড়ি থেকে স্বামীজীর মন্দির পর্যন্ত—তখন স্বামীজীর মন্দিরের শুধু নিচের অংশটুকু ছিল, উপরের অংশ তৈরী হয়নি। বেড়ানোর সময়ে আমাদের কথাবার্তা হত। মনে অনেক-কিছু জিজ্ঞাসা ছিল—যেমন, সাধুজীবন সম্পর্কে। কিন্তু সেই সময়ে সবচেয়ে বড় যে-প্রশ্নটি আমার মন অধিকার করে থাকত সেটি ঐ বিপ্লবী দলের নীতিগত ব্যাপার নিয়ে। সেটি এক সঙ্কটের মতো। মহারাজকে একদিন খোলাখুলি সব বলে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সে-সম্পর্কে যে উপদেশ দিলেন, তা আমার মনে খুব দাগ কাটল। তাঁর সস্নেহ কথাবার্তাও খুব ভাল লাগত।

এদিকে সাতদিন হয়ে গেল, বীরেনের দেখা নেই, তার কোন খবরও পাচ্ছি না। কিছুদিন পরে একটা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, বিশেষ প্রয়োজনে তাকে বর্ধমান যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে কলকাতায় এসে তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরে যেতে হয়, যোগাযোগ করবার সময় পায়নি। আমার সঙ্গে দেখা করতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে সে লিখেছে, আমি যেন সময়মতো ঢাকায় ফিরে যাই। আমি চিঠিখানি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখালাম। তিনি পড়ে বললেনঃ 'তাইতো, ও চলে গেছে! তা যাক না, তোমার এক বন্ধু চলে গেছে, আমরা তো অনেক বন্ধু রয়েছি!' সময়ে সময়ে তিনি বলতেনঃ 'বীরেনই তোমার বন্ধু, আমরা কি বন্ধু হতে পারি না?'

আমার তবু ফিরে যাবার খুব ইচ্ছা হত। মহারাজকে জানালাম সেকথা। মহারাজ বললেনঃ 'এখনই যেতে চাইছ কেন? আর একটা মাস থাক না, স্বামীজীর জন্ম-তিথি আসছে, সেই উৎসব পর্যন্ত থেকে যাও।' আমার তখন ফিরে যাবার ইচ্ছাটা তীব্র। যাই হোক, মহারাজ বলেছেন বলে স্বামীজীর জন্মোৎসব পর্যন্ত থাকব, ভাবলাম। স্বামীজীর জন্মোৎসবে খুব আনন্দ হল। মহারাজকে সেকথা জানাতে মহারাজ বললেনঃ 'চলে গেলে এই আনন্দ কোথায় পেতে?'

স্বামীজীর জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়ে গেলে আবার ফিরে যাবার প্রসঙ্গ তুললাম। মহারাজ তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পর্যন্ত থেকে যেতে বললেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসব আর এক আনন্দমেলা। মনে হল, এই আনন্দের তুলনা নেই। এই উৎসব-আনন্দের শরিক হওয়ার পর লক্ষ্য করলাম, আমার মনে ঘরে ফেরার তাগিদ আর নেই। মনের ভিতর থেকে তখন যেন একটি নতুন রাজ্যের খবর শুনতে পাচ্ছিলাম। অনুভব করছিলাম, সেই রাজ্যটি যেন আমার কত আপনার। মহারাজকে আর বলতে হল না, নিজের অন্তরের তাগিদেই মঠে থেকে গেলাম। অবশ্য তাঁর আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

আমার সাধুজীবনের প্রথম পর্বে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছাড়া আর যাঁর বিশেষ প্রভাব আমার উপর পড়েছিল তিনি হলেন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ। আজও সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করি। এমন প্রেমিক, দরিদ্রবৎসল, বিশেষত এমন কর্মঠ সাধু আমি দেখিনি। এই বাবুরাম মহারাজের শুভেচ্ছা আর প্রেরণাতেই আমি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করি।

* * *

তারিখ ঠিক মনে নেই, একদিন বাবুরাম মহারাজের নির্দেশমতো মঠ থেকে কলকাতায় গেলাম। বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, তিনি বলরাম বসুর বাড়িতে থাকবেন; আমাকেও রাত্রিটা সেখানেই কাটাতে বলেন। সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। যেসময়ের কথা বলছি তখন আমাদের কলকাতায় থাকবার আর কোনও জায়গা ছিল না। সাধুদের আস্তানা বলতে বলরামবাবুর বাড়ি। সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে ওঠা যেত এবং আহারাদিও করা যেত। আবার অসুখ-বিসুখ হলে সেখানে থেকে-যাওয়াও চলত। বলরামবাবুর পরিবারের সকলেই সাধুদের খুব আদরযত্ন করতেন। সেদিন সন্ধ্যায় খুব লম্বা-চেহারার একটি ছেলেকে দেখলাম, বলরামবাবুর বাড়িতে এসেছে। বাবুরাম মহারাজের পরিচিত মনে হল, তবে আমি তাকে

মোটেই চিনতাম না। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেনঃ 'দ্যাখ, ও যখন আজ এসেছে তোকে একটা কাজ করতে হবে। ছেলেটি কলকাতা শহরের কিছু চেনে না, কাল আবার মা-ঠাকরুনের কাছে ওর দীক্ষা হবে। তুই ওকে কাল সকালে নিয়ে যাবি। প্রথমে উদ্বোধন-বাড়ির সামনে গঙ্গার যে-ঘাট আছে সেখানে গিয়ে গঙ্গাস্নান করবি, ওকেও করাবি। তারপর উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের কাছে ওর দীক্ষার কথা বলবি। পারবি তো?' বললামঃ 'হ্যাঁ, মহারাজ। কেন পারব না?'

যথাসময়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোররাত্রে শুনতে পেলাম বাবুরাম মহারাজ জেগে উঠে ডাকাডাকি শুরু করেছেনঃ 'বীরেন, উঠে পড়, উঠে পড়, তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে যে।' ঐ ছেলেটির নাম বীরেন। তারপর আমাকে ডেকে বললেনঃ 'উঠে পড়, মুখ-টুখ ধুয়ে নে।' আমি উঠে পড়লাম, মুখ-টুখ ধুয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। সিঁড়ি তখনও অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছি, বাবুরাম মহারাজ তখন আমাকে বললেনঃ 'শোন, দাঁড়া একটু। হ্যাঁরে, তোর দীক্ষা হয়েছে? তুইও দীক্ষা নে। মহারাজের সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে কথা হয়েছে; আমার মনে আছে, তিনি তোর দীক্ষার কথা বলেছেন।' একটু থেমে তিনি আবার বললেনঃ 'আমার কথা শুনবি? আমার কথা মানবি?' 'কেন মানব না? বলুন মহারাজ', আমি সবিনয়ে বললাম। তিনি বললেনঃ 'শোন, তুই মায়ের কাছে দীক্ষা নে।' আমি প্রশ্ন করলামঃ 'কিন্তু মায়ের কাছে দীক্ষা নেব কেমন করে? তিনি তো আমাকে ভাল করে চেনেন না। আমি যাই, প্রণাম করেই চলে আসি।' বাবুরাম মহারাজ বললেনঃ 'না, তিনি তোকে চেনেন।' 'তাহলে কি বলব আমি?'—জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি নির্দেশ দিলেনঃ 'তুই শরৎ মহারাজের কাছে যাবি, তাঁকে গিয়ে বলবি। সারদানন্দ স্বামী তো তোকে চেনেন?' বললামঃ 'হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আমাকে চেনেন। পূজনীয় শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) যখন অসুস্থ অবস্থায় উদ্বোধনে ছিলেন, তখন আমি ওখানে ছিলাম। কিছুদিন ওঁর সেবা করেছিলাম। সেই সময়ে স্বামী সারদানন্দ আমাকে দেখেছেন।' বাবুরাম মহারাজ বললেনঃ 'হ্যাঁ, শরৎ মহারাজ তোকে খুব ভালই চেনেন। তোর উপর উনি খুব সন্তুষ্ট। শশী মহারাজের সেবা করলি এতদিন, সেই সময়ে কত পরিশ্রম করেছিলি! তোর সম্পর্কে ওঁর খুব ভাল ধারণা।' আমি বললামঃ 'সে আমি জানি না।' তিনি বললেনঃ 'যাই হোক, ওকে সঙ্গে নিয়ে যা। আর তোর নিজের জন্যও নতুন কাপড় নিয়ে যা। দুজনে গঙ্গাস্নান করে উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করবি, বলবি, "বাবুরাম মহারাজ আমাদের পাঠিয়েছেন; আপনাকে বলেছেন মা-ঠাকরুনের কাছে আমাদের দীক্ষার কথা বলতে আর সেইমতো ব্যবস্থা করতে।"'

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে আমি পথনির্দেশের প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার প্রার্থনা অবশ্য জানাইনি। তবে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্য তাঁর উপদেশ চেয়েছিলাম। তাছাড়া এই মঠে তাঁরই সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাই তাঁর নিকট দীক্ষালাভের একটি আকাঙ্ক্ষাও মনে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু বাবুরাম মহারাজ এমন-ভাবে জোর করেছিলেন যে, আমার আর অন্যথা করার উপায় ছিল না। তিনি বলে-ছিলেনঃ 'আমার উপর তোর বিশ্বাস নেই? তুই আমাকে ভালবাসিস না? দ্যাখ, তোর ভালর জন্যই বলছি, তুই মায়ের কাছে দীক্ষা নে।' এই কথার উত্তরে আমি কি বলব?

বুঝেছিলাম যা স্থির হয়েছে, তা-ই আমাকে মেনে নিতে হবে এবং মেনে নেওয়াই উচিত। তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব।

অতএব যথাসময়ে উদ্বোধনে গিয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে সব কথা নিবেদন করলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেনঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে।' তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে আমি যে পূজনীয় শশী মহারাজের সেবা করেছি সেকথাও বললেন। শ্রীশ্রীমা সব কথা শুনে বললেনঃ 'হ্যাঁ, বাবা, তোমার দীক্ষা হবে। যাও, বাবা, নিচে গিয়ে বসো, পরে ডেকে নেব।'

যথাসময়ে দীক্ষা আরম্ভ হল এবং একে একে আমাদের ডাক আসতে লাগল। প্রথমে আমার সঙ্গীর ডাক এল, তারপর আমার। মা ছিলেন উদ্বোধনের যে-ঘরে এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হয় সেই ঘরটিতে। শ্রীশ্রীমা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন সব সময়ে। আজ কিন্তু ঘোমটা ছিল না। আসন পাতা ছিল। ঘরে ঢুকে সেই আসনে বসলাম। আসনে বসবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমা আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। যতদূর মনে পড়ে, আমার ইষ্ট সম্বন্ধে বা ঐরকম কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলামঃ 'আমার কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না তা তো জানি না। আপনার যা ভাল মনে হয় তা-ই আমাকে দিন, মা।' মা বললেনঃ 'তা-ই হবে।' এরপর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন, তারপর আমাকে মন্ত্র দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, এতদিন যে-ভাব নিয়ে আমি আছি ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী তিনি মন্ত্র দিয়েছেন। আমি তো শ্রীশ্রীমাকে আমার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে কিছু জানাইনি। তাঁর ইচ্ছামতো মন্ত্র দিতেই অনুরোধ করেছিলাম। আমার পছন্দ তো কত রকমেরই হতে পারে, কিন্তু কী আশ্চর্য, বিশেষ যে-ভাবটি নিয়ে এতদিন অগ্রসর হচ্ছিলাম মা আমাকে ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী মন্ত্র দিলেন! মা-ঠাকরুন তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে আমার মনের কথা ঠিক জেনে নিয়েছেন। এর ফলে আমার মনে খুব তৃপ্তি ও আনন্দ হল। এইভাবে আমার দীক্ষা হল।

দীক্ষার পরেও আমি বেলুড় মঠেই আছি। গঙ্গার এপারে আছি আমরা, ওপারে শ্রীশ্রীমা আর তাঁর লীলাসঙ্গী ও সঙ্গিনীরা। এখনকার মতো তখন ইচ্ছামতো মঠ থেকে বেরিয়ে কোথাও যাতায়াত করা যেত না। তাছাড়া মঠের গাড়িও ছিল না। কাজেই ইচ্ছা হলেই শ্রীশ্রীমাকে যে দর্শন করব, সেটি তখন সম্ভব ছিল না। তবে যখন বাবুরাম মহারাজ আমাকে কোনও কাজের জন্য কলকাতায় পাঠাতেন, তখনই বলে দিতেনঃ 'মায়ের বাড়িতে প্রসাদ পাবে আর ওখানে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করবে।'

মা-ঠাকরুনকে প্রণাম করা ছিল আবার একটি সমস্যা। সর্বদা তাঁকে মহিলারা ঘিরে থাকতেন। তাই প্রথমে দর্শনের কথা পূজনীয় শরৎ মহারাজকে বলতে হত; তিনি রাসবিহারী মহারাজকে (স্বামী অরূপানন্দকে) বলে দিতেন; রাসবিহারী মহারাজ ভক্তদের মায়ের কাছে নিয়ে যেতেন। এই ছিল নিয়ম। শ্রীশ্রীমা ও মহিলা-ভক্তদের অসুবিধা হবে ভেবে দর্শনের কথা বলতে আমার একটু অস্বস্তি হত। যাই হোক, বাবুরাম মহারাজের নির্দেশ অনুসারে শরৎ মহারাজের কাছে গিয়ে দর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করতাম এবং ক্রমে ব্যবস্থা হয়ে যেত। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে গিয়ে দেখতাম তাঁর মুখ লম্বা ঘোমটায় ঢাকা। মঠ থেকে এসেছি শুনে মাথার কাপড় একটু সরিয়ে জিজ্ঞাসা করতেনঃ

'বাবা, মঠ থেকে এসেছ? বাবুরাম কেমন আছে? তারক (মহাপুরুষ মহারাজ) কেমন আছে?' পরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মঠের প্রত্যেকের কুশল-সমাচার নিতেন—ভৃত্যদেরও। মাকে সব বলতে হত। কিন্তু এই রকম দর্শন ঘটত বিশেষ কোন কাজের উপলক্ষে এবং সেরকম উপলক্ষও ক্বচিৎ-কদাচিৎ পাওয়া যেত। শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার অথবা সেখানে তাঁর পরিমন্ডলে দিনযাপনের সুযোগ আমার কখনও হয়নি।

শ্রীশ্রীমাকে একবার দুর্গাপূজার সময়ে বেলুড় মঠে দেখেছি। সেবার পূজার সময়ে পূজনীয় রাখাল মহারাজ মঠে ছিলেন না। মহাপুরুষ মহারাজ এবং তুরীয়ানন্দ স্বামীও ছিলেন না। উৎসব-আয়োজনের সবকিছুর মূলে ছিল বাবুরাম মহারাজের প্রেরণা। তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা। আর পূজার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন জনৈক ভক্ত। তখন কলকাতা থেকে নৌকায় প্রতিমা আনা হত। পূজা হত শ্রীরামকৃষ্ণের পুরানো মন্দির আর মঠবাড়ির মাঝের জায়গায়। ঐ জায়গাটা বাঁশ দিয়ে ঘিরে উপরে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। সেবারও সেইখানেই পূজা হল। যতদূর মনে পড়ছে, তন্ত্রধারক হয়েছিলেন পূজনীয় শশী মহারাজের বাবা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী।

মহাসমারোহে এবং মহানন্দে পূজা অনুষ্ঠিত হল। একদিন সমাগত সব ভক্তের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য এখনকার তুলনায় তখন ভক্তের সংখ্যা অনেক কম ছিল। বাবুরাম মহারাজ আর একদিন বেলুড় মঠের নিকটবর্তী অঞ্চলের যেসব জেলে গঙ্গায় মাছ ধরত তাদের সকলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জেলেদের নৌকা মঠের ঘাটের কাছেই থাকত আর এরা প্রতিদিন মঠে কিছু মাছ দিয়ে যেত দাম না নিয়ে। ওদের সেদিন তিনি আনন্দ করে ভরপেট প্রসাদ খাওয়ালেন। গরীব এই মানুষগুলিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ খাইয়ে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। মানুষকে, বিশেষত গরীব মানুষকে, ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়ে আনন্দ-লাভ—এটি বাবুরাম মহারাজের অনন্য চরিত্রের একটি লক্ষণীয় দিক।

ভক্ত যাঁরা মঠে আসতেন তাঁদের যত্ন-আপ্যায়নের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর থাকত। তিনি বলতেন: 'দ্যাখ, ওরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসছে, তোর বা আমার কাছে নয়। তুই নিশ্চয় ঠাকুরকে ভালবাসিস, ভালবাসিস তো? তাহলে ঠাকুরের কাছে যারা আসছে তাদেরও সেই নজরে দেখবি। প্রিয়জনের মতো দেখবি, দেখবি ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে। সতর্ক দৃষ্টি রাখবি যাতে ওদের আদর-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি না হয়ে যায়।' মনে হয়, এসব তিনি বলতেন যাতে ওঁদের সম্পর্কে আমাদের মনে কোনও রকম উপেক্ষার বা বিরক্তির ভাব না আসে। তাঁর সেই মহৎ, উদার, আশ্চর্য প্রেমানুভূতি আমি লক্ষ্য করতাম—মানুষের প্রতি প্রেম, প্রত্যেকের প্রতি।

* * *

বাবুরাম মহারাজের ঐকান্তিক প্রেরণায় যেমন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার দীক্ষালাভ হয়েছিল, তেমনই তাঁরই বিশেষ আগ্রহে জয়রামবাটীতে গিয়ে মায়ের দর্শনলাভ এবং তাঁর সান্নিধ্যলাভেরও সুযোগ হয়েছিল একবার। এই সুযোগটি ঘটে মায়াবতীতে তিন-চার বছর থাকার পর কিছুদিনের জন্যে যখন বেলুড় মঠে ফিরে আসি সেই সময়ে। মেদিনীপুরে বন্যার সময়ে সেখানে কয়েকমাস রিলিফের কাজ করবার পর আমাকে মায়াবতী আশ্রমে কর্মী হিসাবে পাঠানো হয়। বাবুরাম মহারাজের ইচ্ছা ছিল না আমি মায়াবতী চলে যাই। তিনি আমাকে আপত্তি জানাতেও বলেছিলেন।

কিন্তু আপত্তি আমি করিনি। কর্তৃপক্ষ—স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ—যে-ব্যবস্থা করেছেন তা আমি বিনা বাক্যে মেনে নেব না কেন? বুঝতে পেরেছিলাম, আমি মায়াবতী চলে যাওয়ায় বাবুরাম মহারাজ মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এর মূলে অবশ্যই ছিল আমার প্রতি তাঁর অহেতুক স্নেহ-ভালবাসা।

যাই হোক, তিন-চার বছর পরে মায়াবতী থেকে কয়েকদিনের জন্যে যখন বেলুড় মঠে এসেছি, সেই সময়ে বাবুরাম মহারাজ একদিন সকালে আমাকে বললেনঃ 'তুই তো এখন এদিকছাড়া হয়ে গেছিস! হ্যাঁরে, এখানে এলি, মায়ের দর্শন হয়েছে? কখনও মায়ের বাড়ি জয়রামবাটী গেছিস?' আমি বললামঃ 'না মহারাজ, এবার দর্শন তো হয়নি। জয়রামবাটী কখনও যাইনি।' এমনিতে জয়রামবাটী সম্পর্কে আমার একটা ভীতি ছিল। জয়রামবাটীকে আমার মশা আর ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি মনে হত। এরকম জায়গায় নিজে থেকে কখনও আমার যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। তীর্থযাত্রী যে-ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে তীর্থস্থানে যায়, সেই ভাব নিয়ে জয়রামবাটী যাওয়ার চিন্তা আমার মনে কখনও আসেনি। বাবুরাম মহারাজ বললেনঃ 'এবার মায়াবতী ফেরবার আগে জয়রামবাটী ঘুরে আয় না কেন?' কিন্তু আমি যে যাব, যাবার জন্য তো কিছু টাকা-পয়সা চাই। মায়াবতী ফিরে যাওয়ার যতটুকু ভাড়া, ততটুকুই আমার কাছে ছিল, তার অতিরিক্ত এক পয়সাও ছিল না। তাহলে কি করে জয়রামবাটী যাব? তাঁকে সেইকথা জানালে তিনি বললেনঃ 'টাকার জন্য তোকে ভাবতে হবে না, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' তারপর সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ডেকে বললেনঃ 'কাল সকালেই রওনা হয়ে যা। শ্রীরামপুর থেকে এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা দীক্ষা নেবার জন্য জয়রামবাটী যাচ্ছেন। তাঁরা হাওড়া স্টেশনে তোর জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁদের সঙ্গে যাবি তুই।' যাওয়ার সময় সবকিছু সুষ্ঠুভাবেই হল। ঐ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার বাসন্তী-পূজার সপ্তমীর দিন দীক্ষার কথা, আমরা পৌঁছালাম আগের দিন। ওঁরাই সব খরচপত্র বহন করলেন—টিকিট কেনা এবং অন্যান্য সবকিছুই।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে সেবার তিন-চার দিন ছিলাম। ওখানে দুটি ছেলেকে সেই প্রথম দেখলামঃ রামময় ও বরদা। এছাড়া সেখানে ছিল এক বলিষ্ঠ যুবক, খুব শক্ত-সমর্থ চেহারা এবং দেখেই মনে হয় বেপরোয়া। সে সিলেটের জ্ঞান। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমাকে দেখেই সে অভ্যর্থনা জানালঃ 'আসুন, আসুন। ওদিকে চলুন, মাকে দর্শন করবেন।' জয়রামবাটীর বাড়ির কোথায় কি, কোন্ ঘরে কে থাকেন বা কি হয়, কিছুই আমার জানা ছিল না। জ্ঞান আমাকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম। প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠলামঃ 'এ কি করছ তুমি, রান্নাঘরে নিয়ে যাচ্ছ কেন? মা কোথায়? আমি মাকে প্রণাম করতে এসেছি ঠিকই, কিন্তু তিনি এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকেন তো সেখানকার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তো আমি অপেক্ষা করতে পারি।' কিন্তু এসব বললে কি হবে, জ্ঞানকে নিরস্ত করা গেল না। সে আমাকে রান্নাঘরে শ্রীশ্রীমার সামনে হাজির করিয়ে ছাড়ল। আমি সেখানেই মাকে প্রণাম করলাম। জিজ্ঞাসা করলামঃ 'মা, আপনি এখানে কি করছেন, রুটি সেকছেন?' তিনি বললেনঃ 'বাবা, এখানকার লোক রুটি খায় না। কলকাতা থেকে আমার ছেলেরা যখন আসে তাঁদের জন্য রুটি করি।' সেই সময়ে জয়রামবাটীতে অনেক অতিথি। তাদের জন্য শ্রীশ্রীমা রুটি করছিলেন। মা আমাকে

বললেনঃ 'যাও বাবা, মুখ হাত ধুয়ে নাও। আমি একটু পরেই আসছি।' আমার সঙ্গীদের দীক্ষাসংক্রান্ত পত্রটি শ্রীশ্রীমাকে দিলাম। সপ্তমীর দিন ওঁদের দীক্ষা হবে এই ঠিক হল। আগেই বলেছি, আমরা ওখানে গিয়েছিলাম বাসন্তীপূজার সময়ে।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে দেখলাম ভিন্ন রূপে—কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমন নয়। মা এখানে ঘরোয়া সাজে—ঘোমটা ছিল না। সরলতা আর পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। যাবতীয় গৃহস্থালির কাজে তিনি নিরত। একদিন ভোরবেলা তাঁকে দেখলাম, হাতে একটি পাত্র—কষ্ট করে হাঁটছেন। বোধহয় পায়ে বাতের জন্যে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। পাত্রটি নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন কোন প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে। পথে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলামঃ 'এত ভোরে কোথায় যাচ্ছেন, মা?' বললেনঃ 'গোয়ালার বাড়ি যাচ্ছি, দুধের জন্য। আমার কলকাতার ছেলেদের সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস, তাই দুধ আনতে যাচ্ছি।' শ্রীশ্রীমা নিজেই চলেছেন দুধ জোগাড় করতে! বিস্মিত হয়ে গেলাম। উদ্বোধনের বাড়িতে তাঁর ঘোরাফেরার অবকাশ ছিল না, তাই সেখানে তিনি নববধূর মতো আড়ষ্ট হয়ে থাকতে বাধ্য হতেন। কিন্তু জয়রামবাটীতে তিনি স্বাধীন, আর সর্বদা কাজ করছেন—নিজেই করছেন সব কাজ। চলে যেতে যেতে তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'ঐ ঘরের বারান্দায় কুটনো কোটার সময়ে তোমার কাছ থেকে মায়াবতীর গল্প শুনব।' তাঁর শয়নঘরের ঠিক বাইরে তরকারি কোটা হত। তিনি আবার বললেনঃ 'ঐখানে তুমি আসবে আর মায়াবতীর সব কথা, সবকিছু শুনব।'

তাঁর কথামতো আমি যথাসময়ে হাজির হলাম। তিনি কুটনো কুটতে থাকলেন আর আমি মায়াবতীর কথা বলে চললাম। যে তিন-চার দিন জয়রামবাটীতে ছিলাম, সেই কয়দিনই এইভাবে মায়াবতী-প্রসঙ্গ চলেছিল।

তিনি ধর্মপ্রসঙ্গে অথবা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাকে বিশেষ কিছু বলেননি, আমিও তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। তবে কথাপ্রসঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে বলতেনঃ 'যেখানেই থাক, যে-কাজের মধ্যেই থাক, ঠাকুরকে সদাসর্বদা ধরে থেকো।' তিনি অল্পকথায় উপদেশ দিতেন। নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়ে আমার কাছে কখনও কিছু বলেননি।

শরীরত্যাগের পূর্বে তাঁকে আমার শেষ দর্শন হয় উদ্বোধনে—তখন তিনি বিশেষ পীড়িত। শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় তখন নিয়মিত উদ্বোধনের বাড়িতে এসে তাঁর চিকিৎসা করতেন। তাঁকে তখন দেখেছিলামঃ শান্তভাবে সব রোগযন্ত্রণা সহ্য করছেন। সতীশ মহারাজ—কাশীর সত্যানন্দ স্বামী—আর আমি তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। বেলুড় থেকে আমার মায়াবতী ফিরে যাবার কথা, তারপর সেখান থেকে মানস সরোবরের পথে যাত্রা করবার কথা। আমি মায়ের আশীর্বাদ চাইলাম। সব শুনে তিনি বললেনঃ 'বাবা, আমি শুনেছি, মানস বড় দুর্গম তীর্থ। খুব সাবধানে থাকবে। যা-ই কর, সর্বদা ঠাকুরকে ধরে থেকো।' মানসের পথে আমার একটি আশ্চর্য দর্শন হয়। স্বপ্নদর্শন! এই সূত্রে বলে রাখা দরকার, আমার সাধারণত দর্শন জাতীয় অভিজ্ঞতা হয় না।

মানসতীর্থে যাওয়ার পথে আলমোড়া জেলার ভিতর এক জায়গায় কয়েকদিন আমরা বিশ্রাম করেছিলাম। সেখানে কয়েকজন পরিচিত ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করি।

একটি ছোট বাড়িতে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সেইখানেই প্রথম অথবা দ্বিতীয় রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখি। ঘুম ভাঙার পর ঘড়িতে দেখেছিলাম, রাত তখন দুটো।

স্বপ্নে দেখলাম শ্রীশ্রীমাকে। মাকে যেন অপূর্ব সাজে সাজানো হয়েছে, চরণ দুখানি আলতায় রাঙানো। সুন্দর, পরিষ্কার একটি শাড়ী পরনে, গলায় ফুলের মালা। মাকে দীপ্তিময়ী দেখাচ্ছিল। যেখানে মাকে এনে রাখা হয়েছে, সেই জায়গাটিও স্পষ্ট দেখেছিলাম। সেটি হল—গঙ্গাতীরবর্তী সেই স্থান, যেখানে এখন তাঁর মন্দির। অনেক লোকের সমাবেশ সেখানে দেখলাম। কিন্তু মাকে ওরা কাঁধে বয়ে এনেছে না গাড়িতে এনেছে তা বুঝতে পারলাম না। ভিড়ের মধ্যে তিনজনকে স্পষ্ট দেখেছিঃ মাখন সেন, সুরেশ মজুমদার এবং ঐ দলের আর এক ভদ্রলোক যার নাম এখন মনে করতে পারছি না। আশ্চর্যের বিষয়, দ্বিতীয়বার এই দৃশ্য অথবা শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে অন্য কোনও দৃশ্য স্বপ্নে আসেনি।

মানস থেকে ফেরবার পথে আমরা তাকলাকোটে বিশ্রাম করেছিলাম। তাকলাকোট একটি বড় ব্যবসার জায়গা। ওখানে তখন সাধারণত পণ্য-বিনিময়ে ব্যবসা চলত। অর্থাৎ ভারতীয় জিনিসের বিনিময়ে ঐ জায়গার জিনিস পাওয়া যেত। পশম আর পশমে তৈরী জামাকাপড়ের আদান-প্রদানই ছিল প্রধান ব্যবসা। ভারতের বাসিন্দা ভুটিয়ারাও ওখানে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করত। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একজন কমিশনার ওখানে গিয়ে দেখাশুনা করে আসতেন, দরদাম বেঁধে দিয়ে আসতেন। লোকজন নিয়ে তিনি একটি বিরাট তাঁবুতে থাকতেন।

যাওয়ার পথে তাঁকে দেখিনি, কিন্তু ফেরবার পথে সেই অফিসারকে দেখলাম। অফিসারটি পাঞ্জাবের অধিবাসী। যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হল সেখান থেকে তাঁর তাঁবু কিছু দূরে। ভদ্রলোকটি আমাদের সেই তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমাকে নমস্কার করে তিনি বললেনঃ 'মহারাজ, আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

তাঁর তাঁবুতে গিয়ে আমাদের খুব আরাম হল। সেখানে দু-একটা খবরের কাগজ আছে, দেখতে পেলাম।' তিনি প্রথমে আমাদের সেসব পড়তে দিলেন না। চা খাওয়ার পর তিনি জানালেন, রামকৃষ্ণসঙ্ঘের পক্ষে একটা দুঃসংবাদ আছে। পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত একটা খবরের কাগজ তিনি আমাদের পড়তে দিলেন। দুটি দুঃসংবাদ ঐ পত্রিকায় ছিল। প্রথম খবরটি হলঃ শ্রীশ্রীমা দেহত্যাগ করেছেন। মোটামুটি বিস্তারিত আকারে সংবাদটি প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংবাদটি এক বিখ্যাত জননেতার পরলোকগমন সংক্রান্ত।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, যে-রাত্রে আমি শ্রীশ্রীমায়ের শরীরত্যাগের স্বপ্নটি দেখি, তার পরের দিন সতীশকে সেটি তার ডায়েরীতে লিখে রাখতে বলি। সে এই খবরের কাগজে সংবাদটি দেখার অনেক আগের কথা।

কিন্তু আর কখনও শ্রীশ্রীমা আমাকে স্বপ্নে দেখা দেননি। তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি সেই একবারই—কিন্তু সে-দর্শন অতিশয় স্পষ্ট। অতি স্পষ্ট দেখেছিলাম তাঁর মুখ, তাঁর চোখ এবং তাঁকে ঘিরে থাকা সব লোককে। মনে আছে, অপূর্ব সুষমায় পূর্ণ সেই মুখমণ্ডল—আমার স্বপ্নে দেখা মায়ের সেই মুখখানি!

পরে মিলিয়ে দেখেছি, ঠিক সেইদিনই শ্রীশ্রীমা শরীরত্যাগ করেন।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ

শাস্ত্র বলছেঃ 'নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুম্ অর্হতি।' 'নিরাকারা' আকার গ্রহণ করেন কেন? 'উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।' যাঁরা ভক্ত, মুমুক্ষু, তাঁদের মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য, জগৎকল্যাণের জন্য মাতৃরূপিণী পরাশক্তি এবারে পৃথিবীতে অবতীর্ণা। মহামায়া সারদা এবার বহুরূপে, শতরূপে কৃপা করেছেন কত অনুগতজনকে। শতরূপা সারদার শতরূপে প্রকাশ—'উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।'

আমার এই ক্ষুদ্র জীবন জ্যোতিঃস্বরূপিণী সারদার শতরূপের একটি রশ্মিতে কৃতার্থ। জীবন-সায়াহ্নে সেই ভাস্বর জ্যোতি উজ্জ্বলতম চিন্ময় সত্তারূপে আজও অম্লান। অব্যক্তা যিনি, অচিন্ত্যা যিনি, ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করার দুর্বল প্রয়াস আমার।

আমার তখন প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। কাটিহারে স্কুলে শিক্ষকতা করি, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। একটি মেসে থেকে স্কুলে যাতায়াত করতাম। সেখানেই অঘোর-বাবু বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। একদিন লক্ষ্য করলাম তাঁর নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে গেরুয়া কাপড় পরা একটি লোক আমাদের মেসে আসছেন। পর পর কয়েকদিন তাঁকে মেসে আসতে দেখে কৌতূহলী হয়ে জানলাম, তিনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী; সম্প্রতি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কাটিহারে এসেছেন। অঘোরবাবুদের বাড়িতে পারিবারিক স্নানাগার ব্যবহারে অসুবিধে হওয়ায় আমাদের মেসে অঘোর-বাবুর ব্যবস্থামতো স্নানাদি করতে নিত্য আসছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারি তাঁর নাম স্বামী জ্ঞানানন্দ, জ্ঞান মহারাজ বলেই পরিচিত। তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর সেবা করেছেন অনেক-দিন। তাঁর কাছেই শুনলাম শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অনেক অন্তরঙ্গ কথা। মায়ের স্নেহকরুণা কতভাবে ভক্তজনের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। সেইসব কথা শুনতে শুনতে আমারও ইচ্ছে হল একবার মাকে দেখতে। জ্ঞান মহারাজকে সেকথা বলতে তিনি উৎসাহিত হয়ে সামনের পুজোর ছুটিতেই জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করবার কথা বললেন।

জ্ঞান মহারাজ নিজে সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন জয়রাম-বাটীতে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পুজোর ছুটির সময়। মা তখন তাঁর নতুন বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই বাড়ির বাইরের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। মনের মধ্যে অনেক কল্পনার ছবি এঁকে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম। জ্ঞান মহারাজ বাড়ির ভিতরে গিয়ে খবর দিয়ে আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। রামময় মহারাজ তখন মায়ের সেবক হিসাবে সেখানেই ছিলেন। ছোটখাট মানুষটি, আমার খুবই ভাল লেগেছিল। তিনিই আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মা তখন তাঁর ঘরে চৌকিতে বসে-ছিলেন পা ঝুলিয়ে। আমি মাকে প্রণাম করলাম। মায়ের হাত-পায়ের গড়ন ও মুখের চেহারা দেখে আমার নিজের ঠাকুরমার কথা মনে হয়েছিল। তাঁর মধ্যে তখন কোনও দেবীভাব আমি বুঝতে পারিনি। তাঁর হাত-পায়ের গড়ন বেশ কর্মঠ, শক্ত

বলে মনে হল। তিনি নিজে ধরা না দিলে, নিজের স্বরূপ নিজে না প্রকাশ করলে তাঁকে বোঝে কার সাধ্য? 'মায়য়া বহুরূপিণী।' নিজের স্বরূপ মায়ায় আবৃত করে রেখেছেন। আর আমার দৃষ্টি ও বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করেছেন। তখনও সময় হয়নি বোধহয় আমার!

শুনলাম মায়ের শরীর অসুস্থ। জ্ঞান মহারাজের ইচ্ছা ছিল সেইবারই মায়ের কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিই। কিন্তু মা বললেনঃ 'বাবা, এখন শরীরটা ঠিক নেই, পরে হবে।' আমার মনও হয়তো দীক্ষার জন্য ঠিক তৈরী হয়নি। তাই ছলনাময়ী মা অসুস্থতার ছল করে আমাকে তখন গ্রহণ করলেন না। সেবার কয়েকদিন ছিলাম। মাকে ঘরোয়া পরিবেশে, সংসারের নানা কাজেকর্মে দূর থেকে অনেকবার দেখলাম। কিন্তু মনে সত্যি কোনও উচ্চ ভাবের অনুভূতি টের পেলাম না। তবু মা যে স্নেহ-ময়ী, করুণাময়ী, নিকটতম কোন আত্মীয়ার মতো—এই বোধটুকু হয়েছিল। বিদায় নেওয়ার সময় যখন প্রণাম করে চলে আসছি তখন মা নিজেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটি কথা বললেন। আমার আগে যাঁরা প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফুল, বেলপাতা ইত্যাদির সঙ্গে একটা পাতা-সমেত আমলকীর ডালও দিয়েছিলেন। মা তখন পূজার আসনেই বসেছিলেন। প্রণাম করার পরেই মা হঠাৎ সেই আমলকীর পাতাগুলি তুলে আমাকে দেখিয়ে বললেনঃ 'জান বাবা, এই আমলকী পাতা বেলপাতার মতোই শিবের খুব প্রিয়।' কেন বললেন তা জানি না—কিন্তু এই বিধান আজও মনে আছে! ফিরে এলাম কর্মস্থলে। কিন্তু মন মাঝে মাঝে জয়রামবাটী ছুটে যেত।

জ্ঞান মহারাজ কিন্তু আশা ছেড়ে দেননি। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সেই বছরই বড়দিনের ছুটিতে আবার জয়রামবাটী গেলাম। এবারও নতুন বাড়ির বাইরের ঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। রামময় মহারাজই আবার আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মাকে প্রণাম করার পরেই এবার কিন্তু তিনি এমন একটা মনের ভাব প্রকাশ করলেন, যেন আগের বারে তাঁর অসুস্থতার জন্য দীক্ষা হল না, এবার তা হয়ে গেলেই ভাল। অপ্রত্যাশিত মায়ের ইচ্ছা আমার মনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল। আমি সানন্দে আমার বাসনা মাকে নিবেদন করতে, পরদিনই তিনি দীক্ষার দিন স্থির করলেন। পরের দিন সকালে পুণ্যপুকুরে স্নান করে অনাস্বাদিতপূর্ব বিচিত্র এক অনুভূতি হৃদয়ে নিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলাম। দীক্ষার জন্য আমার কোন প্রস্তুতি ছিল না। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যাইনি। অকিঞ্চন আমাকে মা তাঁর ঘরে, তাঁর পাশে বসিয়ে মহামন্ত্র দান করলেন। দীক্ষার পরে আমাকে দিয়ে তিনবার জপ করিয়েও নিলেন। ঠিক সেই সময় আমার চোখের সামনে থেকে একটা অদ্ভুত পর্দা সরে গেল! 'মোক্ষ-দ্বার কপাট-পাটনকরী' করুণাময়ী মা কি করলেন জানি না! কিন্তু আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই আমার ইষ্টমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাঁর মধ্যে দেখলাম। তিনবার দেখলাম। আমাকে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মা বলে উঠলেনঃ 'কি দেখছ বাবা? যা দেখছ, ঠিকই দেখছ।' কৃপাসুমুখী মা আমার চোখের আবরণ সরিয়ে দিয়ে নিজের স্বরূপটি মেলে ধরলেন। অনন্তরূপা সারদার বরাভয়া মূর্তি আমার সামনে প্রকাশিত হল। সর্বাঙ্গ শিহরিত, বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ আমাকে মা বললেনঃ 'বাবা, দক্ষিণা দাও।' আমার সঙ্গে তো কিছুই ছিল না। তখন মা-ই দেখিয়ে দিলেন ঘরের কোণে কয়েকটি ফল রয়েছে। অর থেকেই একটি তুলে

এনে তাঁকে দিতে বললেন। যন্ত্রচালিতবৎ সেই ফল তাঁকে নিবেদন করলাম। এ-জীবন কৃতার্থ হল! এই মনুষ্যজন্ম সার্থক হল! প্রণাম করে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম: এ কি হল?

সেদিন দুপুরে সব ভক্তদের সঙ্গে মায়ের ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেতে বসেছি। আমি নবাগত, একটু লাজুক স্বভাবের, তাই পঙ্ক্তির একেবারে শেষেই বসেছি। পরিবেশন শুরু হতেই দেখলাম, মা এসে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। একটা হাত চৌকাঠের উপর। কত স্নেহভরে তিনি তাকিয়ে আছেন, সকলকে খাওয়াচ্ছেন। দীক্ষার সময়ের মতো এখনও মাকে সেই বরাভয়া মূর্তিতেই আবার দেখলাম। আমি মাথা নিচু করেই খাচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন এসে আমাকে একবাটি পায়েস দিয়ে বললেন: 'মা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।' মুখ তুলে দেখি, মা মৃদুস্বরে বলছেন: 'খাও বাবা, সবটুকু খাও।' তখন আমার খাওয়ার মতো অবস্থা নয়। মায়ের ঐ অপার্থিব স্নেহ, অযাচিত করুণায় আমার চোখ ঠেলে জল আসছিল। আবেগ, উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ, আর সকলের মাঝে আমার এই বিশেষ ব্যবস্থায় আমি সংকুচিত। ধীরে ধীরে প্রসাদ সবটুকু নিঃশেষ করলাম। জীবনের সেই স্মরণীয় দিনের অবিস্মরণীয় ঘটনাটি আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আজও উজ্জ্বল।

সে যাত্রা জয়রামবাটীতে আরও কয়েকদিন ছিলাম। মায়ের গৃহস্থ-ভক্ত বিভূতি-বাবু ও সেবক রামময় মহারাজের কাছে জপধ্যান সংক্রান্ত সবকিছুই জেনে নিয়েছিলাম। সেজন্য মায়ের কাছে আর ওসব বিষয়ে কিছু জানা হয়নি। শুধু যে-কদিন ছিলাম দুবেলাই মাকে কখনও তাঁর ঘরে, কখনও বারান্দায় প্রণাম করতে যেতাম। জয়রামবাটী থাকাকালীন মাকে খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবেই দেখি। দেখি তাঁর মানবী ভাবটাই। করুণামিশ্রিত তাঁর জননীভাবই জয়রামবাটীতে প্রকট ছিল। তাঁর নিজের পরিবেশ-পরিজনই বোধহয় এর কারণ। চলে আসার দিন তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি মাথায় হাত দিয়ে মৃদুস্বরে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন: 'ভাল থাকো বাবা।' সেই স্বর এখনও কানে বাজে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকেই মায়ের শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ে। মার্চ মাসে মাকে উদ্বোধনে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেই সময় আমি কলকাতা থেকে জ্ঞান মহারাজের লেখা একটি চিঠি পাই। তাতে জানতে পারি মায়ের শরীর খুব অসুস্থ। দর্শন করতে হলে আর দেরি না করাই ভাল। এই চিঠি পাবার পরই জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমি কলকাতায় শ্যামবাজারের একটি বাড়িতে এসে উঠি এবং যথাসময়ে উদ্বোধনে মাকে দর্শন করতে যাই। তখন মায়ের শরীর খুবই অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তাঁকে শুধু দর্শন ও প্রণাম মাত্রই হয়। উদ্বোধনে মা যেন অন্য ভাবে থাকতেন। তাঁকে দর্শন করতে সময় ধরে ভক্ত-শ্রেণীর সঙ্গে যেতে হত। এখানে যেন মায়ের জয়রামবাটীর সেই সহজ, স্বচ্ছন্দ রূপটি দেবীত্বের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকত। এবারে তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না।

মাকে আমার শেষ দর্শন তাঁর স্থূল শরীর পরিত্যাগের পরে। দেহত্যাগের খবর পেয়েই পরদিন সকালে ছুটে যাই মায়ের চরণে শেষ প্রণাম জানাতে। সেদিন সারাদিন, একেবারে পবিত্র হোমাগ্নিতে বেলুড় মঠে দিব্যশরীরের আহুতি পর্যন্ত কাছাকাছিই ছিলাম।

আমি একটু শুষ্ক-মনের মানুষ। ব্রহ্মশক্তি জগন্মাতৃরূপে এই শরীরকে অবলম্বন করে লীলা করছেন, সাধু-ভক্তদের মুখে শুনেছিলাম, বিশ্বাসও করেছিলাম। কিন্তু নিজের অনুভূতি তখনও তেমন কিছু হয়নি। শুধু মায়ের স্নেহ আর কি যেন এক অপার্থিব ভাবে পরিপূর্ণ মায়ের মুখখানি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই মুখ সচরাচর দেখা যায় না—এইটুকু মনে হত। মায়ের জীবনীতে আছে, কাশীতে এক মেয়ে-ভক্ত মায়ের সামনেই গোলাপ-মাকে 'মা' মনে করায় তাঁর কাছ থেকে ধমক খেয়ে, সম্মুখে উপবিষ্টা মাকে দেখিয়ে বলতে শুনেছিলঃ 'দেখছ না? এমন মুখ কি মানুষের হয়!' আমারও যতবারই মায়ের মুখখানি দেখবার অবকাশ হয়েছিল, শুধু মনে হয়েছিলঃ এ মুখ কি মানুষের হয়!

মানুষের শরীরে মানুষের চালচলন নিয়ে যিনি আবির্ভূতা, তাঁর ভিতর অ-মানুষী, অপার্থিব ভাব দু-একবার ছাড়া বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলেও, তাঁর মুখের সেই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য যে তাঁর আন্তরসত্তার বহিঃপ্রকাশ—এটুকু বুঝতাম।

আজ জীবনের অন্ত্যলগ্নে জীবন-তরণী ভেসে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-পারাবারের অভিমুখে। এ-নৌকার হাল ধরে বসে আছেন যিনি, তাঁর মাথার ঘোমটা মাঝে মাঝে সরে গেলে আজও দেখতে পাই সেই মুখখানি। আর সেই ভরসায় নিশ্চিন্তে পড়ে আছি তাঁরই মুখ চেয়ে।

শ্রুতিলিখনঃ স্বামী অচ্যুতানন্দ

স্বামী অশেষানন্দ

স্বামী অখিলানন্দ আর আমি কলকাতায় একই কলেজে পড়তাম। কলেজের নাম সেন্ট পল্‌স্‌ কলেজ। অখিলানন্দ পড়তেন এক ক্লাস উঁচুতে। অখিলানন্দই আমাকে প্রথমে রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কাছে নিয়ে যান। মহারাজ তখন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। আছেন বলরাম বসুর বাড়িতে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমরা বলরাম-মন্দিরে গিয়ে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করে আসতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা বলরাম-মন্দিরে গিয়ে দেখি, মহারাজ বাইরে কোথাও গেছেন। কয়েকজন ভক্ত সেখানে ছিলেন। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি উদ্বোধনে গিয়ে মাকে দর্শন করে আসতে চাই কিনা। আমি অখিলানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কি ইচ্ছা। অখিলানন্দ বললেনঃ 'এখানে একজন সাধুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। আমি যেতে পারছি না। তুমি বরং যাও। আমি মাকে দেখেছি, তুমি তো দেখনি। তোমার কাছে এটা একটা মহা ভাগ্যের কথা।'

বলরাম-মন্দির থেকে উদ্বোধন হেঁটে যেতে দশ-পনের মিনিট লাগে। উদ্বোধনে গিয়ে আমি অফিস-ঘরে বসে আছি। এমন সময় স্বামী ধীরানন্দ (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে সেখানে দেখতে পেয়ে বললেনঃ 'আমি তোমাকে বলরাম-মন্দিরে কয়েকবার

দেখেছি। তোমার ধর্মজীবনের ভার কে নেবে, সে-সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?' সেই সময় আমি কান্ট, হেগেল, প্লেটো—এইসব খুব পড়ছি। এ'দের মধ্যে প্লেটো ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে তাঁকেই আমি সর্বাগ্রগণ্য মনে করতাম। অ্যারিস্টটলকেও পছন্দ করতাম তাঁর যুক্তিপ্রণালীর জন্য। কিন্তু প্লেটো আমার কাছে শ্রদ্ধা পেতেন তাঁর অতীন্দ্রিয় আদর্শের জন্য। কৃষ্ণলাল মহারাজকে আমি বললামঃ 'আমি অনেকটা ইয়াঙ্কি ছোকরাদের মতন। খুব কট্টর স্বভাবের ; আর অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। বাইবেল পড়েছি, কারণ সেন্ট পল্‌স্ কলেজে বাইবেল পড়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু গীতা-টীতা আমি পড়িনি।' আমার কথা শুনে কৃষ্ণলাল মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে বললেনঃ 'আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছুই বোঝ না। ধর্মজীবনে একজন পথপ্রদর্শকের দরকার। তিনি যেন মশাল হাতে করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। মনে কর, তুমি একটা গুহামন্দিরে গিয়েছ। সেখানে তো সব অন্ধকার। যদি তুমি একা যাও, নির্ঘাত তোমার মাথা দেয়ালে ঠোক্কর খাবে। কিন্তু একজন পান্ডা যদি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিয়ে চলে, তাহলে তোমার আর আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে না। তুমি নিশ্চিন্ত-মনে দেবদর্শন করতে পার।' আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?' তিনি উত্তর দিলেনঃ 'আমি এই বলতে চাই যে, শ্রীশ্রীমা ওপরে রয়েছেন। তোমার উচিত তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করা ; তাঁর কাছে প্রার্থনা করা যাতে তিনি তোমায় দীক্ষা দেন।'

এটা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সেই সময় শ্রীমার কথা বাইরে খুব বেশী প্রচার হয়নি। মায়ের কোন জীবনীগ্রন্থ বা ফটোও তখন পাওয়া যেত না। মা যখন কলকাতা আসেন, তখন যাতে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী-সঙ্গিনীদের থাকবার সুবিধে হয়, সেইজন্য স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ি' তৈরী করেছিলেন। আমি যে অফিস-ঘরে বসে ছিলাম, সেটা ছিল একতলায়। ওপরের তলায় ঠাকুরঘরে মা থাকতেন। স্ত্রীভক্তদের জন্য প্রতিদিনই মায়ের দর্শনের ব্যবস্থা থাকত। পুরুষ-ভক্তরা শুধু মঙ্গল ও শনিবার মায়ের কাছে যেতে পারতেন।

রাসবিহারী মহারাজ উদ্বোধন এবং জয়রামবাটী দু-জায়গাতেই মায়ের সঙ্গে তাঁর সেবার জন্য থাকতেন। তিনি ঐ অফিস-ঘরে এসে বললেনঃ 'যাঁরা মাকে দর্শন করতে চান, আমার সঙ্গে আসুন।' তিনি আমাদের বলে দিলেন, আমরা যেন মায়ের সঙ্গে কোন কথা না বলি, তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসব। রাসবিহারী মহারাজের পেছন পেছন মায়ের কাছে গিয়ে দেখলাম, মা ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন। মাকে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে সিঁড়ি দিয়ে যখন নেমে আসছি, কৃষ্ণলাল মহারাজ আমায় বললেনঃ 'মাকে বলেছিলে তোমায় কৃপা করতে? তোমায় দীক্ষা দিতে?' আমি বললামঃ 'না মহারাজ। আমাদের বলা হয়েছিল কথা না বলতে।" তিনি তখন রাসবিহারী মহারাজকে বলে দিলেনঃ 'রাসবিহারী, তুমি এই ছেলেটিকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও। মাকে বলো, এর মহারাজের কাছে যাতায়াত আছে। তিনি যেন অনুগ্রহ করে একে কৃপা করেন।' রাসবিহারী মহারাজ একটু গোঁড়া ছিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ সেটা জানতেন। সেইজন্য তিনি আরও বলে দিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ ছেলে, সম্ভ্রান্তবংশীয়, কলেজে পড়ি, ইত্যাদি।

কাজেই, আমি আবার মাকে দর্শন করার সুযোগ পেলাম। এবার দেখলাম, মায়ের মাথায় ঘোমটা নেই। মা বললেনঃ 'কেন বাবা, তুমি তো রাখালের কাছে যাও; রাখালই তো তোমায় দীক্ষা দিতে পারে। সে দেবার অধিকারীও বটে—তবে আমার কাছে কেন চাচ্ছ?' আমি বললামঃ 'মা, তুমিই যদি আমায় কৃপা কর, আমি মনে করব, সে আমার পরম সৌভাগ্য। আমার কাছে সেটা ভগবৎ-অনুগ্রহ বলে মনে হবে।' মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেনঃ 'আচ্ছা, তা-ই হবে। তুমি দুদিন পরে এস। গঙ্গাস্নান করে আসবে। সকালবেলাটা কিছু খেও না। নিচের অফিস-ঘরে এসে অপেক্ষা করো। ঠাকুরের পুজো শেষ করে আমি কাউকে পাঠাব তোমায় ওপরে নিয়ে আসতে। তারপর তোমার দীক্ষা হবে।'

মা যা যা বললেন, নিচে নেমে এসে কৃষ্ণলাল মহারাজকে সব বললাম। উনি খুব খুশী হলেন। মনে হল, তাঁর আনন্দ আমার চেয়েও বেশী। সেদিন আমি ভেবে যাইনি যে, দীক্ষা প্রার্থনা করব। আকস্মিকভাবে সব যোগাযোগ হয়ে গেল। আমার তখন সতেরো বছর বয়স। দীক্ষার তাৎপর্য কি, তা-ই আমি তখন জানতাম না। আমার খালি এই মনে হয়েছিল যে, মা আমাকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি আমার খুব নিকটজন, আমি অপরিচিত হলেও তিনি আমার অত্যন্ত আপন। সত্যি-কথা বলতে কি, মা যে স্বয়ং জগন্মাতা একথা আমার তখন মনেই হয়নি। পরবর্তী-কালে পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। মা তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক বিভূতি গোপন করে রাখতেন। আমি শুধু অনুভব করতাম, তাঁর অসীম দয়া, অফুরন্ত স্নেহ আর অপার করুণা। কিন্তু তিনিই যে মানবীরূপে অবতীর্ণা স্বয়ং আদ্যা শক্তি—একথা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার কথা অখিলানন্দকে সব বললাম। আরও বললাম যে, দীক্ষা কি, আমাকে কি কি করতে হবে বা কিভাবে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে—সেসব আমি কিছুই জানি না। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, চিন্তার কোন কারণ নেই, তিনি আমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। যেদিন দীক্ষা হবে, তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা কলেজস্ট্রীট বাজারে গেলাম। কিছু ফল, মিষ্টি আর ফুল কিনলাম। আর কিনলাম একটা লালপাড় শাড়ী—মাকে দেব বলে।

সেই রাতটা আমার একটু দুশ্চিন্তায় কাটল। অখিলানন্দের কাছে শুনেছিলাম, দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যকে যে মন্ত্র দেন, সেই মন্ত্রই শিষ্যকে গ্রহণ করতে হয়। সে-ব্যাপারে শিষ্যের কোন অভিমত প্রকাশ করতে নেই। আমি কিন্তু এতদিন একটা নির্দিষ্ট ভাবে আমার ইষ্টমূর্তির চিন্তা করে এসেছি। যদি মা সেটা পরিবর্তন করে দেন, তাহলে আমি কি করব? আমি তো তাহলে চুপ করে সেটা মেনে নিতে পারব না। আমাকে তো মুখ ফুটে বলতেই হবে যে, 'মা, আমার এইটা পছন্দ।' বেশ কিছুক্ষণ এরকম দুর্ভাবনায় কাটল—আমি ঘুমোতে পারলাম না।

পরদিন সকালে অখিলানন্দ এবং আমি গঙ্গাস্নান সেরে উদ্বোধনের সেই অফিস-ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। যথাসময়ে ডাক আসতেই আমি ওপরে গেলাম। মা নিজেই পুজো করলেন। তারপর মা আমাকে মন্ত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি যেমনটি মনে মনে চেয়েছিলাম, ঠিক সেই রকম মন্ত্রই মা দিয়েছেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলামঃ মা অসাধারণ সন্দেহ

নেই। তিনি অন্তর্যামী—আমার মনের কথা সব তিনি জানেন। আমার অন্তর তৃপ্তিতে ভরে গেল। দীক্ষার পর মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তুমি দুপুরে এখানে প্রসাদ পাবে তো?' আমি বললামঃ 'মা, আমি গোটা দিনের ছুটি নিইনি। শুধু একবেলার ছুটি নিয়েছি।' মা তখন আমাকে কিছু ফলমিষ্টি প্রসাদ দিলেন। আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম।

রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে দীক্ষার পর দেখা হল। তিনি বললেনঃ 'মা তোমাকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তোমার তো জপের মালা নেই দেখছি।' আমি বললামঃ 'আপনি কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?' তিনি রাজী হলেন। আমি তাঁকে মালার জন্য কিছু টাকা দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, দুদিন পর যেতে। এর মধ্যে তিনি মালা আনিয়ে শ্রীমাকে দিয়ে শোধন করিয়ে রাখবেন। দুদিন পর গেলে তিনি আমাকে বললেন যে, আমার জন্য তিনি মালার প্রতিটা দানা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করে দেখেছেন। আমি খুব অবাক হলাম। বললামঃ 'মালার দানা খাঁটি কিনা কিভাবে পরীক্ষা করা হয়? আমরা একটা মানুষ খাঁটি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। কিন্তু মালার দানা কি সেরকমভাবে পরীক্ষা করা যায়?' তিনি তখন পদ্ধতিটি বুঝিয়ে দিলেন। একটা পাত্রে জল নিয়ে ঐ জলে একটা দানা ফেলে দেওয়া হয়। যদি দানাটি ডুবে যায়, তবে বোঝা যাবে সেটি খাঁটি। আর ভেসে উঠলে বুঝতে হবে খাঁটি নয়। আমি তখন মালা নিয়ে ওপরে মায়ের কাছে চলে গেলাম। শ্রীমা মালা নিয়ে তাতে আমার মন্ত্র জপ করে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন কিভাবে মালায় জপ করতে হয়। ইষ্টমূর্তির চিন্তা ও ধ্যান কিভাবে করতে হয়, তা-ও তিনি সেদিন আমায় শিখিয়ে দিলেন।

পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ আমার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটিয়েছিলেন, যা না হলে আমি বুঝতে পারতাম না, ঐ শুভদিনগুলিতে আমি শ্রীমার কাছ থেকে কী সম্পদ লাভ করেছিলাম। আমি কিছুদিন স্বামী সারদানন্দের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করেছিলাম। মায়েরই কৃপায় এটা সম্ভব হয়েছিল বলে আমি মনে করি। সেই সময় স্বামী সারদানন্দ আমাকে দিয়ে যেসব চিঠি লেখাতেন তাতে শিষ্যদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ দিতেন। কোন শিষ্য মন্ত্র ভুলে গিয়ে থাকলে তার চিঠিটা তিনি নিজে লিখতেন। তা না হলে অন্য সব চিঠি আমাকে দিয়েই লেখাতেন। একদিন মহারাজের ধ্যানের পরে তাঁকে গিয়ে প্রণাম করে বললামঃ 'মহারাজ, শ্রীমা আমায় খুব সরলভাবে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আমায় সকাল-সন্ধ্যা নির্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র জপ করতে বা বিশেষ দিনেও কিছু করতে বলে দেননি। তিনি আমায় নির্দিষ্ট কোন সাধনপদ্ধতিও বলে দেননি। মহারাজ, আমার এমন কোন পদ্ধতির প্রয়োজন যাতে আমি ধাপে ধাপে এগোতে পারি। আপনি অনুগ্রহ করে অতিরিক্ত কিছু বলে দেবেন?' স্বামী সারদানন্দ বললেনঃ 'তোমার মতো মূর্খ আমি দুটো দেখিনি। শ্রীমা জগন্মাতা স্বয়ং। তুমি যেসব সাধনপ্রণালীর কথা বলছ, সেগুলি সাধারণ গুরুরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রীমার কথা স্বতন্ত্র। মা তোমাকে যা দিয়েছেন, তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে সেটাই শেষকথা জানবে। তোমার মন্ত্রটা আঁকড়ে ধরে থাক। সেই মন্ত্র জপ কর, তোমার ইষ্টমূর্তির ধ্যানচিন্তা কর—ব্যস্। যখন তোমার মনে ঈশ্বর-দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগবে, দেখবে যে তোমার মনই সেটা

জানতে পারছে। তখন তোমার মন সেই দিব্যসত্তাতে স্থির হয়ে যাবে, তোমার সব মনোবাঞ্ছা তখন পূর্ণ হবে। তুমি বলতে চাও, মা যা দিয়েছেন তার উপরেও আমাকে আরও কিছু দিতে হবে? আমি নিজে যে তাঁর কৃপাতেই এখানে আছি!' স্বামী সারদানন্দের কথাতেই আমার চোখ খুলে গেল। বুঝলাম যে, শ্রীমা কোন সাধারণ সাধিকা নন। তিনি স্বয়ং ভগবতী, জগজ্জননীর মূর্তবিগ্রহ, ব্রহ্মের লীলাচঞ্চল রূপ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি অভিন্ন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবীও এক অচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ। সেই আধ্যাত্মিক বন্ধনের স্বরূপ আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না, কোন দার্শনিক জ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারি না।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন—শ্রীমার জীবন কি নির্দেশ করে?—তার উত্তরে আমি প্রথমেই বলব, তাঁর জীবনে আমরা মূর্ত দেখি চির-আরাধ্যা কুমারী, পরিপূর্ণ পবিত্রতার বিগ্রহ প্রতীচ্যের সেই ম্যাডোনার আদর্শকে। এছাড়াও, গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলের মধ্যে নীরবে নিজের পবিত্র জীবনটি অতিবাহিত করে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি গৃহী-জীবনের আদর্শ। তাঁর জীবন দেখিয়ে দেয় কিভাবে গৃহী-ভক্তেরা ভগবানলাভের চেষ্টা করবে এবং ঈশ্বর-উপলব্ধি করবে। আমার মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সন্ন্যাসের আদর্শই বেশী প্রকট। তাঁর যুবক-ভক্তদের তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে সেটাই পরিষ্কার হয়। কিন্তু গৃহী-ভক্তরা যদি আলো পেতে চায়, তবে তাদের বিশেষ করে শ্রীমার দিকেই তাকাতে হবে। তিনি আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন অতি সহজ-ভাবে। আমরা ভাবি, যা অ-সাধারণ তা নিশ্চয়ই চমকপ্রদ, অ-প্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক কিছু হবে। যা-কিছু স্বাভাবিক, সহজ-সরল, তাকেই আমরা অত্যন্ত সাধারণ মনে করে অবজ্ঞা করি। শ্রীমার উপদেশ দেওয়ার পদ্ধতি ছিল অতি সরল। তাঁর জীবন থেকে যে-দুটি জিনিস আমি শিখেছি, তার একটি পবিত্রতা, অপরটি এই সরলতা। বস্তুত, জীবনের প্রতিটি মহৎ জিনিসই অত্যন্ত সরল। শিশু-অবস্থায় আমরা যে মাতৃস্নেহ আস্বাদ করি, তা কত সরল। কিন্তু শ্রীমার এই অসাধারণ সরলতার মধ্যেও এমন একটা সূক্ষ্মতা মেশানো ছিল যে, তাঁকে বোঝা কঠিন হত। আমিও তাঁকে খুব সামান্যই বুঝেছি। তবে লক্ষ্য করেছি, তাঁর উপস্থিতিতে সৃষ্ট হত এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল, অনুভূত হত সুস্পষ্ট কৃপা ও শান্তির স্পর্শ, আর স্থানটি হয়ে উঠত তীর্থস্বরূপ। তিনি কি ছিলেন এবং কোন্ মহান্ আদর্শের তিনি প্রতীক --কেবল শ্রীরামকৃষ্ণই তা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই তিনি গোলাপ-মাকে নিচের এই ঘটনার সূত্রে শ্রীমার স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন।

একদিন আমি গোলাপ-মাকে বলেছিলামঃ 'শ্রীমা স্থূল শরীরে থাকার সময় আমি যদি সঙ্ঘে যোগ দিতাম, তাহলে তাঁর সেবা করতে পারতাম।' গোলাপ-মা তখন কথায় কথায় বলেছিলেনঃ 'কে তাঁকে বুঝতে পেরেছে? আমি মায়ের এত কাছে কাছে থেকেছি, তবুও তাঁকে বুঝতে পারিনি।' এই বলে তিনি নিজেই আমাকে ঘটনাটি বললেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন শ্যামপুকুর চলে গেলেন, তখন গোলাপ-মা কারও কাছে শুনলেন যে, শ্রীমা ঠাকুরকে খুব বেশী খাওয়াচ্ছিলেন বলে ঠাকুরের অসুখ বেড়ে যাচ্ছিল। তাই ঠাকুর শ্যামপুকুর চলে গেছেন। একদিন মায়ের কানে কথাটা যেতেই মা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তুমি নাকি আমার সেবায় অসন্তুষ্ট?

সেইজন্যই নাকি তুমি শ্যামপুকুর চলে এসেছ?' মায়ের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ স্তম্ভিত। বললেনঃ 'এরকম কথা কে বলেছে?' শ্রীমা বললেন, তিনি অমুকের কাছে শুনেছেন যে গোলাপ-মা এরকম বলছেন। এইকথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভীষণ রেগে গেলেন। বললেনঃ 'সেই বামুনী আসুক দেখি এখানে। আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেব।' যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হতেন, কেউ তাঁর কাছে এগোতে পারত না।

এই ঘটনার ঠিক পরদিনই গোলাপ-মা ঠাকুরের কাছে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তুমি এরকম কথা বলেছ? যাও, ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। ও যদি তোমার উপর অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে আমার কাছেও তোমার ঠাঁই হবে না।' তার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ 'সারদা সরস্বতী। সাধারণ মানবীর মতো দেখতে হলেও, ও আসলে জগন্মাতা স্বয়ং—যাঁর কৃপাকটাক্ষে মানুষের জ্ঞানলাভ সম্ভব। ও অবতীর্ণা হয়েছে মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান দান করতে, জগৎকে আলোর সন্ধান দিতে।' গোলাপ-মা আমাকে বলেছেন, ঠাকুরের এইকথা শুনে তিনি শ্যামপুকুর থেকে সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। সেখানে শ্রীমায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেনঃ 'মা, দয়া করে তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি অমুকের কাছ থেকে শুনে বলেছিলাম। এরকম করা আমার উচিত হয়নি। ঠাকুর আমার উপর খুব রেগে গেছেন। তুমি যদি ক্ষমা না কর, তিনি আর আমাকে তাঁকে দর্শন করার অনুমতি দেবেন না।' শ্রীমা তাঁর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বললেনঃ 'ভুলে যাও গোলাপ, ভুলে যাও। তুমি তো আমার মেয়ে। মা কি কখনও মেয়ের উপরে রাগ করতে পারে? ঠাকুরকে বলো, আমি তোমার উপর সম্পূর্ণ খুশী।' শ্রীরামকৃষ্ণই গোলাপ-মার চোখ খুলে দিয়েছিলেন—যার ফলে শ্রীমার অনুপম দৈবী মহিমা ও শক্তি তিনি কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

শ্রীমার শিষ্য চন্দ্রমোহন দত্তর কাছে আমি আর একটা ঘটনা শুনেছি। আমি তখন উদ্বোধন-অফিসের ম্যানেজারের সহকারী হিসেবে কাজ করতাম আর চন্দ্রবাবু বই প্যাক্ করার কাজ দেখাশোনা করতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ, যিনি পরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তিনি একদিন গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ চন্দ্রবাবুকে বললেনঃ 'তুমি তো মায়ের কাছে যাও। তাঁর কাছে গিয়ে কি চাও?' চন্দ্রবাবু উত্তর দিলেনঃ 'আমি তাঁর কাছে কিছু মিষ্টি প্রসাদ চাই।' তখন মহারাজ বললেনঃ 'তুমি কি মায়ের কাছে শুধু প্রসাদ চাইতেই এসেছ? শুধু সেইজন্যই কি এসেছ তুমি? মা মুক্তিদায়িনী। তুমি মায়ের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান চাও, মুক্তি চাও।' চন্দ্র-বাবু বললেনঃ 'ঠিক আছে, মহারাজ। তা-ই চাইব আমি।' উদ্বোধনে ফিরেই চন্দ্র-বাবু মায়ের ঘরে গেলেন। মা তখন দুপুরের পুজোয় বসেছেন। মা তাঁকে দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু পুজোয় বসেছেন বলে কোন কথা বললেন না। ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন, তিনি কি চান। চন্দ্রবাবু পরে বলেছিলেনঃ 'আমার বুক তখন দুরুদুরু করে কাঁপতে লাগল। আমি ভেবে রেখেছিলাম, বলব, "মা, আমায় কৃপা করে ব্রহ্মজ্ঞান দাও। যদি সেটা খুব বেশী হয়, তবে মুক্তি দাও। যদি তা-ও না হয়, অন্তত মোক্ষ।" কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা এল না আমার। দম বন্ধ হয়ে আসছে মনে হতে লাগল। কোনমতে বলে ফেললাম, "প্রসাদ চাই, মা"।' শ্রীমা আঙুল দিয়ে খাটের নিচে দেখিয়ে দিলেন। সেখানে একটা প্লেটে প্রসাদ ঢাকা ছিল। চন্দ্রবাবু তা থেকে কিছু রসগোল্লা, সন্দেশ আর চমচম নিয়ে নিচে নেমে এলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দকে এসে বললেনঃ

'মহারাজ, আমি ঠিক করেছিলাম ব্রহ্মজ্ঞান চাইব। কিন্তু কিছু একটা ঘটে গেল। কি ঘটল, আমি ঠিক জানি না।' এ থেকে বোঝা যায়, এই ধরনের প্রার্থনা কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না। মায়ের কাছে শিশু যেভাবে চায়, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি-লাভের জন্য তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা জাগা চাই। তবে মায়ের প্রতি চন্দ্রবাবুর যেমন ভক্তি ছিল আর মা-ও তাঁকে যেমন ভালবাসতেন, তাতে আমি বিশ্বাস করি, শেষ মুহূর্তে তিনি নিশ্চয়ই এই আপেক্ষিক জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীমায়ের বাহুডোরে শাশ্বত আশ্রয় লাভ করেছেন।

চন্দ্রবাবুর জন্যই আমি স্বামী সারদানন্দের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলাম এবং তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। তাঁর কাছে শুনেছিলাম, মায়ের কাছে গিয়ে তিনি একবার আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়েছিলেনঃ 'মা, আমি তোমার সেবা করতে চাই।' শুনে মা বললেনঃ 'না বাবা, সরলাই তো আছে (সরলা অর্থাৎ যিনি পরে সারদামঠের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন—নাম হয়েছিল প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা)। তুমি বরং আমার ছেলে শরতের সেবা কর। যদি তুমি সর্বদা তার অনুগত থেকে অবিচলিত ও আন্তরিকভাবে তার সেবা করে যাও, তাহলে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হবে। যে-কেউ এভাবে শরৎকে সেবা করবে, তার সর্বোচ্চ গতি হবে।'

মায়ের এই কথাটি চন্দ্রবাবুর কাছ থেকে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই আমি শরৎ মহারাজকে ছেড়ে কখনও অন্য কোথাও যেতে চাইনি। ঠিক করেছিলাম, যতদিন এই মহাপুরুষ আমাকে তাঁর সেবার সুযোগ দেবেন, তাঁর কাছে থাকব। একবার সাধুরা সব এলাহাবাদ যাচ্ছেন কুম্ভমেলা উপলক্ষে। স্বামী সারদানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে অনেক সাধুর সমাবেশ হবে, আমি যেতে চাই কিনা। আমি বললামঃ 'মহারাজ, আমি আপনার কাছে বেশ আছি। আমি আর কোথাও যেতে চাই না।'

প্রথম যেদিন আমি মায়ের কাছে গিয়েছিলাম, সেদিন অন্যমনস্কভাবে আমার জুতোজোড়া চৌকাঠে ফেলে রেখে যাওয়ার জন্য স্বামী সারদানন্দ আমাকে খুব বকেছিলেন। এর ফলে স্বামী সারদানন্দ সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। পরে যে তাঁর এবং আমার মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি যে আমাকে তাঁর সেবার সুযোগ দিয়েছিলেন—তা-ও মায়েরই কৃপায় সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করি।

যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমার মতো মহান্ আচার্যরা পৃথিবীতে আসেন এক-একটি আদর্শ-জীবন যাপন করতে। তাঁরা মানবজাতিকে দেখিয়ে দেন, ঈশ্বর-উপলব্ধি অন্য যে-কোন ঘটনার মতোই বাস্তব। তাঁদের পুণ্যজীবন মানবজাতির কাছে সর্বোচ্চ আশীর্বাদ-স্বরূপ। আমি বিশ্বাস করি, যতদিন আমি শ্রীমায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলব, তাঁর অসীম কৃপায় আমাকে যে-মন্ত্র তিনি দিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত আমি তার মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারব, ততদিন আমি, অন্তত আমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী, তাঁর কাজ করতে সমর্থ থাকব। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন। আমি শুধু তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করেছি, তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেছি, আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছি। তাঁর শ্রীচরণে আমার বিনম্র প্রণতি এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, এই জীবনে আমি যা কিছু পেয়েছি, তা তাঁর কৃপাতেই

সম্ভব হয়েছে। এখন আমার সমগ্র চিত্ত উন্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছে তাঁরই দিকে—এই আশায় যে, এই মায়ার জগৎ থেকে উত্তরণ করিয়ে তিনি আমায় নিয়ে যাবেন সেই জগতে—যেখানে আছে চিরজ্যোতি, দিব্যসৌন্দর্য, নিত্য-আনন্দ এবং শাশ্বত-সত্য। *

অনুবাদঃ ব্রহ্মচারী পবিত্রচৈতন্য

স্বামী অপূর্বানন্দ

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ আমার জীবনের স্মরণীয় বছর। ঐ বছরেই আমি প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য লাভ করি, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পুণ্যপীঠ বেলুড় মঠ দর্শন করি এবং ঐ বছরই আমি শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ জন সাক্ষাৎ শিষ্য—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দের দর্শন লাভ করি।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর কয়েকদিন পরে প্রথম বেলুড় মঠে যাই এবং সেখানে আট-দশ দিন বাস করি। বেলুড় মঠ দর্শনেরও একটু ইতিহাস আছে। আমি একবার স্বপ্নে বেলুড় মঠ ও মহাপুরুষ মহারাজকে দেখি। ঐ স্বপ্নের কথা চিঠিতে মহাপুরুষ মহারাজকে জানিয়ে বেলুড় মঠ দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করি। তা তিনি দিয়েছিলেন। ঐ চিঠি পেয়ে বেলুড় মঠ অভিমুখে যাত্রা করলাম। মঠে পৌঁছে দেখলাম—সেই আমার স্বপ্নদৃষ্ট বেলুড় মঠ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ঠাকুরঘরে (পুরানো মন্দির) প্রণাম করতেই সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে গেল। খানিক পরে উঠোনে নেমে এসে জনৈক সন্ন্যাসীকে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শনের প্রার্থনা জানাতে আমায় তিনি নিয়ে গেলেন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। মঠবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতেই একজন দিব্যকান্তি শান্তদর্শন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে দেখেই মন বলে দিল, ইনিই আমার স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ মহারাজ। সস্নেহে তিনি আমার দিকে তাকালেন—কৃপা ও করুণা যেন ঝরে পড়ছে ঐ চাহনিতে। আমি অভিভূতের মতো তাঁর চরণে প্রণত হলাম। তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলে তিনি বললেনঃ 'আমি তো কাউকে দীক্ষা দিইনে। ঠাকুরই তোমার গুরু, তুমি পতিতপাবন রামকৃষ্ণ-নাম জপ কর, এতেই তোমার কল্যাণ হবে। পরে যদি দীক্ষার প্রয়োজন হয় সে ব্যবস্থাও তিনিই করে দেবেন।'

দু-তিন দিন মঠে থাকার পর একদিন সকালে যথারীতি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি, তিনি নিজেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কথা তুলে বললেনঃ 'তুমি তো মাকে দেখনি। তোমার মহাভাগ্য যে এসময় শ্রীমা বাগবাজারের উদ্বোধনে আছেন—তাঁকে দর্শন করতে যেও। বলরাম-মন্দিরে মহারাজ, হরি মহারাজ রয়েছেন, তাঁদেরও দর্শন করবে।' পরদিন সকালেই যাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেনঃ 'উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজকে, আর বলরাম-মন্দিরে মহারাজ ও হরি মহারাজকে দর্শন করে বলবে যে, আমি তোমাকে মঠ থেকে পাঠিয়েছি।'

পরদিন সকালবেলা নৌকায় বাগবাজারে পৌঁছালাম। 'নৌকা থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে যখন উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ি' পৌঁছালাম, তখন দেখলাম 'মায়ের বাড়ি'র সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার গাড়িটি চলে গেল। 'মায়ের বাড়ি'র ভেতরে ঢুকতেই একজন সাধু বললেনঃ 'শ্রীমা এইমাত্র ঘোড়ার গাড়িতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বলরাম-মন্দিরে গিয়েছেন। এ-বেলা তাঁর দর্শন হবে না। বিকেলে মহিলা-ভক্তদের দর্শনের সময়। অতএব আগামীকাল সকালে ছাড়া মায়ের দর্শন অসম্ভব।'

মায়ের দর্শন হবে না শুনে মনটা খুব দমে গেল। এই সময় একজন স্থূলকায় প্রবীণ সাধু গঙ্গাস্নান করে ফিরলেন। ভিজে গামছা পরা, কাঁধে পাটকরা ভিজে কাপড় ও হাতে গঙ্গাজলের ঘটি। প্রণাম করতে গেলেই গম্ভীর স্বরে বললেনঃ 'দাঁড়াও, আগে পা-টা ধুয়ে নিই।' ঐ সাধু জানালেনঃ ইনি স্বামী সারদানন্দ। পা ধুয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই তাঁকে প্রণাম করে মাকে দর্শন করার প্রার্থনা জানালাম। আরও জানালাম যে, পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমায় পাঠিয়েছেন। স্বামী সারদানন্দও বললেন, সেদিন শ্রীমায়ের দর্শন সম্ভব নয়। পরদিন সকালে মায়ের দর্শন হতে পারে।

তখন উদ্বোধনে আরও দু-এক জন সাধুকে প্রণাম করে বলরাম-মন্দিরে রাজা মহারাজ ও হরি মহারাজকে দর্শন করতে রওনা হলাম। বলরাম-মন্দিরে গিয়ে রাজা মহারাজের দর্শন পেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন তো ভাগ্যে ঘটেনি—কিন্তু তাঁর মানস-পুত্রকে স্থূল শরীরে দর্শন ও প্রণাম করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হল। কিন্তু হরি মহারাজের দর্শন পেলাম না। তাঁর সেবক-মহারাজ বললেন, সন্ধ্যার পরে তাঁর দর্শন হবে—এ-বেলা নয়। সন্ধ্যার পরে আবার গেলাম বলরাম-মন্দিরে। সেবক-মহারাজের সঙ্গে দেখা হল।

সেবক-মহারাজ আমাকে হরি মহারাজের ঘরে নিয়ে গেলেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম, তারপর পাদস্পর্শ করলাম। তিনি আমায় পাশের ছোট বেঞ্চিতে বসতে বললেন এবং সস্নেহে নানা কথা বলতে লাগলেন। মায়ের দর্শন পাইনি, তাতে মনটা খুবই খারাপ ছিল। মমতা-ভরা স্বরে তিনি আমায় বললেনঃ 'মায়ের দর্শন কি সোজা কথা? তিনি তোমার অন্তরে ব্যাকুলতা বাড়াবার জন্য আজ দর্শন দেননি। পরে তাঁর দর্শন পাবে। সেজন্য দুঃখ করো না। তোমার মনে তাঁর অভাববোধ আরও বাড়লে ঠিক সময়ে তিনি দর্শন দেবেন। খুব কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর। তিনি প্রসন্ন হয়ে অবশ্যই দর্শন দেবেন।' শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের পেছনে যে এত কথা আছে, এত প্রস্তুতির প্রয়োজন—তা আমার ধারণা ছিল না। তাঁর কথায় মনটা শান্ত হল। তাঁকে প্রণাম করে বাসস্থানে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালবেলা শ্রীমায়ের দর্শনে গেলাম, হল না। সাধু-মহারাজরা বললেন যে, সেদিন সকালে বিশেষ কারণে পুরুষ-ভক্তদের দর্শন হবে না। আগামী দিন সকালে আসতে বললেন। মনটা খুব দমে গেল। বলরাম-মন্দিরে গেলাম পূজনীয় মহারাজ ও হরি মহারাজের দর্শনে, তা-ও হল না। দিনটি যেন শতযুগের মতো বড় মনে হতে লাগল! যতটা সম্ভব ধ্যান ও প্রার্থনাদি করলাম, কিন্তু মনের ভিতর একটা বিরাট শূন্যতা—শূলবিদ্ধবৎ ছটফট করে কাটালাম। সন্ধ্যায় আবার গেলাম হরি

মহারাজের কাছে। নানাভাবে তিনি আমায় সান্ত্বনা দিলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কাছে বসে তাঁর স্নেহে আপ্লুত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিলাম। রাত্রে প্রাণের অস্থিরতায় ঘুম হল না।

আমি উঠেছিলাম এক ভক্তের বাড়িতে। পরদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে ভক্তটির ঠাকুরঘরে একটু বসেছি ধ্যান করব বলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। আনন্দ ও বিস্ময়ে বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে অনেকক্ষণ আসনে বসেছিলাম। আসন থেকে যখন উঠলাম তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে—আমিও ধ্যানের কথা ভাবতে ভাবতে আশাভরা প্রাণে মায়ের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

উদ্বোধন-বাড়িতে পৌঁছে দেখি, ততক্ষণে পনের-বিশ জন ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করছেন। জানা গেল যে, মায়ের দর্শন হবে। আনন্দে অধীর হয়ে গেলাম। সাড়ে সাতটার পরে একজন মহারাজ একটি বড় রেকাবিতে শালপাতায় সাজানো প্রসাদ নিয়ে এসে সকলের হাতে হাতে দিয়ে বললেনঃ 'মা প্রসাদ পাঠিয়েছেন, প্রসাদ খেয়ে অপেক্ষা করুন। মায়ের দর্শনের জন্য ডাকা হলে সকলে দর্শন করতে যাবেন।' তিনি আরও বললেন যে, মা নিজের হাতে প্রসাদ সাজিয়ে ভক্তদের জন্য পাঠিয়েছেন। ঐ প্রসাদ খেতে খেতে খুব আনন্দ হল। মা প্রসন্ন হয়ে নিজের হাতে প্রসাদ পাঠিয়েছেন। এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে? ঐ প্রসাদে ছিল শ্রীমায়ের স্পর্শ, তাঁর স্নেহ ও মমতা।

ভক্তরা বলাবলি করছিলেনঃ সামনের এক সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হবে, মাকে দর্শন করে অন্যদিক দিয়ে নেমে আসতে হবে। মা পুরুষ-ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন না, ইত্যাদি। আমি এসব জানতাম না। মা পুরুষ-ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন না শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। আমি তো মা বলে ডাকব, তিনি কি সাড়া দেবেন না! একটা কথাও বলবেন না! মন এ-চিন্তায় যেন শতধা বিখণ্ডিত হচ্ছিল। এমন সময় দেখলাম ভক্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে। উপরে উঠবার সিঁড়ি দিয়ে চলেছেন সবাই সারিবদ্ধ হয়ে। সিঁড়ি পর্যন্ত সকলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার মনে হলঃ 'আমি সকলের পেছনে থাকব। সকলের শেষে আমি প্রণাম করব।' বালকবুদ্ধি! শেষটায় আবার ভয় হল—মা যদি ততক্ষণে চলে যান, যদি প্রণাম করতে না পাই।

কিন্তু তখন আর এগিয়ে গিয়ে অন্য রকম কিছু করার উপায় ছিল না। ঐ লাইনে সকলের শেষে চুপচাপ প্রার্থনারত হয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ভোরবেলার ধ্যানের চিত্রটি অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ভক্তরা সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছেন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে আমিও অনুসরণ করে চলেছি। ক্রমে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখা গেল একটি ঘরের দরজার সামনে এক একজন ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন এবং অন্য দিক দিয়ে নেমে যাচ্ছেন। এগিয়ে চলেছি—আমার পেছনে আর কেউ নেই। ঘরের দরজার সামনে প্রণামের স্থানে এসে দেখি শ্রীমা আপাদমস্তক একখানি গরদের সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে অবগুণ্ঠিতা হয়ে বসে আছেন—মায়ের পা-ও দেখা যায় না—সর্বই ঢাকা। মনটা দমে গেল—অপেক্ষা করার সময় ছিল না। আমিও নতজানু হয়ে মায়ের সামনে ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করলাম—হয়তো তিরিশ-চল্লিশ সেকেন্ড বা এক মিনিট মাথা নিচু করে ছিলাম—চোখ

জলভরা। মাথা তুলেই দেখি মা চাদরটি সরিয়ে দিয়েছেন, মুখে অবগুণ্ঠন নেই। সস্নেহে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। তাঁর পাদস্পর্শ করবার জন্য হাত বাড়াতেই মা স্মিতমুখে আমার মুখে হাত বুলিয়ে চোখের জল মুছে দিলেন এবং আমার চিবুক ধরে চুমু খেলেন। আর মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'বাবা! প্রসাদ খেয়েছ?' আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বললামঃ 'হাঁ মা, খেয়েছি।' ব্যস্, এই দুটি মাত্র কথা। মায়ের স্নেহস্পর্শে মধুর-বচনে অন্তর ভরে গিয়েছিল—আমি অবাক হয়ে শুধু দেখছিলাম মাকে—ভোরবেলায় ধ্যানের সময় এঁকেই তো দর্শন করেছিলাম। সেই সরু লালপেড়ে কাপড়খানি পরা মাতৃমূর্তি আমাকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সর্বাঙ্গে চুম্বন ও স্পর্শ দিয়ে হাত বুলিয়ে কতভাবে আদর করছিলেন। সবই স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছিল। ইচ্ছা হল মাকে জিজ্ঞাসা করি—কিন্তু তা করিনি। মাকে আর একবার প্রণাম করে বিদায় নিলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে চেয়ে দেখি মা তখনও বসে আছেন—আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে। তিনি দৃষ্টির ভিতর দিয়ে আমায় অনুসরণ করছেন। এত বৎসর পরে এখন ঠিক জেনেছি, বুঝেছি—আমি যত দূরেই যাই না কেন, তাঁর দৃষ্টিরেখার বাইরে যেতে পারি না কিছুতেই।

নেমে এসে প্রথমেই মনে হল, আমার এই সৌভাগ্যের সমাচারটি ছুটে গিয়ে আগে পূজনীয় হরি মহারাজকে দেব। তখন বেলা সাড়ে আটটা। তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিনা সে এক কথা। তাছাড়া সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল—মঠ থেকে তিনদিন এসেছি, এক-দিনের জন্য এসেছিলাম, দর্শনাদি সেরে সেদিনই মঠে ফিরে যাবার কথা ছিল, বিশেষ করে অনিশ্চয়তার জন্য কোন খবরও মঠে পাঠাতে পারিনি। তাই তখনই মঠে ফিরে যাওয়া স্থির করলাম।

পূজনীয় হরি মহারাজের সঙ্গে স্থূল শরীরে আর দেখা হয়নি। তাঁর আশীর্বাদেই আমি শ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছিলাম। তিনিই পুণ্যস্পর্শ দিয়ে আমার দেহমন পবিত্র করে দিয়েছিলেন—প্রার্থনার দ্বারা মাতৃদর্শনের সব বাধা করেছিলেন অপসারিত এবং শক্তিপূর্ণ প্রেরণায় অগ্রগতির পথে করেছিলেন চালিত। আমার অন্তরের সকল কৃতজ্ঞতা তাঁকে জানাতে পারিনি বলে এখনও অনুশোচনা হয়।

মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে সব বললাম। তিনি খুশী হয়ে বললেনঃ 'তোমার ভাগ্য ভাল, নইলে এমন সব যোগাযোগ হওয়া। শ্রীমাকে দর্শন করেছ—তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন—আশীর্বাদ করেছেন—এ কি সাধারণ কথা! তোমার মঙ্গল হবে—আমি বলছি—খুব মঙ্গল হবে। ঠাকুর তোমায় কৃপা করেছেন।'

সেবার আট-দশ দিন বেলুড় মঠে বাস করে, নিজেকে মঠে রেখে শুধু দেহটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

আগস্ট ১৯১৯। রামকৃষ্ণ মিশন বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য সেবা-কাজ করছিল। মহাপুরুষ মহারাজ আমায় লিখলেনঃ 'বাঁকুড়া জিলার ইন্দপুর অঞ্চলে আমাদের মঠ হইতে দুইজন সাধু দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। ওখানে একজন কর্মীর প্রয়োজন, অতএব তুমি পত্রপাঠ মঠে চলিয়া আসিবে। আমরা তোমাকে বাঁকুড়ায় সেবাকার্যে পাঠাইব।' চিঠিখানা পাবার দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমি একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে বেলুড় মঠের দিকে যাত্রা করলাম এবং তৃতীয় দিন মঠে পৌঁছে মহাপুরুষ

মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি আনন্দে বললেনঃ 'এসেছ? বেশ করেছ। আজ রাতেই বাঁকুড়া যেতে হবে।'

ইঁদপুরে গিয়ে সেবাকাজে যোগ দিলাম। মায়ের বাড়িও ঐ বাঁকুড়া জেলায়, আর মা তখন জয়রামবাটীতেই আছেন। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার এবং তাঁর কৃপা লাভের এটাই প্রশস্ত সুযোগ মনে করে মহাপুরুষ মহারাজকে মনের ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখলাম—তিনি যদি দয়া করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার দীক্ষা সম্বন্ধে একটু লিখে দেন, তবেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পাওয়া সম্ভব।

আমার চিঠি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ জবাব দিলেনঃ 'শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতি উত্তম। তুমি যাইয়া তাঁহাকে বলিও, "শিবানন্দ স্বামী (তারক মহারাজ) আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আমায় আপনার শ্রীচরণ সমীপে পাঠাইয়াছেন। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করিতে তিনি আমায় পাঠাইয়াছিলেন, সেখান হইতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ও কৃপা লাভের জন্য আসিয়াছি। আপনি কৃপা করুন।"—এইকথা বলিলেই তিনি তোমায় দয়া করিবেন। তিনি দয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে যায় কাহাকেও বিমুখ করেন না। অতএব আমার স্বতন্ত্র পত্র দিবার প্রয়োজন নাই। এই পত্রখানি তাঁর শ্রীচরণ সমীপে পাঠ করিও, তাহা হইলেই হইবে।' মহাপুরুষ মহারাজের চিঠিখানি পেয়ে খুবই আনন্দ হল—আনন্দে ও আশায় অন্তর ভরে উঠল। কিন্তু যে-কাজে এসেছি তার ক্ষতি করে তো যাওয়া যায় না। মাতৃদর্শনের সুযোগের জন্য তাই প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ঐ চিঠিতেই মহাপুরুষ মহারাজ দুখানি গামছা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। স্থানীয় হাট থেকে কিনে রেজিস্ট্রি ডাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। গামছা দুখানি পেয়ে মহাপুরুষ মহারাজ লিখলেনঃ 'তোমার প্রেরিত গামছা দুইখানি আজ পাইলাম। শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ বড় ভাগ্যে ঘটে। তুমি যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া বলিবে, "মা, আমাকে কৃপা করুন।" তারপর তিনি দয়া করিয়া যাহা বলিবেন, তাহাই শিরোধার্য করিবে। যদি তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে মন্ত্র দান করেন, জানিবে তুমি ভাগ্যবান। তিনি আমাদের সকলের মা। তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র পাইলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে। ইহাতে আমারও পরম আনন্দ হইবে, জানিবে। তিনি প্রভুরই নাম তোমায় দিবেন—সকলকেই তিনি তাহাই দেন।'

তাঁর চিঠিখানি পেয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য মন খুবই ব্যাকুল হল। শ্রীভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করতে লাগলাম, সুযোগও হয়ে গেল। কয়েকদিনের ছুটি পেয়ে যাত্রা করলাম মায়ের দর্শনে।

হেঁটে বাঁকুড়া আশ্রমে—ওখান থেকে ট্রেনে গড়বেতা। স্থানীয় আশ্রমে একরাত্রি কাটিয়ে 'ভাদরের' প্রথম দিকে এক ভোরে রওনা হলাম পুণ্যপীঠ জয়রামবাটীর দিকে। খালি পা, জলকাদা ও পিচ্ছিল পথ, হালকা এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় যখন জয়রামবাটী গ্রামের উপকণ্ঠে এলাম তখন বুকের ভিতর যেন ঢেঁকির পাড়-পড়ার মতো শব্দ হতে লাগল। পথের দুধারেই ছোট ছোট মেটে ঘরগুলি অতিক্রম করে উপনীত হলাম মায়ের বাড়ির দরজায়। যদিও আমি কোন চিঠিপত্র দিইনি, তবু মা যেন জানতে পেরেছিলেন। সেবক-মহারাজদের পরিচয় দিয়ে মাকে দর্শন করার প্রার্থনা জানাতেই তাঁরা আমায় বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমা

তখন ভিতরের দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রণাম করে মাথা তুলতেই মা আবেগভরে বললেনঃ 'আহা! বাছার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে—সারাদিন খাওয়া হয়নি। ওকে কিছু খেতে দাও।' আমি পকেট থেকে মহাপুরুষ মহারাজের লেখা চিঠিখানি বের করে পড়তে যাচ্ছি, তখন মা বললেনঃ 'চিঠি পরে শুনব। এখন বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নাও।'

হাত-মুখ ধোয়ার পর সেবক-মহারাজ আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। আসন পাতা, গ্লাসে জল, একথালা মুড়ি ও তালক্ষীর। আমি মাথা নিচু করে মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে সব খেয়ে ফেললাম। সে কী অমৃত! মুড়ি-তালক্ষীর তো কত খেয়েছি জীবনে, কিন্তু এমন মধুর তো কখনও লাগেনি!

জয়রামবাটীতে মাকে দেখলাম ঠিক মায়ের মতোই—মলিন বস্ত্রে দাঁড়িয়েছিলেন, আমার আগমন-প্রতীক্ষায়, কত স্নেহ ও করুণা মূর্তিতে! প্রায় দশমাস পূর্বে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়িতে' মাকে যখন দর্শন করি, তখন তাঁকে এত কাছের মনে হয়নি।

একটু পরেই আমি পুনরায় মায়ের কাছে গেলাম। তিনি তখন পা ছড়িয়ে বসেছিলেন তাঁর মাটির ঘরটির বারান্দায় এবং কুটনো কুটছিলেন। মাকে প্রণাম করে পাশে বসে মহাপুরুষ মহারাজের চিঠিখানি পড়ে শোনালাম। তিনি 'তারকের' (মহাপুরুষ মহারাজের) খবর জিজ্ঞেস করলেন, সস্নেহে দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যের সব খবর নিলেন। পরে দীক্ষা সম্বন্ধে বললেনঃ 'তা বাবা, কাল বেশ ভাল দিন (বোধহয় জন্মাষ্টমী ছিল), কালই তোমায় মন্ত্র দেব। সকালে কিছু খেও না, স্নান করে অপেক্ষা কোরো। আমি সময়মতো ডেকে নেব।' তারপর পাশের ঘরে (তাঁর ঠাকুরঘরে) প্রণাম করতে বললেন।

আমি শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম—বাঁকুড়ার ডাক্তার-স্বামী বৈকুণ্ঠ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের 'আমবাতের' জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ পাঠিয়েছিলেন আমার হাতে। মাকে তা দিতেই তিনি করুণস্বরে বললেনঃ 'বৈকুণ্ঠ ওষুধ পাঠিয়েছে? দাও বাবা, দাও। বৈকুণ্ঠের ওষুধে অসুখ সেরে যায়। দেখ, সারা গায়ে কি হয়েছে—আমবাতের যন্ত্রণায় মরে গেলুম।' এই বলতে বলতে গায়ের কাপড় সরিয়ে সারা বুকে-পিঠে আমবাত দেখাতে লাগলেন। মায়ের কষ্ট দেখে চোখে জল এল।

মা ওষুধটি নিয়ে একপাশে রেখে দিলেন এবং খুব আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ মহারাজ প্রভৃতির সব খবর জিজ্ঞেস করলেন। আরও কত কথা!

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—ঘরে ঘরে দীপ জ্বালা হল। মায়ের ঠাকুরঘরেও আলো, ধূপ-ধুনো দেওয়া হল। আমি বহির্বাটীতে চলে এলাম।

ঐদিন জয়রামবাটীতে অন্য কোন ভক্ত উপস্থিত ছিল না। রাত্রে মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার খাওয়া দেখছিলেন। আমার সারাদিন খাওয়া হয়নি বলে কত যত্ন করে আমাকে খাওয়ালেন। শুভ প্রভাতের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে এক প্রকার বিনিদ্র অবস্থায় রাতটি কেটে গেল। সকালে পুকুরে স্নান করে বসে আছি মায়ের ডাকের প্রতীক্ষায়। দীক্ষার জন্য কি প্রস্তুতির প্রয়োজন—তা জানিও না, জিজ্ঞেসও করিনি,

টাকাকড়িও কিছু ছিল না। আন্দাজ আটটায় সেবক-মহারাজ আমায় ডেকে শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। মা পূজার আসনে বসে পূজা করছিলেন—পাশে আর একখানি আসন। মা আমায় শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করে ঐ আসনে বসতে বললেন। বসতেই আমার হাতে একটু গঙ্গাজল দিলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। মায়ের স্পর্শে রোমাঞ্চ হতে লাগল, এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল অন্তর। মা খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'ঠাকুরকে তোমার ভাল লাগে?' আমি সম্মতি জানাতেই তিনবার একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে পরে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে তা উচ্চারণ করতে বললেন। হঠাৎ পাশের দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেনঃ 'এই, এই তোমার ইষ্ট।' সঙ্গে সঙ্গে ওদিকটা চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তাতে ভেসে উঠল একটি দেবীমূর্তি—জীবন্ত ও জ্যোতির্ময়ী—আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে আছেন। চকিতে কি যেন হয়ে গেল! আমি আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হয়ে গেলাম। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। মায়ের মূর্তিও তখন অন্য রকম। একটু পরেই মা সস্নেহে বললেনঃ 'বাবা, ভয় হয়েছিল কি?' আমি চুপ করে রইলাম মাথা নিচু করে—জবাব দেবার শক্তি ছিল না। তারপর মা আমার ডানহাতটি ধরে প্রত্যেকটি 'কর' স্পর্শ করে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। মা কথা বলছিলেন; কিন্তু আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম! মা বার বার 'কর' স্পর্শ করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জপ-করা দেখাতে লাগলেন, আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন। তা-ই করলাম। তারপর মা ঠাকুরের পটমূর্তি দেখিয়ে বললেনঃ 'ঠাকুরকে প্রণাম কর, ইনিই তোমার ইষ্ট, ইনিই গুরু—তোমার ইহকাল পরকাল সর্বস্ব। ঠাকুরই সর্বদেবদেবীস্বরূপ।' আমি ঠাকুরকে প্রণাম করে মাকেও প্রণাম করলাম। তারপর তিনি কত জপ করতে হবে তা বললেন এবং ধ্যান সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। মা যে কি বা কে তা তখন বুঝতে পারিনি, এখনও কিছুই বুঝি না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল—তিনি ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিতে পারেন।

মায়ের পূজার আসনের পাশেই দুটি ফল ছিল, তা হাতে নিয়ে তিনি বললেনঃ 'ফলগুলি আমার হাতে দাও।' আমি তা-ই করলাম। ঐ বোধহয় গুরুদক্ষিণা। আমি কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাইনি—টাকাকড়ি বা ফলফুল কিছুই না। আমার সব শরীর কাঁপছিল।

মাকে পুনরায় প্রণাম করলাম। তাঁকে এত কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছিল, খুব ভাল লাগছিল। মা সস্নেহে বললেনঃ 'এখন ঘরে গিয়ে বসে যেমনটি দেখিয়ে দিলুম তেমনিভাবে একটু জপ কর। তারপর জল খাবে।'

বিকেলে আবার মায়ের কাছে গিয়েছি—তিনি বারান্দায় মাটির রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসে কুটনো কুটছিলেন। বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ মহারাজের ওষুধে উপকার হয়েছে, আমবাত একটু কমেছে বললেন। একথা-সেকথার পর দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য কিভাবে করা হয় তা জিজ্ঞেস করলেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল তাঁর প্রাণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য খুবই কাতর হয়েছে। কিভাবে ঘরে ঘরে গিয়ে গরীবদের টিকিট দিয়ে আসি, কিভাবে তাদের

অভাব ও দারিদ্রের খোঁজ নিই, টিকিট নিয়ে তারা কিভাবে চাল নিয়ে যায়, মেয়েদের কিছু কিছু কাপড়ও দেওয়া হয়—এসব প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বললাম যা মায়ের অন্তর খুব স্পর্শ করেছিল। বললাম যে, একদিন সকালের দিকে এক গ্রামে খোঁজ নিতে দেখা গেল যারা চাল নিচ্ছিল, তারা কেউ বাড়িতে নেই। বুঝলাম কোথাও কাজ করতে গিয়েছে। কাজ পেলে আর চাল দেওয়া হয় না, তাই তাদের খোঁজ করতে বের হলাম। গ্রামের বাইরে একটি ধানখেতে হাঁটুসমান জলকাদার মধ্যে অনেকে ধান-রোপা করছে দেখা গেল। সেদিকে এগিয়ে যেতেই দূর থেকে দেখলাম একটি মেয়ে-মানুষ খেত থেকে উঠে গিয়ে একধারে রোপা করার জন্য যে ধানের চারার বোঝা রয়েছে তার পেছনে আত্মগোপন করল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল—গতরাত্রে ঐ স্ত্রীলোকটির একটি সন্তান হয়েছে, তাকে নিয়েই সে খেতে কাজ করতে এসেছে। সদ্যঃপ্রসূত সন্তানটিকে নেকড়া জড়িয়ে খেতের ধারে রেখে সে খেতে ধান-রোপা করছে পেটের দায়ে। খেতে কাজ করছে তা ধরা পড়লে আমাদের কাছে চাল পাবে না, তাই আমাকে দূর থেকে দেখেই লুকোবার চেষ্টা করেছিল। ঘটনাটি শুনে মনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল, কী অবস্থায় পড়লে পূর্বরাত্রে সদ্যঃপ্রসূত সন্তানটিকে নিয়ে প্রসূতি মাঠে কাজ করতে আসতে পারে! দারুণ আঘাত পেলাম প্রাণে। আমি শুধু ঐ কামিন-এর কাছে গিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললামঃ 'না মা, তোমার চাল কাটব না।' তাতেই সে একটু সাহস করে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললঃ 'বাবু, বড্ড কষ্টে পড়েছি। তাই খেতে কাজ করতে এসেছি।' খেতে কাজ করলে দুসের ধান পাবে একদিনে।

শ্রীশ্রীমা ঐ ঘটনাটি শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেনঃ 'বল কি গো! অমন পোয়াতী মাঠে কাজ করতে এসেছে। অমন অবস্থায় চাল কাটতে আছে! বেশ করেছ বাবা। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করবেন।' তারপর ঠাকুরের কাছে যেন অভিমান করে মা প্রার্থনা করলেনঃ 'ঠাকুর! তুমি এসব দেখতে পাচ্ছ না?—লোকের এত দুঃখ-দুর্দশা! এভাবে মানুষ কি করে! এর একটা বিধান কর।' মায়ের কণ্ঠে কাতর উৎকণ্ঠা—এখনও যেন তা কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। মা মূর্তিমতী করুণা—আবেগময়ী প্রার্থনা।

তিনি সেবাকার্যের খুঁটিনাটি সব খবর জিজ্ঞেস করছিলেন—আমরা কি খাই, কেমনভাবে থাকি, কি কি কাজ করতে হয়। আমি বললামঃ 'একদিন গ্রামান্তরে কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছি। একটি শুকনো পাহাড়ে ছোট নদী—কুড়ি-পঁচিশ হাত চওড়া, হাঁটুজল—হেঁটে পেরিয়ে গেলাম। এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়েছিল। ফিরবার সময় দেখি যে, ঐ শুকনো নদী লাল জলে কানায় কানায় পূর্ণ ও ভীষণ-রূপে খরস্রোতা হয়েছে। বেলাও হয়েছিল অনেক। নদী পার হওয়ার উপায়ান্তর না দেখে গায়ের জামাকাপড় খুলে মাথায় জড়িয়ে, একহাতে ছাতাটি ধরে, কৌপীনপরা অবস্থায় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং একহাতে সাঁতার কাটতে কাটতে স্রোতে ভেসে কোন প্রকারে পরপারে এলাম। অনেকটা দূর পর্যন্ত আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নদীর ধারে কাঁটাঝোপের দরুন প্রাণসংশয় হয়েছিল।' ঐ ঘটনাটি শুনতে শুনতে মায়ের মুখখানা বেদনায় মলিন হয়ে গেল। তিনি করুণস্বরে বললেনঃ 'বাবা, ঠাকুর তোমায় রক্ষা করেছিলেন। ঐ কাঁটাঝোপের মধ্যে ঢুকে গেলে আর তো বেরুতে পারতে না! অমনটি আর কখনও করো না বাবা।' আমার সব দুঃখ-বেদনা মা অন্তরে

অনুভব করেছিলেন। তাঁর মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সন্তানের দুঃখে। এখনও বিপদে-আপদে মায়ের ঐ সাবধানবাণী প্রাণে বল দেয়।

কথায় কথায় পরদিন কামারপুকুর-দর্শনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা তাতে অনুমতি দিলেন না। বললেনঃ 'না বাবা, এখন কামারপুকুর গিয়ে কাজ নেই, পরে কখনও যেও। এখানে কোন রকমে "তেরাত্র" কাটিয়ে ফিরে যাও। এ ঘোর ম্যালেরিয়ার সময়—ঘরে ঘরে জ্বর। এসময় কাউকে এখানে আসতে বলি না। তা তারক তোমায় পাঠিয়েছে।'

মায়ের নির্দেশ মেনে নিলাম। এবং অনেক পরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কামারপুকুর দর্শন করি, জয়রামবাটীতেও আসি। মা যে-ঘরটিতে থাকতেন, যেখানে বসতেন, যে-ঠাকুরঘরে দীক্ষা দিয়েছিলেন—সেসব স্থান দর্শন ও প্রণাম করি।

*   *   *

আমার সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু ছিল না, গুরুদক্ষিণাও দিতে পারিনি, গুরুসেবার কোন সুযোগই পাইনি—সেজন্য মনের ভিতর খুবই অশান্তি। পরের দিন যখন শুনলাম যে, মায়ের সেবক বরদা মহারাজ যাচ্ছেন কোতুলপুরের হাটে, আমিও মাকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাটে গেলাম। মেঠো রাস্তা—জলকাদা—তিন মাইল পথ অতিক্রম করে যেতে হয়। বরদা মহারাজ ঐ হাটে একঝুড়ি আনাজপত্র ও অন্যান্য জিনিস কিনলেন। আমি একথালা মিছরি কিনলাম মায়ের জন্য এবং দুপুরে কোয়ালপাড়া আশ্রমে খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে ঐ ঝুড়িটি মাথায় করে জয়রামবাটীতে ফিরে এলাম। ঐ ঝুড়িতে মায়ের ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র ছিল—তা বয়ে আনাও তো মায়েরই সেবা। জয়রামবাটীতে পেঁছে আমি যে একথালা মিছরি এনেছিলাম, মাকে দিতেই তিনি দুহাত বাড়িয়ে তা নিলেন এবং খুশী হয়ে বললেনঃ 'বেশ করেছ বাবা! আমি রোজ একটু একটু মিছরির পানা করে খাব।' আমার চোখে জল এল। মাত্র পাঁচ আনার মিছরি—তা মা এমন আদর করে গ্রহণ করলেন! মায়ের কোন সেবাই তো করতে পারিনি। তাই সন্ধ্যার পূর্বে যখন দেখলাম যে, পুণ্যপুকুরের ধারে বেগুনচারা লাগাবেন বলে সেবক হরিপ্রেম মহারাজ বাগানে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর হাত থেকে কোদালটি নিয়ে ঐ জমি তৈরী করে তাঁর সঙ্গে বেগুনের চারা লাগালাম। ঐ গাছে বেগুন হবে—মায়ের সেবাতে লাগবে।

এইভাবে 'তেরাত্র' কেটে গেল। চতুর্থ দিন বিকেলের দিকে মাকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলাম। আমি প্রণাম করতেই তিনি চিবুক ধরে চুমু খেলেন। আমি বালকবুদ্ধিতে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললামঃ 'মা, আপনি আমায় মনে রাখবেন।' তিনিও করুণাভরে বললেনঃ 'হ্যাঁ বাবা, তোমাকে মনে রাখব।' আমি ঐভাবে তিনবার প্রার্থনা জানালাম, তিনিও প্রত্যেকবারই বললেনঃ 'হ্যাঁ বাবা, মনে রাখব।' তিনি আমায় মনে রাখবেন—এই ভেবে আমার অন্তর আনন্দে ভরে গেল, আর বাক্যস্ফূর্তি হল না। পুনরায় মাকে প্রণাম করে তাঁর দিকে মুখ করে পেছনে হটতে হটতে সদর দরজা পর্যন্ত এলাম—মা ততক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। শেষবার মাকে দেখে দরজার বাইরে এলাম এবং মায়ের করুণ মুখখানি ও

তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় তিন মাইল অতিক্রম করে এলাম কোয়ালপাড়া আশ্রমে। আমি মায়ের কাছে ভক্তি-মুক্তি প্রার্থনা করিনি—মনেও আসেনি।

মাকে পেলেই তো সব পাওয়া হল—তাঁর করুণা থাকলেই তো সবকিছু হল। আমি মাকে ভুলে যেতে পারি সংসারের পেষণে দলিত হয়ে, ধূলি-কাদায় মলিনদৃষ্টি হয়ে, কিন্তু মা যদি আমায় স্মরণে রাখেন তাহলেই তো সুপথে চলতে পারব। মা যদি স্মরণ করে কোলে তুলে নেন—কোলে কোলে রাখেন, সংসারের মৃত্তিকা গায়ে মাখতে না দেন, তবেই তো আমি হব নির্মল সুন্দর। এই ভেবে মায়ের কাছে শুধু একটি প্রার্থনা জানিয়েছিলামঃ 'মা, আপনি আমায় মনে রাখবেন।' তিনবার এই প্রার্থনা জানাই, তিনবারই তিনি অভয় দিয়ে বলেছিলেনঃ 'হ্যাঁ বাবা, তোমাকে মনে রাখব।' পরে সেবক বরদা মহারাজের মুখে শুনেছিলাম—আমি চলে আসার পর মা তাঁকে ডেকে বলেছিলেনঃ 'দেখ গো, ছেলেটি তিন সত্যি করিয়ে নিলে!' মায়ের মুখ থেকে যা-কিছু বেরুবে তা-ই সত্য। তিনি ত্রিসত্য করে বলেছিলেন—আমায় ভুলবেন না। এই আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি, পরম আশীর্বাদ, পরম অভয়, বল, ভরসা ও সান্ত্বনা।

কোয়ালপাড়া আশ্রমে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে রওনা হলাম কোতুলপুর হয়ে বিষ্ণুপুর। চব্বিশ মাইল জলকাদায় হেঁটে, ছাতা ছিল না—জোর বৃষ্টির মধ্যে গাছের আড়ালে আশ্রয় নিতে নিতে সন্ধ্যার পূর্বে যখন বিষ্ণুপুর পৌঁছালাম, তখন আমি আধমরা।

সেবাকেন্দ্রে নিরাপদে পৌঁছে সে-খবর দিয়ে শ্রীশ্রীমাকে যে-চিঠি লিখেছিলাম, তাতে কোয়ালপাড়া থেকে বিষ্ণুপুর, এই চব্বিশ মাইল বৃষ্টি ও জলকাদায় পথের কষ্টের কথাও লিখেছিলাম। শ্রীশ্রীমা ঐ চিঠি পেয়ে আমার জন্য খুবই চিন্তিত হয়েছিলেন। সেবক বরদা মহারাজ আমায় লিখলেন—অমন করে পথের কষ্টের কথা মাকে লিখতে আছে? তিনি খুবই অধীরা হয়েছেন—ইত্যাদি। জবাবে ভাল আছি জানিয়ে দিলাম। ঐভাবে চিঠি লিখে মাকে চিন্তিত করার জন্য আমার কিন্তু মনে দুঃখ হয়নি, বরং আনন্দ হয়েছিল এই মনে করে যে, মা আমার জন্য ভেবেছেন এবং তাঁর আশীর্বাদেই আমি ঐ ম্যালেরিয়ার সময়েও সুস্থ ছিলাম। ছেলের জন্য মা ভাববেন না তো কে ভাববে?

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ। মহাপুরুষ মহারাজের চিঠিতে জানলাম শ্রীশ্রীমা গুরুতর অসুস্থ। এই সংবাদ পেয়ে অবধি মাকে দেখবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল। মঠে ফিরবার অনুমতি প্রার্থনা করে মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি লিখলাম। তিনি জবাবে অনুমতি দিয়ে ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে জানালেন যে, আরও কিছুদিন ওখানে থাকলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হত। কিন্তু শ্রীশ্রীমাকে দেখবার খুব ইচ্ছা যখন হয়েছে তখন মঠে ফিরে আসতে পার।

কিছুদিন পরেই মঠে ফিরে এসে তার পরদিনই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে 'মায়ের বাড়ি'তে গেলাম। কিন্তু মায়ের শরীর খুব খারাপ বলে দর্শনাদি সব বন্ধ ছিল। তবু মঠ থেকে গিয়েছি বলে পূজনীয় শরৎ মহারাজের বিশেষ অনুমতিক্রমে শুধু দূর থেকে দর্শন ও প্রণাম করে মায়ের শারীরিক অবস্থার খবর সব জেনে অগত্যা মঠে ফিরে এলাম। মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা হল না—মায়ের সঙ্গে দুটি

কথাও বলতে পারলাম না—খুবই কষ্ট হল মনে! তখন জয়রামবাটীতে মাকে যে দেখেছিলাম, তাঁর কাছে বসে কথাবার্তা বলেছিলাম, তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে-ছিলাম—সেসব কথা খুব মনে পড়তে লাগল।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর খারাপ বলে মহাপুরুষ মহারাজ রোজ মঠ থেকে একজনকে মায়ের খবর জানবার জন্য উদ্বোধনে পাঠাতেন। মঠে টেলিফোন বা বৈদ্যুতিক আলো তখনও হয়নি। আমি 'মায়ের বাড়ি' থেকে ফিরে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি মায়ের খবর জিজ্ঞেস করলেন। মায়ের হাতে-পায়ে শোথ দেখা দিয়েছিল, দুটি পা-ই ফুলে গিয়েছিল এবং খুব অরুচি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলেছিলেন যে, কবিরাজ 'শ্বেতপুনর্নবা' শাক পথ্য দিয়েছেন আর অরুচির জন্য 'আমরুল শাক' চাটনির মতো করে খেতে বলেছেন। তা শুনেই মহাপুরুষ মহারাজ বললেনঃ 'মঠের বাগানে তো প্রচুর পুনর্নবা হয়েছে, আমরুল শাকও খুব আছে। তুমি রোজ সকালে মায়ের জন্য কিছু পুনর্নবা ও আমরুল শাক নিয়ে যেও এবং মায়ের খবরও নিয়ে এস।' তাঁর কথামতো প্রতিদিন ভোরবেলায় কিছু ভাল আমরুল শাক কলাপাতায় বেঁধে নিতাম। তারপর খেয়া-নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে কুঠিঘাট থেকে হেঁটে আটটার মধ্যেই উদ্বোধনে পৌঁছে ঐ শাক সেবক-মহারাজের হাতে দিতাম এবং দূর থেকে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে মায়ের খবর নিয়ে মঠে এসে মহাপুরুষ মহারাজকে দিতাম। মহাপুরুষ মহারাজ খুব ব্যগ্র হয়ে সব শুনতেন—মঠের আর সব সাধুরাও। এই সুযোগে প্রায় দেড়মাস রোজ মাকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ দেড়মাস মাকে দূর থেকে প্রণাম করার সময় রোজই দেখেছি যে, মা শীর্ণ শরীরে বারান্দার দরজার দিকে মুখ করে মেঝেতে শুয়ে আছেন এবং আমি যখন প্রণাম করতাম তিনি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সস্নেহে আমাকে দেখতেন। আহা! সে চাহনিতে কত স্নেহ, মমতা ও করুণা! তিনি কথা বলেননি, কিন্তু দৃষ্টির ভিতর দিয়ে করুণা বর্ষণ করেছেন—স্নেহ-মমতার স্পর্শ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঐ দৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মিলন হত—তিনি আমার অন্তর স্নেহস্নাত করতেন, এক অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে হৃদয় ভরে যেত। প্রণাম করে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে মৌনপ্রার্থনা জানিয়ে যখন চলে আসতাম, তখন শ্রীশ্রীমায়ের স্নিগ্ধ সজল চোখ দুটি থেকে যেন করুণা বর্ষিত হত আর যতদূর থেকে দেখা যেত, দেখতাম মা অপলকনেত্রে আমাকেই দেখছেন।

ঐসময়ে একদিন 'মায়ের বাড়ি' থেকে ফিরে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি মায়ের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। আমি চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিষয় নিবেদন করে যখন বললাম যে, রাত্রে তাঁর একটুকুও ঘুম হয়নি, সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা, ছটফট্ করেছেন—শুনতে শুনতে মহাপুরুষ মহারাজের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেনঃ 'আহা! সকলের পাপ গ্রহণ করেই তো মায়ের এত অসুখ। তাইতো সর্বাঙ্গে তাঁর ঐ বিষের জ্বালা। তিনি শত শত সন্তানের পাপতাপ নিজের ভিতর আকর্ষণ করে নিয়ে সন্তানদের নিষ্পাপ করে দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা ও মায়ের কৃপা একই। ঠাকুর নরদেহ ত্যাগ করে এখন শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে বাস করছেন। যারা মায়ের কৃপা পেয়েছে তাদের এই শেষ জন্ম। মা, মা, তুমি ভক্তদের জন্য কত কষ্টই না সহ্য করছ!

'একদিন ঠাকুর আমায় বলেছিলেন—"ঐ যে নহবতে আছে আর মন্দিরে ভব-তারিণী—একই।" আমি তখন কি এত সব বুঝতাম! তিনি বলেছিলেন—শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যে মাকে দর্শন করেছে—সে মুক্ত হয়ে যাবে। মায়ের দর্শন কি কম ভাগ্যের কথা!' বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলামঃ 'মাকে রোজ তো দর্শন করছি, কিন্তু মায়ের মুখের একটি কথাও তো শুনতে পাই না। আমার কেবলই মনে হয়—আহা! মা যদি একটি কথাও বলতেন!'

মহাপুরুষ মহারাজ খুব আবেগভরা কণ্ঠে বললেনঃ 'ঐ যে মা তোমার দিকে চেয়ে থাকেন, ঐ তো তাঁর আশীর্বাদ। তিনি কৃপাদৃষ্টিতে তোমায় দেখেছেন। তোমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। মায়ের কৃপা পেয়েছ—তোমার এ-জীবনের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। এখন তাঁর শরীর এত খারাপ, কি করে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন? তিনি এত দুর্বল যে, কথা বলার শক্তিই তো নেই! তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর মুখের কথা শুনতে পাবে।' মহাপুরুষ মহারাজের সে শুভ-ইচ্ছা এক অলৌকিক উপায়ে আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছিল।

দেহত্যাগের রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা দিব্যদেহে জ্যোতির্ময়ীরূপে আমায় শেষ আশীর্বাদ করেছিলেন। ২০ জুলাই ১৯২০। রোজ যেমন ঘুমাই সেদিনও তেমনি ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত প্রায় দেড়টার সময় অদ্ভুতভাবে মায়ের দর্শন পাই। অসাধারণ সেই দর্শন। মাকে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে দেখতে পেলাম। তিনি সস্নেহে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমাকে মধুরস্বরে ডেকে বলছেনঃ 'বাবা, আমি যাচ্ছি।' এই অদ্ভুত দর্শনের মর্ম কিছুই বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম, যখন মায়ের দেহরক্ষার মর্মন্তুদ সংবাদটি পেলাম। মা উদ্বোধনে মর্তনু ত্যাগ করেছেন প্রায় সেই সময়—যখন আমি তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম!

কুমুদবন্ধু সেন

আমার জীবনে স্মরণীয় সেই দিন—যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে উপনীত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি তখন স্কুলের ছাত্র, এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি।

স্বামী যোগানন্দের কাছে আমি প্রায়ই যেতাম। তিনি তখন উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ৫৭ রাধাকান্ত বোস স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় এলে যে-ঘরে বিশ্রাম করতেন, সেই ঘরেই স্বামী যোগানন্দ থাকতেন। সংলগ্ন হলঘরে বসে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এবং অনুরাগীদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। হলঘরে মাঝে মাঝে আলমবাজার মঠের সন্ন্যাসীরাও এসে থাকতেন। সেটি আবার বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর বৈঠকখানা হিসাবেও ব্যবহৃত হত। বলাবাহুল্য, রামকৃষ্ণ বসু, সেইসঙ্গে

তাঁর পরিবারের সকলেই, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্যদের একান্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম বসুকে তাঁর অন্যতম রসদ্দাররূপে চিহ্নিত করেছিলেন। বলরাম বসুর ধর্মানুরাগ, ঈশ্বরভক্তি, ভালবাসা, সেইসঙ্গে দানশীলতা ; ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যদের সেবাযত্নে একান্ত আন্তরিকতা ; তাঁর শুদ্ধ, উন্নত, আদর্শ চরিত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের পাঠকদের সবিশেষ জানা আছে। বলরাম বসুর প্রতি শ্রদ্ধাবশে সাধারণে বাড়িটিকে 'বলরাম-মন্দির' বলে উল্লেখ করত, কেননা সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাই এবং তাঁদের শিষ্য ও ভক্তদের পাদস্পর্শে পবিত্র।...

স্বামী যোগানন্দের কাছ থেকেই আমি জানতে পারি যে, শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এসে শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক তরুণ-ভক্ত শরৎ সরকারের বাড়িতে অবস্থান করছেন। বলরাম-মন্দিরের পশ্চিমে একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে বাড়িটি।

পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে কিছু ফুল, প্রধানত লাল পদ্ম ও মিষ্টান্ন নিয়ে আমি সেখানে হাজির হলাম। বাড়ির দরজায় শরৎ সরকার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে দোতলার একটি বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, মাতাঠাকুরানী পুজো করছেন, তাই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে দিয়ে ভিতরে শ্রীশ্রীমার কাছে খবর পাঠালেন, আমি দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছি। পনের মিনিটের মধ্যেই গোলাপ-মা এসে শ্রীমার দর্শনের জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। যে-ঘরে আমি অপেক্ষা করছিলাম, তার সংলগ্ন উত্তরদিকের একটি ঘরের চৌকাঠের উপর গোলাপ-মা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দুরুদুরু বক্ষে, ভাবাপ্লুত হৃদয়ে আমি আস্তে আস্তে ঘরটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর মিষ্টান্নাদি গোলাপ-মায়ের হাতে দিয়ে (যাঁকে আমি তখনও পর্যন্ত জানি না, পরে শরৎ সরকারের কাছে জেনে নিয়েছিলাম) দেখি, শ্রীশ্রীমা গোলাপ-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শুভ্রবস্ত্রে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা, কিন্তু শ্রীচরণ মুক্ত, কোনও আবরণ নেই। ভক্তিভরে সবকটি ফুল তাঁর পায়ে দিয়ে প্রণাম করলাম। চারিদিকে পূর্ণ নীরবতা। আমি ওঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। শ্রীশ্রীমা নিঃশব্দে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। স্নেহ ও আশীর্বাদের সেই দিব্যস্পর্শ আমাকে অভিভূত করে ফেলল। তাঁর সান্নিধ্যে যে-শিহরণ বোধ করেছিলাম, তখন বালক আমি, সেই পবিত্রকারী প্রভাবের গভীরতা পরিমাপ করতে পারিনি, তথাপি সেই গম্ভীর ভাবময় পরিবেশ যে একটা বিরাট মহিমার বোধ আমার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছে, তা অনুভব করেছিলাম। কোন কথাবার্তা হয়নি, তিনি কোন প্রশ্নও করেননি। কয়েক মিনিট পরে মা চলে গেলেন। গোলাপ-মা কিছু ফল এবং মিষ্টান্ন প্রসাদ আমাকে দিলেন। বিপুল আনন্দে ভরপুর হয়ে আমি নিচে নেমে এলাম—দরজার কাছে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সঙ্গে দেখা। তিনি হেসে বললেনঃ 'আরে, তুই তো বড় চালাক দেখছি! আমি ছিলাম না, সেই ফাঁকে তুই চুপি চুপি এসে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করে নিয়েছিস!'

এখানে বলে নেওয়া যায়, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের যে-সমস্ত ভক্তবৃন্দ মায়ের দর্শনের জন্য আসতেন তাঁদের দেখাশোনা করবার জন্য ঐ বাড়িতে থাকতেন। স্বামী যোগানন্দও মায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ

নজর রাখতেন। আমার পরম ভাগ্য, আমি স্বামী যোগানন্দের কৃপাতেই মাকে প্রথম দেখার সুযোগ পাই।

তার পর থেকে প্রায় প্রত্যেক দিনই আমি মায়ের কাছে গেছি। গঙ্গায় স্নান করে ফুল হাতে শরৎ সরকারের বাড়িতে যেতাম মাকে দর্শনের জন্য। শ্রীশ্রীমা সেখানে প্রায় একমাস কাটিয়ে জয়রামবাটী ফিরে যান। তিনি কেবল আমার নাম শুনেছিলেন, কিন্তু কখনও খোঁজ করেননি কে আমি। তবু তাঁর কত করুণা, যখনই গেছি, তখনই গোলাপ-মা অথবা অন্য কোন সঙ্গিনীর সঙ্গে আমাকে দর্শন দিয়েছেন। তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলির অনুমতিও দিয়েছেন। কিন্তু কোন কথা হত না, বা আমি কে, কোথা থেকে আসছি, সে-বিষয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্নও করতেন না। লোকে যেমন দেবীপ্রতিমার পাদপদ্মে অঞ্জলি দেয়, সেইভাবে আমি তাঁর শ্রীচরণে পুষ্প নিবেদন করেছি। সত্যই দেবীপ্রতিমা—মাটির, পাথরের বা ধাতুর নয়, একেবারে জীবন্ত প্রতিমা—মানবদেহে আদর্শের বিগ্রহ। দর্শনকালে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করত। কিন্তু তা মূক বা নিশ্চেতন নয়, উচ্চারিত শব্দের অপেক্ষা অনেক বেশী ভাবগ্রাহী। সে নৈঃশব্দ্য সুমহান্, সমুন্নত, সুপবিত্র এবং অন্তর্ভেদী। তা করুণাকিরণে আলোকিত, দিব্য-জননীর প্রাণময় প্রেমের নিত্য উৎস থেকে উৎসারিত প্রাণময় রসধারা। ...মায়ের সঙ্গে এই সকল নীরব সাক্ষাতের কালে আমি এমন একটি দিনের কথাও মনে করতে পারি না, যখন নতুন প্রেরণা, আশা ও শান্তিতে আমি উজ্জীবিত হইনি। অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি, আমি এমন একজনের সান্নিধ্যে উপনীত, যিনি আমার পিতামাতার থেকেও অনেক বড়।

আমি বলরাম-মন্দিরে এবং আলমবাজার মঠে প্রায়ই সাধুদের কাছে যেতাম। তাতে পড়াশোনার ক্ষতি হত, এই ভেবে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রায়ই আমাকে ধমক দিতেন। আমায় ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন: 'ওহে, মন দিয়ে পড়ার বই পড়বে। কি ভাবছ, ঈশ্বরদর্শন করা বুঝি খুব একটা সহজ ব্যাপার? পড়াশোনায় যে মন দিতে পারে না, সে কখনই পূজা-প্রার্থনা এবং জপধ্যানেও মন বসাতে পারবে না। পরীক্ষায় পাস করার থেকে ওটা অনেক শক্ত ব্যাপার। আগে পড়াশোনা করে জ্ঞানার্জন কর এবং পবিত্র নির্মল জীবন যাপন কর, তা-ই তোমাকে প্রার্থনা ও জপধ্যানে সাহায্য করবে।' আমি নীরবে শ্রদ্ধাভরে তাঁর উপদেশ শুনলাম। প্রায় প্রত্যেক দিনই শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতাম বলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে সংস্কৃতে তাঁর রচিত একটি স্তোত্রও আমাকে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর অনুসরণে সেটি লেখা। প্রত্যূষে সেটি পাঠ করতে বলেছিলেন। স্তোত্রটি বেশ দীর্ঘ। দুর্ভাগ্যের কথা, আমার প্রতিবেশী সেটি আমার কাছ থেকে নিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী-শিষ্য মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত আমার একেবারে প্রতিবেশী এবং নিকট-বন্ধু। তিনি বাংলার প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পর্কে নাতি, এবং নিজেও সাহিত্যিক। ঈশ্বর গুপ্ত যে বাংলা দৈনিক পত্রিকাটি চালাতেন, পরবর্তী-কালে সেটি মণীন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ও সম্পাদনায় বের হত। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলেন, মণীন্দ্রের তখন অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কট। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের কাছে সেকথা শুনেছিলেন। একদিন মণীন্দ্রকে

ডেকে স্বামীজী গোপনে একহাজার টাকা উপহার হিসেবে দিলেন। মঠের সাধুরা এবং অন্যান্য ভক্তরা মাঝে মাঝে মণীন্দ্রের বাড়িতে আসতেন। তাঁরা তাঁকে গুরুভাই বলেই মনে করতেন, খোকা বা মণি বলে ডাকতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা আমাকে বললেনঃ 'মণীন্দ্র নিতান্ত বালক-বয়সেই ঠাকুরের কাছে এসেছিল। তাঁর অসুখের সময়ে মণীন্দ্র এবং তার সমবয়সী একটি ছেলে দোলের দিনে তাঁকে বাতাস করছিল। অন্য ছেলেরা তখন বাইরে রঙ নিয়ে খেলছে। ঠাকুর বার বার তাদের দোল খেলতে যেতে বললেন। কিন্তু তারা গেল না, বাতাস করেই চলল। ঠাকুর তখন সজল চোখে বলেছিলেন, "আহারে! আমার রামলালা এইসব ছেলেদের মধ্য দিয়ে আমার সেবা করছে। এরাই আমার রামলালা"।'

একদিন আমাদের উপস্থিতিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের একটি চিঠি শ্রীশ্রীমাকে পড়ে শোনালেন। মঠের গুরুভাইদের সম্বোধন করে চিঠিটা লেখা। চিঠিতে তিনি খোঁজ নিয়েছেন কিভাবে মায়ের খরচপত্রাদি চলছে। তিনি বলেছেন, চিঠিটা যেন মঠের সকলেই পড়ে, তা যেন শ্রীশ্রীমা, গোলাপ-মা এবং যোগীন-মাকেও পড়ে শোনানো হয়। ঐ চিঠিতে স্বামীজী ব্যাকুল হয়ে তাঁর গুরুভাইদের বলেছেন, ঠাকুরের বাণী প্রচারে এবং লোককল্যাণে তাঁরা যেন যথাসর্বস্ব, এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। সেকথা শুনে প্রত্যেকে স্তব্ধ, ঠাকুরের উচ্চ ভাবকে স্বামীজী যেভাবে উপস্থিত করেছেন তা সকলকে আলোড়িত করে তুলল। কিছু পরে গোলাপ-মা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'সারদা (এটাই ছিল ওঁর সন্ন্যাস-পূর্ব নাম), মা বলছেন, নরেন ঠাকুরের যন্ত্র, তাই তাকে দিয়ে তিনি এসব লিখিয়েছেন, যাতে তাঁর ছেলেরা এবং ভক্তরা তাঁর কাজ করতে পারে, জগতের কল্যাণ করতে পারে। নরেন যা লিখেছে সব ঠিক, কালে নিশ্চয়ই সফল হবে।' মায়ের এসব কথা শুনে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। যেকথা তারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল অথচ প্রকাশ করতে পারছিল না, মা তা খুলে বলেছিলেন। সত্যই সে এক মাহেন্দ্র ক্ষণ। ভরপুর মন নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। মনে তখন স্বামীজী সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। আর কানে বাজছিল মায়ের সময়োপযোগী কথাগুলি।

শরৎ সরকারের বাড়িতে মায়ের এই অবস্থান প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা বলেছিলেনঃ 'শরৎ, লোকে তিনদিন দুর্গাপুজো করে, আর তুমি একমাস ধরে দুর্গাপুজো করছ! লোকে মাটির মূর্তির পুজো করে, আর তুমি করলে জ্যান্ত দুর্গার পুজো।'

প্রতি বৎসরের মতো ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমা জগদ্ধাত্রীপুজো করলেন। বিশেষ কারণে আমি তখন জয়রামবাটী যেতে পারিনি। কিন্তু আমার বন্ধুরা সেখান থেকে ফিরে এসে সেখানকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছিল। কী চমৎকার সেখানকার পরিবেশ! মা নিজের ছেলের মতো করে তাদেব কত না যত্ন করেছেন। তাদের সুখের শেষ ছিল না। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলল: নিজের বাড়িতেও এমন মাতৃস্নেহ পাইনি।

ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক জয়রামবাটী থেকে ফিরে এসে মণীন্দ্রের বাড়িতে দু-তিন দিন থাকেন। তিনি আগে থেকেই উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করছিলেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম তাঁর পক্ষে অসহ্য লাগছিল। তিনি সর্বদা ভাবতেন কি করে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হবেন। একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের

জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই মতো একটি জ্যোতির্ময় মূর্তিকে দেখিয়ে জয়রামবাটী যেতে বলছেন। ভদ্রলোক অবিলম্বে একাকী জয়রামবাটী যাত্রা করলেন। সেখানে শ্রীশ্রীমার দর্শন পেলেন। মা তাঁকে খুবই স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং জগদ্ধাত্রীপূজার দিনই দীক্ষা দিলেন। ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে তিনি অবাক; কী আশ্চর্য, স্বপ্নে যাঁকে দেখেছেন—এ যে একেবারে সেই দেবীমূর্তি! এই প্রসঙ্গে মণীন্দ্র বলেছিলেন, অসুখের সময় তিনি ঠাকুরকে বলতে শুনেছিলেনঃ 'আমি অর্ধেক করেছি, বাকিটা ও (অর্থাৎ তাঁর লীলা-সঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা) করবে মানুষের মঙ্গলের জন্য।'

'কার ছেলে তুমি?'

'আমি তোমারই ছেলে, মা।'

সেই প্রথম আমি মায়ের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। তিনি আমাকে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। আমার উত্তর যেন তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর কলকাতার বাগবাজার এলাকার একটি বাড়িতে (হলুদের গুদাম একতলায় থাকায় বাড়িটি 'হলুদ গুদাম বাটী' নামেই পরিচিত ছিল)। তিনতলা বাড়ি—এক-তলায় গুদাম, দোতলা এবং তিনতলা বসবাসের জন্য ভাড়া দেওয়া। দোতলার পূর্ব অংশে দুটি ঘর, মধ্যে কিছু খোলা জায়গা। ঐ খোলা জায়গাটির পূর্ব অংশ দিয়ে একটি ছোট সিঁড়ি তিনতলায় উঠে গেছে। সেখানে শ্রীশ্রীমা গোলাপ-মায়ের সঙ্গে থাকতেন। গোপালের মা এবং অন্য স্ত্রীভক্তরা সেখানে প্রায়ই এসে দু-এক দিন করে থাকতেন। সেখানে তিনটি ঘর, সামনে দক্ষিণদিকে চওড়া ঘেরা বারান্দা, পশ্চিমে বড়-সড় খোলা ছাদ, শ্রীশ্রীমা সেখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতেন। গঙ্গার প্রতি মায়ের বিশেষ ভক্তি-ভালবাসা একেবারে বাল্যকাল থেকেই।

যাই হোক, আমার উত্তর শুনে গোপালের মা, তিনি আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, শ্রীশ্রীমাকে বললেনঃ 'বউমা, আমার গোপাল তোমার কাছে চমৎকার সব ছেলেদের এনে দেবে। আমার গোপালের টানে তারা এসে যাবে।' অপরিচিতের সামনে মায়ের মুখ ঘোমটায় ঢাকা থাকত। কিন্তু সেই মুহূর্তে তা নেই। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। সেই দর্শনে আমার প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। কী অপরূপ! শান্ত মুখচ্ছবি—করুণায় সুকোমল, দিব্য আলোকে ঝলমল, মাতৃত্বের মহিমায় উন্নত। আশা-বিশ্বাসে ভরে গেল মন, অনুভব করলাম আমি পরম আশ্রয় পেয়েছি। তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন আমার বাড়ি কোথায়, মা-বাবা জীবিত আছেন কিনা। বললামঃ 'না মা, কেউ নেই। এক বছরের মধ্যে তাঁদের দুজনকেই হারিয়েছি।' স্নেহ-দরদ ভরা গলায় মা বললেনঃ 'আ-হা, কী দুঃখের কথা! কিন্তু বাছা, সেজন্য চিন্তা করো না। পার্থিব বন্ধন ক্ষণিকের। আজ মনে হয় যথাসর্বস্ব, কাল তারা নেই। তোমার সত্যিকারের বন্ধন ভগবানের সঙ্গে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে। এখানে নিয়মিত আসবে, প্রসাদ নেবে।' গভীর ভাবাবেগে দুচোখ-ভরা জল নিয়ে বললামঃ 'মা, আমি তোমাকে পেয়েছি, তুমি আমার জগজ্জননী, আমার সত্যিকারের মা, এটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি শুধু আমাকে করুণা কর, আশীর্বাদ কর।' মা বললেনঃ 'বাছা, ঠাকুর এরই মধ্যে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন। স্কুলে ছুটি থাকলেই এখানে এসে থাকবে। এখন প্রসাদ নিয়ে যোগেন, রাখালের কাছে যাও।

তাদের পবিত্র সঙ্গ তোমার মনকে উঁচুতে তুলে দেবে, মন থেকে সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাবে।' শ্রীশ্রীমা আমাকে নিজহাতে ফল, মিষ্টান্ন দিলেন, আমি তখনই নেমে এলাম।...

মাস্টারমহাশয় প্রত্যেক শনিবার বিকেলে এখানে আসতেন। এবং রবিবার সন্ধ্যা, কখনও কখনও সোমবার সকাল পর্যন্ত থাকতেন। আমিও প্রায়ই রাত্রে মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে থাকতাম। তিনি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে অনেক প্রেরণাপ্রদ ঘটনা বলতেন। ভক্তরা সবাই এখানে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মায়ের কাছে দীক্ষাও পেতেন। আমি শুনলাম তিনি একদিন এক শিষ্যাকে বলছেনঃ 'অনেক সময়ে লঘু, চঞ্চল মনের মানুষ দীক্ষার জন্য আসে। আমি তাদের চেহারা, ভাবভঙ্গি দেখেই পূর্বজীবন বুঝতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, আগে তারা অন্য কারও কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে কিনা। যখন বলে হ্যাঁ, তখন তাদের বলি, "কী আশ্চর্য, তুমি আবার দীক্ষার জন্য এসেছ! তোমার গুরু যে-মন্ত্র দিয়েছেন তার উপর এতটুকু বিশ্বাস নেই? মন্ত্র ভগবানের পবিত্র নাম ছাড়া আর কি! তার পরেও তুমি দীক্ষার জন্য এলে কেন?" তখন তারা ক্ষমা চায়, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে মন্ত্রের জন্য অনুনয় করে। কারও কান্না আমি সহ্য করতে পারি না। তখন ঠাকুরকে ডেকে বলি, এদের বিশ্বাসে জোর এনে দাও। তারপর ঠাকুরের নির্দেশে নতুন মন্ত্র দিই। এই অতিরিক্ত মন্ত্র দিই ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভক্তি-বিশ্বাস বাড়াবার শক্তি হিসাবে।' সেকথা শুনে শিষ্যা বললেনঃ 'তোমার কৃপা এবং আশীর্বাদে তারা বেঁচে গেল।' মা তৎক্ষণাৎ বললেনঃ 'না না, আমি কেউ নই। ঠাকুরই তাদের আশীর্বাদ করেন। আমি তাঁর যন্ত্রমাত্র।'

একদিন সন্ধ্যায় মাকে দর্শন করতে গেছি। কিন্তু মায়ের কাছে প্রথমেই না গিয়ে স্বামী যোগানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী-ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে যেসব মনোহারী কথা বলছিলেন তা শুনতে বসে গেলাম। স্বামী যোগানন্দ বলছিলেনঃ 'ঠাকুর জ্ঞানমূর্তি। ঠাকুর প্রায়ই আমাদের বলতেন, মা-কালীর কাছ থেকেই তাঁর সকল শিক্ষা। ঠাকুরের উপদেশ, কথা, গল্প—এ সবই তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গভীর চিন্তাশক্তি এবং সূক্ষ্ম ক্ষমতার পরিচায়ক। ঐসব মনের মধ্যে নতুন আলো জ্বালায়, সমস্ত সন্দেহ দূর করে, সমস্যার সমাধান করে দেয়। তখন তাঁকে বুঝতে পারিনি। এখন যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন ঝলকে ঝলকে বুঝছি, ঐ মানবদেহ-মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছিল কোন্ অনন্ত জ্ঞান ও অসীম প্রেম! সাধারণ কথা ও কাজও কত গভীর অর্থদ্যোতক তা বুঝতে পারি। বৈষ্ণবেরা যে বলে, শ্রীচৈতন্য গভীর সমাধিতে বা ঈশ্বর-উন্মত্ততায় যা-কিছু করেছেন সবই দিব্যলীলা—সেকথা ঠাকুর সম্পর্কেও সত্য, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝছি। ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত। তাঁর প্রজ্ঞা, চরিত্র, অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ; উচ্চতম, নিম্নতম সব মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসত। কাউকে তিনি অবজ্ঞা করেননি—পাপী বা পুণ্যবান, যে-ই হোক। সাধারণ মানুষ তাঁর অপূর্ব জীবন, অম্লান পবিত্রতা, সীমাহীন ভালবাসা, অভূতপূর্ব তপস্যা, সর্বাত্মক অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এবং সুগভীর বাণী ও শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধিতে সমর্থ নয়। পূর্ব পূর্ব ঋষি ও অবতার-দের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রসমূহে লিখিত অধ্যাত্ম-সত্যের উন্মোচন-কক্ষ তাঁর জীবন।

নরেনকে তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে বিশেষভাবে এনেছিলেন তাঁর উচ্চ আদর্শের প্রচারের জন্য, যাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণ হয়, মানবসমাজ উন্নীত হয়।'

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করলেন। তিনি বিশেষভাবে ঠাকুরের ভালবাসা-করুণার কথা বললেন। তিনি যখন সংসারত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ঠাকুর তাঁর শোকার্ত বৃদ্ধা মাতার কথা স্মরণ করিয়ে বলেনঃ 'দেখ, তোমার ভাই সুরেন্দ্র মারা গেছে, এখন তোমার কর্তব্য জগন্মাতা জ্ঞানে নিজের মাকে সেবা করা। সাংসারিক দুঃখকষ্ট থেকে বৈরাগ্য এলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সংসারে থেকে মায়ের সেবা কর—তা-ই তোমার আদি কর্তব্য, তা-ই তোমার ধর্ম। আন্তরিকতার সঙ্গে করলে আধ্যাত্মিকতার পথে এগোতে পারবে।'

আমি একান্ত নিবিষ্ট মনে এইসব কথা শুনছিলাম। রাত বেশী হলে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার চলে গেলেন। তখন আমার খেয়াল হল মাকে দর্শন তো করা হয়নি। অথচ বিশেষভাবে সেজন্যই এসেছি। স্বামী যোগানন্দকে সেকথা বললাম। তিনি গোলাপ-মাকে ডেকে শ্রীশ্রীমাকে জানাতে বললেন। গোলাপ-মা উত্তরে জানালেনঃ 'মা শুয়ে পড়েছেন।' আমাকে হতাশ এবং বিষণ্ণ দেখে স্বামী যোগানন্দ বললেনঃ 'আর কিছু করার নেই। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল এস।' তাঁর কথা যেই শেষ হয়েছে, অমনি গোলাপ-মা আমাকে ডেকে বললেনঃ 'মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এখনই এস।' আমার বুক নেচে উঠল। তখনই উপরে উঠে গেলাম এবং মায়ের পাদস্পর্শ করার সৌভাগ্য হল। মা জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'এত দেরি করলে কেন?' উত্তরে বললামঃ 'মা, আমি যোগীন মহারাজ এবং দেবেন মজুমদারের কথাবার্তা এত মন দিয়ে শুনছিলাম যে, সময়ের খেয়াল ছিল না।' মা হাসলেন। তারপর বললেনঃ 'তা বেশ। ঠাকুরের সঙ্গে দিব্যলীলায় মগ্ন ছিলে, তাই মাকে ভুলে গিয়েছিলে।' কোন যোগ্য উত্তর না দিতে পেরে আমি নিশ্চুপ। মা সস্নেহে বললেনঃ 'বাবা, এখন বাড়ি যাও। অনেক রাত হয়ে গেছে।' আনন্দে ভরপুর হয়ে নিচে নেমে এলাম, সাধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। নিজের মনে ভাবতে লাগলাম, শ্রীশ্রীমায়ের কী গভীর স্নেহ এবং দয়া আমার উপর! রাত্রে বিছানা ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন কেবল আমাকে দর্শন দেবার জন্যই!

এখানে বলা দরকার, এই সময়ে জানাশোনা ভক্তদের পাঠানো বাইরের লোকেরা স্বচ্ছন্দে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে পারতেন; আগে এ-ব্যাপারে যে কড়া বিধিনিষেধ ছিল, তা বহুলাংশে শিথিল করা হয়েছিল। নাগমহাশয় এই বাড়িতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছিলেন; তাঁকে শালপাতায় প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল। প্রসাদ খেয়ে পাতাটি ফেলে না দিয়ে সেটিও প্রসাদজ্ঞানে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন। তাঁর ভক্তি দেখে সকলে অবাক। প্রসাদের প্রতি কী ভক্তি—যে-পাতায় প্রসাদ দেওয়া হয়েছে সেটাও তাঁর কাছে পবিত্র এবং প্রসাদের অংশ। শ্রীশ্রীমা স্নেহচক্ষে নাগমহাশয়ের এই কাজ দেখে বললেনঃ 'ঠাকুরের কাছে অনেক ভক্ত এসেছেন, কিন্তু দুর্গাচরণের মতো ভক্ত মেলা ভার।' সেই দিব্যদৃশ্যের সাক্ষী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যখন ভাবাবেগে থর্‌থর্ করতে করতে নাগমহাশয় কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছিলেনঃ 'কৃপাময়ী মা, কৃপার শেষ নেই, কৃপার শেষ নেই।'

ঐ বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে দীক্ষা দেন। মা সেদিন কত না আশীর্বাদ করেছিলেন, তা আমার মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল।

একদিন মাকে বললামঃ 'ধ্যানের সময়ে ভালভাবে মনঃসংযোগ করতে পারছি না। আমার মন বড়ই তরল, চঞ্চল।' মা হেসে উত্তর দিলেনঃ 'ওটা কিছু নয়। মনের ঐ স্বভাব, চোখ এবং কানের মতোই। নিয়মিত ধ্যান-জপ করে যাও। ভগবানের নামের আকর্ষণ ইন্দ্রিয়ের নামের আকর্ষণের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। নিয়মিত অভ্যাস করলে সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। সব সময় ঠাকুরের কথা ভাববে, তিনি তোমাকে সর্বক্ষণ দেখছেন। তোমার ত্রুটি সম্পর্কে একদম চিন্তা করবে না।' আমি বললামঃ 'মা, আশীর্বাদ করুন যাতে আমি নিয়মিত অভ্যাস করতে পারি।' মা মিষ্টি হেসে বললেনঃ 'তোমার কথাবার্তা, কাজকর্ম ও অভ্যাস সম্পর্কে সৎ থাকবে। তাহলেই অনুভব করবে, কতখানি ধন্য তুমি। ঠাকুরের আশীর্বাদ সর্বক্ষণ জীবের উপর বর্ষিত হচ্ছে, তা চাওয়ার দরকার হয় না। ব্যাকুল হয়ে ধ্যান-জপ কর, তাঁর অসীম কৃপা বুঝতে পারবে। ভগবান চান ঐকান্তিকতা, সত্যবাদিতা, ভালবাসা। বাহ্যিক ভাবোচ্ছ্বাস তাঁর কাছে পৌঁছায় না। নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে নামজপ করবে, মন্ত্রোচ্চারণের সময়ে সর্বশক্তি দিয়ে মনকে একাগ্র করবে। যদি অন্য সমস্ত চিন্তা সরিয়ে দিয়ে হৃদয়ের গভীরতম আর্তির সঙ্গে তুমি প্রভুকে ডাকতে পার, তিনি সাড়া দেবেনই। করুণাময় তিনি, তোমার প্রার্থনা পূরণ করবেন।'...

একবার মায়ের ইচ্ছায় আলমবাজার মঠের স্বামীজীরা মায়ের বাড়িতে প্রসাদ পেতে এলেন। ভাগ্যবশে তাঁদের সঙ্গে আমি একই ঘরে প্রসাদ পেয়েছিলাম। তবে মঠের মন্দিরের পূজায় ব্যস্ত থাকায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আসতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতি সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের হাত দিয়ে মা তাঁর জন্য প্রসাদ পাঠালেন। মায়ের ইচ্ছায় এবং গোলাপ-মায়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত নানা ধরনের সুখাদ্য সকলেই পরম পরিতোষ সহকারে আহার করেন।

বিখ্যাত নট ও নাট্যকার, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ওখানে মাঝে মাঝে আসতেন—স্বামী যোগানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।... ঠাকুর ও মায়ের প্রতি গভীর ভক্তি, ওঁদের ঈশ্বরত্ব এবং সীমাহীন করুণা সম্বন্ধে দৃঢ়-বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের উক্তিতে এমনভাবে প্রকাশ পেত যে, সেখানে উপস্থিত মানুষেরা অপূর্ব উদ্দীপনা বোধ করতেন। বহুদিন পরে একবার আমাকে তিনি বলেছিলেন, পূর্বে তিনি, সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য গৃহী-ভক্তেরাও, মায়ের মহিমা বুঝতে পারেননি। 'আমরা গুরুপত্নী বলেই তাঁকে ভক্তি করতাম। তখন ঠাকুরই আমাদের কাছে সবকিছু—বন্ধু, পিতা, মাতা, পথপ্রদর্শক গুরু। নিরঞ্জনই (স্বামী নিরঞ্জনা-নন্দ) প্রথম আমার চোখ খুলে দেয়। জীবনের সেই পর্বে যখন প্রচণ্ড শোক-দুঃখে আমি আর্ত, বিচলিত, বিপর্যস্ত, কিছুতেই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না, সেই সময় নিরঞ্জন প্রায়ই আসত, ধর্মপ্রসঙ্গ করে আমার মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করত। একদিন তাকে বললাম, "ভাই নিরঞ্জন, কী দুর্ভাগ্য, এখন ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছি না—তিনিই ছিলেন আমার একমাত্র আশ্রয়।" নিরঞ্জন বাধা দিয়ে বলল, "সেকি, মা তো আছেন। ঠাকুর আর মায়ের মধ্যে তফাত কোথায়? লক্ষ্মী ছাড়া নারায়ণকে ভাবতে পারেন? পার্বতী ছাড়া শিবকে, সীতাহীন রামকে, এবং রাধা বা রুক্মিণীকে

বাদ দিয়ে কৃষ্ণকে?" আমি চমকে গেলাম, "কি বলছ?—ঠাকুর এবং মা এক, অভিন্ন?" নিরঞ্জন উত্তরে বলল, "বেশ, আপনি তো মনে করেন শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। আপনি কি ভাবেন তিনি একজন সাধারণ নারীকে তাঁর লীলাসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন? ঠাকুরের এই কথাগুলি অবশ্যই স্মরণে রাখবেন, 'ব্রহ্ম এবং শক্তি এক ও অভিন্ন যদিও দুই রূপে আমাদের কাছে তাঁরা প্রকাশিত।' মা স্বয়ং শক্তি, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি।" নিরঞ্জনের এইকথা শুনে আমার চোখ খুলে গেল। মুহূর্তে মাতাঠাকুরানীর মধ্যে জগন্মাতাকে অনুভব করলাম। তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য আবির্ভূতা। শ্রীশ্রীমাকে দেখার জন্য তৎক্ষণাৎ জয়রামবাটী যাবার একান্ত তাগিদ মনে অনুভব করলাম। মাকে দেখবই, যিনি এই মহাদুঃখের দিনে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারেন, আমার শোক দূর করতে পারেন। নিরঞ্জন এই মনোভাবে সায় দিয়ে আমার সংগী হতে চাইলেন। কিন্তু বলরাম বসু প্রবলভাবে আপত্তি জানালেন। আমি আমার পার্থিব দুঃখকষ্টের দ্বারা শ্রীশ্রীমাকে উৎপীড়িত করি, তা তিনি কোনমতেই চান না। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার বাইরে ছিলেন। নিরঞ্জন তাঁকে পুরো ব্যাপারটি লিখে পরামর্শ চাইলেন। স্বামীজীর অনুমতি পেয়ে আমরা দুজনে জয়রামবাটী যাত্রা করলাম। প্রথম কামারপুকুর যাওয়ার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। যে কুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেটিকে মনে হয়েছিল ঋষির পবিত্র তপোবন। নির্মল দৃশ্য ও প্রতিবেশ প্রাণমন কেড়ে নিয়েছিল। তারপর জয়রামবাটী গেলাম। সেখানে থাকাকালে সোজাসুজি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি কি আমার সত্যি-কারের মা, নাকি পাতানো মা?" মা বলেছিলেন, "আমি তোমার সত্যিকারের মা।"' গিরিশবাবু আমাদের কাছে তেজোময় ভাষায়, আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেনঃ 'হ্যাঁ, মা স্বয়ং জগজ্জননী—শহর থেকে বহুদূরে, এক গ্রামের গরীব মেয়ে হয়ে এসেছিলেন, যেখানে নগরজীবনের কর্মকোলাহল, বিষয়ী লোকের স্বার্থ, কৃত্রিম চটকদার জীবন-যাত্রা নেই। আমি মায়ের কাছে কোন কিছুই প্রার্থনা করিনি। কিন্তু যখনই তাঁর কাছে গেলাম, আমার সমস্ত দুঃখকষ্ট এক মুহূর্তে চলে গেল, মনে অপূর্ব শান্তি অনুভব করলাম যা পূর্বে কখনও পাইনি। আঃ, সেই দিনগুলি কী অপার্থিব আনন্দেই না কেটেছে!'

(স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও গিরিশ ঘোষের সেই জয়রামবাটী অবস্থিতি-কালে) এক-দিন জয়রামবাটীতে একটি ভিখারি এসে গান ধরলঃ

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)।
(ও মা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টিভিখারি।
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী—
•বিশ্বেশ্বরী তুই বিশ্বেশ্বরের বামে?
খ্যাপী খ্যাপা আমার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘুরে পরে,•
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে,

দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে।
হিমালয় বাস হর করিয়াছে,
ভিক্ষায় দিন রক্ষা এমন দিন গেছে,
এখন কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে।
ফিরেছে কি কপাল তোর কপালক্রমে?
বিষয়বুদ্ধি বটে, বিশ্বাস হইল মনে,
তা না-হলে গৌরীর এতেক গৌরব কেনে?
নয়নে না দেখে আপন সন্তানে,
মুখ বাঁকায়ে রয় শ্রীরাধিকার * নামে।
(* রাধিকা—সঙ্গীত রচয়িতার নাম)

ভিখারি গান শেষ করল। সেখানে উপস্থিত গিরিশবাবু, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং অন্যান্যদের চোখ ততক্ষণে জলে ভরে উঠেছে। মা-ও, সেইসঙ্গে তাঁর মহিলা সঙ্গিনীও, অশ্রুপাত করছিলেন। গানটি শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী মনে পড়িয়ে দিয়েছিল যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে জয়রামবাটী ও আশেপাশের গ্রামের লোকেরা 'পাগল জামাই' বলত, যখন মায়ের নিজের পিতা-মাতাই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মায়ের বিয়ে দেবার জন্য অনুতাপ করতেন, যখন প্রতিবেশীরা দুঃখ করত তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য। মা এই-সব কথাবার্তার কোন প্রতিবাদ করতেন না, বা করতে পারতেন না। তিনি নীরবে এই সমস্ত অপমানের কথা সহ্য করতেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে জানতেন, তাঁর স্বামী এমনি পাগল নন, ঈশ্বরপাগল, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উন্নত স্তরের। তারপর শ্রীশ্রীমা যখনই ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসতেন, তখনই উপভোগ করতেন দিব্য-আনন্দ। মা অন্য কারও বাড়িতে যেতেন না, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেও নয়, পাছে লোকে তাঁর স্বামী সম্পর্কে অমর্যাদার কথা বলে, তাঁর মন্দভাগ্য নিয়ে ঠাকুরের দোষ দেয়। এখন শ্রীরামকৃষ্ণকে লোকে ঋষি, অবতার বলে মানছে, তাঁর পূজা হচ্ছে নানাস্থানে, লোকে ঐ গন্ডগ্রামেও মায়ের দর্শনের জন্য আসছে, অনেক ভক্তই তাঁকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা বলে মনে করছেন। গানটি স্মরণ করিয়ে দিল পূর্বকথা, শ্রোতাদের মনে ভেসে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর প্রথম জীবনের কথা, তাই তাঁদের চোখে জল এসেছিল। আমি গিরিশ ঘোষের কাছে শুনেছিঃ এক ঘণ্টারও অধিককাল সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো জলভরা চোখে বসে থেকেছিলেন।

আনন্দের দিনগুলি শেষ হয়ে এল। শুনলাম, কালীপূজার পর মা জয়রামবাটী ফিরে যাবেন। যাবার দিনে গিরিশবাবু এলেন। কোন কথা না বলে তিনি যোগানন্দ স্বামীকে ডেকে নিয়ে সোজা মায়ের কাছে চলে গেলেন। আমরা তাঁর পিছু পিছু গেলাম। গভীর ভাবাবেগে ও ভক্তিতে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তিনি করজোড়ে বললেনঃ 'মা, আমি যখনই তোমার কাছে আসি, আমার মনে হয় আমি তোমার কাছে ছোট শিশু, যেন নিজের মায়ের কাছে এসেছি। আমি যদি তোমার বড়সড় ছেলে হতাম, তাহলে মাকে সেবা করতে পারতাম। কিন্তু তার উলটোটাই হচ্ছে। তুমিই আমাদের সেবা করছ, আমরা তা করছি না। তুমি জয়রামবাটী যাচ্ছ লোকজনের সেবা করতে, এমনকি রান্না করেও খাওয়াবে। বল, কেমন করে আমি তোমার সেবা করতে পারি? কি করে জগন্মাতার সেবা করতে হয়, তা কি আমি জানি?' আবেগে রুদ্ধ

হল কণ্ঠ, মুখ রক্তাভ। আবার তিনি বললেনঃ 'মা, তুমি আমাদের মনের কথা সব জান। আমরা তো নিজের মনের ভাব বুঝতে পারি না। তোমার কাছে পেঁছাবার যোগ্য আমরা নই। কিন্তু অসীম দয়া তোমার, সন্তানদের দেখা দিতে নিজেই এসেছ। যখনই তোমার এখানে আসার ইচ্ছে হবে, তৎক্ষণাৎ দ্বিধামাত্র না করে চলে আসবে। আমরা, তোমার সন্তানেরা, আমাদের মাকে দেখে কতই না আনন্দ পাই। তোমার সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাদের ধন্য কর।' আমরা পিছনে ছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে তারপর বললেনঃ 'মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, ঈশ্বর কখনও কখনও আমাদেরই মতো মানবদেহে আবির্ভূত হন। তোমরা কি অনুভব করতে পারছ, স্বয়ং জগন্মাতা গ্রাম্য রমণীর বেশে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন? কল্পনা করতে পারছ কি, সাধারণ নারীর মতোই তিনি সমস্ত প্রকার গার্হস্থ্য ও সামাজিক কাজকর্ম করে থাকেন? এসব সত্ত্বেও, তিনি স্বয়ং মহামায়া, মহাশক্তি, জীবের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, একই সঙ্গে মাতৃত্বের পরম আদর্শও স্থাপন করে যাচ্ছেন।' উপস্থিত সকলের উপর তাঁর এই বক্তব্য গভীর প্রভাব বিস্তার করল। পরম প্রশান্তি ও মহিমায় ভরে গেল সম্পূর্ণ পরিবেশ। তা যেন সাক্ষাৎ স্বর্গলোক, আধ্যাত্মিক আনন্দ ও আশীর্বাদে পূর্ণ।

মায়ের সঙ্গে আমরা রেলস্টেশনে গেলাম, তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলাম, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে তাঁর জন্য ভাড়া করা একটি বাড়িতে তিনি ছিলেন। স্বামী যোগানন্দ মায়ের দেখাশোনা করার জন্য ছিলেন। তাছাড়া আরও দুজন ছিলেন—দীন মহারাজ এবং কৃষ্ণলাল মহারাজ। কৃষ্ণলাল তখন ব্রহ্মচারী। শেষের দুজন বাজার-হাট ইত্যাদি ঘরকন্নার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন কলকাতায় এলেন, ঘটনাচক্রে স্বামীজীকেও সেই সময় দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আসতে হল তাঁর প্রিয় শিষ্য খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখানে বলা প্রয়োজন, এর কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী দার্জিলিং গিয়েছিলেন। মা তখন জয়রামবাটীতে তাঁর গ্রামে। ভারতে ফেরার পরে, কলম্বো থেকে কলকাতা আসার পথে স্বামীজীকে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। অনবরত সাক্ষাৎকার, মানপত্র গ্রহণ এবং একের পর এক বক্তৃতাদান—এই সবই করতে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনের কয়েকদিন পরেই তিনি কয়েকজন গুরুভাই এবং তরুণ শিষ্যসহ দার্জিলিং চলে গিয়েছিলেন।

খেতড়ির রাজা আরও কয়েকজন দেশীয় রাজার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন—সকলেই রানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকালের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে লন্ডনে যাচ্ছেন। মহারাজার একান্ত ইচ্ছা ছিল, স্বামীজী তাঁর সঙ্গী হবেন। সমুদ্রযাত্রাকালে বাধ্যতামূলক বিশ্রামে স্বামীজীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটবে। তাই তিনি স্বামীজীকে কলকাতায় আসতে আহ্বান করেছিলেন যাতে যাত্রার পূর্বে প্রয়োজনমতো ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। তদনুযায়ী স্বামীজী দার্জিলিং থেকে কলকাতায় এলেন। শিয়ালদহ স্টেশনে নামামাত্র সেখানে সমবেত গোটা মারোয়াড়ী সমাজের পক্ষে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হল। তাঁকে মানপত্র দেওয়া হল। মহারাজা

অজিত সিংহকে অগ্রণী করে ব্যবসায়ী সমাজের শিরোমণিরা সংবর্ধনায় এগিয়ে এসেছিলেন। কারণ এই ব্যবসায়ীদের অনেকেই মহারাজার অধীনস্থ জমিদার, আর স্বামীজী মহারাজার সম্মানীয় অতিথি ও পূজনীয় গুরুদেব। স্বামীজীকে সরাসরি মহারাজার বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হল। পরের দিন বিকেলে স্বামীজী মহারাজার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গেলেন। সেখান্ থেকে ফেরার পথে তাঁরা আলম-বাজার মঠে নামলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্ধ্য-আরতি দেখবার জন্য। যাবার পূর্বে উভয়েই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। কথামৃতকার মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে দুই জায়গাতেই উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পরদিন বিকেলে দুজন তরুণ ব্রহ্মচারী শিষ্যকে নিয়ে স্বামীজী বাগবাজারে এলেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। আমি তখন স্বামী যোগানন্দের কাছাকাছি বসে ধর্মপ্রসঙ্গ করছিলাম। স্বামীজীর আসার সংবাদ শুনেই যোগানন্দ স্বামী তাঁকে অভ্যর্থনা করতে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। কুশল বিনিময়ের পর স্বামীজী যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'মা এবং তাঁর সঙ্গিনীরা ভাল আছেন তো?' যোগানন্দ বললেনঃ 'ঠাকুরের কৃপায় এখানে সব কুশল। কিন্তু দার্জিলিং-এ তোমার শরীর কেমন ছিল?' স্বামীজী তার পরেই সোজা মায়ের কাছে চলে গেলেন, আমরা তাঁর পিছু পিছু গেলাম।

এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। পাশ্চাত্য থেকে বিপুল যশগৌরব নিয়ে প্রত্যাবৃত্ত স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের এই সাক্ষাৎ-দৃশ্যটি দেখার সৌভাগ্য যে অল্প কয়েকজনের হয়েছিল তাঁরা প্রত্যেকেই তখন আনন্দে বিহ্বল। মা অন্য দিনের মতো অবগুণ্ঠনে আবৃত থেকে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বামীজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। পৃথিবীখ্যাত বিবেকানন্দ শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে অনুগত সন্তানের মতো শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণত। দীর্ঘ সাত বছর পরে স্বামীজীকে দেখলেন শ্রীশ্রীমা। তিনিও গভীরভাবে আলোড়িত, স্থির, নির্বাক, যেন সমাধিমগ্ন। গোটা পরিবেশ অবর্ণনীয় মহিমা ও দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ।

প্রণাম করার সময়ে স্বামীজী মায়ের পাদস্পর্শ করেননি। 'তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেনঃ 'যাও, মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, কিন্তু পাদস্পর্শ করো না। উনি এতই কৃপাময়ী, কোমলপ্রাণা, স্নেহাতুরা যে, কেউ ওঁর পাদস্পর্শ করলে উনি তৎক্ষণাৎ তার জ্বালা-যন্ত্রণাকে টেনে নেন নিজের মধ্যে। তার ফলে অপরের জন্য ওঁকে নিঃশব্দে ভুগতে হয়। একে একে ধীরে ধীরে গিয়ে ওঁকে প্রণাম কর, গোটা মন-প্রাণ দিয়ে ওঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, কিন্তু মুখে কোনও কথা নয়। উনি সর্বদা এমন অতিচৈতন্য-লোকে থাকেন যে, প্রত্যেকের অন্তরের সংবাদ জানেন।' স্বামীজীর নির্দেশে আমরা সবাই গিয়ে আস্তে আস্তে মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। স্বামীজী শান্তভাবে বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমাদের প্রণাম শেষ হলে গোলাপ-মা নিস্তব্ধতা ভেঙে খুব স্নেহভরা স্বরে স্বামীজীকে ডেকে বললেনঃ 'মা জানতে চাইছেন দার্জিলিং-এ তোমার শরীর কেমন ছিল? কোন উন্নতি হয়েছে কি?'

স্বামীজীঃ 'হ্যাঁ, ওখানে আগের থেকে ভাল ছিলাম। মহেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে এবং তাঁর সুশিক্ষিতা স্ত্রী আমাদের যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করেছেন। আমার মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

গোলাপ-মাঃ 'মা বলছেন, ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন। তোমাকে সমাজের উন্নতির জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে।'

স্বামীজীঃ 'মা, আমি পরিষ্কার দেখছি, মনেপ্রাণে অনুভব করছি যে, আমি ঠাকুরের হাতের যন্ত্র ছাড়া কিছু নই। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, কি করে এইসব ব্যাপার সম্ভব হচ্ছে, কি করে পাশ্চাত্যের স্ত্রী-পুরুষে ঠাকুরের বাণী প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছে! মা, আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম। তারপর যখন বক্তৃতা করে সেখানকার লোকেদের মুগ্ধ করতে পারলাম, তাদের কাছ থেকে বিরাট সংবর্ধনা পেলাম, তখন বুঝতে পারলাম মায়ের আশীর্বাদের ফলেই এই অলৌকিক কান্ড ঘটেছে। যখন একান্তে থেকেছি, তখন স্পষ্টই অনুভব করেছি, ঠাকুর যাকে বলতেন মা-কালী, তিনিই আমার পথ দেখিয়েছেন।'

মায়ের উত্তর গোলাপ-মা স্বামীজীকে জানালেনঃ 'ঠাকুর মা-কালীর থেকে পৃথক্ নন। ঠাকুরই এই বিরাট জিনিসগুলি তোমাকে দিয়ে করিয়েছেন। তুমিই তাঁর বাছা শিষ্য এবং সন্তান। তোমার প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা, তিনি সকলকে বলেই গিয়েছিলেন, তুমি একদিন পৃথিবীর আচার্য হবে।'

গভীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বললেনঃ 'মা, আমি তাঁর বাণী প্রচার করতে চাই, আর সেজন্য যত শীঘ্র সম্ভব একটি সঙ্ঘ স্থাপন করতে চাই। কিন্তু যত দ্রুত তা করতে চাইছি, ততটা দ্রুত পারছি না বলে কষ্ট পাচ্ছি।'

মা এবার নিজেই কোমল স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেনঃ 'চিন্তা করো না। তুমি যা করেছ, আর যা করবে সবই চিরকালের জিনিস। এই কাজের জন্যই তুমি এসেছ, হাজার হাজার মানুষ তোমাকে পৃথিবীর সেরা আচার্য বলে গ্রহণ করবে। স্থির জেন, ঠাকুর শীঘ্রই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। দেখবে অল্পদিনের মধ্যে তোমার ভাব কার্যকরী হচ্ছে।'

প্রার্থনার সুরে স্বামীজী বললেনঃ 'মা, আশীর্বাদ করুন, আমার কাজের পরিকল্পনা যেন শীঘ্র রূপায়িত হচ্ছে দেখতে পাই। দু-এক দিনের মধ্যে দার্জিলিং-এ ফিরে যাচ্ছি। কলকাতায় এসেছিলাম খেতড়ির মহারাজার অনুরোধে।' এই কথা কটি বলে, স্বামীজী আবার মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।...

স্বামী যোগানন্দ সর্বদাই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার ভাষায় মায়ের প্রসঙ্গ করতেন। অনর্গলভাবে বলে যেতেন, কেমন করে একেবারে শিশুবয়স থেকে সকল পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মা উদাসীন থেকেছেন, কী তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ স্বভাব, অকলঙ্ক চরিত্র, শিশুসুলভ সারল্য, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সকলের প্রতি সহানুভূতি, সহৃদয়তায় পূর্ণ অন্তর, অসীম মাতৃস্নেহ, গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, এবং অধ্যাত্ম-পথগামীদের অন্তরে উদ্দীপনা সঞ্চারে ও তাকে ঊর্ধ্বায়িত করায় তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা! তাঁর কথা এখনও সকলের বিশেষ জানা নেই, তবু নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের পুরাণ এবং ইতিহাসের বিরাট আধ্যাত্মিক চরিত্রদের মতোই মহামহিমময়ী।

ঠাকুর এবং মায়ের পবিত্র সম্পর্ককে ভুল বুঝে কিভাবে সন্দেহ করেছিলেন, সেকথাও স্বামী যোগানন্দ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বোধহয় রাত্রে গোপনে মায়ের ঘরে যান। দক্ষিণেশ্বরে মা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের

কাছেই নহবতখানায় থাকতেন। একদিন রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নহবতখানার দিকে যেতে দেখে স্বামী যোগানন্দের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি পিছনে অতি সাবধানে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতখানার পাশ কাটিয়ে নিজের মনে এগিয়ে যেতে লাগলেন, মায়ের ঘরের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। তিনি ঝাউতলার দিকে যাচ্ছিলেন শৌচাদির জন্য। জ্যোৎস্না-ভরা রাত। যোগানন্দ মায়ের ঘরের দিকে নজর করে দেখলেন, শ্রীশ্রীমা সেই মধ্যরাত্রেও গভীর ধ্যানে মগ্ন। অধ্যাত্ম-আলোকোজ্জ্বল মায়ের মুখ, বাহ্যচেতনাহীন, আত্ম-নিমজ্জিত। সে এক দিব্য দৃশ্য! শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষের সাধুত্বকেও তিনি সন্দেহ করেছেন, এর গ্লানিতে যোগানন্দের মন পূর্ণ। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পদধ্বনি শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে উত্তরের বারান্দায়, যেখানে তাঁর বিছানা সেদিকে চললেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, ঠাকুর তাঁকে আগেই ধরে ফেলেছেন। তিনি পুরো ব্যাপারটিই বুঝেছিলেন। অপ্রস্তুত শিষ্যকে সান্ত্বনা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে জোরের সঙ্গে বলেছিলেনঃ 'বেশ বেশ। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।'

যোগানন্দ যখন এই ঘটনাটি বলছিলেন তখন গভীর আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। শেষে বললেনঃ 'ঠাকুর এবং মায়ের সেই ছবি আমার স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যাবে না। আমি তখন বুঝেছিলাম, ওঁরা দুজনেই ঈশ্বরস্বরূপ, লক্ষ লক্ষ ভক্তের জন্য করুণায় দেহধারণ করেছেন। ন্যায়বোধ, পবিত্রতা, ঐশ্বরিকতা, স্বার্থহীন সেবা এবং সত্যের আদর্শ তাঁরা আমাদের কল্যাণে রেখে যাবেন। রেখে যাবেন দুর্বল, পতিত, অসহায়, পদদলিত মানুষের প্রতি তাঁদের ভালবাসা, মনুষ্যজাতির দুর্গতিমোচনের জন্য তাঁদের তুলনাহীন ত্যাগ। তাঁরা এসেছিলেন মানুষের মন থেকে সমস্ত সন্দেহ এবং হতাশাকে দূর করতে, বিশ্বাস এবং ভালবাসায় তাকে উজ্জীবিত করতে, উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে; কি করে সুখদুঃখ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে থাকতে হয়, কিভাবে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্তব্য করতে হয় তা দেখিয়ে দিতে। ঠাকুরের মতো মা-ও অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁর উপদেশ-নির্দেশ, তাঁর প্রজ্ঞাবচন—সকলই তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল, সেগুলি কারও ধার করা কথা নয়, গ্রন্থ থেকেও সংগৃহীত নয়। ঠাকুর এবং মা দুজনেই দেখিয়ে গেছেন, আধুনিক যুগের এই জটিল বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যেও কি করে শুদ্ধসত্ত্ব সরল জীবন যাপন করা যায়।'...

শ্রীশ্রীমা যাবতীয় গার্হস্থ্য এবং সামাজিক কাজে সক্রিয় থেকেও সর্বদা দিব্যভাবে আবিষ্ট থাকতেন, অবিচলিত থাকতেন জীবনের সঙ্কটে, যন্ত্রণায়। যখনই আমি তাঁর দর্শনে গেছি, তাঁকে সেই একই প্রকার স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী মাতারূপে দেখেছি। করুণাঘন শান্ত তাঁর দুই নয়ন, জগজ্জননীর দিব্যজ্যোতিতে তা সমুজ্জ্বল। তাঁর উপস্থিতি আমার মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি করত, ভাষায় তার প্রকাশ সম্ভব নয়।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা এখানে বলা প্রয়োজন। কয়েকদিনের মধ্যে স্বামীজী দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফেরেন। তার পরেই তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিজের কল্পনাকে রূপায়িত করতে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভাগুলি সাধারণভাবে প্রতি রবিবার

সন্ধ্যায় বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত। এরকম কয়েকটি সভার সময়ে শ্রীশ্রীমা তাঁর সঙ্গিনী ও শিষ্যাদের নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। স্বামীজী প্রায়শ এইসব সভায় সভাপতিত্ব করতেন, অনেক গান গাইতেন, বিশেষত যদি শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকতেন।

বলরাম বসুর বাড়িতে স্বামী যোগানন্দ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যে একবার একটি অসাধারণ তাৎপর্যময় আলোচনা হয়েছিল। ...১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইয়ের মাঝামাঝি স্বামী যোগানন্দ আলমোড়া থেকে কলকাতায় সবেমাত্র ফিরেছেন। দুমাস আগে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। ...গিরিশ ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে স্বামী যোগানন্দ বলেছিলেনঃ 'স্বামীজী একটি স্ত্রী-মঠ স্থাপন করতে চান, সেটি সরাসরি শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে পরিচালিত হবে। এই মঠে ঠাকুরের সমস্ত শিষ্যারা একত্রে থাকতে পারবেন। অন্য মহিলারা, পাশ্চাত্যের মহিলারাও, যদি ত্যাগ-বৈরাগ্য-সাধনার জীবন যাপন করতে চান, এখানে বাস করতে পারবেন। তাঁরা ঠাকুরের শিষ্যাদের পবিত্র সঙ্গ করে অতীতের অনুষঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং দেখবেন আদর্শের জীবন্ত রূপ। বালবিধবা এবং অবিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে যাঁরা উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য এবং সমগ্র দেশের মহিলাদের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে চান, তাঁরাও মহিলা-মঠের সদস্য হতে পারবেন। শ্রীশ্রীমা হবেন তাঁদের কাছে আদর্শ-প্রতিমা, তাঁর আশীর্বাদে তাঁদের ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, তাঁদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন প্রাচীনকালের গার্গী-মৈত্রেয়ীর মতো ব্রহ্মবিদেরা; এমনকি আমাদের পুরাণ ও ইতিহাস কথিত প্রাচীন বীররমণী ও ব্রহ্মবিদের থেকেও অনেক বড়মাপের তাঁরা হয়ে দাঁড়াবেন। মায়ের ব্যক্তিগত জীবন এবং চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিসম্ভূত বাক্যাবলী, তাঁর সমুন্নত ভালবাসা এবং যত্ন মঠের সদস্যাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে তাঁদের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে, তাঁদের সামনে খুলে দেবে নতুন আদর্শের জগৎ। তাঁরা সর্বোচ্চ মানবকল্যাণের পথে অগ্রসর হবেন নির্ভয় বিশ্বাসে।'

স্বামী যোগানন্দ বললেনঃ 'স্বামীজী গভীর আবেগের সঙ্গে আমাকে বলেছেন, "আমাদের মাতাঠাকুরানী বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির ভাণ্ডার, যদিও আপাতভাবে গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত। তাঁর আবির্ভাব ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবযুগোদয় সূচনা করেছে। যে-আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করেছেন, যার প্রকাশ তিনি করছেন, তা কেবল ভারতীয় নারীদেরই মুক্তি দেবে না, পরন্তু সমস্ত পৃথিবীর নারীদের মন ও হৃদয়ে প্রবেশ করে তাদের প্রভাবিত করবে। মাতৃত্বই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, বিশেষত ভারতবর্ষে তা প্রত্যেক নারীরই সহজাত বৈশিষ্ট্য যা ক্ষুদ্র বালিকার মধ্যেও দেখা যায়।"'

স্বামী যোগানন্দ আরও বললেনঃ 'পাশ্চাত্যের সামাজিক কাঠামো নারীর জায়া-রূপের উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু মাতৃত্বই ঐশ্বরিক ভালবাসার যথার্থ প্রকাশ—তা বিশাল, মহান্, আকাশের মতো প্রশস্ত। ভারতীয় সমাজে এখন বিভিন্ন বিদেশীয় জাতি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নানাপ্রকার রীতিনীতি, ভাব প্রবেশ করেছে। তার ফলে আমাদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত মাতৃত্বের যথার্থ আদর্শ বর্তমানে ক্রমেই বিদূরিত হয়েছে—ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে এসেছিলেন

নিজ জীবন এবং উপলব্ধির দ্বারা এই মহান্ আদর্শকে পুনর্জীবিত করে তুলে ধরতে। এমনকি বিভিন্ন ধর্মপথে সুকঠিন সাধনার কালেও শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও ঈশ্বরের মাতৃভাবের আদর্শ থেকে সরে যাননি। তিনি ভৈরবী-ব্রাহ্মণীকে তাঁর প্রথম পথপ্রদর্শক এবং গুরু বলে মেনেছিলেন। সম্পূর্ণ সন্ন্যাসের কালেও তিনি কখনও পত্নীকে ত্যাগ করেননি, যাঁকে তিনি নিজ মাতা চন্দ্রাদেবীর মতো জগজ্জননী বলে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে তিনি বিশুদ্ধ ভালবাসা এবং ভক্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর কাছে জগন্মাতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এই উপলব্ধি কোন ভাবগত বা আদর্শায়িত বিভ্রম নয়। ঐশ্বরিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে দিব্যানন্দজাত এই প্রত্যয়। শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-করুণা পার্থিব সম্পর্কজাত নয়, তা দিব্যপ্রেমের উৎস থেকে স্বতোৎসারিত—অবতারের বৈশিষ্ট্য যা। সকল সন্তানের কল্যাণ ও সেবায় উৎসর্গীকৃত তাঁর জীবন, কোন পার্থিব সম্পর্কজনিত নিচ পার্থক্যবোধ সেখানে নেই—এ সমস্তই মাতৃত্বের চরম আদর্শ। তাঁর কৃপা কেবল আত্মীয়-পরিজন, ভক্ত অথবা গ্রামের লোকেদের উপরেই বর্ষিত হয় না, তা অফুরন্ত, অব্যাহত, অসীম। তা বর্ষিত হয় সমাগত সকল প্রার্থীর উপরই। ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সকল কাজই মাতার ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা আছে তাঁর জীবনে। স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃত্বের এই আদর্শ সম্পর্কে সর্বদাই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধায় বলে থাকেন, তাঁর ধারণায় প্রতিটি দেশের নারীদের আত্মোন্নতিতে সহায়ক হবে এই আদর্শ। আর শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে এবং উৎসাহে পরিচালিত সন্ন্যাসিনীদের মঠটি হবে এই মহান্ আদর্শ প্রচারের মূল কেন্দ্র।'

গিরিশ ঘোষ উত্তরে বললেনঃ 'নতুনভাবে আমাদের সমাজ সংগঠন এবং নারীদের উন্নতির জন্য সত্যই কী অভিনব সাহসী চিন্তা স্বামীজীর! স্বামীজীর ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করতে আমার কোনই দ্বিধা নেই। কিন্তু বড়ই কঠিন কাজ, বিশেষত এখন স্বামীজীর স্বাস্থ্যের যা অবস্থা। বর্তমানে তাঁকে এই দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়াটা কতদূর সঙ্গত জানি না। অবশ্য তিনি আমাদের যা করতে বলবেন, বিনা দ্বিধায় আমরা তা করব। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন, ডাক্তারেরা তো সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতেই পরামর্শ দিয়েছেন।'

স্বামী যোগানন্দ বললেনঃ 'সমাজ এবং মানুষের উন্নতির জন্য যা করা উচিত বলে সে মনে করে, দৈহিক অসুস্থতা বা অন্য কোন বাধা তা থেকে তাকে নিরুৎসাহ বা নিবৃত্ত করতে পারবে না। স্বাস্থ্যের এই বর্তমান অবস্থাতেও এ ছাড়া তার মাথায় অন্য কোন চিন্তা নেই। তার স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন দেখে সে কেবল মৃদু হাসে। স্ত্রী-মঠ শুরু করার বিষয়ে তার সকল পরিকল্পনার কথা শোনার পর তাকে বললাম, "সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন মনে করছ, তা-ই কর। কিন্তু দোহাই, মাকে এখনই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরো না। ঠাকুর কি বলতেন, স্মরণ আছে তো—জনসমাজে তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] প্রচার শুরু করলে তাঁর শরীর থাকবে না? একই কথা মায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমি তাই হাবি-জাবি সকলকে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, অন্তত দর্শনকালে তাঁর পাদস্পর্শ করতে দিই না। আমি চাই শুদ্ধস্বভাব, আন্তরিক ভক্তেরাই তাঁর দর্শন পাক। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, মাকে এখন ব্যস্ত করো না। তুমি এখন অন্য পবিত্রচরিত্র উচ্চ

আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মেয়েদের নিয়ে স্ত্রী-মঠের কাজ আরম্ভ করতে পার, যাঁরা জ্ঞান-কর্মের বিভিন্ন ধারায় সুসম্পন্ন, পুরুষদের বা সাধুদের সাহায্য না নিয়েও যাঁরা সঙ্ঘ চালাতে সমর্থ।" আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র স্বামীজী আমাকে প্রাণ থেকে ধন্যবাদ দিয়ে সহাস্যে বললেন, "মন্ত্রী, তুমি আমাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছ। ঠাকুরের সতর্ক-বাণীকে মনে করিয়ে ভালই করেছ। আমি মাকে ব্যস্ত করব না। তাঁর অভিপ্রায় তিনিই ভাল জানেন, তাকে তিনিই সিদ্ধ করবেন। সেখানে কথা বলবার আমরা কে? তাঁর আশীর্বাদে আমরা সবকিছু সমাধা করব। তাঁর আশীর্বাদের শক্তি আমি দেখেছি, অনুভব করেছি। তাতে আছে অলৌকিক শক্তি।" সুতরাং স্বামীজী আর স্ত্রী-মঠের পরিকল্পনায় থাকার জন্য মাকে অনুরোধ করে বিব্রত করবেন না।'

এসব শুনে গিরিশবাবু বললেনঃ 'যোগেন মহারাজ, তুমি মস্ত কাজ করেছ। এখন বুঝতে পারছি স্বামীজীর সঙ্গে তোমার আলমোড়া যাবার হেতু কি। যোগেন, শোনো, মায়ের আশীর্বাদের অপূর্ব প্রকাশের আমিই এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত! একবার আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি, ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিদারুণ যন্ত্রণায়, রোগের অন্যান্য উপসর্গের ফলে ছটফট করছিলাম। একরাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক নারীমূর্তি, মমতায় ভরা মাতৃমুখ, তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, বাছা, শীঘ্রই তোমার অসুখ সেরে যাবে। আমাকে পান করবার জন্য ঔষধ দিলেন। তারপর স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। আমি গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে রইলাম দীর্ঘসময়। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিন সকালে আমি প্রায় সুস্থ, রোগতাপ যেন নেই, পূর্ণ নিরাময় ঘটে গেল অচিরে। এ ব্যাপারটা তখন থেকেই আমার কাছে রহস্য হয়ে আছে। এ-জাতীয় অলৌকিকতার সঙ্গে আমি তখনও অপরিচিত। তখনও তো ঠাকুর অথবা মায়ের দর্শনের এবং তাঁদের আশীর্বাদলাভের সৌভাগ্য হয়নি। পরে জয়রামবাটী গিয়ে মাতাঠাকুরানীকে দেখে অবাক—আরে, এঁকেই তো স্বপ্নে দেখেছি—ইনিই তো স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে আমাকে ঔষধ দিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন। আরও বুঝতে পারছি, মায়ের কৃপাতেই ঠাকুরের নিকটে এসে তাঁর চরণে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁরই আশীর্বাদে তাঁর করুণালাভের ভাগ্য, এবং তোমাদের সকলের, বিশেষত স্বামীজীর সঙ্গলাভের ভাগ্য আমার হয়েছে। স্বামীজী—আহা—কিশোর বয়সেই গুরুমহারাজের জন্য সবকিছু ত্যাগ করলেন।' *

অনুবাদঃ সুদীপ বসু

ধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি। স্থান—উদ্বোধনের পূজার ঘর। বেলুড় মঠ থেকে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ কেষ্টলাল মহারাজকে বললেনঃ 'কেষ্টলাল, ধীরেনকে মায়ের কাছে নিয়ে "বলি" দিয়ে নিয়ে আয়।' বাবা নেই, মা-ও বহুদিন আগে মারা

গেছেন। মন উদাস। মনে শুধু ভাবনা কোথায় যাব—কি করে হারানো মাকে পাব। মাতৃহারা কিশোরের মর্মবেদনা কেউ বুঝবে না।

বলিই বটে—আমরা বাঙাল—বরিশাল বাড়ি। অতএব বলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এরা সরস্বতী পূজায়ও পাঁঠা বলি দেয়।

উদ্বোধনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ডেস্ক-এ বসে লিখছেন। সিঁড়ির কাছে যেতেই হেঁকে বললেনঃ 'কে যায়? মায়ের শরীর ভাল নয়, যেও না।' আমি কোন কথা না শুনে তাঁকে ধাক্কা মেরেই মায়ের কাছে গেলাম। মা পূজায় বসেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়েই বুঝলেন দীক্ষাপ্রার্থী। একটু হেসে বললেনঃ 'কাল এসো।'

পরদিন ৩ জানুয়ারি। স্নান সেরে গেলাম। মা তাঁর বাঁদিকের আসনে বসতে বললেন। এদেশের মেয়েরা যেমন চিবুক স্পর্শ করে বধূবরণ ইত্যাদি করে, মা তেমনই আমার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগলাম মায়ের পূজা—সামনে নৈবেদ্যের থালা, ফল, ফুল। মা কিছু-ক্ষণ ধ্যান করে, আমার দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেনঃ 'তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?' আমি বললামঃ 'মা, মায়ের মৃত্যু আমার ছয় বছর বয়সে, বাবা চোদ্দ বছরে, ওসব তো জানিনে মা। তবে মায়ের মৃত্যুর সময় শিয়রে বাবা কালীমূর্তি রেখে-ছিলেন।' মা বুঝে নিলেন। চিবুকে হাত রেখে কানে মহামন্ত্র দিলেন। একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতো পা থেকে মাথা অবধি চলে গেল। সে আনন্দময় অনুভূতি শুধু অনু-ভবের—বর্ণনার নয়। এবার করগণনা দেখালেন। আমার ভুল হতে লাগল—মাকে কিছু না বলে শুধু তাকিয়ে রইলাম। আবার দেখিয়ে দিলেন। আবার ভুল হল। আবার দেখিয়ে দিলেন করুণাময়ী।

দীক্ষাশেষে হাত পাতলেন। গুরুদক্ষিণা। আমার পকেট শূন্য জেনে মা নৈবেদ্যের থালা থেকে একটি ফল নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেনঃ 'বল, "আমার ইহকাল পর-কালের পাপপুণ্য সব তোমায় দিলাম।"' আমি বললামঃ 'মা, ছেলে মাকে ভাল জিনিস দেয়। আমি পাপ-টাপ দিতে পারব না।' মা হেসে বললেনঃ 'থাক বাবা, তোমায় কিছু করতে হবে না। শুধু সকাল-সন্ধ্যা জপ করো। জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি।' মাকে বললামঃ 'হাতে জপ আমার হচ্ছে না।' মা কেষ্টলাল মহারাজকে ডেকে এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা আনিয়ে দিলেন। সেইটেই এখন আমার সম্পদ।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করি। জীবনে মায়ের কৃপায় পেয়েছি অনেক। জীবনে অনেক শূন্যতা তাঁর কৃপায় ভরেছে। কিন্তু যায়নি আমার গুরুদক্ষিণা না দেবার বেদনা। জীবনপাত্র ভরে মাকে গুরুদক্ষিণা দেব—আমার আজীবন লক্ষ্য। কিন্তু লক্ষ্য এখনও ছুঁতে পারিনি। জানি না এ-জীবনে আর পারব কিনা।

কামারপুকুরে যুগী শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে গ্যারিসন সাহেব আমাকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'তুমি মাকে দেখেছ। তাঁর কিছু "মিরাক্‌ল্‌" দেখেছ? মায়ের কিছু অসাধারণ ঘটনার কথা বল।'

উত্তরে তাঁকে বলেছিলামঃ 'তুমি নিজেই তো তাঁর একটি "মিরাক্‌ল্‌"—মায়ের করুণার বড় উপমা। খুব কম সময় আর অল্প অর্থ ব্যয় করে আমরা এসেছি

কলকাতা থেকে। তুমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কামারপুকুরে এসে হাজির হয়েছ। এটাই মায়ের করুণার একটি বড় দৃষ্টান্ত নয় কি?'

পূজনীয় শরৎ মহারাজ—মায়ের দ্বারী। তিনি বলতেনঃ 'তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।' আমরাও হতবাক্ তাঁর লীলা দেখে।

রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক বিদেশী সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ 'মহারাজ, আপনি কেন জয়রামবাটী এসেছেন?' স্মিতহাস্যে মহারাজ জবাব দিয়েছিলেনঃ 'আমার ব্যাটারী চার্জ দিয়ে নিতে।'

মা নিজে বলেছেনঃ 'জয়রামবাটী "শিবপুরী", তেরাত্র থাকলে দেহ শুদ্ধ হয়।' আমায় যদি কেউ বলে, 'অমরনাথ, ক্ষীরভবানী যাবে'—আমি বলিঃ 'সব তীর্থের সেরা তীর্থ জয়রামবাটী। যদি পার সেটি দর্শন কর, ধন্য হবে।'

স্বামীজীর ভাই মহিমবাবু আমাকে বলেছিলেনঃ 'সব বলবে, কিন্তু মায়ের কথা বলবে খুব সাবধানে। কৃপা পেয়েছ, এইটে ধরে থাক। বলতে গিয়ে ছোট করে ফেলবে।' মায়ের কথা বলতে তাই বড় ভয়—পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলি।

ভগিনী দেবমাতা

আমার কলকাতা-ভ্রমণ ছিল তীর্থযাত্রার মতো। কলকাতার অদূরে গঙ্গার তীরে রয়েছে সেই মন্দিরটি, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করেছেন ও ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। গঙ্গার অপরতীরে কিছু দক্ষিণদিকে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় মঠ। সর্বোপরি রয়েছে বাগবাজারের সেই অনাড়ম্বর বাড়িটি, যেখানে বাস করতেন এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধিকা। তাঁর নাম সারদামণি দেবী, কিন্তু সচরাচর তিনি শ্রীমা বা মাতাদেবী বলেই পরিচিত। তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্যই বাংলাদেশে আমার এই তীর্থযাত্রা।

মাদ্রাজে পৌঁছাবার পরেই তাঁর কাছ থেকে এই সস্নেহ আশীর্বাদ-পত্রটি পেলামঃ

স্নেহের দেবমাতা,

ঠাকুরের প্রতি তোমার ভক্তির সংবাদ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনন্ত ভক্তিতে তোমার হৃদয় পূর্ণ হউক, তোমার প্রতি আমার এই আশীর্বাদ। ইহার জন্য আমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। তুমি দীর্ঘজীবী হও এবং আমার অন্যান্য সন্তানদের সহিত চিরশান্তিতে পূর্ণ হও।...

আমি ভাল আছি।

ইতি

তোমার স্নেহশীলা মাতাঠাকুরানী

চিঠিখানি বাংলায় লেখা ছিল—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। (চিঠিটির বর্তমান বাংলা-অনুবাদ ইংরেজী-অনুবাদ থেকে করা।)

আমার তীর্থযাত্রা ছিল আধুনিক ধরনের—প্রথমত ট্রেনে, তাছাড়া জুতো পরে। কিন্তু আমি প্রাচীন রীতি বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলাম এবং আমার সঙ্গে কিছু

প্রণামী-দ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। ভারতীয় ধর্মীয় রীতিতে—পুণ্যস্থানে শূন্য-হস্তে যাওয়া অনুচিত। আমার সঙ্গে ছিল সঙ্ঘের বর্ষীয়ানদের জন্য পাড়বসানো তাঁতবস্ত্র, নতুন সুতি-কাপড়ে জড়ানো এক মস্ত পুঁটলি, বড় একঝুড়ি দুষ্প্রাপ্য কমলালেবু—যা শুধু দক্ষিণভারতেই জন্মায় ; ট্রেনে ব্যবহারের জন্য বিছানাপত্র (ভারতে প্রত্যেক যাত্রীই তাঁর নিজের বিছানাপত্র বহন করেন), একটা টিনের তোরঙ্গ, আর একটুকরি ফলমূল এবং কিছু বই। সহযাত্রীরা আমার তীর্থযাত্রার লটবহর বেশ অবজ্ঞার সঙ্গেই দেখছিল। জিনিসপত্র তাদের সঙ্গেও ছিল কিন্তু সেগুলো বিলাতিকেতার, আর আমারটা ভারতীয়—তফাত অনেকখানি।

মাদ্রাজ থেকে কলকাতা—অধীর আগ্রহে একে একে চল্লিশটি ঘণ্টা গুণে দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নের কিছু আগে পৌঁছালাম। স্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন ভগিনী ক্রিস্টিন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন (বাগবাজারে) বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখানেই আমার জন্য শ্রীমায়ের স্নিগ্ধ ভালবাসার সংবাদ অপেক্ষা করে ছিল। তিনি আমার ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন তাঁর নিজের ঘরের উপরতলায়। সেখান থেকে আশপাশের বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে গঙ্গাদর্শন করা যায়। কিন্তু সে-বাড়িতে পর পর কয়েকটি সংক্রামক রোগের ঘটনার জন্য শেষপর্যন্ত স্কুলবাড়িতেই আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল। সিস্টার নিবেদিতা ও সিস্টার ক্রিস্টিন আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও দাক্ষিণ্যপূর্ণ আদরযত্ন করেছিলেন এবং তাঁদের পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু [কলকাতায় এসেই এখানকার জলহাওয়ার সঙ্গে অপরিচিত আমি সংক্রামক কোন রোগে (কলেরা, বসন্ত) আক্রান্ত হয়ে না পড়ি সকলের সেই উদ্বেগে] রাত্রির মতো দিনেও যে মায়ের নিকট-সান্নিধ্য পাব না—সেকথা ভেবে দুঃখও সংবরণ করতে পারিনি।

বিদ্যালয় থেকে সারি সারি কয়েকটি বাড়ির পরেই মায়ের বাড়ি। আমাকে কেউ একজন এসে নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। একটা ছোট টুকরিতে সঙ্গে নিয়ে-আসা কিছু কমলালেবু এবং অন্য প্রণামী-দ্রব্য নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়লাম। এক অপরিচিত ভদ্রলোক আমাকে মালপত্রের ভারে বিব্রত দেখতে পেয়ে তাঁর ছেলেকে আমার হাতের জিনিসপত্রগুলো বয়ে নিয়ে যেতে বললেন। মায়ের বাড়িতে আমরা পৌঁছালাম। নতুন বাড়ি। মা থাকতেন দোতলায়—নিচের তলায় [উদ্বোধন] পত্রিকা অফিস।

সদর-দরজা এবং উঠোন পেরিয়ে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। পূজার ঘরের পিছনে একটি ঘরে শ্রীমাকে একলা পেলাম। তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করলাম নিজেকে, প্রণামীর সঙ্গে। স্নিগ্ধ স্নেহের সঙ্গে বললেনঃ 'ওমা দেবমাতা! দেবমাতা!' তারপর তাঁর শ্রীহস্ত আমার মাথায় রাখলেন। তাঁর স্পর্শে আমার অন্তর হতে নবজীবনের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে আমার সমগ্র সত্তাকে প্লাবিত করে তুলল।

তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন মন্দিরের বেদীর কাছে। প্রণাম করে মেঝেতে বসলাম, বিশ্রাম নেবার জন্য তিনি কাছেই শুয়ে পড়লেন। একজন সন্ন্যাসিনী এসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—ভারতবর্ষে ভালবাসায়-ভরা সেবার এটি প্রচলিত রীতি। সে-দৃশ্য দেখে মনে হলঃ 'আমি কি কোনদিন এই সেবার অধিকার লাভ করতে পারব!' আমার এই চিন্তা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইশারায়-আমাকে

কাছে ডেকে সন্ন্যাসিনীর স্থান গ্রহণ করতে বললেন। তাঁর কোমল সুঠাম শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শের সৌভাগ্য—সে এক দুর্লভ আশীর্বাদ। কিন্তু পাথরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসা ক্রমেই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। এবারও তিনি আমার মনের ভিতরের কথা বুঝে নিয়ে আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। আমরা একে অন্যের ভাষা জানতাম না। যখন পরস্পরের বক্তব্য বুঝিয়ে বলার কেউ উপস্থিত থাকতেন না, তখন তিনি হৃদয়ের অকথিত গভীরতর ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতেন। সে ভাষা বুঝতে আমাদের কারোরই কোনও অসুবিধা কখনও হত না।

মা অবিলম্বে আমাকে নিজের কাজকর্মে লাগিয়ে দিলেন। তাঁর ঘর দেখাশোনা করার সুযোগ পেলাম। প্রতিদিন সকালে আসতাম, তাঁর বিছানা ঠিকঠাক করে দিতাম এবং জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতাম। সেই কাজ করবার সময়ে একদিন চোখে পড়ল, সামনের বারান্দার দিকে পাঁচটি বড় বড় জানলার শার্শিপাল্লায় রঙ আর পুডিং-এ দাগ ধরে আছে। সেগুলো সব সময় খোলা থাকত বলে স্বভাবতই কারও নজরে পড়েনি। একদিন সকালে আমি কিছু পরিষ্কার কাপড় আর বানর-মার্কা সাবান ('বন আমি'-র ভারতীয় বিকল্প) নিয়ে গিয়ে শার্শিগুলো ঝক্‌ঝকে করে ফেললাম। মা দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত। সেদিন যখনই কেউ এসেছে, মা একটা জানলা বন্ধ করিয়ে দেখিয়েছেন তার কাচগুলো কেমন ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

আর একবারের কথা। একজন বাছাইকরা দুটি সেরা আম নিয়ে এসেছেন। মা চাইছিলেন আমি ঐ আম দুটি নিয়ে যাই। কিন্তু আমি রাজী হলাম না, কারণ জানতাম, সেগুলি শেষ মরশুমের আম, আর মা আম খুব ভালবাসেন। বললামঃ 'আম দুটি আপনি নিজে রাখলে আমার বেশী আনন্দ হবে।' মা চকিতে বললেনঃ 'আমি রাখলে তোমার আনন্দ, আর তুমি নিলে আমার আনন্দ, কার আনন্দ বেশী হবে তুমি মনে কর?' আমার মুখে তখনই কথা জুগিয়ে গেলঃ 'মা, আপনার আনন্দই বেশী হবে কারণ আপনার অনেক বড় মন।' জবাব শুনে মনে হল মা খুশী হলেন।

প্রতিটি প্রাণী সম্পর্কে তাঁর অন্তহীন স্নেহ-ব্যাকুলতা। মানুষের মাপে তাকে মাপা যায় না। তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে তার আভাস মেলে। সেগুলি থেকে কিছু কিছু এখানে উপস্থিত করছি যদিও তা করতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কারণ, সেগুলি এতই অন্তরঙ্গ চরিত্রের যে, প্রকাশ করা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও আমি তাঁর ভাব ও ভাবনার পরিচয়লাভের সুযোগ থেকে অন্যদের বঞ্চিত করতে চাই না।

আমার আদরের কন্যা,

তোমার ভালবাসাভরা পত্রগুলি পাইয়াছি। ঠিক সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া কিছু মনে করিও না। তোমার কথা সব সময় মনে পড়ে। তুমি যেখানে বসিয়া ধ্যান করিতে সেই জায়গাটির দিকে চোখ পড়িলেই তোমার সুন্দর মধুর চেহারাটি সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এ-বাড়ির সকলে তোমার কথা খুব বলিয়া থাকে। তোমার শেষ পত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভাল আছেন জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম।...

এখানে সকলে কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমার একান্ত স্নেহশীলা মাতাঠাকুরানী

আমার আদরের কন্যা,

তোমার পয়লা নভেম্বরের পত্র পাইয়াছি। চিঠি পাইয়া যে কী আনন্দ হইল তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমি এখানে (পুরীতে) বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছি। আরও দুই-এক মাস থাকিব। আশা করি তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র দিবে। আমি এখন আগের চেয়ে ভাল আছি। বোস্টন কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাব দিন দিন ছড়াইয়া পড়িতেছে জানিয়া আমি সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আদরের কন্যা আমার, আমি সকল সময় তোমার কথা ভাবি। আশা করি এখন সম্পূর্ণ কুশল। আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ লইও।

তোমার স্নেহের মাতাঠাকুরানী

আমার আদরের কন্যা,

তোমার সব পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। সেগুলি যে আমার কত ভাল লাগিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। তোমার দিন-যাপনের পদ্ধতিটি সুন্দর। তোমার শরীর-স্বাস্থ্য দিন দিন ভাল হইয়া উঠিতেছে জানিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। আমার স্নেহের কন্যা, তুমি নিশ্চয় জানিবে, ঠাকুর তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তোমার কথা সর্বদা মনে পড়ে। এই মাসের ১৬ তারিখে আমি দেশে যাইব।...এখানে সকলে ভাল আছে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ লইবে।

তোমার একান্ত স্নেহময়ী মাতাঠাকুরানী

মা নিজের হাতে চিঠি লিখতেন না। তাঁর সঙ্গে থাকতেন এমন কোন মহিলাকে চিঠির কথা মুখে মুখে বলে যেতেন। তাঁর পত্রের অনুলেখিকা অবশ্যই খুব নির্ভর-যোগ্য। মা যেমনটি বলতেন ঠিক তেমনটি তিনি লিখে নিতেন কারণ আমার কাছে একবার একটি চিঠি এসেছিল যাতে 'প্রিয় দেবমাতা' বলে সম্বোধন করা ছিল। অন্য কেউ বাকি ঠিকানা যোগ করে দিয়েছিলেন। চিঠিটি ছিল এইঃ

বাগবাজার, কলকাতা, ভারত

আমার পরম আদরের কন্যা,

তোমার ১৬ আগস্টের পত্র পাইয়াছি। যখন তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, ঠিক তখনই তোমার পত্রটি আসিল। সুতরাং বুঝিতে পার সেটি পাইয়া আমি কতখানি আনন্দ পাইয়াছি।

তুমি পত্রে ওখানকার কাজকর্মের যে-বিবরণ পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। পরমানন্দ এবং ওয়াশিংটন ও বোস্টনের অন্যান্য ভক্তদিগকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাইবে। তুমি আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়াছ এবং পরম উৎসাহে ঠাকুরের কাজ করিতেছ জানিয়া আমি আরও খুশী হইয়াছি। সত্যিই এই সংবাদ পাইয়া আমি অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। আমি আগের চাইতে এখন একটু ভাল আছি।

সারদানন্দ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সত্যকাম, কুসুমদেবী, গণেন, নিবেদিতা ও সুধীরা ভাল আছে। তাহারা প্রায়ই তোমার কথা বলে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। আদরের কন্যা আমার! ইতি

তোমার স্নেহময়ী মাতাঠাকুরানী

নিচের দুখানি পত্রও আমার আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের পরে লেখাঃ

সুন্দর বিলাস, মাদ্রাজ, ভারত

আদরের কন্যা আমার,

তোমার ১৭ জানুয়ারি ও ৯ ফেব্রুয়ারির দুইখানি পত্র পাইলাম। ওয়াশিংটন ও বোস্টনের কাজের বিবরণ খুব আগ্রহের সহিত আমি শুনিয়াছি। ভবিষ্যতে ঐ-বিষয়ে আরও জানিবার ইচ্ছা রহিল।

দুইমাস কোঠারে কাটাইয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি এখানে যে-বাটীতে অবস্থান করিতে আমি এখন সেইখানে আছি। দেড়মাস হইল এইখানে আসিয়াছি। ইহার মধ্যে আমি রামেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম এবং সেখানে চারদিন ছিলাম। বলরামবাবুর পরিবারের লোকেরা এখন আমার সঙ্গে আছে। সবাই ভাল আছে, কেবল উহাদের পরিবারের একজন মহিলা আন্ত্রিক-জ্বরে ভুগিতেছে। সে সুস্থ হইয়া উঠিলেই আমরা কলিকাতা রওনা হইব। কাল আমাকে ব্যাঙ্গালোর যাইতে হইবে। সেখানে দু-এক দিন থাকিব। তারপর এখানে ফিরিয়া আসিব।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এখন একটু ভাল। অন্যান্য সাধুরা ভাল আছেন।

তুমি, স্বামী পরমানন্দ, এবং ওয়াশিংটন ও বোস্টনের সকল ভক্ত আমার আশীর্বাদ জানিও।

ইতি

তোমার স্নেহের মাতাঠাকুরানী

জয়রামবাটী গ্রাম, হুগলী জেলা

স্নেহের কন্যা দেবমাতা,

খুব আনন্দের সহিত তোমার ১১ জুলাই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। শ্রীমান পরমানন্দ এখনও ভারতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। যোগীন-মা, গোলাপ-মা এবং অন্যান্য সকলে ভাল আছে। আমি এখন ভাল আছি। আশা করি তোমরা ওখানে সকলে কুশলে আছ।...

অত্যন্ত বেদনার সহিত জানাইতেছি, আমার বড় স্নেহের সন্তান শশীর [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের] শরীর গিয়াছে। আমার এই ক্ষতি পূরণ হইবার নয়। গত আগস্ট মাসে সে পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে।

তোমাদের সকলকে আমার আশীর্বাদ।

তোমার একান্ত স্নেহশীলা মাতাঠাকুরানী

•

তাঁর আশীর্বাদ-লাভ এবং তাঁর কাছে শিক্ষালাভের জন্য অগণিত ভক্ত সমবেত হতেন তাঁর পদপ্রান্তে। তিনি স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন, যখন তিনি নিজগ্রামে থাকতেন তখন অনেকদিনই রাত দুটো-তিনটের সময় ব্যাকুল তীর্থযাত্রীরা তাঁকে জাগিয়ে তুলতেন। প্রখর রৌদ্রে ছায়াহীন দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম না করে তাঁরা যাত্রা শুরু করতেন সন্ধ্যার পর ; তাই তাঁদের পৌঁছাতে শেষরাত্রি হয়ে যেত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এসব দর্শনার্থীরা মায়ের অপরিচিত। কিন্তু মায়ের রীতি ছিল, তখনই শয্যা-

ত্যাগ করে স্বহস্তে রান্না করে খাইয়ে তাঁদের অতিথিশালায় বিশ্রাম করতে পাঠানো। অতিথিশালাটি তাঁরই গ্রামের এক শিষ্য—ভক্তদের ব্যবহারের জন্য তৈরী করে দিয়েছিলেন।

কলকাতাতেও প্রায় প্রতিদিন ভক্ত-তীর্থযাত্রীরা আসতেনই তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে। তাঁরা কোন্ সময়ে এলেন, কোথায় তাঁদের বাস, কি তাঁদের জাতি বা বর্ণ—এসব ছিল তাঁর কাছে অবান্তর। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যেখান থেকেই আসুন, সকলের জন্যই ছিল তাঁর স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বাগত আহ্বান। সবাই তাঁর সন্তান। মাতৃগর্ভজাত সকলকেই তাঁর মাতৃহৃদয় ঢেকে রাখত তাঁর সর্বপ্লাবী পরম ভালবাসায়। সমগ্র মনুষ্যসমাজই তাঁর সংসার।

অতি বাল্যকালে অধ্যাত্মজগতের জ্যোতির্দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে তাঁর বিবাহ। বস্তুত, সে-বিবাহ ছিল বাগ্দানের নামান্তর মাত্র। বিবাহের অনুষ্ঠানাদির পরে তিনি তাঁর পিতামাতার কাছে স্বগ্রামে বাস করতে থাকেন। আর তাঁর থেকে বয়সে বহু বৎসরের বড় তাঁর স্বামী ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুরোহিতের নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে। বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল। ভগবদ্-ব্যাকুলতার প্লাবন বয়ে গেল তাঁর স্বামীর সমগ্র সত্তার উপর দিয়ে। সর্বোচ্চ উপলব্ধির পরম আলোকিত প্রশান্তি তিনি লাভ করলেন, কিন্তু একই সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে গেল মানবিক কামনা-বাসনার শেষ চিহ্নটুকুও।

দূর গ্রামে গিয়ে পৌঁছাল ভাসা ভাসা নানা গুজব। তরুণী-বধূটিকে তা তাঁর অভিনব বৈধব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলল। ভারতীয় স্ত্রীর প্রশ্নাতীত আনুগত্য নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর স্বামীকে দেখার ব্যাকুলতায় এবং সবকিছু স্বচক্ষে দেখার অভিপ্রায়ে তিনি পদব্রজে যাত্রা করে, বহু ক্রোশ অতিক্রম করে, কলকাতার কাছে গঙ্গাতীরে সেই মন্দিরে এসে পৌঁছালেন। বিহ্বল শিশুর মতো নমস্কার করে শ্রীরামকৃষ্ণ সাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন। তারপর বললেনঃ 'আমি প্রত্যেক নারীর মধ্যে কেবল জগন্মাতাকেই দর্শন করি—আমি তোমাকে পত্নীরূপে দেখব কি করে?' তিনি তখনই উত্তর দিলেনঃ 'আমি তোমার কাছে কিছু চাইতে আসিনি। আমি এসেছি শুধু সেবা করতে আর শিক্ষা নিতে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী জননী তখন মন্দির-উদ্যানে ক্ষুদ্র নহবত-ঘরে থাকতেন। খুবই বৃদ্ধা তিনি—সারদাদেবীর উপর তাঁকে দেখাশোনা করার ভার ন্যস্ত হল। প্রতিদিন রান্না করাই তাঁর প্রধান কাজ। সে-খাবার মায়ের অনুগত সন্তানটি মায়ের সঙ্গে প্রায়ই গ্রহণ করতেন। বড় সুখেই কাটছিল দিন। কিন্তু [একদিন] মৃত্যুর ছায়া এসে গ্রাস করল শতায়ু বৃদ্ধার জীবনকে। সুতরাং সারদাদেবী তখন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

নহবতের উপরতলায় সানাইওয়ালারা প্রহরে প্রহরে পূজার সময় জানিয়ে সানাই বাজাত, কিন্তু নিচের ঘরে বুকচাপা স্তব্ধতা। মা নিচের যে-ঘরে থাকতেন তার সামনের বারান্দায় মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যায় এমন তালপাতার বেড়া। শুধু একটি ফোকর দিয়ে চারপাশের বাগানের কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যেত। আর সেখানেই মা দিনের বেলা, এমনকি গভীর রাত্রি পর্যন্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন, কেবল স্বামীর মুখটুকু ক্ষণেক দেখার আশায়। কিন্তু বৃথা। এমনকি রাত্রে ঠাকুর

যখন খানিক দূরে পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে যেতেন, তখনও মাথার ওপর ভাল করে কাপড় ঢেকে দিতেন। এসব কাহিনী আমাদের শোনাতে শোনাতে মা বলতেনঃ 'বাস্তবিক সে ছিল একটি পরীক্ষাই আমার কাছে।'

ক্রমে অন্য বাঙালী মহিলারা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরের সান্নিধ্য-লাভে উৎসুক এইসব ভক্ত-মহিলাদের দ্বারা তাঁর ছোট্ট ঘরখানি প্রায়ই পূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। [ইতিমধ্যে অন্যান্য] শিষ্যরাও ঠাকুরের কাছে এসে হাজির হতে শুরু করেছেন। মা দেখলেন তাঁর ভক্তের সংসার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একবার ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেনঃ 'দেখ, ছেলেপুলে সকলেরই থাকে, কিন্তু তারা প্রায়ই মন্দ আর অবাধ্য হয়, কত ঝঞ্ঝাট বাধায়; কিন্তু আমি তোমার কাছে যেসব ছেলেদের এনেছি তারা সবাই ভাল, শুদ্ধসত্ত্ব। এরা তোমাকে কখনও কষ্ট দেবে না।'

যত লোকই আসুক না কেন, মা তাদের খাবার তৈরী করতে কখনও ক্লান্তি বোধ করতেন না। প্রায়ই তাঁর নৈপুণ্য রীতিমতো পরীক্ষার সম্মুখীন হত। একদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন গণ্যমান্য লোক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন। কাঁচা সবজির ভাঁড়ার তখন শেষ। কিছু বাতিল বাঁধাকপির পাতা আর সামান্য দু-একটা আনাজ ছাড়া আর কিছুই নেই। মা পড়লেন সঙ্কটে। কিন্তু গোলাপ-মা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেনঃ 'ঐ ঝড়তি-পড়তি দিয়েই চমৎকার একটা রান্না তুমি করতে পারবে।' উত্তরে মা বললেনঃ 'ভাল, দেখি চেষ্টা করে। —যদি ভাল হয় তাহলে তার জন্যে প্রশংসা হবে তোমারই প্রাপ্য। আর যদি না হয় তাহলে তার বদনামও তোমায় পেতে হবে কিন্তু।' ঐসব দিয়েই দ্রুত রান্না করে মন্দিরে [শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে] পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বললেনঃ 'এমন চমৎকার রান্নার সবজি পাওয়া গেল কি করে?' না মা কিন্তু সেই প্রশংসা বা সুখ্যাতির ভাগ নেননি—সবটাই দিয়েছিলেন গোলাপ-মাকে।

দক্ষিণেশ্বরে মা সব সময় বাস করেননি। সবসুদ্ধ বছর পনের এখানে কাটিয়ে-ছিলেন, কিন্তু একটানা নয়। মাঝে মাঝে লম্বা ছেদ পড়ত। সেসময় তিনি থাকতেন স্বগ্রামে। মন্দির-নির্মাণকারিণী ভক্ত-বিধবা রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতেনঃ 'বাবা, তুমি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া কর না। তোমার জন্যে ভাল করে রান্না করে দেবার জন্য মাকে এখানে আনিয়ে নাও না কেন?' সুতরাং প্রসন্নচিত্তে মা আবার ফিরে আসতেন নহবতের বারান্দায় খোলা উনুনের পাশে।[১]

পরবর্তীকালে শুধু স্বামীর জন্য খাবার তৈরী করা নয়, তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার, কাছে বসে খাওয়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তিনি। তবু বালিকাসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করতে পারেননি, মুখখানি সর্বদা ঘোমটায় ঢেকে রাখতেন তিনি।

এক রাত্রের কথা তিনি আমাদের কাছে বলেছিলেন। সেদিন এক ব্রাহ্মণ ভক্ত-মহিলার সঙ্গে তিনি ঠাকুরের ঘরে খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুর ঈশ্বরীয়-প্রসঙ্গ শুরু করলেন। সারারাত ধরে তা চলল—কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গিয়েছিল তার হুঁশ ছিল না কারও। মা বললেনঃ 'যখন ভোরের আলো ফুটল তখন দেখি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি—মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে। তাঁর সেই অপূর্ব কথার যাদুতে এমনই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। দিনের আলোয় চেতনা ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে নহবতে ছুটে পালালাম।'

নহবতে তাঁর জীবন একান্ত সরল ও অনাড়ম্বর। রাত তিনটে কি চারটে, অন্য কেউ ওঠার আগে বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি গঙ্গাস্নানে যেতেন। এবং রাত্রের শেষ শান্ত প্রহরটি অতিবাহিত করতেন ঈশ্বরধ্যানে। আমাকে একজন বলেছিলেনঃ 'মা কখনও ধ্যান করেন না।'—কিন্তু আমি জানতুম, তা কখনও সত্য হতে পারে না। এক-দিন কথাবার্তার মধ্যে তিনি চাপা মৃদুস্বরে বলেছিলেন, তাঁর ধ্যানের বিশেষ সময়টি হল প্রত্যূষে—চারটে থেকে ছটার মধ্যে। ভারতীয় নারী সব বিষয়ে খোলামেলা কথা বলে থাকেন—কেবল বলেন না সেই পবিত্র গোপন ক্ষণটির কথা যা নিবেদিত ঈশ্বরকে। সেটি তিনি রাখেন পবিত্র মন্ত্রের মতো একান্ত সঙ্গোপনে।

ঠাকুরের জন্য রান্না এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আগত ভক্তবৃন্দের দেখাশোনা করা—তাঁর সারাদিন পূর্ণ হয়ে থাকত এইসব কাজে। কিভাবে তাঁর রাত্রি কাটত, তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় জনৈক ভক্তের কথায়। ঠাকুরের প্রতি ঐ ভক্তটির বিশ্বাস একবার ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হয়েছিল। এক পরিচারিকার মুখে গালগল্প শুনে তাঁর মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে ; মন্দির সংলগ্ন বাগানে আত্মগোপন করে তিনি ঠাকুরের উপর নজর রাখেন। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত রাত্রি। ঠিক মধ্যরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দরজা খুলে গেল—তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে নহবতের দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন—তারপর নহবত অতিক্রম করে পঞ্চবটীতে তাঁর অভ্যস্ত ধ্যানের জায়গাটিতে গিয়ে বসলেন। আত্মগ্লানিতে অস্থির ভক্তটি ছুটে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আছড়ে পড়ে নিজের মূঢ় সংশয়ের কথা প্রকাশ করলেন। স্নিগ্ধ মধুর হেসে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ 'তোদের মায়ের ওখানে গিয়ে কি হবে রে? এই মুহূর্তে সে কি আর এ-জগতে আছে? তার মন এখন এই জগতের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। আসার সময় দেখিসনি, ওপরের বারান্দায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আছে সে?'

মায়ের চাহিদা বলতে কিছু ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগীদের মধ্যে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল। তারা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভাল চাল, ডাল এবং অন্যান্য জিনিস প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসত তাঁর কাছে। একবার একজন একটি বালিশের মধ্যে সেলাই করে দশ হাজার টাকা নিয়ে এল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ 'ও-জিনিস আমার চাই না। কি করব আমি ওসব নিয়ে। তোমাদের মায়ের কাছে নিয়ে যাও।' সেই প্রসঙ্গে মা বলেছেনঃ 'লোকটি আমার কাছে টাকা নিয়ে এল ; সঙ্গে ঠাকুরও এলেন। যেন আমাকে পরীক্ষা করতেই তিনি বললেন, "টাকাটা নিয়ে নাও না কেন? ওতে তুমি জড়োয়া, গয়না কিনতে পারবে, যা কোনদিন পাওনি।" আমি বললাম, "সোনাদানা নিয়ে আমি কি করব? ওসব আমার চাই না।"' লোকটিকে টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হল।

একবার স্থির হল, আলোবাতাসহীন পর্দাঘেরা নহবতের চেয়ে খোলামেলা একটি জায়গায় মা যাতে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একজন ভক্ত ঘর তৈরীর জন্য দুটি পুরো গাছের কাঠ দিলেন। বড় বড় ভারী গাছের গুঁড়িগুলি গঙ্গার ঘাটে এসে ভিড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে হৃদয়কে মা পরামর্শ দিলেন, সেগুলি ঘাটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখতে। হৃদয় কিন্তু বাইরের দিকের কাঠই কেবল বাঁধলেন। তার ফলে রাত্রে জোয়ার এসে ভিতরের কাঠ মাঝগঙ্গায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পরদিন সকালে মহা চাঞ্চল্য, কারণ গাছ দুটির দাম পাঁচশো টাকা। হৃদয় উলটে মাকে ধমক দিতে লাগলেন, তাঁরই দুর্ভাগ্যে এই দুর্বিপাক! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে মাঝগঙ্গা থেকে কাঠ ফিরিয়ে আনতে পাঠালেন। তারপর গুঁড়ি দুটিকে চেরাই করে মন্দির-সংলগ্ন পল্লীতে মায়ের জন্য একটি ছোট বাড়ি করে দেওয়া হল।

এসব ঘটনার বহুদিন পরে আমি মাতৃসান্নিধ্যে গিয়েছি। দক্ষিণেশ্বর তারই মধ্যে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে ভক্তের দল আসেন ঠাকুরের উপস্থিতির সুবাস-টুকুর রেশ বুকভরে গ্রহণ করতে। মা তখন বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের তৈরী করা কলকাতার একটি বাড়িতে। সে-বাড়ির দোতলায় তিনি থাকতেন। সঙ্গে থাকতেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী কয়েকজন মহিলা।

অন্য সকলের মতোই সেখানে তিনি থাকতেন। সবার সঙ্গে একইভাবে গৃহস্থালির কাজকর্ম করতেন। কোথাও নিজেকে আলাদা করে রাখার কোন চেষ্টা তাঁর ছিল না। শুধু পার্থক্য ছিল তাঁর অধিকতর নম্রতায়, অধিকতর মধুরতায় এবং বিনতিতে। এক-দিনের কথা মনে আছে। দেখেছিলাম, গ্রাম থেকে আগত এক ব্রাহ্মণকে গভীর ভক্তিতে তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করছিলেন। কারণ আর কিছু নয়, ব্রাহ্মণটি ছিলেন এক গ্রাম্য পুরোহিত অথবা কুলগুরু জাতীয় কেউ। তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণে তাঁকে অত্যন্ত সাধারণ কেউ বলে মনে হত। সংসারের সবকিছুর মধ্যে নিজেকে এমনিভাবে সম্পূর্ণ আড়ালে তিনি ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহজতার অবগুণ্ঠনতলে বিরাজিত ছিল রাজরাজেশ্বরীর মহিমা, যা অভিভূত করত হৃদয়কে এবং নত করে দিত অপরকে তাঁর চরণপ্রান্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে। তাঁর অন্তরের দৈবী-চেতনার আলোককে গোপন করার পক্ষে তাঁর মানবীয় বাহ্যিক আবরণটি ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। তিনি কখনও ধর্মশিক্ষা দিতেন না ; উপদেশ দিয়েছেন কদাচিৎ। তাঁর ছিল শুধু জীবন—যাপিত জীবন। সেই পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত কত মানুষের জীবনকে নির্মল ও উর্ধ্বায়িত করেছে, কে তার ইয়ত্তা করবে?

দোতলার যে-ঘরে তিনি থাকতেন, তার লাগোয়া একটি বড় ঘর ছিল। সেটি ছিল সকলের বৈঠকখানা—গল্প, কথাবলার জায়গা। তার একপ্রান্তে পূজার ঘর। কিন্তু উভয় ঘরের মধ্যে কোনও ভেদরেখার প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেখানে যাঁরা থাকতেন তাঁদের জীবনে দ্বিতীয় কোন সঙ্গীর অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন তাঁদের একান্ত সঙ্গী-সহচর। স্বাভাবিকভাবেই দিবারাত্র তাঁর চরণাশ্রয়েই কাটাতেন তাঁরা। সকাল থেকেই শুরু হত ভক্তদের আসা-যাওয়া। তাঁরা এসে প্রথমে ঠাকুরঘরের সামনে প্রণাম করতেন, তারপর ফুল-ফল বেদীর পাশে রাখতেন। তারপর প্রণাম করতেন মাতাঠাকুরানীকে, এবং তাঁর নির্দেশমতো কাছে বসতেন। সেখানে কয়েকজন তরুণ ছিলেন যাঁরা মায়ের আশীর্বাদ না নিয়ে কখনও প্রাত্যহিক কাজ আরম্ভ করতেন

না। এঁদের প্রতি মায়ের বিশেষ স্নেহ। এঁরা যে তাঁরই হাতে, কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছেন।

তাঁকে ঘিরে থাকত আনন্দ-স্নিগ্ধ এক মধুরতা। সেইসঙ্গে ছিল এমন প্রচ্ছন্ন রস-বোধ যে, তাঁর সঙ্গে যে-কোনও বিষয়ে আলাপ করা যেত। তুচ্ছতম বিষয়েও তাঁর কৌতূহল। তাঁর সঙ্গে থাকত আটবছরের ভাইঝি রাধু—তার মতোই শিশুর খেলায়, রঙ্গে, তিনি মেতে উঠতে পারতেন। একবার আমি রাধুর জন্য ইংরেজী দোকান থেকে 'বাক্সের মধ্যে জ্যাক' (জ্যাক ইন দী বক্স) খেলনাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটি নিয়ে তাঁর খুশীর দৃশ্যটি আমি এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। যতবার পুতুলটি শব্দ করে বাক্স থেকে লাফিয়ে উঠেছে ততবারই তিনি শব্দটির নকল করে হেসে লুটিয়ে পড়েছেন।

আর একদিন আমি গিয়ে দেখি তিনি কাচের পুঁতির মালা গাঁথছেন। রাধুই কারণটা জানালঃ 'মন্দিরের ঠাকুর-দেবতার মতো আমার গোপালের যে কোনও গয়না নেই!' কিন্তু মায়ের কাজে কোন ছলনা ছিল না। এই ছোট্ট খেলনা-পুতুলটিকেই তিনি ভগবানের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন, এবং যেমন করে একজন ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী শিশু যীশুর জন্মদিনে তাঁকে আচ্ছাদনে ভূষিত করেন তেমনি করেই তিনি সেটিকে আভরণে ভূষিত করছিলেন।

শ্রীমা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর সত্তা আজও আমাদের সতত রক্ষা করছে। তিনি চলে যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম এই শেষ চিঠিখানিঃ

আদরের কন্যা আমার,

তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। অনেকদিন পরে তোমার একখানি পত্র পাইলাম। শ্রীমান বসন্ত (স্বামী পরমানন্দ) এবং তুমি কুশলে আছ জানিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি আমার কন্যা। আবার তুমিই আমার মাতা, কারণ তুমি আমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ। বসন্তকে আমার আশীর্বাদ জানাইও। তোমাকেও আমার আশীর্বাদ। সকলের জন্যেই আমার আশীর্বাদ। বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) শরীর যাওয়াতে আমি কী পরিমাণ দুঃখ পাইয়াছি তাহা পত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বসন্তের কাজকর্ম ভাল চলিতেছে জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক কাজের চাপে তাহার এখানে আসা হইতেছে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি, যখন সম্ভব হইবে সে আসিবার চেষ্টা করিবে। মঠে যাহারা আছে তাহাদের সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইও। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সকলকে তাঁহার যোগ্য সন্তান করিয়া তুলুন—এই আমার প্রার্থনা। তোমার কুশল সংবাদ দিও। চিঠি দিবে।

ইতি,
আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে বাস করার দুর্লভ সৌভাগ্য যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা জেনেছেন, ধর্ম কত মধুর, কত স্বাভাবিক, কত আনন্দময় সামগ্রী। তাঁরা জেনেছেন সেই শুচিতা

ও আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। তাঁরা জেনেছেন, পবিত্রতা যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ধরা দেয় এমন সুরভি-সুবাস, যা জড়বাদী স্বার্থপরতার কটু গন্ধ ও ক্লেদকে পরাভূত করে নিঃশেষে বিনষ্ট করে দেয়। করুণা, ভক্তি এবং ঈশ্বরানুভূতি—এই ছিল শ্রীমার সহজাত স্বভাব। কিন্তু এতই সহজ স্বাভাবিক ছিল যে লোকের কাছে সেগুলি আলাদা-ভাবে ধরা পড়ত না। তাঁর প্রাণজুড়ানো আশীর্বচনের একটি শব্দ. কিংবা ক্ষণেক স্পর্শের মধ্যে এই গুণগুলির অস্তিত্ব অনুভূত হত।

বিস্তীর্ণ জলাশয় বা প্রবহমান নদীর মতো তাঁদের জীবন। সূর্যরশ্মি তার জল-কণাকে শোষণ করে, তারপর তা আবার বর্ষণরূপে ফিরে আসে পৃথিবীকে সতেজ করবার জন্য। তাঁদের পার্থিব দেহ আমাদের সামনে থেকে সরে যায়। কিন্তু আমাদের ক্লান্ত স্তিমিত হৃদয়কে নবপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত করতে, আমাদের নতুন আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে, আমাদের জীবনে উদ্দেশ্যের নতুন শক্তি ও রূপ উন্মোচন করতে তাঁদের পুণ্যপ্রভাব নিত্য বর্তমান।[২]

অনুবাদঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ভগিনী সুনন্দাদেবী

মাদ্রাজের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনিই পথিকৃৎ—স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে দক্ষিণ ভারতে পাঠিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ শুরু করবার জন্য। সেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি ডঃ পি. বেঙ্কটরঙ্গমকে (আমার পিতৃদেবকে) একটি চিঠি লিখে জানালেন যে, জগজ্জননী সারদাদেবী ব্যাঙ্গালোরে আসতে সম্মত হয়েছেন এবং তাঁর ও তাঁর সঙ্গের আরও দশজনের সেখানে থাকবার সব ব্যবস্থা যেন করা হয়।* মহীশূর রাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে ডঃ বেঙ্কটরঙ্গম ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোক্তা (এবং স্তম্ভস্বরূপ)।

শ্রীশ্রীমা এলেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। বাসভনগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ঠাকুরঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল। মনে আছে, শ্রীমা ব্যাঙ্গালোরে এসে-ছিলেন কোন এক শুক্রবার এবং ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে গিয়েছিলেন কোন এক সোমবারে। তাঁর উপস্থিতিতে বহু লোকের ভিড় হত। তাঁরা সকলেই তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতেন। ডঃ পি. বেঙ্কটরঙ্গম তাঁর স্ত্রীকে একদিন আশ্রমে পাঠালেন। সঙ্গে একটা চিঠি দিয়ে আশ্রমের স্বামীজীকে অনুরোধ করলেন, তাঁর স্ত্রীকে যেন শ্রীমার দর্শন-লাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আমিও আমার মায়ের সঙ্গে ছিলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে, শ্রীমা এবং আমার মায়ের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল। আমার

মা বাংলা জানতেন না, শ্রীমাও তামিল জানতেন না। তবুও দুজনেই বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে গেলেন. মাঝে মাঝে হাসিকৌতুকও করছিলেন। যেভাবে তাঁরা কথা বলছিলেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, দুজনেই দুজনের কথা বুঝতে পারছেন--ভাষার বাধাটা তাঁদের কাছে কোন সমস্যা নয়। একদিন এই রকম কথাবার্তার মাঝে আমার মা-বাবা প্রস্তাব করলেন. আমাকে এবং আমার বোনকে তাঁরা শ্রীমায়ের সেবায় উৎসর্গ করতে চান। উত্তরে শ্রীমা বললেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পক্ষে আমরা তখন খুবই অল্পবয়স্ক; আমরা যখন বড় হব তখন যেন তাঁর কাছে আসি। আমার তখন মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়স। শ্রীমায়ের কাজে (অর্থাৎ সন্ন্যাসিনীর জীবন বরণ করবার জন্য) নিজেদের উৎসর্গ করবার জন্য আমি এবং আমার মেজবোন কলকাতা যাত্রা করতে পেরেছিলাম ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর। সঙ্গে ছিলেন আমার মাসতুতো [?] বোন এবং স্বর্গত এম. রাজাগোপাল নাইডু। কলকাতায় পৌঁছে অবশ্য হতাশ হতে হল। শুনলাম শ্রীমা স্থান-পরিবর্তনের জন্য জয়রামবাটী গেছেন। মনে সত্যিই একটা ধাক্কা খেলাম।

এই প্রসঙ্গে, একটি দূর-প্রদেশে নতুন পরিবেশে আমাদের প্রথম প্রথম কিরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল. তা বর্ণনা করা অসঙ্গত হবে না। আমরা সেখানকার ভাষা জানতাম না। রেলস্টেশন থেকে সোজা উদ্বোধন পৌঁছেছিলাম। তখন বিকেলবেলা। প্রথমেই যাঁর সঙ্গে দেখা হল, তিনি হলেন স্বামী সারদানন্দ। আমরা যতদিন কলকাতায় ছিলাম, তিনিই ছিলেন আমাদের অভিভাবক। কলকাতায় থাকবার দ্বিতীয় দিন আমরা বেলুড় মঠ গেলাম। যখন বেলুড় মঠ দর্শন করতে গিয়েছিলাম. স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠে ছিলেন না। আমরা স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাদের নতুন জীবনে প্রবেশের জন্য অনেক উপদেশ ও উৎসাহ দিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আমরা ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারতাম না। নতুন জায়গায় অপরিচিতির অস্বস্তি এবং বাড়ির জন্য মন-কেমন-করা --এই দুয়ের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য নিবেদিতা স্কুল এবং শ্রীসারদা মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষা ভগিনী সুধীরা সন্ধ্যাবেলাগুলি আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। তিনি ইংরেজী জানতেন. আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। আমাদের বাংলা না জানার ফলে অনিবার্য-ভাবেই আমরা যেন শিশুদের 'সরাসরি পদ্ধতিতে' ইংরেজী শেখানোর দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম। দু-তিন মাসের মধ্যেই আমরা বাংলা শিখে ফেললাম। ভাষার ব্যাপারে আর কোন সমস্যা রইল না।

শ্রীমায়ের দেখা পাওয়ার আগে এই দু-তিন মাস অতিক্রান্ত হবে -এটি সম্ভবত দৈবনির্দিষ্টই ছিল। কারণ. আমরা যদি এর আগেই তাঁর দর্শন পেতাম. তাহলে আমাদের দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলতে হত, এবং আমরা মন খুলে কথা বলতে পারতাম না। আমাদের কলকাতা পৌঁছানো এবং জয়রামবাটী থেকে ফেরার পরে শ্রীমায়ের সাক্ষাৎ লাভ--এই দুয়ের মাঝে আমরা যথেষ্ট সময় পেয়ে গিয়েছিলাম

বাংলা শেখার জন্য। যখন তাঁর দর্শন পেলাম, তখন তিনি প্রথমেই যে-কথাগুলি আমাদের বললেন, তা হলঃ 'মা, আমি তোমাদের জন্য জয়রামবাটীতে অপেক্ষা করছিলাম। তোমরা এলে না বলে আমি নিজে তোমাদের কাছে এসেছি।' মাতৃস্নেহে ভরপুর এই কথাগুলি আমাদের প্রাণে শিহরণ জাগাল। যেটুকু অপরিচয়ের ভাব অবশিষ্ট ছিল, তা-ও চলে গেল।

মাতৃমন্দির থেকে উদ্বোধন হেঁটে যাওয়া যেত। আমরা প্রায়ই মাতৃমন্দিরের অন্য-দের সঙ্গে গিয়ে শ্রীমাকে দর্শন করতাম। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে গিয়ে যতটা কায়িক সেবা তাঁকে করতে পারি, করতাম। আমার পরম সৌভাগ্য, আমাকে বলা হয়েছিল, প্রতিদিন সকাল প্রায় নটা নাগাদ মা যখন স্নান করতে যেতেন, তার আগে তাঁর গায়ে-মাথায় তেল মাখিয়ে দিতে। এই সময় অনেক পাকা চুল তাঁর মাথা থেকে খসে পড়ত। আমি কখনও সেগুলি ফেলে দিতাম না। ছোটছোট গোছা করে সংগ্রহ করে আমি সেগুলি শাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে রাখতাম। মা একদিন আমাকে ওরকম করতে দেখে ফেললেন। হেসে বললেন যে, তাঁর কত চুল উঠে গেছে, তিনি সেসব ফেলে দিয়েছেন। আমি তাঁর চুল রেখে দিতে আগ্রহী জানলে, তিনি সেসব চুল আমাকেই দিতেন।

একদিন সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় শ্রীমাকে দর্শন করবার জন্য আমাদের ডাকা হল। তিনি আমাদের বললেন, তাঁর সামনে তামিল ভাষায় কথা বলতে। আমাদের কয়েকটা তামিল গান গাইতেও বললেন। গান শুনে মা খুব খুশী হয়ে আনন্দে হাসতে লাগলেন। আর এক দিন আমরা যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছি, তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন রাধুর জন্য কিছুটা দক্ষিণ ভারতের 'রসম' তৈরী করে পাঠাতে। আমরা তাড়াতাড়ি 'রসম' তৈরী করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। আর একটা দক্ষিণ ভারতীয় রান্না তিনি খেতে চেয়েছিলেন—সেটি হল 'রাইস-আপ্পালমস্'। আমার বাবা এটি তৈরী করিয়ে রেলওয়ে পার্সেল করে ব্যাঙ্গালোর থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মা খেয়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পেতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রেলওয়ে পার্সেলে এসেছে বলে কয়েকজন প্রাচীনপন্থী মহিলা মাকে তা খেতে দিলেন না।

একবার এক মেঘলা দিনে, আমি উদ্বোধনে গিয়েছিলাম মাকে প্রণাম করতে। তিনি সাদরে আমাকে গ্রহণ করলেন। আমি তখন প্রায়ই শূলবেদনায় ভুগতাম বলে তিনি সেদিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। আকাশে মেঘ ছিল—সেদিনকার আবহাওয়ার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়ার মিল ছিল। মা সেটি লক্ষ্য করে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়াও কি সেই রকম নয়? তার পরে বললেন, ব্যাঙ্গালোর তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। সেখানকার লোকের প্রশংসা করে মা বললেন, তাদের খুব ভক্তি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃমন্দিরের মেয়েদের তীর্থভ্রমণের জন্য বেনারসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়ে আমি শূলবেদনায় ভুগেছিলাম। আমরা ফিরে আসার কিছু পরেই মা সেই খবর পেলেন। যে-মেয়েরা তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল, তাদের একজনের কাছে মা আমার

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজখবর করলেন এবং তিন-চারটে কমলালেবু খাবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এরকমই ছিল তাঁর মাতৃহৃদয়!

শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে ফিরেছিলেন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। তারপর যখন তাঁর কাছে দীক্ষার কথা তুলেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, পরদিনই দীক্ষা দেবেন। কিন্তু আরও একটি মেয়ে বহুদিন ধরে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী ছিল। সে তখন মাতৃমন্দিরের অন্যান্য আবাসিকদের সঙ্গে খাসী-পাহাড় অঞ্চলে গিয়েছিল। তার জন্য আমার দীক্ষার দিনও স্থগিত থেকে গিয়েছিল। অবশেষে সেই পবিত্র অবিস্মরণীয় দিনটি এল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। সেদিন ছিল রথযাত্রা। আমার সঙ্গে মাতৃমন্দিরের আরও তিনজন দীক্ষালাভ করল শ্রীমার কাছ থেকে। আমরা গঙ্গাস্নান করে নতুন কাপড় পরে উদ্বোধন গিয়েছিলাম সকাল প্রায় আটটার সময়। আমাদের সঙ্গে আরও দীক্ষার্থী ছিল এবং সকলের দীক্ষা সকাল দশটার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। মা এক এক করে নাম ধরে ডেকে নিয়ে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। দীক্ষা দেওয়ার পর মা প্রাতরাশ করলেন এবং মায়ের প্রসাদ আমাদের সকলকে দেওয়া হল। প্রসাদ নেওয়ার আগে, আমরা যারা দীক্ষা নিয়েছিলাম তারা সবাই মায়ের শ্রীচরণে ফুল দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম। আমরা তারপর মাতৃমন্দিরে ফিরে এলাম। দুপুরের আহারের জন্য আবার উদ্বোধনে গেলাম।

একদিন আমার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, মায়ের কাছ থেকে বিশেষ কোন কৃপা পেতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলা মাকে প্রণাম করতে গেলাম। যারা উপস্থিত ছিল, তাদের সবাইকে শ্রীমা সেদিন কিছুটা সন্দেশ-প্রসাদ ভাগ করে দিলেন। যখন আমার পালা এল, তাঁর হাত থেকে ফসকে প্রসাদ তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ল। তিনি সেটি তাঁর পা থেকে তুলে নিয়ে আমাকে দিলেন। আমি এই ঘটনাকে মায়ের বিশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। মায়ের এই মাতৃস্নেহের নিদর্শন আরও একদিন পেয়েছিলাম। সেদিন গঙ্গাস্নান করে সোজা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। চুল ভিজে ছিল। মা স্নেহস্নিগ্ধ-ভাবে বললেন যে, আমি চুল না শুকিয়ে ঐভাবে থাকলে আমার সর্দি লেগে যাবে। তিনি আমার চুল খুলে দিলেন যাতে শুকোতে পারে। আর একদিন আমার ইচ্ছে হল প্রাতরাশ করার আগেই মায়ের দেখা পেতে। উদ্দেশ্য মাতৃদর্শনের পূর্ণ আধ্যাত্মিক ফল লাভ। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, মা প্রথমেই যে-প্রশ্নটি করলেন সেটি হচ্ছে, আমি সকালের খাবার খেয়ে এসেছি কিনা। তিনি আমাকে কিছু প্রসাদ দিলেন; তারপর আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। একদিন মা তাঁর নীলচে সবুজ রঙের শালটি সেলাই করবার জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেলাই করবার সময় একটা তিনকোনা টুকরো বাড়তি হয়ে যাওয়ায় কেটে ফেলার প্রয়োজন হল। শালটাকে সেই অনুযায়ী ছেঁটে ঠিক করা হল। মায়ের আশীর্বাদের নিদর্শন-স্বরূপ ঐ টুকরোটি এখনও সযত্নে রাখা আছে।

আমরা দু-বছরের বেশী হল বাড়ি ছেড়ে এসেছি। স্বামী সারদানন্দের মনে হল, স্থান-পরিবর্তনের জন্য আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। যাবার জন্য সব ব্যবস্থা করা হল। আমাদের যদিও অনিচ্ছাই ছিল, তবুও আমরা তখন বয়োজ্যেষ্ঠদের উপদেশ অনুযায়ীই চলতাম। যাত্রার দিন মায়ের কাছে গেলাম তাঁর আশীর্বাদ নিতে। তিনি

শুধু আমাদের আশীর্বাদই করলেন না, আমাদের কিছু মিছরি এবং ঠাকুরের নির্মাল্য দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে।

ব্যাংগালোরে আমরা মাত্র কুড়ি দিন ছিলাম। কারণ, খবর পেলাম যে, মা গুরুতর অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। আমরা তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফেরবার জন্য যাত্রা করলাম। কলকাতা পেঁছেই মায়ের কাছে গেলাম তাঁকে প্রণাম করতে। মা শয্যাশায়ী হলেও অত্যন্ত সজাগ। আমাদের ওখানকার সকলের খোঁজখবর করলেন তিনি। মায়ের স্বাস্থ্য দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে শুরু করল এবং তাঁকে সব সময় দেখাশুনো করার জন্য একজন সেবিকার প্রয়োজন হল। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (সরলা দেবী) মায়ের সেবাশুশ্রূষার ভাব গ্রহণ করলেন। ইনি বিশেষ যত্নসহকারে ধাত্রীবিদ্যা শিখেছিলেন। মাতৃমন্দিরে আমাদের সংগে একই ঘরে থাকতেন ইনি। মাতৃমন্দিরের মেয়েদের পালা-করে মায়ের কাছে রাত্রি জাগার জন্য এবং তাঁর সেবা করার জন্য নিয়োগ করা হল। আমার সময় ছিল রাত দুটো থেকে ভোর চারটে। সেবার জন্য যাকে পাঠানো হত, মা তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি আমাকে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে হাত বোলাতে বলতেন। আমরা সব সময় খুব সতর্ক থাকতাম। কারণ, সামান্য একটু শব্দ হলেই পাশের ঘর থেকে স্বামী সারদানন্দের গলা শোনা যাবে, তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন, কি হয়েছে। এরকম এক রাতে, মায়ের একটু বিকারের মতো হয়েছিল। কখনও বলছেন বেলুড় মঠে যাবেন, কখনও বা বলছেন ব্যাঙ্গালোরে। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললামঃ সেরে উঠুন, তারপর ঐসব জায়গায় যাবেন। এই শুনে তিনি শান্ত হয়ে গেলেন। মা মশারির মধ্যে শুয়ে থাকতেন বলে আমি মশারির ভেতরে ঢুকে মায়ের সেবা করতাম। বহুবার আমাকে তিনি বলেছেন, তাঁরই সংগে মাদুরে শুয়ে পড়তে। (যখন তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁকে খাট থেকে মেঝেতে মাদুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।) যদিও এটা একটা মহাসুযোগ ছিল, তবুও সব সময়ই আমি ইতস্তত করতাম এবং মনে মনে খুব ভয় পেয়ে যেতাম। আমার সৌভাগ্য যে, প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার সঙ্গে একই ঘরে থাকতে পেরেছিলাম। মায়ের সেবা ও শুশ্রূষা করতেন বলে তিনি মায়ের নখ-কাটার সুযোগও পেতেন; সুযোগ পেতেন তাঁর গা-হাত-পা টিপে দেবারও। এই নখ-কাটা এবং গা-হাত-পা টিপে দেবার সুবাদে তিনি মায়ের নখ, চুল ইত্যাদি সংগ্রহ করে রেখে দিতেন। ভারতীপ্রাণার সংগ্রহে মায়ের যে নখ, চুল ইত্যাদি ছিল, সেগুলি তিনি, যখনই আমি অনুরোধ করেছি, তৎক্ষণাৎ আমায় দিয়ে দিয়েছেন। সেই পবিত্র স্মারক বস্তুগুলি বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের মাতৃমন্দিরে পূজিত হয়। মায়ের সেবাশুশ্রূষা করবার সময় একবার তাঁর পুরানো একটা শাড়ী ব্যাজ (ব্যান্ডেজ?) তৈরী করার জন্য ছিঁড়তে হয়। শাড়ীটা ছিঁড়ে টুকরো করতে বলা হয়েছিল আমাকে। শেষে পাড়-সহ একফালি কাপড় শুধু অবশিষ্ট ছিল। পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আমি সেটি রেখে দিয়েছিলাম। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা যখন ব্যাঙ্গালোরে এসেছিলেন, তখন তাঁর যে পায়ের ছাপ নেওয়া হয়েছিল, সেটিও [ব্যাঙ্গালোরের] মায়ের মন্দিরে সুরক্ষিত আছে।

শ্রীমায়ের অবস্থা দিনের পর দিন, খুব দ্রুতগতিতে, খারাপ হয়ে চলল। মহা-সমাধির তিনদিন আগে থেকে আমাদের আর তাঁর সঙ্গে থাকতে দেওয়া হল না।

আমরা শুধু তাঁকে দর্শন করে মাতৃমন্দিরে ফিরে আসতাম। অবশেষে একদিন ভোর-বেলা গোলাপ-মা এসে আমার কানে কানে বললেনঃ অবশ্যম্ভাবী মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে গেছে। অতঃপর মহাসমাধিতে মগ্ন শ্রীমায়ের স্নিগ্ধ মুখশ্রী আমরা দেখলাম। তাঁর নশ্বর দেহ এরপর বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হল। আমরাও বেলুড় মঠে রওনা হলাম। মাকে স্নান করানোর ভার আমাদের দেওয়া হল। স্নান করানো শেষ হলে, মায়ের দেহ চিতায় শুইয়ে অগ্নিসংযোগ করা হল। তাঁর সব 'মেয়ে'ই সুযোগ পেলেন চিতায় ঘি এবং অন্যান্য উপকরণ ঢালতে। যখন ঘি ইত্যাদি ঢালছি, তখন চিতার আগুনের শিখা আমার হাত ছুঁয়ে গেল। মায়ের সেই অন্তিম স্পর্শ আমি দীর্ঘকাল অনুভব করেছি। তাঁর সব 'মেয়ে'ই উপবাস করেছিলেন—এই ধরনের উপলক্ষে যা করতে হয়। আমরা দিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতাম। রাতটা কিছু ফল খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। শ্রীমায়ের যে পুণ্য সান্নিধ্য আমি লাভ করেছিলাম, স্থূল জগতে এইভাবে তার পরি-সমাপ্তি হল।

শ্রীমায়ের কাছে রোজ যখন যেতাম, তখন একদিন খুব স্নেহভরে তিনি আমায় বলেছিলেন, অন্তত একবারের জন্য জয়রামবাটী দেখে আসতে। মায়ের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। কুড়ি দিন সেখানে ছিলাম। খুব আনন্দে অতিবাহিত হয়েছিল দিনগুলি।[২]

অনুবাদঃ ব্রহ্মচারী পবিত্রচৈতন্য

বিবিধ

'কৈলাসের ভগবতী'

'ভূপেন্দ্রকুমার বসু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দশ বৎসর প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোমোহন মিত্রের গৃহে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেন। ভূপেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "যখন শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিতেন, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে (মনোমোহনবাবু আমাদের) অনুরোধ করিতেন। তিনি বলিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করা হইল। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিলে তিনি প্রায়ই তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতে যাইতেন। কখনও কখনও শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার সিমলার বাড়িতে আনিয়া পরিবারের সকলকে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ বন্দনা করিবার সুযোগ দিতেন।"

'মনোমোহন সময় সময় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটীতে কোন কোন ভক্তকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কৃপালাভ করিতে পাঠাইতেন। একবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন তিনি জনৈকা স্ত্রীভক্তকে নিম্নলিখিত পত্রসহ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীপদ ভরসা

শ্রীচরণকমলেষু

মা,

প্রণতিপূর্বক নিবেদনমিদম্, ঠাকুর বলিতেন, "জ্ঞানবিচারে ধিক্"—যতই জ্ঞান-বিচারের আলোচনা করি ততই দেখি তোমার শ্রীপাদপদ্ম হইতে দূরে পড়িতেছি। 'আমরা ঠাকুরের দাস—চিরকাল বলিব, অসম্ভব তোমাতে সম্ভবে। তুমি কেন একজনকে মায়াপাশে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখ—আর কেনই বা একজনকে মুহূর্তকাল মধ্যে মায়াপাশ হইতে উন্মুক্ত করিয়া তোমার ভাবপ্রেমের অনুরাগী কর তাহা তুমিই জান। আমার তাহা জানিবার অধিকার নাই—ইচ্ছাও নাই। এইটি কেন হয়, ঐটি কেন হয় না, ইত্যাকার বিষয়বুদ্ধিতে বাজ পড়ুক। মা, (আমি) তোমার পাগল ছেলে; মনের আবেগে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম।

একটি অনুরোধ—বিশেষ অনুরোধ—পত্রবাহক পরম ভক্তিমতী রমণী—আমি ইঁহাকে মা বলিয়াছি—দয়া করিয়া তাঁহাকেও তোমার শান্তিময় শ্রীচরণে স্থান দিও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই রমণী তোমার আশ্রয়ে থাকিবার উপযুক্ত পাত্রী। মা তোমার জানিতে কিছু বাকি নাই।

ঠাকুরের কৃপায় অত্র সমস্ত মঙ্গল। মা, তোমাকে দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়—এখন কেমন আছ সবিশেষ লিখিয়া সুখী করিও। আশীর্বাদ কর,

ঠাকুর ঠাকুর করিয়া পাগল হইয়া যাই। সংসারের সুখ তো মর্মে মর্মে বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি সমস্তই অসার, কেবল ঠাকুরই একমাত্র সার বস্তু।

ইতি

১০।১০।০২ তোমার পাগল ছেলে

শুক্রবার, মহাষ্টমী। মনোমোহন

'মনোমোহন 'ভক্তগণকে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করিবার জন্য সদাই অনুপ্রাণিত করিতেন। মনোমোহন বলিতেন, কামারপুকুর ও জয়রামবাটী মহাতীর্থ। কামারপুকুর কিংবা জয়রামবাটী হইতে কোন লোক আসিলে তাহাদের পরম যত্ন-সহকারে আপ্যায়িত করিতেন। তিনি বলিতেন, কামারপুকুর ও জয়রামবাটী বাসীর দর্শনলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

'যোগোদ্যান, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। বহু ব্যক্তি উপস্থিত। শ্রীযুত তারকচন্দ্র দত্ত নামে রামচন্দ্রের জনৈক শিষ্যকে মনোমোহন বলিলেন, "ওরে তারক! ঠাকুরকে তো দেখিসনি। যদি দেখতিস তো বুঝতে পারতিস। ঠাকুরের কাছে নিত্যজীব-টীব ছিল না। তিনি বুঝতেন পতিত জীব, অজ্ঞান জীব, মায়ান্ধ জীব। যদি একবার তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতেন যে, এরা ভগবানকে আশ্রয় করতে চায়, তাহলে তাঁর কৃপার অফুরন্ত ভাণ্ডার আপনি উন্মুক্ত হয়ে যেত। তিনি নিজে তাঁকে কৃপা করতেন, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা তাঁকে পাইয়ে দিতেন এবং আধার শুদ্ধ হলে তাঁর ইষ্ট-দর্শনও করিয়ে দিতেন। কতভাবে যে কৃপা দেখাতেন তা বলে শেষ করতে পারি না।"

'১৩০৮ সালে যোগোদ্যানে পাকা নাটমন্দিরটি নির্মিত হইলে তিনি (মনোমোহন) উৎসবের সময় শ্রীশ্রীমাকে যোগোদ্যানে আনাইয়াছিলেন। সেইদিন শ্রীশ্রীমা নিজহাতে ঠাকুরের বেদীর সম্মুখে বসিয়া পূজা করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের পূজা দেখিয়া মনোমোহন যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তীকালে জনৈক ভক্তের নিকট বলেন; তিনি [সেই ভক্ত] আমাদের নিকট সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমা কৈলাসের ভগবতীরূপে সাক্ষাৎ মহাদেবের পূজা করিতেছেন। আর আমরা ভাবে প্রেমে আত্মহারা হইয়া সেই পূজা দেখিতেছি। শ্রীশ্রীমায়ের নিবেদনকালীন আর্তির কথা কি আর বলিব, আমরা সকলে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।" শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিতে নবনির্মিত নাটমন্দিরটি পূত ও পবিত্র হইয়া গেল।

'আর একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিয়াছি—সেদিন তিনি (মনোমোহন) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট বহুক্ষণ ছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাকালীন ধ্যানের সময় তিনি সহসা ধ্যানের মধ্যে মহালক্ষ্মীরূপে শ্রীশ্রীমাকে দেখিলেন। নিম্নে বর্ণনাটি দেওয়া হইল, "একখানি রত্নসিংহাসনের উপর শ্রীশ্রীমা বসিয়া আছেন, মায়ের দুপাশে দুজন কিশোরী চামর দুলাইতেছে। সিংহাসনখানির তলদেশে দুইটি হস্তী শুঁড় উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। মায়ের মাথায় স্বর্ণখচিত মুকুট, দেহ নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত. পরনে একখানি বিদ্যুৎপ্রভা উজ্জ্বল শাড়ী। এক হাতে বর, আর এক হাতে আশীর্বাদ, অধরে হাস্যরেখা, যেখানে যেখানে মায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে সেখানে স্তবকে স্তবকে পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা সেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে লেখা স্বামী বিমলানন্দের পত্রের উত্তরে শ্রীমায়ের মূল পত্রের ফটো।

[শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে]

শ্রীগ্‌ুরবে নম

জযবামবাটী

১৩০৯।১৫ই ভাদ্র

নিবাপদেষ্‌ু—

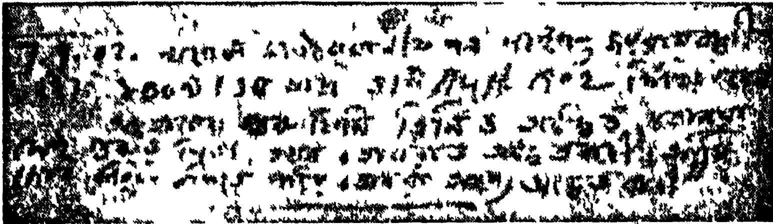
পরম শ্‌ুভাশীর্ব্বাদবিশেষ—

বাবাজী—১খান পত্র পাইযা জ্ঞাত আছি। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহাবাজেব জন্য যে কণ্ট হইতেছে লিখিযা কি জানাই। আমাদেব গ্‌ুব্‌ু জিনি [যিনি] তিনি ত অদ্বৈত। তোমবা সেই গ্‌ুব্‌ুব শিস্য [শিষ্য] তখন তোমবাও অদ্বৈতবাদী। আমি যোব [জোব] কবিযা বলিতে পারি তোমবা অবশ্য অদ্বৈতবাদী [।] মিসেস সেভিযাবকে আমাব ভালবাসার সহিত আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তোমবা সকলে আমাব আশীর্ব্বাদ জানিবে [।] কালীকৃষ্ণ তথায যাইবেক জানিযা মতিলালেব ১খান পত্র পাইযাছি [।] তাহাকে আমাব আশীর্ব্বাদ জানাইবে [।] মেযে মান্‌ুষেব মঠ*—মঠে সাবধানে থাকবে। আব স্বামীজীব যোব [জোব] নাই। আমবা সকলে ভাল আছি। তোমাদেব সংবাদ লিখিবে। ইতি

তোমাদেব মাতা

আশীর্ব্বাদিকা

মাযাবতী অদ্বৈত আশ্রমেব তৎকালীন অধ্যক্ষ এবং প্রব্‌ুদ্ধ ভাবত' পত্রিকাব সম্পাদক স্বামী স্বব্‌ুপানন্দেব ব্যক্তিগত ডাযেবীতে শ্রীমাযেব উপবোক্ত পত্রেব উল্লেখ পাওযা যায। তা থেকে জানা যায যে শ্রীমাযেব পত্রটি মাযাবতীতে স্বামী বিমলানন্দের হাতে পেশছেছিল ৭ সেপ্টেম্বব ১৯০২।



7 9 02 খগেন মাতাঠাকুবাণীব পত্র পাইল জযবামবাটী হইতে ১৩০৯।১৫ ভাদ্র 31st Augt 1902 লিখিযাছেন [:] আমাদের গ্‌ুব্‌ু যিনি তিনি ত অদ্বৈত [।] তোমবা সেই গ্‌ুব্‌ুব শিষ্য তখন তোমবাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোব কবিয়া বলিতে পারি তোমবা অবশ্য অদ্বৈতবাদী [।]"

---

* 'মেয়ে মান্‌ুষেব মঠ' কথাটি ম্‌ুলপত্রে পাশে লেখা আছে (ফটো দ্রষ্টব্য)। মিসেস সেভিযার মাযাবতী আশ্রমে থাকতেন। সম্ভবত সেকাবণেই শ্রীমা ঐকথা লিখেছিলেন। আমবা এই অন্‌ুমানের ভিত্তিতে কথাটিকে এখানে বসিযেছি।

সম্পাদক

চাহিলেন। আমার হৃদয়টি যেন পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পরের কথা আমার জানা নাই!" ' *

একটি ঐতিহাসিক পত্র

প্রতিচ্ছবিসহ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর যে-পত্রটি প্রকাশিত হল, সেটি আমাদের বিবেচনায় একটি ঐতিহাসিক পত্র। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এটির স্থান আছে। এই আন্দোলন ভারত ও পৃথিবীর ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে যেহেতু উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে, তাই এর ইতিহাসে যদি কোন রচনার বিশেষ মূল্য থাকে, তাহলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

পত্রলেখিকা কিন্তু লেখিকা হিসেবে কোনমতে বিখ্যাত নন। তিনি স্বহস্তে চিঠি লিখতেন না। ঠিকভাবে বলতে গেলে, তিনি লিখতেই পারতেন না। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'নিরক্ষর' স্বামীকেও অতিক্রম করেছেন।[১] 'নিরক্ষর' শ্রীরামকৃষ্ণ লিখতে জানতেন, এবং অতি সুছাঁদ ছিল তাঁর হস্তাক্ষর।

পত্রটির মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি থেকে পাঠক দেখবেন তাতে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এবং ভাষাও সুগঠিত নয়। পত্রটির বক্তব্য শ্রীশ্রীমা বলে গিয়েছিলেন, এবং সেবক বা সঙ্গিনীদের কেউ তা লিখে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, এর মধ্যে এমন কিছু বস্তু আছে যা বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

এই পত্র ইতিপূর্বে সম্পূর্ণত কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, যদিও এর প্রয়োজনীয় অংশ বহুদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত' স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত

* উদ্বোধন কার্যালয় থেকে ১৩৫১ সালে প্রকাশিত 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৫৭-৫৮, ২৭২-৭৩। মনোমোহন মিত্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী-ভক্ত।

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে শ্রীশ্রীমার লেখাপড়ার কিছু বিবরণ আছে। বিয়ের আগে নিজের পড়াশোনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলেছেনঃ 'ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ (জ্ঞাতিভাই) ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখনও কখনও যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম।' বিয়ের পরে লেখাপড়া সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ 'কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি "বর্ণপরিচয়" একটু একটু পড়তুম। ভাগ্নে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে ; বললে, "মেয়েমানুষের লেখা-পড়া শিখতে নেই ; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?" লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত; সে এসে আবার আমায় পড়াত।'

শ্রীশ্রীমার কথায় আরও জানা গেছে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আরও একটু ভাল করে শিখতে পেরেছিলেন। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে স্নান করতে এসে তাঁকে পড়িয়ে যেত; শ্রীশ্রীমা তাকে মাইনে-রূপে (বা গুরুদক্ষিণারূপে!) বাগানের শাক-পাতা দিতেন। 'এই বিদ্যাভ্যাসের ফলে তিনি রামায়ণাদি পড়িতে পারিতেন, কিন্তু লিখিতে বিশেষ পারিতেন না; এমনকি শেষ বয়সে নাম সহি পর্যন্ত করিতে পারিতেন না।'

হয়—তার মধ্যেই সম্ভবত পত্রটির প্রথম প্রকাশ্য উল্লেখ পাই। তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরী থেকে উক্ত পত্রের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী থেকে উক্ত অংশ নিয়েছেন, এবং 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে তা নিয়েছেন 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে। স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরী আমি স্বামী অব্জজানন্দের কাছে দেখবার সুযোগ পেয়েছি—সেখান থেকে উক্ত অংশ 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। স্বামীজীর শিষ্য খগেন অর্থাৎ স্বামী বিমলানন্দ শ্রীশ্রীমাকে এক পত্র লেখেন—তার উত্তরে শ্রীশ্রীমার ঐ পত্র। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২ তারিখে স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরীতে এ-বিষয়ে লেখা আছে : 'খগেন মাতাঠাকুরানীর পত্র পাইল, জয়রামবাটী হইতে, ১৩০৯, ১৫ ভাদ্র, ৩১ আগস্ট ১৯০২ :—লিখিয়াছেন—।' [শ্রীমায়ের পত্রের ফটোর অপরদিকে দ্রষ্টব্য।]

পত্রটির পটভূমিকা স্বামীজীর জীবনী-পাঠকের জানা আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে দারুণ বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্য দিয়ে নিতান্ত অসুস্থ শরীরে স্বামীজী দুর্গম মায়াবতীতে গিয়েছিলেন শোকার্ত মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে এবং নিজের একটি প্রিয় স্বপ্নের কিছু সার্থকতার রূপকে স্বচক্ষে দর্শন করতে। স্বামীজীর স্বপ্ন-কল্পনা অনুযায়ী মায়াবতীতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করেছিলেন—সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন, বিনা চিকিৎসায়—সে-মৃত্যু স্বামীজীর 'ভিশন'-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বামীজীর নানাপ্রকার 'ভিশন'-এর প্রধান একটিকে—বিশুদ্ধ অদ্বৈতকে সাধনা-রূপে গ্রহণ এবং ধর্মরূপে প্রচারের ব্রতকে গ্রহণ করেছিলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। অদ্বৈত আশ্রমের স্থাপনা সেইজন্যই। কোন্ বিরাট ও বিশুদ্ধ কল্পনায় স্বামীজী এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তা স্বামীজীর জীবনী-পাঠক জানেন—তাঁরা জানেন, ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এই দুই বিদেশীকে এবং স্বামী স্বরূপানন্দ নামক স্বদেশীয়কে একাজে সহায়ক পেয়ে স্বামীজী কতখানি উল্লসিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের পঞ্জরাস্থি দিয়ে মায়াবতীতে কোন্ অদ্বৈত-বজ্র নির্মিত হয়েছে তা-ই দেখার জন্য স্বামীজীর শেষ হিমালয়যাত্রা।

মায়াবতী স্বামীজীকে কতখানি আনন্দ দিয়েছিল, তা তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়—একটি ব্যাপার কতখানি আঘাত করেছিল, তা-ও পাই। অদ্বৈত আশ্রমের একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পট প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছিলেন—রামকৃষ্ণসঙ্ঘের একটি কেন্দ্র অন্তত থাক্ যেখানে বিশুদ্ধ নিরাকার অদ্বৈতের উপাসনা হবে। দূর হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম স্বামীজীর সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত কেন্দ্র—সেখানেও সাকার উপাসনা!! তদুপরি, আমার ধারণা, ঘটনাটিকে 'কথা-মতো কাজ না-করা' বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, তাঁরা অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ; প্রধান কর্মী স্বামী স্বরূপানন্দও তা-ই—সেই আশ্রমে, যেহেতু সেটি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, তার জোরে, সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীরা যদি সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করে দেন, তাহলে আদর্শরক্ষা তো হয়ই না, নেতার প্রতিশ্রুতি-রক্ষাও হয় না।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর তৃতীয় খণ্ড থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছিঃ

'কয়েকজন (অদ্বৈত) আশ্রমবাসীর একান্ত ইচ্ছায় একটি ঠাকুরঘর কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা হত। (মায়াবতীতে) উপস্থিত হবার পরে স্বামীজী একদিন সকালে সেই ঘরটি দেখতে পান—দেখেন যে, অদ্বৈত আশ্রমে রীতিমতো ঠাকুরঘর চালু হয়ে গেছে, ধূপ-ধুনো, ফুল-ফল দিয়ে দিব্যি ভোগ-পূজা চলছে। তখনই তিনি কোন কথা বলেননি ; কিন্তু সন্ধ্যায় সকলে যখন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছেন তখন তিনি অদ্বৈত আশ্রমের মতো জায়গায় ঠাকুরপূজা করার কঠোর সমালোচনা করলেন। বললেনঃ অত্যন্ত অনুচিত কাজ করা হয়েছে। অদ্বৈত আশ্রমে ধর্ম আচরিত হবে ব্যক্তিগতভাবে ; আশ্রমবাসীরা নিজস্ব ভাবে ধ্যানাদি করবেন, একক বা সমবেতভাবে শাস্ত্রচর্চা করবেন, তাঁরা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অদ্বৈতবাদের অনুশীলন করবেন ও তার শিক্ষা দেবেন—দ্বৈতবাদের দুর্বলতা বা নির্ভরতা থেকে একেবারে দূরে থাকবেন। অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রচারিত প্রসপেক-টাসে স্বামীজী স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন—এখানে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ অদ্বৈততত্ত্ব, সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্বলকর সংস্রব থেকে যা মুক্ত—কেবল তা-ই অনুশীলিত ও প্রচারিত হবে। অদ্বৈত আশ্রম একমাত্র অদ্বৈতের জন্যই উৎসর্গীকৃত। সুতরাং, স্বামীজী বললেন, এক্ষেত্রে বিচ্যুতির সমালোচনা করার অধিকার তাঁর আছে। তাছাড়া তাঁর নিজ গুরুর শিক্ষা ও আশীর্বাদেই তিনি অদ্বৈতবাদী হয়েছেন ; এবং তিনি এ-বিষয়ে সচেতন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সর্বপ্রকার ধর্মধারণা শিক্ষা দেবার ও প্রচার করার দায় দিলেও তাঁর (স্বামীজীর) ক্ষেত্রে কিন্তু অদ্বৈতবাদের উপরই জোর দিয়ে গেছেন।

'অদ্বৈত আশ্রমে আনুষ্ঠানিক পূজা-সম্বন্ধে স্বামীজী যদিও তাঁর কঠোর মনো-ভাব উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পূজা-ঘরটি অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেননি—যাঁরা ওর জন্য দায়ী, তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করার মতো কোনও কাজ তখন করেননি। সেটা করলে কর্তৃত্বের জোর খাটানো হত। যাঁরা ওকাজ করেছেন, তাঁরাই যেন নিজেদের ভুল বুঝে তার থেকে সরে যান—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু স্বামীজীর আপসহীন মনোভাব (যার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তাঁর দুই অদ্বৈতবাদী শিষ্য, স্বামী স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ার) অপর আশ্রমবাসীদের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল—এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য এবং তা বজায় রাখবার জন্যই যে স্বামীজী তাঁদের নিয়োগ করে-ছেন, সেটা গভীরভাবে অনুভব করে তাঁরা পূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন—এবং ক্রমে ঠাকুরঘরও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২]

'আশ্রমবাসীদের একজনের মনে দ্বৈতবাদের দিকে ঝোঁক ছিল। এক্ষেত্রে অদ্বৈত আশ্রমের সদস্য হওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে সন্দিহান হয়ে তিনি

সর্বোচ্চ বিচারকরূপে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে মীমাংসা চেয়েছিলেন। মাতাঠাকুরানী তাতে উত্তর দেন, "শ্রীগুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী ; তিনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তোমরা তাহলে অদ্বৈতবাদ অনুসরণ কর না কেন? তাঁর সকল শিষ্যই অদ্বৈতবাদী।" বেলুড় মঠে ফেরার পরে মায়াবতীর ঠাকুরঘর সম্বন্ধে আক্ষেপ করে স্বামীজী বলেছিলেন, "ভেবেছিলুম, অন্তত একটি কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে। হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো ওখানেও জেঁকে বসে আছে। ভালই।"

স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে প্রকাশিত এই বিবরণের বিশেষ মূল্য এইখানে - জীবনীটি লেখা হয়েছিল স্বামী বিরজানন্দ এবং মিসেস সেভিয়ারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। অদ্বৈত আশ্রমের পূর্বোল্লিখিত ঘটনা যখন ঘটে, উভয়েই তখন সেখানে উপস্থিত। সুতরাং, তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই লিখিয়েছেন। এবং আরও উল্লেখযোগ্য—উভয়ে ছিলেন ভাবধারার ক্ষেত্রে 'বিরোধী শিবিরের'—স্বামী বিরজানন্দ ঠাকুরঘর-প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম[৩] এবং মিসেস সেভিয়ার কট্টর অদ্বৈতবাদী।

ইংরেজী জীবনীর মধ্যে মাতাঠাকুরানীর চিঠির যে-অংশ পাই, তা কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এবং জনৈক আশ্রমবাসী (স্বামী বিমলানন্দ) ঠিক কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, তা-ও বোধহয় সবটা দেওয়া হয়নি। স্বামী বিমলানন্দ কি কেবল দ্বৈতবাদে ঝোঁক আছে সুতরাং অদ্বৈত আশ্রমে তাঁর থাকা উচিত কিনা—মাত্র এই বিষয়েই প্রশ্ন করে শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, না অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরঘর থাকার বিরুদ্ধে নিজগুরুর মনোভাবের বিষয়ে প্রশ্নও করে পাঠিয়েছিলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল বলেই মনে হয়। এবং আমরা বুঝতে পারি—যাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ধর্মকে বরণ করেন, তাঁরা কী গভীর জিজ্ঞাসায় মথিত হতে পারেন যা স্বামীজীর মতো গুরুর কাজের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও সংশয় জাগাতে পারে—এবং পুনশ্চ, বুঝতে পারি—সঙ্ঘের কাছে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কেবল গুরুপত্নী ছিলেন না, তিনি গুরুর প্রতিনিধি, সঙ্ঘজননী এবং সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ।[৪]

সারদাদেবীর আলোচ্য পত্রটির গুরুত্ব, আমরা যতদূর দেখেছি, এ-পর্যন্ত স্বামীজীর দিক দিয়েই বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ওটি কি সারদাদেবীর জীবনীর পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ? যদি আমরা একবার ভেবে দেখি—কী সহজে স্বচ্ছন্দে পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিত্য-সত্যের ভূমিতে স্থাপন করতে পারতেন —তাহলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সারদাদেবী নারী এবং মাতা, দৈনন্দিন জীবনে স্বতই দ্বৈতবাদী—তাঁর পূজার দেবতা আবার নিজ স্বামী—যিনি গুরু এবং ঈশ্বর তাঁর কাছে, সারাদিন তাঁর পূজাতেই কাটে—সেই স্বামী-গুরু-

ঈশ্বরের পূজার পট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে গুরুর শিষ্যের ইচ্ছায়—তখন তাঁর কি মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত?—অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা বন্ধ করিয়ে স্বামীজী ঠিক কাজই করেছেন!! আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে এ-বস্তু অলৌকিক। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর পক্ষেই এ-জিনিস করা সম্ভবপর ; শ্রীরামকৃষ্ণ যে অদ্বৈতসাধনার সময়ে জ্ঞানের অসিতে মাতৃমূর্তিকে পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন! সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'ও সারদা, সরস্বতী'—সেকথার আর কোন্ প্রমাণ প্রয়োজন?

পত্রটির আর একটি বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এবং রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সর্বোচ্চ ধর্মধারণা কি—সে-বিষয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে তাহলে এই পত্র তার মীমাংসা করে দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়াচার্য সত্য, কিন্তু নিজে তিনি অদ্বৈতবাদীও। তাঁর ধর্মমত নিয়ে অবশ্য তর্ক আছে। তিনি কি দ্বৈতবাদী, না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, নাকি অদ্বৈত-বাদী? 'কথামৃত' পড়ে অনেকেই তাঁকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মনে করেন। এক বিশিষ্ট পণ্ডিত-অধ্যাপক গ্রন্থ লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ জোর করে শ্রীরামকৃষ্ণকে অদ্বৈতবাদী খাড়া করেছেন, যা তিনি মোটেই ছিলেন না। এ-ধরনের রচনা নিশ্চয়ই শেষ রচনা নয়। এক্ষেত্রে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চাই—সারদাদেবীর পত্রটি তেমন একটি অব্যর্থ প্রমাণ।

সবিনয়ে সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়াচার্য হওয়ার সংগে অদ্বৈতবাদী হওয়ার বিরোধ তো নেই-ই, বরং উলটো পক্ষে, অদ্বৈতবাদী না হলে তিনি সমন্বয়াচার্য হতে পারতেন কি? সমন্বয়বাদীদের কথা—যে-কোন পথ ধরে অগ্রসর হওয়া যাক না কেন, যদি যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে তাহলে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। মাত্র অদ্বৈতবাদীরাই একথা বলতে পারেন, কারণ তাঁরা চলার পথে কোন সাকার ভগবানকে—কোন ঈশ্বরীয় রূপকেই পথের শেষ বলেন না। পরিণতিতে যাঁদের কাছে কোন একটিমাত্র মূর্তি নেই, এক অদ্বয় সত্তাকেই সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপের মূল বলে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা কোন একটিমাত্র পথকেও অবলম্বনীয় মনে না করতে পারেন। অপরদিকে দ্বৈতবাদীরা যেহেতু তাঁদের সম্প্রদায়গত সাকার ভগবানকেই শুধু মানেন, তাই সেই ভগবানের কাছে উপস্থিত হবার জন্য সম্প্রদায়গত পথটিকেও একমাত্র অবলম্বনীয় বলে স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বৈত-বাদীরা খুব উদার হলে বড়জোর ভিন্ন মতাবলম্বীদের 'সহ্য' করেন—কিন্তু 'স্বীকার' করেন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ ব্রহ্ম যদি অগ্নি—শক্তি তার দাহিকাশক্তি। কিন্তু অগ্নিরই দাহিকাশক্তি—দাহিকাশক্তির অগ্নি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মের শক্তি সারদা, তাই তিনি সজোরে মূল সত্যরূপকে প্রকাশ করেছেনঃ 'আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত।' *

ফ্রাঙ্ক ডোরাক-অঙ্কিত শ্রীমায়ের প্রতিকৃতি

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক (Frant Dvorak) ছিলেন স্বামী অভেদানন্দের দীক্ষিত শিষ্য। আজীবন তিনি পবিত্র কৌমারব্রত পালন করেছেন। তাঁর বোন হেলেনা ডোরাকও ছিলেন চিরকুমারী। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আগেই অবশ্য ফ্রাঙ্ক ডোরাকের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের পত্রালাপ হয় এবং শ্রীমা সারদাদেবীর চিত্রটি তিনি এঁকে-ছিলেন স্বামী সারদানন্দের 'নির্বন্ধাতিশয্যে'।

ফ্রাঙ্ক ডোরাক সারদাদেবীতে এসে পেঁাছেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন অহৈতুকী করুণার বশে আকস্মিক অলৌকিক উপায়ে। প্রাগের এই চিত্রশিল্পী স্বপ্নে একদিন এক মহাপুরুষের মূর্তি দেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল—He must be an Indian saint। কিন্তু কে সেই ভারতীয় মহাত্মা, তখনই তা জানতে পারেননি। কিছুদিন পরে তাঁর হাতে আসে ম্যাক্সমূলারের লেখা ঃ Life and Sayings of Ramakrishna। বইখানা খুলে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখেই তিনি চমকে ওঠেন, বুঝতে পারেন ঃ এই সেই মহাত্মা—যাঁকে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন বইটি। সেইদিন থেকে তাঁর ধ্যানের সামগ্রী হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি, জীবনের চলার সম্বল হল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড় আকারের তৈলচিত্র আঁকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করলেন ফ্রাঙ্ক ডোরাক। সেই উদ্দেশ্যে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দকে লিখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ফটো পাঠিয়ে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। স্বামী সারদানন্দ তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি ভঙ্গিমার ফটো পাঠিয়ে দিলেন—দক্ষিণেশ্বরে তোলা সবচেয়ে পরিচিত বসা-মূর্তি, কেশব সেনের বাড়িতে তোলা দাঁড়ানো মূর্তি, এবং স্টুডিওতে তোলা থামে হাত দেওয়া ধুতিপরা ও কোঁচা ঘাড়ে ফেলা ছবিটি। তিনটি ক্ষেত্রেই ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন। তিনটি ছবির মধ্যে কেশব সেনের বাড়িতে তোলা ছবিটিই ফ্রাঙ্ক ডোরাকের পছন্দ হয়। ভাবলেন, তাঁর চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মূর্তিটিই তিনি চোখ-খোলা অবস্থায় আঁকবেন। কিন্তু চোখ-খোলা থাকলে ঐ ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের ভাব কিরকম হতে পারে? দিনের পর দিন গভীর-ভাবে চিন্তা করতে থাকেন সেই বিষয়ে। এই অবস্থায় একদিন ভাবচক্ষে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোজ্জ্বল মূর্তি। দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ দুটি খোলা—'অফুরন্ত প্রেম ও করুণার ভাব তাতে মাখানো, অথচ একান্ত উদাসীন ও ব্রহ্মনিবদ্ধ' সেই দৃষ্টি। ফ্রাঙ্ক ডোরাক তাঁর এই দিব্যদর্শনকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর আঁকা শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্র-অঙ্কনের পর ফ্রাঙ্ক ডোরাক সারদাদেবীর একটি তৈলচিত্র আঁকতে শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রত্যেক শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের একটি করে তৈলচিত্র আঁকেন। কিন্তু অকালে দেহরক্ষা করেছিলেন বলে তাঁর সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের একটি এবং স্বামী অভেদানন্দের

তিনটি চিত্র ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যে আর কারও চিত্র তিনি এঁকে যেতে পারেননি।

শ্রীমার চিত্র-অঙ্কনের কিছুদিন পরেই ফ্রাঙ্ক ডোরাক পরলোকগমন করেন। স্বামী সারদানন্দের অনুরোধে এই ছবি আঁকা হয়েছিল বলে তাঁর বোন হেলেনা ডোরাক ছবিটি স্বামী সারদানন্দের নামে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু চিত্রটি কলকাতায় যখন পৌঁছায় তখন স্বামী সারদানন্দও দেহত্যাগ করেছেন এবং উদ্বোধনের কর্মভার পেয়েছেন গণেন মহারাজ। চিত্রটির জন্য যে শুল্ক ধার্য হয়েছিল, তা অতিরিক্ত মনে হওয়ায় গণেন মহারাজ চিত্রটি গ্রহণ করলেন না। চিত্রটি ফিরে গেল হেলেনা ডোরাকের কাছে। নিশ্চয়ই আহত হয়েছিলেন হেলেনা ডোরাক। কারণ, ফ্রাঙ্ক ডোরাকের ইচ্ছা ছিল সারদাদেবীর এই চিত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রের পাশেই যেন স্থান পায়। সেই ইচ্ছার কথা স্মরণে রেখেই হাল ছাড়তে পারলেন না হেলেনা ডোরাক। তাঁর কাছে স্বামী অভেদানন্দের নিউইয়র্কের ঠিকানা ছিল। সেই ঠিকানায় স্বামী অভেদানন্দের নামে একটি চিঠি লিখে তিনি তৈলচিত্রটি সম্পর্কে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের শেষ ইচ্ছার কথা জানালেন। পত্রটি নিউইয়র্ক ঘুরে কলকাতায় স্বামী অভেদানন্দের কাছে এসে পৌঁছল। স্বামী অভেদানন্দ হেলেনা ডোরাককে জানালেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আলেখ্যটি তাঁর কাছে বেদান্ত সমিতি-ভবনেই আছে এবং শ্রীমার চিত্রটিও তিনি যেন তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে শ্রীমার তৈলচিত্রটি কলকাতায় এসে পৌঁছাল ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। স্বামী অভেদানন্দ যেদিন শুল্ক বিভাগের অফিসে চিত্রটি আনতে গেলেন, 'গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল'-এর অধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন চিত্রটির সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য। চিত্রটি খোলা হলে এর অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ভাল করে দেখেশুনে তিনি বললেনঃ চিত্রটির দাম কমপক্ষে পাঁচশ টাকা হওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী শুল্ক-বিভাগ চিত্রটির উপর শুল্ক ধার্য করলেন পঁচাত্তর টাকা এবং বললেন, তখনই তা দিতে হবে। অথচ স্বামী অভেদানন্দ বা অধ্যক্ষ—কারও কাছেই তখন এক পয়সাও নেই। এমন সময় দেখা গেল, গণেন মহারাজ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। স্বামী অভেদানন্দকে দেখে তিনি ভিতরে এলেন এবং সব শুনে নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, ঠিক পঁচাত্তর টাকাই আছে। গণেন মহারাজের কাছ থেকে ঐ টাকা ধার করে শুল্ক হিসেবে দিয়ে শ্রীমার তৈলচিত্রটি সঙ্গে করে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত-সমিতিতে ফিরে এলেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের ইচ্ছা পূর্ণ হল। শ্রীমার তৈলচিত্র স্থান পেল শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্রের ডান পাশে। এ-খবর পেয়ে হেলেনা ডোরাক খুব খুশী হয়েছিলেন। সেকথা ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ তারিখে স্বামী অভেদানন্দকে প্রাগ থেকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়। শুল্ক বাবদ ঐ পঁচাত্তর টাকা হেলেনা ডোরাক স্বামী অভেদানন্দের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেকথাও ঐ চিঠি থেকে জানা যায়।

স্বামী অভেদানন্দ যখন দার্জিলিং-এর বেদান্ত আশ্রমে আছেন তখন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে পাশ করা এক চিত্রশিল্পী একদিন তাঁর কাছে এসেছিলেন। সেই শিল্পীর সঙ্গে ফ্রাঙ্ক ডোরাক, তাঁর আঁকা তৈলচিত্র দুটি এবং শিল্প প্রসঙ্গে সেদিন সুদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। কলকাতার

বেদান্ত মঠে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেই চিত্রশিল্পীকে তিনি বলেছিলেনঃ 'আপনি আর্টিস্ট। পেন্টিংসের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান ঐ বেদান্ত মঠের মন্দিরেই আছে। অবদানটি অস্ট্রিয়ার [?] (প্রাগের) একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক-অঙ্কিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও সারদাদেবীর দুটি লাইফ-সাইজ অয়েল-পেন্টিংস। ..ছবি দুটি দেখার জন্য নানান স্থান ও দেশ থেকে শিল্পীরা এসেছেন ও আসেন। তাঁরা দেখে শতমুখে প্রশংসা করে গেছেন। ফ্রম দি আর্টিস্টিক ভিউপয়েন্ট ঐ দুটি ছবির সত্যিই তুলনা নাই। সুতরাং আর্টিস্ট হিসাবে আপনার ঐ ছবি দুটি দেখা উচিত।'

স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিতে ফ্রাঙ্ক ডোরাক-অঙ্কিত শ্রীমা যেন 'ঠিক ষোড়শী মূর্তি। যেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে বসে আছেন'। শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্রটির পটভূমিকা (যা এই নিবন্ধে আগেই বলা হয়েছে) বিবৃত করবার পর স্বামী অভেদানন্দ শ্রীমার তৈলচিত্রটি সম্বন্ধে ঐ শিল্পী-ভদ্রলোককে বলতে থাকেন। বলেনঃ 'শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ছবিরও তুলনা নাই। অপরূপ মূর্তির বিকাশ এবং লাবণ্যপূর্ণ শ্রীশ্রীমার অঙ্গসৌষ্ঠব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি-আঁকা শেষ করে ডোরাক শ্রীশ্রীমার ছবিটি এঁকেছিলেন। শ্রীশ্রীমার যে ফটোটি তিনি পছন্দ করেছিলেন তাতে মুখ ও চোখের দৃষ্টি ছিল ডানপাশের দিকে ফেরানো। তিনি ছবি আঁকার সময় মুখটিকে সামনের দিকে করে নিয়েছিলেন।...

'আর্টের দিক থেকে...শ্রীশ্রীমার ছবি শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়েও রসোত্তীর্ণ। এটি শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদান। এতে কালার-কম্বিনেশন-এর তুলনা নেই। ...লাবণ্য, কমনীয়তা ও সফ্‌ট্‌নেস-এর সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও স্বর্গীয় ভাবের অভিব্যক্তি শ্রীশ্রীমার ছবিতে সুপরিস্ফুট। অফুরন্ত ভালবাসা, করুণা ও মাতৃত্বের পূর্ণবিকাশ ছবিতে প্রতিফলিত। শ্রীশ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না। নারীত্বের সকল কিছু সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ছবিটিতে মূর্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সর্বদা প্রসন্নতা ও ক্ষমাসুন্দর ভাব মুখে ও চোখে সুস্পষ্ট। শ্রীশ্রীমার স্তোত্রে আমি তাই লিখেছি--

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥
স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥...

'আমার কি ভাব জানো? শ্রীশ্রীমার কেন, সমস্ত দেবীমূর্তিই নবযৌবনসম্পন্না হওয়া উচিত। প্রাচীন ছবিতে এবং ভাস্কর্যে দেখবে দেবীমূর্তিতে সর্বদাই নব-যৌবনরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বুড়ো, অসুখে জর্জরিত, রোগে বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত—দেবদেবীদের এই ধরনের ছবি আঁকা বা প্রতিকৃতি তৈরী করা মোটেই উচিত নয়। শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধেও তা-ই। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীশ্রীমার ছবিতে দেবীভাব ও স্বর্গীয় সুষমা সুপরিস্ফুট। অপূর্ব লাবণ্য ও অনাবিল আনন্দপূর্ণ স্নিগ্ধতা সমগ্র ছবিখানিতে মাখানো রয়েছে। ছবিটির সত্যিই তুলনা নাই।'

অনেকে বলেন শ্রীশ্রীমার ঐ ছবিটি নাকি একটু 'ওয়েস্টার্নাইজড'। এই 'অভি-

যোগের উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ বলেনঃ 'হ্যাঁ, শ্রীশ্রীমার ছবিতে প্রাচ্যের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের নারীত্বের ভাব ফুটে উঠেছে—এটাই তাদের বলার উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি-সম্বন্ধেও আমি ওরকম কত-কিছু মন্তব্য ও সমালোচনা শুনেছি। সাধারণ মানুষ কেন, বিশিষ্ট আর্টিস্টদের মধ্যেও রুচি ও মতের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সকল শিল্পীর ও লোকের দৃষ্টিভঙ্গি সমান নয়। তবে যে-কোন আর্টের মধ্যে একটা নিজস্ব ভঙ্গি ও ধারা বজায় থাকা উচিত। যিনি আর্টিস্ট হবেন, তাঁর সকল-কিছু সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ভাবের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। তাঁর কাছে টেকনিক ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু কলাসৌন্দর্যের ভিতর এদেশ-ওদেশ জাতিবিচারের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়।...

'সৃষ্টিতেই বৈচিত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এঁরা এক ও অদ্বিতীয় হলেও তাঁদের বিকাশে ও বর্ণনায় বৈচিত্র আছে। শিল্প ও শিল্প-প্রতিভা তেমনি এক হলেও বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন শিল্পীর রুচিতে ও দৃষ্টিভেদে শিল্পে বৈচিত্র সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীশ্রীমার ছবিকে তাই যাঁরা ওয়েস্টারনাইজড বলেন, তাঁরা নিজ নিজ রুচির সীমিত গণ্ডিকে লক্ষ্য করে এবং দেশ ও সমাজের ভিন্নতার মাপকাঠিকে ধরেই মন্তব্য করেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাক যথার্থ ধ্যানী শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই শ্রীশ্রীমার অপরূপ ছবি এঁকেছেন।...তাঁর নিজস্ব কোন সমাজ, জাতি বা বর্ণ ছিল না, বরং নিরপেক্ষ ও উদার মন নিয়েই তিনি "সুন্দর"-এর সাধনা করেছিলেন সমগ্র জীবন ধরে। শিল্পে স্বর্গীয় সুষমা সৃষ্টি করাই ছিল ডোরাকের জীবনের সাধনা। রস ও ভাবের পরিবেশকরূপে নির্দ্বন্দ্ব মনে শিল্প সৃষ্টি করেছেন ডোরাক নিজেকে ও শিল্পপ্রেমিককে ভাবলোকে পেঁীছে দেওয়ার জন্য। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের শিল্পসৃষ্টি তাই রসোত্তীর্ণ ছিল। তাই তিনি শ্রীশ্রীমার এ-ধরনের জীবন্ত কমনীয় ও লাবণ্যময়ী প্রতিকৃতি আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন।..

'তবে কি জানো?—সাধারণ মানুষ চায় বাস্তবের পূজা। সে বাইরের জগতে গাছপালা, ঘরবাড়ি যেমনটি দেখে, তেমনটিই দেখতে চায় তার নকল করা প্রতিকৃতির ভিতর, এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে মেজাজ যায় বিগড়ে, আর তাই ফটো বা ফটোর হুবহু নকল ছবি হয় তার কাছে সমাদরের বস্তু। ফটো হল কোনকিছুর কয়েক সেকেণ্ডের একটি রিপ্রোডাকশন (পুনর্প্রতিফলন) বা রিপ্রেজেন্টেশন (প্রতিচ্ছবি) মাত্র। কাজেই কোন মানুষের ফটোর অর্থ হল সেই মানুষটির হাবভাব, অভিব্যক্তি এক বা কয়েক সেকেণ্ডে যা ছিল—ঠিক তারই প্রতিফলন ও প্রতিচ্ছবি, তার পূর্বেকার বা পরেকার কোনকিছুর খবর সে দিতে পারে না। তাই শিল্পবিকাশের দিক থেকে ফটো (আলোকচিত্র) একান্তই ইমপারফেক্ট (অসম্পূর্ণ)।...

'শিল্পী কোন মানুষের ছবি আঁকেন মানে সেই মানুষের সমগ্র জীবনকে ধ্যাননেত্রে প্রথমে নিরীক্ষণ করেন ও পরে তার প্রতিফলন করেন বাইরে। অয়েলপেন্টিং-ও (তৈলচিত্র) তাই মানুষের আকৃতি ও গঠনের সঙ্গে হুবহু না মিলতে পারে, কিন্তু তার সমষ্টিরূপের ও পূর্ণ অভিব্যক্তির পরিচয় দান করে।...

'একটি মানুষের জীবন হল a sum-total of events that build up a history of his whole life (ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি—যা সমগ্র জীবনের ইতিহাস গঠন করে)। মোটকথা, জীবনের ধারাবাহিক ঘটনা-পারম্পর্যকে সাজালে যে-ইতিহাস

সৃষ্টি হয় তাই হল বাইরের দিক থেকে অন্তত গোটা একটি মানুষের জীবন। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন, তখন মানুষের ঐ সমগ্র জীবনের ইতিহাসটাই তিনি রঙ ও তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন ; তাতে সেই মানুষটির সঙ্গে তার ছবি হুবহু মিলল কিনা তা তিনি খতিয়ে দেখেন না। এমনকি শিল্পী মানসচক্ষে ভিসুয়ালাইজ করেন অনন্ত অনাগত জীবন, সেজন্যই শিল্পজগতে তিনি যথার্থ শিল্পীর সম্মান লাভ করেন। র‍্যাফেল ম্যাডোনার কি অদ্ভুত ছবিই না এঁকে গেছেন। ম্যাডোনাকে অর্থাৎ ম্যাডোনার সমগ্র জীবন-ইতিহাসকে র‍্যাফেল ভাবচক্ষে নিরীক্ষণ করেছিলেন। ঐ একটি ছবির জন্য র‍্যাফেল চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন পৃথিবীতে।

'ফ্রাঙ্ক ডোরাকও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর তৈলচিত্রই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে জগতে। শ্রীশ্রীমার ছবিকে তিনি আইডিয়ালাইজড করেছেন। শ্রীশ্রীমার সমগ্র জীবন ও মহিমা ভাবচক্ষে দর্শন করে তিনি তাঁর অয়েলপেন্টিংটি এঁকেছিলেন। শ্রীশ্রীমার ছবিখানিকে এ্যাপ্রিসিয়েট করতে গেলে তাই শিল্পী ডোরাকের অন্তরের ধ্যানঘন অপার্থিব ভাবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। সাধারণ লোক হাত, পা, মুখ, চোখ, গায়ের রঙ মিললো কিনা এইসব নিয়েই ছবির বা শিল্পের বিচার করে, কিন্তু শিল্পসৌন্দর্যের জগতে ঐসব বিচারের মূল্য নিতান্তই নগণ্য।

'শ্রীশ্রীমার ছবিতে মানুষীভাবের পরিবর্তে দেবীভাব সুপরিস্ফুট। ...শ্রীমা নব-যৌবনসম্পন্না, জগদ্ধাত্রীরূপিণী ও পবিত্রতার জীবন্ত মূর্তি। তাই তাঁর ছবি আঁকতে গেলে শিল্পীকে অপার্থিব রাজ্যের অধিবাসী হতে হবে।'

ফ্রাঙ্ক ডোরাক সেই রাজ্যে বাস করতেন। তাঁর শিল্পসৃষ্টি শিল্পরসিক মানুষকে সেই রাজ্যের সন্ধান দিয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেনঃ 'পৃথিবীর মাটিতে বাস করলেও ফ্রাঙ্ক ডোরাক অপার্থিব রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। ...শ্রীশ্রীমার সমগ্র জীবনের আলেখ্য তাই তিনি এঁকেছেন বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের সমন্বয় সাধন করে। অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অনাগত ভবিষ্যতের দিকেও ডোরাক তাঁর সৌন্দর্যসেবী মনকে ও দৃষ্টিকে প্রসারিত করে-ছিলেন, তাই পরিপূর্ণ হয়েছে তাঁর সঙ্কল্প ও সাধনা।...

'শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক তিন লোককে অতিক্রম করে তুরীয়লোকে শিল্পপ্রেমিককে পৌঁছে দেবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর তৈলচিত্র এঁকেছিলেন।' *



শ্রীশ্রীমার প্রথম ছবি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে
১৩০৫ সাল : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ,
ফটো : মিঃ হ্যারিংটন ব্যবস্থাপনায় : মিসেস ওলি বুল
স্থান : বাগবাজার (বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার আবাস)



শ্রীশ্রীমা

ফ্রাঙ্ক ডোরাক অঙ্কিত

শ্রীমায়ের প্রথম তোলা আলোকচিত্র

শ্রীশ্রীমায়ের প'য়তাল্লিশ বছর বয়সে তোলা আলোকচিত্র এখন সর্বত্র পূজিত হয়। একই সংগে তিনটি ছবি তোলা হয়েছিল। এর আগে শ্রীমার কোন ছবি তোলা হয়নি, যদিও পরে তোলা অনেকগুলি ছবি পাওয়া যায়। মিসেস ওলি বুল প্রভৃতিরা প্রথম ইউরোপীয় যাঁরা শ্রীমার দর্শন পান। মিসেস ওলি বুলই প্রথম শ্রীমার ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন, সেই ছবি এখন দেশবিদেশে প্রচারিত ও অর্চিত। এক্ষেত্রে মিসেস ওলি বুলের ভূমিকা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণযোগ্য। অতীব বিস্ময়ের কথা, এই ছবি তোলার সময়ে শ্রীমার বয়স প'য়তাল্লিশ—শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত 'পূজিত' ছবিটিও প'য়তাল্লিশ বছর বয়সে তোলা। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগে দেখতে পাই শ্রীমা তাঁর এই আলোকচিত্রটিকে 'ঠিক' বলে অনুমোদন করেছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অরূপানন্দ শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'মা এ ফটো কি ঠিক?' উত্তরে মা বলেনঃ 'হাঁ, এটি ঠিক। তবে পূর্বে আরও মোটা ছিলুম। যখন ছবি ওঠায় তখন যোগীনের (স্বামী যোগানন্দের) খুব অসুখ। তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিছল। মন ভাল নয়, যোগীনের অসুখ বাড়ছে তো কাঁদছি, আবার যোগীন ভাল থাকছে তো ভাল থাকছি। সারা মেম [মিসেস ওলি বুল] এসে এইটি ওঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, "মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজো করব।" তাই শেষে এই ছবি ওঠায়।'

শ্রীমার এই আলোকচিত্র তিনটির বিষয়ে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যার 'প্রবুদ্ধ ভারতে' স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের একটি প্রবন্ধে [Illustrating a new biography of Ramakrishna] আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায়। প্রসংগত উল্লেখ্য, স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ জন্মসূত্রে আমেরিকান, পূর্বাশ্রমে জন ইয়েল—সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক। তিনি লিখেছেনঃ 'ইশারউড তাঁর গ্রন্থে [রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য-গণ] স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমায়ের একটি প্রতিকৃতি দিতে চেয়েছেন। স্থির হয় যে, ঠাকুরের প'য়তাল্লিশ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে তোলা "পূজিত" ছবির সমজাতীয় মাতাঠাকুরানীর একটি ছবি দেওয়া হবে। শ্রীমায়ের ঐ-ধরনের ছবিটির পরিচয় সন্ধানকালে কতকগুলি আকর্ষণীয় তথ্য পেলাম। এই ভংগির ছবিটি কলকাতায় সিস্টার নিবেদিতার আবাসে ১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে অন্য দুটি ছবির সংগে একই সময়ে একই অবস্থানে তোলা হয়। ঠাকুরের দেহান্তের বারো বছর পরে শ্রীমায়ের এই ছবি তোলা হয় এবং এইটি তাঁর প্রথম [আক্ষরিক অর্থে দ্বিতীয়] ছবি। শ্রীমার প্রতিকৃতি আমেরিকায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে মিসেস ওলি বুল ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন। শোনা যায় যে, একজন ইংরাজ ফটোগ্রাফারকে নিয়োগ করা হয়েছিল। পশুচর্মের আসন বিছিয়ে, সামনে কয়েকটি টব বসিয়ে দেওয়ার পরে শ্রীমা আসন গ্রহণ করেন। নিবেদিতা ও মিসেস বুল তাঁর শাড়ী ঠিকঠাক গুছিয়ে দিতে সাহায্য করেন। শ্রীমা ফটো-গ্রাফারের সামনে বসতে খুবই লজ্জাবোধ করেন, কিছুতেই ক্যামেরার দিকে তাকাতে চান না, নতদৃষ্টিতে বসে থাকেন এবং ভাবস্থ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট না হলেও ক্যামেরাম্যান প্রথম ছবিটি তোলেন, যেটি প'য়তাল্লিশ বছর বয়সের "নত-

দৃষ্টি চিত্র"। এরপর শ্রীমা সপ্রশ্ন আঁখি তোলেন—"শেষ হয়েছে কি?" ফটোগ্রাফার তখন দ্বিতীয় ছবি তোলেন—সেইটিই সুপরিচিত "পূজিত" ফটো।...

'ঐসময়ে গৃহীত তৃতীয় ফটোটির বিষয়ে আমার কিছু ব্যক্তিগত বক্তব্য আছে। এইটি হল শ্রীমা ও নিবেদিতার মুখোমুখি বসে থাকার ছবি। ভারতে থাকাকালে আমি কয়েকবার শুনেছি, এটি খাঁটি ছবি নয়, সাজানো ছবি। শ্রীমা ও নিবেদিতার ঐরকম একত্রে ফটো নাকি কখনও তোলা হয়নি। দুজনের দুটি ছবিকে কেটে মুখো-মুখি জুড়ে কেউ হয়তো আবার নেগেটিভ তৈরী করে এই ছবি বানিয়েছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। এই তৃতীয় ছবিটির অস্তিত্ব বারো বছর আগেও অজ্ঞাত ছিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসার পথে আমি ইংলন্ড ঘুরে আসি। সেখানে আমি আর্ল অব স্যান্ডউইচের বাড়িতে ছিলাম। এঁর প্রথম পত্নী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আমে-রিকান বন্ধু লেগেটদের আত্মীয়। লর্ড স্যান্ডউইচের বাড়িতে দ্বিতীয় লেডী স্যান্ড-উইচ শ্রীমা-নিবেদিতার এই ছবিটির পুরাতন একটি মূল প্রিন্ট দেখতে পান। ছবিটি তিনি আমাকে দেন ভারতে নিয়ে যাবার জন্য, এবং বলেন, "তিনি অন্তত আগে এই ছবিটি দেখেননি, সম্ভবত এটি সুপরিচিত ছবি নয়"। "সুপরিচিত নয়" বললে অল্পই বলা হয়। বেলুড় মঠে পেঁছে ছবিটি স্বামী শঙ্করানন্দকে দিলে তিনি রীতিমতো অবাক এবং অতীব উল্লসিত। সহর্ষে বললেন, "এ ছবি আগে কখনও দেখিনি তো। এমন কোন ফটো আছে জানতামই না।" বর্তমানে এই ছবিটির যেসব প্রিন্ট দেখা যায়, সে সবগুলিই লর্ড স্যান্ডউইচের বাড়ি থেকে পাওয়া মূল ছবির পুনর্মুদ্রণ।'

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' গ্রন্থে ঐ ফটোগ্রাফারের নাম বলা হয়েছে হ্যারিংটন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য আরও লিখেছেনঃ 'ফটো তুলিবার সময়ে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি কাপড়ে ঢাকা ছিল। পদাঙ্গুলি বাহিরে রাখিয়া একখানি ফটো তোলার প্রয়োজন মিসেস বুল অনুভব করেন, দেশে নিয়া পূজা করিবেন বলিয়া। মাকে সেইকথা জানাইয়া, অনেক বলিয়া-কহিয়া দ্বিতীয়বার ফটো তুলাইতে সম্মত করানো হয়। গোলাপ-মার মুখে এই ঘটনা অনেকেই শুনিয়াছেন—তিনি মায়ের সঙ্গে ছিলেন।'

ফটো তিনটি সম্বন্ধে মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি নিবেদিতা লিখছেনঃ 'By next week's post I send to London 10 photographs of her (Mother). The two negatives are to be 40 Rupees and expenses 3·4—total 43·4 and my proof and negative cost nothing. So unless you write to the contrary we shall keep the 3 negatives here.' দেখা যাচ্ছে, শ্রীমার সঙ্গে নিবেদিতার ছবি বাড়তি তোলা হয়েছিল, এবং তুলতে কোন খরচ হয়নি।

মিস ম্যাকলাউডের পত্রে শ্রীমা সারদাদেবী

॥ ১ ॥

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩, জর্জ মন্টেগুকে (পরবর্তীকালে নবম আর্ল অব স্যান্ডউইচ)

সারদাদেবী সম্বন্ধে কলকাতা থেকে লেখা তোমার চিঠি থেকে জানলাম, তুমি তাঁর মধ্যে মহামূল্য মণিরত্নের সন্ধান পেয়েছ। আমরা সকলেই তা অনুভব করি; আর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বস্তুরই অর্চনা করেছেন। পরম সদ্‌বস্তু তিনি; শান্ত, শক্তিময়ী, মানবিক অনুভূতিতে ভরপুর এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। তাঁকে খুবই ভালবাসি। তাঁর দর্শনে আবার নিশ্চয়ই যাব।

॥ ২ ॥

১৫ আগস্ট ১৯২০, স্বামী সারদানন্দকে

সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল—আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ! আমার কাছে তাঁর জীবন হল অসীম উৎসাহের জীবন—যা আমাদের সবাইকে সেই শরণদায়ী সহানুভূতিভরা জীবনতলে একত্র করেছে, যা নতুন প্রয়োজনের অনুরূপ আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ ঋজু প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত নতুন নতুন আদর্শের নজির সৃষ্টি করেছে! ওঃ, তাঁর জীবন অবলম্বনে আমরা প্রত্যেকেই কী দৃষ্টান্তই না দেখতে পারি! তিনি আদর্শের নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করে গেছেন—আমাদেরও অবশ্য তাই-ই করতে হবে—তাঁর নয়, আমাদের স্বকীয় (জীবনের নজির সৃষ্টি)! আর অন্য কোন উপায়ে জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না।

॥ ৩ ॥

২ জুন ১৯২৬, অ্যালবার্টাকে (পরবর্তীকালে লেডি স্যান্ডউইচ)

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকে আছেঃ 'সকল ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে আমার শরণ নাও। আমি তোমার সকল পাপ মোচন করব। শোক করো না।' কথাগুলির আশ্চর্যজনক রূপায়ণের সংবাদ গত সন্ধ্যায় জেনেছি, যখন মঠে গঙ্গার ঘাটে বসে থাকার সময়ে দুই তরুণ সন্ন্যাসী, ফণী ও গোপালচৈতন্যের মুখে সারদা-দেবীর কাহিনী শুনছিলাম। সারদাদেবী দীক্ষা দেবার সময়ে ওদের কপালে ও মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে বলেছিলেনঃ 'তোমাদের পূর্বজন্ম ও এই জন্মের সমস্ত পাপের বিনাশ হোক।' এর অর্থ, গুরু আক্ষরিকভাবে নিজের উপর শিষ্যের সকল পাপভার তুলে নেন। এখানে সারদাদেবীই সেই গুরু। দেখা যাচ্ছে, হিন্দুধর্মের মধ্যেও অন্যের পাপগ্রহণের ভাব আছে। এই দুই তরুণ সন্ন্যাসীর মন, প্রাণ ও জীবন এখন এমনই

ভাস্বর যে, তাদের সংস্পর্শে অন্যের মধ্যে সেই আনন্দ অনিবার্যভাবে সঞ্চারিত হয়। যতদূর মনে হয়, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফণী প্রথম মাতাদেবীকে দেখেছিল, এবং তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছিল। ঐদিন, দীক্ষা দেবার আগেই মায়ের খাবার বাড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সরিয়ে রেখে তিনি ফণীকে নিয়ে একাকী মন্দিরে যান, এবং সকলে অবাক হয়ে দেখে, দশ মিনিট ধরে দীক্ষানুষ্ঠান চলে। পরের সপ্তাহে ফণী স্বেচ্ছায় [প্রথম] মহাযুদ্ধের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে অপর তিরিশ জন ছাত্র-সৈনিকের সঙ্গে করাচি যাত্রা করে। সেখান থেকে পারস্য। দীক্ষাগ্রহণের সময় ফণীর যুদ্ধে যোগদানের কোন চিন্তা ছিল না।

সকলেই অনুভব করেন, সারদাদেবী দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্না। 'তিনি সবই জানেন।' তাঁকে প্রথম দর্শনকালে গোপালচৈতন্যের বয়স ছিল চোদ্দ। জয়রামবাটী থেকে ছ-মাইল দূরে সে থাকত। পাছে তার বাড়ির লোকেরা সারদাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে, তাই সে অন্য গ্রামে তার এক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে (শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে বাড়ির লোকের আপত্তি ছিল না) ঘুরপথে প্রতি সপ্তাহে মাতাঠাকুরানীর সঙ্গে দেখা করত। ফলে, বস্তুতপক্ষে প্রতি-বার চোদ্দ মাইল হাঁটতে হত। একদিন সবিস্ময়ে সে দেখে, তার বাবা তাকে বারো-টাকা দিয়ে বলছেনঃ 'এটা রাখ, যেভাবে ইচ্ছে খরচ করতে পার।' (যদিও এর আগে সে কখনও মায়ের কাছ থেকে একটি-দুটি পয়সার বেশী পায়নি, আর বাবার কাছ থেকে কিছুই পায়নি।) ফলে সে এখন থেকে সারদাদেবীর জন্য ঐ টাকাগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ফল-মিষ্টির জন্য চার আনা থেকে আট আনা খরচ করতে পেরেছিল। তারপর টাকা শেষ হয়ে গেলে তার যেতে সঙ্কোচ হতে লাগল। অল্প-দিনের মধ্যে, সারদাদেবী গোপালের গ্রাম থেকে কিছু কিছু জিনিস কিনে আনার জন্য প্রতি সপ্তাহে তাকে কিছু অর্থ দিতে লাগলেন। গোপালচৈতন্যের গ্রাম সারদাদেবীর গ্রামের চেয়ে বড়। এখন সে খুব খুশী, কারণ কিছু নিয়ে যেতে পারছে। মাঝে মাঝে কোন বিশেষ উৎসব বা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সারদাদেবী তাকে সোমবার সকালের দিকে স্কুলে যাবার পথে আটকে দিতেন, বলতেনঃ 'তোমার শিক্ষকেরা দেরি হওয়া নজরই করবেন না।' আর বাস্তবিকই তা-ই হত।

সারদাদেবীর শিষ্যসংখ্যা হাজার হাজার [?], সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য মুষ্টিমেয় এবং স্বামীজীর কয়েকশ; কারণ সারদাদেবী স্বামীজীর পরে কুড়ি বছরেরও বেশী [বস্তুতপক্ষে আঠেরো বছর] জীবিত ছিলেন। নিজের পরিবারে নিকট-লোক-দের নিয়ে তিনি বেশ ঝঞ্চাটে ছিলেন। তাঁর ভাইঝি খুবই বিরক্তিকর স্বভাবের মেয়ে, সে তাঁর সঙ্গে একই বিছানায় শুত, তাঁকে সারাক্ষণ অতিষ্ঠ করত। সারদাদেবী ভাইঝির বিয়ে দেন, স্বামী পরে তাকে পরিত্যাগ করে। শেষপর্যন্ত মেয়েটি অশক্ত হয়ে পড়ে, এবং তাঁর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সারদাদেবী এখন নেই, আর বালিকা (মহিলা বলাই উচিত) বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ! এই মহীয়সী নারী, যিনি জীবৎকালে আক্ষরিকভাবে পূজিত হয়েছেন—ঘরসংসারের মধ্যে ঠিক কি ছিল তাঁর সত্য-চিত্র, তা জানতে আমার আনন্দ ও আগ্রহের শেষ নেই। এখন তাঁর নামে একটি অতি সুন্দর মন্দির তৈরী হয়েছে; বেলুড়ে স্বামীজীর মন্দিরের চেয়ে অনেক বড় সেটি—তিনজন সাধু ও ব্রহ্মচারী তাঁর সেবায় আছে। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে কামারপুকুরে

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানে পর্যন্ত এখনও মন্দির হয়নি (তবে সেজন্য দান সংগ্রহ করা হচ্ছে)। গোপাল বলল, সারদাদেবী তাকে নিখুঁত কাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন; কাজ যেন এলোমেলো অগোছাল না হয়। একবার তিনি গোপালকে খেতে বসবার জন্য একসারিতে আটটি আসন পাততে বলেন; গোপাল তা করে। তিনি তাকে ঠিক করে পাততে বলেন। দ্বিতীয়বারেও যখন সোজা করে পাতা হল না, তখন তিনি নিজে ঠিক করে দিলেন। প্রতিটি পাতা যাতে খুব যত্নে ধোওয়া হয়, তারপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে তা মোছা হয়, যাতে বুটি পাতায় না জড়িয়ে যায় -সেদিকে তাঁর নজর ছিল।

একদিন গোপাল ফুলবাগান কোপাতে ভুলে গিয়েছিল। এসে দেখে, সারদাদেবী নিজেই তা করছেন। যখন সে আপত্তি জানাল, তখন সারদাদেবী বললেনঃ 'আমার এই দুটি হাত সব কাজ করতে পারে।' এমন কোন কাজ ছিল না যা তিনি করতেন না বা করতে পারতেন না।

॥ ৪ ॥

৫ অক্টোবর ১৯২৭. অ্যালবার্টাকে (পরবর্তীকালে লেডি স্যান্ডউইচ)

সারদাদেবী ছিলেন এই নতুন ধর্মসংঘের নিকটে মহিমময়ী মেরী-মাতা। *

জীবনপঞ্জী

১৮৫৩—২২ ডিসেম্বর (৮ পৌষ ১২৬০, কৃষ্ণা সপ্তমী), বৃহস্পতিবার রাত্রি দুই দণ্ড নয় পল সময়ে জয়রামবাটীতে জন্ম। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর প্রথম কন্যা। জন্মের পূর্বে রামচন্দ্রের স্বপ্নদর্শনঃ 'একটি হেমাঙ্গী বালিকা তাঁহার পৃষ্ঠোপরি পড়িয়া কোমল বাহুপাশে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়াছে।' রামচন্দ্র প্রশ্ন করেনঃ 'কে গো তুমি?'—বালিকার উত্তরঃ 'এই আমি তোমার কাছে এলুম।' ভগিনীঃ (১) কাদম্বিনী দেবী, স্বামীঃ কোকন্দ নিবাসী সুধারাম চক্রবর্তী। ভ্রাতাগণঃ (১) প্রসন্নকুমার—প্রথম পত্নী রামপ্রিয়ার দুই কন্যা—নলিনী ও সুশীলা (মাকু), প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া পত্নী সুবাসিনীর দুই কন্যা কমলা ও বিমলা, এক পুত্র গণপতি। (২) উমেশচন্দ্র (বিবাহের পূর্বে মৃত)। (৩) কালীকুমার—পত্নী সুবোধবালা, দুই পুত্র—ভূদেব ও রাধারমণ। (৪) বরদাপ্রসাদ—পত্নী ইন্দুমতী, দুই পুত্র—ক্ষুদিরাম ও বিজয়কৃষ্ণ। (৫) অভয়চরণ (ডাক্তারী-শিক্ষার অব্যবহিত পরে মৃত্যু)—পত্নী সুরবালা, এক কন্যা—রাধারানী।

১৮৫৯—মে (বৈশাখের শেষ ভাগ, ১২৬৬), বিবাহ। পাত্র, হুগলী জেলার কামারপুকুর নিবাসী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবীর কনিষ্ঠপুত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায়, বয়স ২৪। বিবাহের পূর্বে কন্যা অন্বেষণকালে গদাধরের নির্দেশঃ 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা আছে।' পাত্রপক্ষ-কর্তৃক কন্যাপক্ষকে তিনশ মুদ্রা পণ দান। বিবাহের পরদিন শ্বশুরালয়ে আগমন এবং তার পরদিন পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬০- নভেম্বর-ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ ১২৬৭), দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটীতে গদাধরের গমন, কয়েকদিন অবস্থান, অতঃপর বধূসহ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন। কামারপুকুরে কয়েকদিন অবস্থানের পর পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন এবং গদাধরের (অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ) দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬৪- (১২৭১), জয়রামবাটী অঞ্চলে দারুণ দুর্ভিক্ষ। পিতা রামচন্দ্রের দরিদ্রসেবায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ। 'এক এক দিন এমন হত, এত লোক এসে পড়ত যে খিচুড়িতে কুলোত না। তখনই আবার চড়ানো হত। আর সেই গরম গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শিগ্‌গির জুড়োবে বলে আমি দুহাতে বাতাস করতুম।'

১৮৬৬- মে (বৈশাখ ১২৭৩), তৃতীয়বার শ্বশুরালয়ে আগমন। হালদারপুকুরে একাকী স্নানে যাওয়ার সময় প্রতিদিন আটটি দিব্য কন্যার (অষ্টসখীর) উপস্থিতি—সম্মুখে ও পশ্চাতে চারজন করে বেষ্টিত অবস্থায় হালদারপুকুরে গমন ও প্রত্যাবর্তন। একমাস অবস্থানের পর জয়রামবাটীতে।

১৮৬৬-৬৭—ডিসেম্বর-জানুয়ারি (পৌষ-মাঘ ১২৭৩), চতুর্থবার শ্বশুরালয়ে—দেড়-মাস অবস্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতা চন্দ্রমণি দেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে।

১৮৬৭—মে (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪), ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়রামের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরে গমন। পঞ্চমবার শ্বশুরালয়ে আগমন। দীর্ঘ সাতমাস কামারপুকুর অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ। ঐ কাল সম্পর্কে পরবর্তীকালে উক্তিঃ 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।'

১৮৭২—মার্চ (চৈত্র ১২৭৮), সুদূর দক্ষিণেশ্বরে সাধনমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের উন্মত্ততা সম্পর্কে নানাবিধ গুজব। সংকল্পঃ 'সবাই এমন বলছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কেমন আছেন।' অসুস্থা অবস্থায় পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা—পথে অসুস্থতাবৃদ্ধি। 'বেহুঁশ হইয়া মাতা যখন পড়িয়ে। আসিয়া পাশেতে তাঁর বসে এক মেয়ে॥ নেহারিয়া মাতা তাঁরে করিলা জিজ্ঞাসা। তোমার কোথা হইতে হইয়াছে আসা॥ তদুত্তরে কাল মেয়ে কহিলা মাতায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে আইনু হেতায়॥' 'কালো-মেয়ের' সেবাযত্নে ও আশ্বাসে পরদিন সুস্থতালাভ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন।

১৮৭২—৫ জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-অনুসারে জ্যৈষ্ঠের শেষার্ধ ১২৮০, জুন ১৮৭৩), ফলহারিণী কালীপূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক জগদম্বারূপে (ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীরূপে) পূজান্তে শ্রীচরণে সাধনার ফল, জপের মালা প্রভৃতি সমর্পিত।

১৮৭৩—মধ্যভাগে (১২৮০ সালের প্রথম ভাগে, লীলাপ্রসঙ্গ-অনুসারে কার্তিক ১২৮০), দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থতা। কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন।

১৮৭৪—২৬ মার্চ, পিতা রামচন্দ্রের পরলোকগমন।

এপ্রিল (বৈশাখ ১২৮১), দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বর আগমন।

১৮৭৫—বর্ষায় আমাশয় রোগ।

(আনুমানিক) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন। পুনরায় আমাশয়ে আক্রান্ত—মুমূর্ষু-অবস্থায় সিংহবাহিনী দেবীর নিকট হত্যাদান। প্রাপ্ত ঔষধে আরোগ্যলাভ।

১৮৭৬—২৭ ফেব্রুয়ারি (১৬ ফাল্গুন ১২৮২), শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি দিবসে চন্দ্রমণি দেবীর লোকান্তর।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। কয়াপাট-বদনগঞ্জে প্লীহা চিকিৎসা।

১৭ মার্চ (৫ চৈত্র ১২৮২), তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বর আগমন। শম্ভু মল্লিক-কর্তৃক নির্মিত চালাঘরে কিছুদিন বাস। শ্রীরামকৃষ্ণের আমাশয় হলে নহবতে গিয়ে তাঁর সেবার ভারগ্রহণ।

২২ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩), সাবিত্রীব্রত।

নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৩), জয়রামবাটী গমন।

১৮৭৭—শ্যামাসুন্দরীকে জগদ্ধাত্রীর স্বপ্নদান।

১৪ নভেম্বর (৩০ কার্তিক), শ্যামাসুন্দরীর গৃহে প্রথম জগদ্ধাত্রীপূজায় অংশগ্রহণ।

১৮৮১—ফেব্রুয়ারি-মার্চ, চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন—সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, শ্যামা-

সুন্দরী প্রভৃতি। উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়রামের দুর্ব্যবহারে ব্যথিত-চিত্তে মাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ এবং সংকল্পঃ 'মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।'

মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮), দক্ষিণেশ্বর থেকে হৃদয়রাম বিতাড়িত।

১৮৮২—ফেব্রুয়ারি-মার্চ, অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে পঞ্চমবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও সেবার ভারগ্রহণ।

১৮৮৪—দুর্ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণের বামহস্তের অস্থির স্থানচ্যুতি।

(মাঘ ১২৯০), ষষ্ঠবার দক্ষিণেশ্বর আগমন কিন্তু বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে যাত্রাবদলের জন্য পরদিন জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন।

১৮৮৫—মার্চ, রামলালের বিবাহে উপস্থিতি এবং সেখান থেকে সপ্তমবার দক্ষিণেশ্বর আগমন।

এপ্রিল (ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের মতে ২৫ চৈত্র), ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত।

মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, শুক্লা ত্রয়োদশী), পানিহাটি-উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা; অনুমতিলাভ, কিন্তু উৎসবে যোগদানে অসম্মতি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্যঃ 'সঙ্গে না গিয়ে ভালই করেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলত "হংসহংসী এসেছে", ও খুব বুদ্ধিমতী।'

২৬ সেপ্টেম্বর, চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতা আগমন। প্রথম বাগবাজারের বাসাবাড়িতে—সেদিনই বলরাম বসুর বাড়িতে।

২ অক্টোবর, চিকিৎসার সুবিধার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাসাবাড়িতে। কয়েক-দিন পরে সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে আগমন।

১১ ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯২), শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে।

১৮৮৬—শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক ভারসমর্পণঃ 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।'

শ্রীরামকৃষ্ণের রোগনিরাময় প্রার্থনায় তারকেশ্বরে হত্যাদান। তৃতীয়রাত্রে বৈরাগ্য-সঞ্চার এবং হত্যাদানে প্রাণত্যাগ সংকল্প পরিত্যাগ। তিরোভাবের পূর্বে শ্রীরাম-কৃষ্ণের নির্দেশঃ 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে...কারও কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিতহাত করো না। তোমার মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। ...বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয় ...কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি নষ্ট করো না।'

১৬ আগস্ট (৩১ শ্রাবণ ১২৯৩), রাত্রি একটা দুই মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ। সারদাদেবী নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেনঃ 'মা-কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো।'

১৬ আগস্ট, সধবা-চিহ্ন পরিত্যাগ কালে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও নিষেধঃ 'আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?'

২১ আগস্ট, উদ্যানবাটী ত্যাগ ও বলরাম বসুর বাড়িতে।

২৩ আগস্ট, জন্মাষ্টমী দিবসে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ঠাকুরের অস্থিভস্ম সমাহিত।

৩০ আগস্ট, বলরাম বসুর আবাস থেকে বৃন্দাবন যাত্রা—সঙ্গে গোলাপ-মা, লক্ষ্মী-দেবী, যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ প্রভৃতি। পথে বৈদ্যনাথ-ধাম ও কাশীধাম দর্শন। কাশী থেকে অযোধ্যায়। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে (প্রায় এক বৎসর) অবস্থান। স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষাদানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ দান—যোগানন্দকে দীক্ষাদানের মাধ্যমে শ্রীমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের শুরু। বৃন্দাবন থেকে হরিদ্বার ও জয়পুর দর্শন। কলকাতার পথে প্রয়াগে।

১৮৮৭—৩১ আগস্ট, কলকাতা প্রত্যাবর্তন ও বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান।

পক্ষকাল পরে কামারপুকুর যাত্রা। পথে দক্ষিণেশ্বরে সকল দেবদেবীকে প্রণাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিগুলি দর্শন।

কামারপুকুরে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন—প্রায় নিঃস্বজীবন যাপন। 'ত্রৈলোক্য আমাকে সাতটি করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহরাখার পর দীনু খাজাঞ্চী ও অন্য সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে। আত্মীয় যারা ছিল তারাও মানুষবুদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।'

কামারপুকুরে নিঃসঙ্গতার বেদনা ও সন্তানহীনতায় দুঃখ। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনদান ও আশ্বাসঃ 'তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এইসব রত্ন ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে "মা" "মা" বলে ডাকবে।' গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সঙ্কল্প—শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন দান। 'কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসবার পর, ...একদিন দেখিকি, সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল, এইসব যত ভক্তেরা—কত লোক। দেখিকি, ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে।—এই জলের স্রোত। ...দেখছি ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা! আমি তাড়া-তাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলুম।' গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ।

১৮৮৮—মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫), ভক্তদের চেষ্টায় বলরাম বসুর গৃহে আগমন।

বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের ভাড়াটে বাড়িতে মাস ছয়েক অবস্থান। স্বামী অভেদানন্দ-রচিত সারদাস্তোত্র, 'প্রকৃতিং পরমাম্' শ্রবণে আশীর্বাদ। গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সাহচর্যে তপশ্চরণ। নির্বিকল্প সমাধি।

৫ নভেম্বর, বলরাম বসুর বাড়ি থেকে জাহাজে পুরী যাত্রা।

৭ নভেম্বর, চাঁদবালিতে উপস্থিতি। লঞ্চে কটক ও সেখান থেকে গোযানে পুরীধাম। বলরামবাবুর ক্ষেত্রবাসীর মঠে অবস্থান। বস্ত্রাঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো-সহ মন্দিরে উপস্থিতি এবং তাঁকে জগন্নাথমূর্তি প্রদর্শন। উপলব্ধিঃ 'জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ—রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছি।'

১৮৮৯—১২ জানুয়ারি, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও ভক্ত 'নগা'-র গৃহে অবস্থান।

১৩ জানুয়ারি, নিমতলায় গঙ্গাস্নান।

২২ জানুয়ারি, কালীঘাটে দেবীদর্শন।

৫ ফেব্রুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী

প্রেমানন্দ, শ্রীম প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুর গমন।
(আনুমানিক) ১২ ফেব্রুয়ারি, তারকেশ্বর হয়ে কামারপুকুর প্রত্যাবর্তন।
ডিসেম্বর, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তপস্যার জন্য পশ্চিম গমনে অনুমতি দান।

১৮৯০—(আনুমানিক) বৎসরের প্রারম্ভে কলকাতায় আগমন ও বেলুড়ে রাজু গোমস্তার গৃহে অবস্থান।
৪ মার্চ, কম্বুলিয়াটোলায় শ্রীম-র গৃহে।
২৫ মার্চ, স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে গয়াধাম যাত্রা। পথে বৈদ্যনাথ দর্শন। গয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদেবীর পিণ্ডদান। বুদ্ধগয়া দর্শন।—সন্ন্যাসী-সন্তানদের মাথা গোঁজার ঠাঁই-এর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা।
২ এপ্রিল, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও শ্রীম-র গৃহে অবস্থান।
বলরাম বসুর অসুস্থতার সংবাদে বলরাম-ভবনে উপস্থিতি।
১৩ এপ্রিল, বলরাম বসুর দেহত্যাগ।
মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭), বেলুড়ের ঘুষুড়ি অঞ্চলে শ্মশানের কাছে ভাড়াবাড়িতে অবস্থান।
জুলাই, স্বামী বিবেকানন্দের প্রব্রজ্যা সংকল্প ও মাতৃ-আশীর্বাদ প্রার্থনা।
সঙ্গী স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রতি নির্দেশঃ 'বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলুম। তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জান, দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।'
আগস্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র), রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত। বরাহনগরে সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাড়াবাড়িতে আগমন।
শিশুপুত্র-সহ গিরিশচন্দ্রের মাতৃপাদপদ্ম (প্রথম) দর্শন।
রোগ উপশমের পর বলরাম-ভবনে অবস্থিতি।
অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক ১২৯৭), কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী গমন।

১৮৯১—(আনুমানিক) এপ্রিল-মে, জয়রামবাটীতে গিরিশের উপস্থিতি এবং মাতৃ-দর্শনে তাঁর অতীত স্মৃতির জাগরণ। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুমূর্ষু গিরিশের মুখে এক অপরিচিত মাতৃমূর্তি মহাপ্রসাদ দিয়ে বলেনঃ 'খাও, ভাল হয়ে যাবে।' প্রথম মাতৃমুখ-দর্শনে গিরিশের সবিস্ময় উক্তিঃ 'এ্যাঁ মা, তুমি।' গিরিশের প্রশ্নের উত্তরে মায়ের উক্তিঃ 'আমি সত্যিকারের মা ; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।' কয়েকমাস অবস্থানের পর গিরিশের কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
১০ নভেম্বর, জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজায় স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির উপস্থিতি।

১৮৯৩—(আনুমানিক) এপ্রিলের শেষাশেষি, স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশগমনে অনুমতি প্রার্থনা। অনুমতি দানে দ্বিধা। ঠাকুরের নির্দেশ লাভ করে স্বামীজীকে অনুমতি-পত্র।
৩১ মে, স্বামীজীর বিদেশযাত্রা।
জুন-জুলাই (আষাঢ় ১৩০০), বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থিতি।

যোগীন-মার সঙ্গে পঞ্চতপানুষ্ঠান। 'পঞ্চতপা-টপা এসব করে শরীরকে কষ্ট দেওয়া কেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরেঃ 'তপস্যা দরকার...পার্বতীও শিবের জন্যে করেছিলেন।...এ-সব করা লোকের জন্য।'
পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গায় অভিনব দৃশ্য দর্শনঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ...দ্রুতপদে গঙ্গায় নামিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্ময় দেহ...পবিত্র নীরে মিশিয়া গেল।... স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে দুই হস্তে সেই ব্রহ্ম-বারি লইয়া চারিদিকে অগণিত নরনারীর মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।... অসীম জনসঙ্ঘ সেই জলস্পর্শে সদ্যোমুক্তি লাভ করিতেছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার তাৎপর্য উপলব্ধি এবং বিশ্বাস যে, 'সে-লীলার পুষ্টিবিধানের জন্য তাঁহারও এই নরদেহে অবস্থানের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে।' জগদ্ধাত্রীপূজার আগে জয়রামবাটী গমন।

১৮৯৪—জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (মাঘ ১৩০০), কন্যার মৃত্যুতে কাতর বলরাম বসুর পত্নীর সঙ্গে কৈলোয়ার গমনের জন্য কলকাতায় আগমন।
বলরাম-পত্নী কৃষ্ণভাবিনী ও তাঁর জননী, গোলাপ-মা, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, এবং স্বামী যোগানন্দের পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে কৈলোয়ার গমন ও দুমাস অবস্থান।
(আনুমানিক) এপ্রিল, জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন।
(আনুমানিক) সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেলুড়ে অবস্থিতি।
দুর্গাপূজায় স্বামী প্রেমানন্দের জননী মাতঙ্গিনী দেবীর আমন্ত্রণে আঁটপুরে উপস্থিতি ও পূজায় যোগদান।
জয়রামবাটী গমন।

১৮৯৫—(আনুমানিক) ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ (ফাল্গুনের শুরু, ১৩০১), জননী ও সহোদরগণের সঙ্গে কাশী হয়ে বৃন্দাবনে; সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মা।
(আনুমানিক) ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ (ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০১), বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান।
(আনুমানিক) এপ্রিলের মাঝামাঝি, কলকাতায় আগমন ও কম্বুলিয়াটোলায় শ্রীম-র গৃহে প্রায় একমাস অবস্থান।
১৩ মে, জয়রামবাটী গমন (পথে কামারপুকুরে)।
নভেম্বর, কয়েকদিনের জন্য কামারপুকুরে—সঙ্গে গোলাপ-মা।
জয়রামবাটী গমন।

১৮৯৬—এপ্রিল (শেষার্ধ), কলকাতায় আগমন এবং ৫৯।২ রামকান্ত বসু স্ট্রীটে শরৎ সরকারের গৃহে অবস্থান।
বিদেশ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রে সকলকে নরনারায়ণ সেবার আহ্বান; সেই পত্র-শ্রবণে মন্তব্যঃ 'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে নরেনকে দিয়ে এইসব লিখাচ্ছেন।'
মে (শেষার্ধ), বাগবাজারে গঙ্গার ধারে সরকারবাড়ি লেনের গুদামবাড়ির ত্রিতলে

গোলাপ-মা, গোপালের মা ও অন্যান্য স্ত্রীভক্ত সহ অবস্থান। দ্বিতলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ ও দু-এক জন সাধু-ব্রহ্মচারী। একতলায় হলুদের গুদাম। কালীপূজার পর জয়রামবাটী গমন।

১৮৯৭—১৯ ফেব্রুয়ারি, বিদেশ থেকে স্বামীজীর কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
সকাল সাড়ে সাতটায় বজবজ থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে। বিপুল সংবর্ধনা।

১৮৯৮—৩ ফেব্রুয়ারি, বেলুড় মঠের জমির জন্য বায়না।
১৩ ফেব্রুয়ারি, মঠ আলমবাজার থেকে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত।
৫ মার্চ, বেলুড় মঠের জমি রেজিস্ট্রিকৃত।
মার্চ, কলকাতায় আগমন ও ১০।২ বোসপাড়া লেনে অবস্থান।
১৪ মার্চ, স্বামী বিবেকানন্দের বহু ভক্তসহ মাতৃসন্দর্শনে আগমন।
১৭ মার্চ, ভগিনী নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুলের মাতৃসন্দর্শন। নিজ কন্যারূপে গ্রহণ ও একত্রে আহার। স্বামী বিবেকানন্দের বিস্ময়ঃ 'ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে আহার করিয়াছেন! ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?' ডায়েরীতে নিবেদিতার মন্তব্যঃ 'একটি সেরা দিন।' (a day of days)

এপ্রিল, স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে মঠের নির্মাণকার্য শুরু।
৭ এপ্রিল, নির্মীয়মান মঠে আগমন—নিবেদিতা, ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল কর্তৃক সংবর্ধনা ও মঠের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন। পরিতৃপ্ত মন্তব্যঃ 'এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।'
অক্টোবর, অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন-অনন্তর স্বামী বিবেকানন্দের মঠে প্রত্যাবর্তন।

মহাষ্টমী-পূজার দিন বাগবাজারে মাতৃসমীপে; সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ।
নভেম্বর, মিসেস ওলি বুলের আগ্রহে হ্যারিংটন-কর্তৃক আলোকচিত্র গ্রহণ।
১২ নভেম্বর (কার্তিক ১৩০৫), প্রভাতে মঠভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিসহ আগমন ও স্বহস্তে পূজা। অপরাহ্ণে কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
১৩ নভেম্বর, প্রভাতে ১৬ বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দেরও সেখানে উপস্থিতি।
৯ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান।
১০ ডিসেম্বর, বেলুড় মঠে কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিতি।

১৮৯৯—২ জানুয়ারি, নীলাম্বরবাবুর বাগান পরিত্যাগ করে সকল সন্ন্যাসীর বেলুড় মঠে অবস্থান শুরু।
১৩ মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি। সকালে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের

প্রতিকৃতির কাছে স্বহস্তে পূজা ও ভোগ নিবেদন—সন্ধ্যায় নিবেদিতা ও তাঁর স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে চ্যাটার্জী নার্সারীতে অর্কিডকুঞ্জ পরিদর্শন।
২৮ মার্চ (১৫ চৈত্র ১৩০৫), স্বামী যোগানন্দের মহাসমাধি। মায়ের শোকার্ত উক্তিঃ 'জানি, জানি, সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সেকথা আমি জানি—কিন্তু সে যে আমার যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন!' 'বাড়ির একখানি ইট খসল; এবার সব যাবে।'
২০ জুন, স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা ; সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা।
২ আগস্ট, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণের মৃত্যু।
৩০ অক্টোবর, জয়রামবাটী গমন।

১৯০০—২৬ জানুয়ারি, অভয়চরণের বিধবা স্ত্রী সুরবালার কন্যা রাধারানীর (রাধুর) জন্ম।
ঠাকুরের দর্শনদান এবং রাধুকে অবলম্বন করে শরীর রক্ষা করতে নির্দেশ।
কামারপুকুরে অসুস্থতা। জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন, কলেরায় আক্রান্ত।
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের জয়রামবাটী গমন।
অক্টোবর, কলকাতায় আগমন—সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারানী, খুল্লতাত নীলমাধব, মানগরবিনী (ভানুপিসী) ও বিকৃতমস্তিষ্কা ভ্রাতৃজায়া সুরবালা।
১৬-এ বোসপাড়া লেনে অবস্থান।
৯ ডিসেম্বর, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-অভিযানের শেষে স্বামীজীর বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন।

১৯০১—২৪ ফেব্রুয়ারি, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বেলুড় মঠে।
১৮-২২ অক্টোবর, স্বামীজী-কর্তৃক বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব।
শ্রীমাকে স্ত্রীভক্তগণ-সহ নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে এনে রাখা হয়। মায়ের অনুমতি নিয়ে পূজার ব্যবস্থা হয় এবং স্বামীজীর নির্দেশে মায়ের নামেই সঙ্কল্প হয়। মায়ের নির্দেশে দেবীপূজায় পশুবলি বন্ধ থাকে। সেবক কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজকের আসন গ্রহণ করেন আর তন্ত্রধারক হন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজী শ্রীমায়ের হাত দিয়ে তন্ত্রধারককে পঁচিশ টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন।
(আনুমানিক) বৎসরান্তে সুরবালা এবং রাধু-সহ জয়রামবাটী গমন।

১৯০২—৪ জুলাই (২০ আষাঢ় ১৩০৯), স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি।
৩১ আগস্ট (১৫ ভাদ্র ১৩০৯), স্বামী বিমলানন্দকে লেখা পত্রঃ 'আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'
১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বামীজী যখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গিয়েছিলেন, তখন অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার ব্যবস্থা দেখে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য স্বামী বিমলানন্দ শ্রীমাকে পত্র লেখেন। তার উত্তরে শ্রীমা এই তারিখে পত্রটি লেখেন। স্বামী বিমলানন্দের হাতে পত্রটি পৌঁছায় ৭ সেপ্টেম্বর।

১৯০৩—(আনুমানিক) জগদ্ধাত্রীপূজার সময় থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত জয়রাম-বাটীতে। অবশিষ্ট সময় কলকাতায়।

১৯০৪—১৪ ফেব্রুয়ারি, কলকাতায় ২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে। (এই বাড়িতে তিনি দেড়বছর অবস্থান করেন।) মিসেস ওলি বুলের মাসিক আর্থিক সাহায্যদান শুরু। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর।
রথযাত্রার দিন এন্টালী শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনালয়ে।
জন্মাষ্টমী উৎসবে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে।
নভেম্বর-ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ ১৩১১), পুরী গমন। সঙ্গে খুল্লতাত নীলমাধব, সুরবালা, রাধারানী, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদেবী, শ্রীম-র স্ত্রী, চুনিলাল বসুর স্ত্রী, কুসুমকুমারী এবং স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ তিনজন পুরুষ। ক্ষেত্রবাসীর মঠে অবস্থান। পায়ের ফোড়া; অস্ত্রোপচার। মাতা শ্যামাসুন্দরী, কালীমামা প্রমুখকে পুরী আনয়ন। পরে শ্রীম এবং বরদামামারও পুরী আগমন।

১৯০৫—জানুয়ারি (মাঘের প্রথমার্ধ ১৩১১), কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।
(আনুমানিক) মার্চ-এপ্রিল, নীলমাধবের মৃত্যু। শববাহকদের মধ্যে শূদ্রের উপস্থিতিতে গোলাপ-মায়ের আপত্তির উত্তরেঃ 'শুদ্দুর কে গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?'
এপ্রিল (২২ চৈত্র ১৩১১), চিৎপুর রোডে বি. দত্তের স্টুডিওতে ফটো গ্রহণ—সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, রাধু প্রভৃতি।
মে, ভ্যানডাইক কোম্পানীর চৌরঙ্গীস্থ স্টুডিওতে স্বামী বিরজানন্দের আগ্রহে ফটো গ্রহণ—'শ্রীমা সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁহার দক্ষিণে টবে একটি ছোট গাছ রহিয়াছে।'
মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২), বিষ্ণুপুরের পথে জয়রামবাটীতে।
প্রসন্নকুমারের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু—তাঁর দুই কন্যা নলিনী ও মাকুর ভারগ্রহণ।

১৯০৬—জানুয়ারি (মাঘ ১৩১২, প্রথম সপ্তাহ), শ্যামাসুন্দরীর দেহত্যাগ। মাতৃশ্রাদ্ধ।
(আনুমানিক) মার্চ-এপ্রিল, কলকাতায় আগমন—২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের বাসভবনে অবস্থান।
৮ জুলাই (২৪ আষাঢ় ১৩১৩), গোপালের মার মহাসমাধি।
১৮ জুলাই, কেদার দাস-কর্তৃক বাগবাজারে গোপাল নিয়োগী লেনে (বর্তমান ১ উদ্বোধন লেন) তিনকাঠা চারছটাক জমি বেলুড় মঠকে দান। ঐ জমিতে মাতৃমন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা।
জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বে জয়রামবাটীতে উপস্থিতি।

১৯০৭—অক্টোবর, গিরিশভবনে দুর্গাপূজায় যোগদানের জন্য অসুস্থ-অবস্থায় কলকাতা আগমন। বলরাম-ভবনে অবস্থান এবং সেখান থেকে গিরিশের পূজায় যোগদান। 'তিনদিনই শ্রীমা সকলের অর্ঘ্য লইলেন; গিরিশের আত্মীয়স্বজন, এমনকি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচিত-অপরিচিত কেহই বঞ্চিত হইল না।'
১১ নভেম্বর, বিষ্ণুপুরের পথে দেশে গমন।
পাঁচ হাজার সাতশ টাকা ঋণ নিয়ে স্বামী সারদানন্দ-কর্তৃক 'মায়ের বাড়ি'র নির্মাণকার্য শুরু।

১৯০৮—(শেষ ভাগ) এগারো হাজার টাকা ব্যয়ে 'মাতৃমন্দির' নির্মাণকার্যের সমাপ্তি এবং 'উদ্বোধন' কার্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত।

১৯০৯—কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে উপস্থিতি।

২৪ মার্চ, ভ্রাতাদের সম্পত্তির বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য মায়ের আহ্বানে স্বামী সারদানন্দের জয়রামবাটীতে উপস্থিতি। সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগীন-মা ও একজন ব্রহ্মচারী। ভ্রাতাদের কলহ ও কুশ্রী স্বার্থপরতার মধ্যে অবিচলিত শ্রীমা সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দের বিস্ময়ঃ 'আমাদের তো দেখছ—পান থেকে চুন খসলে আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভায়েরা কী কাণ্ডই করছেন; অথচ তিনি যেমন তেমনটিই আছেন—ধীর স্থির।'

২১ মে, সম্পত্তি-বণ্টন শেষ করে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে কলকাতা যাত্রা।

২৩ মে, 'উদ্বোধন'-বাড়িতে প্রথম পদার্পণ। দ্বিতলে থাকার ব্যবস্থা, নিচে 'উদ্বোধন' কার্যালয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য নির্মিত বেদীর উপর নিবেদিতা-রচিত রেশমী চন্দ্রাতপের নিচে চিত্র-প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থায় গররাজিঃ 'ঠাকুরকে ছেড়ে আমার থাকা চলে না, থাকা উচিতও নয়।' ঠাকুরঘরেই থাকার ব্যবস্থা।

জুন, পানিবসন্তে আক্রান্ত।' 'স্বামী শান্তানন্দের স্মারকলিপিতে আছে যে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন তিনি কাশী হইতে শ্রীমায়ের বাটীতে পেঁাছিয়া স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "মায়ের বসন্ত হয়েছে।"'

জুলাই, মাতৃচরণপ্রান্তে ভগিনী দেবমাতা।

কারাগার-মুক্ত বিপ্লবীদের প্রণাম-নিবেদনে মন্তব্যঃ 'কী সাহস! ঠাকুর আর নরেনই এদের এত ভয়হীন করে তুলেছেন। সব তাঁদের দোষ!'

৪ আগস্ট, মাতৃপদপ্রান্তে লেডি অবলা বসু। সকল বড় বড় জাতীয়তাবাদীরা প্রণাম নিবেদন করতে আসছেন দেখে নিবেদিতার মন্তব্যঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "তুমি অনেক সন্তানের মা হবে"—সেকথা আজ সত্য হয়েছে। এখন সারা দেশটাই তোমার।' শ্রীমার উত্তরঃ 'তাই তো দেখছি!'

২১ আগস্ট, যোগোদ্যানে।

২৯ আগস্ট, মিস্টার লেগেটের মৃত্যু। মৃত্যুসংবাদে বিচলিত মায়ের মন্তব্যঃ 'ওঁরা ভাগ্যবান মানুষ।'

৬ সেপ্টেম্বর, জন্মাষ্টমীতে যোগোদ্যানে।

১২ সেপ্টেম্বর, মিনার্ভা থিয়েটারে 'পাণ্ডবগৌরব' নাটক দেখার সময় মঞ্চে দেবী-মূর্তির আবির্ভাব-দর্শনে সমাধি।

৬ অক্টোবর, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে সংবর্ধনা। অসুস্থতা।

লক্ষ্মী দত্ত লেনের দত্ত-গৃহে যতীন মিত্রের কীর্তনগানে উপস্থিতি। মাথুরগানের পর মিলনের পালা-শ্রবণে গভীর ভাবাবস্থা—গোলাপ-মায়ের উক্তিঃ 'সেই বৃন্দাবনে মায়ের ভাব দেখেছিলুম, আর আজ এই দেখলুম।'

১৬ নভেম্বর, জয়রামবাটী যাত্রা।

১৪ ডিসেম্বর, 'উদ্বোধন'-বাড়ি প্রসারের জন্য এক হাজার আটশ টাকায় পার্শ্ববর্তী এককাঠা চারছটাক জমি ক্রয়।

১৯১০—জুলাই, সাত-আট মাস দেশে অবস্থানের পর কলকাতায় আগমন।
৫ ডিসেম্বর, রামকৃষ্ণ বসুর জননীর ইচ্ছানুসারে বলরাম বসুর উড়িষ্যার জমিদারি কোঠারে।

১৯১১—কোঠারে সরস্বতীপূজার পূর্বদিন খ্রীষ্টধর্মান্তরিত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীমায়ের বিধানে হিন্দুধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সরস্বতীপূজার দিন দেবেন্দ্রবাবুকে মন্ত্রদীক্ষা। উড়িয়া যাত্রাভিনয় দর্শন।
ফেব্রুয়ারি, রামেশ্বর-দর্শনের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্য যাত্রা।
মাদ্রাজ—মায়লাপুরে ভাড়াবাড়ি 'সুন্দরবিলাস'-এ অবস্থান।
রামেশ্বরের পথে মাদুরায়। মীনাক্ষী মন্দির, তিরুমল নায়েকের প্রাসাদ ও তেপ্পাকুলম্ সরোবর দর্শন।
রামেশ্বরের পথে মণ্ডপম্ থেকে স্টীমারে পাম্বানে এবং রেলযোগে রামেশ্বরে। রামেশ্বরের গর্ভমন্দিরে কনকাবরণ-উন্মুক্ত শিবলিঙ্গকে একশ আট স্বর্ণ-বিল্বপত্রে পূজা। মন্তব্যঃ 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম ঠিক তেমনটিই আছে।' রামনাদের রাজার ইচ্ছায় মন্দিরসংলগ্ন রত্নাগার দর্শন।
ধনুষ্কোটি-তীর্থে রূপার তীরধনুক-সহ পূজাদানের জন্য দুই সেবককে প্রেরণ।
২৪ মার্চ, ব্যাঙ্গালোরে। গাঁবপুরে গুহামন্দির দর্শন।
একসপ্তাহ পরে, মাদ্রাজে।
দুই-এক দিন পর কলকাতা যাত্রা। রাজমহেন্দ্রীতে একদিনের জন্য জেলা-জজ পার্থসারথি আয়েঙ্গারের আতিথ্যগ্রহণ।
তিন-চার দিন পুরীতে বলরামবাবুদের অপর গৃহ 'শশীনিকেতনে' অবস্থান।
১১ এপ্রিল, কলকাতা আগমন। বেলুড় মঠে অভ্যর্থনা।
১২ মে, নিবেদিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।
১৭ মে, জয়রামবাটী যাত্রা।
১০ জুন, রাধুর বিবাহে উপস্থিতি; পাত্র—তাজপুর নিবাসী মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২১ আগস্ট, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধি। কাতর উক্তিঃ 'শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙে গেছে।'
১৩ অক্টোবর, দার্জিলিং-এ নিবেদিতার তিরোভাব। নিবেদিতার প্রসঙ্গ উঠলে মা কাঁদতেন। আক্ষেপ করে বলেছেনঃ 'যে হয় সুপ্রাণী তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী।'
২৪ নভেম্বর, কলকাতায় আগমন। পথে কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুরের ছবি প্রতিষ্ঠা ও পূজা। স্বদেশী-আন্দোলনের কেন্দ্র কোয়ালপাড়ায় নির্দেশঃ 'যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।'

১৯১২—১৬ অক্টোবর (দুর্গাপূজার বোধন), সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে আগমন। মঠের ফটক থেকে ঘোড়া খুলে সন্ন্যাসীরা ঘোড়ার গাড়ি টানেন। পূজার সুষ্ঠু আয়োজন দর্শনে আনন্দিত মন্তব্যঃ 'সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।'
১৮ অক্টোবর (মহাষ্টমী), তিন শতাধিক ভক্তের প্রণাম গ্রহণ। রাত্রে 'জনা' নাটক অভিনয় দর্শন।

২০ অক্টোবর (বিজয়া দশমী), 'রামাশ্বমেধ' যাত্রাভিনয় দর্শন। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় নৌকায় ডাক্তার কাঞ্জিলালের কৌতুকব্যঙ্গ, বিচিত্র মুখভঙ্গি দর্শনে বিরক্ত ব্রহ্মচারীর আপত্তিতে মন্তব্যঃ 'না, না, এসব ঠিক। গানবাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।'

২২ অক্টোবর, উদ্বোধনে প্রত্যাবর্তন।

৫ নভেম্বর, তৃতীয়বার কাশীধামে। বেলা একটায় শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে 'লক্ষ্মীনিবাসে'। সঙ্গে গোলাপ-মা, ভানুপিসী, সস্ত্রীক শ্রীম প্রভৃতি। প্রশস্ত বারান্দা দর্শনে মন্তব্যঃ 'ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।'

৬ নভেম্বর, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন।

৯ নভেম্বর, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে। মন্তব্যঃ 'এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন।' সেবাশ্রমে দশটাকা দান।

সারনাথ দর্শন।

৩০ ডিসেম্বর, অদ্বৈত আশ্রমে নিজ জন্মতিথি উৎসবে উপস্থিতি।

১৯১৩—১৬ জানুয়ারি, কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

২৩ ফেব্রুয়ারি জয়রামবাটী যাত্রা। পথে কোয়ালপাড়া আশ্রমে বিশ্রাম।

৭ মে, ভূদেবের (কালীকুমারের পুত্র) বিবাহ।

(আনুমানিক) জুন-জুলাই, আমাশয় রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার কাঞ্জিলাল, সুধীরা দেবী, শ্রীম-র স্ত্রী প্রভৃতির আগমন।

কোয়ালপাড়া আশ্রমে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। আশ্রমাধ্যক্ষ কেদারনাথকে নির্দেশঃ 'ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের ভোগ ও অন্তত শনি মঙ্গল বারে মাছ ভোগ দেবে ; আর যেমন করেই হোক তিন তরকারির কম ভোগ দিতে পারবে না। অত কঠোরতা করলে দেশের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুঝবে কেমন করে?'

২৯ সেপ্টেম্বর, কলকাতায়।

১৯১৫—১৯ এপ্রিল, জয়রামবাটী যাত্রা। কোয়ালপাড়ায় নতুন বাড়ি দেখে আনন্দ প্রকাশ।

(আনুমানিক) সেপ্টেম্বর, কোয়ালপাড়ায় নতুন বাড়িতে, সঙ্গে রাধু, মাকু, নলিনী প্রভৃতি। পনের দিন অবস্থান।

(জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারে নানাবিধ অশান্তি। তাই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা কোয়ালপাড়ার আশ্রমাধ্যক্ষ কেদারবাবুকে একটি নতুন বাড়ি, যেখানে তিনি ইচ্ছামতো থাকতে পারবেন, তৈরী করতে বলেন। সেই কথা-অনুযায়ী বাড়িটি নির্মিত হয়। বাড়িটি পরে 'জগদম্বা আশ্রম' নামে পরিচিত হয়।)

১৯১৬—১৫ মে, জয়রামবাটীতে দুই সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে পুণ্যপুকুরের পশ্চিম-তীরে নির্মিত গৃহে প্রবেশ। 'বাটীর উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীমায়ের জন্য দক্ষিণ-দ্বারী ঘর, উহার দক্ষিণে পশ্চিমমুখে বৈঠকখানা বা জগদ্ধাত্রীপূজা মণ্ডপ, মায়ের ঘরের ঠিক উলটো দিকে নলিনীদিদি ও ভক্ত-মেয়েদের বাসস্থান এবং বাড়ির উত্তরপূর্ব কোণে রন্ধনশালা ; ইহার পরে উত্তরধারে চালা নামাইয়া আর

একখানি ছোট রান্নাঘর। ...বাড়ির ভূমি-সংগ্রহের সমকালেই পুণ্যপুকুরও...ক্রীত হয়।'

৭ জুলাই, স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায় নতুন বাড়ি ও জগদ্ধাত্রীর জন্য ক্রীত ধানজমির অর্পণনামা রেজিস্ট্রিকালে কোতুলপুরে উপস্থিতি।

৮ জুলাই, বিষ্ণুপুরে উপস্থিতি এবং সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে সারাদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর কলকাতায় আগমন।

৩-৬ অক্টোবর, দুর্গাপূজায় বেলুড় মঠে—উত্তরের উদ্যানবাটীতে অবস্থান। স্বামী সারদানন্দের মন্তব্যঃ 'এখানে (মঠে) তো তাঁরই (শ্রীমার) পূজা হল।'

১৯১৭—৩১ জানুয়ারি, জয়রামবাটী যাত্রা। পথে কোয়ালপাড়ায় নিজ বাড়িতে (জগদম্বা আশ্রমে) দুই দিন অবস্থানের পর জয়রামবাটীতে।

(আনুমানিক) নভেম্বর, জয়রামবাটীর নতুন বাড়িতে প্রথম জগদ্ধাত্রীপূজায় যোগদান।

১৯১৮—৪ জানুয়ারি, স্বীয় জন্মোৎসবে প্রবল জ্বর।

২১ জানুয়ারি, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য স্বামী সারদানন্দ, ডাক্তার সতীশ চক্রবর্তী, ডাক্তার কাঞ্জিলাল, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও সরলাদেবীর জয়রাম-বাটীতে গমন।

ডাক্তার কাঞ্জিলালের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ।

জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়ায় স্বদেশীদের খোঁজে পুলিসের উৎপাত। ভক্ত বিভূতিবাবুর চেষ্টায় পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আশ্বাস। স্বামী সারদা-নন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তন। স্বামী জ্ঞানানন্দের আগমনে নতুন জটিলতা ও পুলিসী তদন্ত—মণীন্দ্রনাথ বসুর (আরামবাগের উকিল) চেষ্টায় মীমাংসা।

মার্চ, কোয়ালপাড়ায় উপস্থিতি। সেখানে পরে প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী।

১০ এপ্রিল, স্বামী সারদানন্দের কাছে তারবার্তা। সেই রাতেই ডাক্তার কাঞ্জি-লালকে কোয়ালপাড়ায় প্রেরণ।

১৭ এপ্রিল, স্বামী সারদানন্দ, ডাক্তার সতীশ চক্রবর্তী ও যোগীন-মায়ের কোয়াল-পাড়ায় উপস্থিতি।

২১ এপ্রিল, আরোগ্যের পর অন্নপথ্য।

২৯ এপ্রিল, স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে জয়রামবাটীতে।

৫ মে, কলকাতা যাত্রা। পথে কোয়ালপাড়ায় একরাত্রি বিশ্রাম।

৭ মে, উদ্বোধনে।

৩০ জুলাই, স্বামী প্রেমানন্দের দেহত্যাগ। মহাসমাধির সংবাদে কাতর উক্তিঃ 'ঠাকুর, নিলে।' 'মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরাম-রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।'

৩১ ডিসেম্বর, রাধু-সহ নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে।

১৯১৯—২৭ জানুয়ারি, রাধু-সহ জয়রামবাটীর পথে। বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে।

২৯ জানুয়ারি, রাত্রি এগারোটায় কোয়ালপাড়ায়। রাধুর ইচ্ছায় জয়রামবাটীর বদলে কোয়ালপাড়াতেই যাত্রা সমাপ্তি। 'জগদম্বা আশ্রমে' অবস্থান। রাধুর

মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ। নানাবিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থা।
২০ এপ্রিল, মাকুর শিশুপুত্রের (ন্যাড়া) মৃত্যু।
৭ মে, রাধুর প্রথম সন্তানের জন্ম।
২৩ জুলাই, জয়রামবাটী গমন।
১৩ ডিসেম্বর, জয়রামবাটীতে জন্মতিথি উৎসব। বিকাল থেকেই জ্বরের সূত্রপাত।
বিরতিসহ পুনঃপুনঃ জ্বর।

১৯২০—১৭ ফেব্রুয়ারি, স্বামী সারদানন্দের ভুবনেশ্বর থেকে প্রত্যাবর্তন এবং স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ ও অপর দুজনকে জয়রামবাটী প্রেরণ।
২৪ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার উদ্দেশে জয়রামবাটী ত্যাগ।
২৭ ফেব্রুয়ারি, রাত্রি নটায় উদ্বোধনে।
২৮ ফেব্রুয়ারি, ডাক্তার কাঞ্জিলালের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু।
১২ মার্চ, অবস্থা অপরিবর্তিত। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসা শুরু।
৮ এপ্রিল, ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য বিপিনবিহারী ঘোষকে আহ্বান।
২৪ এপ্রিল, স্বামী অদ্ভুতানন্দের মহাসমাধি।
১ মে, অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় ডাক্তার প্রাণধন বসুকে আহ্বান। রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডাক্তার নীলরতন সরকারকে আনয়ন।
১৪ মে, রামকৃষ্ণ বসুর দেহত্যাগ।
১৬ মে, ডাক্তার প্রাণধন বসু-কর্তৃক শ্রীমার রোগ কালাজ্বর-রূপে নির্দেশ।
২০ মে, জয়রামবাটীতে নিউমোনিয়া জ্বরে সহোদর বরদাপ্রসন্নের মৃত্যু।
১ জুন, অবস্থা অপরিবর্তিত। কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেনকে আহ্বান। একই-সঙ্গে কবিরাজ কালীভূষণ সেনের চিকিৎসা।
১৪ জুলাই (তিরোভাবের সাতদিন পূর্বে), স্বামী সারদানন্দের প্রতিঃ 'শরৎ এরা রইল।'
১৬ জুলাই (দেহাবসানের পাঁচদিন পূর্বে), অন্নপূর্ণার মায়ের প্রতিঃ 'যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' সান্ত্বনা বাণীঃ 'শরৎ রইল, ভয় কি!'
২১ জুলাই (৪ শ্রাবণ ১৩২৭), রাত্রি দেড়টায় মহাসমাধি।
২১ জুলাই, বেলা সাড়ে দশটার সময় স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে মরদেহসহ শোকযাত্রা। বরাহনগর থেকে নৌকাযোগে বেলুড় মঠ।
বেলা তিনটায় স্বামীজীর মন্দিরের উত্তরে (বর্তমানে মাতৃমন্দির) গঙ্গাতীরে আহুতি দান।

১৯২১—২১ ডিসেম্বর (৬ পৌষ ১৩২৮), জন্মতিথি-দিবসে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা।

কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যার কোন নির্দিষ্ট কাল নির্ণয় সম্ভব নয়ঃ

(১) দক্ষিণেশ্বরের পথে তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত-দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং

তাদের আশ্রয়ে রাত্রি যাপন। ঘটনাটি যে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ঘটেনি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ শ্রীমা তাঁর সঙ্গিনীদের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর উপস্থিতির কথা বলেছেন—লক্ষ্মীদেবী সঙ্গিনীরূপে প্রথম আসেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। লক্ষ্মীদেবীর প্রথমবার আগমনের সময়ও ঘটনাটি ঘটেনি কারণ সেসময় সঙ্গে ছিলেন মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। শ্রীমা তাঁর মায়ের উপস্থিতির কথা কখনও বলেননি- শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে পরিত্যাগ করে অগ্রসর হবেন এটা সম্ভবও নয়। সুতরাং এটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালের ঘটনা, সেসময় লক্ষ্মীদেবী সহযাত্রিণী ছিলেন।

(২) দক্ষিণেশ্বরে আগমন-সম্পর্কিত তথ্যপঞ্জী অসম্পূর্ণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, তাঁর প্রদত্ত তথ্য ছাড়াও শ্রীমা আরও কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন।

(৩) দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীমায়ের জিহ্বায় শ্রীরামকৃষ্ণ বীজমন্ত্র লিখে দেন। পরদিবস লক্ষ্মীদেবীকে ঘটনাটি জানিয়ে তাঁকেও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠান অনুরূপ বীজমন্ত্র লাভের জন্য।

(৪) দক্ষিণেশ্বর-বাসকালে মাতৃত্বের উত্তরোত্তর বিকাশ-সূচক কয়েকটি ঘটনাঃ

(ক) বালক-ভক্তগণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ধারিত আহার্যের অতিরিক্ত ব্যবস্থা—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরেঃ 'ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।' এই উক্তিটি শ্রীমা করেন স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজের) প্রসঙ্গে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫।৩।২, শ্রীম-এর ঠাকুরবাটী থেকে প্রকাশিত সংস্করণ) অনুযায়ী বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের কাছে আসেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। কাজেই এই ঘটনা তার আগে ঘটেনি।

(খ) বিপথগামিনী স্ত্রীলোকের হাতে ভোজ্যদ্রব্য প্রেরণে ঠাকুরের নিষেধের উত্তরেঃ 'তা তো আমি পারব না ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব, কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।'

(গ) কালীপদ ঘোষের স্ত্রীকে আশ্বাস ও আশীর্বাদী বিল্বপত্র দান—ফলে বিপথগামী কালীপদ ঘোষের মানসিক পরিবর্তন।

(৫) মারোয়াড়ী-ভক্ত লছমীনারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দশ হাজার টাকা দিতে চাইলে তিনি শ্রীমাকে পরীক্ষার জন্য তাঁকে বলেনঃ 'এই টাকা দিতে চায়। আমি নিতে পারব না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে।' উত্তরে শ্রীমা বলেনঃ 'তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ও-টাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না করে থাকতে পারব না...কাজেই ও-টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।'

(৬) তিরোভাবের কিছুদিন পূর্বে দেবমাতাকে শ্রীমা শেষ পত্রে লিখেছিলেনঃ 'বসন্তকে (স্বামী পরমানন্দকে) আমার আশীর্বাদ জানাইও। তোমাকেও আমার আশীর্বাদ। সকলের জন্যেই আমার আশীর্বাদ। ...ঠাকুর তোমাদের সকলকে তাঁহার যোগ্য সন্তান করিয়া তুলুন- আমি এই প্রার্থনা করি।'

গ্রন্থপঞ্জী

জীবনী

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলিকাতা
শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, কলিকাতা
জননী সারদা দেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদঃ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ), কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ, জয়রামবাটী
সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী, কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, কলিকাতা
বিশ্বরূপিণী মা সারদা—শুক্লা ঘোষ, কলিকাতা

A Glimpse of the Holy Mother—Chandra Kumari Handoo, Belur
The Mother Sarada Devi—Winifred Iles, London
Sri Sri Saradadevi—P. B. Junnarkar, Calcutta
The Holy Mother—Swami Nikhilananda, London
The Holy Mother (Sri Sarada Devi)—Swami Nirvedananda, Calcutta
Short Life of the Holy Mother—Swami Pavitrananda, Calcutta
Sri Saradamani Devi : the Hindu Madonna—M. S. Ramulu, Madras
Sri Sarada Devi, La Santa Madre (Spanish)—Su Vida, Buenos Aires
Sri Sarada Devi; the Holy Mother (Her Life and Conversations)—Swami Tapasyananda and Swami Nikhilananda, Madras

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই খণ্ড), কলিকাতা
মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, কলিকাতা
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী—স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, জয়রামবাটী
রামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, কলিকাতা
শ্রীমা—আশুতোষ মিত্র, কলিকাতা

সহায়ক-গ্রন্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (পাঁচ খণ্ড)—শ্রীম-কথিত, কলিকাতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই খণ্ড)—স্বামী সারদানন্দ, কলিকাতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, কলিকাতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, কলিকাতা
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদনাঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং বিমলকুমার ঘোষ), কলিকাতা
সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—সম্পাদনাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা
আনন্দরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী প্রভানন্দ, কলিকাতা
রামকৃষ্ণ-সাধন-পরিক্রমা—মনোরঞ্জন বসু, কলিকাতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-অভিধান—সংকলনঃ কালীজীবন দেবশর্মা, কলিকাতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে—নির্মলকুমার রায়, কলিকাতা
শ্রীশ্রীসারদা দেবীঃ আত্মকথা—সংকলনঃ অভয়া দাশগুপ্ত, কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা—স্বামী তেজসানন্দ, বেলুড়
বিপ্লবের প্রতীক শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী—জীবন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা
দক্ষিণেশ্বরে মা সারদা—প্রণবেশ চক্রবর্তী, কলিকাতা
শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ড), কলিকাতা
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলিকাতা
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (পাঁচ খণ্ড)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, কলিকাতা
ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, কলিকাতা
রাজা মহারাজ—স্বামী নরোত্তমানন্দ, কলিকাতা
ব্রহ্মানন্দ-চরিত—স্বামী প্রভানন্দ, কলিকাতা
শিবানন্দ-বাণী (দুই খণ্ড)—সংকলনঃ স্বামী অপূর্বানন্দ, কলিকাতা
মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, কলিকাতা
মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, কলিকাতা
স্বামী প্রেমানন্দ, আঁটপুর, হুগলী
প্রেমানন্দ-প্রেমকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, কলিকাতা
প্রেমানন্দ জীবনচরিত—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, দেওঘর
স্বামী সারদানন্দ—ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র, কলিকাতা
স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, কলিকাতা
পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ, কলিকাতা
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, কলিকাতা
আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, কলিকাতা
জীবনকথা—স্বামী শঙ্করানন্দ, কলিকাতা

মন ও মানুষ (দুই খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কলিকাতা
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, মেদিনীপুর
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা
অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ—সংকলনঃ স্বামী সিদ্ধানন্দ, কলিকাতা
সৎকথা—সংকলনঃ স্বামী সিদ্ধানন্দ, কলিকাতা
সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সংকলনঃ স্বামী অপূর্বানন্দ, এলাহাবাদ
প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সম্পাদনা ও সংকলনঃ সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায়, কলিকাতা
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী—কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, কটক
সাধু নাগমহাশয়—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, কলিকাতা
গৌরীমা—দুর্গাপুরী দেবী, কলিকাতা
ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, কলিকাতা
নিবেদিতা লোকমাতা (প্রথম খণ্ড)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা
নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ (অনুবাদঃ নারায়ণী দেবী), কলিকাতা
স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ, বেলুড়
দুর্গামা—সুব্রতাপুরী দেবী, কলিকাতা
রামকৃষ্ণ-সংঘ—স্বামী তেজসানন্দ, বেলুড়
উদ্বোধন, শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা, কলিকাতা
উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, কলিকাতা

Ramakrishna: His Life and Sayings—Max Mueller, Calcutta
The Life of Ramakrishna—Romain Rolland, Calcutta
Life of Sri Ramakrishna, Calcutta
Ramakrishna and His Disciples—Christopher Isherwood, Calcutta
God of All—Claude Alan Stark, Massachusetts
Sarada Devi: the Great Wonder, New Delhi
Sri Sarada Devi: Consort of Sri Ramakrishna—Nanda Mukherjee, Calcutta
The Master as I saw Him—Sister Nivedita, Calcutta
The Life of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Disciples, Calcutta
The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, Calcutta
Glimpses of a Great Soul: A Portrait of Swami Saradananda—Swami Aseshananda, Hollywood
Letters of Sister Nivedita (2Vols)—Edited by Sankari Prasad Basu, Calcutta

Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda—Pravrajika Atmaprana, Calcutta

Long Journey Home: A Biography of Margaret Noble (Nivedita) —Barbara Foxe, London

History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission—Swami Gambhirananda, Calcutta

Great Women of India—Swami Madhavananda and Ramesh Chandra Majumdar, Mayavati (The Holy Mother Birth Centenary Memorial)

Women Saints, East and West—Swami Ghanananda and Sir John Stewart-Wallace, Hollywood

The Ramakrishna Movement, its Meaning for Mankind—Swami Budhananda, Calcutta

The Saving Challenge of Religion—Swami Budhananda, Madras

Eternal Values for a Changing Society—Swami Ranganathananda, Calcutta

Prabuddha Bharata: The Holy Mother Birth Centenary Number, Mayavati

The Vedanta Kesari: Holy Mother Birth Centenary Number, Madras

The Holy Mother Birth Centenary Souvenir, 1853-1953, Belur

General Report of the Holy Mother Birth Centenary Celebrations, 1953-54, Belur

Holy Mother Birth Centenary Women Devotees Convention Souvenir, Calcutta, 1954

পত্র-পত্রিকা

উদ্বোধন (কলিকাতা), বিশ্ববাণী (কলিকাতা), মাসিক বসুমতী (কলিকাতা), সমাজশিক্ষা (নরেন্দ্রপুর, চব্বিশ পরগনা)

Prabuddha Bharata (Mayavati), *Vedanta Kesari* (Madras), *Vedanta for East and West* (London), *Vedanta* (Gretz, Paris), *Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture* (Calcutta)

নির্দেশিকা

* চিহ্ন পাদটীকা নির্দেশক।